ফ্রানৎস কাফকা
গল্পসমগ্র

ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা
মাসরুর আরেফিন

ফ্রানৎস কাফকা

গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড

জীবদ্দশায় প্রকাশিত লেখাসমূহ

ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা
মাসরুর আরেফিন

'যদি কোনো একজন লেখকের নাম করতে হয় যিনি আমাদের সময়ের সঙ্গে বহন করেন সেই সম্পর্ক যেমনটি দান্তে, শেক্সপিয়ার ও গ্যেয়টের ছিল তাঁদেরগুলোর সঙ্গে, তাহলে সবার আগে মাথায় আসবে কাফকার নাম।'

– ডব্লিউ. এইচ. অডেন

'আমি যখন কলেজে ভর্তি হই...এক রাতে এক বন্ধু আমাকে ফ্রানৎস কাফকার ছোটগল্পের একটা বই ধার দেয়। ...সে রাতেই কাফকার 'রূপান্তর' গল্পটা পড়া শুরু করি। প্রথম লাইনটা পড়ামাত্র আমার প্রায় বিছানা থেকে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। ...এভাবে যে কেউ লিখতে পারে তা-ই তো আমার জানা ছিল না; যদি জানতাম, তাহলে নিশ্চিত আরো কত আগেই লেখালেখি শুরু করতাম। তার পরই, দেরি না করেই, আমি ছোটগল্প লেখা শুরু করলাম। ...ওই-ই শুরু।'

- গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

দুই খণ্ডে অতি-বিশ্বস্ত বাংলা অনুবাদে *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র* বাংলা সাহিত্যের জন্যই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অনুবাদকের ২২ বছরের কাফকা-বিষয়ক পড়াশোনার ফসল এ বইয়ে থাকছে:

- বিশদ ভূমিকা
- অনুবাদকের কথা
- প্রতিটি লেখার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও পাঠ-পর্যালোচনা
- কালপঞ্জি
- হোরহে লুইস বোরহেসের ভূমিকা।

A
Pathak Shamabesh Book

Short Stories/Translation/Literature

BDT. 1,195.00

CULTURE PRESS

Printed & Bound in Bangladesh by Culture Press, Dhaka

Bangladesh Taka 1,195.00
UK. £ 25 US. $ 50

আধুনিক পৃথিবীর দিকে তাকানো, এক অর্থে, ফ্রানৎস কাফকার চোখ দিয়ে তাকানোই। কাফকার ভুবনে প্রবেশ করা লেখক ও পাঠকদের কাছে তিনি বিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক; শতাব্দীর বিবেক।

এই মহান ও 'ভবিষ্যদ্বক্তা' লেখকের সব ছোট ও বড় গল্প দুই খণ্ডে, বিস্তারিত ভূমিকা ও প্রতিটি লেখার ব্যাখ্যা-টীকাসহ, বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

এই খণ্ডে থাকছে লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত লেখাগুলোর, সম্ভবত যে কোনো ভাষায়, এযাবৎকালের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ সংকলন।

ফ্রানৎস কাফকার বিচিত্র ভুবনে স্বাগত, যেখানে এক সেলস্ম্যান ঘুম থেকে উঠে বিষণ্ন তেলাপোকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়; এক ছেলে বিয়ে করে স্বাধীন হতে চায় বলে তার বাবা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেন; এক অনশন-শিল্পী উপোস করে করে মারা যাওয়ার আগে বলে যায় – এই পৃথিবীতে তার খাওয়ার মতো কোনো খাদ্য নেই বলেই অনশনই ছিল তার শিল্প; এক লোক সারা জীবন অপেক্ষা করে করে ব্যর্থ হয় আইনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে, আর তার মৃত্যুর সময় বলা হয়, ওই দরজাটি শুধু তার জন্যই বানানো হয়েছিল...

ISBN 978-984-8866-67-2

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক ফ্রানৎস কাফকা। শেক্সপিয়ারের পরে আর কোনো লেখককে নিয়ে এতটা গবেষণা হয়নি, যা হয়েছে কাফকাকে নিয়ে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগের আগেই তাঁকে নিয়ে লেখা হয়ে গেছে ১০ হাজার বই। আর ১৯৯৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সময়ে প্রতি ১০ দিনে তাঁর ওপর বের হয়েছে একটি করে নতুন বই। মাত্র নয়টি পূর্ণাঙ্গ গল্প, তিনটি অসমাপ্ত উপন্যাস, সামান্য কয়টি অসমাপ্ত বড় গল্প, কিছু গদ্য-স্কেচ, ডায়েরি ও চিঠি রেখে যাওয়া এই লেখকের – যিনি বন্ধুকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সব লেখা পুড়িয়ে ফেলতে – ক্ষুদ্রায়তন পাণ্ডুলিপির মূল্য ধরা হয়েছিল ১০ কোটি পাউন্ড, কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তা বেচেনি। এ পর্যন্ত সাহিত্যে নোবেলবিজয়ী ১০৯ জন লেখকের মধ্যে ৩২ জনই নিজেদের ওপরে কাফকার প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন।

প্রাগে ফ্রানৎস কাফকা মিউজিয়ামের সামনে

মাসরুর আরেফিন

জন্ম: অক্টোবর, ১৯৬৯। শিক্ষা: বরিশাল ক্যাডেট কলেজ; আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, মেলবোর্ন। পাঠ, অনুবাদ ও ব্যক্তিগত কাফকা-গবেষণার শুরু : ১৯৯০।

একমাত্র প্রকাশিত বই: কাব্যগ্রন্থ *ঈশ্বরদী, মেয়র ও মিউলের গল্প* (২০০১), যা প্রথম আলোর সে বছরের নির্বাচিত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে ব্যস্ত এই গল্পসমগ্রর দ্বিতীয় খণ্ড (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গল্প ও প্রবচনসমূহের পূর্ণাঙ্গ সংকলন) ও কাফকার প্রধান উপন্যাস *দুর্গ* (*The Castle*)-এর বাংলা অনুবাদের কাজে এবং সেইসঙ্গে নিজের প্রথম মৌলিক গল্প-সংকলনের নির্মাণ নিয়ে।

প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্‌মেদ

ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র

প্রথম খণ্ড

জীবদ্দশায় প্রকাশিত লেখাসমূহ

ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা

মাসরুর আরেফিন

পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ ২০১৩

অ নু বা দ কে র উ ৎ স র্গ

প্রিয়তম তিন লেখক

হোরহে লুইস বোরহেস – স্বচ্ছতা, বিস্ময় আর আনন্দ
ব্রুস চ্যাট্‌উইন – পথ, নিঃসঙ্গতা আর পৃথিবীর মায়া
ডব্লিউ. জি. সেবাল্ড – সময়, স্মৃতি, ক্ষয় আর কাফকা

ভয়ংকর এক পৃথিবী আমি বয়ে চলেছি আমার মাথার মধ্যে। কিন্তু কী করে নিজেকে মুক্ত করব, কী করে মাথা ছিঁড়ে-ফেঁড়ে না ফেলে ঐ পৃথিবীকে ছাড়িয়ে আনব? আমার নিজের ভেতর ওগুলো ধরে রাখার কিংবা ওগুলোর কবর দেওয়ার চেয়ে বরং হাজার গুণ ভালো হয় মাথা ছিঁড়ে-কেটে টুকরো করে ফেলা। আসলে এজন্যই আমার পৃথিবীতে আসা, সে বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার।

– ফ্রানৎস কাফকা, *ডায়েরি*, ২১ *জুন* ১৯১৩

লেখক হিসেবে আমার নিয়তি কী হবে তা বলা খুব সোজা। নিজের স্বপ্নতুল্য অন্তর্জীবনের ছবি আঁকার আমার যে প্রতিভা তা আর অন্য সবকিছুই পেছনে ঠেলে দিয়েছে; আমার জীবন ভয়ংকর রকম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, আর এই ক্ষয় থামবেও না। অন্য কিছুই আর কোনো দিন আমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। কিন্তু সেই ছবি আঁকার জন্য আমার যে শক্তি তার ওপর ভরসা করা চলে না : সম্ভবত এরই মধ্যে সে শক্তি চিরতরে হারিয়ে গেছে, সম্ভবত আবার তা আমি ফিরে পাব, যদিও আমার জীবনের পরিস্থিতি সেটার অনুকূল নয়। তাই আমি টলতে থাকি, বিরামহীন উড়ে যাই পর্বতের চূড়ার দিকে, কিন্তু খানিক পরেই পড়ে যাই নিচে। অন্যরাও টলে, তবে পর্বতের নিচুর দিকে, আর আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে; ওরা যদি পড়ে যাওয়ার মতো বিপদের মুখোমুখি হয়, ওদের ধরে ফেলে ওদের আত্মীয়স্বজন, যারা ওদের পাশে পাশে হাঁটে শুধু সেজন্যই। কিন্তু আমি টলি আর দুলি পর্বতের চূড়ার দিকে, উঁচুতে; এর নাম মৃত্যু নয়, মৃত্যুর অনন্ত যন্ত্রণা।

– ফ্রানৎস কাফকা, *ডায়েরি*, ৬ *আগস্ট* ১৯১৪

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

বাইশ বছর শেষে মুক্তি মিলল। ১৯৯০ সালে প্রথম কাফকা পড়া শুরু, তারপর ১৯৯৫ সালে এই একই পাঠক সমাবেশ থেকে বাংলায় *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র* প্রকাশের শেষ ধাপে এসে থেমে যাওয়া, তার পরের সতেরোটি বছর আমার নিরলস ব্যক্তিগত কাফকা-গবেষণা এবং আবার ২০১২ সালের জুনে এসে পুরোনো অনুবাদগুলো ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন করে অনুবাদে হাত দেওয়া, আবার পাঠক সমাবেশের সাহিদুল ইসলাম বিজুর সঙ্গে দুই খণ্ডের *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র* ও কাফকার প্রধান উপন্যাস *দুর্গ*র বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার চুক্তি স্বাক্ষর – অনেক দীর্ঘ এক পথ।

*ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র*র এই প্রথম খণ্ডে থাকছে কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত সব লেখা অর্থাৎ ম্যাক্স ব্রডকে কাফকা যে লেখাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে বলেননি, বলেছিলেন – যেহেতু ওরা প্রকাশিত হয়েই গেছে – যেন ওগুলোর হাজার খানেক কপি যা বাজারে আছে, তা শেষ হয়ে গেলে কখনো আর পুনর্মুদ্রণ করা না হয়। আর দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে কাফকার মৃত্যুর পরে আলোর মুখ দেখা সব গল্প, প্যারাবল, প্রবচন ও গদ্য স্কেচ, যেগুলো (তাঁর তিনটি উপন্যাস, অজস্র চিঠি ও ডায়েরিসহ) তিনি বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে পুড়িয়ে ফেলার স্পষ্ট আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কাফকার এই অতি বিখ্যাত চিঠি দুটি সম্পূর্ণ তুলে ধরা হলো এই বইয়ের 'ভূমিকার আগে' নিবন্ধের টীকা অংশে। যা-হোক, এ দুটি খণ্ড মিলে বাঙালি পাঠক পাচ্ছেন তিনটি উপন্যাস, চিঠি আর ডায়েরির বাইরের পুরো কাফকাকে; অন্যভাবে বললে, ফ্রানৎস কাফকার 'বিখ্যাত' লেখার (শুধু *বিচার* ও *দুর্গ* উপন্যাস ছাড়া) সবই। নিঃসন্দেহে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের জন্য এবং কাফকার প্রাসঙ্গিকতা, প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় পুরো বাংলা সাহিত্যের জন্যই এ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৯৫ সালে, মাত্র একজনের অনুবাদে কাফকা পড়ে (উইলা এবং এডুইন মুইরের প্রশ্নবিদ্ধ অনুবাদ), মূল জার্মানের সঙ্গে একটুও না মিলিয়ে, আমার সেই পুরোনো তৎসম শব্দের আধিক্যে ভরপুর বাংলা গদ্যে *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র* বের হলে যতটা ভুল হতো, আজ বুঝি তার চেয়েও বড় ভুল হতো কাফকা বিষয়ে তেমন কোনো পড়াশোনা ছাড়া ঐ কাজটি শেষ করে বসলে। পাঠকের কাফকা এবং অনুবাদকের কাফকা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে কাফকা উপভোগ করার জন্য পাঠকের কোনো পড়াশোনা বা পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন নেই; সমালোচক ফিলিপ রাহভ্ যেমন বলেন : 'তাঁর সৃজনীশক্তির চরিত্রই এমন যে লেখার বাইরের কোনো জ্ঞান তা উপভোগের জন্য পূর্বশর্ত নয়।' কিন্তু অনুবাদকের কাফকা? তাঁর লেখায় এত বেশি কিছুর পরোক্ষ-উল্লেখ

(allusions), এত রূপক-প্রতীক (symbol ও metaphor – দুই অর্থেই), এত প্যারাডক্স থাকে যে সেসবের গোঁড়ায় না গেলে কাফকা-অনুবাদ ভুল হতে বাধ্য। ফ্রানৎস কাফকা, বোরহেসের মতোই, বিনা কারণে একটি বাক্যও লেখেননি কখনো; এবং তাঁর অতি সহজ, সরল, স্বাভাবিক গদ্য আসলে একটা ধোঁকা মাত্র; পাঠক সেই ধোঁকার মধ্যে পড়লে হয়তো কাফকা পড়তে আরো মজা পাবেন, আরো চমৎকৃত হবেন, কিন্তু অনুবাদক সেই ধোঁকার আড়ালটা পর্দা সরিয়ে দেখে না নিলে নির্ঘাত ভুল অনুবাদ করে বসবেন। এ কারণেই আমি খুশি যে দীর্ঘ ২২ বছরের কাফকা-বিষয়ে পড়াশোনার পরই, জার্মান ভাষাও একটু-আধটু বোঝার পরই, এবং স্রেফ ঠিকভাবে কাফকা অনুবাদের স্বার্থে তাঁর শহর প্রাগের অলিগলি নিজ চোখে দেখে নিয়েই কেবল এ বই বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এই প্রথম খণ্ডটি এক অর্থে তুলনাহীন। কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত লেখাগুলোর এতখানি পূর্ণাঙ্গ কোনো সংস্করণ ইংরেজি ভাষাতে তো নেই-ই, অন্য কোনো ভাষায়ও আছে কি না সন্দেহ। অন্তত কোথাও, পূর্ণাঙ্গতার বিচারে, এই বাংলা প্রথম খণ্ডটির সঙ্গে তুলনীয় কোনো কাফকা গল্প সংকলনের উল্লেখ আমি আজও দেখিনি। এই বইয়ের সব গল্প আপনি ইংরেজিতে একসঙ্গে পাবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা তাঁর উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়টি আপনি সেখানে পাবেন না; আবার সেটি যেখানে পাবেন সেখানে তাঁর 'তিনটি সাহিত্য সমালোচনা' পাবেন না; আবার মাত্র একটি ইংরেজি বইয়েই পাবেন তাঁর 'বিরাট শোরগোল' লেখাটি; এবং অধিকাংশ বইয়েই পাবেন না 'ব্রেস্সায় উড়োজাহাজ'-এর মতো চমৎকার ভ্রমণকাহিনিটি বা সেটার এই পূর্ণাঙ্গ রূপটি। সে-অর্থে আপনি ভাগ্যবান যে আজ পর্যন্ত কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত যত লেখার সন্ধান মিলেছে, তাঁর পুরো একশো ভাগ লেখাই পাচ্ছেন এখানে, দুই মলাটের ভেতরে; সেই সঙ্গে থাকছে প্রতিটি লেখার প্রাসঙ্গিক জরুরি তথ্য ও ব্যাখ্যা।

অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমার সেই ১৯৯৫ সালের উইলা ও এডুইন মুইরের অনুবাদকে আর প্রামাণ্য মানিনি আমি। কারণ, এরই মধ্যে অনেক পড়েছি যে মুইর দম্পতির বিখ্যাত অনুবাদগুলো আসলে প্রশ্নবিদ্ধ এবং বুঝেছি যে কী কী কারণে তারা প্রশ্নবিদ্ধ। অনুবাদ করতে গিয়ে আমি এবার পাশাপাশি রেখেছি কাফকার সব কটি ইংরেজি অনুবাদ (উইলা ও এডুইন মুইরসহ) এবং প্রতিটি লাইনের অনুবাদের সময় সব কটি ইংরেজি অনুবাদ একযোগে পড়ে নিয়েই কেবল বাংলা করেছি; আর সেই সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে যখনই কোনো খটকা লেগেছে, তন্নতন্ন করে বাক্যটির বা শব্দটির ব্যাপারে খুঁজে নিয়েছি আমার সংগ্রহে থাকা ১০০-এরও ওপরের কাফকা-গবেষণা গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা এবং পাশাপাশি দেখে নিয়েছি মূল জার্মান লাইনটিও (যদিও বিনয়ের সঙ্গে মানছি, আমার জার্মান জ্ঞান স্রেফ দীর্ঘ কয়েক বছরের কাফকা, রিল্‌কে ও সেবাল্ড পড়ার অভিজ্ঞতালব্ধ একধরনের ভাসা-ভাসা জ্ঞান মাত্র; এ ব্যাপারে আমার দীর্ঘদিনের নিত্যসঙ্গী এক বিশাল জার্মান-ইংরেজি ডিকশনারি আর ওই ভাষা নিয়ে লেখা এলেবেলে কিছু বই আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা)। এসব কারণেই, প্রকাশকের বিরক্তি ঘটিয়ে, দু বা তিন মাসের অনুবাদে আমার

লেগে গেছে পাক্কা সাতটি মাস। তবে আমি খুশি যে এর ফলে বাঙালি পাঠক পাচ্ছেন এক অতি বিশ্বস্ত বাংলা ফ্রানৎস কাফকাকে। অনুবাদ-সাহিত্যবিষয়ক সব বিতর্ক মাথায় রেখেও আমি এখানে পাঠকের পাঠের আনন্দের ওপরে স্থান দিয়েছি কাফকার প্রতি আমার মহা খুঁতখুঁতে এক বিশ্বস্ততাকে, যার ফলে বাংলা পড়তে কোথাও কোথাও আপনার একটু খটকা লাগতে পারে বটে, কিন্তু আমি মনে করেছি, লেখকটি যেহেতু কাফকা, মো ইয়ান বা ভার্গাস য়োসা বা গার্সিয়া মার্কেস নন, সেহেতু তা-ই সই।

মোট ছয়টি ইংরেজি অনুবাদ থেকে প্রথম খণ্ডের এই লেখাগুলোর বাংলা করা হয়েছে, যেগুলো আমার অনুসরণের ক্রমানুসারে এমন: ১. স্যার ম্যালকম প্যাস্লি (পেঙ্গুইন বুকস); ২. জয়েস ক্রিক (অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ডস্ ক্লাসিকস্); ৩. মাইকেল হফমান (পেঙ্গুইন মডার্ন ক্লাসিকস); ৪. জে এ আন্ডারউড (স্ফিয়ার বুকস্); ৫. নাহুম গ্ল্যাৎসার সম্পাদিত *Franz Kafka – The Complete Stories*-এর উইলা ও এডুইন মুইর এবং তানিয়া ও জেমস স্টার্ন; এবং ৬. কোনো কোনো গল্পের বেলায় আরনস্ট্ কাইজার ও এইথ্নে উইলকিনস্। পাঠকের জানার জন্য বলে রাখছি, ইংরেজিতে কাফকার গল্পগুলোর ক্ষেত্রে (উপন্যাস নয়) ম্যালকম প্যাস্লির অনুবাদের চেয়ে আক্ষরিক ও বিশ্বস্ত কোনো অনুবাদ নেই; আর অন্যদিকে আন্ডারউডের চেয়ে বেশি পাঠযোগ্য, তরতরে কোনো ইংরেজি ভাষান্তর নেই। আমি, যেমনটা আগেই বলেছি, বিশ্বস্ততাকে রেখেছি পাঠযোগ্যতার ওপরে, তাই উপরের তালিকায় ম্যালকম প্যাস্লির নামটিই রয়েছে সবার আগে। ওটাই প্রামাণ্য ধরে এগিয়েছি মোটামুটি সব সময়। আর *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ, যেটি আকারে এই প্রথম খণ্ডটির চেয়েও কিছুটা বড়, এখনো শুরুই করিনি। আর এক মাস পর প্রথম খণ্ড বাজারে বেরিয়ে গেলেই কেবল ওটার কাজে হাত দেব, একই রকম পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে।

অনুবাদে কাফকার অদ্ভুত বিরামচিহ্নরীতি, যেমন ধরুন ড্যাশ বা হাইফেনের আগে কমা, যত দূর সম্ভব অপরিবর্তিত রাখা হলো, সব সময় চেষ্টা করা হলো মূল জার্মানের বিরামচিহ্ন অটুট রাখতে। কাফকার অদ্ভুতুড়ে বিরামচিহ্ন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, এর মধ্য দিয়ে তাঁর মানসিক অবস্থার ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণমূলক বইও আছে কয়েকটি। বাংলা গদ্যের নিয়ম মেনে যেখানে তা ভাঙতেই হয়েছে সেটুকু ছাড়া, আর কোনোখানেই কাফকার বিরামচিহ্নরীতি না মানার সাহস দেখাইনি। কাফকার প্যারাগ্রাফিংয়ের ক্ষেত্রেও তাই – এ ব্যাপারে আরো কঠোরভাবে এখানে মানা হয়েছে শুধু মূল জার্মানকে, কোনো ইংরেজি অনুবাদ নয়।

ফ্রানৎস কাফকার গদ্য যতটা সহজ-সরল ও স্পষ্ট, তাঁর লেখার বিষয়বস্তু বা থিম ততটাই জটিল, অস্বচ্ছ, অনিশ্চিত ও ঘোরালো। প্রচুর মেটাফর (সোজা বাংলায় রূপকালংকার) উপস্থিত তাঁর লেখায় এবং মেটাফরিক্যাল প্যারাডক্সেরও কমতি নেই (যেমনটা তিনি ঠিক মৃত্যুর মিনিট খানেক আগে বলেছিলেন রবার্ট ক্লপস্টক্‌কে: 'হয় আমাকে মেরে ফেলো, না হয় তুমি খুনি')। মেটাফর তাঁর লেখায় অর্থের স্বচ্ছতা আনার বদলে এনেছে অর্থের মহা অনিশ্চয়তা। এ কারণেই আলব্যের কাম্যু বলেন, কাফকার লেখার নিয়তি ও মহত্ত্ব এটাই যে, 'It offers everything and confirms nothing' (তুলে ধরে সবকিছুই, কিন্তু

নিশ্চিত করে না কিছুই)। ওয়াল্টার বেন্‌জামিন বলেছেন: 'কাফকার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল নিজের জন্যই প্যারাবল তৈরি করার...তিনি তাঁর লেখার ব্যাখ্যা ঠেকানোর জন্য যত রকমের সাবধানতা অবলম্বন সম্ভব, তার সবই করে গেছেন। আপনাকে তাঁর লেখার মধ্যে নিজের পথ করে নিতে হবে সাবধানে, সতর্কতা নিয়ে, আর সব দিকে খেয়াল রেখে।'

এ কারণেই কাফকার লেখার অর্থ উদ্ধারের আশায় এত এত গবেষণা, আর এ কারণেই এ বইয়েরও এই দীর্ঘ এক শ পাতার উপরের পাঠ-পর্যালোচনা ও এমন বিশদ ভূমিকা। বোরহেসের মুখবন্ধটিও, বোরহেসের মতো মহান লেখকের লেখা বলে তো বটেই, পাঠককে কাফকা বুঝতে আরো সহায়তা করবে বলেই এ বইতে জুড়ে দেওয়া হলো। এখানে পাঠককে জানিয়ে রাখছি আলব্যের কাম্যুর বিখ্যাত উক্তিটি: 'ফ্রানৎস কাফকার পুরো শিল্পই গঠিত হয়েছে পাঠককে পুনঃপাঠে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখার সমাপ্তি, বা সমাপ্তির অনুপস্থিতি, এমন সব ব্যাখ্যার ইঙ্গিত খাড়া করে, যা পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত করা হয়নি, কিন্তু আপনার কাছে সে ব্যাখ্যা ন্যায্য বলে মনে হওয়ার আগেই আপনার দরকার হয়ে পড়বে লেখাটি, আবার একবার, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার।'

গল্পগুলো পুনঃপুনঃ পাঠ করে বাঙালি পাঠক 'বিশ শতকের এই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক' (বলেছেন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক জে. জি. ব্যালার্ড) এবং নিঃসন্দেহে সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখকের অন্ধকার, কৌতুকময় ও জটিল পৃথিবীতে প্রবেশ করে আনন্দলাভ করুন, এটুকুই প্রত্যাশা।

এবার আসি ধন্যবাদ দেওয়া ও ঋণ-স্বীকারে। প্রজেক্টটি যথেষ্ট বড়, আমি ঋণীও তাই অনেক মানুষের কাছে। প্রথমেই বলতে হয় নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা আমার ছোট ভাই মশিউর রহমান (বাবু)-এর কথা, আমাজন ডটকম থেকে ডেলিভারি নেওয়া অজস্র কাফকাগ্রন্থ এবং কাফকা-গবেষণাগ্রন্থ প্রথম গেছে যার ঠিকানায় এবং বারবারই কষ্ট করে যে বাংলাদেশের প্লেনে তুলে দিয়েছে সেগুলো; মশিউরের সাহায্য ছাড়া নিশ্চিত এ বইটির এই রূপ দাঁড়াত না। আরেকজন আমার ব্যাংকের সহকর্মী আমজাদ হোসেন, সে-ও আমেরিকা থেকে প্রায় ১৫টি কাফকা-গবেষণাগ্রন্থ এনে দিয়েছে আমাকে। এদের দুজনের ঋণ ভোলার নয়।

অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে প্রিয়তম কবিবন্ধু, বর্তমানে ইন্টারনেটে ব্যস্ত ব্লগার, ব্রাত্য রাইসুর নাম, যে আজ ২২টি বছর ধরেই চাচ্ছে আমার ফ্রানৎস কাফকা প্রজেক্ট শেষ হোক; আমার বাংলা গদ্যে স্বচ্ছতা আনার ব্যাপারে নানা উপদেশের জন্যও আমি রাইসুর কাছে ঋণী। এরপর আসে অনুবাদক, লেখক, প্রিয়বন্ধু রাজু আলাউদ্দিনের নাম; মোটামুটি রাইসুর মতো সে-ও আমাকে দীর্ঘ বছর ধরে প্রেরণা দিয়ে গেছে কাফকা অনুবাদে; আর তাঁর বোরহেস অনুবাদও আমাকে অনেক সাহসী করেছে এই কাজে। রাজুর সঙ্গে বোরহেস ও কাফকা নিয়ে এত কথা, এত গল্প হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে কাফকা সম্বন্ধে এমন কিছু অন্তর্দৃষ্টিও আমি পেয়েছি যে, সবকিছু মিলে তাঁর প্রতি আমার ঋণ সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

আর কবি সাজ্জাদ শরিফ ২০১২ সালের মে-জুন মাসে আমাকে কাজটি শেষ করার জন্য তাড়া না দিলে এবং এই দীর্ঘ কয়েক বছরেও কাজটি শেষ না করার জন্য মাঝেমধ্যে খোঁটা না দিলে আমি নিঃসন্দেহে এ বছরও কাফকায় হাত দিতাম না। তাঁর প্রতিও আমার অনেক ঋণ। সত্য কথা বলতে, আমি জানি যে তিনি বিশ্বাস করেন আমি একজন সৎ ও ভালো অনুবাদক; আর তাঁর এই বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞানটুকু আমার জন্য সব সময়ই কাজে লেগেছে বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে। আরেকজন আছেন, অনুবাদক-গল্পকার ফারুক মঈনউদ্দীন, অফিসে তাঁর ঠিক পাশের রুমটিতেই আমি বসি। তাঁর মতো বিখ্যাত অনুবাদকের এত কাছাকাছি থেকে এবং আমার অনুবাদ নিয়ে তাঁর সব সময়ের স্পষ্ট প্রশংসা ও উৎসাহের পরে আমার পক্ষে আর সম্ভবই হয়ে ওঠেনি কাজটি শুরু ও শেষ না করা। সাজ্জাদ ভাই ও ফারুক ভাইয়ের কাছে থাকল আমার সত্যিকারের ঋণ।

এ ছাড়া বলতে হয় *প্রথম আলোর* বন্ধু আলীম আজিজ ও *সমকাল*-এর বন্ধু মাহবুব আজীজের কথা – দুজনই কী সুন্দরভাবে এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যার যার পত্রিকার সাহিত্য পাতায় আমার অনুবাদে ছেপেছিলেন কাফকার দুটি বিখ্যাত গল্প, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২-তে কাফকার 'রায়' গল্প লেখার এক শ বছর পূর্তি উপলক্ষে ছোট ভূমিকাসহ দারুণ ট্রিটমেন্ট দিয়ে। এ দুজনও আমাকে নিয়ত প্রেরণা দিয়ে গেছেন কাজটি শেষ করার জন্য। ধন্যবাদ এই দুই সাহিত্য সম্পাদককে। আরো একজনকে ধন্যবাদ – আমি যে-ব্যাংকে কাজ করি তার ব্র্যান্ড বিভাগের প্রধান নাজমুল করিম চৌধুরী; শিল্প সাহিত্যের বিরাট রসিক এই তরুণ তাঁর অভাবনীয় মার্কেটিং বুদ্ধি দিয়ে এ বইয়ের বাজারজাতকরণের দিকটিতে আমাকে ও বইয়ের প্রকাশককে উল্লেখযোগ্য মেধা-সহায়তা করেছে।

আজ আমার মনে পড়ছে প্রয়াত লেখক ও মনীষী আহমদ ছফার কথা। ১৯৯৫ সালে যখন পাঠক সমাবেশ থেকেই বের হচ্ছে আমার *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র*, তখন ছফা ভাই কী স্নেহে লম্বা একটি চিঠি লিখেছিলেন ঢাকার গ্যেয়টে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরকে, বইটি প্রকাশে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য। ছফা ভাই আজ আর নেই, কিন্তু চিঠিটি আমার কাছে আজও রয়ে গেছে – নিজের অনুবাদ নিয়ে নিঃসংশয় না থাকার কারণে তখন প্রজেক্টটি থেকে সরে আসি বলে, যে চিঠি আমার আর কখনোই পৌঁছানো হয়নি প্রাপকের কাছে।

শেষে আসি প্রাগের বিখ্যাত 'ফ্রানৎস কাফকা সোসাইটি'র দুজন মানুষের কথায় (আমি নিজেও এ মহাপ্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানটির একজন সামান্য সদস্য) যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণাই শুধু দেননি, নানা নির্দেশনা দিয়েও সাহায্য করেছেন। এঁদের প্রথমজন প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারি মিজ্ জুজানো ভের্নোরোভা (Zuzana Vernerova; সবাই ডাকে 'জুজানো' নামে; যেমন কাফকাকে চেক ভাষায় তারা ডাকে 'কাফকে' বা 'কাফকি' নামে)। কাফকা-বিষয়ে বিজ্ঞ এই মেয়েটি অসম্ভব ধৈর্য নিয়ে আমার বইয়ের অসংখ্য চেক ও জার্মান শব্দের উচ্চারণ ঠিক করে দিয়েছে; আমার অনুবাদের বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক জায়গার দারুণ ব্যাখ্যা দিয়েছে; এবং তার অফিসে একদিন পুরো এক বেলার কাজ ফেলে রেখে আমার অনুবাদ বিষয়ে অজস্র আগে-থেকে-তৈরি-করে-নিয়ে-যাওয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়ে

গেছে। অন্যজন 'কাফকা সোসাইটি'র প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্ট ও লাইব্রেরির প্রধান, জুজানো মেয়েটির বস, মিসেস ড্যানিয়েলা উহের্কোভা (Daniela Uherkova), যিনি জুজানোকে কখনোই বাধা দেননি, বরং উৎসাহিত করে গেছেন আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে। 'ফ্রানৎস কাফকা সোসাইটি' প্রতীক্ষায় আছে বাংলায় *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্রর* দুই খণ্ড ও *দুর্গ* উপন্যাসের প্রকাশ হওয়া নিয়ে, এ-ও আমার জন্য কম অনুপ্রেরণার বিষয় নয়।

শেষে আমার সহধর্মিণী ফারহানা মাসরুরের ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারছি না। গত সাতটি মাস এই প্রজেক্ট আমাদের যৌথ সংসারের জীবনযাপনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, আর সেটাই স্বাভাবিক। সমানে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাওয়া এবং আমার অলস মুহূর্তে অনুবাদের কাজে বসতে তাড়া দেওয়ার জন্য আমি তার কাছে নিঃসন্দেহে বড় রকমের ঋণী। ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার দুই মেয়ে মালাগা ও নিওবি-রও, যারা গত সাতটি মাস তাদের বাবার সঙ্গে সম্পর্কের এক নতুন নিয়মে অভ্যস্ত হওয়া শিখেছে।

সবশেষে অসংখ্য ধন্যবাদ পাঠক সমাবেশের প্রকাশক, সাহিত্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু সাহিদুল ইসলাম বিজুকে, ২২টি বছর ধরে আমার কাজের প্রতি আস্থা ও ১৭টি বছর ধরে এ বইয়ের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপির জন্য, একবারও আশা না ছেড়ে, অপেক্ষা করার কারণে। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ বইয়ের প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার কাজটি এত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিল্পী সেলিম আহ্‌মেদকে, যিনি কাজটি করেছেন তাঁর নিখাদ কাফকা-প্রেম থেকেই।

বইয়ের 'ভূমিকা' ও 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশের জন্য কাফকা-বিষয়ক যে অনুবাদক ও গবেষকদের কাছে আমি ঋণী, তাদের নাম ওই দুই অংশের শেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করা হলো।

বইয়ের যেখানেই তৃতীয় বন্ধনী ([ ]) ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই বুঝে নিতে হবে যে, বন্ধনীর ভেতরের কথা, শব্দ বা বাক্যটি অনুবাদকের, সেটি মূল লেখার অংশ নয়।

ফ্রানৎস কাফকার বিশাল-বিচিত্র পৃথিবীতে আপনাকে স্বাগত।

মাসরুর আরেফিন

arefinmashrur@yahoo.com

২৮ ডিসেম্বর, ২০১২, ঢাকা

ভূমিকার আগে

ফ্রানৎস কাফকা: খ্যাতি, প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা

ডক্টর ফ্রানৎস কাফকা, বর্তমান চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগের এক বিমা কর্মকর্তা ও লেখক, বেঁচে ছিলেন মোট চল্লিশ বছর ও এগারো মাস। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কাটান জীবনের ষোলো বছর ও সাড়ে ছয়টি মাস, আর চাকরিজীবনে প্রায় পনেরো বছর। উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে চাকরি থেকে অবসর নেন। গলার স্বরযন্ত্রের ক্ষয়রোগে (বা যক্ষ্মারোগে) তিনি এর দুই বছর পরে মারা যান ভিয়েনার একটু বাইরের এক স্যানাটোরিয়ামে।

এখনকার চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগ তখন (কাফকার জন্ম ৩ জুলাই, ১৮৮৩ এবং মৃত্যু ৩ জুন, ১৯২৪) অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের দুই রাজধানী ভিয়েনা (প্রধান রাজধানী) ও বুদাপেস্টের পরে এর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর। পাশের জার্মান সাম্রাজ্যে সাপ্তাহিক ছুটিতে প্রায়ই বেড়াতে যাওয়া বাদ দিলে কাফকা জীবনে মোট পঁয়তাল্লিশ দিন বিদেশে কাটিয়েছেন। প্রাগ ছাড়া তাঁর দেখা অন্য শহরগুলো হলো: বার্লিন, মিউনিখ, জুরিখ, প্যারিস, মিলান, ভেনিস, ভেরোনা, ভিয়েনা ও বুদাপেস্ট। জীবনে তিনটি সাগর দেখেছেন তিনি, প্রতিটা একবার করে: নর্থ সি, বাল্টিক সাগর এবং ইতালিয়ান অ্যাড্রিয়াটিক। আর দেখেছেন একটি বিশ্বযুদ্ধ।

তিনি কোনোদিন বিয়ে করেননি। তাঁর বাগ্‌দান হয়েছিল মোট তিন বার: দুবার বার্লিনের মেয়ে ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে এবং একবার প্রাগের ইউলি ওরিৎসেকের সঙ্গে। তাঁর রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল আরো চারজন মেয়ের সঙ্গে; এবং দৃশ্যত, তিনি জীবনে অনেকবার গণিকাপল্লিতেও গেছেন। জীবনে একবারই এক মেয়ের সঙ্গে (তাঁর শেষ প্রেমিকা ডোরা ডিয়ামান্ট) তিনি প্রায় টানা ছয় মাস বার্লিনের একটি অ্যাপার্টমেন্টে থেকেছেন। ফেলিস বাউয়ারের বান্ধবী গ্রেটে ব্লখের গর্ভে কাফকার এক সন্তানের জন্ম হয়েছিল বলে অনেকে দাবি করে থাকেন। কাফকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই জীবনীকারের একজন পিটার-আন্দ্রে অল্টসহ[1] অন্যরা সবাই একমত যে এই দাবি ভিত্তিহীন, কাফকা কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি।[2]

লেখক হিসেবে কাফকা প্রায় চল্লিশটি 'সম্পূর্ণ' রচনা রেখে গেছেন। এর মধ্যে নয়টিকে বলা যায় গল্প, অর্থাৎ যে অর্থে আমরা কোনো লেখাকে 'গল্প' নামে আখ্যায়িত করতে পারি: 'রায়', 'দি স্টোকার', 'রূপান্তর', 'দণ্ড উপনিবেশে', 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন', 'প্রথম দুঃখ', 'এক ছোটখাটো মহিলা', 'এক অনশন-শিল্পী', এবং 'গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি' (প্রসঙ্গক্রমে এই নয়টি গল্পই বাংলা অনুবাদে এ বইতে রয়েছে)। কাফকা তাঁর যে-সব লেখাকে 'সম্পূর্ণ' বলেছেন, ছাপার অক্ষরে সেগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ৩৫০-এর মতো।

এর বাইরে কাফকা রেখে গেছেন ৩ হাজার ৪০০ পৃষ্ঠার মতো ডায়েরি এন্ট্রি, খণ্ড সাহিত্যকর্ম, ইত্যাদি (এর মধ্যে তাঁর তিনটি অসম্পূর্ণ উপন্যাসও আছে)। কাফকা তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে বলে গিয়েছিলেন তাঁর সব লেখা (যেগুলো প্রকাশিত হয়নি সেগুলো) পুড়িয়ে ফেলতে;[৩] তিনি নিজেও ধ্বংস করে গেছেন তাঁর অনির্দিষ্ট কিন্তু উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নোটবুক। বন্ধুর কথা শোনেননি ব্রড, তিনি কাফকার সাহিত্যকর্মের যতটুকু হাতের নাগালে পেয়েছিলেন তার মোটামুটি সবটাই প্রকাশ করেছেন। কাফকার রক্ষা পাওয়া প্রায় ১ হাজার ৫০০ চিঠির সবগুলোই প্রকাশিত হয়েছে।

জীবদ্দশায় কাফকা সাতটি রচনা বই আকারে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন : *ধেয়ান* (১৯১২; ১৮টি গদ্য-স্কেচ আছে এতে); *রায়* (১৯১৬); *দি স্টোকার* (১৯১৩; তাঁর *নিখোঁজ মানুষ*, বা ম্যাক্স ব্রডের দেওয়া নামে *আমেরিকা* উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়); *দণ্ড উপনিবেশে* (১৯১৯); *এক গ্রাম্য ডাক্তার* (১৯১৯; ১৪টি গল্পের সংকলন); এবং *এক অনশন-শিল্পী* (১৯২৪ সালে মৃত্যুর সামান্য পরে প্রকাশিত; কাফকা এর প্রুফ দেখে গিয়েছিলেন; মোট চারটি গল্প আছে এতে)। এই বইগুলো বেরিয়েছিল তখনকার জার্মানির তিন খ্যাতনামা প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান থেকে। জীবদ্দশায় প্রকাশিত আরো কিছু লেখার পাশাপাশি কাফকার এ সাতটি বই-ই বাংলা অনুবাদে এখানে ছাপা হলো।

এত অল্পসংখ্যক লেখা লিখে এবং জীবদ্দশায় একটিও উপন্যাস প্রকাশ না করে (আরো নিখুঁত করে বললে, একটি উপন্যাসও সম্পূর্ণ না লিখে), ফ্রানৎস কাফকা বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখকের অভিধা পেয়ে গেছেন।[৪] এটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রধানতম তিন স্তম্ভের একটি কাফকা (অন্য দুজন জেমস জয়েস ও হোরহে লুইস বোরহেস)।[৫] তবে আধুনিক সাহিত্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য খ্যাতনামা লেখকের জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে কাফকার সমান আর কেউই নেই।[৬] শেক্সপিয়ারের পরে আর কোনো লেখককে নিয়ে এতটা লেখালেখি হয়নি, যতটা হয়েছে কাফকাকে নিয়ে। মধ্য নব্বই

দশকের আগেই তাঁকে নিয়ে লেখা হয়ে গেছে ১০ হাজার বই;[৭] এর পরের গল্প আরো চোখ-ধাঁধানো। ২০১০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর *দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌* পত্রিকায় কাফকা স্কলার এলিফ বাটুমান জানাচ্ছেন: 'কাফকা গবেষণার সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাঁর নিজের লেখার সংখ্যার উল্টো ধারায় ; সাম্প্রতিক এক হিসাবমতে, গত ১৪ বছরে [অর্থাৎ ১৯৯৬ থেকে] প্রতি ১০ দিনে তাঁকে নিয়ে বের হয়েছে একটি করে নতুন বই।' কাফকা গবেষণার এই বিরামহীন প্রকৃতি, যা আজও সমানতালে চলছে, পরিষ্কার এ কথা প্রমাণ করে যে ফ্রানৎস কাফকার সাহিত্যকর্ম গত বিংশ শতাব্দীর মতো এই একবিংশ শতাব্দীতেও, একশো বছর পরেও, একইভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সমাজ ও রাজনীতির বিবর্তনের ধারায় সেই প্রাসঙ্গিকতা বরং বেড়েই চলেছে। কাফকা এখন একটি বিশালায়তন অ্যাকাডেমিক ও প্রকাশনা (সেই সঙ্গে টুরিস্ট) ইন্ডাস্ট্রির নাম। সারা পৃথিবীর সব লেখকের মধ্যে একমাত্র শেক্‌সপিয়ার ছাড়া কাফকাকে নিয়েই হয়েছে সর্বোচ্চসংখ্যক পিএইচডি থিসিস, সর্বোচ্চসংখ্যক জীবনীগ্রন্থের প্রকাশ, সর্বোচ্চসংখ্যক কফি-টেবিল বই, আর জগ-মগ-পোস্টার-কলম-টি শার্ট ও স্যুভেনিরের ব্যবসা।[৮] প্রাগে বেড়াতে গেলে খুব ভালোভাবেই বোঝা যাবে, কাফকা-ট্যুরিস্টের ভিড়টা কী নিয়মিত আর কত বড়। কাফকার মূল পাণ্ডুলিপিগুলো (*বিচার* উপন্যাস বাদে) আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোদ্‌লেইয়ান লাইব্রেরিতে। ১৯৯০ দশকে এই পাণ্ডুলিপিগুলোর মূল্য ধরা হয়েছিল ১০ কোটি পাউন্ড।[৯] কিন্তু বলা হয়েছিলো, এর চেয়ে বেশি দাম দিয়ে কেউ কিনতে চাইলেও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কাফকা পাণ্ডুলিপি কারো কাছেই কোনোদিন বিক্রি করবে না, যেমনটা কিনা ল্যুভ মিউজিয়াম কখনোই বেচবে না তাদের *মোনা লিসাকে*। ১৯৯০-এর দশকেই কাফকার সাহিত্যকর্মের কপিরাইট উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারপর জার্মানির প্রফেসরদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধে যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের – কে কাফকার মূল পাণ্ডুলিপি দেখে গবেষণা, অনুবাদ ও অন্যান্য কাজ করার সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে। পৃথিবীর হাতেগোনা পাঁচ-ছয়জন প্রধান কাফকা গবেষকের একজন স্যার ম্যালকম প্যাস্‌লিকে (যিনি কাফকার মূল পাণ্ডুলিপি দেখে তাঁর সব গল্প ১৯৭০-এর দশকে আবারও ইংরেজি অনুবাদের এবং উপন্যাসগুলোর অনুবাদ তত্ত্বাবধানের দুর্লভ সুযোগ পান) এক পর্যায়ে জার্মানরা 'স্যার' নামেই ডাকতে হবে বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা শুরু করে। এমন দাঁড়ায় যে লন্ডনের জার্মান রাষ্ট্রদূতকে স্বয়ং সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হয় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য।

তবে কাফকার প্রতি এই বিশ্বব্যাপী আগ্রহ তৈরি হওয়ারও নিজস্ব ইতিহাস আছে। জীবদ্দশায় স্বল্প পরিচিত এই লেখক ১৯২৪ সালে মৃত্যুর পরই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেননি। মোটামুটি ১৯৪৫ সালের দিক থেকে কাফকা ফেনোমেননের শুরু। ইতিহাসটির দিকে তাকালে মনে হবে, বিশ শতকের শুরুর দিকের এই সামান্য কয়টি লেখার স্রষ্টাকে

বিশ্বখ্যাতির চূড়ায় তোলার জন্যই যেন চারটি ঐতিহাসিক ঘটনা একসঙ্গে, বা পরপর, কোনো অজ্ঞাত পরিকল্পনামাফিকই ঘটেছিল : ১. হলোকাস্ট (১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার-শাসিত নাৎসি জার্মান রাষ্ট্রের স্পন্সর করা, সিস্টেমেটিক ইহুদি গণহত্যাযজ্ঞ; যাতে আনুমানিক ৬ মিলিয়ন ইউরোপিয়ান ইহুদি প্রাণ হারায়); ২. কম্যুনিজম (ব্যক্তির ওপরে রাষ্ট্রের শাসন, আমলাতান্ত্রিকতা এবং জোসেফ স্টালিনের সোভিয়েত বাধ্যতামূলক শ্রম ক্যাম্প বা গুলাগ, যেখানে মোট ১৪ মিলিয়ন সোভিয়েত নাগরিককে মানবেতর পরিবেশে কাজ করতে হয় এবং ১৯৩৪-৫৩ সময়কালে যেখানে মোট ১২ লাখ ৫৮ হাজার ৫৩৭ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে); ৩. অস্তিত্ববাদ (দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদ যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে বিরূপ পৃথিবীতে ব্যক্তির অভিজ্ঞতাই সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার গোঁড়ার কথা; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অস্তিত্ববাদ রীতিমতো একটি আন্দোলনে পরিণত হয়, যার পুরোভাগে ছিলেন দুই ফরাসি লেখক জাঁ পল সার্ত্রে ও আলব্যের কাম্যু এবং জার্মান দার্শনিক মার্টিন হেইডেগার – তিনজনই কাফকা প্রভাবিত); এবং ৪. স্নায়ুযুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার (১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চলা দুই বৃহৎ শক্তি ও তাদের মিত্ররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনা – একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট বিশ্ব)। পৃথিবীর সব প্রান্তকেই কমবেশি ছুঁয়ে যাওয়া এই চারটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কাফকা-পাঠের পরে অনেকেরই মনে হবে, যেন ফ্রানৎস কাফকার দিব্যদর্শী (prophetic) রচনাগুলোকে বৈধতা দেওয়ার বা তাদের সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্যই ঘটেছিল। (অবশ্য এ-দাবির ত্রুটিও আছে; এর মধ্য দিয়ে কাফকাকে ঘিরে থাকা মিথকেই সমর্থন করা হয়। নাৎসি বাহিনী যখন বাড়ির দরজার বাইরে এসে গেছে, তখনো নিশ্চয়ই এই বাড়ির ইহুদি নাগরিকটি জানত না যে সেদিন নাৎসি বাহিনী তাদের বাড়ির সবাইকে ধরে নিয়ে যেতে আসবে, যদি জানতই তাহলে নিশ্চয়ই সে ও তার পরিবার বাড়িতে থাকত না। সেখানে এই ঘটনার প্রায় বিশ বছর আগে ফ্রানৎস কাফকা মারা গেলেও, তিনি তাঁর লেখার মধ্যে রূপক অর্থে এগুলোরই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন – এ কথা বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়। আর ভালোভাবে চিন্তা করে দেখলে এ দাবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত গুলাগ বা মাও-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবে প্রাণ হারানো অগণিত মানুষের বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি বেশ অবমাননাকরও বটে)।

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো যে, প্রধান দশটি কাফকা মিথের একটি এই 'ভবিষ্যদ্বক্তা কাফকা' মিথ ('মিথ' বলতে এখানে বানোয়াট কথা নয় বরং সত্য-অর্ধসত্য অনুমান মিলিয়ে কিছু দাবিকে বোঝানো হচ্ছে)। যা-ই হোক, এটুকু সম্ভবত মিথ নয় যে, কাফকার সাহিত্যকর্ম হচ্ছে কোনোকিছু একেবারে শূন্য থেকে উদয় হওয়ার এবং মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যেই সুবিশাল গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করার এক দুর্লভ উদাহরণ; আর

যেভাবে, যে গতিতে কাফকা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য ও পূজনীয় হয়ে উঠেছেন সে ইতিহাসের মধ্যে আমরা সেই একই 'অফুরন্ত দুর্দমনীয়তা'কেই দেখি, যা কিনা তাঁর লেখনীরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১০] তবে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাফকা পাঠ করলে বোঝা যায়, কাফকার লেখা কোনো 'ভিনগ্রহের' লেখা বা 'অপার্থিব' লেখা, কিংবা শূন্য থেকে উদয় হওয়া কিছু – এসব প্রচলিত ধারণার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে। ১৯৩৮ সালে ওয়াল্টার বেন্‌জামিনের মতো দার্শনিক, লেখক ও সাহিত্যবোদ্ধা কাফকা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে কাফকা 'সাহিত্যে মূলত *বিচ্ছিন্ন* এক সত্তা', যেমনটি চিত্রকলায় পল ক্লি।[১১] যেন বা কাফকার কোনো সাহিত্যিক পূর্বসূরি নেই। কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। বাস্তবে কাফকার ওপর প্রভাব আছে গ্যেয়টে, ফিওদর দস্তইয়েফ্‌স্কি, হাইনরিখ্ ফন ক্লাইস্ট, চার্লস ডিকেন্স, গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, ফ্রানৎস গ্রিলপারসার, ফ্রানৎস ভেরফেল, হুগো ফন হফমান্‌স্‌থাল, স্টিফটার, গোগোল, মেলভিল, অ্যালান পো, মার্কি দ্য সাদ, স্ট্রিন্ডবার্গ এবং সেই সঙ্গে কিছু চেক লেখকের; আর দার্শনিক প্লেটো, নিট্‌শে, সোরেন কিয়ের্‌কেগার্ড, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের; আরো আছে অটো ভেইনিঙগার-এর (*সেক্স অ্যান্ড ক্যারেকটার*-এর বিখ্যাত লেখক); প্রসঙ্গত ভেইনিঙগারের সোশিও-সেক্সুয়াল তত্ত্বগুলো তখনকার দিনে ফ্রয়েডের তত্ত্বের চেয়েও বেশি সুপরিচিত ছিল।[১২] কাফকার পূর্বসূরিদের বিষয়ে আর একটি নামেরই শুধু উল্লেখ করলে চলবে। তিনি মার্টিন বুবার (১৮৭৮-১৯৬৫), অস্ট্রিয়ায় জন্ম নেওয়া ইজরায়েলি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক, কাফকার সময়ে সাপ্তাহিক *ডি ভেল্ট* পত্রিকার সম্পাদক, যে পত্রিকাটি ছিল জায়োনিস্ট আন্দোলনের (ইহুদিত্ব ও ইহুদি সংস্কৃতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যার মূল লক্ষ্য ইজরায়েলে ইহুদি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ও টিকিয়ে রাখা) প্রধান মুখপাত্র। যদিও কাফকার সংশয় ছিল মার্টিন বুবারের জায়োনিস্ট ইউটোপিয়া নিয়ে, এবং তাঁর দুই বন্ধু ম্যাক্স ব্রড ও হুগো বার্গমানের মতো যদিও কাফকা থিওডর হার্সলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কখনো পূর্ণ বিশ্বাস রাখেননি, তার পরও তিনি বসবাস ও লেখালেখি করেছেন মূলত জায়োনিজম ঘিরে তৈরি হওয়া এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বসে। এ বিষয়ে আমরা এই বইয়ের 'ভূমিকা'য় কাফকার 'জীবন' অংশে আরো আলোকপাত করব।

যা আলোচনা করছিলাম তাতেই ফিরে আসা যাক। কাফকার বিশ্বব্যাপী কাফকা হয়ে ওঠার ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। ১৯২৪ সালে কাফকার মৃত্যুর পরের সেই ইতিহাস (যার নির্মাণে ভূমিকা আছে পশ্চিমের বিশাল খ্যাতিমান সব লেখক ও দার্শনিকের, যেমন – ওয়ালটার বেন্‌জামিন ও থিয়োডোর অ্যাডর্নো, আলব্যের কাম্যু ও জাঁ পল সার্ত্রে, হ্যারল্ড ব্লুম ও জাক দেরিদা) এক অর্থে গত শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনকথারই ইতিহাস।[১৩] খুব কম লেখকই কাফকার মতো এমন বৈশ্বিক মনোযোগ কাড়তে পেরেছেন। ভিনদেশের অধিকাংশে সংস্কৃতিতেই কাফকার লেখা এমনভাবে গৃহীত হয়েছে, যেন তিনি তাঁদের

দেশেরই লোক ও লেখক। জেমস জয়েসের ভাষাতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে তাঁর লেখা তাঁর মূল টেক্সটের সঙ্গে জোড় বাঁধা, আর তাতে করে অন্য কোনো ভাষায় জয়েসের অনুবাদ সব সময়েই প্রশ্নবিদ্ধ একটি বিষয়। মার্সেল প্রুস্তের ফরাসি বাক্যগুলোর ছন্দ, দৈর্ঘ্য ও সৌন্দর্য একান্তই ফরাসি একটি ব্যাপার, আর সেইসঙ্গে তাতে যে নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কালপর্বের বিবরণ আছে তাঁর ফলে প্রুস্তের অনুবাদে কখনোই সেই সংহতির দেখা মেলে না যা মেলে তাঁর মূল ফরাসিতে। এগুলোর বিপরীতে, কাফকার লেখা কোনো নির্দিষ্ট জাতিসত্তা, কালপর্ব বা সংস্কৃতির সঙ্গে জোড় বাঁধা নয় – অতএব কাফকা অনুবাদেও কাফকাই থাকেন, আর তাঁর অনুবাদও তুলনামূলক সহজ একটি কাজ। তাঁর লেখার অদ্ভুত ও অপার্থিব যে শুদ্ধতা, কখনোই সেখানে উল্লেখ নেই কোনো জায়গার নামের বা সন-তারিখের, তাই কেউ যখন প্রথম কাফকা পাঠ করেন, তার মনে হবে এ লেখা তো অন্য কোনো ভাষায় আগে থেকেই চোলাই করা, অতএব আমার নিজের ভাষায় বা পৃথিবীর অন্য যেকোনো ভাষায়ই তা এক ও অপরিবর্তনীয়।[১৪]

সত্যি বললে, কাফকার প্রথম সাফল্যও কিন্তু ভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়েই এসেছিল, মূল জার্মানে আসেনি। প্রথমে ফ্রান্স, পরে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় অনূদিত কাফকাই পৃথিবীর কাছে, বৃহত্তর অর্থে, ছিল প্রথম কাফকা। কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর বছর কুড়ি পরে কাফকা জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় (দুটোর একটিও তাঁর নিজের দেশ নয়) অনেকটা আমদানি করা পণ্যের মতো পুনঃপ্রবেশ করেন।

আজ আমরা কাফকাকে যেরকম বিশ ও একবিংশ শতাব্দীর 'সভ্যতা'র অভিশাপের বয়ানকারী হিসেবে দেখি, তাঁকে প্রথম দিকে কিন্তু সেভাবে দেখা হতো না। কাফকার লেখার সামাজিক-রাজনৈতিক 'প্রাসঙ্গিকতা'র বিষয়টিও এরকম ছিল না, এখন তা যেমন। ম্যাক্স ব্রড কাফকাকে তুলে ধরেছিলেন ধর্মীয় গুরু বা সাধু-সন্তের চেহারা দিয়ে। তাঁর প্রধান দুটি উপন্যাসকেই (*বিচার* ও *দুর্গ*) পৃথিবীর কাছে পরিচিত করানো হয়েছিল 'কাবালার (সাধারণ অর্থে ইহুদিদের গোপন, গূঢ় ও ঐন্দ্রজালিক মরমি ধর্মবিশ্বাস) দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা নিজেকে যে দুটি আকারের মধ্যে প্রকাশিত করেন, অর্থাৎ, ন্যায়বিচার ও করুণা' – তারই রূপক লেখনী হিসেবে।[১৫] একই ঘটনা ঘটে ভিন্‌ভাষায় কাফকার ক্ষেত্রেও। তাঁর প্রথম ইংরেজি অনুবাদক উইলা ও এডুইন মুইর, ১৯৩০ সালে *দুর্গ* উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে কাফকাকে তুলে ধরেন আধুনিক কালের জন বুনিয়ান[১৬] রূপে। ওরকম একটা সময়ে যখন পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে ধর্ম নিয়ে শুরু হয়ে গেছে তুমুল সংশয়বাদ আর সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ধর্মের ভূমিকায় আসছে নানা মৌলিক পরিবর্তন, তখন কাফকার এই 'রূপকাশ্রয়ী ধর্মীয়' লেখনীর আবেদন সংগত কারণেই হয়ে দাঁড়ায় বিশাল-বিপুল। মোটামুটি কাফকা-মিথের এই শুরু – যেন ফ্রানৎস কাফকা একজন পূতপবিত্র, সাধু-সন্ত লেখক, যিনি ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে রূপকের মাধ্যমে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যেকার সম্পর্কের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন নির্মোহ এক নতুন ভঙ্গিমায়!

সেই ১৯৩০ সাল (পরে ক্রমবর্ধমান হারে চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেও) থেকেই কাফকা প্রভাবশালী সব সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক ও বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিদ্বজনের প্রিয় লেখক হয়ে উঠতে থাকেন, চতুর্দিকে বলা শুরু হয় যে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন।[১৭] সব দেশে, সব ভাষায় শুরু হয়ে যায় কাফকার অনুকরণ। ডব্লিউ. এইচ. অডেনের মতো বিখ্যাত মানুষ বলেন : 'যদি কোনো একজন লেখকের নাম করতে হয়, যিনি আমাদের কালের সঙ্গে অনেকটা সেই সম্পর্ক বহন করেন, যেমনটা দান্তে, শেক্‌সপিয়ার ও গ্যেয়টের ছিল তাদের কালের সঙ্গে, তাহলে সবার প্রথমে মাথায় আসবে কাফকার নাম।[১৮] একই কথা বলেছেন জর্জ স্টাইনারও। স্টাইনার বিশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক যাকে বলা হয় 'আজকের সাহিত্য জগতের অন্যতম প্রধান পুরুষ;'[১৯] তিনি বলেন : 'তাদের সময়ের জন্য যা ছিলেন দান্তে ও শেক্‌সপিয়ার, কাফকা আমাদের সময়ের জন্য তা-ই।' অডেন ও স্টাইনারের এই বহুল প্রচলিত বাক্যযুগলের ব্যাখ্যায় বলতে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ন্যাশনাল সোশ্যালিজম ও হলোকাস্টের অভিজ্ঞতায় জারিত কাফকা-পাঠকেরা তাঁর লেখার পরে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা থেকে তাকে আর আলাদা করে দেখতে পারেননি। আর সে জন্য কাফকার ১৯১৪ সালে লেখা *বিচার* উপন্যাসের জোসেফ কে.-র বিনা কারণে একদিন গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি তাঁর ১৯১২-তে লেখা 'রূপান্তর' গল্পে গ্রেগর সামসার এক সকালে পোকায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা ধারাবাহিকতায় কোনো রূপকথার গল্প হয়ে থাকেনি, তারা বরং এটিকে দেখেছিলেন হিটলারের নির্মমতার শিকার কোটি মানুষের ভাগ্যের দিব্যদর্শী এক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। কাফকার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক তাঁর নিজের সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে গণ্য হয়নি; কাফকা পাঠকেরা বরং এই সম্পর্ককে দেখেছিলেন পরবর্তীকালের এমন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে ভিশনারি এক সম্পর্ক হিসেবে মিলিয়ে যে-ঘটনাগুলোর তীব্রতা, ব্যাপ্তি ও নৃশংসতা অন্য সবকিছু ম্লান করে দিয়েছিল। এই নিয়তিবাদী ও প্রফেটিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, কাফকার নায়কেরা যে নেতিবাচক অস্তিত্বের মধ্যে তাদের জীবন কাটিয়েছে, তা-ই আধুনিক ইউরোপের পরবর্তীকালীন নেতিবাচকতার (ইউরোপিয়ান ইহুদিদের ও সামগ্রিক অর্থে ইউরোপীয় সংস্কৃতির নিয়তি ও অস্তিত্বের সংকট অর্থে) মুখ্য উদাহরণ হয়ে উঠেছিল। ঠিক এ কারণেই অডেন ও স্টাইনার দাবি করেছেন, কাফকার সঙ্গে আমাদের কাল বা যুগের ঠিক সেই প্রতীকী সম্পর্ক যেটা দান্তে, শেক্‌সপিয়ার ও গ্যেয়টের ছিল তাদেরটার সঙ্গে। ১৯৪৫ সালের দিকে আমরা সবাই ছিলাম জোসেফ কে. বা গ্রেগর সামসার মতো অস্পৃশ্য, নেড়ি-কুকুরসদৃশ মানুষ বা পোকা, 'এই সবচেয়ে অসুখী এক সময়ের' আতঙ্কজনক ও অ্যাবসার্ড অবিচারের সামনে ন্যাংটো, উন্মুক্ত।[২০]

বিশিষ্ট ফরাসি কবি ও নাট্যকার পল ক্লদেল অবশ্য কাফকাকে দেখেছিলেন তাঁর নিজের বিখ্যাত ক্যাথলিক ধর্মপ্রীতির দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি কাফকাকে মনে করতেন

খ্রিষ্টধর্মের ক্ষমা গ্রহণ না করার কারণে জ্বালার মধ্যে থাকা এক ইহুদি। সেই ক্লদেল বলেন : 'আমার কাছে শ্রেষ্ঠতম লেখকের নাম রাসিন; তাকে ছাড়া আর মাত্র একজনকেই আমি টুপি খুলে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি ফ্রানৎস কাফকা।'[২১]

নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক টোমাস মানও বলেন একই রকম কথা : 'যদি আপনি এ কথা মানেন যে হাসি, সিরিয়াস ধরনের কান্না মেশানো হাসি, আমাদের সবচেয়ে ভালোলাগার জিনিস, দুঃখকষ্টের মধ্যেও ওটাই এখনো আমাদের বিরাট গুণ হিসেবে টিকে আছে, তাহলে আপনারও, আমার মতোই, কাফকার ঐ দরদি আসক্তিগুলোকে মনে হবে বিশ্বসাহিত্যে পড়া যায় এমন সবচেয়ে দামি লেখাগুলোর মধ্যে অন্যতম।'[২২]

আরেক নোবেলজয়ী আঁদ্রে জিদ কাফকাকে নিয়ে এ ধরনের কোনো দাবিনামা পেশ করে বসেননি ঠিকই, তবে তিনি ১৯৪০ সালের ডায়েরিতে তাঁর ওপরে কাফকার *বিচার* উপন্যাসের প্রভাব বিষয়ে লেখেন; পরে উপন্যাসটিকে মঞ্চে নাট্যরূপ দেন।[২৩] আসলেই ১৯৫৫ সাল নাগাদ এটা সত্যি কথা হয়ে দাঁড়ায় যে, 'ফ্রান্সে এখন কাফকা সবচেয়ে পরিচিত এবং এ দেশের সঙ্গে সবচেয়ে আত্তীকৃত জার্মানভাষী লেখকদের একজন – এমনকি রিল্‌কের চেয়েও বেশি, আর নিট্‌শের সমপর্যায়ের। তিনি আমাদের কাছে আর অচেনা বা বহিরাগত কেউ নন; ফরাসিরা তাঁকে নিজেদের একজন বলেই ভাবে।'[২৪] পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে কাফকা বিষয়ে ঐ একই কথা বলা যেত সুইডেন কিংবা জাপানকে নিয়েও, আর যদি মনে হয় যে অন্য দেশগুলোতে কাফকা পিছিয়ে ছিলেন, তাহলে শুধু এটুকু জানলেই চলবে যে ১৯৬১ সালে কাফকার ওপর লেখা বইয়ের স্রেফ তালিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০০; সেই তালিকায় ছিল প্রতিটি মহাদেশের লেখকের উপস্থিতি। ষাটের দশকের শুরুর দিকে কাফকা শুধু আর পড়াই হতে লাগল না, সাহিত্যে রীতিমতো কাফকাপূজা শুরু হয়ে গেল।

কাফকাকে নিয়ে লেখা এসব বইয়ের বড় অংশেই তাঁর সাহিত্যকর্মের মান নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো লেখা নেই, যতটা আছে পৃথিবীর প্রতি তাঁর বার্তা কী তা নিয়ে, তাঁর বার্তার কতটুকু ধর্মীয়, কতটুকু আমলাতন্ত্র বিষয়ক, তার ব্যাখ্যা ইত্যাদি নিয়ে। এর পেছনে ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে – যেমন জীবদ্দশায় কাফকার অতি সামান্যসংখ্যক লেখা প্রকাশ করে যাওয়া, ১৯২৪ সালে মৃত্যুর পরে অল্পস্বল্প পরিচিতি শুরু হলেও ১৯৩৩ সাল নাগাদ নাৎসি বাহিনী জার্মানির ক্ষমতায় আসা, ১৯৩৯-এর মধ্যে কাফকার নিজের দেশ চেকোস্লোভাকিয়াও (একই অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অস্ট্রিয়াসহ) নাৎসি সেন্সরশিপের অধীনে চলে যাওয়া, এইসব। এ কারণেই কাফকা তখন ভালোভাবে কেবল বিদেশি ভাষায়, বিদেশের মাটিতেই পড়া সম্ভব ছিল। নতুন প্রজন্মের জার্মানদের কাফকার কথা শুনতে ও জানতে প্রায় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বিদেশি সাহিত্যবোদ্ধারা তখন কাফকার ব্যাখ্যা করছেন ইংরেজি বা ফরাসিতে কাফকা অনুবাদ পাঠ করে, আর ১৯৪৬ থেকে নিউ ইয়র্কে শোকেন বুকস্ (Schocken Books) মূল জার্মানে

কাফকার বইগুলোর প্রকাশনা শুরু করলেও তা জার্মানিতে পৌঁছাচ্ছে না। কাফকার বাণিজ্যিক সাফল্য দেখে বিদেশিরা তখন আরো ব্যস্ত আরো আরো ব্যাখ্যা হাজির করার কাজে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, কাফকা কী লিখে গেছেন সেই শব্দগুলো বা ভাষা বড় কথা নয়, কাফকা কী চিন্তা করে গেছেন তার অনুমানটাই বড়। এভাবেই কাফকা-মিথের জন্ম; জার্মানিতে কাফকার মহা খ্যাতির এভাবেই শুরু – বিদেশিদের হাতে, যারা কাফকার লেখনীর চেয়ে কাফকার চিন্তাভাবনা ও আইডিয়াগুলো নিয়ে ফ্যাশনেবল্ ও দার্শনিক কথাবার্তা বলতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন।[২৫]

এত দূর এসে কাফকার কাফকা হয়ে ওঠার পেছনের গল্পটুকু বলার লোভ সামলাতে পারছি না। এই গল্পের মধ্য দিয়ে প্রধান দশটি কাফকা মিথের অন্যতম 'নাৎসিরা কাফকা পুড়িয়ে ফেলেছিল' – এই মিথের ভেতরকার সত্যটুকুও বেরিয়ে আসবে। ইতিহাসটা সংক্ষেপে এ রকম : ১৯২৪ সালে কাফকার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রড বার্লিনের ছোট কিন্তু নতুন-কিছু-করার-ঝোঁকগ্রস্ত প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান ফেরলাগ ডি শ্‌মিডে (Verlag di Schmiede)-কে রাজি করালেন কাফকার *বিচার* (*The Trial*) উপন্যাসটি প্রকাশ করার জন্য। কাফকার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে ব্রড উপন্যাসটি খাড়া করান। এর পরেই তিনি, ১৯২৬ সালে, মিউনিখের নামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কুর্ট ভোলফের কাছে কাফকার প্রধান উপন্যাস *দুর্গ* (*The Castle*) সম্পাদনা করে তুলে দেন (এটিও অসমাপ্ত) এবং কাফকার প্রথম উপন্যাস *নিখোঁজ মানুষকে* (জার্মান নাম *Der Verschollene* যার ইংরেজি দাঁড়ায় 'The Man Who Disappeared')। এরই প্রথম অধ্যায় The Stoker এ বইতে বাংলা অনুবাদে ছাপা হলো) *আমেরিকা* নাম দিয়ে ১৯২৭-এ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি উইলা ও এডুইন মুইরের ইংরেজি অনুবাদে ১৯৩০-এ *দুর্গ* উপন্যাস ও ১৯৩৭-এ ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে একই সঙ্গে *বিচার* উপন্যাসটি বের হয় আলফ্রেড নফ্ (Alfred Knopf) প্রকাশনা থেকে। মূল জার্মান বা ইংরেজি অনুবাদ – কোনোটিরই বাণিজ্যিক সফলতা মেলেনি, যদিও সাহিত্যবোদ্ধাদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পড়ে।

এই বাণিজ্যিক ব্যর্থতায় বিচলিত না হয়ে ম্যাক্স ব্রড বরং আরো অনেক নামীদামি লেখককে একসঙ্গে জড়ো করেন কাফকার গল্প ও উপন্যাস সমগ্র প্রকাশের পক্ষে গণবিবৃতি দেওয়ার জন্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন মার্টিন বুবার, আঁদ্রে জিদ, হারমান হেসে, হাইনরিখ মান, টোমাস মান এবং ফ্রানৎস ভেরফেল। বিবৃতির মূল বক্তব্যটি লক্ষণীয়, যেখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে কাফকার আধ্যাত্মিকতার প্রতি (অর্থাৎ ফ্রানৎস কাফকার ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা তাঁর সাধু-সন্তের পবিত্রতার প্রতি – যেটি নিজেই একটি অন্যতম কাফকা মিথ): কাফকার লেখা 'অসামান্য মাপের আধ্যাত্মিক কাজ, বিশেষ করে এখন, এই বিশৃঙ্খলার সময়ে।' কাফকার আগের প্রকাশকেরা যেহেতু তত দিনে জার্মানির অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন, ম্যাক্স ব্রড এবার হাজির হলেন গুস্তাভ কিয়েপেন্‌হিউয়ের প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠানের কাছে। কিয়েপেন্‌হিউয়ের রাজি হলেন কিন্তু শর্ত দিলেন প্রথম খণ্ডটি বাণিজ্যিক সাফল্য

পেলেই কেবল অন্য খণ্ডগুলো বের হবে। কিন্তু ১৯৩৩ সালে হিটলারের নাৎসি বাহিনী ক্ষমতায় এলে কিয়েপেন্‌হিউয়ের পিছিয়ে গেলেন। ১৯৩৩ সালেই এল নতুন আইন: ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত জার্মান ইহুদিরা 'জার্মান' স্কুলে পড়াতে বা পড়তে পারবে না, 'জার্মান' সংবাদপত্র ও প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিজের কিছু বা অন্যের কোনো লেখা প্রকাশ করতে পারবে না, এবং 'জার্মান' শ্রোতাদের সামনে কিছু বলতে বা কোনোকিছুর প্রদর্শনী দেখাতে পারবে না। এই আদেশের কারণে ইহুদি মালিকানাধীন প্রকাশনা সংস্থাগুলো, যেমন এস. ফিশার ফেরলাগ, সব 'আর্যকৃত' হয়ে গেল, তারা ইহুদি লেখকদের বই প্রকাশনা বন্ধ করে দিল। কাফকার লেখা তখন সরকার নিষিদ্ধ করে দেবে বা নাৎসি জাতীয়তাবাদী ছাত্রেরা পুড়িয়ে ফেলবে, সেরকম বিখ্যাতও নয়, কিন্তু 'আর্য' পাবলিশারেরা ছাপাবে না ততটুকু 'ইহুদি' তো বটে।

অবাক ব্যাপার, নাৎসিদের এই আদেশ থেকে বিশেষ অব্যাহতি পেল শোকেন ফেরলাগ (Schocken Verlag বা Schocken Books; সারা পৃথিবীর কাফকা-অনুরাগীদের কাছে খুব পরিচিত একটি নাম; এর প্রতিষ্ঠাতা সালমান শোকেনও তাই), যদিও তা ইহুদি প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান। নাৎসিরা জানাল, শোকেন্ থেকে ইহুদি লেখকদের বই বেরোতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে, বইগুলো শুধু ইহুদিদের কাছেই বিক্রি করতে হবে। ম্যাক্স ব্রড শোকেন্‌কে বিশ্বব্যাপী কাফকা প্রকাশনার আইনি অধিকার দিয়ে দিলেন। প্রথমদিকে শোকেনের এডিটর-ইন-চিফ ল্যামবার্ট শ্নেইডার রাজি হলেন না। তিনি মনে করলেন, এ লেখাগুলোর জন-আবেদন (public appeal) নেই। ছয় ভলিউমে কাফকার উপন্যাস, গল্প, ডায়েরি, চিঠি ইত্যাদির প্রকাশে শোকেনের মালিক সালমান শোকেনও তখন গররাজি, যদিও তিনি এর সর্বজনীন সাহিত্যমূল্য ও নাৎসিদের জার্মান-ইহুদি সংস্কৃতি ধ্বংসের বিপরীতে এ লেখাগুলোর শক্তি সম্পর্কে ঠিকই অবগত ছিলেন। তাঁর এই দোনোমনার সময়ে তাঁরই এক এডিটর মরিৎস স্পিৎসার তাঁকে অনুরোধ জানালেন 'এগিয়ে যেতে', কারণ স্পিৎসার লেখাগুলোর মধ্যে দেখলেন 'মূলত এক ইহুদি' কণ্ঠ যা ইউরোপিয়ান ইহুদিদের দিকে ধেয়ে আসা নতুন অন্ধকার বাস্তবতার নতুন অর্থ দেবে আর মূল জার্মান সংস্কৃতিতে ইহুদিদের অবদানেও নতুন পালক যোগ করবে। এর পরই ১৯৩৪ সালে শোকেন থেকে বেরোল *আইনের দরজায়* (*Before The Law*; নামগল্পটি এই খণ্ডের বাংলা অনুবাদে আছে) নামে কাফকার ডায়েরি থেকে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও ছোটগল্পের সংকলন এবং পরের বছরেই কাফকার তিনটি উপন্যাস। শোকেন্ সংস্করণের কাফকাই ছিল বিশাল দেশটিতে ছড়িয়ে পড়া প্রথম কাফকা। মার্টিন বুবার এক চিঠিতে[২৬] ম্যাক্স ব্রডকে লিখলেন যে এই খণ্ডগুলো 'বিশাল সম্পদ', যাতে দেখা যায় 'কেউ কীভাবে ছোট এক কিনারার মধ্যেও নিজের সমস্ত সততা নিয়ে এবং নিজের পশ্চাৎপট (background) না হারিয়ে ঠিকই বেঁচে থাকতে পারে।'

স্বাভাবিকভাবেই, শোকেন্ প্রকাশনীর বিক্রি করা কাফকাসমগ্রের খণ্ডগুলো, অবশ্যই আইন ভেঙে, অনেক অ-ইহুদি হাতেও গিয়ে পড়ল। জার্মান পাঠকেরা – ইহুদি বা ইহুদি নয়, দেশে বা নির্বাসনে – ধীরে ধীরে একমাত্র এই শোকেন্ প্রকাশনীর মাধ্যমেই শতাব্দীর সেরা এই লেখকের লেখা পড়া শুরু করলেন।[২৭] গুরুত্বপূর্ণ জার্মান লেখক ক্লাউস মান (*মেফিস্টো* উপন্যাসের জনক; নোবেলজয়ী জার্মান ঔপন্যাসিক টোমাস মানের পুত্র) নির্বাসন থেকে লিখলেন : 'কাফকাসমগ্রের এই খণ্ডগুলো জার্মানি থেকে বের হওয়া সবচেয়ে মহৎ, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনা।' তিনি কাফকার লেখাকে সরাসরি বললেন : 'ইতিহাসের ঘটনাবহুল এই সময়ের সবচেয়ে শুদ্ধ, সবচেয়ে অসাধারণ সাহিত্যকর্ম।' ক্লাউস মানের এই লেখা থেকেই ঘটল বিপত্তি। ১৯৩৫ সালের ২২ জুলাই জার্মান সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে সালমান শোকেনের কাছে চিঠি এল যে তাঁর প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান থেকে 'এখনো ম্যাক্স ব্রডের সম্পাদনায় কাফকা সমগ্র বিক্রি করা হচ্ছে', যদিও কাফকার সাহিত্যকর্ম তিন মাস আগে থেকেই নাৎসি বাহিনী 'ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত লেখনীর তালিকায়' যোগ করেছে। বিপদ বুঝতে পেরে সালমান শোকেন্ তাঁদের প্রতিষ্ঠান সরিয়ে আনলেন পরের চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে, কাফকার জন্মশহরে। প্রাগ থেকেই বের হলো কাফকাসমগ্রের ডায়েরি ও চিঠির খণ্ডগুলো। অবাক ব্যাপার, এর পরও একেবারে ১৯৩৯ সালে সরকার শোকেন্ প্রকাশনী বন্ধ করে দেওয়া পর্যন্ত, তারা ঠিকই কাফকাসমগ্রের আগের খণ্ডগুলোর পুনর্মুদ্রণ ও জার্মানি জুড়ে বিতরণ চালিয়ে যেতে পেরেছিল বড় কোনো বাধা ছাড়াই। ঐ বছরই প্রাগ হিটলারের বাহিনীর হাতে অধিকৃত হলো, ইউরোপে বন্ধ হয়ে গেল শোকেনের কার্যক্রম। নাৎসিদের হাতে কাফকার বহ্নুৎসব বা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার এই হচ্ছে আসল ইতিহাস।

এরপর ১৯৩৯ সালেই প্যালেস্টাইনে শোকেন্ বুকসের প্রতিষ্ঠা, সেখান থেকে হিব্রু ভাষায় কাফকার প্রকাশ, পরে ১৯৪৫ সালে নিউ ইয়র্কে শোকেন্ বুকসের বাণিজ্যিক সূচনা। সালমান শোকেন্ এখানে তাঁর চিফ এডিটর করলেন বিখ্যাত জার্মান-আমেরিকান রাজনৈতিক তাত্ত্বিক হান্নাহ আরেন্টকে, একই পদে সঙ্গে রাখলেন প্রখ্যাত ইহুদি ধর্মতাত্ত্বিক ও সাহিত্যবোদ্ধা-সম্পাদক নাহুম গ্লাৎসারকে (বাজারে সহজলভ্য *The Complete Stories of Franz Kafka*-র সম্পাদক এই নাহুম গ্লাৎসার)। নিউ ইয়র্কের শোকেন্ বুকস্ কাফকাকে মূল জার্মানে প্রকাশ অব্যাহত রাখল, আর ১৯৪৬ সালে মুইরের ইংরেজি অনুবাদে কাফকার উপন্যাসগুলো পুনঃপ্রকাশ করল নিউ ইয়র্ক থেকে। আমেরিকায় কাফকার শুরুটা অবশ্য ভালো হলো না। *দি নিউ ইয়র্কার*-এর মতো সাপ্তাহিক পত্রিকায় এডমান্ড উইলসনের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি ও সাহিত্যসমালোচক কাফকাকে খুব বড় মাপের কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানালেন (যদিও তাঁকে তুলনা করলেন নিকোলাই গোগোল ও এডগার অ্যালান পো'র সঙ্গে)। তা সত্ত্বেও আমেরিকায় শুরু হয়ে গেলা কাফকা-উন্মাদনার; পৃথিবীর নানা ভাষায় একযোগে বের হতে শুরু হলো কাফকা – নানা ভাষায়; আর ১৯৫১ সালে ফ্রাংকফুর্টের জার্মান-ইহুদি প্রকাশনা সংস্থা এস. ফিশার জার্মানিতে কাফকা প্রকাশনা ও বিতরণের স্বত্ব

পেয়ে গেল। কাফকার মহাখ্যাতির শুরু হয়ে গেল জার্মানিতে। আমরাও এখন ফিরে যেতে পারি কয়েক পাতা আগে – এ গল্পের যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানে। শুধু সালমান শোকেনকে ১৯৪৬-এর ৯ আগস্টে লেখা হান্নাহ্ আরেন্টের একটি চিঠির কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি লিখলেন যে, কাফকার অবস্থা হয়েছে কার্ল মার্ক্সের মতো : 'জীবদ্দশায় কাফকার মোটামুটি সচ্ছলতাও ছিল না [স্বচ্ছল বাবা-মায়ের সন্তান, ভালো চাকরি করা এই লেখক জীবনের একেবারে শেষ দিকে এসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির কারণে রীতিমতো দারিদ্র্যের মুখে পড়েছিলেন], আর এখন তিনিই কিনা প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে বোদ্ধা ও মনীষীদের ভালো চাকরি দিয়ে, ভালোভাবে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেন নিশ্চিত।'

আমরা এখন বিশ্বসাহিত্যে ফ্রানৎস কাফকার প্রভাব নিয়ে কিছু কথা বলব। ১৯০১ থেকে শুরু করে ২০১২ পর্যন্ত সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া ১০৯ জন লেখকের মধ্যে ৩২ জনই তাঁদের লেখায় কাফকার সরাসরি প্রভাব আছে বলে স্বীকার করেছেন।[২৮] এই একটি তথ্য থেকেই কিছুটা বোঝা যায় আধুনিক সাহিত্যে ফ্রানৎস কাফকার প্রভাবের বিষয়টি। তবে বিশ্বসাহিত্যে নোবেল পুরস্কারই গুরুত্ব ও মানের প্রধান মানদণ্ড নয় বলে এবং নোবেল পুরস্কার না-পাওয়া অনেক লেখকই নোবেল পাওয়া লেখকদের চেয়েও বড় বলে, কাফকা প্রভাবিত মূল কিছু লেখকের নাম এখানে দেওয়া গেল কোনো রকম বয়স, কাল, দেশ বা খ্যাতির ক্রম না মেনে (এর মধ্যে নোবেল বিজয়ীদের নামের পাশে * চিহ্ন দেওয়া হলো): হোর্হে লুইস বোরহেস, আলব্যের কাম্যু*, ইউজিন আয়েনেস্কো*, জাঁ পল সার্ত্রে*, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস*, হোসে সারামাগো, জর্জ অরওয়েল, রে ব্রাডবুরি, জে ডি স্যালিঙ্গার, আইজাক বাশেভিস সিঙ্গার*, স্যামুয়েল বেকেট*, অঁরি মিশো, এলিয়াস কানেত্তি*, গ্রাহাম গ্রিন, টমাস পিন্‌চন, ডন ডেলিল্লো, জন আপডাইক, সুসান সন্‌টাগ, টোমাস মান*, হারমান হেসে*, আন্দ্রে জিদ*, টি এস এলিয়ট*, উইলিয়াম ফকনার*, এস ওয়াই আগনন্*, হাইনরিশ বোল*, ডোনাল্ড বার্থেলমে, সালমান রুশদি, রিসজার্ড কাপুসিন্‌স্কি, ভ্লাদিমির নবোকভ, মিলোরাড পাভিচ, দানিলো কিস, দিনো বুজ্জাতি, হুলিও কোর্তাসার, আর্নেস্তো সাবাতো, ইসমাইল কাদারে, কামিলো হোসে সেলা*, বানার্ড ম্যালামুড, নরমান মেইলার, ফিলিপ রথ, উইলিয়াম স্টাইরন, মারিও বার্গাস য়োসা*, কাজুও ইশিগুরো, হারুকি মুরাকামি, কোবো আবে, সল বেলো*, উইলিয়াম গোল্ডিং*, গুন্টার গ্রাস*, জে.এম. কুৎসিয়া*, মো ইয়ান*, ইতালো কালভিনো, আর্থার মিলার, মিলান কুন্ডেরা, সিস্ নুটেবুম, ডব্লিউ জি. সেবাল্ড – বিশ্বসাহিত্যের একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।[২৯]

কাফকার এই প্রভাব মূলত তাঁর ভিশন, দৃষ্টিকোণ ও থিম-কেন্দ্রিক প্রভাব। কাফকার এনিগ্‌মা (বা ধাঁধা) অনুকরণ করা খুবই কঠিন, তাই লেখার ভাষা, শব্দচয়ন, বাক্যগঠনে কাফকাকে আনা প্রায় অসম্ভব; যেটা সম্ভব তা হচ্ছে কাফকার থিমকে মাথায় রেখে পরিপার্শ্ব

সমাজ ও ব্রহ্মাণ্ডকে দেখা – মূলত সেটাই ঘটেছে অধিকাংশ কাফকা-প্রভাবিত লেখকের বেলায়।[৩০] কাফকা স্কলার নিল্ পেজেস বলেন, 'কাফকার প্রভাব সাহিত্যকে ও সাহিত্য-বিষয়ক পড়াশোনাকে ছাড়িয়ে গেছে; চলচ্চিত্র বা অন্যান্য ভিজুয়াল আর্ট, সংগীত ও জনসংস্কৃতির অন্য মাধ্যমগুলোতেও তা দেখা যাচ্ছে।[৩১] জার্মান ও ইহুদি সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক হ্যারি স্টাইনহাউয়ার বলেন, 'সাহিত্যের জগতে কাফকার অভিঘাত বিশ শতকের অন্য যেকোনো লেখকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।'[৩২] আর ম্যাক্স ব্রড তো বলেই গেছেন: 'একদিন বিংশ শতাব্দীকেই ডাকা হবে কাফকা শতাব্দী নামে।'[৩৩]

কেন কাফকার এই বিশাল প্রভাব? কী আছে তাঁর লেখায়? এ প্রশ্নের সবচেয়ে সহজ উত্তর বোধ হয় যেকোনো প্রামাণ্য ইংরেজি অভিধানে কাফকায়েস্ক (Kafkaesque) শব্দটির অর্থ দেখে নিলেই অনুমান করা যায়: ১. অর্থহীন, বিভ্রান্তকর, প্রায়শই ভীতিকর ও বিপজ্জনক জটিলতা; উদাহরণ, 'কাফকায়েস্ক আমলাতন্ত্র'; ২. পরাবাস্তব বিকৃতিতে ভরা এবং প্রায়শই আগাম বিপদ ও নৈরাজ্যের বোধ-জাগানো অনুভূতি; উদাহরণ, 'কাফকায়েস্ক বিচারব্যবস্থা'; ৩. দুঃস্বপ্নপীড়িত রকমের জটিল, উদ্ভট ও বিচিত্র, অথবা অযৌক্তিক কিছু; উদাহরণ 'রাষ্ট্রক্ষমতার কাফকায়েস্ক অলিগলি'; ৪. চেক সাহিত্যিক ফ্রানৎস কাফকার লেখা অত্যাচার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের এবং দুঃস্বপ্নের লক্ষণাক্রান্ত কাল্পনিক জগৎ।

চারটি খ্যাতনামা ইংরেজি অভিধান থেকে নেওয়া এ চারটি সংজ্ঞা থেকেই বোঝা সম্ভব, যা-কিছু এখানে বলা হয়েছে তার সবই আমাদের গত শতাব্দী ও চলমান শতাব্দীর মূল লক্ষণ। বাস্তবের পৃথিবী ঠিক এ রকমই: অন্ধকার, জটিল, নিরাশাজনক, অন্যায়-অবিচার-নিপীড়নে ভরা, গোলকধাঁধা সমতুল্য, বিভ্রান্তকর, দুঃস্বপ্নময়, যন্ত্রণাপীড়িত, পাপবোধ, অপমান, অবমাননা ও মানুষে মানুষে দূরত্বে পূর্ণ। আধুনিক মনের মানচিত্রই এ রকম – কাফকায়েস্ক ধাঁধায় ভরা, যেখানে পরিস্থিতিগুলো থেকে বাঁচার বা পালানোর পরিষ্কার কোনো পথ কখনোই নেই। রাষ্ট্রীয় বা জাতিগত পর্যায়ের ঘটনাগুলোও তাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সব ঘটনা থেকেই এটা পরিষ্কার যে, মানুষ ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাই নেয়নি। ১৯৪৫-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, কতগুলো গণহত্যা হয়েছে, কত কত মানুষ বিনা বিচারে কারাগারে পচে মরেছে, কতবার কত কত মানবসন্তান প্রতিষ্ঠানগুলোর আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে, চাকরি হারানোর বা পথে বসে যাওয়ার ভয়ে কেঁপে উঠেছে – তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এ কারণেই কাফকা পরবর্তী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে কাফকার এত সর্বব্যাপী প্রভাব। আপাতচোখে খোদাহীন, নিষ্ঠুর, বিচ্ছিন্নতার বোধ ও হয়রানির এই আধুনিক বিশ্বে তাঁর প্রভাব এড়িয়ে লেখাটাই প্রায় অসম্ভব। এ শতাব্দীটিই যখন কাফকা-শতাব্দী, তখন কাফকার প্রভাব এড়িয়ে কেউ লিখবেন কীভাবে?

আমরা যত সহজে কাফকার লেখার বৈশিষ্ট্যগুলো ওপরে তুলে ধরলাম, কত সুখেরই না হতো কাফকার লেখা থেকে সেগুলো যদি সরাসরি বোঝা যেত। তিনি 'কী বোঝাতে চাইছেন' তা কখনোই স্পষ্ট করে বলেননি, কিন্তু একই সঙ্গে যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে তা বলেছেন তার চেয়ে স্পষ্ট করে বলা কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভবই নয়। তাঁর লেখার স্পষ্টতা কিন্তু একসঙ্গে থিমের আপাতদুর্বোধ্যতা, এ দুয়ে মিলে যে 'আচ্ছন্নতা'র বোধ জাগে তার ফলে দুটো ঘটনা ঘটেছে: ১. সারা পৃথিবী জুড়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য কাফকা-ভক্ত; ২. কাফকার লেখার ব্যাখ্যা হয়েছে যতভাবে সম্ভব ততভাবে। সাহিত্যে জন্ম হয়েছে 'দি কাফকা প্রবলেম' নামের শব্দবন্ধ ও বিতর্ক। আর তা আজও চলছেই।

'ভূমিকার আগে' অংশটি – যার উদ্দেশ্য ছিল কাফকার বিষয়ে যারা তেমন কিছুই জানেন না, তাঁদের একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়া – এখানেই শেষ করছি এখনকার বিশ্বসাহিত্যের জীবিত লেখকদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সবচেয়ে খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক ও গল্পকার, লাতিন আমেরিকার কলম্বিয়ার নোবেল বিজয়ী গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের একটি সাক্ষাৎকারের সামান্য অংশ তুলে দিয়ে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন পিটার এইচ. স্টোন; প্রকাশিত হয়েছিল *দি প্যারিস রিভিউ* পত্রিকার ৮২তম সংখ্যায়, ১৯৮১ সালে:

প্রশ্নকর্তা: আপনার লেখালেখির কীভাবে শুরু?

গার্সিয়া মার্কেস: আমি যখন কলেজে ভর্তি হই, সাহিত্যের সাধারণ পড়াশোনা আমার ভালোরকমই ছিল, আমার বন্ধুদের চেয়ে গড়পরতা অনেক বেশি। বোগোতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে আমার নতুন নতুন বন্ধু তৈরি হতে থাকে, যারা আমাকে সমকালীন লেখকদের সঙ্গে পরিচিত করানো শুরু করে। এক রাতে এক বন্ধু আমাকে ফ্রানৎস কাফকার ছোটগল্পের একটি বই ধার দেয়। আমি যে মেসে থাকতাম, সেখানে যাই, আর সে রাতেই কাফকার 'রূপান্তর' গল্পটি পড়া শুরু করি। প্রথম লাইনটা পড়ামাত্র আমার প্রায় বিছানা থেকে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। কী যে অবাক হই আমি। প্রথম লাইনটা ছিল: 'এক ভোরে গ্রেগর সামসা অসুখী সব স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখে সে তার বিছানায় প্রকাণ্ড এক পোকায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে আছে...।' আমি লাইনটা নিজেকে নিজে পড়ে শোনাতে লাগলাম, ভাবলাম, এভাবে যে কেউ লিখতে পারে তা-ই তো আমার জানা ছিল না; যদি জানতাম, তাহলে আমি নিশ্চয় আরো কত আগেই লেখালেখি শুরু করতাম। তারপরই, দেরি না করেই, আমি ছোটগল্প লেখা শুরু করলাম। ...ওই-ই শুরু।

টীকা

১. পিটার-আন্দ্রে অল্টের বিশালায়তন কাফকা জীবনী *Der ewige sohn* (*ডার এভিগে জোহন; অনন্ত পুত্র*) বের হয়েছে ২০০৫ সালে; এখনো ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি। কাফকার জীবন ও তাঁকে ঘিরে থাকা নানা মিথের ওপরে নতুন আলো ফেলা, জার্মান পুরস্কার পাওয়া এই বইতে অল্ট পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন যে কাফকার কোনো সন্তান হওয়ার ব্যাপারটি একেবারেই অসম্ভব। গ্রেটে ব্লখ পরিষ্কার জানতেন, কাফকার সঙ্গে একা দেখা করার

'নিষ্কলুষ' আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার পরিণতি কী হবে, তাই তিনি কখনোই ওভাবে কাফকার সঙ্গে দেখা করেননি

২. রাইনার স্টাখের কাফকা জীবনীগ্রন্থ *Kafka – The Decisive Years* (২০০২) যা ইংরেজি ভাষায় এ-মুহূর্তে কাফকার প্রধান জীবনীগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত, সেখানে স্টাখ পরিষ্কার জানাচ্ছেন, কাফকা কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি

৩. কাফকার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত *বিচার* (*The Trial*) উপন্যাসের এপিলোগ অংশে ম্যাক্স ব্রড জানাচ্ছেন: 'ফ্রানৎস কাফকার কাগজপত্রের মধ্যে কখনোই কোনো ইচ্ছাপত্র (উইল) খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর লেখার টেবিলে, একগাদা কাগজের নিচে, পাওয়া গেল কালিতে লেখা আমার উদ্দেশে একটা নোট। এতে লেখা:

প্রিয়তম ম্যাক্স, আমার শেষ অনুরোধ: যা কিছু আমি রেখে যাচ্ছি (অর্থাৎ আমার বইয়ের তাকগুলোতে, দেরাজগুলোয়, লেখার টেবিলে, বাসায় ও অফিসে, কিংবা যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই, যা-কিছু তুমি খুঁজে পাও তার সবই), তা নোট বই আকারেই হোক, কিংবা পাণ্ডুলিপি, আমার লেখা চিঠি, অন্যের আমাকে লেখা চিঠি, ছোটখাটো কোনো খসড়া লেখা ইত্যাদি ইত্যাদি যা-ই হোক, সবকিছু তুমি পুড়িয়ে ফেলবে, একদম শেষ পাতা পর্যন্ত, এমনকি তোমার কাছে আমার যে লেখা বা নোটগুলো আছে, কিংবা অন্যদের কাছে (আমার নাম করে তুমি অন্যদের থেকে ওগুলো অনুনয় করে চেয়ে নেবে), যা যা আছে – সব। যেসব চিঠি তোমাকে দেওয়া হয়নি সেগুলো যাদের কাছে আছে তারা যেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে সব পুড়িয়ে ফেলে।

তোমারই, ফ্রানৎস কাফকা

আরো ভালোভাবে খুঁজে আমি একটা হলুদ হয়ে যাওয়া, হালকা ও নিঃসন্দেহে অনেক বেশি পুরোনো কাগজের টুকরো পেলাম, যাতে পেনসিল দিয়ে লেখা:

প্রিয় ম্যাক্স, মনে হয় না এবার আর আমি টিকব। মাস খানেকের ফুসফুসসংক্রান্ত জ্বরের পরে নিউমোনিয়া মনে হচ্ছে যথেষ্ট...।

যদি কিছু ঘটেই যায়, তাই, আমার সমস্ত লেখা বিষয়ে এই আমার শেষ ইচ্ছাপত্র: যা কিছু আমি লিখেছি তার মধ্যে শুধু এই কটি বই-ই গোনায় ধরা যেতে পারে: *রায়*, *দি স্টোকার*, *রূপান্তর*, *দণ্ড উপনিবেশে*, *গ্রাম্য ডাক্তার* এবং ছোটগল্প 'অনশন-শিল্পী'। (*ধেয়ান* বইটির যে কটা কপি এখনো পাওয়া যায়, তারা থাকুক; সেগুলো মন্ড বানানোর ঝামেলা আমি কাউকে দিতে চাচ্ছি না, কিন্তু কোনোভাবেই বইটির পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না)। আমি যখন বলি যে এই পাঁচটি বই এবং ছোটগল্পটি গোনায় ধরা যায়, তার মানে আমি এটা বলছি না যে ওরা আবার ছাপা হোক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমি ওদের দিয়ে যাচ্ছি; বরং উল্টোটাই, ওরা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাক, সেটাই আমার চাওয়া। শুধু যেহেতু ওগুলো কারো না কারো কাছে আছে, তাই আমি বাধা দিচ্ছি না কেউ যদি ওদের রাখতে চায় তাতে।

কিন্তু এর বাদে আর যা যা-কিছু আমি লিখেছি (ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজে ছাপা হয়ে থাকুক আর পাণ্ডুলিপি কিংবা চিঠি হিসেবেই লেখা হোক), সবকিছু, কোনো ব্যতিক্রম

ছাড়া, যদি হাতের নাগালে পাওয়া যায় তো, কিংবা যাদের উদ্দেশে লিখেছি তাদের কাছ থেকে মিনতি জানিয়ে দখল করা যায় তো (এদের অধিকাংশকেই তুমি চেনো, আসল যে কজন তারা হচ্ছে... আর কোনোমতেই কিন্তু নোট বইগুলোর কথা ভুলো না...) – এই কোনো রকম বাছবিচার না-করে এবং ভালো হয় না পড়েই এই সব (যদিও আমি কিছু মনে করব না তুমি যদি লেখাগুলোতে চোখ বোলাও, কিন্তু চাইছি যে, তুমি সেটা করবে না; তবে যা-ই হোক তুমি বাদে অন্য কেউ যেন ওগুলোতে চোখ দিতে না পারে) – এই সব, কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই, পুড়িয়ে ফেলতে হবে, আর তোমার কাছে আমার মিনতি যে কাজটা তুমি করবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

– ফ্রানৎস'

৪. দ্রষ্টব্য James Hawes, *Excavating Kafka* (২০০৮) বইটি

৫. দ্রষ্টব্য Roberto Calasso, *K.* (২০০৫) বইটি

৬. দ্রষ্টব্য Steve Coots, *Franz Kafka – Beginner's Guide* (২০০২) বইটি

৭. দ্রষ্টব্য James Hawes, *Excavatings Kafka* (২০০৮) বইটি

৮. ঐ

৯. *The Observer* (London), ১৭ মে, ১৯৯৮

১০. দ্রষ্টব্য Micheal Hofmann, *Franz Kafka – Metamorphosis and Other Stories* (২০০৭)-এর ভূমিকা অংশ

১১. ওয়াল্‌টার বেনজামিনের গেরশম শোলেমকে লেখা চিঠি, তারিখ: ১২ জুন, ১৯৩৮। সূত্র: Mark Anderson সম্পাদিত *Reading Kafka – Prague, Politics & Fin de Siècle* (১৯৮৯) বইটি

১২. ভেইনিঙ্গারের (Otto Weininger) এই খ্যাতির পেছনে ছিল ১৯০৩ সালে তাঁর বহুল প্রচারিত আত্মহত্যার ঘটনা। ২৩ বছর বয়সে তিনি ইহুদি ধর্ম থেকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এর পরপরই আত্মহত্যা করেন। একই বছর তাঁর *Sex and Character* বইয়ের সাড়া জাগানো প্রকাশ ঘটে এবং পরের আট বছরে এর বারোটি সংস্করণ বের হয়। স্বয়ং স্ট্রিন্ডবার্গ ও ভিট্‌গেনস্টাইন এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৩০ সালে থিওডর লেসিং ভেইনিঙ্গারকে 'ইহুদি আত্মঘৃণা'র প্রধান উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। কাফকার সময়কে ও মানসকে বুঝতে হলে এই তথ্যগুলো খুব জরুরি। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন Reiner Stach-এর (ইংরেজি ভাষায় লভ্য কাফকার প্রধান জীবনীগ্রন্থ *Kafka – The Decisive Years*, ২০০২-এর লেখক) প্রবন্ধ 'Kafka's Egoless Women: Otto Weininger's *Sex and Character*'। প্রবন্ধটি Mark Anderson সম্পাদিত *Reading Kafka – Prague, Politics & Fin de Siecle* (১৯৮৯) বইতে পাওয়া যাবে

১৩. Mark Anderson-এর আগে উল্লিখিত বইয়ের ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য

১৪. ঐ

১৫. কাফকার *দুর্গ* (*The Castle*) উপন্যাসের প্রথম জার্মান সংস্করণের (১৯২৬) এপিলোগ অংশে ম্যাক্স ব্রড।

১৬. জন বুনিয়ান (১৬২৮-১৬৮৮) খ্যাত তাঁর খ্রিষ্টীয় রূপককাহিনি *The Pilgrim's Progress* (১৬৭৮) এর জন্য। বুনিয়ান ছিলেন ইংরেজ এবং খ্রিষ্টীয় লেখক ও ধর্মপ্রচারক

১৭. Ronald Gray, *Franz Kafka* (১৯৭৩) বইয়ের 'Kafka the Writer' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

১৮. Flores ও Swander সম্পাদিত *Franz Kafka Today* বইয়ের পৃষ্ঠাঃ ১ দ্রষ্টব্য

১৯. সূত্রঃ উইকিপিডিয়া, George Steiner আর্টিকেল

২০. কাফকার ঐতিহাসিক পাঠ বিষয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন গুন্টার অ্যান্ডার্সের *Kafka Pro and Contra* (ইংরেজি অনুবাদঃ ১৯৬০) বইটি। অ্যান্ডার্স বইটি লেখা শুরু করেন বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্যারিসে নির্বাসনে থাকা অবস্থায় এবং যুদ্ধের পরপরই এটি বই আকারে প্রকাশ করেন

২১. পল ক্লদেল, *Le Figaro Litteraire*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৪৭। পল ক্লদেল (১৮৬৮-১৯৫৫) শীর্ষস্থানীয় ফরাসি কবিদের একজন। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অগাধ ভক্তি ইংরেজি ভাষার কবি টি. এস. এলিয়টের শেষ দিককার বিশ্বাসের সমান্তরাল বলে ধরা হয়। ব্রিটিশ কবি ডব্লিউ. এইচ. অডেনের বিখ্যাত কবিতা 'In Memory of W. B. Yeats'-এ পল ক্লদেল এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ আছেঃ

> Time that with this strange excuse
> Pardoned Kipling and his views,
> And will pardon Paul Claudel,
> Pardons him for writing well.

ঝাঁ রাসিন (Jean Racine, ১৬৩৯-১৬৯৯), মলিয়ের ও পিয়ের করনেইয়ের পাশাপাশি সতেরো শতকের তিন মহান ফরাসি নাট্যকারের একজন ও পশ্চিমা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ

২২. ক্লাউস ভাগেন্‌বাখের (Klaus Wagenbach) *Franz Kafka*, ১৯৬৪ বইয়ে টোমাস মানের উদ্ধৃতি (পৃ. ১৪৪)। টোমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫) ১৯২৯ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী জার্মান ঔপন্যাসিক ও গদ্যশিল্পী। বিখ্যাত *বাডেন্‌ব্রুকস্‌* ও *দি ম্যাজিক মাউন্টেন* উপন্যাসের জনক

২৩. সূত্রঃ Ronald Gray, *Franz Kafka* (১৯৭৩)-এ উল্লেখিত Maja Goth-এর Franz Kafka et les lettres francaises, *1928-1955* (প্যারিস, ১৯৫৬) গ্রন্থের পৃ. ৪৩

২৪. ঐ; পৃ. ২৫৩

২৫. হাইনজ্‌ পোলিৎসার, *Problematik und Probleme der Kafka - Forschung* (১৯৫০), পৃ. ২৭৩-৮০ [Issues and Problems of the Kafka-Research]

২৬. দ্রষ্টব্য *Letters of Martin Buber* (১৯৯১; শোকেন্‌ বুকস্‌, নিউ ইয়র্ক; পৃ. ৪৩১)

২৭. স্যার ম্যালকম প্যাস্‌লির তত্ত্বাবধানে, ১৯৯৮ সালে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে করা ব্রেয়ন মিচেলের নতুন ইংরেজি অনুবাদে কাফকার *বিচার* উপন্যাসের 'প্রকাশকের ব্যাখ্যা' অংশে আর্থার স্যামুয়েলসন (এডিটরিয়াল ডিরেক্টর, শোকেন্‌ বুকস্‌, নিউ ইয়র্ক)

২৮. সূত্রঃ 'Solving A Literary Mystery', Kafka Project, San Diego State University, ২০১২

২৯. সূত্রঃ ঐ। তালিকাটি বিচিত্র, নানা দেশের নানা লেখক আছেন এতে; কিন্তু একটু মন দিয়ে নামগুলো পড়লেই বোঝা যায়, কত গভীর এই তালিকা, বিশ্বসাহিত্যের কত যথার্থ

প্রতিনিধিত্বকারী। এ লেখকদের অধিকাংশই নানা সময়ে, নানা লেখা ও সাক্ষাৎকারে তাঁদের ওপর ফ্রানৎস কাফকার প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। যাঁরা নিজেরা তা করেননি, সেসব ক্ষেত্রে সাহিত্যবোদ্ধারা তাঁদের লেখায় কাফকার প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন

৩০. শিমন স্যান্ডব্যাংক, *After Kafka: The Influence of Kafka's Fiction* (১৯৯২)

৩১. র‍্যাচেল কোকার, 'Kafka Expert links teaching, research'। State University of New York, ৩০ আগস্ট, ২০১২

৩২. হ্যারি স্টাইনহাউয়ার, 'Franz Kafka: A World Built on Lie', The Antioch Review (১৯৮৩)

৩৩. ঐ

ভূমিকা

প্রস্তাবনা

ফ্রানৎস কাফকার লেখায় সব বিচিত্র ও উদ্ভট ঘটনা ঘটে এমনভাবে, যেন ওগুলোতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। যেমন: গ্রেগর সামসা নামের এক সেলস্‌ম্যান এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে, সে একটা তেলাপোকায় পরিণত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু বেচারা তখনো ভাবছে অফিসে যাওয়ার ট্রেনটা যেন আবার মিস না হয়ে যায় (গল্প 'রূপান্তর'); জোসেফ কে. নামের এক নিরপরাধ ব্যাংকারকে একদিন সকালে অজানা এক অপরাধের দায়ে দুজন সরকারি এজেন্ট আকস্মিক গ্রেপ্তার করে বসে। কে.র প্রতিবেশী মহিলার ঘরে তার একটা ছোটখাটো বিচার হয়ে যায়। তাকে কেউ গ্রেপ্তার করে কোথাও নিয়ে যায় না, শুধু 'মুক্ত'ভাবে ঘোরাফেরা করার অনুমতি আর পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয় তাকে (উপন্যাস *বিচার*); কে. নামের এক ভূমিজরিপকারী ভদ্রলোক সারা জীবন ধরে ব্যর্থ চেষ্টা করে যায় গ্রামের শাসকদের দুর্গ বলে পরিচিত রহস্যময় এক দুর্গের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করার আর তার এই গ্রামে অবস্থানের আইনগত স্বীকৃতি ও অনুমতি পাওয়ার (উপন্যাস *দুর্গ*); এক অদ্ভুতদর্শন মেশিন আক্ষরিক অর্থেই দণ্ডিত আসামিদের গায়ে শত শত সুই দিয়ে নকশা করে লিখে দেয় তাদের অপরাধের কথা, ওভাবেই নির্মম মৃত্যু হয় আসামিদের (গল্প 'দণ্ড উপনিবেশে'); এক লোক সারা জীবন আইনের দরজার বাইরে অপেক্ষা করে থাকে ভেতরে ঢোকার জন্য, তারপর যখন সে মারা যাচ্ছে, তাকে বলা হয়, এই দরজাটা শুধু তার জন্যই বানানো হয়েছিল (গল্প, 'আইনের দরজায়'); এক ব্যবসায়ী ছেলে বিয়ে করে স্বাধীনভাবে সংসার করতে চায় আর এতে খেপে গিয়ে তার বৃদ্ধ বাবা, জীর্ণ নোংরা আন্ডারওয়ার পরা এক ক্ষমতা-উন্মাদ বুড়ো, ছেলেকে পানিতে ডুবে মরার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বসেন (গল্প 'রায়'); এক বৃদ্ধ গ্রাম্য ডাক্তার গভীর রাতে আজব এক ঘোড়াগাড়িতে চড়ে, তার নিজের বাসার কাজের মেয়েটাকে ধর্ষণোদ্যত এক লোকের হাতে ফেলে রেখে রোগী দেখতে যান দূরের গাঁয়ে, রোগীর শরীরে জ্বলজ্বল করছে ফুলের মতো একটা ক্ষত, আর সেখানে কিলবিল করছে পোকা, আর গ্রামবাসীরা ডাক্তারের রোগ সারানোর ব্যর্থতার শাস্তি হিসেবে এই অসহায় ডাক্তারকে শুইয়ে দেয় বিছানায়, রোগীর পাশে (গল্প 'এক গ্রাম্য ডাক্তার'); সম্রাটের বার্তা নিয়ে এক বাহক কোনো দিনই পৌঁছাতে পারে না তার গন্তব্যে, পথে শুধু বাধা আর বাধা, আক্ষরিক অর্থে গোলকধাঁধার মতো (গল্প 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা'); এক লোকের পেশাই

হচ্ছে না খেয়ে থাকা, ক্ষুধা-শিল্পী সে, একদিন ওভাবে উপোস করেই সে মারা যায়, আর মরার আগে বলে যায়, তার খাওয়ার মতো কোনো খাবার এই পৃথিবীতে নেই বলেই অনশনই ছিল তার শিল্প (গল্প, 'এক অনশন-শিল্পী'); এক কিশোর ছেলে, কার্ল রসমান, বাসার কাজের মেয়ের গর্ভে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিলে তার বাবা-মা তাকে অভিবাসীদের জাহাজে তুলে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেন, এবার এই ভিনদেশে শুরু হয় তার বারবার নানা বিচারের মুখোমুখি হওয়া (উপন্যাস *আমেরিকা*, প্রথম অধ্যায় এ বইয়ের 'দি স্টোকার'); এক মেয়ে ইঁদুর, নাম জোসেফিন, মঞ্চে গান গায়, তার জাতির একমাত্র আশা-ভরসা সে, এমনটাই তার দাবি, আর আমরা তার জীবনের গল্পটি শুনি এক কথকের মুখে যে জোসেফিনের দাবিগুলোর প্রতি সন্দিহান কিন্তু একই সঙ্গে বিস্ময়বিমুগ্ধ যে মঞ্চের বাইরের এই অতি সাধারণ মেয়ে ইঁদুরটি মঞ্চে কেন এত পূজনীয় (কাফকার শেষতম গল্প 'গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি')।

বলে শেষ করা যাবে না কীসব বিচিত্র, আপাত-অর্থহীন, মানসিক ও শারীরিক নৃশংসতার ঘটনা অবলীলায় ঘটে যেতে থাকে কাফকার গল্পের পরে গল্পে, ডায়েরির পাতায় পাতায়; বারবার মনে হয়, সবটা দুঃস্বপ্নে ঘটছে, সবটাতে গল্পের চরিত্রেরা যেন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে তাদের জীবনের মানে, কিংবা খুঁজে ফিরছে খোদার সাহায্যের হাত, মালিকের অনুগ্রহ বা শাসকের কৃপাদৃষ্টি। নাকি পুরোটাই ঠাট্টা, নাকি পুরোটাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরের ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির এক গদ্যকবিতা, তখনকার সামাজিক-বাস্তবতার এক কমিক উপস্থাপন (এখানে মনে পড়ে যায় ১৯০৮-এর দিকে চার্লি চ্যাপলিন-হ্যাট-পরা কাফকার বিখ্যাত ছবিটার কথা; চ্যাপলিন বাস্তবেই প্রিয় ছিল কাফকার)?

কতভাবেই-না কাফকা পড়া যায় – ডাক্তারি শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন কাফকা পড়ার চল আছে (অর্থাৎ কাফকার 'ক্লিনিক্যাল ব্যাখ্যা'), তেমনি শ্রেণীবৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও কাফকাকে নিয়ে লেখা হয়েছে কয়েক শ বই (কাফকার 'ম্যার্ক্সিস্ট ব্যাখ্যা'), আর তেমনই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণবাদী চোখ দিয়ে কাফকার প্রতিটা লাইন, এমনকি প্রতিটা শব্দের, আর কমা, সেমিকোলন ব্যবহারেরও ব্যাখ্যা হয়েছে কতবার (কাফকার 'ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা')। আরো কত কত ব্যাখ্যা হয়েছে এই লেখকের লেখার থিম, তাঁর ব্যবহৃত ইমেজ ও লেখার আবহ নিয়ে – তার ইয়ত্তা নেই। তবে সবকিছু বলা হয়ে যাওয়ার পরেও, বারবারই, কাফকার পোস্টকার্ড ইমেজটি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'যন্ত্রণা' ও 'জ্বালা-পীড়া-দুঃখ-কষ্টে'র। রোনাল্ড হেয়ম্যানের ১৯৮১-তে প্রকাশিত যথেষ্ট বিখ্যাত কাফকা-জীবনীর একেবারে শেষে নির্ঘণ্ট অংশ 'ফ্রানৎস কাফকা' নামের পাশের ভুক্তিগুলোর দিকে তাকালে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়:

> *কাফকা, ফ্রানৎস:* 'আত্মহত্যার বোধ'; 'আত্মঘৃণা'; 'আনন্দময় অভিজ্ঞতাগুলো মনে রাখতে পারার অক্ষমতা'; 'শব্দের জ্বালাতনে পীড়িত'; 'নিজেকে অপছন্দ করার বাধ্যতামূলক আচরণ'; এমনকি এক রহস্যময় ভুক্তি 'জীবন যে খাদ্য দেয় তার প্রত্যাখ্যান'।

এটাই আমাদের সেই চিরচেনা কাফকা: খ্যাপাটে, যন্ত্রণাপীড়িত, আত্মবিশ্বাসহীন, নিজের প্রতি ঘৃণায় ভরা এক শিক্ষিত চেক যুবক, যার অদ্বিতীয় মেধার পূর্ণ স্বীকৃতি তাঁর নিজের সামান্য একচল্লিশ বছরের জীবদ্দশায় মেলেনি।

আরেকটু পণ্ডিতি ঢঙে বললে, আমাদের চিরচেনা কাফকার ছবিটা এমন: এক রহস্যময় প্রতিভা, নিঃসঙ্গ এক ইউরোপিয়ান নস্ত্রাদামুস্ (ভবিষ্যদ্বক্তা), যার সৃজনী-ক্ষমতাকে তাঁর সমকালীন লেখকেরা উপেক্ষা করেছিলেন আর যিনি ইহুদিদের প্রতি এক বৈরী পরিবেশে বাবার তাচ্ছিল্য ও অফিসের পীড়ন সয়ে নেমে গিয়েছিলেন তাঁর কুহকী সাধু-সন্তসুলভ চিন্তার গভীরতম প্রদেশে আর ওখান থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন একদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে, সোভিয়েত গুলাগ আসবে, আমলাতন্ত্র পৃথিবী জুড়ে আরো পোক্ত হবে এবং আধুনিক মানুষের জীবন জটিল থেকে আরো জটিলতর হয়ে উঠবে।

কাফকাকে দেখার এই প্রতিষ্ঠিত ঢং, কাফকা-ব্যাখ্যার সময় শব্দচয়নের এই যে চিরচেনা ভঙ্গি, রোনাল্ড হেয়ম্যানের বইয়ের 'কাফকা' নামের পাশে নির্ঘণ্টের এই যে ক্লিশে ভুক্তিগুলো, এর নামই 'কাফকা-মিথ'। আমরা যত যা-ই বলি না কেন, আমাদের ঐ কাফকা-মিথই ভালো লাগে, মিথের ঐ কাফকাকেই আমরা ভালোবাসি, পূজা করি, পছন্দ করি। তবে কথা হচ্ছে, এসব মিথের গোঁড়ায় আছে বিরাট গলদ – এই কাফকা-মিথের অনেকটুকু সত্যিই মিথ বা অসত্য অনুমান।

সত্য তাহলে কী, তা জানার জন্য আমাদের নির্মোহ চোখে তাকাতে হবে কাফকার জীবনের দিকে। কাফকার লেখাগুলো অসংখ্য আত্মজীবনীর উপাদানে ভরপুর (কিন্তু তার মানে এমন না যে কাফকার সাহিত্যকর্ম তাঁর কোনো লুকানো-সাজানো আত্মজীবনী)। কাফকা আসলে বলেওছিলেন যে, তাঁর কোনো কোনো লেখা 'সত্যিই একদম ব্যক্তিগত স্বভাবের কিছু হিজিবিজি কাটা বা খসড়া নোট টোকার বেশি কিছু না'; কিন্তু জীবনকে সাহিত্যে পরিণত করার তাঁর যে মূল লক্ষ্য ছিল, সেখানে তিনি ঠিকই ঐ ব্যক্তিগত পর্যায়কে অতিক্রম করে, সমগ্র মানব-অস্তিত্বের মৌলিক চেহারাটিই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন 'পৃথিবীকে তার শুদ্ধ, সত্য ও অপরিবর্তনীয় রূপে তুলে ধরতে' (ডায়েরি, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭)।

ফ্রানৎস কাফকার *গল্পসমগ্র*-এর বাংলা অনুবাদের এই 'ভূমিকা'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী তা এখানে পরিষ্কার হওয়া দরকার। কাফকাকে নিয়ে তৈরি হওয়া মিথগুলো খণ্ডানোর জায়গা এটা নয়, আর তা সাধারণ বাঙালি পাঠকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছুও নয়। মিথ বলি, আর সত্যই বলি, এই 'ভূমিকা'র উদ্দেশ্য পরিষ্কার: ১. কাফকার জীবনের মূল দিকগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা (তাতে যদি কোনো-না-কোনো মিথ এমনিতেই খণ্ডানো হয়ে যায়, তো ভালো), যাতে করে তাঁর সময়কার সমাজ, রাজনীতি ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনা থেকে পাঠকের কাফকা বুঝতে কিছুটা সুবিধা হয়; ২. কাফকা-সাহিত্যের নানা ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব কিছুটা ছুঁয়ে যাওয়া (গল্পগুলোর বিশদ পাঠ-পর্যালোচনা এমনিতেই থাকছে এ বইয়ের শেষে) যাতে করে পাঠক আরো আগ্রহী হয়ে ওঠেন ফ্রানৎস কাফকার জীবন

ও সাহিত্যকর্ম বোঝার ব্যাপারে এবং এর সূত্র ধরে একসময় প্রবেশ করেন শুধু কাফকার নয় বরং সমগ্র আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের বিশাল ভুবনে; এবং ৩. পাঠককে এ কথাটুকু বলা যে, যেমনটা আলব্যের কাম্যু বলেছিলেন, কাফকার মূল স্বাদ অনুভব করার জন্য তাঁর নিজের লেখা বারবার পড়তে হবে; আর তাঁকে নিয়ে লেখা যত কম পড়া যায় ততই ভালো। মিথের কাফকার বিষয়ে শুধু এটুকুই জানা ভালো যে তাঁকে নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে এই এই মিথ বিদ্যমান আছে, কিন্তু মিথের কাফকা মাথায় রেখে কাফকা-পাঠ তাঁর সরল-সুন্দর গল্পগুলো পাঠের আনন্দ শুধু বাধাগ্রস্তই করবে।

কাফকার জীবনে প্রবেশের আগে আসুন আমরা শুধু একবার দেখে নিই প্রধান দশটি কাফকা-মিথ। আবারও বলছি, এখানে 'মিথ' বলতে বোঝানো হচ্ছে হয় অর্ধসত্য বা পুরো অসত্য কিছুকে। প্রতিটা মিথের পাশে ব্র্যাকেটে তা সত্য না অসত্য নাকি অর্ধসত্য সেটা বলে দেওয়া হলো:

১. কাফকা তাঁর জীবদ্দশায় লেখক হিসেবে বলতে গেলে অপরিচিত ছিলেন; লেখা প্রকাশে তাঁর ছিল বিরাট অনীহা (অর্ধসত্য)

২. কাফকা তাঁর সমস্ত লেখা ম্যাক্স ব্রডকে তাঁর মৃত্যুর পরে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন (সত্য)

৩. ভয়ংকর এক আমলাতান্ত্রিক চাকরি তাঁকে নিষ্পেষিত ও শেষ করে দিয়েছিল (অর্ধসত্য)

৪. কাফকার বাবা ছিলেন একজন নিষ্ঠুর একনায়ক; ভালো কিছুই ছিল না তাঁর বাবার মধ্যে (বিতর্কিত)

৫. কাফকা জীবনের বহু বছর যক্ষা রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন (সত্য)

৬. কাফকা তাঁর জীবনে আসা নারীদের সঙ্গে অসম্ভব রকমের সৎ ছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ ও অসহায় (অসত্য)

৭. প্রাগে জার্মানভাষী ইহুদি হিসেবে কাফকা ছিলেন দ্বিগুণ টানাপোড়েনে – তিনি ছিলেন সংখ্যালঘুদের মধ্যেও সংখ্যালঘু; সংখ্যাগুরু চেকভাষীদের মধ্যে এক সংখ্যালঘু জার্মানভাষী লেখক এবং চারদিকের অসংখ্য খ্রিষ্টানের মধ্যে সংখ্যালঘু এক ইহুদি (অর্ধসত্য)

৮. কাফকার সাহিত্যকর্ম তাঁর এই জোড়া সংখ্যালঘুত্বের ইহুদি অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা। তাঁর লেখা বুঝতে হলে তাঁর ইহুদিত্বকে আগে বুঝতে হবে (বিতর্কিত সত্য)

৯. কাফকার সাহিত্যকর্ম, যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি বন্দিশিবিরের ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিল যুদ্ধের প্রায় কুড়ি বছর আগেই (সত্য, তবে ব্যাপারটি এমন নয়)

১০. নাৎসিরা কাফকার লেখা নিষিদ্ধ করেছিল এবং পুড়িয়ে ফেলেছিল (অর্ধসত্য; মূলত অসত্য)

২.

জীবন

পরিবার

১৮৮৩ সালের জুলাই মাসের ৩ তারিখে ফ্রানৎস কাফকার জন্ম তখনকার অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে, এই প্রাচীন শহরটির ওল্ড টাউন স্কোয়ারের একদম কাছে। প্রাগ তখন বোহেমিয়া রাজ্যের রাজধানী। কাফকারা ছিলেন মধ্যবিত্ত, আশ্‌কেনাজি সম্প্রদায়ের ইহুদি। তাঁর বাবা হারমান কাফকা (১৮৫২-১৯৩১) ছিলেন ইয়াকব কাফকার চতুর্থ সন্তান; ইয়াকব পেশায় ছিলেন ধর্মীয় অনুশাসন-মানা কসাই। ইয়াকবই পরিবারটিকে দক্ষিণ বোহেমিয়ার ইহুদি অধ্যুষিত পল্লি ওসেক্ থেকে প্রাগে নিয়ে আসেন। কিছুদিন সেনাবাহিনীতে, কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ সেলস্‌ম্যান হিসেবে কাটিয়ে হারমান কাফকা তাঁর স্যুভেনির, ফ্যান্সি জিনিসপত্র আর কাপড়চোপড়ের দোকান চালু করেন প্রাগে, ওল্ড টাউন স্কোয়ারে। তাঁর অফিসে কাজ করতেন ১৫ জন কর্মচারী (এতে বোঝা যায়, একদম ছোট ছিল না তাঁর ব্যবসা) আর তাঁর ব্যবসার লোগো ছিল দাঁড়কাক (চেক ভাষায় *Kavka*)। কাফকার মা ছিলেন ইয়ুলি কাফকা (১৮৫৬-১৯৩৪), ইয়াকব লোউভি নামের এক প্রতিষ্ঠিত রিটেল ব্যবসায়ীর মেয়ে; শিক্ষার দিক থেকে তাঁর স্বামীর ওপরে। কাফকার বাবা-মা বাসায় কথা বলতেন ইদ্দিশ (হিব্রু বর্ণমালায় লেখা আশ্‌কেনাজি ইহুদি মূল থেকে তৈরি হওয়া, গোঁড়া ইহুদিদের ব্যবহৃত হিব্রু ও সেমেটিক সংমিশ্রণের এক জার্মান ভাষার রূপ) ঘেঁষা এক জার্মান ভাষায়, কিন্তু 'শিক্ষিত জার্মান' ভাষা তখন যেহেতু ছিল সমাজে ও চাকরিতে উপরে ওঠার জন্য জরুরি, তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের 'শিক্ষিত জার্মান' ভাষা শিখতেই অনুপ্রাণিত করতেন। কাফকারা ছিলেন মোট ছয় ভাই বোন, এঁদের মধ্যে ফ্রানৎস কাফকা সবার বড়। ফ্রানৎসের বয়স ছয় হওয়ার আগেই তাঁর অন্য দুই ভাই গেয়র্গ ও হেইনরিখ একদম শিশু বয়সেই মারা যান। এরপর জন্ম নেন ফ্রানৎসের তিন বোন: গ্যাব্রিয়েল, ডাকনাম এলি (১৮৮৯-১৯৪১); ভ্যালেরি, ডাকনাম ভাল্লি (১৮৯০-১৯৪২); ওটলি, ডাকনাম ওট্‌লা, আমৃত্যু বড় ভাই ফ্রানৎস কাফকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন ছিলেন এই ওট্‌লা (১৮৯২-১৯৪৩)। তিন বোনের মৃত্যুসন দেখে নিশ্চয়ই আর বলতে হয় না যে এঁরা তিনজনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাৎসি বন্দিশিবিরে প্রাণ হারান।

কাফকারা শুরুর দিকে থাকতেন একটা ছোট, ঠাসাঠাসি অ্যাপার্টমেন্টে। তাঁদের বাসায় এক কাজের মেয়ে থাকত (কাফকার বেশ কিছু গল্প ও তিনটি উপন্যাসে বাসার ঝি বা কাজের মেয়ের কথা বারবার ঘুরেফিরে আসে)। কাফকার ঘর প্রায়ই থাকত অনেক ঠান্ডা;

প্রাগে বিদ্যুৎ তখনো আসেনি, হিটিং সিস্টেমের তো প্রশ্নই আসে না; প্রচণ্ড শীতে কয়লাই ছিল একমাত্র ভরসা (দেখুন, এ বইয়ের গল্প 'কয়লা-বালতির সওয়ারি')। ১৯১৩-র নভেম্বরে কাফকা পরিবার বেশ বড় একটা অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওঠে (প্রায় সাত-আটবার বাসা বদল করেন হারমান কাফকা; সবগুলোই প্রাগের ওল্ড টাউন স্কোয়ারের আশপাশে), যদিও তত দিনে এলি ও ভাল্লির বিয়ে হয়ে গেছে এবং তাঁরা কাফকার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে বাস করছেন। ১৯১৪-র আগস্টে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগেভাগে, এ দুই বোন বাবা-মায়ের বড় অ্যাপার্টমেন্টে ফেরত আসেন, যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে তাঁদের স্বামীরা কোথায় তা তাঁরা জানতেন না। দুজনেরই তখন বাচ্চা কোলে। ফ্রানৎস কাফকা, তাঁর বয়স তখন ৩১, ভাল্লির ফেলে আসা নীরব নিশ্চুপ অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওঠেন; জীবনে এই প্রথম তাঁর একা থাকা। কাজের দিনগুলোতে বাবা-মা দুজনেই কাজে যেতেন, ইয়ুলি কাফকা মাঝেমধ্যে টানা ১২ ঘণ্টা কাজ করতেন স্বামীর দোকানে, ব্যবসা দেখাশোনায়। কাফকার শৈশব তাই ছিল মূলত তিন বোনের সঙ্গে, কিছুটা একা – কাজের মেয়ে আর ঠিকা-ঝিদের হাতেই আসলে বেড়ে উঠেছিলেন এই চার ভাইবোন।

শিক্ষা

১৮৮৯ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত কাফকা প্রাগের তখনকার মাসনা স্ট্রিটে 'জার্মান বয়েজ এলিমেন্টারি স্কুলে' পড়াশোনা করেন। তাঁর বয়স ১৩ হলে 'বার মিৎজভাহ্' (ইহুদি ছেলেদের বালেগ হওয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠান) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাফকার ছোটবেলার ধর্মীয় পড়াশোনার শেষ হয়। কাফকা কখনোই ইহুদি উপাসনালয় সিনাগগে যেতে পছন্দ করতেন না; বছরে মাত্র চারবার বাবার সঙ্গে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদির জন্য সিনাগগে যেতেন।

১৮৯৩-এ এলিমেন্টারি স্কুল ছেড়ে কাফকা প্রাগের ওল্ড টাউন স্কোয়ারের ওপর অবস্থিত কিন্‌স্কি প্যালেসে (এটারই নিচতলায় ছিল তাঁর বাবার দোকান) কড়া শাসনের ও ক্ল্যাসিক্যাল শিক্ষাদান রীতিতে চালানো জার্মান মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। এখানে পড়ার মাধ্যমে ছিল জার্মান, কিন্তু কাফকা চেক বলতে ও লিখতে পারতেন। তাঁর চেক ভাষায় দখলের জন্য তিনি প্রশংসাও কুড়িয়েছিলেন, কিন্তু নিজেকে তিনি চেক ভাষায় সাবলীল মনে করতেন না। ১৯০১-এ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে কাফকা প্রাগের জার্মান কার্ল-ফার্দিনান্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। শুরু করেন রসায়নে, কিন্তু দুই সপ্তাহ পরে আইনের ছাত্র হয়ে যান। আইন নিয়ে পড়াশোনা তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁর বাবা খুশি হয়েছিলেন, কারণ আইনশাস্ত্রে পড়াশোনা শেষে ভালো ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব। এখানে কাফকার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক ফেলিক্স ভেলট্‌শ্, লেখক অস্কার বাউম, ফ্রানৎস ভেরফেল্ প্রমুখ। প্রথম বছরের পড়া শেষ হতেই কাফকার সঙ্গে পরিচয় হয় ম্যাক্স ব্রডের।

ম্যাক্সও ছিলেন আইনের ছাত্র। শুরু হয় কিংবদন্তিতে রূপ নেওয়া এক আজীবন বন্ধুত্বের। ম্যাক্স ব্রডই প্রথম খেয়াল করেন খুব কম কথা বলা, লাজুক ধরনের এই ছেলেটির মেধা ও প্রজ্ঞা গভীর ও অগাধ। জীবনভর কাফকা খুব উৎসুক পাঠক ছিলেন। ম্যাক্স ও তিনি একসঙ্গে, ম্যাক্সের পরামর্শে, মূল গ্রিক ভাষায় প্লেটোর *Protagoras* পড়েন এবং কাফকার পরামর্শে তাঁরা দুজনে আবার একসঙ্গে মূল ফরাসিতে ফ্লবেয়ারের *Sentimental Education* ও *The Temptation of Saint Anthony* পড়েন। কাফকা চারজন লেখককে তাঁর 'সত্যিকারের রক্তের ভাই' বলে ভাবতেন: দস্তয়ইয়েফ্স্কি, ফ্লবেয়ার, ফ্রানৎস গ্রিলপারসার ও হাইনরিখ ফন ক্লাইস্ট (ক্লাইস্ট প্রসঙ্গে কাফকার সাহিত্য সমালোচনামূলক লেখাটি বাংলা অনুবাদে এ বইতেই রয়েছে)। এর পাশাপাশি চেক সাহিত্য ভালোবাসতেন কাফকা আর গ্যেয়টেকে খুব পছন্দ করতেন। ১৯০৬ সালের ১৮ জুলাই তিনি আইনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি পান এবং এর পরে এক বছর আদালতে বাধ্যতামূলক বেতনহীন ক্লার্কের চাকরি করেন। পড়াশোনার ক্ষেত্রে কাফকার প্রিয় বিষয়, অনুমান করি, ছিল দর্শন ও ধর্ম। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি কোনো বিশেষ টান তিনি দেখাননি। ১৯১৭ সালের পরে তিনি পাস্‌কাল, শোপেনহাউয়ার, সাধু অগাস্তিনের *Confessions*, শেষ দিককার টলস্টয়ের খ্রিষ্টীয় ডায়েরিগুলো – এসব পড়েন। এঁদের মধ্যে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সোরেন কিয়ের্‌কেগার্ড কাফকার ওপর সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেন বলে ধারণা করা হয়। অনেক কাফকা গবেষকে বিশ্বাস করেন, ডেনিশ এই দার্শনিকের মধ্যেই আছে কাফকাকে বোঝার অন্যতম কার্যকর চাবিকাঠি। কাফকার উপন্যাস *দুর্গ*-এর প্রথম প্রকাশের এপিলোগে ম্যাক্স ব্রডও সে কথা উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু বাস্তবে কাফকা কিয়ের্‌কেগার্ডকে যেভাবে বুঝেছিলেন, তাতে মনে হয় না, কিয়ের্‌কেগার্ডের পক্ষে কাফকার লেখায় বিরাট কোনো ছাপ ফেলা সম্ভব ছিল। কাফকা ও কিয়ের্‌কেগার্ড – এ প্রসঙ্গে আমরা এই 'ভূমিকা'র শেষ দিকে আরেকটু আলোচনা করব।

কর্মজীবন

কাফকা মোট দুটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন এবং একটি বড় ব্যবসায়িক উদ্যোগে মাথা ঘামান। প্রথম চাকরিটি ছিল এক ইতালিয়ান বিমা কোম্পানি Assicurazioni Generali-তে। ১৯০৭ সালের ১ নভেম্বর থেকে ১৯০৮-এর ১৫ জুলাই পর্যন্ত ইতালিয়ান এই কোম্পানির প্রাগের অফিসে খুব অসুখী এক সময় কাটে তাঁর। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার দীর্ঘ কর্মঘণ্টা তাঁকে বিষণ্ণ করে তোলে – বেতনও কম আর সেই সঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকা লেখালেখির জন্য সময় দেওয়া যাচ্ছে না, এ দুটো সত্যই পীড়া দিতে থাকে তাঁকে। তাঁর অনেক চিঠিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫ জুলাই ১৯০৮-এ চাকরি থেকে পদত্যাগ করার দুই সপ্তাহ পরে তিনি সরকারি বিমা প্রতিষ্ঠান Workers'

Accident Insurane Institute for the Kingdom of Bohemia-তে যোগ দেন। অফিসে তাঁর দায়িত্ব ছিল মিল-কারখানার শ্রমিকেরা কাজ করতে গিয়ে আহত হলে, সেসব দুর্ঘটনার তদন্ত করা ও ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নির্ধারণ করা; তখনকার দিনে মেশিনে কাটা পড়ে হাতের আঙুল হারানো কিংবা অন্য কোনো অঙ্গের ক্ষতি হওয়া ছিল বেশ নৈমিত্তিক ঘটনা। আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম ম্যানেজমেন্ট গুরু পিটার ড্রাকারের দাবি যে ফ্রানৎস কাফকাই আজকালকার মিল-কারখানায় ব্যবহৃত মাথার শক্ত হেলমেটের মতো জিনিসটার উদ্ভাবক, যদিও এ তথ্যের সমর্থনে কাফকার অফিসের কাগজপত্র থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি (অনুসন্ধিৎসু পাঠক সাম্প্রতিক প্রকাশিত, বিখ্যাত কাফকা স্কলার স্ট্যানলি কর্নগোল্ড ও অন্যদের সম্পাদিত *Franz Kafka – The Office Writins* বইটি ঘেঁটে দেখতে পারেন)। কাফকার বাবা তাঁর ছেলের এই চাকরিকে Brotberuf বা 'রুটির চাকরি' বলে খোঁটা দিতেন; অসংখ্য লেখায় কাফকা নিজেও অফিস-জীবনের অনেক কিছু নিয়ে তাঁর মনঃকষ্টের কথা বলে গেছেন – এর মধ্যে অন্যতম বেশ কিছু ডায়েরি এন্ট্রিতে অফিসের তোষামোদি সংস্কৃতি, বস্-তোষণ ইত্যাদি নিয়ে তাঁর কিছু কমিক্যাল লেখা। কিন্তু এই একই মানুষ অফিসে কাজের বেলায় ছিলেন খুঁতখুঁতে, যত্নশীল, সৃজনশীল এবং নিবেদিতপ্রাণ। এরই ফলস্বরূপ দ্রুত অনেকগুলো পদোন্নতি হয় তাঁর; এবং নভেম্বর ১৯১৫ নাগাদ তাঁর বেতন গিয়ে দাঁড়ায় বছরে ৫ হাজার ৪৯৬ ক্রাউন, যার মূল্য, তখনকার দিনে, এখনকার হিসাবে মোটামুটি মাসে প্রায় সোয়া ৬ লাখ বাংলাদেশি টাকার মতো। কাফকার সময়ে তাঁরই পরিদর্শন করা অফিসগুলোর শ্রমিকদের গড় বেতন ছিল বছরে ৯০০ থেকে ১০০০ ক্রাউন। দৈনিক মাত্র ছয় ঘণ্টা অফিসে চাকরি করে মাসে ৬ লাখ টাকার উপরে আয় করা কাফকার চাকরিকে কোনোভাবেই বাজে, নিম্নপদের কোনো চাকরি বলা যাবে না। ১৯১৮-র জানুয়ারিতে কাফকার বাবা ৫ লাখ ক্রাউন দিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কেনেন, যার মূল্য তখনকার দিনে আজকের প্রায় ৫ মিলিয়ন পাউন্ডের সঙ্গে তুলনীয়। জেমস্ হয়েস্-এর *Excavating Kafka* (২০০৮) এবং পিটার-আন্দ্রে অল্ট এর সাড়া-জাগানো জার্মান কাফকা-জীবনী *Der ewige sohn* (*The Eternal Son*; ইংরেজি অনুবাদ এখনো বের হয়নি)-এর এই তথ্য কাফকার নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাঁর চাকরির ভয়ংকরত্ব বিষয়ে গড়ে ওঠা মিথের ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে। পদোন্নতি পেয়ে একসময় কাফকার কাজ হয় ক্ষতিপূরণ দাবির যথার্থতা নির্ণয় করা, রিপোর্ট লেখা, ব্যবসায়ীদের আবেদন নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report) তৈরি করার মতো বড় কাজটিও কাফকা করেছেন অনেক বছর। তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির ও সম্পাদনার কাজে তাঁর দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করতেন। দুপুর দুটোয় শেষ হয়ে যেত কাফকার অফিসের কাজ, অতএব সাহিত্যের জন্য দেওয়ার মতো সময় তাঁর মিলত যথেষ্ট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন প্রাগের যুবকদের সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগ দিতে হচ্ছে, তখন অফিসের ঊর্ধ্বতনেরা কাফকাকে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য 'জরুরি প্রয়োজন' ঘোষণা করার কারণেই তাঁর আর যুদ্ধে যাওয়া লাগেনি।

শুধু সেবারই নয়, পরে তিনি অসুস্থ হলে যেভাবে বারবার তাঁর অফিস তাঁর জন্য দীর্ঘ সব ছুটি মঞ্জুর করেছে এবং শেষে অতি অল্প বয়সে শারীরিক অসুস্থতার কারণে পূর্ণ পেনশন নিয়েই কাফকাকে যেভাবে চাকরিতে ইস্তফা দিতে দেওয়া হয়েছে – এর সবই দানবীয় এক অফিসে আমলাতান্ত্রিক অন্ধকারে হাতড়াতে থাকা ফ্রানৎস কাফকা মিথের বিপরীতে আমাদের নতুন করে তাঁকে নিয়ে ভাবতে উৎসাহ জোগায়।

১৯১১ সালে কাফকার বোন এলির স্বামী কার্ল হারমান ও ফ্রানৎস কাফকা মিলে প্রাগের প্রথম অ্যাজবেস্‌টস্‌ কারখানা খোলায় মনস্থির করেন। মেয়ের বিয়েতে কাফকার বাবার দেওয়া যৌতুকের টাকাই ছিল এ ব্যবসার মূল পুঁজি। প্রথমদিকে এই ব্যবসার প্রতি কাফকা খুবই আগ্রহ দেখান, পরে তাঁর লেখালেখিতে ব্যাঘাত ঘটছে বলে তিনি এর ওপর বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন।

জীবনের এরকম এক সময়েই তাঁর পরিচয় ঘটে এক ইদ্দিশ নাট্যদলের সঙ্গে। প্রাগে নাটক মঞ্চায়ন করতে আসা ইদ্দিশ অভিনেতাদের দলটির নেতা ইজাক লাউভির (দুই রকম বানানে Isaak Lowy এবং Jitskhok Levi) সঙ্গে কাফকার গাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ১৯১১-এর অক্টোবরে এদের একটি নাটক দেখে কাফকা পরের টানা ছয় মাস ইদ্দিশ ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে ডুবে যান। এই আগ্রহ থেকেই পরে ডানা মেলে কাফকার ইহুদিধর্মের (Judaism) প্রতি আগ্রহের। এর কাছাকাছি সময়েই কাফকা মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে বাকি জীবনের জন্য শাকাহারী (Vegetarian) হয়ে যান। ১৯১৫ সালে তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার ডাক আসে, কিন্তু আগেই যেমন বলা হয়েছে, সরকারি কাজে তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে অফিস তাঁকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। পরে অবশ্য, ১৯১৭ সালে, তিনি নিজেই কিছুটা যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতি রোমান্টিসিজম ও কিছুটা রহস্যময় এক কারণে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখান, কিন্তু তত দিনে যক্ষ্মার কারণে ডাক্তারি দৃষ্টিকোণ থেকেই সেনাবাহিনী তাঁকে নিতে অপারগতা জানিয়ে বসে। ১৯১৮ সালে, মাত্র ৩৫ বছর বয়সে, তাঁর অফিস শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর পেনশন মঞ্জুর করে। এর পরের ছয়টি বছর মোটামুটি নানা স্যানাটোরিয়ামে (হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যনিবাস) ঘুরে ঘুরেই জীবন কাটে তাঁর।

বোনের স্বামীর সঙ্গে অ্যাজবেস্‌টস্‌ ফ্যাক্টরি চালু করার আকুতি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে (তারিখ: ৫ নভেম্বর, ১৯১৫) হাবসবুর্গ সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রানৎস জোসেফের চালু করা অস্ট্রিয়ান যুদ্ধ-বন্ডে বিনিয়োগ করে ১৫ বছর ট্যাক্স-ফ্রি বার্ষিক ৫.৫% সুদ হারে লাভ পাওয়ার জন্য বড় অঙ্কের টাকা খাটানো এবং নিবেদিতপ্রাণ হয়ে অফিসে কাজ করে তাঁর বারবার পদোন্নতি পাওয়ার ও মোটা বেতনের কর্মকর্তা হওয়ার ঘটনাগুলো আমাদের তাঁর অপার্থিব, সাধু-সন্ত রূপের উল্টোদিকে তাঁকে এক প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, বৈষয়িক ও পার্থিব মানুষ হিসেবে দেখতে প্রণোদনা জোগায়।

কাফকার বাবা – হারমান কাফকা

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে খুব কম লেখকের বাবাই ফ্রানৎস কাফকার বাবা হারমান কাফকার মতো বিনা অপরাধে এভাবে নিন্দিত ও গবেষকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। যেকোনো কাফকা-গবেষণায়ই হারমান কাফকা এক অন্যতম বড় চরিত্র এবং তাঁর চেহারাটি সেখানে সব সময়ই নিষ্ঠুর, অনুভূতিশূন্য এক পিতার, যিনি তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তানকে আজীবন আতঙ্কের মধ্যে রেখেছিলেন, বাস্তবিক অর্থেই তাকে পোকার চেয়ে বেশি সম্মান দেখাননি, যার ফলে সন্তানটি বেড়ে উঠেছিল আত্মবিশ্বাসহীন এক ব্যর্থ মানুষ হিসেবে।

কাফকা-গবেষক স্ট্যানলি কর্নগোল্ডের ভাষায় হারমান কাফকা ছিলেন 'বিশালদেহী, স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী এক ব্যবসায়ী'; আর ছেলে ফ্রানৎস কাফকার মতে, তিনি ছিলেন, 'শক্তি, স্বাস্থ্য, ক্ষুধা, উঁচু গলা, বাকপটুতা, নিজের প্রতি মুগ্ধতা, পার্থিব কর্তৃত্ব, সহ্যক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানের দিক থেকে একজন সত্যিকারের কাফকা' ('যেমনটা আমি কখনোই হতে পারিনি,' কাফকা লিখেছেন)।

বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি কাফকা তাঁর আত্মবিশ্লেষণের সবচেয়ে দামি ও বড় দলিল তাঁর বিখ্যাত *বাবাকে লেখা চিঠিতে* (*Letter to His Father*) লিখে রেখে গেছেন। ১৯১৯ সালের নভেম্বরে লেখা প্রায় ১০০ পাতার এই *চিঠি* ফ্রানৎস কাফকার আত্মজীবনীমূলক প্রধান রচনা, যার উল্লেখ যেকোনো প্রামাণ্য কাফকা-গবেষণা বইয়ে থাকবেই। তিনি চেয়েছিলেন, বাবাকে এই চিঠি পাঠিয়ে বাবার সঙ্গে সম্পর্কের একটি দফারফা করবেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় ছোট বোন ওটলা এবং তাঁর মা তাঁকে চিঠিটি পাঠাতে নিষেধ করেন। কাফকা এটিকে ব্যক্তিগত একটি দলিল হিসেবেই রেখে দেন, পরে ১৯২০ সালে তাঁর প্রেয়সী মিলেনা য়েসেন্‌স্কাকে তিনি চিঠিটি পড়তে দেন মিলেনার দিক থেকে তাঁকে বোঝার সুবিধা করে দিতে।

এ চিঠিতেই আমরা দেখতে পাই বাবা হারমান কীভাবে ছেলেকে 'টেবিলের চারপাশে তাড়িয়ে বেড়াতেন', কীভাবে তাঁকে হুমকি দিতেন ('আমি তোমাকে মাছের মতো ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলব'), কীভাবে খুব ছোটবেলায় এক রাতে ছেলে কাঁদতে থাকলে বাবা তাঁকে বিছানা থেকে তুলে বাড়ির বাইরে পেছনের বারান্দায় ফেলে রেখেছিলেন, যার ফলে ছেলের মনে হয়েছিল বাবার তুলনায় সে অতি তুচ্ছ কিছু। কাফকার ভাষ্যমতে, তাঁর বাবা দোকানের কর্মচারীদের ওপর জুলুম করতেন, খুব খোঁটা দিয়ে কথা বলতেন তাঁর সন্তানদের সঙ্গে এবং একবার এসব জুলুমে ত্যক্ত হয়ে দোকানের সবাই চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার মনস্থির করলে ছেলেকেই সবাইকে এক-এক করে বুঝিয়ে ঠান্ডা করতে হয়েছিল। বাবাকে কাফকার 'দৈত্য' বলে মনে হতো। বাবার সঙ্গে সাঁতারের পুলে গেলে, বাবার বিশাল বপুর সামনে তাঁর নিজেকে মনে হতো, 'একটা ছোট কঙ্কাল, অনিশ্চিত, ডাইভিং বোর্ডের ওপরে খালি পায়ে ঘোরাঘুরি করছি, পানি ভয় পাচ্ছি; সাঁতারের সময় তুমি যেভাবে হাত-পা চালাও তা আমার পক্ষে করা সম্ভব না।' খাবার টেবিলে বাবা হারমান গপগপ করে গরম

ধোঁয়া ওঠা খাবার গিলতেন বড় বড় গাল ভরে, মাংসের হাড় চিবাতেন কড়মড় করে, কিন্তু তাঁর সন্তানদের বলতেন যে ওভাবে খাওয়া নিষেধ। (চিঠির এ অংশ আমাদের মনে করিয়ে দেয় কাফকার গল্পের মাংসভোজী অনেক চরিত্রের কথা, যেমন *আমেরিকা* উপন্যাসের ভোজনপ্রিয় গ্রিন কিংবা 'এক অনশন-শিল্পী' গল্পের খসড়ার সেই নরমাংসভোজী চরিত্রকে)। কাফকার ভাষায় তাঁর বাবা তাঁর পুরো জীবন দখল করে ছিলেন, 'পৃথিবীর পুরো মানচিত্রের উপর শুয়ে ছিলেন' তিনি, ফ্রানৎসের জন্য 'কোনো জায়গাই রাখেননি'। বাবাকে অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয়ে কাফকা তাঁর অক্ষমতার জন্য নিজেকেই দোষী ভাবতে শুরু করলেন; তাঁর নিজের সারাংশ: 'তোমার জন্য, বাবা, আমি আমার আত্মবিশ্বাস হারিয়েছি, বিনিময়ে পেয়েছি এক সীমাহীন অপরাধবোধ।'

ফ্রানৎস কাফকা জীবনের শেষ দিকে যখন কপর্দকশূন্য মেয়ে ইউলি ওরিৎসেককে বিয়ে করতে চাইলেন, তাঁর বাবা তখন খেপে গেলেন। কাফকার ভাষায়, তাঁর বাবা তাঁকে বললেন: 'মেয়েটা খুব সম্ভব তার ব্লাউজ একটুখানি উঠিয়েছে, প্রাগের ইহুদি মেয়েগুলো যেভাবে ওঠায় আর কি, আর তুমি? তুমি মজে গেলে, ঠিক করলে ঐ মুহূর্তেই তাকে বিয়ে করবে। তোমাকে আমি একবারেই বুঝি না। তুমি বড় হয়েছ, শহরে থাকছ, কিন্তু তোমার চলার পথে দেখা হওয়া প্রথম মেয়েটাকে বিয়ে করা ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারছ না। অন্য কোনো "রাস্তা" কি তোমার নেই? ওইসব জায়গায় যেতে যদি তোমার ভয় লাগে, আমি তোমাকে সাথে নিয়ে যাব।' বাবার কাছ থেকে পাওয়া গণিকালয়ে যাওয়ার এই ইঙ্গিত কাফকার কাছে মনে হয়েছিল পৃথিবীর 'সবচেয়ে নোংরা জিনিস'। বাবার কর্তৃত্ব থেকে মুক্তির জন্য কাফকা পথ হিসেবে দেখতেন নিজের ক্যারিয়ারকে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে তাঁর বাবা-মা ছেলে কোন বিষয়ে পড়বে তা নিয়ে তাঁকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিন্তু এই স্বাধীনতা, কাফকার মতে, ছিল অর্থহীন। যে অপরাধবোধ তাঁর বাবা তাঁর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, এর ফলে পড়াশোনাতে কাফকা কোনো আনন্দই পেতেন না, প্রতিবছর পরীক্ষার আগে তিনি ভাবতেন যে ফেল করবেন। যদিও প্রতিবছরই তিনি পাস করে গেছেন, তবু তাঁর ভাষায়, পড়াশোনার প্রতি তাঁর ততটুকুই আগ্রহ ছিল যেরকম আগ্রহ কোনো টাকা চুরি করা ব্যাংক কমকর্তার, যেকোনো সময়ে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ের মধ্যে, থাকে তার দৈনন্দিন ব্যাংকিংয়ের কাজে।

পরে তিনি দেখলেন, বাবার হাত থেকে পালানোর আরেকটি রাস্তা হচ্ছে 'সাহিত্য'। কাফকা এ চিঠিতে স্বীকার করেছেন, সাহিত্যের মধ্যে সত্যিই কিছুটা হলেও তাঁর সান্ত্বনা মিলেছিল। কিন্তু তাতে স্বাধীনতা বা মুক্তি আসেনি, কারণ: 'আমার সব লেখাই যে ছিল তোমাকে নিয়ে; লেখালেখির মধ্যে আমি শুধু ওসব জিনিসেরই বিলাপ করে গেছি যেগুলো তোমার বুকে মাথা রেখে করতে পারিনি।' কর্তৃত্বপরায়ণ বাবার মূর্তি আমরা কাফকার অন্যতম বিখ্যাত দুটো গল্পের মধ্যে পাই – 'রায়' ও 'রূপান্তর'। প্রথমটিতে ছেলে বিয়ে করে স্বাধীন হতে চাইলে তাঁর বুড়ো বাবা তাঁকে তাঁর বিয়ের পাত্রী নিয়ে ওভাবেই খোঁটা দেন, যেভাবে হারমান তাঁর ছেলেকে দিয়েছিলেন, যেমনটা উপরে বলা হয়েছে, সে ইউলি

ওরিৎসেককে বিয়ে করতে চাইলে। গল্পের মধ্যে, পরে এই বাবা ছেলেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আর দ্বিতীয় গল্পটিতে ছেলে পোকা হয়ে গেলে বাবাই একসময় তার গায়ে একটা আপেল ছুড়ে মেরে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন।

গত ১০০ বছর ধরে ব্যক্তি কাফকাকে বোঝার যতভাবে চেষ্টা হয়েছে তার সবচেয়ে বড় চেষ্টাটাই হয়েছে তাঁর বাবাকে লেখা এই চিঠির মাধ্যমে। এই চিঠি নিয়েই লেখা হয়েছে ১ হাজার ২০০-র উপরে গবেষণা গ্রন্থ।

শেষ বিচারে এটাই মনে হয় যে, এই চিঠি ছিল কাফকার নিজের উদ্ভাবিত, নিজেকে শান্ত করার, সুস্থ করার থেরাপি। কাফকা এখানে, বাবার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বাধীন হওয়ার জন্য, তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবার সম্পর্ককে নিজের দিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এই বোঝার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঢুকেছে কাফকার অতিশয়োক্তি, আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বার্থে বাবাকে ছোট করে দেখানো এবং তাঁর লেখকসুলভ সহজাত অনেক কল্পনা প্রবণতা। তবু এটাও বলা যাবে না এই চিঠির সব দাবি মিথ্যা। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বোহেমিয়ার ওসেক্ নামের এক গ্রামে ফেরিওয়ালার গাড়ি ঠেলে বেড়ানো হারমান কাফকার প্রাগে এসে মোটামুটি বড় এক ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার সংগ্রামের গল্প থেকেই বোঝা যায়, কতটা শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল এই লোকের। তাঁর হিসাবেই তিনি মাপতে চাইতেন বাকি সবাইকে, সবাইকে মনে করতেন তারা যেহেতু জীবনসংগ্রাম কী তা দেখেনি, তাই বড় আরামে আছে। কাফকার চিঠিতে বাবার প্রতি তাঁর অনুভূতিগুলো বিধৃত থাকলেও বলা তো নেই যে বাবারও কী পরিমাণ হতাশা ছিল তাঁর খামখেয়ালি, অদ্ভুত স্বভাবের একমাত্র পুত্রসন্তানটিকে নিয়ে (মনে রাখতে হবে এই বাবা-মায়ের অন্য দুই ছেলে মারা গিয়েছিল তাদের ১৫ মাস ও ৭ মাস বয়সে)। কাফকার বাবা-মা কাফকার আপন চাচাতো ভাই ব্রুনো কাফকার (ব্রুনো ছিলেন প্রাগের নামকরা আইনের অধ্যাপক এবং পরে খ্যাতিমান এক রাজনীতিবিদ) সাফল্যের মাপে তাঁদের ছেলের পার্থিব ব্যর্থতাগুলো – বিশেষ করে তাঁর বিয়েশাদি করে সংসার করতে না-পারা ও মেয়ের জামাইয়ের সঙ্গে অ্যাজবেস্টসের ব্যবসা শুরু করেও হাল ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টিকে – মাপতেন।

বাবা-ছেলের এই সম্পর্কের ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণবাদী ব্যাখ্যা হয়েছে বিস্তর। কাফকা চিঠিতে ফ্রয়েডের বলা ইডিপাল সম্পর্কের কথাই যেন লিখেছেন (যার মূল কথা, ছেলেকে বড় হতে হলে, তাকে তার বাবার মতোই হতে হয়, যৌন দিক থেকে ওরকম পাকা হতে হয়; কিন্তু ছেলেকে একই সঙ্গে বাড়ির একমাত্র যৌন বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষের জায়গাটি থেকে বাবাকে সরিয়েও দিতে হয়, বাবার অনুকরণ করার স্বার্থে বাবার বিরুদ্ধেই তাকে দাঁড়াতে হয়)। কাফকা লিখছেন: 'তোমার সঙ্গে আমার যে অসুখী সম্পর্ক তার থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাকে এমন কোনো কাজ করতে হবে, যার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সবচেয়ে দূরতম; বিয়ে করা সবচেয়ে বড় কাজ, ও থেকেই সবচেয়ে প্রশংসাযোগ্য স্বাধীনতা আসতে পারে, কিন্তু আমি দেখছি যে বিয়ের সঙ্গেই তোমার সম্পর্কটা সবচেয়ে কাছের।'

কাফকা এখানে তাঁর বাবাকে দোষ দিচ্ছেন, কেন ছেলে বিয়ে করছে না তা নিয়ে হইচই করার জন্য, কিন্তু কাফকার মতে, তাঁর বাবাই তাঁকে এমন আত্মগ্লানি ও পাপবোধে ভোগা, খোঁড়া এক মানুষ বানিয়ে রেখেছেন যে তাঁর পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব। সন্দেহ নেই, এ চিঠির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাবার প্রভাবের বলয় থেকে তাঁর নিজের মন ও মানসকে বের করে আনা, মুক্ত হওয়া; কিন্তু এ চিঠিতে কাফকা নিজেকে তাঁর বাবার এতখানিই সৃষ্ট এক চরিত্র করে দেখিয়েছেন যে সেই বাবার থেকে তাঁর একটামাত্র চিঠি লিখে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অসম্ভব *ঠেকে*। তাহলে কাফকা কি সেই সময়ের এক্সপ্রেশনস্টিক সাহিত্যের রীতি মোতাবেক পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব নিয়ে রোমান্টিকতায় ভুগতেন? তখনকার দিনে শিল্পসাহিত্যের অন্যতম বিষয়ই ছিল সাহসী, শিল্পীমনের পুত্রের সঙ্গে কর্তৃত্বপরায়ণ বুর্জোয়া পিতার দুর্বোধ্য সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলা। পিতারা ওখানে হতেন মিথ্যা বিশ্বাস ও মিথ্যা নৈতিকতার ধারক ও বাহক, আর তাঁদের সন্তানেরা আধুনিক, মুক্তমনা, প্রথাবিরোধী চরিত্র। এই দুজনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে কম সাহিত্য হয়নি গত শতাব্দীর শুরুর দিকে।

হয়তো তা-ই হবে, হয়তো না। হয়তো 'বাবার কর্তৃত্বের সামনে নির্যাতিত, অসহায় কাফকা' একটি মিথ, কিংবা হয়তো তা কিছুটা সত্য, কিছুটা মিথ্যা। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে কাফকার *বাবাকে লেখা চিঠি* একটি দারুণ গল্প – কাফকার নিজের জীবন নিয়ে নিজেকে বলা একটি চমৎকার কাহিনি। তাতে আমাদের কোনো আপত্তিও থাকার কথা না: সেরা মনঃসমীক্ষণের কাজও তো তাই: আমরা কী করে আমরা হয়েছি তার একটা সন্তোষজনক গল্প খাড়া করতে পারা।

আমাদের জন্য জরুরি এটুকুই যে, এই 'চিঠি' আমাদেরকে কাফকার অপরাধবোধ ও পাপবোধে আকীর্ণ সাহিত্যকর্মগুলোর খুব কাছে নিয়ে আসে এ কথা – বিশেষ করে তাঁর *আমেরিকা* উপন্যাস থেকে শুরু করে পরের সব লেখার জন্য সত্য (অর্থাৎ ১৯২২ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত)। এই চিঠিতে কাফকার টাকা চুরি করা এক ব্যাংকারের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার মধ্যে আমরা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম *বিচার* উপন্যাসের (যেখানে ব্যাংকার জোসেফ কে. বিনা অপরাধে একদিন গ্রেপ্তার হয়ে যায়, কিন্তু তাকে কখনো আটক করা হয় না, সে জীবনভর ঘুরে বেড়ায় – শেষ দৃশ্যে নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত – তার অপরাধ কী তা জানার জন্য) বীজ খুঁজে পাই।

কাফকার মা – ইয়ুলি কাফকা

এই বিশাল *বাবাকে লেখা চিঠিতে* কাফকার মা ইয়ুলি কাফকা কত ছোট যে একটা চরিত্র তা ভাবতে অবাক লাগে। বাবার সঙ্গে তুলনায় তাঁর মা খুব শান্ত ও লাজুক এক মহিলা ছিলেন। এ চিঠিতে তাঁর ভূমিকা স্বামীর সহকারী একজন হিসেবে, যিনি তাঁর সন্তানদের বাবার সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠ যে বাবার অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ; কিন্তু

তা সত্ত্বেও তাঁকে আমরা দেখি একজন অসহায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, অসহায় কারণ তিনি পিষ্ট দুদিকেরই চাপে – একদিকে তাঁর স্বামী, অন্যদিকে তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা চার সন্তান। কাফকা বাবাকে লিখেছেন: 'আমরা তাঁকে (মাকে) সমানে হাতুড়ির বাড়ি মেরে যাচ্ছি, তোমার দিক থেকে তুমি, আমাদের দিক থেকে আমরা।' ঐ দুটি গল্পেও – 'রায়' ও 'রূপান্তর' – যেখানে কাফকা-পরিবারের সবচেয়ে কাছাকাছি এক ছবি পাওয়া যায়, মা চরিত্রটি লক্ষণীয়: 'রায়' গল্পে মা মৃত; আর 'রূপান্তর' গল্পে তিনি তাঁর 'দুর্ভাগা ছেলের' প্রতি মমতায় ভরা, কিন্তু ছেলের বিপদে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা ছাড়া তাঁর আর কোনো ভূমিকা নেই। মনঃসমীক্ষণবাদী চোখ দিয়ে দেখলে মনে হয়, কাফকার অরক্ষিত মানসিক অবস্থার কারণ শুধু তাঁর বাবার কর্তৃত্বপরায়ণতাই নয়, তাঁর প্রতি খুব কম বয়সেই তাঁর মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারটাও এর একটা কারণ বটে। কাফকার ডায়েরিতে ইয়ুলি কাফকাকে আমরা দেখি ছেলের অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপারগুলো নিয়ে 'ঘ্যানঘ্যান' করছেন, ছেলের বিরক্তি শুধুই বাড়াচ্ছেন আর তাঁকে বুঝতে পুরো ব্যর্থ হচ্ছেন। কাফকা ডায়েরিতে নালিশ জানাচ্ছেন যে তাঁর মা তাঁকে সাধারণ আর দশটা যুবকের মতোই ভাবেন, তাই 'ঘ্যানঘ্যান' করেন তাঁর ছেলে কেন ওসব 'সাহিত্য' ছেড়ে অন্য সবার মতো বিয়ে-থা করে সংসারী হচ্ছে না। কাফকার দীর্ঘদিনের প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারকে লেখা একটি চিঠির পুনশ্চঃ অংশে আমরা মা ও ছেলের এই পর হয়ে যাওয়া এবং একই সঙ্গে পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসার এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই:

> আমি কাপড়চোপড় ছাড়ব এমন সময় মা কী যেন সামান্য একটা কাজে আমার ঘরে ঢুকলেন, তারপর তিনি চলে যাচ্ছেন, এমন সময় আমাকে শুভ রাত্রি জানিয়ে একটা চুমু খেলেন, এরকম ঘটেনি অনেক বছর। 'ঠিক আছে', আমি বললাম। 'আমার কখনো সাহস হয়নি' আমার মা বললেন, 'আমি ভাবতাম তুমি এসব পছন্দ করো না। কিন্তু তুমি যদি পছন্দ করে থাকো, তো আমিও করি।'

ব্যক্তিগত জীবন ও কাফকা সাহিত্যে যৌন অনুষঙ্গ

কাফকার যৌন জীবন ছিল বেশ সক্রিয়। ম্যাক্স ব্রডের ভাষায়, কাফকা যৌন কামনার হাতে 'উৎপীড়িত' হতেন। কাফকার অন্যতম প্রধান জীবনীকার রাইনার স্টাখের মতে, কাফকা জীবনভর 'অবিরাম মেয়েদের পেছনে ছুটেছেন', আর তাঁর মধ্যে সব সময় কাজ করত 'বিছানায় ব্যর্থ হওয়ার ভয়।' কাফকা অনেকবার পতিতা সংসর্গ করেছেন; আর পর্নোগ্রাফিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর জীবনে প্রেম এসেছে মোট ছয় বার – একেকবার একেক রূপে।

কাফকার ডায়েরি ও চিঠিগুলো পড়লে এরকম মনে হয় যে, বিয়ে করাকে তিনি জীবনের মুখ্যতম ব্যাপার বলে ভাবতেন।

বিয়ে করা, পরিবার গড়ে তোলা, যতগুলো সন্তান ঘরে আসে তাদের গ্রহণ করা, এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে তাদের পাশে দাঁড়ানো, এমনকি অল্পস্বল্প পথ দেখানো, আমার হিসেবে এই-ই হচ্ছে মানুষের পক্ষে অর্জনযোগ্য সবচেয়ে বড় সফলতা।

বাবাকে লেখা চিঠিতে কাফকার এই ঘোষণা তিনি নিজের জীবনে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি কোনো দিন। তাঁর সঙ্গিনী নির্বাচনে সব সময়ই সমস্যা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল বিয়ে করে সংসার শুরু করলে, ঘরে সন্তান এলে, সাহিত্যচর্চায় ব্যাঘাত ঘটবে – এই ভয়।

কাফকার প্রথম প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারের কথা বলা যাক। বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের বাসায় ১৯১৩ সালের ১৩ আগস্ট কাফকার সঙ্গে ফেলিসের দেখা হয়। ফেলিস বয়সে ছিলেন তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট এক বুদ্ধিদীপ্ত, অল্পবিস্তর পড়ালেখা করা, অনাকর্ষণীয় চেহারার, ভালো চাকরি করা বার্লিনের মেয়ে। কাফকা তাঁকে ভক্তি করতেন, কিন্তু তাঁর প্রতি কামনা-বাসনা বোধ করতেন না। ১৯১৫ সালে ফেলিসের সঙ্গে সময় কাটানোর পরে কাফকা ডায়েরিতে লেখেন: 'চিঠির ভুবনে ছাড়া বাস্তবে আমি কখনো ফেলিসের সঙ্গে সম্পর্কের সেই মধুরতাটুকু অনুভব করিনি, যেটা মানুষ প্রেমিকার সঙ্গে করে; তাঁর প্রতি আমার শুধু অসীম ভক্তি।' এই স্মার্ট ও আত্মবিশ্বাসী ফেলিসের সঙ্গে কাফকার যখন বিয়ের কথা শুরু হয়, তিনি বোধ হয় নিজের অসম্পূর্ণতাগুলো নিয়ে ভয় পেয়ে যান, সঙ্গে তো সাহিত্য ও বিয়ের মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য ঘিরে দুশ্চিন্তা এবং নিজের জীবনে বাবার সংসারেরই পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ভয় ছিলই। ফেলিস তাঁকে নিয়ে বাসার আসবাব কিনতে গেলে, কাফকার কাছে সেগুলো মনে হয় 'কবরফলক'; আর ফেলিস যখন বলেন যে তাঁদের দুজনের বাসায় থাকবে তাঁর (ফেলিসের) পছন্দের ছবি, কাফকার কাছে খুব অসহ্য লাগে কথাটা। ফেলিসের সঙ্গে বাগ্‌দানের অনুষ্ঠানে কাফকার নিজেকে মনে হয় 'কোনো আসামির মতো হাত-পা বাঁধা'। ফেলিসকে লেখা ৫০০ চিঠির মধ্যে (*Letters to Felice* নামে কাফকার বেস্টসেলার বইটি বাজারে সহজলভ্য) আমরা পাই কাফকার মানসিক ও আবেগগত চাহিদার এক রক্তাক্ত ছবি; ফেলিসের জীবনযাপনের প্রতিটি খুঁটিনাটি জানতে চাওয়ার মধ্যে আমরা দেখি হবু বধূর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কলাকৌশল আঁটা এক চতুর কাফকাকে, আর সবচেয়ে বেশি দেখি দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতার এক প্রগাঢ় অভাব। ফেলিসের চিঠিগুলো যদিও পাওয়া যায়নি, তবু এটুকু নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়, তিনি কাফকা নামের ৬ ফুট লম্বা, সুদর্শন ও আকর্ষণীয় যুবকের খামখেয়ালি, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ততার কারণে মানসিকভাবে যথেষ্ট বিরক্ত ছিলেন। ১৯১৪-র ১২ জুলাই ফেলিস নিজেই তাঁদের প্রথম বাগ্‌দান ভেঙে দেন; পরে অবশ্য তাঁরা আবার যোগাযোগ শুরু করেন – দ্বিতীয়বারের মতো বাগ্‌দান হয় ১৯১৭-র জুলাইতে, পরে সে-বছরেরই ডিসেম্বরে এটিও ভেঙে যায়।

ফেলিসের সঙ্গে সম্পর্ক চলাকালীন কাফকা গোপনে ফেলিসের প্রিয়তম বান্ধবী গ্রেটে ব্লখের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গ্রেটে বার্লিনেরই এক ইহুদি পরিবারের মেয়ে। ম্যাক্স ব্রড দাবি করেন যে গ্রেটের গর্ভে কাফকার একটি পুত্রসন্তান হয়, যার কথা কাফকা কখনো

জানতেন না। যদিও সবচেয়ে বিখ্যাত দুই কাফকা-জীবনীকার পিটার-আন্দ্রে অল্ট ও রাইনার স্টাখের মতে এ দাবি সত্য নয়; গ্রেটের সঙ্গে কাফকার ওরকম ঘনিষ্ঠতা কখনোই হয়ে ওঠেনি। গ্রেটে ও কাফকার মধ্যেকার গোপন সম্পর্কের কথা গ্রেটেই বান্ধবী ফেলিসকে জানিয়ে দেন। ফেলিস গ্রেটেকে লেখা কাফকার চিঠিগুলো পড়ে চরম প্রতারিত বোধ করেন।

১৯২০ সালে, অসুস্থ অবস্থায়ই, কাফকা প্রেমে পড়েন চেক সাংবাদিক ও লেখক, সুন্দরী মিলেনা য়েসেন্স্কার। মিলেনাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলো *Letters to Milena* নামের আরেক বেস্টসেলিং বই। এই চিঠিগুলো ফেলিসকে লেখা চিঠিগুলো থেকে অনেক বেশি আন্তরিকতা ও উষ্ণতায় ভরা। এঁদের মূল বৈশিষ্ট্য নিরাপত্তাহীনতার বোধ, তাঁর ভীতি ও নিজের প্রতি ঘৃণার অনুভূতি। তিনি নিজেকে তুলনা করেন 'নোংরা বিছানায় শোয়া, মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা এক লোক, যাঁকে দেখতে এসেছে মৃত্যুর ফেরেশতা' হিসেবে। এই দফায় আমরা কাফকার প্রতি তাঁর প্রেমিকার অনুভূতির কথাগুলোও জানতে পারি। ম্যাক্স ব্রডকে লেখা মিলেনার অসংখ্য চিঠির মধ্যে দিয়ে জানা যায়, কাফকার ছোটখাটো বিষয়গুলো সামলানোর (যেমন পোস্ট অফিসে যাওয়া) অপারগতা দেখে মিলেনা বিস্মিত; আর অন্যান্য লোকদের স্মার্টনেস দেখে (যেমন ফেলিসের, সেই সঙ্গে মিলেনার মেয়েবাজ স্বামী আরনস্ট্ পোলাকের) কাফকা কীভাবে হীনম্মন্যতায় ভুগতেন তা বুঝতে পেরে তিনি কাফকার প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র। মিলেনা লেখেন:

> সে (কাফকা) ভাবে যে সে অপরাধী ও দুর্বল, তার পরও এই পৃথিবীতে তাঁর মতো বিশাল শক্তির আর কেউ নেই; আর কারো নেই উৎকর্ষের পূর্ণমাত্রা অর্জনের, শুদ্ধতা ও সত্য অর্জনের এরকম পরম ও তর্কাতীত প্রয়োজন।

মিলেনাকে কাফকা লেখেন: 'আমি নোংরা, মিলেনা, আমার ভেতরকার নোংরার কোনো শেষ নেই, সে কারণেই আমি শুদ্ধতা নিয়ে এত জোরে চিৎকার করি।' (২০ আগস্ট, ১৯২০)।

১৯২০-এর আগস্টে মিলেনা ব্রডকে আরো একটি চিঠি লেখেন, যেটি কাফকার অপাপবিদ্ধ, সাধু-সন্তের ইমেজ (বা মিথ) আরো গাঢ় করে তোলে।

> তাঁর [কাফকার] কাছে জীবন অন্যদের কাছে যেমন সেরকম মোটেই নয়...সে একদম সাধারণ জিনিসগুলোও বুঝতে পারে না...এই পুরো পৃথিবীই তাঁর কাছে একটা ধাঁধা...আমি যখন তাকে আমার স্বামীর কথা বললাম, আমার স্বামী যার আমার প্রতি অবিশ্বস্ততার ঘটনা বছরে শতবার ঘটছে, তাঁর মুখটা [আমার সেই স্বামীর প্রতি] সেরকম শ্রদ্ধায়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেমনটা হয়েছিল সে আমাকে তার অফিসের বস্ নিয়ে বলার সময়... তাঁর বস্ দ্রুত টাইপ করতে পারেন, আর সেকারণেই [কাফকার হিসেবে] কী চমৎকার একজন মানুষ তিনি... সে [কাফকা] মিথ্যা বলতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

মিলেনার সঙ্গে সম্পর্ক চলার সময়েই কাফকা প্রাগের এক গরিব অশিক্ষিত হোটেল পরিচারিকা ইউলি ওরিৎসেকের প্রেমে পড়েন। ১৯১৯ সালের এক ছুটিতে তাঁদের পরিচয়।

ইউলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি। এ দুজনের মধ্যে বিয়ের জন্য বাগ্‌দান হয়, দুজনে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেন, বিয়ের তারিখও ঠিক করেন। ইউলির সামাজিক অবস্থান ও জায়োনিস্ট আন্দোলনের (ইহুদিদের স্বাধীন আবাসভূমি ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন) প্রতি সমর্থনের কারণে কাফকার বাবা খেপে যান। এ ঘটনা থেকেই জন্ম হয় কাফকার বিখ্যাত *বাবাকে লেখা চিঠির*। একসময় ইউলিকে ছেড়ে মিলেনার দিকেই কাফকা বেশি ঝুঁকে পড়েন, ইউলির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন; ইউলি বলেন: 'তুমি কি সত্যিই আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?'

ইউলির চেয়ে অনেক বেশি গাঢ় ও সম্ভাবনাময় ছিল কাফকার শেষ প্রেম। প্রেমিকার নাম ডোরা ডিয়ামান্ট। কাফকার অন্য দুই মূল প্রেমিকা ফেলিস ও মিলেনার পাশাপাশি ডোরাও এখন অনেক বিখ্যাত এক নাম। ১৯২৩-এর আগস্টে মৃত্যুর মাস দশেক আগে ডোরার সঙ্গে কাফকার পরিচয় হয় এক অবকাশযাপন কেন্দ্রে। ডোরার বয়স তখন ২৫, কাফকার চেয়ে ১৫ বছরের ছোট; বার্লিনে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একা বাস করা এক মেয়ে সে। ডোরা কাফকার কাছে জায়োনিজম ও ইহুদি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অগাধ আগ্রহ প্রকাশ করেন; পরে দুজনেই পরিকল্পনা করেন যে তাঁরা প্যালেস্টাইনে গিয়ে সংসার পাতবেন, সেখানে তাঁরা একটা রেস্টুরেন্ট খুলবেন – ডোরা হবেন সেটার পাচক, কাফকা ওয়েটার। তা আর হয়ে ওঠেনি; কাফকা মারা যান এর ক'মাস পরেই, কিন্তু ডোরা কাফকাকে জীবনের শেষ ক'মাস – প্রাগ ও পরিবারের শৃঙ্খলমুক্ত অবস্থায় – বার্লিনে সম্ভবত কাফকার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু উপহার দেন। ডোরা এর পরে বেশ নামকরা এক অভিনেত্রী হন, কম্যুনিজমে সক্রিয় হয়ে ওঠেন (মিলেনার মতোই), প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। লন্ডনে ১৯৫২ সালে ডোরার মৃত্যু হয়। ১৯২৪ সালে কাফকার মৃত্যুর সময় ডোরা তাঁর পাশে ছিলেন।

কাফকার লেখার কোনো কোনো অংশ এমন ধারণারও জন্ম দিয়েছে যে তিনি সম্ভবত সমকামী ছিলেন। তবে গবেষকরা এখন একমত যে, তা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক এক অনুমান। কাফকার সময়টা ছিল ইউরোপে পুরুষবাদী সংস্কৃতির তুমুল জোয়ারের সময়; সব ছেলে একসঙ্গে মিলে ব্যায়াম, সাইক্লিং, সাঁতার, দীর্ঘ পথ হাঁটা, পুরো জার্মানি জুড়ে হাইকিং করতে বেরোনো – এসব নতুন ফ্যাশন তখন তুঙ্গে। কাফকার তিন-চারটে লেখায় তথাকথিত সমকামী যৌনতার ইঙ্গিত খুব বেশি হলে এসবেরই উদ্‌যাপন – এমনটাই এখন এ বিষয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত উপসংহার।

এর বিপরীতে, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক কাফকার হাতে সব সময়ই অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়েছে। কাফকার লেখায় এই সম্পর্কগুলো সব সময় আতঙ্ক-জাগানো ও নোংরা। *আমেরিকা* উপন্যাসে ক্লারা যখন কার্লের দিকে যৌনমিলনের জন্য এগিয়ে আসে, সে কার্লকে পেড়ে ফেলে কুংফু স্টাইলে। *বিচার* উপন্যাসের লেনি তো মনে হয় কোনো জন্তু, তার আঙুলগুলো বাদুড়ের মতো, জোসেফ কে.-কে ভুলিয়েভালিয়ে সে মেঝেতে টেনে আনে, বলে: 'তুমি এখন আমার।' আরো খারাপ *দুর্গ* উপন্যাসের সেই দৃশ্য যখন কে. ও ফ্রিডা

সরাইখানার মেঝেতে জমে থাকা নোংরা ময়লা কাদাপানির মধ্যে মিলিত হয় (যদিও এ সময়ে কাফকার বর্ণনা কিছুটা লিরিক্যাল, অর্থাৎ তিনি সম্ভবত বলতে চাইছিলেন যে, সেক্স একটা নোংরা বিষয় হলেও এর মধ্য দিয়ে ভালোবাসা ও আত্মহারা হওয়ারও প্রকাশ ঘটে)। কাফকা মিলেনাকে লিখেছিলেন, সেক্সের জন্য তাঁর তাড়নার কারণে তাঁর নিজেকে পৃথিবীর পথে ঘুরে বেড়ানো ইহুদি (Wandering Jew) বলে মনে হয়: 'অর্থহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি অর্থহীন, নোংরা এক পৃথিবীর পথে।' কিন্তু একই সঙ্গে সেক্সের মধ্যে আছে 'স্বর্গ থেকে পতনের আগে স্বর্গের যে হাওয়ায় আমরা শ্বাস নিতাম সে রকম হাওয়ার কিছু একটা।'

আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, যৌনতার বেলায় কাফকার ওপর সব সময় ভর করে সমাজের একেবারে নিচু স্তরের, গরিব, কাজের মেয়েরা। *আমেরিকা* উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় 'দি স্টোকার'-এ (যা এ বইতে অনূদিত হলো) আমরা দেখি কাজের মেয়ের গর্ভে বাচ্চা জন্ম দিয়ে আমেরিকায় নির্বাসিত হয়েছে কিশোর কার্ল রসমান; *বিচার* উপন্যাসে জোসেফ কে.-র নারীরা হয় সামান্য টাইপিস্ট, ধোপানি, না হয় উকিলের কাজের মেয়ে; *দুর্গ* উপন্যাসের ফ্রিডা পানশালায় কাজ করা নগণ্য এক মেয়ে, আর পেপি (প্রথম দিকে) আরো নিচু শ্রেণীর এক কাজের মেয়ে; 'রূপান্তর' গল্পে মধ্যবয়সী চুলে বেণি করা কাজের মেয়েটা পোকা-গ্রেগরকে কত ভয় পায় (কিন্তু বয়স্কা ঝি-টা এই পোকাকে একটুও ভয় পায় না); 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পে ঘোড়ার আস্তাবল থেকে উদয় হওয়া দানবীয় সহিস যৌনবাসনা পূরণের জন্য ডাক্তারের কাজের মেয়ে রোজের ওপর এমনভাবে চড়াও হয়, যেন মনে হয়, সে নরমাংসভোজী, রোজকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে; আর 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন' গল্পের নায়ক পুরুষ শিম্পাঞ্জি রট্‌পিটারের জন্য সঙ্গী হিসেবে মেলে এক আধা-বশমানা মেয়ে শিম্পাঞ্জি, 'শিম্পাঞ্জিদের মতো করেই তাঁর সঙ্গসুখ ভোগ করে রট্‌পিটার'।

কাফকা-সাহিত্যের যৌন বিষয়গুলো যাঁরা 'অপার্থিব' বলেন (এবং কাফকা মিথে নতুন পালক যোগ করেন), তারা কোন যুক্তিতে তা বলেন জানি না; আমার বরং *Excavating Kafka* বইয়ের জেমস হয়েসের মতো করেই মনে হয় যে, কাফকা সাহিত্যে (এবং কাফকার ব্যক্তিজীবনেও) যৌনতা খুব উদ্ভট, প্রথাবিরুদ্ধ ও নোংরা-কাদায় ভরা পার্থিব এক সত্য। 'রূপান্তর' গল্পের মানুষ-পোকা গ্রেগর যেভাবে তার বোনের গলায় চুমু খেতে চায়, কিংবা 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পে রোগীর ঊরুতে যে রকম গোলাপ-রঙের ক্ষত আমরা দেখি, তার নানা রূপক অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু তা সাধু-সন্ন্যাসীর চোখে দেখা কোনো 'অপার্থিব', বৈরাগ্যময় যৌনতা নয়।

ব্যক্তিত্ব

কাফকা ভয়ে থাকতেন যে অন্য মানুষের কাছে তিনি বোধ হয় বিরক্তিকর এক চরিত্র – শারীরিক ও মানসিক, দুই দিক দিয়েই। তবে তাঁর সঙ্গে যারা মিশেছেন তাঁদের সবার কাছেই তিনি ছিলেন চুপচাপ ও ঠান্ডা মাথার, যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ও শুষ্ক রসবোধসম্পন্ন এক

ব্যক্তিত্ব; কিশোরসুলভ হ্যান্ডসাম, কিন্তু পোশাকে-আশাকে অনাড়ম্বর এক মানুষ। ব্রডের হিসাবে কাফকা তাঁর দেখা অন্যতম মজার এক মানুষ, যিনি বন্ধুদের সঙ্গে সব সময় হাসি-তামাশা করতেন, তাঁদের কঠিন সময়ে তাঁদের ভালো উপদেশ দিতেন। ব্রড আরো বলছেন, কাফকা ছিলেন খুব আবেগে পূর্ণ একজন আবৃত্তিকার, বক্তৃতার সময়ে তিনি কথা সাজাতেন গানের মতো গুছিয়ে। ব্রডের হিসাবে, কাফকার ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় দুটো দিক ছিল: তাঁর 'পরম সত্যবাদিতা' (Absolute Wahrhaftigkeit) এবং 'সূক্ষ্ম বিবেকবোধ' (präzise Gewissenhaftigkeit)। তিনি বিষয়ের এমন খুঁটিনাটি গভীরে চলে যেতেন, এতখানি ভালোবাসা নিয়ে ও নিখুঁতভাবে তা যেতেন যে, আগে চোখে না পড়া অনেক বিষয়ও তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসত, 'সেগুলো হয়তো অদ্ভুত শোনাত, কিন্তু সেগুলো সত্য ছাড়া আর কিছুই হতো না (nichts als wahr)।'

কাফকা নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধুলা ভালোবাসতেন, ভালো সাইকেল চালাতেন, সাঁতার পছন্দ করতেন, নৌকার দাঁড় টানায় দক্ষ ছিলেন, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাফকাই পরিকল্পনা করতেন বন্ধুরা মিলে কোথায় দীর্ঘ পদযাত্রাতে যাবেন। তাঁর অন্যান্য আগ্রহের মধ্যে ছিল বিকল্প বা প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতি, অ্যারোপ্লেন ও সিনেমা। লেখালেখি তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তিনি বলতেন যে লেখালেখি 'প্রার্থনার মতো' একটা কাজ। কোলাহল তিনি খুব অপছন্দ করতেন, এর পরিচয় পাওয়া যায় এ বইতে অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রথম দিককার ছোট রচনা 'বিরাট শোরগোল'-এ। কাফকা সিগারেট খেতেন না; মদ, কফি, চা, চকলেটও না। তিনি জীবনের দীর্ঘ অনেকগুলো বছর শুধু শাকাহারীই ছিলেন না, কীভাবে খেতে হবে তার নিয়মও ছিল তাঁর জন্য ধরাবাঁধা। খাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি 'fletcherize' করতেন – আমেরিকার হোরেস ফ্লেচার উদ্ভাবিত খাবার চিবানোর তখনকার দিনের এক ফ্যাশন, যেখানে খাবার মুখে নিয়ে এত বেশি সময় ধরেই চিবানো হতো যে তা তরল স্যুপের মতো হয়ে গলা দিয়ে নেমে যেত। কাফকা বিশ্বাস করতেন, এতে হজমের ওপর সবচেয়ে কম চাপ পড়ে আর খাবার থেকে সবচেয়ে বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়।

পেরেজ আলভারেজের দাবি, কাফকার ছিল একধরনের split personality – ভগ্নমনস্ক (schizophrenic) বিভাজিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'রূপান্তর' গল্পসহ অন্য আরো কিছু লেখার বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপারগুলো তাঁর ওই বিভাজিত ব্যক্তিতার কারণেই লেখা সম্ভব হয়েছে – এমন দাবি এই 'ক্লিনিক্যাল' ব্যাখ্যাদাতাদের। ১৯১৩-এর ২১ জুনের ডায়েরিতে কাফকা লিখছেন:

> আমার মাথার মধ্যে কী ভয়ংকর এক পৃথিবী। মাথা ছিঁড়ে-ফেঁড়ে না ফেলে আমি কী করে নিজেকে মুক্ত করব, ওই পৃথিবীকে [মাথা থেকে] মুক্ত করে আনব! আর মাথার ভেতরে ওগুলোকে ধরে রাখার বা কবর দেওয়ার চেয়ে হাজার গুণে ভালো মাথা ছিঁড়ে-কেটে টুকরো করে ফেলা। আমি যে সে কাজের জন্যই এখানে [এ পৃথিবীতে] আছি, তা আমার কাছে একদম পরিষ্কার।

যৌন বিষয়ে কাফকার ঘৃণা, অপরাধবোধ এবং একই সঙ্গে তার অনেকবার পতিতালয়ে যাওয়া, পর্নোগ্রাফির প্রতি আগ্রহ – এসব নিয়েও কম গবেষণা হয়নি। পাশাপাশি অনেকে এমন দাবিও করেছেন যে কাফকার খাওয়া-সংক্রান্ত অসুখ ছিল। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মানফ্রেড ফিখ্‌টার তো 'প্রমাণ হাজির করেছেন যে...কাফকা anorexia nervosa-র (খাদ্যভীতির মানসিক অসুখ, যার পরিণতিতে বিপজ্জনকভাবে মানুষ শুকিয়ে যায়) ব্যতিক্রমী এক লক্ষণে' ভুগতেন। তাঁর আরো দাবি, কাফকা শুধু 'নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতার রোগেই ভুগতেন না', মাঝেমধ্যে 'আত্মহত্যাপ্রবণও' ছিলেন। অনেক গবেষকেরই দাবি, কাফকা ছিলেন 'হাইপোকন্ড্রিয়াক' (কোনো আপাত-কারণ ছাড়াই যে মানুষ তার অসুখ আছে বলে কল্পনা করে ও অহেতুক উৎকণ্ঠায় ভোগে)। অন্তত একবার যে কাফকা আত্মহত্যা করার সংকল্প করেছিলেন, ১৯১২ সালে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কাফকার এই বিষণ্ণ, মলিন চেহারাটি প্রতিনিধিত্ব করছে বিশ শতকের (এবং একুশ শতকেরও) আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের, যেমনটি উনিশ শতকের জন্য করেছিলেন ম্যানিক ডিপ্রেশন ও বাইপোলার ডিজঅর্ডারে ভোগা ব্রিটিশ কবি, অসুখী লর্ড বায়রন। 'কাফকায়েস্ক' বিশেষণটি 'বায়রনিক' বিশেষণের মতোই অকাট্য ও জোরালো। তবে বায়রনের অভিজাত, অনিষ্টকর ইমেজের (যা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারগুলোকে তাচ্ছিল্য করছে) চেয়ে কাফকার ইমেজটি অনেক বেশি সার্বজনীন। কাফকার অতি মামুলি জীবনীর দিকে তাকালেই মনে হয় যে তিনি আমাদেরই একজন: অতি সাধারণ এক জীবনের বৃত্তে বন্দী থেকে তিনি অনুভব করে গেছেন সাধারণ সব ভয়, দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা ও হতাশা; আমরা তাঁকে সহজেই বুঝতে পারি, কারণ তাঁর অনুভবগুলো আমাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি খাপে খাপে না-ও মেলে, তবু আমাদের ভয়-শঙ্কা ও দুঃস্বপ্নগুলোর সঙ্গে মেলে তো বটেই।

কাফকা নিয়ে যা কিছু মিথ (বায়রনকে নিয়ে মিথের মতই); তা কাফকার নিজেরই গড়ে তোলা। ওই মিথগুলোর পেছনে কাফকার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভূমিকা না থাকলেও, তিনি তাঁর চিন্তার মধ্যে তাঁর রোজকার অভিজ্ঞতার যেভাবে রূপ দিয়েছিলেন, তারপর লেখনীতে সেগুলো যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন (প্রথমত তাঁর নিজের জন্য, আর পরে সবার পড়ার জন্য), তাতেই দাঁড়িয়ে গেছে মিথগুলো। সে কারণেই কাফকার গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলো থেকে তাদের লেখককে আমরা আলাদা করতে পারি না। তাঁর উপন্যাসের নায়কদের নামগুলোও (লেখার তারিখের ক্রম মেনেই) ধাপে ধাপে ছোট হয়ে আসে: *আমেরিকা* উপন্যাসের কার্ল রসমান থেকে *বিচার* উপন্যাসের জোসেফ কে. থেকে *দুর্গ* উপন্যাসের কে.। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল একবার: ১৯২২-এর জানুয়ারিতে কাফকা একটা হোটেলে চেক-ইন করছেন, দেখলেন যে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁর বুকিং ভুলভাবে পড়ে, তাঁর নামের জায়গায় লিখে রেখেছে 'জোসেফ কে.' (Joseph K[afka])। কাফকা ডায়েরিতে লিখলেন: 'আমার কি ওদেরকে ঠিক করে দেয়া উচিত, নাকি ওরাই আমাকে ঠিক করুক'। এখানে বাক্যের দ্বিতীয় অংশে কাফকা তাঁর সহজাত কূটাভাস (paradox) করছেন: অর্থাৎ আমিই

হয়তো ভুল, আমার নাম আসলেই হয়তো জোসেফ কে., অতএব হোটেল কর্তৃপক্ষই আমাকে, আমার নামটাকে, ঠিক করুক, অর্থাৎ জোসেফ কে.ই রেখে দিক।

যেহেতু সাংস্কৃতিক আইকন 'ফ্রানৎস কাফকা' শেষ বিচারে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, সেহেতু এর বাইরে গিয়ে সত্যিকারের কাফকার ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ অনেক কঠিন এক কাজ। গল্প-উপন্যাসের আর ফেলিস ও মিলেনাকে লেখা অসংখ্য চিঠির সেই যন্ত্রণাকাতর কাফকা তাঁর বাস্তব জীবনের দক্ষ অফিস কর্মকর্তা, স্পোর্টসম্যান ও প্রাগের মোটামুটি খ্যাতিমান লেখকে পরিণত হওয়া কাফকার মতোই সত্য। বিষয়টি আসলে কাফকার প্রতিমাসুলভ ইমেজকে ঠিক করা বা না করার নয় (অর্থাৎ তাঁর বাস্তব ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের নয়), বরং আসল অর্থপূর্ণ কাজ হচ্ছে তাঁর লেখার মধ্যে ফেরত গিয়ে, ওগুলোর মধ্যেই দেখা যে, কীভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাগুলো ভেঙে ওই ইমেজ দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। তবে সচেতন পাঠককে সব সময় মাথায় রাখতে হবে, এভাবে কাফকার জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতাগুলোর সমান্তরালে তাঁর সাহিত্যকর্ম পড়ে যাওয়ার বিপদও আছে। মনে রাখতে হবে, তাঁর সাহিত্য তাঁর নিজের জীবন, সময় ও সমাজকে অনেক-অনেক বেশি গুণে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল বলেই কাফকা এখনো পৃথিবীতে বেস্টসেলার, এখনো এই ১০০ বছর পরেও মানুষ তাঁর লেখা পড়ে আর এখনো প্রতি ১০ দিনে তাঁর ওপর একটি করে নতুন বই বের হয় ('ভূমিকার আগে' অংশ দেখুন)।

কাফকা ও রাজনীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। ১৯১৪ সালের ২ আগস্টে কাফকার সেই কিংবদন্তিতুল্য ডায়েরি এন্ট্রি: 'জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে – বিকেলে সাঁতার।' এত বড় বৈশ্বিক ঘটনায়, যেখানে তাঁর নিজের দেশও যুদ্ধের অংশ, কাফকার কী নিরাসক্ত, উদাসীন, নিস্পৃহ উক্তি। একদিকে বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে সাঁতার – কিসের সঙ্গে কী? পড়তে গিয়ে মনে হয় হোরহে লুইস বোরহেসের সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম গল্প 'ট্‌লন, উকবার, অরবিস, টারটিয়াস'-এর শেষ অংশটুকুর কথা: ট্‌লন গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে এবং পৃথিবীর মাটিতে ট্‌লনের বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী উড়ে এসে পড়তে থাকার কারণে পৃথিবীর সর্বব্যাপী ধ্বংস নেমে আসছে; এমনকি পৃথিবীর স্কুলগুলোতে মানুষের ইতিহাসের জায়গায় ট্‌লনের ইতিহাস পড়ানো শুরু হয়েছে; ওষুধশাস্ত্র ও প্রত্নতত্ত্ব পড়ানোর বিষয়বস্তু বদলে গেছে, সামনে বদলে যাবে জীববিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র। এমন এক চরম ও চূড়ান্ত বিপৎসংকুল মুহূর্তে বোরহেস গল্পটি শেষ করছেন এভাবে:

> এরপর পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষা। পৃথিবী হয়ে যাবে ট্‌লন। তবে আমার এসবে কোনো মনোযোগ নেই; আমি আদ্রোগের হোটেলে বসে, শান্ত-স্থির দিনগুলোয়, ব্রাউনের *Urn Burial* বইটির...অনুবাদের (যা আমার প্রকাশ করার ইচ্ছা নেই) কাজ সংশোধন করে যেতে লাগলাম।

কাফকার মতোই আরেক মহান লেখক বোরহেসেরও রাজনীতি বিষয়ে কী নিরাসক্ত ভঙ্গি! পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর উনি কোথাকার সতেরো শতকের এক লাশের আচার-সংস্কারের ওপরে লেখা বই অনুবাদ করে যাচ্ছেন, তাও কিনা যে অনুবাদ তাঁর প্রকাশ করার ইচ্ছা নেই। চারপাশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, আর কাফকা বিকেলে সাঁতার নিয়ে ব্যস্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে কাফকা ক্লাব মলাদিচ্ নামের চেক এক নৈরাজ্যবাদী, সামরিকতন্ত্র-বিরোধী সংগঠনের বেশ কিছু মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। হুগো বার্গম্যান, যিনি কাফকার সঙ্গে একই স্কুলে গেছেন, ১৯০১ সালে কাফকার থেকে আলাদা হয়ে যান। তিনি লিখেছেন: 'কাফকার সমাজতন্ত্র আর আমার জায়োনিজম – দুটোই খুব কড়া ধাঁচের।...জায়োনিজম ও সোশ্যালিজমের মিশেল করে কোনোকিছু এখনো উদ্ভাবিত হয়নি।' চেক নৈরাজ্যবাদীদের (anarchist) বিষয়ে কাফকা পরে ডায়েরিতে লিখেছেন: 'এরা সবাই মানুষের সুখ আদায় করার সংগ্রাম করছে, এজন্য এরা কোনো ধন্যবাদও পাবে না। আমি এদের বুঝি। কিন্তু...এদের পাশে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে আর মিছিল করে যাওয়া সম্ভব নয়।'

চেকোস্লোভাকিয়ায় কম্যুনিস্ট শাসনের সময় (১৯৪৮ থেকে ১৯৮৯) কাফকার সাহিত্যকর্ম পুরো ইস্টার্ন ব্লক বা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট ব্লকের দেশগুলোতে নিষিদ্ধ করা হবে কি হবে না, তা নিয়ে বিরাট বিতর্ক ছিল। যখন শাসকেরা ভেবেছেন যে কাফকা তাঁর সাহিত্যে পতনশীল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখেছেন, তখন কাফকা পড়ানো গেছে। যখন তারা এর উল্টোটা ভেবেছেন, কাফকা তখন নিষিদ্ধ হয়েছে। আরনস্ট্ পয়েলের বিখ্যাত কাফকা জীবনীগ্রন্থ *A Nightmare of Reason* (১৯৮৪) বইটির একেবারে শেষে পয়েল লিখছেন: 'মৃত্যুতেও কাফকা তাঁর বাবা-মায়ের কাছ থেকে পালাতে পারেননি। তাঁরা তার সঙ্গে আছেন একই কবরে, কবরফলকও একটিই। এই বিড়ম্বনা অবশ্য অবাক করে না, কারণ আমরা দেখি যে তাঁর নিজের শহরেই কাফকার কবরকে কীভাবে সম্মান করা হয়েছে, ওদিকে তাঁর লেখা কীভাবে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে।'

কম্যুনিস্ট চেকোস্লোভাকিয়ার জন্য কাফকা-সাহিত্যের আরেক বড় উপাদান 'বিচ্ছিন্নতাবোধ' (alienation) তাদের বড় ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিল। কম্যুনিস্টরা ভাবত, কাফকা তাঁর লেখায় যে অ্যালিয়েনেশনকে চিত্রিত করে গেছেন তা কম্যুনিস্ট সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে; কারণ কম্যুনিস্ট সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ বা নিরাসক্তির কোনো জায়গাই নেই, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে। কাফকার আশিতম জন্মদিনে, ১৯৬৩ সালে, তাঁরা মনস্থির করলেন, অতএব, কাফকার লেখার আমলাতান্ত্রিক চিত্রণ নিয়ে কথা বলতে হবে। কাফকার মূল লেখাগুলোর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিস্তর হয়েছে, কিন্তু তিনি আদতে কোনো রাজনৈতিক লেখক কি না তা নিঃসন্দেহে একটি বিতর্কিত বিষয়।

ইহুদিত্ব ও জায়োনিজম

ইহুদি ধর্মের সঙ্গে কাফকার সম্পর্ক – তা ইদ্দিশ নাটক দেখে তাঁর মোহগ্রস্ত হওয়ার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ হোক কিংবা মার্টিন বুবারের 'সাংস্কৃতিক জায়োনিজম' আন্দোলনে বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই হোক কিংবা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাক্স ব্রড ও হুগো বার্গম্যানের সরাসরি জায়োনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়েই হোক – ইদানীংকালের কাফকা-গবেষণার অন্যতম বড় একটি বিষয়। কাফকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই চালাতেন প্রাগের জায়োনিস্ট সংবাদপত্র *Selbstwehr* (Self-Defence বা আত্মরক্ষা)। এঁদের সঙ্গে কাফকা জায়োনিস্ট মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন অনেকবার; ১৯১৩ সালে ভিয়েনায় এগারোতম জায়োনিস্ট কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, হিব্রু পড়েছেন, এমনকি ডোরাকে নিয়ে প্যালেস্টাইনে গিয়ে বাস করার স্বপ্নও দেখেছেন। কাফকার অনেক লেখায়, যেমন *গল্পসমগ্র*-এর এই প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'শিয়াল ও আরব', 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন' ও 'গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি' গল্পে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 'একটি কুকুরের তদন্তমালা' ও 'চীনের মহাপ্রাচীর' গল্পে তখনকার জায়োনিস্ট মহলে চলমান বিতর্কগুলো আমরা দেখতে পাই, আর ওগুলো মূলত (প্রাথমিক অর্থে) জায়োনিস্ট পাঠকদের জন্যই লেখা হয়েছিল মার্টিন বুবারের সাময়িকী *Der Jude* (The Jew বা ইহুদি)-এর কাফকা একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন এবং ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে এই পত্রিকায় তিনি বেশ কটি গল্প প্রকাশ করেন।

কাফকার 'যন্ত্রণা', তাঁর লেখায় নিজেকে পীড়িত করার, কষ্ট দেওয়ার শ্লেষাত্মক বর্ণনা, তাঁর 'বিভাজিত' ব্যক্তিত্ব, এই সবকিছু তখনকার দিনের মধ্য ইউরোপের ইহুদিদের 'আত্মসমালোচনা' ও 'আত্ম-ঘৃণার' যে সংস্কৃতি চালু ছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। ১৯১০ সালের *Selbstwehr* পত্রিকা ঘেঁটে দেখা গেছে, কাফকার অঞ্চলের (বোহেমিয়া রাজ্যের – প্রাগ ছিল এর রাজধানী) ইহুদিদের প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে: 'আপনি যদি শোনেন যে তারা তাদের সঙ্গী ইহুদিদের নিয়ে কী বলছে, আপনার মনে হবে আপনি পৃথিবীর এক নম্বর ইহুদিবিদ্বেষী (anti-semitic) কারো সঙ্গে আছেন।' কাফকার মধ্যেও যে একই প্রবণতা ছিল, তা তাঁর লেখা ও ডায়েরির পাতায় স্পষ্ট। তখনকার পশ্চিম ইউরোপীয় ইহুদিরা সবাই 'দলগত সংশয়'-এ ভুগতেন – চেক জাতীয়তাবাদী সংখ্যাগুরুরা ইহুদিদের মনে করত তারা ধর্মাচার মেনে গোপনে মানুষ খুন করে; এই সংখ্যাগুরুরা মাঝেমধ্যে ইহুদিদের মেরেও বসত (কাফকার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু তার ছোটবেলায় ইহুদিবিদ্বেষী এক আক্রমণে চোখের দৃষ্টি হারান); ইহুদিদের ব্যঙ্গ করে বলা হতো 'ছারপোকা', 'কুকুর', 'শিম্পাঞ্জি', ও 'ইঁদুর' (লক্ষণীয় যে এই চারটি প্রাণী নিয়েই কাফকা তাঁর বিখ্যাত চারটি গল্প লিখেছেন, যদি আমরা 'রূপান্তর' গল্পের অনিশ্চিত প্রজাতির পোকাটিকে ছারপোকা হিসেবে ধরি)। সংখ্যাগুরুদের হাতে এসব লাঞ্ছনার জবাব দেওয়ার জন্য ইহুদিদের কোনো শক্ত ধর্মীয় প্ল্যাটফর্ম ছিল না। প্রাগের ইহুদিদের তখন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ কিংবা আত্মহত্যা করা ছিল অনেক নৈমিত্তিক ঘটনা। কাফকা ডায়েরিতে লিখেছেন 'আমার ক্লাসে সম্ভবত

মাত্র দুজন সাহসী ইহুদি ছেলে ছিল, এরা দুজনই স্কুলে থাকতেই কিংবা স্কুল ছাড়ার কিছুদিন পরে গুলিতে আত্মহত্যা করে।'

ইহুদিত্ব ও জায়োনিস্ট আন্দোলন নিয়ে কাফকার মুগ্ধতার পাশাপাশি, আমরা তাঁর ডায়েরিতে অন্য রকম কথাও দেখতে পাই: 'আমার সঙ্গে ইহুদিদের কোনো মিল আছে কি? আমার নিজের সঙ্গেই আমার কিছুর মিল নেই; আমি যে শ্বাস নিতে পারছি এটুকু ভেবেই তো আমার উচিত খুব চুপচাপ এক কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।'

Excavating Kafka বইতে হয়েস বলছেন, কাফকা তাঁর নিজের ইহুদিত্ব বিষয়ে খুব সচেতন থাকলেও, তাঁর লেখার ইহুদি ব্যাখ্যা করা ভুল হবে, কারণ, হয়েসের মতে, তাঁর লেখায় ইহুদি চরিত্র, দৃশ্য বা থিম অনুপস্থিত। প্রখ্যাত সাহিত্যবোদ্ধা হ্যারল্ড ব্লুম এ কথার বিপরীতে বলেন যে, যদিও কাফকা তাঁর ইহুদি উত্তরাধিকার নিয়ে বিব্রত ছিলেন, তবু তিনি 'মূলত একজন ইহুদি লেখক'। পাভেল আইজ্নার, কাফকার প্রথম দিককার অনুবাদকদের একজন, তাঁর *বিচার* উপন্যাসকে বলছেন যে এটি 'প্রাগে ইহুদিদের ত্রিধারা অস্তিত্বের এক মূর্ত প্রকাশ...নায়ক জোসেফ কে. এখানে (রূপকার্থে) গ্রেপ্তার হলেন একজন জার্মানের (রাবেনস্টাইনার), একজন চেকের (কুলিচ) এবং একজন ইহুদির (কামিনার) হাতে। আধুনিক পৃথিবীর ইহুদিদের "অপরাধহীন অপরাধবোধের" (guiltless guilt) প্রতিমূর্তি জোসেফ কে., যদিও উপন্যাসটির কোথাও এমন কোনো প্রমাণ নেই যে জোসেফ কে. একজন ইহুদি।'

মৃত্যু

১৯১৭ সালের আগস্টে কাফকার স্বরযন্ত্রের ক্ষয়রোগ (যক্ষ্মা) ধরা পড়ে। ১৯১৮-এর অক্টোবরে তিনি স্প্যানিশ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর একদম কাছাকাছি চলে যান। উল্লেখ্য, স্প্যানিশ ফ্লুতে সে সময় শুধু জার্মানিরই আড়াই লাখ লোক মারা গিয়েছিল। টানা কয়েক সপ্তাহ ১০৬ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় কাটে তাঁর। আমরা তাঁর যক্ষ্মার প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। ১৯১৭-র আগস্টের পর কাফকা তাঁর বাবা-মায়ের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসেন, এরপর বোন ওট্লার কাছে, গ্রামে, গিয়ে থাকেন আট মাস। আবার ফিরে আসেন বাবা-মায়ের কাছে, এরপর প্রাগ ও আধা-স্বাস্থ্যনিবাস ধরনের নানা হোটেলের (যক্ষ্মা উৎপীড়িত পুরোনো ইউরোপে ওরকম হোটেলের কমতি ছিল না) মধ্যে বারবার আসা-যাওয়া; তারপর সত্যিকারের ডাক্তারি স্বাস্থ্যনিবাস হয়ে বার্লিনে ডোরা ডিয়ামান্টের সঙ্গে কয়েক মাস।

১৯২৪-এর মার্চে তিনি খুব অসুস্থ অবস্থায় বার্লিন থেকে প্রাগে ফিরে আসেন। এখানে পরিবারের সবাই, বিশেষ করে তাঁর প্রিয়তম ছোট বোন ওট্লা, তাঁর দেখভাল করেন। ১০ এপ্রিল কাফকাকে নেওয়া হয় ভিয়েনার কাছে কিয়েরলিংয়ে ডক্টর হফমানের স্যানাটোরিয়ামে। কাফকার সঙ্গে ছিলেন প্রেমিকা ডোরা ও রবার্ট ক্লপস্টক (১৯২১-এ

চেকোস্লোভাকিয়ার মাতলিয়ারি স্যানাটোরিয়ামে কাফকার চেয়ে ১৬ বছরের ছোট মেডিক্যাল ছাত্র রবার্টের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। রবার্ট ওখানে নিজের যক্ষা সারাতে এসেছিলেন। ম্যাক্স ব্রডকে লেখা কাফকার চিঠিতে জানা যায়, কাফকা এই ছেলেটির মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্যিক ফ্রানৎস ভেরফেলকে খুঁজে পেয়েছিলেন। কাফকা, ডোরা ডিয়ামান্ট ও রবার্ট ক্লপ্‌স্টক – এই তিন মিলে আমাদের 'ছোট পরিবার'; তিনি জীবনের শেষ বছরে এ রকমই বলতেন। রবার্ট ক্লপ্‌স্টক ১৯৭২ সালে আমেরিকায় মারা যান)। এই স্যানাটোরিয়ামেই ১৯২৪-এর ৩ জুন কাফকা মৃত্যুবরণ করেন। না খেতে পারাই ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ: গলার অবস্থা ক্ষয়রোগে এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি দীর্ঘদিন কোনোকিছু গলা দিয়ে নামাতে পারেননি, আর অন্য কোনোভাবে শরীরে খাবার ঢোকানোর পদ্ধতিও তখনো আবিষ্কার হয়নি। তাঁর মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণটি এরকম:

> সোমবার ২রা জুন, কাফকার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি 'এক অনশন-শিল্পী' বইটির প্রুফ দেখে কাটান।...কিন্তু পরদিন ভোর চারটার দিকে ডোরা লক্ষ করেন, কাফকা ঠিকভাবে শ্বাস নিতে পারছেন না। ডোরা তখন ক্লপ্‌স্টিক ও ডাক্তারকে খবর দেন; ডাক্তার কাফকাকে কর্পূরের ইনজেকশন দেন।
>
> কাফকা খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তিনি ক্লপ্‌স্টিককে বকতে থাকেন, জানতে চান তাঁকে কেন সেই প্রতিশ্রুত মরফিন দেওয়া হচ্ছে না। 'তুমি আমাকে সব সময় কথা দিয়েছ। গত চার বছর ধরে তুমি আমাকে কথা দিয়ে আসছ। আমাকে তুমি জ্বালাচ্ছ, সব সময় তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে আসছ। তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলব না। তাহলে তা-ই হোক, ওটা [মরফিন] ছাড়াই আমি মারা যাব।' তাঁকে তখন মরফিনের দুটো শট দেওয়া হয়, কিন্তু তখনো তিনি বলছেন: 'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরো না। তুমি আমাকে রোগ সারানোর ওষুধ [অ্যান্টিডোট] দিচ্ছ।' এরপর শেষ একটা স্বচ্ছতার খিঁচুনি, তিনি রবার্ট ক্লপ্‌স্টকের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন: 'আমাকে হয় মেরে ফেলো, না হলে তুমি খুনি' (Kill me, or else you are a murderer)।
>
> শরীরে মরফিনের কাজ শুরু হলে কাফকা ক্লপ্‌স্টককে তাঁর বোন এলি বলে ভাবা শুরু করেন, ভয় পান যে এলির মধ্যেও এই অসুখ ছড়িয়ে যাবে: 'বেশি কাছে এসো না এলি, বেশি কাছে না... হ্যাঁ, ওখানে থাকো, ওটাই ঠিক আছে।'
>
> ২ তারিখেই, অমানুষিক কষ্ট করে কাফকা তাঁর বাবা-মায়ের কাছে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন, চিঠিতে তাঁর শারীরিক অবস্থার নিখুঁত বিবরণ দেন, তাঁরা তাঁকে দেখতে আসবেন কি না, এলে লাভ কী আর ক্ষতি কী, এ দুয়ের যুক্তি-তর্ক তুলে ধরে শেষে তাদের না আসতে বলেন। চিঠিটি তাঁর হয়ে লেখা শেষ করেন ডোরা, যোগ করেন: 'আমি ওর হাত থেকে কলম নিয়ে নিলাম...'।
>
> ৩ জুন, রবার্ট ক্লপ্‌স্টকের দিকে তাঁর চিরাচরিত ঢঙে ঐ প্যারাডক্সিকাল চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পরে, ক্লপস্টক যখন ইনজেকশনের সিরিঞ্জ সাফ করতে যাচ্ছেন, কাফকা মিনতি জানান: 'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।' ক্লপস্টক বলেন: 'আমি যাচ্ছি না।' কাফকা উত্তরে বলেন: 'কিন্তু আমি যাচ্ছি'; তারপর তাঁর চোখ বন্ধ করেন।
>
> ৩ জুন, মঙ্গলবার, দুপুরের দিকে, তাঁর একচল্লিশতম জন্মদিনের এক মাস আগে, কাফকা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডোরা তখন প্রচণ্ড ভগ্নহৃদয়, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থা, কাফকার মৃত শরীর ছেড়ে যাবেন না; ক্লপ্‌স্টক একসময় ডোরাকে বিশ্রাম নিতে যাওয়ার জন্য জোর করতে থাকেন। 'শুধু ডোরাকে যারা চেনে, তারাই জানবে ভালোবাসার অর্থ কী,' এর কয়েক ঘণ্টা পরে ম্যাক্স ব্রডকে লেখেন ক্লপ্‌স্টক।

এই দফায় মাত্র এক সপ্তাহ লাগল কাফকাকে প্রাগে ফিরিয়ে আনতে। ১১ জুন তাঁকে সমাধিস্থ করা হলো প্রাগের জেলিড্‌স্কেহো রেলস্টেশনের পাশে নতুন ইহুদি কবরস্থানে। প্রায় ১০০ লোক জড়ো হয়েছিল তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। ম্যাক্স ব্রড সেখানে মৃত্যুর গাথা পাঠ করেছিলেন, আর যখন শবাধারটি কবরে নামানো হচ্ছিল, ডোরা নিজেকে কবরের মধ্যে বারবার ছুড়ে ফেলতে চাইছিলেন।

প্রাগের যে ছোট পৃথিবীতে কাফকা জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন, সেখানে তাঁর মৃত্যু নিয়ে শোক করা হলো। সবচেয়ে বড় দৈনিক *Prager Presse*-এ ৪ জুন ম্যাক্স ব্রডের লেখা শোকগাথা ছাপা হলো। জার্মান ভাষার পত্রিকাগুলোতে দীর্ঘ শোকসংবাদ বেরোল। ১৯ জুন প্রাগের জার্মান চেম্বার থিয়েটারে ৫০০-এর মতো লোক জড়ো হলো কাফকার স্মৃতিসভায়। ৫ জুন কাফকার প্রাক্তন প্রেমিকা, চেক ভাষায় তাঁর অনুবাদক, মিলেনা য়েসেন্‌স্কা প্রাগের চেক রক্ষণশীল দৈনিক *Narodny Listy*-তে কাফকার উদ্দেশে বিদায়বার্তা লিখলেন:

ডক্টর ফ্রানৎস কাফকা, প্রাগে বাস করা জার্মান লেখক, গত পরশু মারা গেছেন ভিয়েনার কাছে ক্লস্টারনুবার্গের কিয়েরলিং স্যানাটোরিয়ামে। অল্প মানুষই তাঁকে চিনতেন, কারণ তিনি চলতেন একা, সন্ন্যাসীর মতো – পৃথিবীর রীতিনীতি বিষয়ে সচেতন কিন্তু ওগুলোতে ভীত। কয়েক বছর ধরেই তিনি ভুগছিলেন ফুসফুসের অসুখে, অসুখটি তিনি সযত্নে লালন করতেন...এই অসুখ তাঁকে অনুভূতির এমন এক সূক্ষ্মতা দিয়েছিল, যাকে অলৌকিকের কাছাকাছি কিছু বলতে হবে, আর দিয়েছিল এমন এক আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা যার আপসহীনতার ব্যাপারটি ভয়-জাগানোর মতো কিছু হয়ে পড়েছিল...। আধুনিক জার্মান সাহিত্যের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লেখাগুলো তিনি লিখেছেন; এদের নগ্ন সত্যের কারণে, এমনকি যখন রূপক অর্থেও বলা হচ্ছে, তখনো মনে হয় সবকিছু কত স্বাভাবিক। এদের মধ্যে আছে এমন একজন মানুষের বক্রাঘাত (irony) ও ভবিষ্যদ্বক্তার অন্তর্দৃষ্টি (prophetic vision) যিনি দণ্ডিত ছিলেন পৃথিবীকে এতখানি এক চোখ-ধাঁধানো স্পষ্টতা নিয়ে দেখার কাজে যে, তিনি আর তা সইতে পারেননি, তাই মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন।

কাফকাকে কবর দেওয়া হলো সেই প্রাগেই, যেমনটা তিনি জানতেন ও ভয় পেতেন যে একদিন হবে। 'ছোট মায়ের থাবা' (কাফকা এভাবেই বলতেন প্রাগ সম্বন্ধে) একদম তিক্ত এক শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরে রাখল। এখন প্রাগের নতুন ইহুদি কবরস্থানে পাঁচ ভাষায় কাফকা-তীর্থযাত্রীদের তাঁর কবরে পৌঁছানোর রাস্তা দেখানো হচ্ছে। তিনি তাঁর বাবা-মায়ের কাছ থেকেও ছাড়া পেলেন না, এমনকি মৃত্যুতেও না; তাঁরা আছেন তাঁর সঙ্গে একই কবরে, একই কবরফলকের নিচে।

৩.

ফরাসিরা কেন কাফকা পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল?

১৯৪৬ সালে ফরাসি কম্যুনিস্টরা এক জরিপ চালিয়েছিল: 'কাফকা কি অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলা উচিত?' – এই শিরোনামে। তাদের যুক্তি ছিল, কাফকা 'অন্ধকারের সাহিত্যের' বিপজ্জনক প্রতিনিধিত্ব করছেন, সমাজে কাফকার খুব বাজে প্রভাব পড়তে পারে। খ্রিষ্টানরাও একই রকম কথা বললেন, এমনকি এরিখ হেলারের মতো পণ্ডিত মানুষও। গুন্টার অ্যান্ডার্স তাঁর আলোচনার উপসংহার টানলেন এই কথা বলে: 'পৃথিবীর যে ছবি কাফকা এঁকেছেন, সে রকম পৃথিবী বাস্তবে হওয়া উচিত নয়; তাতে মানুষের যে রকম আচরণ, সে রকম আচরণ হওয়া ঠিক নয়...ইতিবাচক কিছু হিসেবে তাঁর সাহিত্য কখনোই তাঁর নিজের বা অন্যদের কাজে আসবে না; তবে "সতর্কবাণী" হিসেবে আমাদের জন্য তা কাজে লাগতে পারে।'

ইতির বিপরীতে কাফকার এই নেতিবাচকতার কথা বলতে গেলে সেই ক্লিশে 'কাফকায়েস্ক' প্রসঙ্গই বারবার চলে আসে। আমরা যদি ১০০ রকমের ও ধরনের কাফকা-ব্যাখ্যা পাশে সরিয়ে রাখি, এ কথা তো অগ্রাহ্য করা যাবে না যে কাফকার লেখার একেবারে মূলে আছে আধুনিক পৃথিবীতে ব্যক্তির একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং অনাত্মীয় পরিবেশে 'এই পৃথিবীতে, এই শহরে, আমার পরিবারে পা রাখার ব্যাপারে পুরোপুরি অনিশ্চিত' (দেখুন এই বইয়ের 'যাত্রী' গল্পটি) মানুষদের কথা ও কাহিনি। কাফকা তাঁর পাঠকের মধ্যেও এই বিচ্ছিন্নতার বোধ জারিত করেন কী সুন্দরভাবে – তাঁর লেখায় কোনো দেশ, সময় বা স্থানের নাম থাকে না; এমনকি প্রকৃতির আইনও কাজ করে না (মানুষ পোকা হয়ে যায়), সামাজিক রীতিও মানা হয় না ('এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের বুড়ো ডাক্তার শীতের নগ্ন পৃথিবীতে 'এই সবচেয়ে অসুখী সময়ের তুষারের সামনে অনাবৃত হয়ে' অনন্তকাল ঘুরে বেড়ান); পারিবারিক নিয়মও শ্রদ্ধা করা হয় না (ছেলে বিয়ে করবে তাই বুড়ো বাবা 'রায়' গল্পে ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন)। আরো বেশি স্তম্ভিত হতে হয় তাঁর নিজের লেখা থেকে তাঁর দূরত্বের ব্যাপারটি দেখলে। তাঁর উদ্ভট, নিষ্ঠুর, অবিচারের ঘটনাগুলোয় আমরা দেখি লেখক কত নিস্পৃহভাবে অনুপস্থিত, কখনোই তিনি কোনো পক্ষ নিচ্ছেন না, কখনোই কোনো কিছুতে একটুও অবাক হচ্ছেন না; এর বদলে, সব সময় পক্ষপাতশূন্য, নৈর্ব্যক্তিক এক ভঙ্গিতে গল্প বলে যাচ্ছেন। তাঁর লেখা কেন প্রাসঙ্গিক, কেন আমরা তা পড়ব, এর উত্তরে কাফকার বিখ্যাত ডায়েরি এন্ট্রির কথাটাই মাথায় আসে। আমরা তা পড়ব, কারণ এতে ধরা আছে 'Das Negative meiner Zeit' – 'তাঁর সময়ের নেতিবাচকতা।' কাফকা ডায়েরিতে লিখছেন:

> আমি প্রচণ্ডভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছি আমার সময়ের নেতিবাচক বিষয়গুলো। এমন এক সময়ে আমি বাস করছি যা, অবশ্যই আমার অনেক কাছের, যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আমার কোনো অধিকার নেই, তবে – যেন বা – এই সময়টার প্রতিনিধিত্ব করার আমার অধিকার আছে।

কাফকার পৃথিবী এ রকম অ্যান্টি-পৃথিবী বলেই, তা ইতিহাসের নেতিবাচক দর্পণ বলেই ফরাসি কম্যুনিস্টরা কাফকা নিয়ে ওরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

'আমি সাহিত্যে গড়া'

আমরা ফ্রানৎস কাফকার *গল্পসমগ্র* পড়ব আর সাহিত্যচর্চা তাঁর কাছে কত বড় পূজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ এক এবাদত ছিল তা জানব না, তা হয় না।

কাফকার ডায়েরিতে ও চিঠিতে আমরা দেখি, যতবারই কাফকা বিয়ের চিন্তা করেছেন, ততবারই তাঁর সাহিত্যচর্চাই তাঁর কাছে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। কোনো ভাষাই নেই এটুকু সত্য বোঝানোর জন্য যে, সাহিত্য তাঁর কাছে তার বেঁচে থাকার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ার একবার এখন বার্লিনে কাফকার চিঠিগুলো এক হাতের-লেখা-বিশারদকে দেখতে দিলেন, সেই লোক বলেছিলেন, এই হাতের লেখা যার, তার 'সাহিত্যে আগ্রহ' আছে। ফেলিসকে কাফকা উত্তরে বলেছিলেন: 'আমার সাহিত্যে আগ্রহ নেই, আমি সাহিত্য দিয়েই গড়া। আমি আর অন্য কিছু না, অন্য কিছু হতেও পারব না।' তিনি মনে করতেন, বিয়ে করলে তাঁর জীবন থেকে সাহিত্যের জন্য প্রয়োজনীয় নির্জনতাটুকু তিনি হারাবেন। কিন্তু সেই নির্জনতা তিনি যখন খুঁজে পেতেন, তখনো সাহিত্য তাঁর কাছে কঠিন ও হতাশাজনক কিছুই হয়ে থাকত। কাফকার ডায়েরি তাঁর লেখার অক্ষমতা নিয়ে নিজেকে ভর্ৎসনায় ভরপুর। শুধু একবারই তিনি কোনো সচেতন চেষ্টা ছাড়া, স্বাচ্ছন্দে লিখতে পেরেছিলেন। সেই রাতটা ছিল ১৯১২ সালের ২২-২৩ সেপ্টেম্বর রাত; ২২ তারিখের রাত ১০টা থেকে ২৩ তারিখ সকাল ৬টা পর্যন্ত একটানা আট ঘণ্টায় তিনি লিখে ফেলেছিলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'রায়' এবং এটি লেখার মধ্য দিয়েই নিজের লেখনীশক্তি তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন – কাফকা কাফকা হয়ে উঠেছিলেন। পরদিন তিনি ডায়েরিতে লিখলেন: 'একমাত্র *এভাবেই* সম্ভব লেখালেখি, একমাত্র এরকম প্রাঞ্জলভাবেই, শরীর ও আত্মা এরকম সম্পূর্ণ খুলে দেওয়ার মাধ্যমেই।' তাঁর এই প্রথম সাহিত্যিক সাফল্য আসে ফেলিসের সঙ্গে পরিচয়ের মাত্র এক মাসের মধ্যে। তিনি ম্যাক্স ব্রডকে বলেন, গল্পের শেষ লাইনটি লেখার সময় – অর্থাৎ 'সে সময় সেতুটার উপর দিয়ে পার হচ্ছে রীতিমতো অফুরন্ত স্রোতে যানবাহন' – এই বাক্যের শেষ শব্দটি 'Verkher' (অর্থাৎ traffic বা যানবাহন) লেখার সময় তিনি ভেবেছিলেন 'শক্তিশালী এক বীর্যপাতের' কথা। 'Verkher' শব্দের জার্মান অর্থ একই সঙ্গে 'যানবাহন' ও 'বীর্যপাত' বা 'যৌনমিলন'। এখানে শব্দটি 'যানবাহন' অর্থে ব্যবহৃত হলেও, কাফকা

যেহেতু ব্রডকে এরকম কথা লিখেছেন, তাঁর মানে কি এই যে তাঁর যৌনকামনা, ফেলিস তা জাগ্রত করার পর, তাঁর লেখালেখির মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছিল?

সফল সার্থক লেখার অনুভূতি কাফকার জন্য শুধু ওরকম চূড়ান্ত আনন্দের কিছু ছিল, কেবল তা-ই নয়; সার্থক কোনোকিছু লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি তার জীবনের দুঃখ-কষ্ট থেকেও দূরে সরতে চাইতেন। প্রায়ই দেখা যেত কষ্টের কোনো ঘটনার পরেই কাফকার সৃজনীশক্তি জেগে উঠত। ফেলিসের সঙ্গে বাগ্‌দান ভেঙে যাওয়ার পরে, ফেলিসের বান্ধবী গ্রেটে ব্লখের সঙ্গে গোপনে প্রেম করবার শাস্তিস্বরূপ বন্ধুদের সঙ্গে হোটেলে 'বিচারপর্বে' (tribunal) বসার পরেই, তিনি লিখলেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস *বিচার* ও মারাত্মক গল্প 'দণ্ড উপনিবেশে' – দুটি কাহিনিই ন্যায়বিচারের মেটাফর (রূপক)। *দুর্গ* উপন্যাসটিও তেমন – এটি তিনি শুরু করেন মিলেনার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে হবে এমন সময়ে। লেখার মাধ্যমে জীবনের উচ্চতর দৃষ্টিকোণ অর্জন করে কাফকা তাঁর অর্থহীন আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মগ্লানি থেকে কিছুটা হলেও বাঁচবার পথ খুঁজে পেতেন। ১৯২২ সালে তিনি লিখলেন, লেখালেখির সান্ত্বনা এটাই যে এর মাধ্যমে 'খুনিদের লাইন' থেকে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন, আর সৃষ্টি করতে পারেন 'আরো উচ্চতর পর্যবেক্ষণের এক দেখার চোখ, উচ্চতর, ধারালোতর নয়; আর সেটা যত বেশি উঁচু হয়, খুনিদের লাইন থেকে (আমার অস্তিত্ব) তত দূরে সরে যায়; সেটা যত তার নিজের গতির আইন মেনে চলে, ততই তার পথ হয়ে ওঠে আরো অগণনীয়, আনন্দময় ও ঊর্ধ্বগামী।'

একই সঙ্গে কাফকা ভাবতেন যে লেখালেখি তাঁর কাছে নিজের 'মনশ্চিকিৎসা'র চেয়ে অনেক বেশি কিছু। লেখালেখির মধ্য দিয়ে 'নবযুগের' সূচনা হয় বলে ভাবতেন তিনি। ১৯১৬ সালে কাফকা তাঁর প্রকাশকের কাছে স্বীকার করলেন, 'দণ্ড উপনিবেশে' গল্পটি আসলেই বেদনাদায়ক একটি গল্প; ব্যাপারটা তিনি ব্যাখ্যা করলেন এভাবে: 'আমাদের ইতিহাসের এই যুগ, বিশেষ করে আমার এই সময়টি, সত্যিই অনেক বেদনাদায়ক।' পরের দিকে এসে তিনি তাঁর লেখালেখিকে বললেন 'ধাঁধায় ভরা এক মিশন'।

> *এক গ্রাম্য ডাক্তার*-এর মতো লেখা লিখে আমি এখনো খুব বেশি হলে ক্ষণস্থায়ী একধরনের তৃপ্তি পেতে পারি, এ ক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি যে ওরকম আরো লেখা আমার পক্ষে সম্ভব (যদিও খুবই অসম্ভব ঠেকছে ব্যাপারটা); কিন্তু সুখ পেতে পারি কেবল তখনই যখন আমার পক্ষে সম্ভব হবে পৃথিবীকে তার শুদ্ধ, সত্য ও পরিবর্তনের-অতীত রূপে তুলে ধরা।

এ কথার কী অর্থ (...'raise the world into the pure, the true, the unchangeable') তা বোঝা দুরূহ; তবে এটুকু পরিষ্কার যে লেখালেখি তাঁর কাছে ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ছিল। তিনি পৃথিবীর মূল সত্য, আদি ও অপরিবর্তনীয় মূল রূপটিকে – তা শুভ হোক আর অশুভ হোক, কিছু যায়-আসে না; অন্তত তাঁর কাছে সত্য রূপ বলে মনে হলেই হলো – তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাইছিলেন। তিনি যখন একই প্রসঙ্গে বলেন, লেখালেখি তাঁর কাছে 'প্রার্থনা'র মতো, তখন হঠাৎই বিভ্রম

বোধ হয় যে (যেমনটা কাফকার লেখার ধর্মীয় ব্যাখ্যাদাতারা বলেন), সত্যিই কি কাফকা নিজেকে 'পয়গম্বর' বলে মনে করতেন?

কাফকা-ব্যাখ্যা – ধর্মীয় ব্যাখ্যা

আগেই বলেছি, কাফকার সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়েছে অগুনতি রকমের। 'ভূমিকার আগে' অংশে বেশ কিছু কাফকা-ব্যাখ্যা অল্প ছুঁয়েও যাওয়া হয়েছে। কোনো কাফকা-ব্যাখ্যারই গভীরে যাওয়ার জায়গা এটি নয়; অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য ওই ছোঁয়াটুকুই যথেষ্ট। তার পরও যতগুলো কাফকা-ব্যাখ্যা হয়েছে (বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাফকা ব্যাখ্যার মোট ১৯ রকমের মূলধারা আছে), যেমন অস্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণবাদী ব্যাখ্যা (তিনি ডায়েরিতে লেখেন যে, 'রায়' গল্পটি লেখার সময়ে তাঁর মাথায় 'ফ্রয়েডের চিন্তা, স্বাভাবিকভাবেই' এসেছিল), মার্ক্সিস্ট ব্যাখ্যা, মেটাফিজিক্যাল ব্যাখ্যা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যা, অ্যাবসার্ড সাহিত্যিক ব্যাখ্যা, এক্সপ্রেশনিস্ট ব্যাখ্যা, সামাজিক ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, দার্শনিক ব্যাখ্যা, নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, আত্মজৈবনিক ব্যাখ্যা, আইনি ব্যাখ্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি, এর মধ্যে আজও অন্যতম জোরালো ব্যাখ্যা হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সূত্রের নিরিখে কাফকা-ব্যাখ্যা এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোকে কাফকা ব্যাখ্যার পাশাপাশি – টিকে আছে কাফকা-সাহিত্যের ধর্মীয় ব্যাখ্যা। মৃত্যুর পরে যেহেতু ম্যাক্স ব্রডের হাত ধরেই কাফকার বিশ্বসাহিত্যে প্রবেশ এবং ব্রড যেহেতু বিশ্বাস করতেন কাফকার লেখাকে দেখতে হবে 'ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে ব্যক্তিমানুষের ঈশ্বরকে খোঁজার আধ্যাত্মিক এক নিরন্তর সংগ্রাম হিসেবে', আর সেই সঙ্গে কাফকার প্রথম ইংরেজি অনুবাদক উইলা ও এডুইন মুইরও যেহেতু সেই বিশ্বাস মাথায় রেখেই কাফকা-অনুবাদ করেন, কাফকার ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি তাই রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে 'কাল্ট'-এর আকার ধারণ করে। আমরা এখানে কাফকার সৃষ্টিকর্মের আজও এই সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যাখ্যাটি নিয়ে সামান্য আলোকপাত করব।

এ বইতেই *ধেয়ান* নামের গল্পসংকলনে আছে কাফকার অন্যতম বিখ্যাত স্কেচ 'গাছ'। পুরো লেখাটি এ রকম:

> যেহেতু আমরা হচ্ছি তুষারে গাছের গুঁড়িগুলোর মতো। আপাত-চোখে ওগুলো কী সুন্দর, তুষারের উপরে, পড়ে আছে মাটিতে; আর হালকা একটা ধাক্কাতেই আমরা ওদের সরাতে পারব মনে হয়। না, আপনি তা পারবেন না, কারণ ওরা শক্ত করে মাটিতে গাঁথা। কিন্তু দেখুন, সেটাও স্রেফ আপাত-অর্থেই।

এই লেখার কী মানে হয়? নিট্‌শের মতোই কাফকা এখানে বলছেন, 'পৃথিবীর আর কোনো নিরাপদ ভিত্তি নেই, ভিত্তি সরে গেছে।' তুষারের মধ্যে বড় হওয়া গাছগুলো দেখে মনে

হচ্ছে ওরা দাঁড়িয়ে আছে শক্তপোক্তভাবে, কিন্তু ওদের ধাক্কা দিয়ে সরানো সম্ভব। তবে আমরা সরাতে চাইলেই গাছগুলো থেকে বাধা আসছে, মনে হচ্ছে আমাদের চেয়ে ওদের শিকড় আরো গভীরে পোক্ত। কিন্তু ওদের এই মাটির গভীরের শিকড় একটা 'ইল্যুশন' বা অলীক কল্পনা মাত্র। দেখতে যাকে সবচেয়ে পোক্ত ভিত্তির মনে হয়, তার ভিত্তি আসলে অত পোক্ত আদৌ নয়। নিট্‌শের ক্ষেত্রে এই হালকা ভিত্তির কারণ: ইউরোপে 'ঈশ্বর মারা গেছেন।' সেটা এ কারণে শুধু নয় যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস ধসে গেছে; বরং এ কারণেও যে মানুষ চাইছে – বিদ্রোহীর মতো – তাদের নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ঈশ্বরের হাত থেকে কেড়ে নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে। ইউরোপে ঈশ্বর-অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী তার আগের সেই স্পষ্ট দিগন্তরেখা, স্পষ্ট অর্থ এবং দৃঢ় ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। যুদ্ধ, নির্যাতন, ক্ষুধা, নিগ্রহ ও নির্বিচার অবিচারের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আর কোনো সূত্র নেই, শরণ নেই, কিসের বরাতে জীবনকে দেখব তার আর কোনো বিধিমালা নেই, মানুষ আর পারছে না পৃথিবীকে অন্ধকার পথের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ঠেকাতে; কোনো অভিভাবক নেই, কর্তা নেই, যিনি কিনা আমাদের জন্য তা ঠেকাবেন।

কাফকা বারবার ওরকম এক পরিস্থিতির ছবি এঁকেছেন যেখানে আমাদের অভিভাবক, আমাদের কর্তা, আরো আরো দূরে সরে গেছেন, অনতিক্রম্য দূরে, যেন নির্বাসনে। সে জন্যই কাফকার শ্রেষ্ঠতম একটি লেখা 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা'য় (এ বইয়ের এক *গ্রাম্য ডাক্তার* গল্পসংকলনে আছে) আমরা দেখি সম্রাট তাঁর বার্তাবাহককে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে, কিন্তু সেই 'অপরাজেয়', 'শক্তিশালী' বাহক নানা গোলকধাঁধার চক্করে পড়ে আমাদের কাছে মৃত সম্রাটের বার্তাটি আর পৌঁছাতেই পারল না। 'কিন্তু', গল্পটি এভাবে শেষ হচ্ছে, 'তুমি বসে থাকো তোমার জানালায়, আর যখন সন্ধ্যা নামে, তুমি স্বপ্নে কল্পনা করে নাও ঐ বার্তার'। ঈশ্বর যদি সত্যিই মারা গিয়েও থাকেন আমরা তবু ঐ ঐশ্বরিক বার্তার আশায় বসে থাকি; কিন্তু যখন কোনো বার্তা, কোনো সাহায্যই আসে না, যখন ধুম করে চাকরি হারিয়ে একটা পরিবার রাস্তায় ভিক্ষার জন্য বসে যায়, বা যখন বিনা বিচারে পুলিশ আমাদের কারাগারে ঢুকিয়ে দেয়, তখন আমরা মনে মনে কল্পনা করে নেই সে বার্তার, খোদার থেকে পাব এমন কোনো সান্ত্বনার।

কাফকার উপন্যাসগুলোতে আমাদের যিনি বাঁচাবেন তাঁর এই অনুপস্থিতি অধিকাংশ সময়েই ধর্মীয় রূপকল্পে তুলে ধরা হয়েছে। *আমেরিকা* উপন্যাসে নিউ ইয়র্ক শহরের গির্জা দেখা যাচ্ছে কুয়াশার মধ্যে ডুবে আছে, কিন্তু পোলান্ডারের গ্রামের বাড়িতে কোনো গির্জাই নেই, বিল্ডিংটার আধুনিকায়নের কাজে ওটা পরিত্যক্ত করে রাখা হয়েছে। *বিচার* উপন্যাসের ক্যাথেড্রালটি বিশাল, অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রায় ফাঁকা; জোসেফ কে.র কাছে ওটা মূলত একটা 'ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন'। কবরে রাখা যিশুর একটা ছবি, জোসেফ কে. টর্চলাইটের আলোয় ছবিটা টুকরো-টুকরোভাবে দেখতে পাচ্ছে, একবারে পুরোটা কখনো নয়, তারপর একসময় সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, কারণ ওটা ইদানীংকালের আঁকা একটা ছবি মাত্র। ক্যাথেড্রালের এই অন্ধকার দেখে আমাদের মনে পড়ে নিট্‌শের পাগলের সেই

সর্বনাশা কথা: 'চার্চগুলো এখন আর খোদার কবর ও মনুমেন্ট ছাড়া আর কী?' কাফকার শেষ উপন্যাস দুর্গতে আমরা দেখি কীভাবে তিনি কে.র নিজের শহরের চার্চের সঙ্গে এই দুর্গের তুলনা দিচ্ছেন। দুর্গটি দেখতে দুর্গের মতো লাগছে না। তাহলে দুর্গের চেহারা নিয়ে কে.-র যে প্রত্যাশা, তা মিটবে কীভাবে? দুর্গে তো অভিভাবকেরা থাকেন, তাঁদের থাকার জায়গার চেহারাই যদি অমন হয়, তাহলে তাদের নিজেদের চেহারা কেমন হতে পারে? তাহলে এই হচ্ছে গ্রামের মানুষের কর্তার ছবি? আর দুর্গটা যদিও গ্রামের পেছনে অনেক উঁচুতে, কিন্তু ওটা দেখতে তো গ্রামের থেকে আলাদা কোনো কিছু লাগছে না। কাফকা কি এখানে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে আজকাল মানুষ যে কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে (অর্থাৎ খোদা), তা আসলে তাদের নিজেদের কল্পনা দিয়েই গড়া কোনোকিছু?

বারবার কাফকার লেখার এই 'চার্চ' তাঁর সময়ের প্রাগের চিত্রকেই তুলে ধরে, তাঁর ইহুদি পরিবারকে নয়। কাফকার জন্মস্থানের কয়েক গজের মধ্যেই চারটি বিশাল বিশাল চার্চ, পুরো প্রাগ ভরে আছে বিশালায়তন সব চার্চে। খ্রিষ্টধর্ম তাঁর কাছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা হিসেবে একদম তাঁর চোখের সামনেই ছিল সব সময়। তবে তাঁর লেখায় যে চার্চগুলো আছে, তাদের কী ব্যাখ্যা, তা বলা দুরূহ। 'রায়' গল্পে গেয়র্গের বন্ধু থাকে রাশিয়ার পিটার্সবার্গে, অর্থাৎ পিটারের শহরে, আমাদের মনে আসে সেন্ট পিটার ও রোমের কথা। তারপর গল্পের সেই বিধ্বংসী দৃশ্য: কিয়েভ শহরের এক যাজক মানুষের অনেক বড় এক ভিড়ের সামনে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তার হাতের তালু কেটে একটা ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। কেন? আর গেয়র্গের বাবা যখন গেয়র্গকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, গেয়র্গ যখন সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামছে, তখন ঝি-ঝি চিৎকার করে উঠল: 'যিশু'; ব্রিজটা থেকে ঝুলন্ত গেয়র্গকে নিশ্চয় ঝুলন্ত ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতোই দেখতে লাগছিল। 'রূপান্তর' গল্পে পোকা হয়ে যাওয়া গ্রেগরের দিকে তাঁর অভিভাবক পিতা আপেল ছুড়ে মারলেন, সে তখন 'ঐ জায়গাতেই যেন পেরেকে গেঁথে গেল' – আবার সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি মনে আসে আমাদের। 'দণ্ড উপনিবেশে' গল্পে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির আলোকপ্রাপ্তি ঘটে 'ষষ্ঠতম ঘণ্টায়।' 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের অসুস্থ ছেলেটিকে জানালা থেকে তাকিয়ে দেখে দুটি ঘোড়া; আস্তাবলে যিশুর জন্মের উল্টো ছবি যেন। 'এক অনশন-শিল্পী' গল্পে অনশন-শিল্পী খায় না '৪০ দিন'। ঠিক ৪০ দিনই কেন? যিশুর জনহীন-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো, উপোস করা সেই ৪০ দিনের কথাই কি মনে আসে না এটি পড়লে?

বাইবেলের এসব পরোক্ষ-উল্লেখ বিভ্রান্তিকরই ঠেকে, মনে হয় কাফকা খ্রিষ্টধর্মের মূল্যবোধগুলো নিয়ে ক্রিটিক করছেন। নিট্‌শের পাঠক হিসেবে কাফকা নিঃসন্দেহে ধর্ম নিয়ে নিট্‌শের সমালোচনাগুলো (বিশেষ করে খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে করা যেগুলো) জানতেন। নিট্‌শে অস্বীকার করেছিলেন যে খ্রিষ্টধর্মের নৈতিক বিষয় ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আসমানি কোনো ব্যাপার আছে। নিট্‌শের হিসেবে নৈতিকতা বিষয়টি ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, কোনো অবিনশ্বর-একক নৈতিকতা বলে কিছু নেই, আর ধর্মীয় নৈতিকতার এত জয়গান এজন্য না যে ওগুলোর মধ্যে আহামরি কোনো উৎকর্ষতা আছে,

বরং এজন্য যে, যারা ওগুলো মেনে চলে তারা পৃথিবীতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষ হয়। নিট্‌শে আরো বলেন, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের যাজক জাতীয় লোকেরা মূলত অসুস্থ, প্রাণহীন, খোঁড়া মানুষ আর তারা তাদের ততোধিক দুর্বল শিষ্যদের ওপর খবরদারি চালায় তাদের কৌশলে, মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়ে। এই আলোকে দেখলে কাফকার 'রায়' গল্পের নিজেকে আহত করা সেই যাজক হয়ে ওঠে নিট্‌শের *The Genealogy of Morals*-এর অসুস্থ যাজকেরই একটি ছবি, যে যাজকের ক্ষমতার কেন্দ্রে আছে তার শিষ্যদের অসুস্থতার বোঝা বহনের গল্প। আমরা দেখি, 'রূপান্তর' গল্পের স্বার্থপর পরিবারটি যখন গ্রেগরের মৃত্যুর খবর পায়, তারা তাদের বুকে, স্বস্তিতে, ক্রুশচিহ্ন আঁকে। *আমেরিকা* উপন্যাসে কাজের মেয়ে ইয়োহান্না ব্রামার কার্লকে যৌনভাবে ব্যবহার করার পরে একটা কাঠের ক্রুশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করে। 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের ডাক্তার এটা ভেবে ব্যথিত যে তার রোগীরা তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস তাদের অপদার্থ যাজককে বাদ দিয়ে এখন এই বুড়ো ডাক্তারের ওপর অর্পণ করেছে:

> তাদের আগের সেই ধর্মবিশ্বাস তারা হারিয়ে ফেলেছে; যাজক বসে আছে বাড়িতে আর তার বেদিতে পরার পোশাক এক এক করে ছিঁড়ে ফেলছে; কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে তাদের আশা যে তিনি তার শল্যচিকিৎসকের নাজুক হাত দিয়ে সব অসম্ভবকে সম্ভব করে দেবেন।

কাফকার লেখায় – উপরের এসব খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে যোগাযোগের উদাহরণের পাশাপাশি – ইহুদিধর্ম ও জায়োনিজমের যোগাযোগের বিষয়টা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দুই ধর্মের তাত্ত্বিকেরাই যার যার মতো করে অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরেছেন কাফকার গল্প, উপন্যাস, ডায়েরি, চিঠি ঘেঁটে। জায়োনিস্ট আন্দোলনের মতো একটি বাস্তবভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি কাবালার (Kabbalah; ইহুদিদের গূঢ় রহস্যময় ধর্মীয় গুপ্তবিদ্যা) দৃষ্টিকোণ থেকেও কাফকাকে দেখা হয়েছে। *বিচার* উপন্যাসের দৃশ্যকল্পগুলো – যেমন এর বিচারকেরা, দ্বার রক্ষকেরা, এর ঘোঁরানো-প্যাঁচানো সিঁড়িগুলো – বলা হয়েছে কাবালার অনেক সূত্র ও মন্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়; যদিও কাফকা *বিচার* উপন্যাস লেখার সময়ে কাবালা বিষয়ে কতটুকু জানতেন তা নিয়ে বিরাট সন্দেহ আছে। কাফকার ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে খ্যাতিমান দার্শনিক ওয়াল্টার বেন্‌জামিন ও ধর্মতাত্ত্বিক গেরশোম শোলেম (বর্তমানে যাকে কাবালা-বিদ্যা ও আধুনিক জার্মান-ইহুদি চিন্তার অন্যতম বড় স্তম্ভ হিসেবে দেখা হচ্ছে)-এর মধ্যকার বিতর্কের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বেন্‌জামিন খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন ম্যাক্স ব্রড ও অন্যদের খাড়া করা 'অনায়াসলব্ধ' ধর্মীয় ব্যাখ্যা পড়ে (তিনি ব্রডের লেখা কাফকা জীবনীগ্রন্থটি অন্যদের পড়তেই মানা করেছিলেন; তাঁর হিসেবে এতই ফালতু ওই বই); তাঁর ভাষ্যমতে, কাফকার কল্পনাগুলো পৃথিবীতে ধর্মের উদ্ভব ঘটারও আগের সময়কার বিষয়, কাফকার চিন্তার সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের চিন্তার যোগাযোগ আছে, কাফকার এই 'প্রাচীনতা' (যদিও তিনি 'আধুনিকতাবাদী' বা মডার্নিস্ট লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ) ধর্ম ঘটবার আগের ঘটনা। আর শোলেম উত্তরে বলেছিলেন, যা-ই বলা

হোক না কেন, কাফকা ঐশ্বরিক বার্তার আলোকেই তাঁর পৃথিবীর ছবিটি এঁকেছিলেন, কিন্তু সেই বার্তার তিনি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে যেতে পারেননি, কারণ তিনি বার্তাটির ঠিকভাবে পাঠোদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শোলেমের মতে, কাফকা 'নেগেটিভ' বা 'নেতিবাচক' ধর্মতত্ত্বের বার্তাবাহক, ইতিবাচক ধর্মীয় বিশ্বাসের নয়।

যা-ই হোক, আপনি যতই কাফকা পড়বেন, বিশেষ করে তাঁর ডায়েরি, ততই আপনার কাছে পরিষ্কার হবে যে, কাফকার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মানুরাগী কারো খুশি হওয়ার কিছু নেই। আপনি ধাঁধায় পড়ে যাবেন এটা ভেবে যে, কাফকা কি ঈশ্বরের প্রশংসা করছেন, নাকি ঈশ্বরের সমালোচনা করছেন, নাকি ঈশ্বরের বাণী যে মানুষেরা বহন করে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ-অবিশ্বাস-সংশয় প্রকাশ করছেন? আর সেই সঙ্গে কাফকার ঈশ্বর কি খ্রিষ্টান ঈশ্বর, নাকি ইহুদি ঈশ্বর, নাকি অন্য কোনো ধর্মের ঈশ্বর? কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতিই তিনি মিত্রতা দেখাননি – এটুকু পরিষ্কার। যতজন ধর্মবেত্তা ও দার্শনিক কাফকার মন কেড়েছিলেন, তাঁর মধ্যে একমাত্র সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের (১৮১৩-১৮৫৫) সঙ্গেই ছিল তাঁর কিছুটা বিশেষ এক সম্পর্ক।

১৯১৩ সালে কাফকা প্রথম কিয়ের্কেগার্ড পড়েন। তিনি দেখতে পান যে ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌দান ভেঙে যাওয়ার ঘটনার (যার মূল উৎস ছিল বিয়ে করলে সাহিত্যচর্চায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে এমন একটা ভীতি) সঙ্গে ধর্মের টানে কিয়ের্কেগার্ডের রেজিনা ওলসেন-এর সঙ্গে বাগ্‌দান ভেঙে যাওয়ার ঘটনার মিল আছে। ১৯১৭-১৮ সালে তিনি নতুন করে কিয়ের্কেগার্ড পড়া শুরু করেন, ব্রডকে লেখা চিঠিতে বিস্তারিত লিখতে থাকেন কিয়ের্কেগার্ড প্রসঙ্গে। কাফকা বিশেষভাবে মুগ্ধ হন কিয়ের্কেগার্ডের *Fear & Trembling* বইয়ের পিতা-পুত্রের কাহিনি – হজরত ইবরাহিম ও তাঁর ছেলে ইসমাইলের কুরবানির কাহিনি – পড়ে। ছেলেকে কুরবানি দিতে রাজি হওয়ার মধ্যে দিয়ে ইবরাহিম সামাজিক নৈতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে (অর্থাৎ পুত্রহত্যা করতে রাজি হয়ে) তাঁর পিতৃসুলভ নৈতিকতাবোধ ছাড়িয়ে গিয়ে, খোদার সেবায় সবকিছু উৎসর্গ করতে সম্মত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রত্যয় খুব ভালোভাবেই সামাজিক নৈতিকতার বিপক্ষেও দাঁড়িয়ে যেতে পারে – এমনটাই বলেছিলেন কিয়ের্কেগার্ড। কাফকা বললেন অন্য কথা। ইবরাহিম-ইসমাইলের ঘটনায় তাঁর মনে হলো ধর্মবিশ্বাস আসলে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত একটি বিষয়, যার নির্ণয় শুধু খোদাই করতে পারেন; এখানে সামাজিক নৈতিকতার আগে – ঐ কুরবানির ঘটনায় – বিবেচনা করতে হবে ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে। কাফকার আরো মনে হলো, যে মানুষ তার চরিত্র দৃঢ় রাখতে পারে, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অটুট রাখতে পারে (যদিও বাবা-মা ও শিক্ষকেরা সব সময়ে চেষ্টা করেন এটা খর্ব করতে), সেই মানুষের প্রতি শয়তান ও ফেরেশতা, দুই-ই আকৃষ্ট হয়, এর ফলে তার পক্ষে পরম ভালো কাজ ও চরম খারাপ কাজ – দুটোই করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

কিয়ের্কেগার্ড এভাবেই কাফকাকে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো মানবসমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখার চশমাটা ধার দিলেন, ধর্মীয় কাঠামোর আয়তনে

জীবনকে দেখার স্পৃহা জাগালেন। কাফকা বুঝতে পারলেন, লেখালেখি শুধু নিজের জন্য নয়, শুধু নিজের সৃজনীক্ষুধা মেটাবার জন্য নয়, বরং এর মাধ্যমে বৃহত্তর মানবসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব, অর্থাৎ লেখালেখির কোনো উচ্চতর লক্ষ্যও থাকতে পারে। এভাবেই – উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাড়না থেকেই – কাফকার লেখালেখি তাঁর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, কাফকা তাঁর অস্তিত্বের একটা ন্যায্যতা খুঁজে পেলেন এর মধ্যে দিয়ে। তাঁর লেখার প্রয়োজনটা হয়ে উঠল অস্তিত্ববিষয়ক বা অস্তিত্ববাদী, বা ধার্মিক প্রয়োজন। *বিচার* উপন্যাস লেখার সময় তিনি ডায়েরিতে লিখলেন:

> দু বছর আগে যেমনটা ছিলাম [অর্থাৎ 'রায়' গল্প লেখার সময়ে] আজ আর আমি আমার লেখার মধ্যে সেরকম সুরক্ষিত অবস্থায় নেই...তার পরও আমি জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছি; আমার রোজকার শূন্য, পাগলাটে, ব্যাচেলরের মতো জীবনের একটা ন্যায্যতা খুঁজে পেয়েছি।

শেষ দিকের কাফকা শুধু তাঁর নিজের জীবনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি ও একটি কারণ বা ন্যায্যতা খুঁজে ফেরেননি, তিনি সেটি – পয়গম্বরদের মতোই – আমাদের সবারটার জন্যও হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। তিনি তখন নিজেকে দেখেছেন তাঁর সময়ের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে। ১৯১৮-র ২৫ ফেব্রুয়ারির নোটবুকে আমরা তাকে এক রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিশনের সঙ্গে লড়াইরত দেখি:

> আমি যদ্দুর জানি, জীবনের জন্য দরকারি এমন কিছুই আমি সঙ্গে আনিনি, শুধু এনেছি মানুষের চিরকালীন ও সর্বজনীন দুর্বলতাগুলো। এভাবেই...খুব শক্তিশালীভাবেই আমি আত্মস্থ করে নিয়েছি আমার সময়ের নেতিবাচক দিকগুলো...। কিয়ের্কেগার্ডকে যেভাবে খ্রিষ্টধর্ম – মানতেই হবে ওই ধর্ম এখন আলগা হয়ে পড়েছে, ব্যর্থ হচ্ছে – জীবনে হাতে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে, আমাকে তা নেয়নি; কিংবা জায়োনিস্টরা যেভাবে ইহুদিদের প্রার্থনার শালের প্রান্ত – ওটাও এখন আমাদের থেকে পালিয়ে যাচ্ছে – ধরতে পেরেছে, আমি তা পারিনি। আমিই শেষ কিংবা আমিই শুরু।

'আমিই শেষ কিংবা আমিই শুরু' – শেষ কথা

কাফকা যখন বলেন, তিনি হয় শেষ, না হয় তিনি শুরু, অর্থাৎ তাঁর মধ্যেই আছে একটা সমাপ্তি বা একটা আরম্ভ, তিনি পুরোপুরি ভুল বলেন না। তিনি অর্ধেক ঠিক কথা বলেন। একভাবে দেখলে তিনি সমাপ্তি তো বটেই: তাঁর পথ ধরে আর বেশি দূর যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়; যে ভয়ংকর পৃথিবী তিনি তাঁর মাথার মধ্যে বয়ে চলেছিলেন, তার সামান্য অংশ মাথায় আনলেও সাধারণ মানুষ স্ট্রোকে বা দুর্ঘটনায় মারা যাবে (এ প্রসঙ্গে কাফকার মৃত্যুতে মিলেনা য়েসেন্‌স্কার শোকবার্তাটি আবার পড়ুন)। কিন্তু থিমের দিক দিয়ে দেখলে, তিনি শুরু। তাঁর বিশাল ও মহান থিম – এর পূর্বপুরুষ নিট্‌শে ও কিয়ের্কেগার্ডে লুকানো থাকলেও, কথাসাহিত্যে কাফকার আগে কেউ তা ভাষা দেয়নি –

হচ্ছে এ পৃথিবীতে বাস করার শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক টেনশন। আমাদের সময়ের আধুনিকতা, উদারনৈতিক চিন্তাচেতনা এবং তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফাঁকিটা ও ফাঁকটা কাফকা ধরতে পেরেছিলেন। সেজন্যই হয়তো কাফকার লেখা ভর্তি পুরোনো প্রথা ও পুরোনো বিশ্বাসে: পিতা, পিতার শাসন, আদালত, বিচার, দুর্গ, সম্রাট, অবিনশ্বর আইন ইত্যাদি। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'চীনের মহাপ্রাচীর' (*গল্পসমগ্রর* দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন)-এ যূথবদ্ধ, একত্রিত এক জাতির কথা বলার সময়, সেই জাতির একজন হতে পারার 'মহান' ব্যাপারটির কথা জানানোর সময়, কীভাবে কাফকা কাব্যিক হয়ে ওঠেন! আর 'আইনের দরজায়' গল্পে ভেতরে প্রবেশের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে থেকে লোকটা যখন ব্যর্থ এক জীবন কাটিয়ে মারা যাচ্ছে, তখন এই বোকা কিনা দেখে যে 'আইনের দরজাপথ থেকে ভেসে আসছে অনির্বাণ একটা দীপ্তি।'

কাফকার মতো চালাক সম্ভবত আর কেউ ছিলেন না; তাঁর মতো স্বচ্ছতা নিয়ে বিশ্বব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার ফাঁকগুলোও আর কেউ বোধ হয় ধরতে পারেননি। কাফকার রসবোধ (সেন্স অব হিউমার) নিয়ে চিন্তা করলেই মজা হয়, কীরকম গুরুতর সব পরিস্থিতিকে কীরকম কমিক বানিয়ে ছেড়েছেন তিনি। প্রাগের 'ক্যাফে স্যাভয়' তে তিনি যখন বন্ধুদের সামনে *বিচার* উপন্যাসের শুরুটা পড়ে শোনাচ্ছেন, তখন তিনি ও তাঁর বন্ধুরা হেসে কুটিকুটি। কেন? ওরকম ভয়ংকর এক ঘটনা দিয়ে যার শুরু – এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে তার বিছানায় এক সকালে আগন্তুকেরা এসে গ্রেপ্তার করে বসল, বিনা কারণে – তা পড়তে গিয়ে কাফকা ওরকম হাসছিলেন কেন? 'গায়িকা জোসেফিন বা ইঁদুর-জাতি' গল্পে (এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত) সংগীতশিল্পী জোসেফিনকে নিয়ে কাফকা ওরকম মারাত্মক ব্যঙ্গ করেন কেন যে, জোসেফিন আসলে গান পারে না, সে অন্য ইঁদুরদের মতোই একটু কিচিরমিচির করে? জোসেফিন ভাবে সে তাঁর জাতির ত্রাণকর্তা, আর গল্পের কথক কিনা বলে, 'হায় খোদা, জোসেফিন যেন কোনো দিন জানতে না পারে, আমরা যে তাকে শুনি সেটাই প্রমাণ করে যে সে সত্যিকারের কোনো গায়িকা নয়।' এ কেমন কথা? গল্পে গল্পে কাফকার এই বক্রোক্তি, ঠাট্টা, শীতল রসিকতা কখনো কখনো আমাদের উঁচু লয়ের হাসিতে ফেটে পড়তেও বাধ্য করে (যেমন এই সংকলনের গল্প: 'রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান', 'এক ছোটখাটো মহিলা', 'দি স্টোকার', 'প্রথম দুঃখ', 'এক অনশন-শিল্পী', 'গায়িকা জোসেফিন')। কাফকার এই যে জার্মান ভঙ্গিতে রস বা হিউমার, যা কমেডিও নয়, বা চাতুর্যপূর্ণ রসিকতাও (wit) নয়, আসলে জীবনের খুঁতগুলো খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়ে সেগুলো নিরাসক্তভাবে মেনে নেওয়ার তাঁর যে ভঙ্গি – যেন তিনি বোঝেন যে কেবল তিনিই ওগুলো বোঝেন, কিন্তু আমরা বোকারা বুঝি না – তারই প্রকাশ। আজ বিশটি বছর ধরে কাফকা পড়ার পরে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, কাফকার রসবোধ যে বুঝবে, গল্পে গল্পে তাঁর বাঁকা উক্তি ও খোঁটা ও ব্যঙ্গগুলো যে ধরতে পারবে, সে-ই দাবি করতে পারবে, সে কাফকা বুঝেছে।

কাফকার সব প্রধান নায়কেরা দেখবেন একটা মতিবিভ্রমের মধ্যে আছে – পোকা গ্রেগর ভাবছে সে পোকা হয়ে গেছে তো কী হয়েছে, তাকে অফিসে যেতে হবে; জোসেফ

কে. তাঁর বিচার হবে বলে সারা জীবন অপেক্ষা করছে; কে. দুর্গের লোকদের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য জীবনটা বরবাদ করে দিচ্ছে; সম্রাটের বার্তাবাহক দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছেই; গ্রাম্য ডাক্তার যতক্ষণে খেলাটা বুঝতে পেরেছেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে; আইনের দরজায় ঐ বুদ্ধু দাঁড়িয়েই আছে এই অপেক্ষায় যে দরজাটা কবে খুলবে; দণ্ড উপনিবেশে মৃত্যুদণ্ডের পুরোনো প্রথায় বিশ্বাসী লোকটি ভাবছে এই পর্যটক তার ভয়ংকর বিচারব্যবস্থার পক্ষে রায় দিয়ে সব আবার ঠিক করে দেবেন। এদের কারো বিভ্রম, কারো ঘোরই, যেন কাটছে না। এ বইয়ের মোট ৪৬-৪৭টি গল্প-ছোট গল্প-স্কেচের ২৪টিতেই আমরা ওরকম মতিবিভ্রমের (delusion) মধ্যে থাকা চরিত্রের খোঁজ পাই। আমরা অবাক হই, হাসি, ওদের জন্য আমাদের মায়া হয়।

মজার কথা হচ্ছে, কাফকার এ রকম কোনো মতিবিভ্রম বা অলীক বিশ্বাস ছিল না। তিনি পৃথিবীকে অতি, অতি স্পষ্ট করে দেখে ফেলেছিলেন, যেভাবে দেখলে নিজের আর কোনো বিভ্রম থাকে না, কেবল তখন অন্যের বিভ্রম নিয়ে ঠাট্টা করা যায়। কাফকা জেনে গিয়েছিলেন যে ক্ষমতাশালীরা টিকে থাকে বিভ্রম ছড়িয়ে, মিথ্যা বলে আর ভয় দেখিয়ে; আর ক্ষমতাহীনেরা বেঁচে থাকে ঐ ক্ষমতাশালীদের যে ক্ষমতা আছে তা কল্পনা করে নিয়ে। এরা দুই পক্ষই বড় বড় কথা বলে, ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ে, কিন্তু ওদিকে এদের আন্ডারওয়্যারগুলো নোংরা, এদের প্রার্থনার পোশাকগুলো ধার করা, এদের বিচারালয়ে পর্নোগ্রাফি পড়ে থাকে সবার চোখের সামনে, এদের ন্যায়বিচারের মধ্যে মানুষ মেরে ফেলাও ন্যায়বিচারের লক্ষণ হিসেবে পড়ে। পার্থিব ক্ষমতাই শেষ কথা, বাকি সব দার্শনিকতা, ধর্ম, আন্দোলন – সব ফাঁকা বুলি; কাফকা খুব ভালোভাবে সেটা বুঝেছিলেন। তাঁর ভাষায় এটাকেই তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁর সময়ের 'নেতিবাচকতা'কে বুঝেছেন ও সেটির প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

যারা একবার কাফকা পড়েছেন তারা যে মুহূর্তে ধরে ফেলেন যে, কাফকা 'বুঝেছিলেন', কাফকা সত্যি জীবন, পৃথিবী, সমাজের সব খেলা 'বুঝেছিলেন', তখন তাঁর প্রতি মুগ্ধতা থেকেই তারা আর কখনো কাফকা ছাড়তে পারেন না। একসময় এই পাঠকেরা বুঝে যান যে, 'কাফকায়েস্ক' কথাটাও অর্থহীন, এ দুনিয়ার এত অনেক কিছুই 'কাফকায়েস্ক' যে, সেটার আর কোনো মানে থাকে না। বেকার যুবক যখন চাকরি পাওয়ার জন্য অফিসগুলোর বারান্দায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সেটাও 'কাফকায়েস্ক'; অসুস্থ রোগী যখন বড় হাসপাতালের বিরাট আয়োজনের মধ্যে কোনো ডাক্তার খুঁজে পায় না, যিনি তার সমস্যাটা বুঝবেন, সেটাও 'কাফকায়েস্ক'; টিভির পর্দায় ধুম করে যখন আমরা দেখি যে ক্ষমতাশালীরা কী সূক্ষ্ম কৌশলে সাধারণ মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, সেটাও 'কাফকায়েস্ক', আর আদালতের দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে আমরা যখন দেখি যে আমাদের ফাইলটা অসহায়ের মতো পড়ে আছে নিচের দিকে, সেটাও কাফকায়েস্ক; আর গভীর রাতে ঘুমের মধ্যে মোবাইল ফোন বেজে উঠলে যে ভয় নিয়ে আমরা সেটা ধরি, আর শুনি ওপাশে, পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে কে যেন বলে উঠছে 'হ্যালো', সেটাও 'কাফকায়েস্ক'।

আমরা পছন্দ করি কি না-করি, কাফকা আমাদের এই আধুনিক সংস্কৃতির এক অমোচনীয় অংশ হয়ে গেছেন। নিরাপত্তাহীনতা আর আতঙ্কের যে বোধ কাফকা আমাদের মধ্যে জারিত করে গেছেন, আত্ম-উন্নয়নের লাখো বইয়ের কোনোটি পড়েই সেই বোধ আমাদের আর কাটে না। তাঁর 'সেন্স অব হিউমার' হাসির ছলে আমাদের দেখিয়ে দেয় যে আমরা কত ভুল, কত বোকা। আমাদের পাপবোধ, হতাশা, ন্যায়বোধ, আশা, পাপমোচন ও ভালোবাসা – সবকিছুর মধ্যেই কত বড় আধ্যাত্মিকতার অভাব ও ফাঁকি। তাই কাফকার আধ্যাত্মিকতা আমাদের জন্য সান্ত্বনা হয়ে আসে। তাঁর কল্পনাশক্তির অদ্ভুত লজিক একই সঙ্গে আমাদের বুদ্ধি ও আবেগকে মথিত করে। আমরা বুঝি যে তাঁর নিজের জীবনের সংকট ও সমস্যাগুলো আমাদেরটার থেকে আলাদা কিছু নয়। আমরা বুঝি যে আমাদের মানবসমাজের হৃদয়টি আছে কাফকার ঐ ছোট কয়টি বইয়ের মধ্যেই। তাই আমরা মুগ্ধ হই, আলব্যের কাম্যুর কথার সঙ্গে একমত হই যে, কাফকা বারবার পড়ার জিনিস। 'আমরা কী?' এত বড় প্রশ্নের উত্তর যেহেতু সহজ হওয়ার কথা নয়, তাই আমরা কাফকা বারবার পড়ি – যুগে যুগে, দেশে দেশে।

পুনশ্চ

কাফকা সম্বন্ধে যারা আরো জানতে চান, তারা যেন তাঁর ওপরে লেখা ১৩ হাজারেরও বেশি বইয়ের হট্টগোলের মধ্যে হাবুডুবু না খান, তাই আমি আমার বিশ বছরব্যাপী কাফকাপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে এখানে মাত্র কয়েকটি বইয়ের সন্ধান দিচ্ছি। আমি নিজে যদি ১৯৯৫ সালের দিকে এ সন্ধানটি জানতাম, তাহলে জীবনের পাঁচ-সাতটি বছরে অসংখ্য 'কাফকা মিথে' ভরা, অনায়াসলব্ধ বিশ্বাসে ঠাসা, কাফকা গবেষণাগ্রন্থ পড়ে সময় নষ্ট করতাম না। আমাদের মাথায় রাখতে হবে কাফকার এক প্রধানতম জীবনীকার রাইনার স্টাখের কথা: 'সারা পৃথিবী জুড়ে প্রকাশিত অসংখ্য কাফকা "ভূমিকার" মধ্যে মাত্র তিন বা চারটিই পড়ার যোগ্য।' এ কথা আমি এখন নিজেও বিশ্বাস করি।

প্রথমে আমি কাফকার জীবনীর কথায়। ম্যাক্স ব্রডের *ফ্রানৎস কাফকা: একটি জীবনী* (Max Brod, *Franz Kafka: A Biography,* ১৯৪৭) অনেক সমালোচিত ও নিন্দিত একটি বই হলেও এটির অন্য বিশাল মূল্য আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে একমাত্র কাফকা-জীবনী এটিই। তাই পড়া উত্তম বা এখান থেকেই শুরু করা উত্তম।

এ ছাড়া যথেষ্ট ভালো বই আরনস্ট্ পয়েলের *নাইটমেয়ার অব রিজন* (Ernst Pawel, *The Nightmare of Reason: A Life of Franz Kafka,* ১৯৮৪)। রোনাল্ড হেয়ম্যান ও নিকোলাস মারের জীবনী দুটি অনেক জনপ্রিয় হলেও, পড়ার তেমন কোনো মানে হয় না।

তবে সবচেয়ে ভালো কাফকা-জীবনীগ্রন্থ রাইনার স্টাখের বইটি – Reiner Stach; *Kafka – The Decisive Years;* ইংরেজি অনুবাদ ২০০৫। জার্মান ভাষায় লেখা তিন খণ্ডের কাফকা জীবনীর এই দ্বিতীয় খণ্ডটিই এখন পর্যন্ত ইংরেজিতে বেরিয়েছে। তুলনাহীন ভালো বই। যদিও এর চেয়েও ভালো হচ্ছে পিটার আন্দ্রে অল্টের বিশাল বইটি – Peter-Andre Alt, *Der ewige sohn,* ২০০৫। ইংরেজিতে *The Eternal Son* নামের এ বইটির ইংরেজি অনুবাদ আজও কেন যে বের হয়নি, তা এক অবাক করা বিষয়। জার্মান ভাষার সর্বোচ্চ পুরস্কার পাওয়া এ বইটি সব কাফকা-মিথ ভেঙে দিয়েছে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে। জানা যায়, ইংরেজি অনুবাদ শিগগিরই বেরোচ্ছে। এর কল্পনাশক্তির সাহস ও বিশ্লেষণের গভীরতার কোনো তুলনা হয় না।

কাফকা সাহিত্যের বিশ্লেষণ বা গবেষণা নিয়ে খুব চমৎকার বইগুলোর মধ্যে পড়বে: (১) Ronald Gray-র *Franz Kafka* (১৯৭৩); (২) Mark Anderson সম্পাদিত *Reading Kafka - Prague, Politics, and the Fin De Siècle* (১৯৮৯); (৩) Ritchie Robertson-এর ছোট ১৩৬ পাতার বই *Kafka: A Very Short Introduction* (২০০৪), যা বিশাল আকারের অগুনতি কাফকা-পুস্তকের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট, স্বচ্ছ, ও সুন্দরভাবে সাজানো; (৪) Ritchie Robertson-এরই *Kafka: Judaism, Politics, and Literature* (১৯৮৫); (৫) Julian Preece সম্পাদিত *The Cambridge Companion to Kafka* (২০০২); (৬) W.J. Dodd সম্পাদিত *Kafka: The Metamorphosis, The Trial and The Castle – Modern Literatures in Perspective* (১৯৯৫); (৭) James Rolleston সম্পাদিত *A Companion to the Works of Franz Kafka* (২০০২); এবং (৮) অতি অবশ্যই Ronald Gray সম্পাদিত *Kafka - A Collection of Critical Essays* (১৯৬২) বইটি যেখানে চমৎকার এক 'ভূমিকা'র পরে এডুইন মুইর-এর 'To Franz Kafka' কবিতাটিই শুধু নেই, আরো আছে Erich Heller-এর 'The World of Franz Kafka'; Martin Buber-এর 'Kafka and Judaism'; এবং নোবেলজয়ী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান লেখক Albert Camus-এর অবশ্যপাঠ্য, চমৎকার প্রবন্ধ 'Hope and the Absurd in the World of Franz Kafka'।

ইংরেজি ভাষায় প্রধানতম কাফকা-গবেষক Ritchie Robertson ও Sir Malcolm Pasley -এর যেকোনো বই বা প্রবন্ধ নির্দ্বিধায় পড়তে পারেন। এদের দুজনেরই কাফকার ওপরে দখল পৃথিবীর যেকোনো কাফকা গবেষকের বা বোদ্ধার কাছেই ঈর্ষণীয় বিষয়। 'অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ড ক্ল্যাসিকস্' সিরিজে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত কাফকার *The Metamorphosis and Other Stories*; এবং *A Hunger Artist and Other Stories* নামের দুটি গল্পসংকলন এবং কাফকার তিনটি উপন্যাস *The Man Who Disappeared* (যার নাম ম্যাক্স ব্রড রেখেছিলেন *Amerika*); *The Trial* ও *The Castle* - এর তিনটি নতুন ইংরেজি অনুবাদ – এ পাঁচটি বইয়ের সব কটিতেই পাবেন Ritchie Robertson-এর অনবদ্য সব ভূমিকা ও পাঠ-পর্যালোচনা। কাফকার অনুবাদ আপনার সংগ্রহে থাকলেও এ পাঁচটি নতুনভাবে করা মূল পাণ্ডুলিপি দেখে অনুবাদ, সেই সঙ্গে যেহেতু পাচ্ছেন Ritchie Robertson-এর ভূমিকা ও ব্যাখ্যা, অবশ্যই পড়ার ও সংগ্রহে রাখার মতো সম্পদ।

এ ছাড়া Walter Benjamin -এর বিখ্যাত প্রবন্ধ Franz Kafka: On the Tenth Anniversary of His Death একটি অবশ্যপাঠ্য রচনা। এটি আছে তাঁর *Illuminations* (১৯৬৮) গ্রন্থে। এ ছাড়া পড়তে পারেন বিখ্যাত চেক ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরার কাফকাকে নিয়ে লেখা চমৎকার প্রবন্ধটি, যেটি আছে তাঁর *Testaments Betrayed* (১৯৯৫) বইয়ে। এখানে কুন্ডেরা ম্যাক্স ব্রডকে অভিযুক্ত করেছেন পৃথিবীর কাছে কাফকার 'সাধু-সন্তের ও শহীদের' ইমেজটি প্রতিষ্ঠা করার দোষে। কুন্ডেরা বলছেন, ব্রডের কারণেই মানুষ কাফকার লেখাকে তাঁর আত্মজৈবনিক গণ্ডি থেকে দেখে কিংবা ধর্মীয় রূপক হিসেবে পাঠ করে, যদিও, কুন্ডেরার ভাষায়, কাফকা হচ্ছে 'বিশাল কল্পনাশক্তির গুণে বাস্তবের পৃথিবীকে রূপান্তরিত করে দেওয়া' সাহিত্যকর্ম।

আরেকটি মহা-বিতর্কিত বইয়ের কথা বলতেই হচ্ছে। এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতো এ বইটি যথেষ্ট একপেশে, কিন্তু যথেষ্ট মজার ও কৌতূহলোদ্দীপক। এটি James Hawes-এর বই *Excavating Kafka - The Truth Behind the Myth* (২০০৮)। এ বইটি অবশ্য অন্যসব পড়ার শেষে পড়াই ভালো। পড়ার পরই পাঠক বুঝবেন, কেন তা বলছি।

উইকিপিডিয়ার 'Franz Kafka' আর্টিকেলটিও একটি ভালো লেখা। যে বা যাঁরাই এটি লিখেছেন, তাঁরা খেটেই কাজটি করেছেন; এবং এর মূল সৌন্দর্য এর বিন্যাসে। কাফকা-পাঠের একেবারে শুরুতে কিংবা একেবারে শেষে – দুই সময়েই এটি পড়া সুবিধাজনক। এর Reference অংশটি এবং তার

পরের Bibliography (Journal, Newspapers ও Online Sources-সহ) অমূল্য।

তবে সবকিছুর চেয়ে ভালো ফ্রানৎস কাফকার নিজের লেখা পড়া এবং এ কথাটি মনে রাখা যে সব গবেষক একমত, কাফকা বারবার পড়ার জিনিস। সরল, সোজা গদ্যে, ভান-ভণিতাহীন কাফকা পড়ার জন্য কোনো পূর্বপ্রস্তুতি লাগে না – এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। পড়া শুরু করে দিলেই হয়। তাঁর তিনটি উপন্যাস (ইংরেজিতে এখন, এত বছর পরে, মূল পাণ্ডুলিপি দেখে অনুবাদ করা 'Critical' এডিশনও বেরিয়ে গেছে এবং এগুলো বাজারে সহজলভ্যও) এবং গল্প সংকলনগুলো ছাড়াও অবশ্যপাঠ্য তাঁর ডায়েরি এবং চিঠির চারটি বই – *Letters to Felice*; *Letters to Milena*; *Letters to Friends, Family and Editors* এবং *Letters to Ottla and the Family*। এ ছাড়া আছে তাঁর সংকলিত প্রবচনগুচ্ছ *The Collected Aphorisms*; অনুবাদ 'ম্যালকম প্যাস্‌লি', ১৯৯৪; আছে *The Blue Octavo Notebooks*, সম্পাদনা ম্যাক্স ব্রড ১৯৫৪; এবং *Franz Kafka – Parables and Paradoxes* (১৯৬১) – এ তিনটি বই-ই বাজারে পাওয়া যায়।

সবার শেষে বলব আমার খুবই প্রিয় দুটি বইয়ের কথা – দুটিই অসংখ্য ছবিসংবলিত কাফকা অ্যালবাম, সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ: (১) Klaus Wagenbach-এর *Franz Kafka: Pictures of A Life* (১৯৮৪, ইংরেজি অনুবাদে); এবং (২) Jeremy Adler-এর *Franz Kafka* (২০০১)। কাফকার সময়কে ছবি ও লেখা – দুই-ই দিয়ে বোঝার অন্য কোনো এমন ভালো বিকল্প নেই।

কাফকার নিজের লেখা ও কাফকার ওপরে লেখা বইগুলো পাওয়ার শ্রেষ্ঠ স্থান www.amazon.com।

'ভূমিকার আগে' এবং 'ভূমিকা'টি লেখার জন্য আমি কাফকাকে নিয়ে লেখা উপরের সবগুলো বইয়েরই কমবেশি সাহায্য নিয়েছি। ভূমিকার বিন্যাসটি করেছি বা এটি সাজিয়েছি মোটামুটি Wikipedia-এর Franz Kafka আর্টিকেলটির মতো করে। এদের সবার প্রতি আমি অকুণ্ঠচিত্তে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

হোরহে লুইস বোরহেসের মুখবন্ধ[১]

ফ্রানৎস কাফকা, শকুন

এটা সবার জানা যে ভার্জিল তাঁর মৃত্যুশয্যায় বন্ধুদের বলেছিলেন *ঈনিদ*-এর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে, দীর্ঘ এগারো বছরের মহান ও জটিল পরিশ্রমের ফসল ছিল তাঁর মহাকাব্য *ঈনিদ*; শেক্সপিয়ার কোনো দিন তাঁর নাটকগুলো একত্রে দুই মলাটের ভেতরে নিয়ে আসার কথা ভাবেননি; কাফকা তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে মিনতি জানিয়েছিলেন তাঁর তিনটি উপন্যাস ও গল্পগুলো পুড়িয়ে ফেলতে, পরে ওগুলোই তাঁকে এনে দেয় চিরস্থায়ী খ্যাতি। এই তিন সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যানের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটা, আমার যদি ভুল না হয়, এক অলীক কল্পনা। ভার্জিল জানতেন তিনি তাঁর বন্ধুদের ভক্তিভরা অবাধ্যতার ওপরে ভরসা রাখতে পারেন, যেমন কাফকা জানতেন ম্যাক্স ব্রডের বেলায়। শেক্সপিয়ারের ব্যাপার এগুলো থেকে পুরো আলাদা। ডি কুইন্সি বিশ্বাস করেন যে শেক্সপিয়ারের কাছে খ্যাতি ছিল মঞ্চে অভিনয় করার বিষয়, ছাপার অক্ষরে নয়; নাটকের মঞ্চই তাঁর কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কথা হচ্ছে, কেউ যদি সত্যিই চায় তাঁর সৃষ্টকর্ম, তাঁর বইগুলো, পুড়িয়ে ফেলবেন, তাহলে কাজটা তিনি কখনোই অন্যের হাতে সঁপে দেবেন না। আমি মনে করি, কাফকা ও ভার্জিল সত্যিকারভাবে তাঁদের সৃষ্টিকর্মের ওরকম বহ্ন্যুৎসব চাননি; তাঁরা দুজনেই স্রেফ চেয়েছিলেন কোনো সাহিত্যকর্ম তার লেখকের ওপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করে সেই দায়িত্বটুকুর বোঝা এড়াতে, এরকমই আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁদের। ভার্জিল, আমার ধারণা, তাঁর অনুরোধটা জানিয়েছিলেন সম্পূর্ণ নন্দনতাত্ত্বিক কারণে: আসলে তিনি তখনো চাচ্ছিলেন এই লাইন বা ওই লাইনটা, কিংবা এই বা ঐ ছন্দ বা বর্ণনাটুকু বদলাবেন।

ফ্রানৎস কাফকার ঘটনাটা এসবের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। কাফকার সৃষ্টকর্মকে বলা যায় ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের এবং ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের দুর্বোধ্য-মহাবিশ্বের যে নৈতিক সম্পর্ক তা নিয়ে লেখা প্যারাবল্ [নীতিগর্ভ রূপককাহিনি] বা প্যারাবল্ পরম্পরা। আধুনিক বা সমকালীন সব প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও, কাফকার লেখা প্রথাগত অর্থে যাকে 'আধুনিক সাহিত্য' বলা হয় তার চেয়ে বরং *বুক অব জব*[২]-এর সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। তাঁর সাহিত্যকর্মের ভিত্তিমূলে আছে একটা ধর্মীয় চেতনা, বিশেষভাবে বললে ইহুদি চেতনা; এ ছাড়া অন্য কোনো প্রেক্ষাপট থেকে কাফকার লেখার ব্যাখ্যা অর্থহীন। কাফকা তাঁর সাহিত্য

রচনাকে দেখেছিলেন কোনো বিশ্বাসের বস্তু হিসেবে, আর তিনি চাননি যে মানবসমাজ এটা পড়ে নিরুদ্যম হয়ে পড়ুক। এ কারণেই তিনি তাঁর বন্ধুকে অনুরোধ করেন, যেন বন্ধু তাঁর সব লেখা ধ্বংস করে ফেলেন। তবে এর পেছনে আরো অন্য কারণ আছে বলেও আমি সন্দেহ করি। কাফকা জানতেন তাঁর পক্ষে স্বপ্ন দেখা বলতে শুধু দুঃস্বপ্নই দেখা সম্ভব, আর তিনি এটাও জানতেন যে সেই স্বপ্নের উৎস বাস্তব পৃথিবী, বাস্তবতা হচ্ছে বিষণ্ন সব দুঃস্বপ্নের এক ধারাবাহিক অনুক্রম। একই সঙ্গে তিনি কালক্ষেপণের ও স্থগিতকরণের নাটকীয় সম্ভাবনার বিষয়ে মুগ্ধতায় ছিলেন; তাঁর প্রায় সব লেখার মধ্যেই এ বিষয়টি উপস্থিত। কিন্তু এ দুটো জিনিসই – বিষণ্নতা ও কালক্ষেপণ – নিঃসন্দেহে শেষে গিয়ে তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। কাফকা খুব সম্ভব কিছু সুখী লেখার জন্ম দিতে পারলেই বেশি খুশি হতেন – কিন্তু তাঁর সততা তাঁকে সে রকম কৃত্রিম কিছু লিখতে দেয়নি।

আমার প্রথমবার কাফকা পড়ার কথা আমি কখনোই ভুলতে পারব না, ১৯১৭ সালের এক আধুনিক ও অতি আত্মসচেতন প্রকাশনার মাধ্যমে আমার সেই প্রথম কাফকা পাঠ। এর সম্পাদকেরা – তাঁদের মেধা বলতে একদম কিছু ছিল না তা আমি বলব না – নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন লেখা থেকে বিরামচিহ্ন যতটা পারা যায় উঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে, সেই সঙ্গে লেখার অন্ত্যমিল, বড় ছাঁদের বর্ণ [ক্যাপিটাল লেটার] এসবও বাদ দেওয়া নিয়ে; তাঁদের ঝোঁক ছিল রূপালংকারের [মেটাফর] ভারবহ ধোঁকা তৈরি করার দিকে, একাধিক শব্দের ধ্বনি ও অর্থ জোড়া দিয়ে নতুন কৃত্রিম শব্দ তৈরিতে, আর আরো আরো সব নতুনত্ব আনার ব্যাপারে, যা তখনকার তরুণদের কাছে ছিল শখের মতো, যা সম্ভবত সব সময়ের সব তরুণেরই শখ। প্রকাশনাটির এত সব কায়দা ও চমক সত্ত্বেও আমার কাছে – আমি তখন তারুণ্যের স্বভাব মেনে সহজে বশ হয়ে যাই এমন এক পাঠক – ফ্রানৎস কাফকার স্বাক্ষরসহ ছাপা হওয়া একটা ছোট লেখাকে মনে হয়েছিল বাড়াবাড়ি রকমের নীরস। আজ এত বছর পরে, এই বৃদ্ধ বয়সে, আমার তখনকার সেই ক্ষমাহীন সাহিত্যিক সংবেদনশীলতার অভাবকে আমি স্বীকার করে নিতে পিছপা হচ্ছি না: আমার সামনে আসা সেই খোদার বাণীকে আমি তখন ধরতে পারিনি।

আমরা সবাই জানি, কাফকা সব সময়েই তাঁর বাবার সামনে এক রহস্যময় অপরাধবোধে ভুগতেন, যেভাবে ইজরায়েল ভোগে তার খোদার সামনে; তাঁর ইহুদিত্ব, যা তাঁকে বাকি মানবসমাজ থেকে আলাদা করে রেখেছিল, পরিষ্কারভাবে তাঁর কাছে ছিল এক যন্ত্রণা। এর ওপরে, মৃত্যু যে আসন্ন সেই বোধ, সেই সঙ্গে যক্ষ্মারোগ নিয়ে তাঁর জ্বোরো আবেগ নিঃসন্দেহে ধারালো করে তুলেছিল তাঁর সব ইন্দ্রিয় আর বোধের জগৎকে। তবে এসব পর্যবেক্ষণ সবই মূল বিষয়ের বাইরের; সত্য হচ্ছে, যেভাবে হুইসলার বলেছেন, 'শিল্প ঘটে (Art happens)'[৩]।

দুটো ধারণা – আরো নিখুঁত করে বললে, দুটো ধারণা নিয়ে তাঁর আচ্ছন্নতা – কাফকার লেখায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে: অধীনতা আর অনন্ত। মোটামুটি তাঁর সব রচনাতেই আমরা দেখি কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের ক্রমবিভক্তি; আর এই আধিপত্যপরম্পরা (hierarchy)

অনন্ত এক বিষয়। কার্ল রসমান, তাঁর প্রথম উপন্যাস *আমেরিকার* নায়ক [দেখুন এ বইতে প্রকাশিত গল্প 'দি স্টোকার'], সে এক গরিব জার্মান তরুণ, পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্য এক মহাদেশের গোলকধাঁধার মধ্যে, আর শেষমেশ তার জায়গা মিলল 'গ্রেট নেচার থিয়েটার অব ওকলাহোমা'য়; ওই অনন্ত-অসীম নাট্যমঞ্চ পৃথিবীর চাইতে কম ভিড়ে ভরা নয়, ওখানে আমরা স্বর্গেরই পূর্বসূচনা দেখি যেন (এখানে কাফকার একান্ত ব্যক্তিগত এক বৈশিষ্ট্যেরও দেখা মেলে: স্বর্গের ছোঁয়াসমৃদ্ধ ওই ছবিতেও আমরা মানুষকে সুখী দেখি না, আর ওখানেও দেখতে পাই সেই নানা রকমের ছোট ছোট বিলম্ব হওয়ার বা কালক্ষেপণের উপস্থিতি)। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস (*বিচার; The Trial*)-এর নায়ক জোসেফ কে., দিন দিন তাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে এক অর্থহীন বিচার-প্রক্রিয়া, কী অপরাধে সে অভিযুক্ত তা সে না পারছে জানতে, না পারছে তার তথাকথিত বিচার করতে থাকা অদৃশ্য ট্রাইব্যুনালের কখনোই মুখোমুখি হতে; কোনো বিচার সম্পন্ন করা ছাড়াই সেই ট্রাইব্যুনাল অবশেষে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দিয়ে বসল। তাঁর তৃতীয় ও শেষ উপন্যাসের (*দুর্গ; The Castle*) নায়ক কে. একজন ভূমি জরিপকারী, যাকে ডাকা হয়েছে একটা দুর্গে যেখানে সে কোনো দিনই ঢুকতে পারছে না; তাকে মরতে হবে দুর্গের চার দেয়ালের বাইরে, দুর্গ কর্তৃপক্ষ কোনো দিন স্বীকৃতিই দেয় না তাঁর উপস্থিতির, তারা মেনেই নেয় না কে. নামের কেউ ছিল বা আছে। অনন্ত কালক্ষেপণের এই মোটিফ তাঁর গল্পগুলোতেও দৃশ্যমান। এদের একটি হচ্ছে সম্রাটের বার্তাবাহককে নিয়ে [দেখুন এই বইতে প্রকাশিত গল্প 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা'] যে কিনা কখনোই পৌঁছাতে পারে না, তার বার্তা বাহনের বঙ্কিম পথ বারবার অন্য লোকেরা আরো বঙ্কিম, আরো ধীর করে দেয়; আরেকটি গল্পে [এ বইয়ের 'পাশের গ্রাম'] এক লোক কোনো দিন তার পাশের গ্রামে যেতে পারে না, সে বুঝতেই পারে না পাশের গ্রামে যাওয়াটা কীভাবে সম্ভব, ওভাবেই মারা যায় সে; অন্য আরেকটিতে [বাংলায় *গল্পসমগ্রর* দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে] দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কোনো দিন দেখা হওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় হচ্ছে 'চীনের মহাপ্রাচীর' [বাংলায় *গল্পসমগ্রর* দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে], ১৯১৯ সালে লেখা এই গল্পটিতে অনন্তের কোনো শেষ নেই: অনন্ত দূরের সেনাদলগুলোকে ঠেকানোর জন্য এক সম্রাট, যিনি স্থান ও কালের হিসাবে অনন্ত দূরবর্তী, আদেশ দিলেন যে তাঁর অনন্ত সাম্রাজ্যের চারপাশটা ঘিরে অনন্ত প্রজন্মকে অনন্তকাল ধরে এক অনন্ত দেয়াল বানাতে হবে।

সমালোচকদের অভিযোগ যে কাফকার তিনটি উপন্যাসের মাঝখানের অনেক কটা অধ্যায় নেই, যদিও তাঁরা এটাও মানছেন যে তাতে খুব একটা কিছু যায়-আসে না। আমার হিসেবে তাঁদের এই অভিযোগের উৎস হচ্ছে কাফকার সাহিত্যকর্ম বিষয়ে তাঁদের এক মৌলিক ভুল-বোঝাবুঝি। কাফকার এই 'অসমাপ্ত' তিন উপন্যাসের করুণ রসের (pathos) আসল গোড়াই তো হলো এদের একই রকম তিন নায়কের বারবার মুখোমুখি হতে হওয়া অনন্ত সব বাধার দেয়াল। ফ্রানৎস কাফকা উপন্যাস তিনটি শেষ করেননি, কারণ শেষ না করাটাই তাঁর দরকার ছিল। জেনো[৪] বলছেন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়

পৌঁছানো অসম্ভব: B বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য আমাদের প্রথমে অন্তবর্তী C বিন্দু পার হতে হবে, কিন্তু এই C-তে পৌঁছানোর আগে আমাদের পার হতে হবে অন্তর্বর্তী বা মাঝখানের D বিন্দু, কিন্তু D বিন্দুতে পৌঁছানোর আগে... । জেনো যেমন এরকম অনন্ত সব বিন্দুর তালিকা লিখে যাননি, কাফকারও তেমন প্রয়োজন পড়েনি ভাগ্যের সব রকম উত্থান-পতনের অনন্ত তালিকা তৈরি করার। আমাদের শুধু এটুকু জানাই যথেষ্ট যে সে তালিকা হবে মৃত মানুষের পৃথিবীর (Hades) মতোই অনন্ত-অসীম।

কাফকা-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসহনীয়, দুর্বিষহ সব পরিস্থিতির নির্মাণ। অল্প কয়েকটি লাইন পড়লেই (উদাহরণস্বরূপ এখানে কাফকার প্রবচন সংকলন *পাপ, দুঃখবেদনা, আশা ও সত্য পথ নিয়ে ভাবনা*[৫] থেকে দুটি প্রবচন তুলে ধরা হলো) বোঝা যাবে, কীরকম অমোচনীয়ভাবে কাফকা তা নির্মাণ করতে পারতেন: 'পশুটি তার প্রভুর হাত থেকে টান দিয়ে চাবুকটা কেড়ে নিল, তারপর নিজে প্রভু হবে বলে পেটাতে লাগল নিজেকে; হায়, সে জানে না যে চাবুকের একটা নতুন গিঁট থেকে তৈরি হওয়া এক অলীক কল্পনা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।'[৬] কিংবা: 'চিতাবাঘেরা উপাসনালয় আক্রমণ করে বসেছে, তারা বলি দেওয়ার পানপাত্র থেকে সব খাওয়া শুরু করেছে; এটা হঠাৎই ঘটে গেছে, বারবারই ঘটে চলেছে; অবশেষে বোঝা গেল, এমনটা যে ঘটবে তা বলে দেওয়াই ছিল, আর একসময় এটা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশেই পরিণত হলো।'[৭]

সম্ভবত কাফকার উদ্ভাবনক্ষমতা তাঁর শৈলীর চেয়ে বেশি প্রশংসনীয়। তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যেই ঘুরেফিরে আসে সেই একই চরিত্র: আধুনিক ঘর-সংসারী মানুষ[৮] (Homo Domesticus), মূলত জার্মান, মূলত ইহুদি, কত ব্যাকুল তার জায়গাটুকু ধরে রাখতে, অতি নগণ্য একটুখানি জায়গা, আর কোনো ব্যাপারই না কোন ক্রম অনুসারে তা মিলছে – মহাবিশ্বে, কোনো মন্ত্রণালয়ে, কোনো পাগলাগারদে নাকি কোনো জেলখানায়। কাফকার ক্ষেত্রে ঘটনাপরম্পরার রূপরেখা (plot) এবং আবহটুকুই কেবল দরকারি, গল্পের মোচড় বা নায়কের মনোজগতের চিত্রণের গভীরতা নয়। এ কারণেই তাঁর গল্পগুলো তাঁর উপন্যাসের চেয়ে উৎকৃষ্ট; এ কারণেই আমরা পাঠককে আশ্বস্ত করতে পারি যে এই বইয়ের গল্পগুলোতে এই অদ্বিতীয় লেখকের পুরো ব্যাপ্তির একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাবে।

টীকা

১. *বোরহেস এই প্রবন্ধটি লেখেন দি লাইব্রেরি অব ব্যাবেল* নামের কল্পকাহিনি সিরিজের একটির মুখবন্ধ হিসেবে। সিরিজটি ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত স্পেনের Ediciones Siruela প্রকাশনী থেকে বের হয়। এর প্রত্যেকটি গল্প বা কাহিনি বোরহেস নিজে বাছাই করতেন এবং প্রতিটির ভূমিকাও তিনিই লিখতেন। বোরহেসের ভূমিকাটির নাম ছিল: *ফ্রানৎস কাফকা, শকুন*; প্রকাশের সাল ১৯৭৯। পরে ১৯৮১ সালে জে. এ. আন্ডারউডের অনুবাদে কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্পগুলোর সংকলনে (নাম: *ফ্রানৎস কাফকা – স্টোরিজ ১৯০৪-১৯২৪*) বোরহেসের এই প্রবন্ধটি বইয়ের মুখবন্ধ হিসেবে ছাপা হয়।

২. হিব্রু বাইবেলের একটি বই, যেখানে জব বা ইসলামিক নামে আইয়ুব-এর সঙ্গে শয়তানের দ্বন্দ্ব, বিচার, খোদার প্রতি চ্যালেঞ্জ, তাঁর ভোগান্তির উৎস ও প্রকার নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা এবং সবশেষে খোদার উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। বুক অব জব-এর মূল প্রশ্ন হলো, 'কেন ভালো মানুষেরা বেশি ভোগে?'

৩. খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী জেমস অ্যাবট ম্যাকনিল্ হুইস্লার (১৮৩৪-১৯০৩); জন্ম আমেরিকায়, কাজ করতেন ইংল্যান্ডে। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের নাম *Whistler's Mother* (১৮৭১)। 'শিল্প ঘটে' কথাটির পুরো বাক্যটি হচ্ছে: 'শিল্প ঘটে – কোনো জীর্ণ কুটিরই এর থেকে নিরাপদ নয়, কোনো যুবরাজই এর ওপর ভরসা করতে পারবে না, সবচেয়ে বিরাট বুদ্ধিমত্তা দিয়েও এর প্রকাশ ঘটানো যাবে না, আর একে বিশ্বজনীন করে তুলে ধরার ক্ষুদ্র চেষ্টাগুলো সব পর্যবসিত হবে খেয়ালি হাস্যরসে, মোটা দাগের তামাশায়।' 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বের বড় সমর্থক ছিলেন হুইসলার।

৪. গ্রিক দার্শনিক যিনি ইলিয়ার জেনো নামে পরিচিত (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০-৪৩০ সন)। তাঁর মোট নয়টি কূটাভাসের (paradox) মধ্যে তিনটি অতিবিখ্যাত: অ্যাকিলিস ও কচ্ছপ, দ্বিবিভাজিত (dichotomy) বিচার বা তর্ক এবং উড়ন্ত তির। জেনো মনে করতেন গতি (motion) একটি অলীক কল্পনা।

৫. কাফকার কিছু জ্ঞানগর্ভ বাণী বা প্রবচনের (aphorism) সংকলন। ম্যাক্স ব্রডের দেওয়া নাম: *Reflections on Sin, Suffering, Hope, and the True Way*। কাফকা এগুলো ১৯১৭-১৮ সালের শরৎ ও শীতে লেখেন এবং প্রতিটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করে একসঙ্গে করেন। তিনি নিজে কখনো এদের সংকলনের কোনো নাম দেননি।

৬. উপরোল্লিখিত প্রবচন সংকলনের ২৯ নম্বর প্রবচন।

৭. উপরোল্লিখিত প্রবচন সংকলনের ২০ নম্বর প্রবচন।

৮. লাতিন শব্দ Homo Domesticus বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় মানুষ বা Homo Sapiens-এর আধুনিক রূপকে। নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিবর্তনের ধাপে আগের সেই জঙ্গলে বাস করা ও শিকার করে টিকে থাকা মানুষ গোঁড়ায় গিয়ে আজও একই কাজ করে – শুধু সময়, আবহ, উপকরণ ও চেতনা ইত্যাদি ভিন্ন। আধুনিক মানুষ ঘর বাঁধে, সংসার করে, চাকরি বা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং আধুনিক সময়ের নানা উৎপীড়ন ও সাধারণ লক্ষণ থেকে সে কখনোই মুক্ত নয়।

দুটি কথোপকথন

১. প্রার্থনাকারীর সঙ্গে কথোপকথন

একটা সময় ছিল যখন আমি প্রতিদিন এক গির্জায় যেতাম কারণ সেখানে একটা মেয়ে, আমি যার প্রেমে পড়েছি, রোজ সন্ধ্যায় আধা ঘণ্টা হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করত, ফলে তাকে শান্তিমতো মন ভরে দেখতে পেতাম।

একদিন সে আসেনি, আমি হতাশ হয়ে চোখ রাখছি অন্য প্রার্থনাকারীদের ওপর, আমার চোখ পড়ল এক তরুণের দিকে, সে তার লম্বা হালকা-পাতলা শরীর পুরো মেঝেতে টানটান করে পড়ে আছে। একটু পর পর সে শরীরের সব শক্তি নিয়ে তার মাথা আঁকড়ে ধরছে আর জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাথরের মেঝেতে উপুড় করে রাখা হাতের তালুতে ঠুকছে মাথাটা।

গির্জায় তখন শুধু অল্প ক'জন বৃদ্ধ মহিলা, তাদের চাদরে ঢাকা মাথা ঘুরিয়ে তারা বারবার দেখছে এই প্রার্থনাকারীকে। এই মনোযোগ পেয়ে সে মনে হলো খুশি হয়েছে, কারণ তার প্রতিটা ভক্তিভরা চিৎকারের আগে সে একবার করে চোখ ঘোরাচ্ছে, কতজন মানুষ তাকে দেখছে তা মনে হয় বুঝে নিতে চাইছে। আমার কাছে এটা অশোভন লাগল, আমি তাই ঠিক করলাম সে যখন গির্জা থেকে বেরোবে, আমি তাকে গায়ে পড়েই জিজ্ঞাসা করব কেন সে এইভাবে প্রার্থনা করে। কারণ এই শহরে আমার আসার পর থেকেই আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার করে জানার ব্যাপারটা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বের হয়ে উঠেছে, যদিও সে-মুহূর্তে ঐ মেয়ের গির্জায় না-আসায় আমার বিরক্তিই লাগছিল শুধু।

কিন্তু তার দাঁড়াতে দাঁড়াতে এক ঘণ্টা লেগে গেল, তার প্যান্ট সে এত লম্বা সময় ধরে ঝাড়ল যে আমার মনে হচ্ছিল চিৎকার করে বলি: 'হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, তুমি প্যান্ট পরে আছ।' এবার সে খুব কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, আর নাবিকদের মতো ঝাঁকি মেরে চলার ভঙ্গিতে হেঁটে গেল পবিত্র জলের আধারটার দিকে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম দরজা ও জলাধারটার মাঝখানে, আমাকে কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে তাকে যেতে দেব না এ-ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার মুখে আমি ঠুলি আঁটলাম, যেমনটা আমি সব সময় করি কোনো জোরদার বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে।

তারপর আমি শরীরের সব ভর দিয়ে দাঁড়ালাম আমার ডান পায়ের উপরে, বাঁ পা'টা কোনোমতে বুড়ো আঙুলের উপরে ঠেকিয়ে ভারসাম্য রাখছি, বেশ ক'বার দেখেছি যে এভাবে দাঁড়ালে নিজের মধ্যে একটা সুস্থিতির অনুভূতি আসে।

এখন এমনটা হতে পারে যে এই তরুণ পবিত্র জল তার মুখে ছিটানোর সময়ই, ইতোমধ্যে, আমাকে দেখে নিয়েছে; হতে পারে আমার চোখ গোলগোল করে তাকে দেখার কারণে সে আরো আগে থেকেই আমাকে ভয় পেয়েছে, কারণ এবার সে, বেশ হঠাৎ করেই, দরজার দিকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। এমনটা আমি আশা করিনি। নিজের অজান্তেই আমি তাকে থামাবার জন্য লাফ দিয়ে উঠলাম। কাচের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেছে। আর এক মুহূর্ত পরে আমি যখন ওখান থেকে বেরিয়েছি, কোথাও তাকে দেখলাম না, কারণ আমার সামনে অনেক সরু সরু গলি আর রাস্তায় যানবাহনও কম ছিল না।

এর পরের দিনগুলোতে সে আর এল না, কিন্তু মেয়েটা আবার এল, পাশের একটা উপাসনার বেদির কোনায় বসে প্রার্থনা করল। তার পরনে একটা কালো রঙের পোশাক, কাঁধের উপর দিয়ে গেছে স্বচ্ছ লেসের কাপড় – তার শেমিজের অর্ধেক চাঁদের মতো আকারটা দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে – পোশাকটার নিচের পাড় থেকে ঝুলছে সুন্দর ঝালর করে কাটা রেশমি কাপড়। মেয়েটা যেহেতু ফিরে এসেছে, আমি খুশিমনেই ভুলে গেছি ঐ তরুণকে, এরপর সে যখন আবার নিয়মিত আসা শুরু করেছে, তার বরাবরের ঐ একই ভঙ্গিতে প্রার্থনা করছে, আমি তার দিকে আর কোনো খেয়ালই দিলাম না।

তার পরও, যেই-না এসে আমার পাশ দিয়ে যায়, আমি দেখি সে হঠাৎ খুব জোরে হাঁটা শুরু করে আর তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখে। অন্যদিকে, প্রার্থনার সময়ে সে বারবার চোরা-চোখে আমাকে দেখতে থাকে। আসলে মনে হয় তাকে চলা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় আমি ভাবতে পারি না আর তাই সে যখন স্থির দাঁড়িয়ে আছে তখনো তাকে আমার মনে হয় যেন পিছলে চলে যাচ্ছে।

এক সন্ধ্যায় আমি আমার ঘরে একটু বেশিক্ষণ ধরে বসে থাকলাম। তার পরও শেষে ঠিকই গির্জায় গিয়ে হাজির হলাম। আমার মেয়েটা ভেতরে নেই, ঠিক করলাম আবার ঘরে ফিরে যাব। কিন্তু দেখলাম ঐ তরুণ মেঝেতে শুয়ে আছে। তাকে প্রথমবার দেখার সেই কথা মনে পড়ে গেল আর আবার আমার কৌতূহল জেগে উঠল।

পা টিপে আমি দরজার কাছে গেলাম, ওখানে বসে থাকা অন্ধ ভিখারিকে একটা পয়সা দিলাম, আর দরজার খোলা পাল্লার পেছনে তার পাশে ঠাসাঠাসি করে বসলাম। পুরো এক ঘণ্টা ওখানে বসে থাকলাম আমি, সম্ভবত আমার চেহারায় একটা ধূর্ততার ছাপ। ওখানে বসে থাকতে আমার ভালোই লাগল; মনে মনে ঠিক করলাম, আবার প্রায়ই এখানে বসব। দ্বিতীয় ঘণ্টায় ওখানে ভেতরে প্রার্থনারত এক মানুষের জন্য ওভাবে বসে থাকাটা বোকামি বলে মনে হওয়া শুরু হলো আমার। তার পরও, তিন ঘণ্টা চলছে তখন, আমার বিরক্তি বেড়ে চলেছে, মাকড়সাগুলোকে আমি কাপড়ের উপর হাঁটতে দিচ্ছি, ওভাবেই বসে দেখছি গির্জার অন্ধকারের ভেতর থেকে, লম্বা শ্বাস টেনে, শেষ লোকগুলো বেরিয়ে আসছে।

তবে অবশেষে সে-ও এল। আমি বুঝলাম, একটু আগে শুরু হওয়া গির্জার বড় ঘণ্টাগুলোর ঢং ঢং শব্দ তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। সে হাঁটছে সাবধানে পা ফেলে, প্রতিবার ভাল করে পা ফেলবার আগে হালকাভাবে পা দিয়ে বুঝে নিচ্ছে নিচের মাটিটা।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি, লম্বা একটা পা ফেলে সামনে এগোলাম, তাকে ধরে ফেললাম। 'শুভ সন্ধ্যা,' বললাম আমি, তার কোটের কলারে হাত রেখে তাকে সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কিয়ে নিচে নামিয়ে আনলাম আলো-জ্বলা স্কোয়ারটার ওখানে।

আমরা যখন নিচে পৌঁছেছি, কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল: 'শুভ সন্ধ্যা, বন্ধু, প্রিয় স্যার, আমার ওপরে রাগ হয়ো না, আমি তোমার সবচেয়ে বাধ্যগত চাকর।'

'বটে', আমি বললাম, 'তোমাকে আমি কিছু কথা জিগ্যেস করতে চাই। অন্যবার তুমি আমার আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছ কিন্তু আজ রাতে আর সেটা পারছ না।'

'স্যার, তুমি তো দয়ালু এক মানুষ, আমাকে বাড়ি যেতে দাও। আমি খুব হতভাগা একজন, এটাই সত্যি কথা।'

'না,' পাশে চলে যেতে থাকা ট্রামের শব্দের মধ্যে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম। 'তোমাকে আমি ছাড়ছি না। আমার এ ধরনের সাক্ষাৎই পছন্দ। তুমি আমার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনা শিকার। আমি নিজেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

তারপর সে বলল: 'ওহ্ খোদা, তোমার মন তো ঠিকই আছে, কিন্তু তোমার মাথা তো কাঠের গুঁড়ির। তুমি আমাকে বলছ "সৌভাগ্যের শিকার," কী সৌভাগ্য বিষয়ে তুমি এতটা নিশ্চিত হচ্ছ? কারণ আমার দুর্ভাগ্য শুধু পড়ো-পড়ো অবস্থায় ভারসাম্য রেখে আছে, এটার দিকে যে-ই প্রশ্নের আঙুল তুলবে, ওটা গিয়ে পড়বে তারই মাথার ওপরে। শুভ রাত্রি, স্যার।'

'চমৎকার,' আমি বললাম, তার ডান হাত ধরলাম জোরের সঙ্গে। 'তুমি যদি আমার কথার উত্তর না দাও, আমি তাহলে এখানে রাস্তায় চিৎকার শুরু করব। আর দোকানে কাজ করা যত মেয়ে আছে আর তাদের যত ভালোবাসা-প্রার্থীরা খুশিমনে তাদের অপেক্ষায় আছে, সব দৌড়ে আসবে তখন; কারণ তারা ভাববে, কোনো চার-চাকার ঘোড়াগাড়ি উল্টে গেছে কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর তখন আমি লোকজনকে তোমাকে দেখিয়ে দেব।'

এ কথা শুনে সে ভেজা চোখে আমার হাতে চুমু খেল, একটার পরে আরেকটা হাতে। 'তুমি যা জানতে চাও তা বলব আমি, কিন্তু দয়া করে ওখানে ওই পাশের রাস্তায় চলো।' আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললাম, আমরা রাস্তা পার হয়ে ওখানে গেলাম।

ওখানে যাওয়ার পরে ছোট রাস্তার ঐ অন্ধকার দেখে তার ভালো লাগল না, ওখানে সামান্য কিছু হলুদ বাতি একটা থেকে অন্যটা অনেক দূর পর পর জ্বলছে। সে আমাকে একটা পুরোনো বাড়ির নিচু বারান্দাপথের ভেতরে নিয়ে এল, আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে একটা ছোট বাতি, কাঠের এক সিঁড়ির সামনে ওটার থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় মোম পড়ছে। ওখানে সে গম্ভীর মুখে তার রুমাল বের করল, আর একটা ধাপের উপরে তা মেলে রাখল, বলল: 'বসো, প্রিয় স্যার আমার, বসো, বসে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে তোমার

সুবিধা হবে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকছি, উত্তর দিতে আমারও তাহলে সুবিধা হবে। স্রেফ আমাকে যন্ত্রণা কোরো না।'

অতএব আমি বসে পড়লাম, সরু চোখে উপরের দিকে তাকে দেখতে লাগলাম, আর বললাম: 'তুমি পুরো পাগল, একেবারে পাগল! গির্জায় তুমি কী করো তা যদি দেখতে! কী বিরক্তির তোমার ঐ প্রার্থনা আর আমরা যারা দেখছি, তাদের জন্য কী অস্বস্তির সেটা! তোমাকে যদি বারবার ওভাবে দেখতে হয় তাহলে কীভাবে কেউ নিজের প্রার্থনায় মন দেবে?'

সে তার শরীর দেয়ালের সাথে ঠেসে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু তার মাথাটা বাধাহীন নড়তে পারছে সামনে পেছনে। 'রাগ হোয়ো না – যা তোমার ব্যাপার না, তা নিয়ে তুমি কেন রাগ হবে? আমি যখন খারাপ আচরণ করি তখন আমার রাগ হয়; কিন্তু অন্য কেউ যদি ভুলটা করে, তাহলে খুশিই লাগে। তাই রাগ হোয়ো না, যদি তোমাকে বলি যে আমার জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষকে আমার দিকে তাকাতে বাধ্য করা।'

'কী যে বলো তুমি,' আমি চেঁচিয়ে বললাম, এই নিচু ছাদের বারান্দাপথের হিসেবে একটু জোরেই হয়ে গেল চিৎকারটা, কিন্তু আবার আমি নীরব হয়ে যাব এই শঙ্কাও পেয়ে বসেছিল আমাকে, 'সত্যি, কী কথা যে বললে এটা। কোনো সন্দেহ নেই আমার অনুমান এমনই ছিল, তোমাকে প্রথমবার দেখেই আমার এটাই অনুমান হয়েছিল, আমি তোমার অবস্থা আন্দাজ করতে পারছিলাম। আমারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তুমি ঠাট্টা হিসেবে নিয়ো না যদি বলি অবস্থাটা অনেকটা শুকনো মাটিতে সমুদ্রপথের বমি বমি ভাব হওয়ার মতো। ঐ অবস্থায় জিনিসের সত্যিকারের নাম আর মনে করা যায় না, তাই তড়িঘড়ি ঐ সবকিছুকে অস্থায়ী, কাজ-চালানোর মতো নাম দিতে হয়। তুমি সেটা হয়তো যত তাড়াতাড়ি পারা যায় করলে, কিন্তু ওদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতেও পারোনি, তার আগেই তুমি ভুলে গেছ কোন্‌টাকে কী নাম দিয়েছিলে। মাঠের মধ্যে দাঁড়ানো একটা পপ্‌লার গাছকে তুমি নাম দিয়েছিলে "ব্যাবেলের চূড়া", কারণ তুমি তখন জানতে না কিংবা মনে করতে পারতে না যে ওটা একটা পপ্‌লার গাছ, আবার এখন ওটা নামহীন দাঁড়িয়ে, আর এবার তুমি ওটাকে বললে "পাঁড় মাতাল নূহ"।'

আমি একটু বিব্রত হয়ে গেলাম যখন সে বলল: 'আমি খুশি যে আমি তোমার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝিনি।'

বিরক্তি নিয়ে আমি চটজলদি বললাম: 'তুমি যে বললে তুমি খুশি, এতেই বোঝা যাচ্ছে আমার কথা তুমি কিছুই বুঝতে পারোনি।'

'সেটা ঠিক আছে স্যার, মানলাম, কিন্তু তুমি যা বললে তা কিন্তু সত্যি অদ্ভুত কথা বললে।'

আমি আমার হাত রাখলাম আমার উপরের দিকের একটা সিঁড়ির ধাপে, সোজা পেছনের দিকে হেলান দিলাম, আর এই প্রায় আয়ত্তে-আনা-অসম্ভব আসনে বসে (কোনো কুস্তিগিরের শেষ আশ্রয় এ ধরনের আসন) তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'তোমার এই কোনোকিছুর মধ্যে থেকে মুচড়ে বেরিয়ে আসার কৌশলটা কি হাস্যকর নয়, নিজের মানসিক অবস্থাটা এভাবে তুমি অন্যের ওপরে ঝাড়ছ?'

এতে মনে হয় তার সাহস বেড়ে গেল। সে তার শরীরকে এর সঙ্গে সামঞ্জস্য দিতে আর কিছুটা বিরোধিতা জানাতে তার দুই হাত একসঙ্গে করল, বলল: 'না, আমি কারো সঙ্গেই অমনটা করি না, এমনকি যেমন ধরো তোমার সঙ্গেও না, কারণ আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না। কিন্তু যদি করতে পারতাম, খুশিই হতাম তাহলে, কারণ তখন আর গির্জায় অন্যদের আমার দিকে তাকাতে বাধ্য করা লাগত না। তুমি কি জানো, কেন আমার তা করা লাগে?'

এই প্রশ্নটা আমাকে কিছুটা অসুবিধায় ফেলে দিল। কোনো সন্দেহ নেই আমি তা জানি না, আর আমার বিশ্বাস আমি জানতেও চাই না। আমি কখনোই এখানে আসতে চাইনি, মনে মনে বললাম আমি, কিন্তু এই চিড়িয়া আমাকে বাধ্য করেছে তার কথা শুনতে। অতএব বুঝলাম যে আমার খালি মাথা নাড়তে হবে, এভাবে জানাতে হবে যে আমি জানি না, তার পরও দেখলাম যে আদৌ আমি আমার মাথা নাড়াতে পারছি না।

আমার সামনে দাঁড়ানো তরুণ একটু হাসল। তারপর সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আর চেহারার মধ্যে স্বপ্ন দেখছে এমন একটা ভঙ্গি নিয়ে আমাকে বলল: 'এর আগে আর কোনো দিন আমার এরকম নিজের একদম ভেতর থেকে বিশ্বাস আসেনি যে আমি বেঁচে আছি। দেখো, আমার চারপাশে সবকিছু নিয়ে আমার সচেতনতা এমন ক্ষণস্থায়ী যে সব সময় আমি মনে করি এরা একদিন সত্যি ছিল আর এখন দূরে ক্ষিপ্র বেগে সরে যাচ্ছে। প্রিয় স্যার আমার, আমার অবিরাম বাসনা সবকিছু আমার চোখের সামনে হাজির হওয়ার আগে কেমন ছিল তা যদি একপলক একটু দেখতে পারতাম। আমার ধারণা, তখন ওরা সব ছিল শান্ত ও সুন্দর। নিঃসন্দেহে তা-ই হবে, কারণ আমি প্রায়ই শুনি লোকজন সবকিছু নিয়ে ওভাবেই বলছে, যেন ওরা শান্ত ও সুন্দরই ছিল আসলে।'

যেহেতু আমি কোনো উত্তর করলাম না আর যেহেতু নিজের অজান্তে কেঁপে ওঠা আমার মুখের পেশির মাধ্যমেই শুধু বোঝা গেল আমার অস্বস্তিটুকু, সে জিজ্ঞাসা করল: 'তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে লোকজন ওভাবে বলে?'

আমি জানি আমার হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়ানো উচিত, কিন্তু পারলাম না।

'তুমি আসলেই তা বিশ্বাস করো না? কেন, শোনো; আমি যখন শিশু, তখন একদিন দুপুরে ছোট একটু ঘুম দিয়ে জেগে উঠে শুনি, তখন আধো ঘুমে আছি, শুনি যে আমার মা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তার সবচেয়ে সাধারণ গলায় জোরে কাকে যেন বলছে: "কী করছো ওখানে, বন্ধু? কী গরম পড়েছে।" আর নিচে বাগান থেকে এক মহিলা উত্তর দিল: "আমি ঘাসে শুয়ে আনন্দে কাটাচ্ছি।" সে এটা বলল খুব সহজভাবে, কথার মধ্যে কোনো পীড়াপীড়ির কিছু নেই, যেন তার কথাটা অবধারিত বলে ধরে নিতে হবে।'

আমার মনে হলো সে আমার কাছ থেকে একটা উত্তরের আশা করছে, তাই আমি আমার প্যান্টের হিপ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে এমন ভাব করতে লাগলাম যেন কিছু একটা খুঁজছি। কিন্তু আসলে কিছুই খুঁজছিলাম না, শুধু চাচ্ছিলাম একটু নড়েচড়ে বসি, যাতে করে তার মনে হয় আমি তার কথা মন দিয়েই শুনছি। তারপর আমি বললাম ঘটনাটা মনে রাখার মতো বটে, আর আমার বোধের অগম্য। আমি আরো যোগ করলাম যে আমার

বিশ্বাস হয় না এটা কোনো সত্যি ঘটনা, বরং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গল্পটা বানানো হয়েছে, উদ্দেশ্যটা আমি ধরে উঠতে পারছি না। তারপর আমি আমার চোখ বন্ধ করলাম, কারণ আলো ওদের পীড়া দিচ্ছিল। 'ওহ্, আমার কী যে খুশি লাগছে, তুমি আমার সঙ্গে একমত হয়েছ। আর আমাকে তা জানাবার জন্য যেভাবে তুমি থামিয়ে দিলে তাতে বোঝা যায় তুমি একেবারেই স্বার্থপর গোছের না। কেন আমার এতে লজ্জা লাগবে যে – কেন আমাদের লজ্জা লাগবে যে – আমি সোজা হয়ে আর গদাই লশ্‌করি চালে হাঁটি না, হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাতে আমার হাঁটার ছড়ি দিয়ে টুকটুক বাড়ি মারি না আর পাশ দিয়ে ওরকম হইচই করে হেঁটে যাওয়া লোকজনের কাপড়ে ঘষা দিয়ে চলি না, তাতে আমার লজ্জিত হওয়ার কী আছে? আমার কি বরং যুক্তিসংগত ক্ষোভের সঙ্গে নালিশ জানানো উচিত না যে কেন আমাকে বাসার দেয়ালে দেয়ালে ফুরফুর করে ছায়ার মতো উড়তে হচ্ছে, কাঁধ নিচু করে লাফিয়ে চলতে হচ্ছে, আর অনেকবারই দোকানের জানালাগুলোর কাচের মধ্যে মিলিয়ে যেতে হচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে?

'কীসব ভয়ংকর দিনই না কাটাতে হচ্ছে আমাকে! আমাদের দালানগুলো এত বাজেভাবে একসঙ্গে রাখা কেন যাতে করে বেশি উঁচুগুলো মাঝেমধ্যে, বাইরের কোনো বোধগম্য কারণ ছাড়াই, ধসে পড়ছে? ঐসব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমি হাঁচড়েপাঁচড়ে চলি আর যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই জিগ্যেস করি: "কীভাবে আবার এরকম ঘটনা ঘটল! আমার শহরে – একদম নতুন একটা বাড়ি – আজকের পাঁচ নম্বর এটা – শুধু ভেবে দেখুন একবার।" আমাকে কেউ কোনো উত্তর দিতে পারে না।

'আর প্রায়ই মানুষ রাস্তায় পড়ে যায়, মরে পড়ে থাকে। তখন ব্যবসায়ী লোকজন সবাই তাদের দোকানের দরজা খোলে, দরজায় ঝোলে কত কত মালসামান, তারা দুলকি চালে বাইরে বেরিয়ে আসে, মরা লোকটাকে কোনো বাসার ভেতরে নিয়ে যায়, তারপর আবার হাজির হয়, তাদের চোখেমুখে হাসি, বলে: "সুপ্রভাত – কীরকম মেঘলা দিন – আমার দোকানে প্রচুর মাথা-ঢাকার কাপড় বিক্রি হচ্ছে – হ্যাঁ, যুদ্ধ।" আস্তে বাসাটার ভেতরে সটকে ঢুকে পড়ি আমি, তারপর আঙুলগুলো টোকা দেওয়ার জন্য বাঁকা করা অবস্থায় ভয়ে ভয়ে কয়েকবার হাত উপরে তুলে শেষমেশ দারোয়ানের ছোট কাচের জানালায় ঠকঠক করি। "ভাই," তাকে বন্ধুর গলায় বলি আমি, "একটু আগে একজন মরা মানুষকে এখানে আনা হয়েছে। আমি তাকে একটু দেখব, প্লিজ।" তারপর যখন সে এমনভাবে মাথা ঝাঁকায় যেন কী করবে মনস্থির করে উঠতে পারছে না, আমি স্পষ্ট করে বলি: "ভাই রে, ভাবছটা কী? আমি গোয়েন্দা পুলিশের লোক। এক্ষুনি আমাকে মরা লোকটা দেখাও তো দেখি, ঝটপট।" "মরা লোক?" সে প্রশ্ন করে, তার প্রায় আহত গলার স্বর। "না, এখানে কোনো মরা মানুষ নেই। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।" আমি তখন বিদায় জানিয়ে কেটে পড়ি।

'আর তারপর আমাকে যদি কোনো বিরাট ফাঁকা চত্বর পার হতে হয় তো সবকিছু আমি ভুলে যাই। এই বিশাল উদ্যোগ নিয়ে বানানো চত্বর আমাকে মুশকিলে ফেলে দেয়,

বিভ্রান্ত করে, আমার এ কথা না-ভেবে আর উপায় থাকে না: "মানুষকে যদি স্রেফ খেয়ালের বশে এত বড় বড় চত্বর বানাতেই হবে, তাহলে এধার থেকে ওধারে যেন যাওয়া যায় সেজন্য তারা পাথরের একটা রেলিংও যোগ করে দেয়নি কেন? আজ দক্ষিণ-পূব দিক থেকে কী জোর হাওয়া বইছে। চত্বরের মাঝখানে হাওয়া পুরো ঘুরপাক খাচ্ছে। টাউন হলের চূড়াটা কেমন ছোট ছোট বৃত্তাকারে টলমল নড়ছে। এইসব নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। প্রতিটা জানালার শার্সি খটখট করছে আর ল্যাম্পপোস্টগুলো নুয়ে পড়ছে বাঁশের কঞ্চির মতো। মাতা মেরির গায়ের ঢিলে জামা তার থামের গায়ে পতপত করছে আর ঝোড়ো হাওয়া ওটাতে ঝাপটা মারছে কীরকম। কারোর কি এসবের কোনো খবর নেই? ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা, যাদের এখন হাঁটার কথা পাথরের আস্তর দেওয়া পথে, তাদের যেন তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। হাওয়া একটু পড়ে আসতেই তারা সবাই থামল, নিজেদের মধ্যে দু-একটা কথাটথা বলল, একে অন্যকে কুর্নিশ জানাল, কিন্তু আবার যখন ঝড়ের মতো শুরু হলো, তাদের আর কোনো উপায় থাকল না, ঠিক একই সময়ে তাদের সবার পা মাটি থেকে উপরে উঠে গেল। তাদেরকে তাদের টুপি আঁকড়ে থাকতে হচ্ছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে, তবে তাদের চোখগুলো কিন্তু আনন্দে-ফুর্তিতে জ্বলজ্বল করছে, ভাবটা যেন স্রেফ কোনো মৃদু বাতাস বইছে। আমি ছাড়া আর কেউই ভয় পাচ্ছে না।"

আমার মনে তখন অনেক ব্যথা, আমি বললাম: তুমি যে আমাকে তোমার মা আর বাগানের ঐ মহিলার গল্পটা বললে, আমার ওটা একটুও অসামান্য কিছু বলে মনে হচ্ছে না। আমি যে ওরকম গল্প আরো অনেক শুনেছি বা ওরকম শোনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, শুধু তা-ই নয়, এর কোনো কোনো গল্পের মধ্যে আমি অংশও নিয়েছি। তোমারটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। তোমার কি মনে হয়, আমি যদি ওই ব্যালকনিতে থাকতাম, আমিও কি একই কথা বলতাম না আর বাগান থেকে একই উত্তর পেতাম না? কী সাধারণ একটা ঘটনা।'

আমি যখন এটা বললাম, দেখে মনে হচ্ছে সে খুবই খুশি হলো। সে বলল যে আমার জামাকাপড় খুব সুন্দর, আর বিশেষ করে আমার টাই তার খুব পছন্দ হয়েছে। আর আমার ত্বক কী সুন্দর। আর স্বীকারোক্তি জিনিসটা আরো স্পষ্ট, আরো দ্ব্যর্থহীন হয়ে ওঠে, যখন তাদের প্রত্যাহার করে বা তুলে নেওয়া হয়।

২. মাতালের সঙ্গে কথোপকথন

সামনের দরজা দিয়ে আমি এক পা বাইরে দিয়েছি, আর তখনই আকাশ, আকাশের বিশাল খিলানে থাকা চাঁদ ও তারা, টাউন হলের পাশের রিংপ্লাৎসের প্রশস্ত স্কোয়ার, স্তম্ভের উপরে দাঁড়ানো কুমারী মেরি আর গির্জা আমাকে অভিভূত করে দিল।

ছায়া থেকে শান্ত পায়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম চাঁদের আলোতে, আমার ওভারকোটের বোতামগুলো খুললাম, শরীর গরম করলাম; তারপর আমার দুই হাত তুলে থামিয়ে দিলাম রাতের গুঞ্জন আর ধ্যানমগ্ন হয়ে ভাবতে শুরু করলাম।

'কী কারণ আছে যাতে তোমরা সবাই এই এমনভাবে আচরণ করছ, যেন তোমরা বাস্তব? তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছ যে আমি বাস্তব নই, আমি এখানে সবুজ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি জোকারের মতো? আর তুমি, আকাশ, তুমি যে বাস্তব কিছু ছিলে তা বহু আগের কথা, আর তুমি রিংপ্লাৎস, পুরোনো টাউন স্কোয়ার, তুমি তো কখনোই বাস্তব ছিলে না।

'সত্যি, তোমরা সবাই এখনো আমার চেয়ে উঁচু আসনে, তবে তা কেবল যখন আমি তোমাদের একলা ছেড়ে যাই।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, চাঁদ, তুমি আর চাঁদ নও, তবে আমি যে এখনো তোমাকে চাঁদ নামে ডেকে যাচ্ছি শুধু এজন্য যে একদিন তোমার নাম চাঁদই ছিল, সেটা সম্ভবত আমার অমনোযোগের কারণেই। কেন তোমার উচ্ছ্বাস কমে আসে যখন আমি তোমাকে ডাকি "অদ্ভুত রঙে বানানো ভুলে যাওয়া কাগজের লণ্ঠন" নামে? আর কেন তুমি একরকম গুটিয়েই যাও যখন তোমাকে ডাকি "কুমারী মেরির স্তম্ভ" নামে, আর তুমি, কুমারী মেরির স্তম্ভ, তোমার চোখ-রাঙানি কত কমে আসে যখন আমি তোমাকে ডাকি "হলুদ আলো ছড়ানো চাঁদ" নামে?

'আমার সত্যিই মনে হচ্ছে যেন তোমাকে নিয়ে চিন্তা করলে তোমার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে; তোমার সাহস ও সুস্বাস্থ্য তাতে কমে যায়।

'খোদা, কত প্রশংসার কাজ হবে যদি কোনো ভাবুক কিছু শিখতে পারে কোনো মাতালের থেকে!

'সবকিছু এত স্তব্ধ হয়ে গেছে কেন? মনে হচ্ছে হাওয়া থেমে গেছে। আর ছোট বাসাগুলো যারা প্রায়ই স্কোয়ারের উপরে গড়াগড়ি যেত (অনেকটা যেন তারা ছোট ছোট চাকার উপরে আছে), তারা বেশ পোক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে – স্থির – স্থির – না, ঐ সরু কাল রেখাগুলো যারা সাধারণত বাড়িগুলোকে মাটি থেকে আলাদা করে, তাদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না।'

আর আমি দৌড় শুরু করলাম। তিনবার ঐ বিশাল স্কোয়ারে বাধাহীন চক্কর দিলাম, আর যেহেতু আমার সামনে কোনো মাতাল পড়ল না, আমি গতি না কমিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে চালর্স স্ট্রিটের দিকে দৌড়াতেই থাকলাম। আমার পাশে পাশে দেয়ালে দৌড়াচ্ছে আমার

ছায়া, প্রায়ই তা আকারে আমার চেয়ে ছোট, দেখে মনে হচ্ছে বাসাগুলোর দেয়াল ও রাস্তার মাঝখানে ছায়াটা কোনো গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে।

দমকল স্টেশন পেরিয়ে আসতেই আমি ক্লেইনার রিং নামের ছোট স্কোয়ারের দিক থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম, ওদিকে ঘুরতেই দেখলাম ফোয়ারার লোহার রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক মাতাল, তার হাত দুটো দুপাশে ছড়ানো আর কাঠের জুতো পরা তার পা তিনি ঠকঠক শব্দ তুলে ঠুকছেন রাস্তায়।

শ্বাস ফিরে পেতে একটুখানিকের জন্য আমি থামলাম, তারপর হেঁটে তার কাছে গেলাম, আমার মাথার রেশমি টুপি উপরে উঠালাম আর নিজের পরিচয় দিতে বললাম:

'শুভ সন্ধ্যা, হে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, আমার বয়স এখন তেইশ, কিন্তু আজও আমার কোনো নাম নেই। কিন্তু আপনি, নিঃসন্দেহে আসছেন বিরাট ঐ প্যারিস শহর থেকে, আপনার নামটা নিশ্চয়ই অসাধারণ কোনো গানের সুরের মতো নাম। আপনাকে ঘিরে আছে স্বেচ্ছাচারী ফ্রান্সের আদালতের কেমন অস্বাভাবিক গন্ধ।

'কোনো সন্দেহ নেই আপনার ঐ হালকা রং মাখা চোখ দিয়ে আপনি দেখেছেন উঁচু ঝলমলে গ্যালারির বারান্দায় দাঁড়ানো সম্মানিত মহিলাদের, তারা শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে ঘোরাচ্ছে তাদের সরু কোমর, তাদের নকশা-তোলা দীর্ঘ পোশাকের পাড়ের দিকটা পুরো ছড়িয়ে পড়েছে গ্যালারির সিঁড়িতে কিন্তু একইসঙ্গে তখনো ঘসটে চলেছে বাগানের বালিতে। আর নিশ্চিত বেপরোয়াভাবে খাটো ধূসর রঙের টেইল-কোট ও সাদা আঁটসাঁট পাজামা পরা পুরুষ ভৃত্যেরা লম্বা লম্বা খুঁটি বেয়ে উঠছে, খুঁটিগুলো একটু পর পর রাখা, তাদের প্রত্যেকেই পা দিয়ে খুঁটি আঁকড়ে ধরে আছে কিন্তু শরীর বারবার পেছনে ঝুঁকে পড়ছে কিংবা পাশে বেঁকে যাচ্ছে, কারণ তাদেরকে মোটা রশি দিয়ে মাঠের থেকে টেনে ওঠাতে হচ্ছে ধূসর লিনেনের বিশাল শামিয়ানা আর ওটা উঁচুতে টানা দিয়ে রাখতে হচ্ছে শূন্যে, কারণ সম্মানিত ঐ ভদ্রমহিলা একটা মেঘলা সকাল দেখবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।' তিনি ঢেকুর তুললেন, আমি প্রায় ভয় পেয়ে গিয়ে বললাম: 'এটা কি সত্যি যে স্যার, আপনি এসেছেন আমাদের ঐ প্যারিস থেকে, ঐ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্যারিস – আহ্, ঐ প্রবল-উৎসাহের শিলাবৃষ্টিতে ভেজা প্যারিস থেকে?' আবার তিনি যখন ঢেকুর তুললেন, আমি বিব্রত হয়ে বললাম: 'বুঝতে পারছি আপনি আমাকে অনেক সম্মান জানালেন।'

আর চটপট আঙুল চালিয়ে আমি আমার ওভারকোটের বোতামগুলো লাগালাম, তারপর লাজুক এক আকুলতার সঙ্গে তাকে বললাম:

'আমি জানি আপনি আমাকে উত্তর পাওয়ার মতো যোগ্য বলে মনে করছেন না, কিন্তু আজ যদি আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করতাম তাহলে আমার জীবন কাটত কাঁদতে কাঁদতে।

'হে আমার চমৎকার ভদ্রলোক, আমি জানতে ব্যাকুল যে আমি যা যা শুনেছি ওগুলো কি সব সত্যি গল্প? আসলেই কি প্যারিসে ও রকম লোক আছে, যারা কোনো কিছু না, স্রেফ আনন্দ-ঝলমল সাজসজ্জা নিয়েই আছে, আসলেই কি ওখানে এমন বাড়ি আছে যেগুলোর শুধু আছে ঢোকার মুখের সিংহদরজা, আর এটা কি সত্যি যে গ্রীষ্মের দিনে আকাশের রং

কেমন ছুটতে থাকা নীল, তাতে নকশা হিসেবে আঠা দিয়ে লাগানো আছে ছোট সাদা সাদা মেঘ, সেগুলোর আকার মানুষের হৃদয়ের মতো? আর সত্যি কি ওখানে আছে মানুষে গিজগিজ এক সুন্দর জায়গা, যেখানে অনেক গাছ ছাড়া আর কিছু নেই, ওই গাছগুলো থেকে ঝোলানো রয়েছে ছোট ছোট ঘোষণাপত্র, তাতে লেখা আছে সবচেয়ে বিখ্যাত বীর, অপরাধী আর প্রেমিকদের নাম?

'তারপর আছে এই আরেকটা খবর। কীরকম মিথ্যা এক সংবাদ! যেমন ধরুন প্যারিসের রাস্তাগুলো নাকি আচমকা নানা শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে, পড়েনি? রাস্তাগুলো উত্তাল হয়ে উঠেছে, নয় কি? সব সময় সবকিছু নিয়মের মধ্যে রাখা যায় না, কীভাবে তা রাখা সম্ভব? কোনো-না-কোনো দুর্ঘটনা ঘটবেই, লোকজন জড়ো হতে থাকবে, আশপাশের গলিগুলো থেকে তারা উপচে পড়বে, তাদের হাঁটার ভঙ্গি ঠাকঠমকে ভরা, তাদের পা বলতে গেলে ফুটপাত ছোঁয়ই না; তাদের সবার মাথাভরা কৌতূহল, কিন্তু হতাশ হওয়ার ভয়ও আছে; তারা দ্রুত শ্বাস ফেলে আর তাদের ছোট ছোট মাথা কেমন করে সামনে বাড়ায়। কিন্তু তাদের যখন একজন আরেকজনের সঙ্গে গায়ে ছোঁয়া লেগে যায়, তারা অনেক নিচু হয়ে কুর্নিশ করে আর একজন অন্যজনের কাছে ক্ষমা চায়: "আমি খুব খুবই দুঃখিত – একদমই অনিচ্ছায় ঘটে গেছে – দেখছেন তো কী বিশাল ভিড়, আমাকে মাফ করবেন, প্লিজ – কেমন আনাড়ির মতো একটা কাজ করলাম আমি – পুরোটাই আমার দোষ। আমার নাম – আমার নাম জেরোমে ফারোখ, আমি রু দ্য কাবোতিনের এক মশলা ব্যবসায়ী – কাল আপনাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিতে চাচ্ছি – আমার স্ত্রী খুব খুশি হবে।" এভাবেই তারা কথা বলে, এমনকি যখন রাস্তা ভরে যায় হই-হট্টগোলে আর চিমনির ধোঁয়া গিয়ে পড়ে বাড়িগুলোর মাঝখানে। নিশ্চয়ই এমনটাই হবে। আর হঠাৎ হয়তো দেখা যাবে শহরের কোনো কেতাদুরস্ত, ধনী এলাকায়, ভিড়ে ভরা কোনো অ্যাভিনিউতে বেশ কটা চার-চাকার ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। ভাবগম্ভীর মুখে পুরুষ ভৃত্যেরা গাড়িগুলোর দরজা খুলল। আটটা অভিজাত সাইবেরিয়ান নেকড়ে-কুকুর উদ্ধত ভঙ্গিতে বাইরে নামল, আর বড় বড় লাফ দিয়ে রাস্তার উপরে চলতে লাগল, ঘেউঘেউ করছে তারা। কে যেন তখন বলল, এরা সব ছদ্মবেশী তরুণ প্যারিসিয়ান ফুলবাবু।'

তিনি শক্ত করে তার চোখ বন্ধ রেখেছেন। আমি কথা থামাতেই তিনি তার দুই হাত নিজের মুখের মধ্যে ঝট করে ঢোকালেন আর নিচের চোয়াল ধরে হেঁচকা টান দিলেন। তার জামাকাপড় সব নোংরা হয়ে আছে। সম্ভবত তাকে কোনো সরাইখানা থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে আর তিনি তা এখনো বুঝে উঠতে পারেননি।

সময়টা এখন মোটামুটি দিন আর রাতের সেই ছোট, শব্দহীন বিরতির সময়; এ সময়ে আমাদের মাথা আচমকাই ভারী হয়ে হেলে থাকে পেছনের দিকে, আর আমরা বুঝতেও পারি না সবকিছু কীভাবে শ্বাস বন্ধ করে আছে, কারণ কেউ এদিকে তাকাচ্ছে না, তারপর সবকিছু মিলিয়ে যায়। এরই মধ্যে আমরা ওখানে দাঁড়াই শরীর নুইয়ে, তারপর উপরের দিকে তাকাই, দেখি যে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আমাদের আর মনে হচ্ছে

না যে হাওয়া বইছে, বরং আমরা ভেতরে ভেতরে জড়িয়ে ধরি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর স্মৃতি, ওদের ছাদ এবং ভাগ্যগুণে চোখা-কোনাওয়ালা চিমনিগুলো বেয়ে বাইরের অন্ধকার চুঁইয়ে পড়ছে বাড়ির ভেতরে, একদম চিলেকোঠা থেকে বিভিন্ন ঘরের মধ্যে। আর কী সৌভাগ্য যে কাল শুরু হবে আরেকটা নতুন দিন, যেদিন, যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক না কেন, আমরা সবকিছু দেখতে পাব।

এবার মাতাল লোকটা তার ভুরু এতই উপরে তুললেন যে তার ভুরু ও চোখের মাঝখানে একটা চকচকে কিছু দেখা গেল, আর তিনি খুচুনি দিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন: 'ব্যাপারটা এরকম, বুঝলে – আমার ঘুম পেয়েছে, বুঝলে, তাই আমি বিছানায় যাচ্ছি। ওয়েনসেস্‌লাস্ স্কোয়ারে আমার একটা শালা আছে, বুঝলে – আমি ওখানেই যাচ্ছি, কারণ আমি ওখানেই থাকছি, কারণ ওখানেই আছে আমার বিছানা। আমি ওখানে যাচ্ছি এখনই। শুধু আমি জানি না কী নাম তার আর সে কোথায় থাকে – মনে হয় আমি তা ভুলে গেছি – কিন্তু কোনো ব্যাপার না, কারণ আমার আদৌ কোনো শালা আছে কি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। ঠিক আছে, আমি চললাম। তোমার কি মনে হয়, তাকে কোনো দিন খুঁজে পাব আমি?'

আমি কোনোকিছু না চিন্তা করেই তাকে উত্তর দিলাম: 'নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন। কিন্তু আপনি এখানে আগন্তুক মানুষ আর যেভাবে হোক আপনার ভৃত্যদের আপনি হারিয়ে বসেছেন। চলুন আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। তাই আমি তাকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, তিনি আমার হাত ধরলেন।

ব্রেস্‌সায় উড়োজাহাজ

৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ তারিখে *লা সেন্টিনেল্লা ব্রেস্‌সিয়ানা* পত্রিকা আনন্দের সঙ্গে লিখছে : 'ব্রেস্‌সায় এত মানুষের সমাবেশ আগে আর কখনোই দেখা যায়নি, বিখ্যাত মোটরগাড়ির রেসের সময়গুলোতেও না; দর্শনার্থীরা ভিড় করেছে ভেনেসিয়া, লিগুরিয়া, পিয়েমন্তে, টোসকানা, রোম, এমনকি সেই নেপলস্‌ থেকেও; বিশিষ্টজনেরা এসেছেন ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা থেকে; সবাই ধাক্কাধাক্কি করছেন আমাদের স্কোয়ারগুলোতে, আমাদের হোটেলগুলোয়, আমাদের ব্যক্তিগত বাসাবাড়ির প্রতিটা খুঁতি কোনায়; সবকিছুর দাম জাঁকালোভাবে বেড়ে চলেছে; এত মানুষকে প্রদর্শনীর মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা অপ্রতুল; এয়ারফিল্ডের উপরে অবস্থিত রেস্টুরেন্টগুলো দুহাজার মানুষকে ভালোভাবেই সেবা দিতে সক্ষম, কিন্তু এরকম হাজার হাজার মানুষ হলে তাদের করার কীই-বা থাকে; বুফেগুলো রক্ষা করার জন্য ফৌজ মোতায়েনের প্রয়োজন পড়বে; এয়ারফিল্ডের সস্তা জায়গাগুলোতে দিনভর দাঁড়িয়ে থাকছে ৫০ হাজার দর্শক।'

এই খবর পড়ে আমার দুই বন্ধু ও আমার একই সঙ্গে আস্থা ও ভীতির অনুভূতি হলো। আস্থা : যেখানেই এরকম মারাত্মক ভিড় হয়, দেখা যায় সবকিছু মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলতে থাকে; আর যেখানে কোনো ফাঁকা জায়গাই নেই, সেখানে জায়গা খোঁজার দরকারও পড়ে না। ভীতি : এ ধরনের সাহসী উদ্যোগ সফলভাবে আয়োজনের ইতালীয় পদ্ধতি নিয়ে ভীতি, আমাদের দেখভালের জন্য যেসব কমিটি নিয়োজিত থাকবে তাদের নিয়ে ভীতি, ট্রেন পাওয়া-না-পাওয়া নিয়ে ভীতি, এ ব্যাপারে *সেন্টিনেল্লা* এরই মধ্যে চার ঘণ্টা দেরির কথা ঘোষণা করে রেখেছে।

সব প্রত্যাশা মিথ্যা হয়ে যায়; কীভাবে যেন সব ইতালিয়ান স্মৃতিই ঘরে ফিরে আসার পর গোলমেলে হয়ে যায়; ওগুলো স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে, এগুলোর ওপর আর ভরসা রাখা যায় না।

আমাদের ট্রেন ব্রেস্‌সা স্টেশনের অন্ধকার গহ্বরে ঢুকতেই আমরা দেখলাম মানুষজন এমনভাবে চিৎকার করছে যেন তাদের পায়ের নিচের মাটি জ্বলছে, আমরা তখনো ভাবগম্ভীরভাবে একে অন্যকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি যে, যা-ই ঘটুক না কেন একসঙ্গে দল বেঁধে থাকতে হবে। আমরা কি একধরনের বৈরিতা নিয়েই ব্রেস্‌সায় পৌঁছলাম না?

সবাই ট্রেন থেকে নামলাম; চাকার উপরে নড়বড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন একটা ভাড়া-করা ঘোড়ার গাড়ি আমাদের অর্ভ্যথনা জানাল; গাড়ির চালক মহা খোশমেজাজে আছেন; প্রায় ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আমরা গিয়ে হাজির হলাম 'প্যালেস অব দি কমিটি'তে, ওখানে পৌঁছে আমাদের ভেতরকার বিদ্বেষের ভাবটা এমনভাবে দূর হয়ে গেল, যেন ওটার কোনো অস্তিত্ব আদতে ছিল না; যা যা দরকার সব বলা হলো আমাদের। যে পান্থশালায় আমাদের যেতে বলা হলো সেটা প্রথম দেখাতে লাগল যে আমরা এরকম নোংরা কিছু আগে কোনো দিন দেখিনি, কিন্তু একটু সময় যেতেই ওটা ততটা ভয়াবহ খারাপ বলে আর মনে হলো না। একটা ময়লা যা কিনা ধরুন পড়ে আছে ওখানটায়, যেটা নিয়ে আর কেউ কোনো কথা বলছে না, এমন একটা ময়লা যা কখনোই বদলায় না, যেটার কিনা শিকড় গজিয়ে গেছে, যা মানুষের জীবনকে কোনো-না-কোনোভাবে আরো দৃঢ় ও পার্থিব করে তোলে, একটা ময়লা যার ভেতর থেকে আমাদের আমন্ত্রণকর্তা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির হলেন, নিজেকে নিয়ে গর্বিত তিনি, আমাদের প্রতি বিনয়নম্র, তার কনুইগুলো বিরামহীন নড়াচড়ার মধ্যে আছে আর তার হাত দুটো (প্রতিটা আঙুল একটা করে শুভেচ্ছার বাণী) তার মুখের উপরে ফেলছে নিয়ত বদলাতে থাকা ছায়া, তিনি হাজির হলেন কোমর থেকে অনবরত কুর্নিশ করতে করতে, যে কুর্নিশটা আমরা পরে দেখেই চিনে ফেলতাম গ্যাব্রিয়েল দান্নুনৎসিও এয়ারপোর্টে, বিমান ওড়ার এয়ারফিল্ডে; কে আছে যার এরকম একটা ময়লা নিয়ে কোনো আপত্তি থাকবে?

এয়ারফিল্ডটা মনটিকিয়ারিতে, মান্তুয়া যাওয়ার লোকাল রেলে চাপলে ওখানে এক ঘন্টারও কম সময়ে পৌঁছানো যায়। এই লোকাল রেলওয়ে জনসাধারণের হাইওয়ের উপর নিজের জন্য একটা ট্র্যাক বানিয়ে রেখেছে, ওটার উপর দিয়ে সে তার ট্রেনগুলো চালায় পরিমিত গতিতে, বাকি যানবাহনগুলোর চাইতে জোরেও না, আস্তেও না; ট্রেনগুলো ওভাবেই চলে বাইসাইকেল চালকদের মাঝখান দিয়ে, ওরা প্রায় চোখ বুঁজে সাইকেলের প্যাডেল মারতে থাকে ধুলোর মধ্যে; সারা প্রদেশের একেবারে বাতিল হয়ে যাওয়া চার-চাকার ঘোড়ার গাড়িগুলোর (ওগুলোতে ওঠানো হয় যত খুশি তত লোক, তার পরও কীভাবে যে ওগুলো ওরকম জোরে ছোটে তা মাথায় আসে না) মাঝখান দিয়ে চলে ওরা, আরো চলে বিশাল আকারের মোটরগাড়িগুলোর মধ্যে দিয়েও; গাড়িগুলো দেখেই মনে হয় যেন একদম গোঁ ধরে আছে ছাড়া মাত্রই উল্টে যাবে, ওগুলোর অসংখ্য ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ কীরকম ঝটিতেই সব মিলে একটা উচ্চনাদে চিৎকারের মতো শোনায়।

কখনো কখনো মনে হয় এই শোচনীয় ট্রেনে করে বিমান-প্রদশর্নীর মাঠে পৌঁছানোর আর কোনো আশা নেই। কিন্তু আমাদের চারপাশে ট্রেনে লোকজন হো-হো করে হাসছে, আর ডান ও বাঁ দিকে প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্যরাও হাসছে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে। আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা শেষ প্ল্যাটফর্মে, এক বিশালদেহী লোকের গায়ে হেলান দিয়ে, তিনি দুটো রেলবগির দুদিকে দুই পা রেখে, রেল ইঞ্জিনের সংঘর্ষ ঠেকানোর যন্ত্রের উপরে

দাঁড়িয়ে আছেন, রেলবগিগুলোর হালকা দুলতে থাকা ছাদের থেকে বৃষ্টির মতো ধোঁয়ার কালির গুঁড়া আর ধুলো পড়ছে তার গায়ে। দুইবার ট্রেনটা থামল স্টেশনের দিকে আসতে থাকা একটা ট্রেনের জন্য, এত ধৈর্য নিয়ে এত লম্বা সময় দাঁড়াল যে মনে হচ্ছে ওটা কোনো দৈবাৎ সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে। জানালার বাইরে কয়েকটা গ্রাম ধীরে চলে গেল, এখানে ওখানে দেয়ালে গতবারের মোটরগাড়ির রেসিংয়ের পোস্টারগুলো যেন চেঁচাচ্ছে, রাস্তার পাশের গাছগাছড়াগুলো চেনাই যাচ্ছে না সাদা ধুলোয় ঢেকে জলপাই পাতার রঙের চেহারা নেওয়ার কারণে।

যেহেতু আর সামনে যাওয়ার পথ নেই, ট্রেন অবশেষে থেমে দাঁড়াল। এক দল মোটরগাড়ি ব্রেক কষল একই সঙ্গে; ঘুরপাক খেয়ে উপরে ওঠা ধুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখলাম অনেক ছোট ছোট পতাকা উড়ছে, বেশি দূরে নয়; আমরা তখনো আটকা পড়ে আছি একদল গবাদিপশুর কারণে, ওগুলো বুনো উত্তেজনায় সামান্য উঁচু পাহাড়ি পথ বেয়ে নামছে আর উঠছে, সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ছে মোটরগাড়িগুলোর উপরে।

আমরা পৌঁছালাম। বিমানঘাঁটির সামনে একটা বড় খোলা জায়গায় ছোট ছোট সন্দেহজনক চেহারার কাঠের চালাঘর, ওগুলোর গায়ে যেসব নাম লেখা – গ্যারেজ, গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বুফে, ইত্যাদি – সেগুলো আমরা আশা করিনি। বড় শরীরের অনেক ভিক্ষুক, ওরা ওদের পলকা ঠেলাগাড়িতে থেকে থেকে মোটা হয়েছে, আমাদের পথের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তড়িঘড়ির কারণে ওদেরকে দেখে ইচ্ছে হচ্ছে লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাই। অনেক মানুষ পেছনে ফেলে আমরা এগোলাম, অনেক মানুষ আমাদের পিছনে ফেলল। আমরা আকাশের দিকে তাকালাম, এখানে ওটাই সত্যিকারের চিন্তার বিষয়। খোদাকে ধন্যবাদ যে কেউ এখনো মনে হচ্ছে আকাশে ওড়েনি! কারোর জন্যই আমরা সরে গিয়ে পথ করে দিইনি, তবু এখনো কেউ আমাদের উপর দিয়ে চলে যায়নি। হাজার হাজার যানবাহনের মাঝখানে আর পেছনদিকে, উল্টোদিক দিয়ে দুলে দুলে আসছে ইতালিয়ান অশ্বারোহী সেনাদল। তার মানে দুর্ঘটনা ঘটার কোনো সুযোগ নেই – সেই সঙ্গে শৃঙ্খলারও সম্ভাবনা নেই বিশেষ একটা।

সন্ধ্যার অনেক পরে ব্রেস্সায় ফিরে আমরা চাচ্ছিলাম জলদি একটা নির্দিষ্ট রাস্তায় পৌঁছাতে, আমাদের সবারই মতে সেটা বেশ দূরের পথ। একটা ঘোড়ার গাড়ি দাম হাঁকল তিন লিরা, আমরা বললাম দুই। গাড়ির চালক আমাদের নিতে রাজি হলেন না, কিন্তু স্রেফ দয়ার কারণেই আমাদের শোনালেন যে ঐ রাস্তাটা কত ভয়াবহ দূরে। আমাদের লজ্জা হতে লাগল আগের দরাদরির কারণে। ঠিক আছে তাহলে, তিন লিরা। আমরা গাড়িতে চড়লাম, অল্প পথের তিনটে বাঁক নিল গাড়ি, আমরা পৌঁছে গেলাম কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। ওটো, আমাদের বাকি দুজনের থেকে ওর শক্তি বেশি, জানাল যে এই এক মিনিটের মাত্র পথের জন্য তিন লিরা দেওয়ার ওর সামান্যতম ইচ্ছাও নেই। এক লিরাই বরং বেশি হয়ে যায়। এই যে, এক লিরা। এরই মধ্যে রাত নেমে এসেছে, ছোট রাস্তাটা ফাঁকা, ঘোড়াগাড়ির চালক বেশ শক্তপোক্ত গড়নের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এমন খেপে উঠলেন যেন আমরা তর্কটা

করছি এক ঘণ্টা ধরে : কী? – আমরা তো তাকে ঠকাচ্ছি। – আমরা ভাবছি কী নিজেদের। – তিন লিরার কথা হয়েছিল, তিন লিরাই দিতে হবে, এক্ষুনি তিন লিরা বের করতে হবে নতুবা আমাদের বিস্মিত হওয়ার বেশি বাকি নেই। ওটো : 'ভাড়ার তালিকা দেখাবেন নাকি পুলিশ ডাকব!' ভাড়ার তালিকা? এসব কোনো তালিকা-টালিকা নেই। – ভাড়ার আবার তালিকা থাকে নাকি? – রাতের গাড়ির চুক্তি করেছেন আপনারা, কিন্তু ঠিক আছে যদি দুই লিরা দিই, তিনি আমাদের যেতে দেবেন। ওটো, এতক্ষণে ভয়ংকর রকমের একগুঁয়ে : 'ভাড়ার তালিকা নাকি পুলিশ!' এরপর আরো কিছু চিৎকার আর খোঁজাখুঁজি, শেষে বের হলো একটা ভাড়ার তালিকা, ওটাতে ধুলো ছাড়া দেখা যাচ্ছে না আর কিছুই। শেষে আমরা রাজি হলাম দেড় লিরায়, গাড়িচালক সরু গলিপথ ধরে সামনে চলতে লেগেছে, এত সরু যে তার পক্ষে গাড়ি ঘোরানো সম্ভব নয়; আমার মনে হলো তিনি শুধু প্রচণ্ড রেগেই যাননি, দুঃখও পেয়েছেন। কারণ আমাদের ব্যবহার, দুঃখজনকভাবে, ঠিক ছিল না; ইতালিতে এরকম ব্যবহার করা যায় না; অন্য কোথাও হয়তো এমনটা করা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে না। ঠিক আছে, কিন্তু উত্তেজনার সময়ে কার মনে থাকে সে কথা! এ নিয়ে বিলাপ করার কিছু নেই, স্রেফ এক সপ্তাহের এই বিমান-প্রদর্শনীর জন্য কেউ তো আর ইতালিয়ান হয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু আমরা চাই না বিবেক-যন্ত্রণা আমাদের বিমান ওড়ার মাঠের আনন্দকে নষ্ট করুক, ওতে স্রেফ আরো নতুন বিবেক-যন্ত্রণাই জন্ম নেবে; আর তারপর বিমানঘাঁটিতে আমরা হাঁটি না, ছুটে যাই, আমাদের সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সেই মহা উৎসাহ নিয়ে যা হঠাৎ আমাদের ঘিরে ধরে এই সূর্যের নিচে, আমরা হ্যাঙারগুলো পেরিয়ে আসি, ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া মঞ্চের মতো ওগুলো দাঁড়িয়ে আছে পর্দা নামিয়ে। ওদের সামনের উপরের দিকে তিন কোনা জায়গায় বৈমানিকদের নাম লেখা, যাদের বিমান আছে ঐ পর্দার পেছনে, আর উপরে উড়ছে তাদের যার যার দেশের পতাকা। আমরা নামগুলো পড়ি – কোবিয়ানচি, কাগ্‌নো, কালদেরারা, রুঝে, কার্টিস, মন্‌চের (ইনি ট্রেন্‌টো থেকে আসা একজন টাইরোলিয়ান মানুষ, উড়ছেন ইতালিয়ান পতাকা নিয়ে, স্পষ্ট যে উনি আমাদের চেয়ে ইতালিয়ানদের ওপর বেশি আস্থা রাখেন), আন্‌জানি, রোমান বৈমানিক ক্লাব। আর ব্লেরিও? আমরা জিজ্ঞাসা করি। ব্লেরিও, যার কথা আমরা সারাক্ষণ ভাবছি, কোথায় সেই ব্লেরিও?

তার হ্যাঙ্গারের সামনের বেড়া দেওয়া ছোট জায়গাটায় রুঝে শুধু একটা জামা পরে এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছেন, খাটো একটা মানুষ, চোখে পড়ার মতো বড় নাক। হিংস্র অঙ্গভঙ্গি করে তিনি তাঁর হাত ছুড়ছেন সামনের দিকে, চলতে চলতে নিজের সারা গায়ে সমানে চাটি মারছেন, তার মেকানিকদের হ্যাঙ্গারের পর্দার পেছনে পাঠাচ্ছেন, আবার ডাকছেন ওদের, নিজে ভেতরে গিয়ে ঢুকছেন, সামনে তাড়িয়ে নিচ্ছেন সবাইকে, আর ওনার স্ত্রী সে সময় এক পাশে একটা আঁটোসাঁটো সাদা পোশাক পরে, চুলের মধ্যে শক্ত করে একটা ছোট কালো হ্যাট চেপে বসিয়ে, ছোট স্কার্ট পরা পা দুটো পরিমিত ফাঁক করে

দাঁড়িয়ে, স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন শূন্য গরম বাতাসের দিকে, ব্যবসায়ী মহিলা তিনি – তাই তার ছোট মাথার মধ্যে যত ব্যবসার চিন্তা।

পরের হ্যাঙ্গারের সামনে বসে আছেন কার্টিস, একদম একা। অল্প উঁচু করে পর্দার ফাঁক দিয়ে তার বিমানটা দেখা যাচ্ছে; লোকজন যা বলছে তার চেয়ে আকারে বড় সেটা। আমরা যখন হেঁটে পার হচ্ছি, কার্টিস তার হাতে ধরে আছেন *নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড* পত্রিকা, একটা পাতার উপরের দিকে কোনো লাইন পড়ছেন; আধা ঘণ্টা পরে আমরা আবার একই জায়গা দিয়ে গেলাম, তিনি এরই মধ্যে ঐ পাতাটার মাঝ-বরাবর পৌঁছেছেন; আরো আধা ঘণ্টা পরে পাতাটা তিনি পড়া শেষ করলেন, এবার অন্য নতুন একটা নিলেন হাতে। এটা পরিষ্কার, আজ তিনি আকাশে উড়বেন না।

আমরা ঘুরলাম, তাকিয়ে থাকলাম এয়ারফিল্ডের বিশাল ফাঁকা জায়গাটার দিকে। এটা এত বড় যে এর উপরের সবকিছু মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত, ফেলে রাখা : আমাদের কাছের জয়সূচক খুঁটিটা, দূরে সিগন্যালের লম্বা খুঁটি, একটু ডান দিকে বিমান ওড়া শুরুর গুলতির মতো যন্ত্রটা। কমিটির একটা মোটরগাড়ি মাঠ জুড়ে বাঁক নিয়ে চলেছে, ওটা থেকে উড়ছে বাতাসে টান টান একটা ছোট হলুদ পতাকা, গাড়িটা নিজের ওড়ানো ধুলোর মধ্যেই থামল একবার, আবার চলতে লাগল।

এখানে প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এই অঞ্চলে এরা কৃত্রিম বিরানভূমি বানিয়েছে একটা, আর ইতালির কুলীন সম্প্রদায়, প্যারিসের [illegible]লে রমণীকুল এবং অন্য আরো হাজারো জন এখানে ভিড় করেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ ছোট করে এই রোদে ভরা বিরান শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকতে। খেলার মাঠে সাধারণত বৈচিত্র্য আনে এরকম কোনোকিছুর এখানে দেখা মিলবে না। রেসিং ট্র্যাকের সুন্দর এই বাঁধাগুলো কিংবা টেনিস কোর্টের চারপাশে সাদা দাগ, কিংবা ফুটবল মাঠের তাজা ঘাসের চাপড়া, মোটরগাড়ির ও বাইসাইকেল রেসিং ট্র্যাকের নুড়ি পাথর বসানো উর্ধ্ব আর নিম্নগামী বক্রিমা – কিছুই না। বিকেলে শুধু দুই কি তিন বার দেখা যাবে সামনের সমতলভূমিতে বর্ণিল পোশাকে ছোট অশ্বারোহী সেনাদল দুলকি চালে চলছে। ঘোড়াগুলোর খুর চোখে পড়বে না ধুলোর কারণে, আর সূর্যের মসৃণ আলো প্রায় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একই রকম থাকবে। আর কিছুতেই যেন আমাদের মনোযোগের বিঘ্ন না ঘটে তাই এই খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকার পুরোটা সময় এখানে কোনো গানবাজনারও ব্যবস্থা নেই, শুধু সস্তা টিকিটের দাঁড়িয়ে-দেখার-জায়গাগুলো থেকে লোকজনের শিস শুনেই কোনোমতে আমাদের মেটাতে হবে কানের চাহিদা, পাস করতে হবে ধৈর্যের পরীক্ষায়। তবে ধরুন, আমাদের পেছনের আরো দামি স্ট্যান্ডে বসে আপনি দেখছেন, তখন তা শিস্ বাজানো ওই লোকের দলকে নিশ্চিত মনে হবে যে বিরানভূমির সঙ্গে তারা মিলিয়েই গেছে।

কাঠের রেলিংয়ের এক জায়গায় বেশ অনেক লোকের একটা ভিড় জমেছে। 'কী ছোট!' ফরাসিদের একটা দল মনে হয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। হচ্ছেটা কী? আমরা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কাছে গেলাম। দেখলাম ঐখানে মাঠে, আমাদের একেবারে কাছেই, একটা

ছোট হলুদ উড়োজাহাজ, ওটা ওড়ার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। এবার আমাদের চোখে পড়ল ব্লেরিওর হ্যাঙার, তার পাশে তার ছাত্র লা ব্লাঁ-র হ্যাঙার; একেবারে মাঠের উপর বসানো হয়েছে এই হ্যাঙার দুটো। উড়োজাহাজের দুই ডানার একটার গায়ে হেলান দিয়ে আছেন, দেখেই চেনা যাচ্ছে, স্বয়ং ব্লেরিও, তিনি তাঁর দুই কাঁধ কানের কাছে কুঁজের মতো উঁচু করে নিবিড়ভাবে দেখছেন উড়োজাহাজের ইঞ্জিনে তাঁর মেকানিকদের কাজকর্ম।

এই তুচ্ছ জিনিসটা নিয়ে কি তিনি আকাশে উড়তে চাইছেন নাকি? উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পানিতে মানুষের জন্য বিষয়টা কত সহজ। প্রথমে অনুশীলন করে নেওয়া যায় কোনো পানি ভর্তি ডোবায়, তারপর কোনো পুকুরে, তারপর নদীতে, আর তার অনেক দিন পরে আপনার সাহস আসবে মহাসাগরে নামার; আর আকাশের বেলায়? এই লোকগুলোর জন্য সোজা এক মহাসমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই।

ব্লেরিও এরই মধ্যে বসে গেছেন তাঁর আসনে, হাত রেখেছেন একটা লেভার না যেন কিসের উপরে; তারপর তাঁর মেকানিকেরা এখনো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ওরা সব অতি-উৎসাহী ছেলেপেলে। তিনি ধীরে আমাদের দিকে চোখ ফেরালেন, আবার এদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন, অন্য কোনো দিকে তাকালেন, কিন্তু যা-ই করুন তাঁর সত্যিকারের দৃষ্টি সব সময় নিজের দিকেই নিবদ্ধ। এবার উনি ওড়া শুরু করবেন, এর চেয়ে সরল-স্বাভাবিক আর কিছু হয় না। ওড়া নিয়ে স্বাভাবিকের এই বোধ, এর পাশাপাশি চারপাশে সবার মধ্যে অস্বাভাবিকতার এক অনুভূতি যা তিনি এড়াতে পারছেন না, এই দুয়ে মিলেই ওনার মধ্যে দিয়েছে একরকম ভাবসাব।

একজন সহকারী প্রপেলারটা চালানোর জন্য ওটার একটা ব্লেড ধরলেন, তিনি ওটাতে একটা হেঁচকা টান দিতেই ওটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল, আওয়াজ উঠল কোনো শক্ত-সবল মানুষের ঘনঘন শ্বাস টানার মতো; কিন্তু প্রপেলারটা তার পরও প্রাণহীন। তিনি আবার চেষ্টা করলেন, দশ বার চেষ্টা করলেন, কোনো কোনো বার প্রপেলার তক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর কোনোবার কয়েকটা ঘুরান দেওয়ার চেয়ে বেশি আর কিছু করতে চাইছে না। সমস্যা ইঞ্জিনে। আবার নতুন করে কাজ শুরু হলো, দর্শকেরা যারা কাজটা করছে তাদের চাইতেও বেশি ক্লান্ত। ইঞ্জিনকে প্রত্যেকটা কোনা থেকে তেল মাখানো হচ্ছে; লুকানো স্ক্রুগুলো ঢিলা করে ফের টাইট করা হচ্ছে; একজন লোক হ্যাঙারে দৌড়ে গেল, একটা খুচরা যন্ত্রাংশ নিয়ে এল; দেখা গেল ওটা মিলছে না; আবার সে ফেরত গেল, তারপর হ্যাঙারের মেঝেতে উবু হয়ে বসে দুই হাঁটুর মাঝখানে ওটাতে হাতুড়ি দিয়ে মারতে লাগল। ব্লেরিও একজন মেকানিকের সঙ্গে আসন বদল করলেন, মেকানিক লা ব্লাঁ-র সঙ্গে। এই কেউ একজন প্রপেলার ধরে আবার টান মারছে, এই অন্য কেউ। কিন্তু ইঞ্জিনটা কৃপাহীন; ঠিক একটা স্কুলছাত্রের মতো যাকে সব সময় সবাই সাহায্য করছে, পুরো ক্লাস তাকে উত্তরটা ধরিয়ে দিচ্ছে, না, তা-ও সে পারছে না, আবার এবং আবার সে আটকে যাচ্ছে, আবার আবার আটকে যাচ্ছে সেই একই জায়গায়, তারপর শেষমেশ হাল ছেড়ে দিচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণের জন্য ব্লেরিও

চুপচাপ বসে থাকলেন তাঁর আসনে, তাঁর ছয় সহকারী নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে ঘিরে; সবাই মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছে।

দর্শকেরা কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস ফেলার একটু সময় পেল, তাকাল তাদের চারপাশে। ব্লেরিওর অল্পবয়সী স্ত্রী, তাঁর চেহারায় মা ভাব, হাজির হলেন, তাঁর পেছনে দুটো বাচ্চা। তাঁর স্বামী যদি উড়তে না পারেন, তাহলে তিনি মন খারাপ করবেন, আর যদি ওড়েনই, তাহলে তিনি ভয়ে থাকবেন; এর ওপরে তার সুন্দর পোশাকটা এই আবহাওয়ার হিসেবে একটু বেশি ভারী।

আরো একবার প্রপেলার ঘোরানো হলো, হয়তো আগের চেয়ে এবারে ভালো অবস্থা, হয়তো না; ইঞ্জিন চালু হলো প্রচণ্ড শব্দ করে, যেন এটা অন্য কোনো ইঞ্জিন; চারজন মানুষ উড়োজাহাজটা ধরে থাকল পেছনের দিকে, আর চারপাশের নিঃসাড় অবস্থার মধ্যে ওই ঘুরতে থাকা প্রপেলার থেকে হাওয়ার দমক এসে লোকগুলোর গায়ের আসল জামাকাপড়ের উপর পরা লম্বা ঢিলে কাপড়গুলো নাড়িয়ে কাঁপিয়ে যেতে লাগল। একটা কথাও বোঝা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে শুধু প্রপেলারের আওয়াজই এখানকার রাজা; আটটা হাত এবার উড়োজাহাজটা ছেড়ে দিল, ওটা মাটি-কাদার উপর দিয়ে অনেক দূর দৌড়ে গেল নাচের উঠানে কোনো আনাড়ি শিল্পীর মতো।

কতবার যে এরকম চেষ্টা চালানো হলো, কিন্তু প্রতিটা চেষ্টাই শেষ হলো হতাশায়। প্রত্যেকবারই লোকজন পায়ের উপর উঠে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়িয়ে পড়ছে তাদের খড়ের জাজিম দেওয়া চেয়ারের উপর, শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করছে দুই হাত দুপাশে বাড়িয়ে আর একই সঙ্গে এভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছে তাদের আশা, উদ্বেগ ও আনন্দ। বিরতির সময়গুলোতে ইতালির কুলীন সম্প্রদায়ের ওনারা স্ট্যান্ডগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শুভেচ্ছা আর কুর্নিশ বিনিময় হচ্ছে, লোকজন একে অন্যকে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরছে, স্ট্যান্ডের সিঁড়ির ধাপগুলোয় তারা ওঠানামা করেই চলেছে। লোকজন একে অন্যকে দেখাচ্ছে ঐ যে প্রিন্সেস ল্যাটিসিয়া সাভোইয়া বোনাপার্ত, ঐ যে প্রিন্সেস বোরগেসে, আর ঐ যে বয়স্কা মহিলা যার মুখ কালো হলদে আঙুলের মতো – কাউন্টেস মোরেসিনি। মার্চেল্লো বোরগেসে একই সঙ্গে সব ভদ্রমহিলার দেখাশোনা করছেন, আবার কারোরই করছেন না, দূর থেকে তার চেহারাটার একটা মানে দাঁড়াচ্ছে বটে, কিন্তু কাছ থেকে দেখলে যেভাবে তার গাল দুটো তার মুখের দুই কিনার ঘিরে রেখেছে, তা দেখতে লাগছে বেশ অদ্ভুত। গ্যাব্রিয়েল দান্নুনৎসিও, ছোটখাটো ও দুর্বল, মনে হচ্ছে নেচে চলেছেন কাউন্ট ওল্‌দোফ্রেদির সামনে দিয়ে, এই কাউন্ট কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণদের একজন। দেখা যাচ্ছে উপরে স্ট্যান্ডের রেলিং থেকে নিচে তাকিয়ে আছে পুচ্চিনির কঠিন মুখ, তার নাকটা দেখতে কোনো মাতালের নাকের মতো।

তবে এইসব মানুষকে আপনার কেবল তখনই চোখে পড়বে যখন আপনি তাদের খুঁজছেন। তা যদি না হয় তাহলে আপনি শুধু চারপাশে দেখবেন হালফ্যাশনের দীর্ঘদেহী রমণীদের, তাদের উপস্থিতি বাকি সবকিছু ছায়ায় ঢেকে দিয়েছে। তারা বসার চেয়ে হাঁটা-

ই বেশি পছন্দ করে, কারণ তাদের পোশাকগুলো বসার জন্য ঠিক জুতসই না। এশীয় ধাঁচের নেকাবে ঢাকা তাদের মুখগুলো কেমন মৃদু আধো-আলোকিত। তাদের পোশাকের কারণে (যার উপরের দিকটা ঢিলেঢালা) তাদের পুরো শরীর পেছন থেকে দেখতে লাগছে দ্বিধান্বিত; এরকম রমণীদের যখন দ্বিধান্বিত লাগে, তখন কী একটা মিশ্র ও শান্তি-নষ্ট-করা ভাব হয় মনের মধ্যে! এদের বক্ষবন্ধনী বেশ নিচুতে, এত নিচুতে যে ওখানে পৌঁছানো যাবে না; তাদের কোমর দেখতে লাগছে স্বাভাবিকের চাইতে ঘেরে বড়, কারণ সবকিছু যে অত সরু; এই রমণীদের আলিঙ্গন করতে হবে শরীরের নিচের দিকে।

এতক্ষণ যা দেখলাম তা কেবল লা ব্লাঁ-র উড়োজাহাজ। কিন্তু এবার এল সেই উড়োজাহাজ, যেটাতে করে ব্লেরিও চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন; কেউ তা বলে দেয়নি, কিন্তু সবাই জানে। একটা দীর্ঘ বিরতি, তারপর ব্লেরিও আকাশে, দেখা যাচ্ছে তার শরীরের উপরের অংশ ডানার ওপরে তিনি টান টান করে রেখেছেন, তার পাগুলো ভেতরে কোথাও ঝুলছে প্লেনের যন্ত্রপাতির মাঝখানে। সূর্য নিচে নেমে এসেছে, আর স্ট্যান্ডের শামিয়ানার নিচে আলো ফেলে ঝলক মারছে দুলতে থাকা ডানায়। সবাই তাঁর দিকে উপরে তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে, কারোর মনেই এখন আর অন্য কিছুর জন্য স্থান নেই। তিনি একটা ছোট বৃত্তাকারে উড়ে গেলেন, তারপর প্রায় খাড়া আমাদের মাথার উপরে দেখা গেল তাকে। সারসের মতো গলা বের করে সবাই তাকিয়ে দেখছে কীভাবে তার প্রতিপাশে-এক-পাখার উড়োজাহাজটা দুলছে, কীভাবে ব্লেরিও ওটা নিয়ন্ত্রণ করছেন আর আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছেন। ঘটছেটা কী এখানে? আমাদের মাথার উপরে, মাটি থেকে বিশ মিটার উপরে, একজন মানুষ আটকে আছেন একটা কাঠের খাঁচায়, লড়াই করে যাচ্ছেন এক অদৃশ্য বিপদের সঙ্গে, এর মোকাবিলা তাঁর নিজের খুশিতেই। আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি নিচে কোথায়, খোঁয়াড়ের মধ্যে পরিত্যক্ত ও নিরর্থক হয়ে, দেখছি তাঁকে।

সবকিছু ভালোভাবেই এগিয়ে চলছে। একই সময়ে সিগন্যালের খুঁটি দেখে বোঝা গেল বাতাস এখন আরো অনুকূলে এবং কার্টিস এবার উড়বেন ব্রেস্‌সার গ্র্যান্ড প্রাইজের জন্য। তাহলে তিনি উড়তে যাচ্ছেন, সত্যিই? আমরা তথ্যটা ঠিকমতো হজমও করতে পারিনি, কার্টিসের ইঞ্জিন গজরাতে শুরু করল; তাকে ঠিকমতো দেখেই উঠিনি, তিনি উড়ে আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন; তার সামনে বিস্তৃত সমতলভূমির উপর দিয়ে উড়ছেন তিনি, দূরে বনের দিকে চলে যাচ্ছেন, এই প্রথমবারের মতো বনটা মনে হয় জেগে উঠেছে। ঐ বনের উপর দিয়ে তিনি উড়লেন যেন বহুকাল, হারিয়ে গেলেন, আমরা তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে না, বনের দিকে। কতগুলো ঘরবাড়ির পেছন থেকে, কোথায় তা খোদাই জানেন, তিনি আবির্ভূত হলেন আবার, ঠিক আগের উচ্চতায়, ধেয়ে আসতে লাগলেন আমাদের দিকে; যখন তিনি উপরে উঠছেন, তখন তার দুই জোড়া-পাখার উড়োজাহাজের তলাটা দেখা যাচ্ছে অন্ধকার হয়ে আসছে, যখন তিনি নিচের দিকে ডুব মারছেন, ওটার উপরের অংশটা ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়। সিগন্যাল খুঁটি বেড় দিয়ে তিনি ফিরে এলেন, তাঁকে সম্ভাষণ জানানো চিৎকারের দিকে কোনো খেয়াল নেই তাঁর,

তারপর ঘুরে গেলেন সোজা সেই পথে যেদিক থেকে এসেছেন, স্রেফ যেন দ্রুত আবার একাকী ও ক্ষুদ্র হওয়ার বাসনা থেকেই। এরকম বৃত্তাকারে পাঁচ বার ঘোরা শেষ করলেন তিনি, ৪৯ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে উড়লেন ৫০ কিলোমিটার আর তা দিয়ে জিতে নিলেন ব্রেস্সার গ্র্যান্ড প্রাইজ, ৩০ হাজার লিরা। এটা একটা নিখুঁত কৃতিত্ব, কিন্তু কোনো নিখুঁত কৃতিত্বকে কখনোই উদ্যাপন করা যায় না, শেষমেশ গিয়ে সবাই ভাবে যে নিখুঁত কৃতিত্ব দেখাতে সবাই পারে, নিখুঁত কৃতিত্ব দেখানোর জন্য যেন কোনো সাহসের প্রয়োজন নেই। যখন কার্টিস ওখানে ওই বনের উপরে একা ঘাম ঝরিয়ে যাচ্ছেন, যখন তাঁর স্ত্রী (ইতোমধ্যে সবাই তাঁকে ভালোমতো চিনে গেছে) তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় মগ্ন, এদিকে লোকজন যেন তাকে প্রায় ভুলেই বসেছে। চতুর্দিকে শুধু শোনা যাচ্ছে এই অভিযোগ যে কালদেরারা উড়বেন না (তাঁর উড়োজাহাজ ভেঙে গেছে), বুঝে দুই দিন যাবৎ তার ভইসিন উড়োজাহাজটা নিয়ে নাড়াচাড়াই করেছেন, ওটাকে মুক্তি দেননি তবু, ইতালিয়ান আকাশে চলার বেলুন জোডিয়াক এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। কালদেরার এই দুর্ভাগ্য নিয়ে চারদিকে চলতে থাকা গুজব তাকে এমন যশ-গৌরব দান করেছে যে আপনার একান্তভাবেই মনে হবে তার রাইট-ভাইদের ঐ উড়োজাহাজের থেকে বরং তাঁর জাতির ভালোবাসাই তাকে আরো নিরাপদে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

কার্টিস তাঁর ওড়া তখনো শেষ করেননি, শোনা গেল আরো তিনটে হ্যাঙারে এরই মধ্যে ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে, যেন সংক্রামক এক প্রবল উদ্দীপনায় পেয়েছে ওগুলোকে। দুটো মুখোমুখি দিক থেকে ভয়ংকর ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসছে বাতাস ও ধুলা। একজোড়া চোখ এ সবকিছু দেখার জন্য যথেষ্ট না। আমরা আমাদের আসনে মোচড়াচ্ছি, ঘুরে যাচ্ছি, হেলে পড়ছি, কাউকে ধরে বসছি, বলছি যে আমরা দুঃখিত, অন্য কেউ হেলে-নুয়ে পড়ছে, আমাদের আঁকড়ে টেনে ধরছে, আমরা ধন্যবাদ পাচ্ছি। ইতালিয়ান শরতের সাঁঝবেলার পূর্বাভাস শুরু হয়েছে, আর মাঠে সবকিছু পরিষ্কার দেখা সম্ভব না।

কার্টিস তাঁর বিজয়ীর উড়ান শেষ করে সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পরপরই (আমাদের এদিকে না-তাকিয়েই তিনি একটা ক্ষীণ হাসি দিয়ে তাঁর মাথার টুপি তুললেন), ব্লেরিও একটা সংক্ষিপ্ত বৃত্তাকার ওড়ার জন্য যাত্রা শুরু করে দিলেন, এর আগে দেখার কারণে সবাই জানে তিনি সেটা পারেন! বোঝারই উপায় নেই কাকে সবাই করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে – কার্টিসকে, নাকি ব্লেরিওকে, নাকি এতক্ষণে রুঝেকে যার বিশাল ভারী উড়োজাহাজটা এবার আকাশে উঠবার পথে। রুঝে তাঁর নিয়ন্ত্রণ আসনে বসে আছেন লেখার টেবিলে বসা কোনো ভদ্রলোকের মতো; একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে পেছন থেকে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। তিনি উপরে উঠছেন বৃত্তাকারে, ব্লেরিওরও উপরে উঠে গেছেন, ব্লেরিওকে একজন দর্শক বানিয়ে ফেলেছেন তিনি, তারপর আরো উপরে উঠেই যাচ্ছেন।

আমাদের যদি ঘোড়াগাড়ি পেতে হয়, তাহলে এখনই এখান থেকে বেরোতে হবে; অনেক মানুষ এরই মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে আমাদের পার হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি, শেষের এই উড়ানগুলো সব পরীক্ষামূলক, যেহেতু এরই মধ্যে ৭টা প্রায় বেজে

গেছে তাই এগুলো অফিশিয়ালি আর গোনায় ধরা হবে না। বিমানঘাঁটিতে ঢোকার পথের মোটরগাড়ির পার্কিং এলাকায় ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মাইনে-বাঁধা চালক আর ভৃত্যেরা তাদের সিটের উপর দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে রুঝেকে দেখাচ্ছে; বিমানঘাঁটির বাইরে চার-চাকার ঘোড়াগাড়ির চালকেরাও ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ভাড়াগাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে – রুঝেকে; তিনটা ট্রেন, রেল-ইঞ্জিনের সংঘর্ষ ঠেকানোর শেষ যন্ত্রটা পর্যন্ত ভর্তি, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রুঝেরই কারণে। আমাদের ভাগ্য ভালো যে ঘোড়াগাড়ি পাওয়া গেল, চালক আমাদের সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল (এ গাড়িটায় আলাদা চালকের বক্স নেই); অবশেষে আবার একবার আমরা স্বনির্ভর হয়ে যাত্রা শুরু করলাম। ম্যাক্স খুব যুক্তিসম্মত মন্তব্য করল যে এরকম কিছু একটা প্রাগেও আয়োজন করা যেতে পারে, এবং করা উচিত। সেটা আকাশে ওড়ার প্রতিযোগিতাই যে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, যদিও করলে তা ভালই হয়, সে বলল, তবে স্রেফ একজন বৈমানিককে আনলেই চলবে, আর তা এমন কোনো কঠিন কাজও না, এবং আয়োজকদেরও তাতে ভালোমতোই পুষিয়ে যাবে। পুরো ব্যাপারটা খুবই সহজ; ঠিক এখন রাইট উড়ছেন বার্লিনে, কদিন পরই ব্লেরিও উড়বেন ভিয়েনায়, লাথাম বার্লিনে। অতএব কাজ বলতে এটাই যে ওদের একটু সামান্য পথ পরিবর্তন করতে রাজি করানো। আমরা বাকি দুজন কোনো উত্তর দিলাম না, প্রথম কথা আমরা ক্লান্ত, আর দ্বিতীয় হলো আমাদের এ বিষয়ে কোনো আপত্তি এমনিতেই নেই। রাস্তা বাঁক নিল, রুঝেকে আবার দেখা যাচ্ছে, তিনি এত উপরে উঠে গেছেন যে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর অবস্থান কেবল তারার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা সম্ভব; এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে ওঠা আকাশে শিগগিরই তারা ফুটবে। আমাদের গাড়ি বাঁক নিয়ে নিয়ে চলতেই লাগল; রুঝে তখনো আরো উপরে উঠেই চলেছেন, কিন্তু আমাদের কথা যদি বলতে হয়, আমরা শেষবারের মতো নেমে যাচ্ছি কাম্পানইয়ার খোলা সমতলভূমির গভীরে।

প্রথম দীর্ঘ রেলভ্রমণ: ম্যাক্স ব্রড ও ফ্রানৎস কাফকা

(যৌথভাবে লেখা অসমাপ্ত উপন্যাস 'রিচার্ড ও স্যামুয়েল'-এর প্রথম অধ্যায়)

আমরা দুজনে মিলে যে ভ্রমণবিষয়ক ডায়েরি লেখার পরিকল্পনা করেছিলাম, তার শুধু প্রথম অধ্যায়টিই লেখা হয়েছে; এটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রাগের সাহিত্য সাময়িকী *হারডারব্লাটার*-এ (প্রাগ, মে ১৯১২ সংখ্যা)। নিচের মুখবন্ধটি ছাপা হয়েছিল ভূমিকা হিসেবে:

'রিচার্ড ও স্যামুয়েল – কেন্দ্রীয় ইউরোপ অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত সফর' নামের ছোট আকারের বইয়ে দুই বন্ধুর সমান্তরাল ভ্রমণ-ডায়েরি দুটি একসঙ্গে স্থান পাবে, এই ছিল পরিকল্পনা। এ দুই বন্ধুর স্বভাব একদম আলাদা।

স্যামুয়েল বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন এক তরুণ যে জ্ঞানার্জনের উচ্চাশা অর্জন করতে চায় সাড়ম্বর ভঙ্গিমায়, জীবন ও শিল্পের সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল এক সুবিবেচনা থেকে, তবে শুকনো ও পণ্ডিতি মনোভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিহার করেই। অন্যদিকে রিচার্ডের বিশেষ আসক্তি আছে, এমন কোনো বিষয়ই নেই; সে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে রেখেছে অব্যাখ্যেয় আবেগের কাছে, বিশেষ করে তার সুস্বভাবের কাছে, কিন্তু তার সীমিত ও খাপছাড়া অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তার এত বেশি ঐকান্তিক ও সরল-সোজা স্বাধীনচিত্তটি বেরিয়ে আসে যে তাকে কখনোই খেয়ালি হাস্যকর চরিত্র বলে ভুল করা যাবে না। পেশায় স্যামুয়েল একটি শিল্পকলা সমিতির সেক্রেটারি, রিচার্ড ব্যাংক-কেরানি। স্যামুয়েলের আয়-রোজগারের অন্য ব্যবস্থাও আছে, তবু অলস জীবন সহ্য হবে না বলেই সে কাজ করাটা বেছে নিয়েছে; রিচার্ডের কাজ করতে হয় জীবনধারণের তাগিদেই, ঘটনাচক্রে তার পেশায় সে সফল এবং অনেক প্রশংসাও পাচ্ছে।

নির্দিষ্ট এই ভ্রমণটিতেই এ দুজন, যদিও স্কুলজীবন থেকে তারা বন্ধু, দীর্ঘদিনের মধ্যে প্রথমবারের মতো একা একত্রে হয়েছে। তারা একজন আরেকজনের কাজ ও কথায় মজা পায়, কিন্তু তারা পরস্পরকে আসলে বোঝে না। নানাভাবেই তাদের মধ্যে চলে আকর্ষণ বিকর্ষণের এই খেলা। আমরা বর্ণনা করেছি যে কীভাবে প্রথমে তাদের এই সম্পর্ক অতি ব্যাকুল এক গাঢ়তায় জ্বলে উঠেছিল, তারপর মিলান ও প্যারিসের বিপজ্জনক প্রেক্ষাপটে ঘটা নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে কীভাবে তা একসময় শান্ত হয়ে পারস্পরিক পুরুষোচিত বোঝাপড়ায় রূপ নেয়, শক্ত ও পাকাপাকি বন্ধুত্বে এসে স্থির

হয়। এই ভ্রমণ শেষ হয় দুই বন্ধুর তাদের মেধা এক নতুন, মৌলিক ও শৈল্পিক খাতে ব্যয় করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে।

এই লেখার উদ্দেশ্য দুজন পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্বের কত রকম মাত্রাবিন্যাস হওয়া সম্ভব তা দেখানো আর একই সঙ্গে যে দেশগুলো তারা ঘুরল তাদের ওপর, দুটি ভিন্ন কোণ থেকে, দ্বৈত আলো ফেলা; আর তার মাধ্যমে এই দেশগুলোকে এক তরতাজা, নতুন তাৎপর্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা যেমনটি কিনা প্রায়ই, অন্যায্যভাবেই, আমরা ঘটতে দেখি স্রেফ অদ্ভুত ও চমকপ্রদ বেড়ানোর জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে।

প্রথম দীর্ঘ রেলভ্রমণ

(প্রাগ-জুরিখ)

স্যামুয়েল: ট্রেন ছাড়ল দুপুর ১টা ২ মিনিটে, তারিখ: ২৬ আগস্ট ১৯১১।

রিচার্ড: স্যামুয়েল তার সেই পুরোনো ছোট, পকেট ডায়েরিতে সামান্য কিছু টুকে রাখল দেখে আমার আগের সেই সুন্দর চিন্তাটা আবার ফিরে এল যে আমাদের দুজনেরই উচিত যার যার জার্নালে এই ভ্রমণের সবকিছু লিখে রাখা। আমি তাকে বললাম কথাটা। প্রথমে সে একমত হলো না, পরে রাজি হলো – দুটো ক্ষেত্রেই সে আমাকে কারণ কী তা বলল, দুবারই আমি মনে হয় একদম ভাসা ভাসা বুঝলাম সে কী বলতে চাচ্ছে, তবে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দুজনকেই জার্নাল রাখতে হবে। এবার সে অনেক হাসল আমার নোটবুকটা দেখে – ওটা পুরো কালো কাপড়ে বাঁধাই করা, নতুন, অনেক বড়, চতুর্ভুজ আকারের, দেখতে লাগে স্কুলের খাতার মতো। আমি আগে থেকেই জানতাম, এই নোটবুক পকেটে নিয়ে পুরো ভ্রমণটা করা সহজ হবে না আর যা-ই বলি না কেন, এটা একটা বিড়ম্বনাই। তবে, তাকে সঙ্গে নিয়েই আমি জুরিখে আরেকটু সুবিধাজনক একটা নোটবুক কিনতে পারি। তার একটা কালির কলমও আছে। আমি ওটা মাঝেমধ্যে ধার নেব।

স্যামুয়েল: একটা স্টেশনে আমাদের জানালার ঠিক বাইরেই চার-চাকার এক ঘোড়ার গাড়িতে একজন চাষি মহিলা। একজন হাসছে, তার কোলে আবার একজন ঘুমোচ্ছে। জেগে উঠে সে আমাদের দিকে হাত নাড়াল, তার আধো ঘুমের মধ্যে যেন আমাদের ইঙ্গিত দিল: 'আসো'। আমরা যে তার কাছে যেতে পারছি না তা নিয়ে সে যেন ঠাট্টা করল। অন্য কামরায় একটা শ্যামলা, বীরের মতো গড়নের এক মহিলা – একদম নিশ্চল। তার মাথা সোজা পেছনে ঝুঁকে আছে, সে তাকিয়ে আছে জানালার শার্সির কাচের দিকে। ডেলফি-র ভবিষ্যৎ বলতে পারা ডাইনিবুড়ি।

রিচার্ড: কিন্তু আমার ভালো লাগল না সে যেভাবে ঐ চাষি মহিলাদের সম্ভাষণ জানাল – মিষ্টি কথায় মন-ভোলানো, ভণ্ড, রমণীমোহন ও প্রায় মোসাহেবির ঢঙে। ট্রেন এখন স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে, স্যামুয়েল এবার মহা বিপদে পড়ে গেছে – তার মাথার টুপি নাড়াচ্ছে আর বিরাট বড় এক হাসি দিয়ে মুখ ফাঁক করে আছে। নাকি আমি বাড়িয়ে বলছি? স্যামুয়েল আমাকে তার একটু আগে লেখা জার্নাল পড়ে শোনাল, আমার অনেক ভালো লাগল তা। চাষি মেয়েগুলোকে আমার আরো ভালোভাবে দেখা উচিত ছিল। খুব অস্ফুটভাবে গার্ড জিজ্ঞেস করল, যেন সে ধরেই নিয়েছে যাত্রীরা সবাই এই পথে অনেক রেলভ্রমণ করেছে, আমরা কেউ পিল্‌সেন পৌঁছে কফি খাব কি না। কফি অর্ডার করলেই প্রতিটি অর্ডারের জন্য সে কামরার জানালায় সেঁটে দিচ্ছে একটা ছোট সবুজ টিকিট, ঠিক যেমনটা তারা করত মিস্‌ড্রয়ে, তখনো জাহাজ ভেড়ার জেটি চালু হয়নি, অনেক দূরে থাকতেই স্টিমারগুলো সংকেত-দেওয়ার সরু ও লম্বা পতাকা তুলে জানাত যাত্রীদের তীরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কতগুলো নৌকা লাগবে। স্যামুয়েলের মিস্‌ড্রয় সম্বন্ধে আদৌ কোনো ধারণা নেই। পরিতাপের বিষয়, আমি তার সঙ্গে ওখানে যাইনি কখনো। কী চমৎকার সময় ছিল তখন! এবারের ভ্রমণও চমৎকার হবে। ভ্রমণটা বেশি দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে, ট্রেন বেশি জোরে চলছে; ভ্রমণে বেরোবার জন্য আজকাল আমার মন কেমন আকুলিবিকুলি করে! একটু আগের আমার তুলনাটা কত সেকেলে, মিস্‌ড্রয়ে জেটি এসেছে পাঁচ বছর হয়ে গেছে। পিল্‌সেন নেমে প্ল্যাটফর্মে কফি। যদি টিকিট থাকে, তাহলে এসে না নিলেও চলে, আর টিকিট আদৌ না থাকলেও কফি মেলে।

স্যামুয়েল: প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম আমাদের কামরা থেকে একটা অচেনা মেয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। পরে জানলাম, ওর নাম ডোরা লিপ্‌পার্ট। সুন্দর, চওড়া নাক, সাদা লেসের ব্লাউজের গলার কাছটা ছোট করে কাটা। এই ভ্রমণে এটা পারস্পরিক অভিজ্ঞতার প্রথম ঘটনা; কাগজের ব্যাগে রাখা মেয়েটার বড় হ্যাট হালকাভাবে তাকের থেকে পড়ে গেল, পড়ল এসে আমার মাথায়। আমরা জানলাম, সে এক অফিসারের মেয়ে, তার বাবাকে ইনস্‌ব্রুকে বদলি করা হয়েছে, সে তার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, অনেক দিন তাদের দেখেনি সে। পিল্‌সেনে সে একটা প্রকৌশল অফিসে চাকরি করে – সারা দিন কাজ থাকে, অনেক কাজ, কিন্তু তার ভালোই লাগে কাজ করতে, তার জীবন সুখেই যাচ্ছে। অফিসে সহকর্মীরা তাকে ডাকে: 'আমাদের আদরের পোষা মুরগি', 'আমাদের ছোট চড়ুই' – এসব নামে। অনেক পুরুষ সহকর্মীর মধ্যে সে-ই বয়সে সবচেয়ে কম। ওহ্, অফিসে কী যে মজা! টুপি-কোট রাখার ঘরটাতে মানুষের হ্যাট অদল-বদল করে দিচ্ছি, ডেস্কে সকালের কাজের তালিকা ঝুলিয়ে দিচ্ছি কিংবা লেখালেখির জায়গাটাতে আঠা দিয়ে কলম আঁটকে

রাখছি। আমাদেরও সুযোগ মিলল ওরকম 'চমৎকার' একটা ধোঁকাবাজিতে অংশ নেওয়ার। সে অফিসে তার সহকর্মীদের একটা পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছে, সে লিখছে: 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, শেষমেশ সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটে গেছে। আমি ভুল ট্রেনে চড়ে বসেছি, এখন আমি জুরিখে। উষ্ণতম শুভেচ্ছা।' আমাদের জুরিখ থেকে কার্ডটা ডাকে দিতে হবে। আমরা যেহেতু 'ভদ্রলোক', সে আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখছে যে আমরা পোস্টকার্ডটায় অন্য কোনোকিছু যোগ করব না। অফিসে সবাই চিন্তায় পড়ে যাবে, কোনো সন্দেহ নেই, তারা টেলিগ্রাম পাঠাবে আর খোদাই জানে আর কী করবে। সে ভাগ্নারের খুব ভক্ত, কখনোই ভাগ্নারের কোনো শো সে মিস করে না, 'সেদিন ইসোল্ডে হিসেবে কুর্জকে যদি তোমরা একটু দেখতে,' সে এই এখন ভাগ্নার-ভেজেন্‌ডঙ্ক চিঠিগুলো পড়ছে, বইটা সে সঙ্গে করে ইনসব্রুককে নিয়ে যাচ্ছে, এক ভদ্রলোক তাকে ওটা দিয়েছে, সেই একই লোক যে তাকে পিয়ানোর স্বরলিপি বাজিয়ে শোনায়। দুর্ভাগ্যের কথা যে তার নিজের পিয়ানোর দক্ষতা নেই বললেই চলে, সেটা অবশ্য আমরা তার গুনগুন করে আমাদেরকে শোনানো কিছু রাগিণী শুনে এরই মধ্যে বুঝে গেছি। সে চকোলেটের মোড়ক জমাতে ভালোবাসে, এখন সে রুপালি মোড়ক জমিয়ে জমিয়ে একটা বড় বল বানাচ্ছে, ওটা তার সঙ্গেই আছে। এই বলটা সে তার এক মেয়েবন্ধুকে দেবে, এটা দিয়ে কী কাজ হবে তা আর বলল না। আর সিগারের ব্যান্ড জমানোও তার শখ, মোটামুটি নিশ্চিত ওই ব্যান্ডগুলো সে জমাচ্ছে কোনো ট্রে-র নকশায় কাজে লাগবে বলে। ট্রেনে প্রথম কোনো বাভারিয়ান গার্ড দেখা গেল। তাকে দেখে সে অস্ট্রিয়ান সৈনিকদের বিষয়ে, সাধারণ অর্থে সৈনিকদের বিষয়ে, ছোট করে এবং যুক্তিতথ্য ছাড়াই আমাদের তার মতামত শোনানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল; একজন অফিসারের মেয়ে হিসেবে তার বক্তব্য খানিকটা স্ববিরোধী ও অস্পষ্ট বলতে হবে। তার হিসেবে শুধু অস্ট্রিয়ান আর্মিই কর্তব্যকাজে ঢিলা, তা নয়, জার্মান আর্মিও তাই, পৃথিবীর সবখানের আর্মিই এমন। কিন্তু সে-ই কি অফিসের জানালার কাছে ছুটে যায় না যখন রাস্তা দিয়ে কোনো মিলিটারি বাজনাদল যায়? না, সে যায় না, কারণ তারা সত্যিকারের মিলিটারিই না। তার ছোট বোন অবশ্য পুরো আলাদা। ইনসব্রুক অফিসারদের ক্যাসিনোতে সে সব সময় নাচছে। কিন্তু তার কথা যদি বলি, সামরিক উর্দি তাকে একটুও আকর্ষণ করে না, অফিসারদের নিয়ে তার কোনো রকম কোনো ভালো লাগাটাগা নেই। এটা পরিষ্কার যে অফিসারদের বিষয়ে তার এই মনোভঙ্গির জন্য ঐ ভদ্রলোক যে তাকে পিয়ানোর স্বরলিপি ধার দেয় সে অনেকাংশে দায়ী, কিন্তু সেইসঙ্গে আমরাও একটু দায়ী বটে – ফার্থ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমরা একসাথে এ মাথা থেকে ও মাথা হাঁটলাম, রেলের ভেতরে ওরকম স্থির বসে থাকার কারণে তার এখন বাইরে

হেঁটে নিজকে অনেক ঝরঝরে লাগছে,তার হাতের তালু দিয়ে সে তার কোমরের দিকটায় নিচের দিকে টেনে টেনে নিজেকে স্বচ্ছন্দ করল। রিচার্ড, খুব সিরিয়াসলি, আর্মিদের পক্ষ নিয়ে বলতেই থাকল। ডোরার পছন্দের অভিব্যক্তিগুলো: গর্জিয়াস – ০.৫ অ্যাকসেলারেশন – ফায়ার – চটপট – ঢিলা।

রিচার্ড: ডোরা এল.-এর গোল গোল গাল, তাতে ছড়িয়ে আছে অনেক ব্লন্ড চুল; কিন্তু তার গাল দুটো এমনই রক্তহীন যে ওখানে কোনো লালিমা দেখতে হলে অনেকক্ষণ আঙুল দিয়ে টিপে রাখতে হবে। তার কোমর ও নিতম্ব এঁটে রাখা করসেট্টা ভালো না, তার বুকের উপর দিয়ে এর কিনারগুলো তার ব্লাউজকে দুমড়ে-কুঁচকে রেখেছে; ওখান থেকে চোখ সরিয়ে রাখতে হচ্ছে।

ভালো হয়েছে যে আমি তার মুখোমুখি বসেছি, পাশে বসিনি। পাশে বসা কারো সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। স্যামুয়েল অবশ্য আমার পাশে বসতেই পছন্দ করে; ডোরার পাশে বসাও তার পছন্দের। অন্যদিকে আমার যদি কেউ পাশে বসে তো আমার মনে হয় কোনো জেরা-তল্লাশি চলছে। মোদ্দা কথা, পাশে বসা কারও জন্য আপনার চোখ তৈরি থাকে না, তার দিকে তাকাতে হলে আগে আপনাকে নিজের চোখ পুরো ওদিকে ঘুরিয়ে নিতে হয়। সত্য যে ডোরা ও স্যামুয়েলের কথাবার্তা থেকে আমি মাঝেমধ্যে বাইরে পড়ে যাচ্ছি, কারণ আমি বসে আছি উল্টোদিকের সিটে, এটা বিশেষ করে ঘটছে যখন ট্রেন জোরে ছুটছে; সব সুবিধা সবার একসঙ্গে হয় না। তার পরও, আমি এরই মধ্যে এটাও দেখেছি যে তারা পাশাপাশি বসে থেকেও কোনো কথা বলছে না, যদিও সেটার দৈর্ঘ্য কখনো কয়েক সেকেন্ডের বেশি হবে না; তবে, তাদের কথা না-বলায় আমার দোষ নেই কোনো।

তার প্রশস্তি আমাকে গাইতেই হবে; সে খুব গানপাগল। মেয়েটি স্যামুয়েলকে গুনগুনিয়ে কিছু শোনালে আমি জানি স্যামুয়েল, সম্ভবত, বাঁকা হাসি দিচ্ছে। হয়তো ব্যাপারটা পুরো ঠিক না, কিন্তু যা-ই বলি, একটা বড় শহরে পুরো একা একা থাকা এক মেয়ের জন্য সংগীতের প্রতি এরকম উষ্ণ টান থাকা কি প্রশংসনীয় না? সে এমনকি একটা পিয়ানো ভাড়া করে এনেছে তার ঘরে; তার ঘরটাও ভাড়া নেওয়া ঘর। শুধু কল্পনা করুন: পিয়ানো (প্রবল-পিয়ানো!) বাসায় টেনে আনার সেই লেনদেনটা কত জটিল, একটা আস্ত পরিবারের জন্যও কত জটিল এক বিষয়, আর সেখানে একা দুর্বল একটা মেয়ে! কী পরিমাণ স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা লাগে ঐ কাজের জন্য!

শহরে তার থাকার বন্দোবস্ত নিয়ে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম। সে থাকে তার দুই মেয়েবন্ধুর সঙ্গে, এদের একজন রোজ তাদের রাতের খাবার কিনে নিয়ে আসে একটা খাবারের দোকান থেকে। তারা একসঙ্গে মজায় দিন কাটায়, অনেক হাসে। এই সবকিছু যে একটা পেট্রল-ল্যাম্পের আলোতে ঘটে,

তাতে আমার মনে কেমন যেন একটা বাজে সন্দেহের উদ্রেক হয়, কিন্তু আমি তা বলতে চাই না। এটা অবশ্য স্পষ্ট যে ওই বাজে আলো নিয়ে তার কোনো সমস্যা নেই, কারণ তার মতো উদ্যম যে মেয়ের, ব্যাপারটা তার মাত্র এক দিন মাথায় এলেই সে তো নিশ্চিত কবে বাড়িওয়ালির কাছ থেকে আরো ভালো আলো জোর করে আদায় করে নিত।

যেহেতু আলাপ চলাকালে তাকে তার হাতব্যাগ খুলে ভেতরের সবকিছু আমাদের দুজনকে দেখাতে হলো, আমাদের চোখে পড়ল একটা ওষুধের বোতল – ওটার মধ্যে নোংরা হলুদমতো ওষুধ। এবার জানলাম, তার স্বাস্থ্য বেশি ভালো যাচ্ছে না, সে অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিল। অসুখ মোটামুটি সেরে গেলেও তার এখনো খুব কাহিল লাগে। অফিসের বস্ নিজে তাকে বলেছে, (তার প্রতি এদের আচরণ সত্যি প্রশংসার যোগ্য) তাকে শুধু আধা দিন অফিস করলেই চলবে। আস্তে আস্তে তার অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে এই আয়রন-মিকশ্চারটা খেতে হয়। আমি তাকে বোতলটা জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়ার উপদেশ দিলাম। আমার সঙ্গে মোটামুটি একমত হলো সে (কারণ ওষুধটার স্বাদ জঘন্য), কিন্তু আমার কথাটা নিষ্ফল হলো বোকাভাবেই, যদিও আমি সামনে তার আরো কাছে ঝুঁকে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে আমার ধারণা ব্যাখ্যা করতে লাগলাম – আমার কথা পরিষ্কার, মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসাই সবচেয়ে ভালো; আমি তাকে সাহায্য করার সৎ ইচ্ছা নিয়েই, কিংবা অন্তত একটা মেয়েকে – যে বেশি কিছু জানে না – ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এসব বললাম, বেশ অনেকক্ষণের জন্য এই মেয়ের কাছে নিজেকে কোনো ভাগ্যবান বিধাতা বলেই মনে হলো আমার। যেহেতু সে হাসতেই থাকল, আমি থামলাম। আবার স্যামুয়েল যে আমার লেকচারের পুরোটা সময় তার মাথা নাড়াচ্ছে, তাতে আমার বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি হলো আরো। আমি স্যামুয়েলকে চিনি। সে ডাক্তারে বিশ্বাস করে, ভাবে, প্রাকৃতিক চিকিৎসা একটা হাস্যকর বিষয়। তা কেন, তা আমি খুব ভালো করেই জানি: স্যামুয়েলের কখনো ডাক্তারের দরকার পড়েনি, তাই এসব বিষয় নিয়ে কখনো তাকে গভীরভাবে ভাবতেও হয়নি, যেমন নিজেকে সে ঐ জঘন্য মিকশ্চার খাওয়ার ভূমিকায় ভাবতেও অসক্ষম। আমি যদি এই মেয়েটার সঙ্গে একা থাকতাম, আমি তাকে আমার বিশ্বাসে ঠিকই বিশ্বাস করাতে পারতাম। কারণ, আমি যদি ও বিষয়ে ঠিক না হয়ে থাকি, তাহলে কোনো বিষয়েই আমি ঠিক না!

একেবারে শুরু থেকেই মেয়েটার রক্তশূন্যতার কারণগুলো আমার কাছে পরিষ্কার। অফিস। অন্য সবকিছুর মতোই অফিসের জীবনকেও কৌতুক হিসেবে দেখা যায় (মেয়েটা আন্তরিক অর্থেই সে হিসেবেই দেখে তার অফিসকে, ভালোমতোই ধোঁকা খাওয়ানো হয়েছে তাকে), কিন্তু মূলগত অর্থে, নির্যাসের দিক

থেকে এর অ-সুখী পরিণাম বিবেচনায়, অফিসের জীবন কী? আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি আমি কী বলছি। আর একটা বেচারা মেয়ের কথা চিন্তা করুন – অফিসে বসে আছে, তার পরনের স্কার্ট এ কাজের জন্য উপযুক্ত করে বানানো না, একটা শক্ত কাঠের চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামনে পেছনে নড়তে হচ্ছে তাকে সারাক্ষণ। তাই তার সুগোল দুই নিতম্বের ছাল উঠে গেছে আর তার স্তন দুটো ডেস্কের কিনারে ঘষা খেতে খেতে! বাড়িয়ে বলছি? যা-ই বলুন, কোনো মেয়ে অফিসে কাজ করছে, সেটা আমার কাছে সব সময়ই মন-খারাপ-করা দৃশ্য।

স্যামুয়েল ইতোমধ্যে তার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সে তাকে পটিয়ে (আমি তা কখনোই পারতাম না) আমাদের সঙ্গে খাবার বগিতে আসতেও রাজি করিয়ে ফেলেছে। আমরা হেঁটে খাবার বগিতে ঢুকলাম, চারপাশে অচেনা সব যাত্রী, আমরা তিনজন যে একসঙ্গে, একদল, তা আমাদের হাবভাবে খুব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এ কথাটা এখানে লিখে রাখা উচিত, বন্ধুত্ব গাঢ় করার জন্য নতুন পরিবেশ খুব উপকারী। আমি এখন সত্যি সত্যিই তার পাশে বসে আছি, আমরা ওয়াইন খেলাম, আমাদের হাতে ছোঁয়া আগুন, আমাদের পারস্পরিক ছুটিতে বেড়ানোর মন-মেজাজ আমাদেরকে একটা পরিবারে রূপ দিল।

মিউনিখে আমাদের আধা ঘণ্টা অপেক্ষার সময়, এই ব্যাটা স্যামুয়েল মেয়েটির হাসিমাখা বিরোধিতা সত্ত্বেও (বাইরে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, মেয়েটি তার যুক্তি আরো জোরালো করতে পারল) তাকে রাজি হতে বাধ্য করল যে আমরা গাড়িতে একটু ঘুরে আসব। স্যামুয়েল যখন গাড়ি খুঁজতে গেছে, স্টেশন হলে সে আমাকে বলল, বলতে গিয়ে আমার হাত ধরে বসল: 'প্লিজ, আমরা না যাই। আমার একদমই যাওয়া ঠিক হবে না। যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তোমাকে বলছি, কারণ তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। তোমার বন্ধুকে বলে কোনো লাভ নেই। তার মাথা একেবারে খারাপ!' আমি গাড়িতে চড়ে বসলাম, পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য কষ্টের, এতে আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ে গেল *দি হোয়াইট স্লেভ* নামের এক সিনেমার কথা, ঐ ছবিতে নিষ্পাপ এক নায়িকাকে অচেনা কিছু লোকজন ঠিক একটা রেলস্টেশনের বাইরে অন্ধকারে জোর করে গাড়িতে ওঠায়, তারপর নিয়ে চলে যায়। স্যামুয়েল, অন্যদিকে, আছে ফুর্তি-মনে। যেহেতু গাড়ির বড় হুড আমাদের দৃষ্টি অনেকটা আটকে দিয়েছে, আমরা সত্যিকার অর্থে আশপাশের দালানগুলোর শুধু একতলা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, তা-ও কষ্ট করে। এখন রাত। মাটির নিচের ঘরের মতো লাগছে। কিন্তু স্যামুয়েল সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দুর্গ ও গির্জাগুলোর উচ্চতা নিয়ে সুন্দর কাল্পনিক অনেক অনুমান করে যেতে লাগল। যেহেতু গাড়ির পেছনের অন্ধকার সিটে বসে ডোরা একদম মুখ বন্ধ করে আছে আর আমি ভয় পাচ্ছি কোনো একটা কাণ্ড ঘটবে, স্যামুয়েল মনে হয় অবশেষে একটু অবাক হলো, তারপর আমার হিসেবে একটু বেশি

গতানুগতিক ঢঙে জানতে চাইল: 'কী ব্যাপার, ফ্রয়লাইন, আমার ওপরে রাগ না তো? আমি কি কিছু করেছি?' ইত্যদি ইত্যাদি। সে উত্তর দিল: 'যেহেতু আমি চলেই এসেছি, তাই তোমার আনন্দ নষ্ট করতে চাচ্ছি না। কিন্তু তোমার আমাকে এখানে আনাটা ঠিক কাজ হয়নি। আমি যদি "না" বলি, তোমাকে বুঝতে হবে যে তার কারণ আছে। আমার গাড়িতে ওঠা উচিত হয়নি।' 'কেন?' সে জিজ্ঞেস করল। 'তোমাকে সেটা বলতে পারছি না। তোমার নিজের থেকেই বোঝা উচিত, কোনো মেয়ের জন্য, এ রকম রাতের বেলায় ছেলেদের সঙ্গে গাড়িতে ঘুরে বেড়ানোটা ঠিক কাজ না। তা ছাড়া অন্য আরেকটা কারণও আছে। তুমি ধরে নিতে পারো যে আমি এনগেজড্...।' আমরা, দুজনেই যার যার মতো, চাপা শ্রদ্ধা-সম্মান নিয়ে, গুপ্তরহস্য ভেদ করলাম যে ওই ভাগ্‌নার ভদ্রলোকের ব্যাপারটা তাহলে বোঝা গেল। যাক, আমার নিজেকে গালি দেওয়ার এখানে কিছু নেই, তার পরও তার মন চাঙা করার জন্য আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। স্যামুয়েলও, মেয়েটার প্রতি এই এতক্ষণ ধরে একটু অভিভাবকসুলভ আচরণের পর, মনে হলো কাজটাতে অনুতাপ করছে, সে তার কথাবার্তা শুধু আমাদের রেলভ্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখল। গাড়ির ড্রাইভার আমাদের অনুরোধে অদৃশ্য বিল্ডিংগুলোর (যেগুলো সাইটসিয়িংয়ে দেখানো হয়) নাম বলতে লাগলেন জোরে জোরে। ভেজা অ্যাসফল্টের উপর গাড়ির চাকা, সিনেমার যন্ত্রপাতির মতো, শাঁ শাঁ শব্দ করতে লাগল। আবার আমি ভাবলাম *দি হোয়াইট স্লেভ*-এর কথা। এই লম্বা, নিঃসঙ্গ, বৃষ্টিধোয়া কালো রাস্তাগুলো। আমরা সবচেয়ে পরিষ্কার দেখলাম মনে হয় ফোর *সিজনস্ রেস্তোরাঁ*-র বিশাল পর্দা ওঠানো জানালাগুলো, শুনলাম এটা এখানকার সবচেয়ে অভিজাত রেস্তোরাঁগুলোর একটি। রেস্তোরাঁর উর্দি পরা ওয়েটার কুর্নিশ করছে এক-টেবিল ভরা অতিথিদের। একটা মূর্তি পার হলাম, এটাকে ভাগ্‌নার মেমোরিয়াল বলে চালিয়ে দেওয়ার মজার আইডিয়া এল আমাদের মাথায় – ডোরা এতক্ষণে একটু আগ্রহ দেখাতে শুরু করল। আমরা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য থামলাম 'ফ্রিডম মনুমেন্ট'-এ, এর ফোয়ারাগুলো থেকে বৃষ্টির মধ্যে পানি ছিটকে বেরোচ্ছে। ইজার নদীর উপরে সেতু, আমরা স্রেফ আন্দাজ করলাম যে ওটা ওখানে। পুরো 'ইংলিশ গার্ডেন' জুড়ে অভিজাত লোকজনের ভিলা। লুডভিগজ্ স্ট্রাসে, থিয়েটিনার গির্জা, ফেলড্‌হারন্ হল, শর্ বিয়ার কোম্পানি। আমি জানি না কীভাবে সম্ভব, কিন্তু আমি চিনতে পারছি না কিছুই, যদিও মিউনিখে এর আগে এসেছি বেশ কবার। জেন্‌ডলিংগার গেট স্টেশন, আমি মহা উদ্বিগ্ন ছিলাম (ডোরার কথা ভেবেই) সময়মতো পৌঁছাতে পারব কি না। অতএব, কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে যাওয়ার জন্য স্প্রিং যেভাবে মোড়ানো হয়, আমরাও তেমন ট্যাক্সি-মিটারের ঘড়ির হিসাবে ঠিক কুড়ি মিনিটে শাঁ করে শহরটা একটু চক্কর দিয়ে এলাম।

আমাদের ডোরাকে আমরা পাহারা দিয়ে নিয়ে, ঠিক যেন আমরা ওর মিউনিখবাসী আত্মীয়, তুলে দিলাম ইনস্‌ব্রুকে যাওয়ার ট্রেনের কামরায়, সেখানে কালো পোশাক পরা এক মহিলা (আমাদেরকে ভয় পাওয়ার চাইতে ডোরার ওকেই বেশি ভয় পাওয়া উচিত) তাকে রাতে দেখে রাখবে বলে জানাল। শুধু এই এতক্ষণে আমি বুঝলাম যে কোনো মেয়েকে আমাদের দুজনের কাছে বিশ্বাস করে সঁপে দেওয়া যায়।

স্যামুয়েল: ডোরার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা একদম বিফলে গেল। যতই এটা এগোচ্ছিল, ততই সবকিছু আরো খারাপ হয়ে উঠছিল। আমি চাচ্ছিলাম রেলযাত্রায় ক্ষান্ত দিয়ে মিউনিখে রাত কাটাব। রেগেন্‌জ্‌বার্গের কাছাকাছি কোথাও রাতের খাবার খাওয়া পর্যন্ত আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা টুকরা কাগজে কিছু কথা লিখে আমি তা রিচার্ডকে জানানোর চেষ্টা করলাম। ওকে দেখে মনে হলো না সে আদৌ ওটা পড়ল, শুধু ওটা পকেটে ঢোকানোর কথাই মনে হয় ভাবছিল সে। যা হোক, কোনো ব্যাপার না, ওই বেরসিক চিড়িয়াকে পাত্তা দিতে আমার বয়েই গেছে। শুধু রিচার্ড ওকে নিয়ে যা একটা হাঙ্গামা করল – তার সাড়ম্বর উপদেশ আর কর্তৃত্ব দেখিয়ে। এর কারণেই মেয়েটা তার ফালতু ভাব নিল ওইভাবে, প্রথম দিককার চেয়েও অনেক বেশি করে, আর শেষমেশ গাড়িতে দুজনেই হয়ে উঠল একেবারে অসহ্য। আমরা যখন বিদায় জানালাম, সে যে কী সেন্টিমেন্টাল হয়ে গেল, আমি ওরকমই যে হবে তা জানতাম। রিচার্ড, যে কিনা, কোনো ভুল নেই, তার সুটকেস বয়ে দিচ্ছিল, এমনভাবে সে আচরণ করছিল, যেন মেয়েটা তাকে তার প্রাপ্যের বেশি অনুগ্রহ দেখিয়েছে, আমার তখন বিব্রতই লাগছিল শুধু। সংক্ষেপে বলতে গেলে: মেয়েরা, যারা একা ভ্রমণ করে কিংবা এভাবে-ওভাবে বা কোনোভাবে দেখাতে চায় যে তারা মুক্ত, স্বাধীনচেতা, সেসব মেয়ের উচিত কিনা অন্যদের মতো ছেলেদের সঙ্গে রংঢঙের ভান করা; এটা মনে হয় ইতোমধ্যে অনেক সেকেলে আচরণ হয়ে গেছে – প্রথমে একটা ছেলেকে একটু চুলকানি দেবে, তারপর তার চারপাশে বেড়া দিয়ে দেবে, ছেলেটার এর পরের বিভ্রান্ত অবস্থার সুযোগ নেবে। মেয়েদের এই আচরণ বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না, সহজেই বোঝা যায়, তখন দ্রুত বেড়ার মধ্যে ঘিরে পড়তেই বরং স্বচ্ছন্দ লাগে, ছেলেটাকে সে সম্ভবত যতটুকু বেড়ার মধ্যে ঘিরে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হলেও তখন খুশিই লাগে।

আমরা আমাদের কামরায় ঢুকলাম, ওখানে আমাদের লাগেজগুলো পড়ে ছিল, এটা নিয়ে রিচার্ডের উদ্বেগের কমতি ছিল না। রিচার্ড তার সবসময়ের মতো ঘুমাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, মাথার নিচে কম্বল গুটিয়ে বালিশ বানাচ্ছে আর তার ভারী ওভারকোট এমনভাবে ঝুলিয়েছে যে ঘেরটা তার মুখের উপরে

শামিয়ানার মতো হয়ে গেল। অন্যের প্রতি সম্মান-সমীহ ছাড়াই সে যেভাবে এসব করে, তা আমার ভালোই লাগে; বিশেষ করে প্রশ্নটা যদি হয় তার ঘুমের, তাহলে সে আমাকে জিজ্ঞেস না করেই আলো নিভিয়ে দেবে, যদিও সে জানে আমি ট্রেনে ঘুমাতে পারি না। যেভাবে সে তার সিটে শরীর টান টান করে শোবে তাতে মনে হবে অন্য সহযাত্রীদের যে-কারো চেয়ে ওই সিটের ওপরে তার অধিকারটাই বেশি; আর তারপর তক্ষুনি শান্তির ঘুমে ঢলে পড়বে। এর পরও এই মানুষটার সার্বক্ষণিক অভিযোগ যে তার ঘুম হয়নি।

এই কামরায় আমরা ছাড়া আছে দুই ফরাসি বালক (জেনেভা থেকে আগত দুই হাইস্কুল ছাত্র)। এদের একজন মাথায় কালো চুল, সারাক্ষণ হাসে, রিচার্ড যে তার বসার জন্য বলতে গেলে কোনো জায়গাই রাখেনি (এতখানিই পা ছড়িয়ে শুয়েছে রিচার্ড), তাতেও সে হাসে, পরে রিচার্ড এক মিনিটের জন্য একটু উঠল, সবাইকে বলল সিগারেট একটু কম খেতে, তখন ছেলেটি একটুও দেরি না করে রিচার্ডের বিছানার বেশকিছু অংশ কেড়ে ফেরত দিল। ভ্রমণে বেরোলে এসব ছোটখাটো বিবাদ ভিন্ন ভাষার লোকজন কীরকম নীরবে আর কত বেশি হালকা মেজাজে চালিয়ে যায়, কেউ কারো কাছে মাফ চায় না, কেউ কাউকে গালিও দেয় না। ফরাসি ছেলে দুটোর জন্য আমার রাত পার করাটা একটু সহজ হলো – তারা বিস্কুটের একটা টিন বারবার একজন আরেকজনকে দিচ্ছে কিংবা কাগজ পেঁচিয়ে সিগারেট বানাচ্ছে, কিংবা একটা মিনিট পর পরই করিডরে যাচ্ছে, ওখানে একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করছে, তারপর আবার ফিরে এসে বসছে। লিন্‌ডাউ তে (ওরা বলে 'লেনডো') ওরা অস্ট্রিয়ান গার্ডকে দেখে হেসে কুটিকুটি, কী জোরে সেই হাসি, রাতের এই সময়টার কথা চিন্তা করলে অবাক হতে হয় ওই জোর হাসি শুনে। ভিন দেশের ট্রেনের গার্ড দেখতে কেমন যে জোকারের মতো লাগে, যেরকম ফার্থ-এ আমাদের লেগেছিল বাভারিয়ান গার্ডকে দেখে, তার বিরাট লাল ব্যাগ যেটা প্রায় তার পায়ের কাছে ডানা ঝাপটানোর মতো বাড়ি মারছিল। বাইরে লেক অব কনস্টানস্, ট্রেনের আলো পড়ে তার পানি ঝিকমিক করছে, কেমন কোমল দেখাচ্ছে, লেকের অন্য পাড়ে দূরের আলো পর্যন্ত সেই ঝিকিমিকি, অন্য পাড়টা অন্ধকার ও কুয়াশাঢাকা – দীর্ঘ ও টানা অনেকক্ষণ দেখা গেল এই দৃশ্য। স্কুলে শেখা একটা পুরোনো কবিতা মনে পড়ল: 'লেক অব কনস্টানস্ পার হওয়া সওয়ারি'। বেশ অনেকটা সময় ব্যয় করলাম স্মৃতি থেকে কবিতাটি তৈরি করতে। তিনটে সুইস লোক ঠেলেঠুলে ঢুকল। একজন সিগারেট খাচ্ছে। অন্য দুজন বাইরে গেলে আরেকজন থেকে গেল, তাকে দেখতে শুরুতে অলীক মনে হলেও ভোরের দিকে দৃশ্যমান হয়ে উঠল সে। সে রিচার্ড ও ফ্রেঞ্চ ছেলেটার মধ্যেকার জায়গা দখলের বিবাদ মিটিয়ে দিল, দুজনকেই অসুবিধায় ফেলে ঠিক দুজনের মাঝখানে বসে গেল সে, কঠিন হয়ে ওখানে বসে থাকল রাতের বাকি পুরোটা,

তার দু-হাঁটুর মাঝখানে তার পর্বতারোহণের ছড়ি। রিচার্ড প্রমাণ করল বসে থেকেও ঘুমানো একই রকম সম্ভব।

সুইজারল্যান্ড আমাকে অবাক করে – কারণ আমি দেখি রেললাইনের পুরোটা ধরে সব ছোট শহর ও গ্রামের বাড়িগুলো আলাদা আলাদা দাঁড়ানো, তাদের ভঙ্গির মধ্যে জোরালো ও বলিষ্ঠ এক স্বাধীনতার ছাপ। সেন্ট গল্-এ কোনো দুটো বাড়ির মধ্যেই আর সংযোগরাস্তা নেই। ভালো জার্মান স্বাতন্ত্র্যবোধের সম্ভবত এটি একটি প্রকাশ। বাড়িগুলোর পাশের মাটির অসাম্য ও তারতম্য থাকায় এ প্রকাশ আরো সহজ হয়েছে – প্রতিটা বাড়িরই জানালার শাটার গাঢ় সবুজ, আর ছাদের প্রান্তভাগ ও রেলিংগুলোতে অনেক সবুজ রঙের ছোঁয়া – এ কারণে সব মিলে দেখতে লাগে ভিলার মতো। তার পরও (শুধু একটা বাড়িতেই) দেখা গেল অফিসও খোলা হয়েছে, থাকার ও ব্যবসায়ের জায়গা একই চাঁদের নিচে। ভিলা থেকে ব্যবসা করার এই ব্যবস্থা আমাকে খুব বেশি মনে করিয়ে দিল আর. ভাল্‌জারের উপন্যাস *দি অ্যাসিস্ট্যান্ট*-এর কথা।

রোববার, ভোর পাঁচটা, ২৭ আগস্ট। সব জানালা এখনো বন্ধ, সবাই ঘুমে। একটা অনুভূতি আমাকে তাড়াচ্ছে, আমরা সবাই এই ট্রেনের মধ্যে বন্দী, ট্রেনের চারপাশের বাতাসের সঙ্গে তুলনায় একমাত্র পচা বাতাস শুধু ট্রেনের ভেতরেই, সেটাতে শ্বাস নিচ্ছি আমরা, আর তখন বাইরের ভূপ্রকৃতি কী স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খুলে যাচ্ছে চোখের সামনে, এই দৃশ্য ভালোভাবে দেখতে হলে কোনো রাতের ট্রেনের অবিরাম জ্বলতে থাকা আলোর নিচে বসে থেকেই দেখতে হবে। এই খুলে যাওয়ার খেলায় প্রথমে বলতে হয় অন্ধকার পর্বতমালার কথা, তাদের ও ট্রেনের মাঝখানে খুবই সরু উপত্যকা; এরপর ভোরের কুয়াশা, চারদিকে তা ছড়িয়ে দিয়েছে এক শুভ্র দীপ্তি, দেখে মনে হচ্ছে দরজার উপরে পাখার মতো যে জানালা থাকে তা থেকে যেন বেরোচ্ছে এই রশ্মিগুলো; এরপর ধাপে ধাপে তৃণভূমি চোখে পড়া শুরু হলো, এত সতেজ যেন কখনো ছোঁয়াই হয়নি, সবুজ আর প্রাণরসে টসটসে, এ বছরের এই খরার সময়ে তা দেখে আমি অবাকই হচ্ছি; শেষমেশ সূর্য যখন ওঠা শুরু হলো, ঘাসগুলো একটা ধীর রূপান্তর-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মলিন হয়ে উঠল। গাছগুলোর বিশাল ভারী সব শাখার সুচালো প্রান্তভাগ ঝাঁক বেঁধে নেমে এসেছে কাণ্ডের একেবারে নিচ পর্যন্ত।

গাছের এ ধরনের আকার সুইস শিল্পীদের আঁকা ছবিতে দেখা যায়, আর আজকে পর্যন্ত আমি ভেবেছিলাম ওসব ছবি বোধহয় স্রেফ বিশেষ ভঙ্গিমার এক অঙ্কনশৈলী।

এক মা তার বাচ্চাদের নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তায় রোববারে হাঁটতে বেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এতে আমার মনে পড়ে গেল ঔপন্যাসিক গট্‌ফ্রিড কেলারের কথা, তিনিও বড় হয়েছিলেন মায়ের কাছে।

চারণভূমির পুরোটা জুড়ে চোখ-ধাঁধানো যত সুন্দর বেড়া দেওয়া; অনেকগুলোই বানানো ধূসর কাঠ দিয়ে, মাথা পেনসিলের মতো সুঁচালো, প্রায়ই মূল কাঠ থেকে ওই পেনসিল মাথার কাছে এসে দুদিকে বেরিয়ে গেছে। আমরা ছোট থাকতে পেনসিলের থেকে সিস বের করার জন্য ওভাবে পেনসিলের মাথা কেটে দুই ভাগ করতাম। এ রকম বেড়া আমি এর আগে কখনো দেখিনি। তার মানে প্রতিটা দেশেরই, দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বস্তুগুলোর পাশাপাশি, অভিনবত্ব দেখানোর কিছু-না-কিছু থাকেই, আর ওসব অভিনব জিনিস দেখে খুশিতে নাচতে গিয়ে সত্যিকারের যা অসাধারণ, সেটার কথা ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না।

রিচার্ড: সকালের প্রথম সময়টাতে ধ্যানমগ্ন সুইজারল্যান্ড। লোকদেখানো ভঙ্গিতে খুব সুন্দর কোনো একটা ব্রিজ দেখার জন্য স্যামুয়েল আমাকে ডেকে তুলেছে; আমি উঠে তাকাতে তাকাতে অবশ্য ব্রিজ পার হয়ে গেছি; তার এই সরব ও সরাসরি পদক্ষেপের কারণেই বোধ হয় সুইজারল্যান্ড আমার মাথার মধ্যে শক্তপোক্তভাবে ঢুকে গেল। আমি প্রথমে, অনেক অনেকক্ষণ ধরে, একে দেখলাম আমার ভেতরে ও বাইরে বিরাজমান এক গোধূলির আবছায়ার মধ্যে থেকে।

অস্বাভাবিক ভালো ঘুমিয়েছি আমি গত রাতে, ট্রেনে প্রায়ই আমার এরকম ভালো ঘুম হয়। ট্রেনে আমি আক্ষরিক অর্থেই খুব গুছিয়ে ঘুম যাই। প্রথমে আরাম করে গা-ছেড়ে দিয়ে বসি, সবশেষে ছেড়ে দিই আমার মাথা, প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে নানা কায়দায় বসে-টসে দেখি কোনটা সুবিধাজনক, আমার চারপাশের সবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি, কোনো ব্যাপারই নয় ওরা সবাই চারদিক থেকে হাঁ করে তাকিয়ে আমাকে দেখছে কি না; বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মূল কাজটা আমি করি আমার ওভারকোট কিংবা বেড়ানোর টুপি দিয়ে মুখ ঢাকার মাধ্যমে – আর নতুন এক আসনে ওভাবে জেঁকে বসার ফলে শরীর জুড়ে যে আরাম ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়, তাতেই একটু পরে ঘুমের জগতে ভেসে যাই আমি। শুরুতে, নিঃসন্দেহে, অন্ধকার থাকলে অনেক সুবিধা হয়, কিন্তু পরে আর তার দরকার পড়ে না। লোকজন তখন, আগের মতো, কথা বলে গেলেও কোনো সমস্যা হয় না; প্রকৃতির বিধানগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে: মন দিয়ে ঘুমাচ্ছে এমন কোনো মানুষ তার থেকে অনেক দূরে বসে বকবক করতে থাকা অন্য আরেকজন মানুষের জন্য একটা চিহ্ন, একটা স্মারক, জেগে থাকা লোকটির পক্ষে সেই স্মারক উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। রেলগাড়ির কামরার মতো অন্য আর কোনো জায়গা বোধ হয় নেই যেখানে জীবনের একদম উল্টো দুটো দিক এভাবে এত কাছাকাছি, সরাসরি ও বিস্ময়কর নৈকট্যের মধ্যে চলে আসে; আর যাত্রীরা একে অন্যকে এরকম অনবরত দেখতে থাকার কারণে দেখা যায় সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে একজন আরেকজনকে প্রভাবিত করে বসছে। তাই

ঘুমন্ত কেউ যদি অন্যদের মধ্যে রাতারাতি তক্ষুনি ঘুম ঢুকিয়ে দিতে নাও পারে, তবু তার কারণে অন্যরা ঠিকই অনেক শান্ত, চুপচাপ ও ধ্যানী হয়ে ওঠে, এতটাই ধ্যানী যে (ঘুমন্ত লোকটি অবশ্য এটা চায়নি) তারা সিগারেট খেতে শুরু করে দেয়, দুর্ভাগ্যক্রমে যেটা হয়েছে এই রেলভ্রমণে, যেখানে শালীন স্বপ্নের সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে আমাকে ভকভক করে গিলতে হয়েছে সিগারেটের ধোঁয়া।

ট্রেনে আমার ভালো ঘুম হওয়ার আমি ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবে: অতিরিক্ত কাজের থেকে আমার যে স্নায়ুচাপ হয়, সাধারণত তার কারণে, তার হট্টগোল মাথায় ঢুকে যাওয়ার কারণে আমি ঘুমাতে পারি না; পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে যখন এর সঙ্গে যোগ হয় রাতের হাজারো ছড়ানো-ছিটানো শব্দ, যেমন মানুষের বড় বাসাগুলো থেকে আসা শব্দ, রাস্তা থেকে আসা শব্দ, দূর থেকে ভেসে আসা চাকার গড়গড়ানির শব্দ, প্রত্যেক মাতালের ঝগড়ার শব্দ, সিঁড়িতে প্রতিটা পা ফেলার প্রতিধ্বনির শব্দ – এসব মিলে আমার এত বিরক্তি হয় যে আমি প্রায়ই আমার ঘুম না-হওয়ার কারণে দায়ী করি বাইরের এসব শব্দকে। অন্যদিকে ট্রেনে চড়লে যাত্রাপথের নিয়মিত হাজার শব্দের একঘেয়েমি, তা সে বগির স্প্রিং ঘোরা থেকে আসুক কি চাকার ঘর্ষণ থেকে আসুক কি রেলের পাতের সংযোগস্থলের ধাক্কা থেকে আসুক কিংবা এই পুরো কাঠ, কাচ ও লোহার কাঠামোর কম্পন থেকেই আসুক – তা এমন এক পরম প্রশান্তির পর্যায়ে উঠে যায় যে সেখানে পৌঁছানোর কারণে আমার ঘুম চলে আসে, আপাতদৃষ্টিতে কোনো সুস্থ মানুষ যেভাবে শান্তিতে ঘুমায় সে রকম ঘুম। এই আপাতদৃষ্টি দিয়ে অবশ্য ইঞ্জিন থেকে আসা কান ফুটো করা শিসের কিংবা ট্রেনের গতি বাড়া-কমার উৎপাতের কিংবা কোনো স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে দেখলে নিশ্চিত যে অনুভূতি হতে থাকে তার ব্যাখ্যা হয় না; এসব যেভাবে পুরো ট্রেনের শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়, একইভাবে ওরা ঢুকে পড়ে আমার ঘুমের পুরোটা বেড় দিয়েও, তাতে করে একসময় জেগে উঠতে বাধ্য হই আমি। তখন কানে আসে, এতে অবশ্য অবাক হই না কোনো, স্টেশনের নাম ধরে ডাকা হচ্ছে, এমন সব জায়গা যা আমি কোনো দিন পার হব ভাবিনি, যেমন এবারের সফরেই হলো: লিন্‌ডাউ, কনস্টানস্‌, আরো মনে হয় রোমানস্‌হর্ন; এই নাম ডাকা থেকে অত আনন্দ হয় না, যেটা নিশ্চিত হতো জায়গাগুলো স্বপ্নে দেখলে; বরং উল্টোটাই, স্রেফ বিরক্তিই হয়। যাত্রা চলাকালীন যদি আমাকে ঘুমের থেকে জাগানো হয়, তাহলে অন্য সময় ঘুম থেকে জাগানোর চেয়ে ধাক্কাটা বেশি লাগে; কারণ, তা ট্রেনে ঘুমের স্বভাব বা রীতিবিরুদ্ধ একটা কাজ। আমি তখন চোখ খুলি আর একটুখানিকের জন্য জানালার দিকে তাকাই। ওখানে খুব বেশিকিছু আমার চোখে পড়ে না, আর যা চোখে পড়ে তার ধারণা নিতে পারি কেবল স্বপ্নের-ভেতরে-থাকা কোনো মানুষের অলস উপলব্ধি দিয়েই। তার পরও আমি হলফ

করে বলতে পারি, ভারটেমবার্গের কোথাও (ঠিক যেন ভারটেমবার্গ জায়গাটা আমার অনেক চেনা, এমনভাবে বলছি), রাত প্রায় দুটোর দিকে আমি এক লোককে দেখেছি তার গাঁয়ের বাড়ির বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে তার পড়ার ঘরের দরজা অর্ধেক খোলা, আলো পুরো জ্বলছে, যেন সে এইমাত্র বাইরে এসেছে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আগে তার মাথা একটু ঠান্ডা করার জন্য। লিন্‌ডাউ স্টেশনে গানের শব্দে রাতের শরীরটা ভরে ছিল, স্টেশনে ঢোকার মুখে, আবার স্টেশন ছাড়ার সময়েও, আর যদিও শনি ও রোববারের মাঝখানের রাতে রেলযাত্রায় যে-কেউ যাত্রার পথ ধরে সপ্তাহান্তের নাইট-লাইফের অনেক হইচইয়ের মধ্যে দিয়েই যাবেন, তাতে অবশ্য ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে সামান্যই, ঘুম মনে হয় তাতে করে ততটাই আরো গাঢ় হয় যতটা বাইরের উৎপাত আরো সশব্দ হয়ে ওঠে। গার্ডরাও দেখি যে প্রায়ই আমার ঘোলা হয়ে আসা জানালার শার্সির বাইরে ছোট ছোট পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, কাউকে ঘুম থেকে ওঠানো তাদের উদ্দেশ্য নয়, তারা স্রেফ তাদের দায়িত্বটুকুই পালন করছে, ফাঁকা স্টেশনে গলার বাড়তি জোরের সঙ্গে চিল্লিয়ে বলছে জায়গার নাম, নামের এক অক্ষর এই কামরার আর অন্য অক্ষরগুলো সামনের দিকের কামরার বাইরে হেঁটে যেতে যেতে। আমার সঙ্গের যাত্রীরা তখন তাদের মাথার মধ্যে জায়গার নামটা হয় পুরো তৈরি করার কসরত করছে, না হয় তারা আরো একবার উঠে জানালা সাফ করে বাইরে লেখা স্টেশনের নাম পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে; তবে আমি কিন্তু ততক্ষণে আবার কাঠের গদিতে মাথা হেলান দিয়েছি।

যা হোক, আমি মনে করি কেউ যদি ট্রেনে ওরকম ভালো ঘুমাতে পারে যেমনটা আমি পারি – স্যামুয়েল বলে সে নাকি সারা রাত চোখ খুলে বসে থাকে – তাহলে তাকে একেবারে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত ঘুমাতে দেওয়া উচিত; এটা উচিত না যে সে ওরকম গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে একটা রেলবগির ছোট কামরার ভেতরে, কোনার মধ্যে, ঠাসাঠাসি করে আছে, মুখ তেলতেলে, শরীর ঘর্মাক্ত, চুল একদম উষ্কখুষ্ক, কাপড়চোপড় চব্বিশ ঘণ্টা রেলভ্রমণের ধুলো-কালিতে মাখামাখি, দাঁত ব্রাশ নেই, একটু মুক্ত বাতাস নেই, আর এভাবেই আরো অনেক অনেক ঘণ্টা চলা তার নিয়তিতে লেখা। শরীরে জোর থাকলে ওরকম ঘুম যে-কেউ পারলে ঘৃণা করত, কিন্তু তা বলে তো লাভ নেই; আমার বরং স্যামুয়েলের মতো মানুষদেরকে ঈর্ষা হয়, যারা হয়তো ছাড়া-ছাড়া একটু ঘুম দিয়েছে, তাই নিজেদের যত্ন নিতে পেরেছে অনেক বেশি, প্রায় পুরো ভ্রমণটাই করেছে মানসিকভাবে সচেতন থেকে আর তাদের মাথা অক্ষত ও পরিষ্কার রাখতে পেরেছে ঘুমের যাবতীয় আগ্রাসন থেকে; সন্দেহ নেই, সেই আগ্রাসন তাদেরও ছেড়ে দিয়ে রাখেনি। সকালে, বাস্তবিকই, আমি ছিলাম সম্পূর্ণ স্যামুয়েলের দয়ার ওপরে।

আমরা জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশাপাশি, আমি স্রেফ তাকে খুশি করার জন্যই; যখন সে আমাকে জানালার বাইরে সুইজারল্যান্ডের যতটা দেখা যাচ্ছে তা দেখাল, বলল আমি ঘুমানোর কারণে কী কী সব দেখা মিস করেছি, আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, সেসবের প্রশংসা করলাম ওর মুখ থেকে শুনেই। এটা ভালো যে, আমার এই এখনকার মতো মন-মেজাজ সে হয় ধরে উঠতে পারে না কিংবা খেয়াল করে না, কারণ আমি দেখি বরং এরকম সময়েই সে আমার প্রতি গাঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে (অন্য সময় যখন আমি মনে করি তার বন্ধুত্ব আমার বেশি প্রাপ্য, তখনকার চেয়ে বেশি)। আমি ভাবছিলাম শুধু ডোরা লিপ্‌পার্টের কথা। নতুন কারো সঙ্গে ক্ষণিকের দেখা হলে, বিশেষ করে যদি মেয়েদের সঙ্গে হয়, আমার জন্য কোনো আন্তরিক মতামতে পৌঁছানো কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ দেখা যায় পরিচয় যত সামনে এগোচ্ছে, আমি ততই নিজের দিকে তাকানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছি (নিজেকে ব্যস্ত রাখার জিনিসের আমার কমতি নেই), অতএব ক্ষণিকের যে অনুভূতিগুলো আমার হয় এবং সাথে সাথেই আমি যা হারিয়ে বসি, দেখা যায় তারি অতি হাস্যকর সামান্য এক অংশই আমি ফসল হিসেবে ঘরে তুলতে পেরেছি। অন্যদিকে, স্মৃতিচারণার সময়, এই অল্পপরিচয়ের মানুষগুলো অনেক বড় হয়ে ওঠে, অনেক আদরণীয় হয়ে ওঠে, কারণ স্মৃতির মধ্যে তারা নীরব-নিশ্চুপ, নিজেদের কাজেই ব্যস্ত আর আমাদের উপস্থিতি পুরো ভুলে গিয়ে আমাদের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য দেখিয়ে যায়। তবু ডোরার জন্য (স্মৃতিতে এখন আমার সবচেয়ে নিকটের মানুষ সে) এত বেশি আমার মন-কেমন-করার অন্য একটা কারণও আছে। আজ সকালে আমি জেনেছি স্যামুয়েল আমার একটা অভাব পূরণ করতে পারবে না। সে আমার সঙ্গে ভ্রমণে বেরোতে রাজি, কিন্তু তাতে কী? তার মানে তো হচ্ছে ভ্রমণের অত দিনের পুরো সময় ধরে আমার পাশে থাকবে কাপড়চোপড়ে পুরো গা ঢাকা এক পুরুষমানুষ, যার শরীর আমি হয়তো দেখব শুধু গোসলের সময়েই, যদিও সে দৃশ্য দেখার বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছাও আমার নেই। আমি যদি কাঁদতে চাই তাহলে স্যামুয়েল, নিঃসন্দেহে, তার বুকে মাথা রেখে আমাকে কাঁদতে দেবে, কিন্তু তার সঙ্গে থেকে, তার ঐ পুরুষালি চেহারা, তার ঐ পরিচ্ছন্ন সুচালো দাড়ির নড়াচড়া, তার ঐ শক্ত করে বন্ধ করে রাখা মুখ (আর তো নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই) – এসবের দিকে তাকিয়ে আমার সেই মুক্তির কান্না কি আদৌ কোনো দিন চোখ পর্যন্ত উঠে আসবে?

বিরাট শোরগোল

আমি বসে আছি আমার ঘরে – পুরো অ্যাপার্টমেন্টের হইচইয়ের হেড কোয়ার্টারে। শুনছি সবগুলো দরজা দড়াম-দড়াম বন্ধ করা হচ্ছে, ঐ আওয়াজ আমাকে রেহাই দিচ্ছে এই ঘর থেকে ঐ ঘরে মানুষের ছুটোছুটির আওয়াজ শ্রেণি থেকে; রান্নাঘরে ওভেনের দরজা ঠকাস করে বন্ধ করার শব্দও কানে এল। আমার বাবা ধুম করে হঠাৎ আমার ঘরে উদয় হলেন, আর তার দুলতে থাকা ড্রেসিং-গাউনে খসখস শব্দ তুলে হাঁটতে লাগলেন, পাশের ঘরে উনান থকে ছাই চেঁছে তোলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, ভাল্লি চিৎকার করে জানতে চাইছে বাবার কোটটাতে এখনো ব্রাশ মারা হয়েছে কি না – হলঘর থেকে কথাটা সে চেঁচিয়ে বলল প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদা করে, যেন পরে কেউ না-বলতে পারে যে শুনিনি – এর উত্তরে যে-চিৎকার শুনলাম তা সাপের হিস্ শব্দের আকার নিয়ে আমার মগজ ভজাতে চাইল। অ্যাপার্টমেন্টের সামনের দরজা খোলা হলো ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ তুলে, মনে হলো যেন কেউ সর্দি-শ্লেষ্মাভরা গলা সাফ করল খাকারি দিয়ে; দরজা আরও খুলল কোনো মেয়ের গানের গুনগুন আওয়াজের সঙ্গে, অবশেষে এমন একটা পুরুষালি ভোঁতা দুম শব্দ করে বন্ধ করা হলো যে, এটাই এতক্ষণের সবচেয়ে নির্মম শব্দ বলে মনে হলো আমার। বাবা চলে গেছেন; এবার শুরু হলো আরও পেলব, বিক্ষিপ্ত, হতভাগা সব বিচিত্র শব্দ, এদের নেতৃত্বে আছে দুটো পোষা ক্যানারি পাখির আওয়াজ। ক্যানারি দুটো আমাকে মনে করিয়ে দিল যে আজই প্রথম না, আমি আগেও ভেবেছি আমার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে, সাপের মতো বুকে ভর দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে, পেটের উপর উপুড় আর হেঁটমুখ হয়ে আমার বোন ও তার কাজের মেয়েটার কাছে ভিক্ষা চাইব যে তোমরা একটু চুপ করো।

খেয়ান

গাঁয়ের রাস্তায় বাচ্চারা

বাগানের বেড়ার অন্য পাশ দিয়ে দু-চাকার ঘোড়াগাড়িগুলো চলে যাওয়ার শব্দ কানে এল, এমনকি মাঝেমধ্যে গাড়িগুলো দেখতেও পেলাম গাছের পাতার মৃদু সরে যেতে থাকা ফাঁক দিয়ে। ওগুলোর চাকার স্পোক আর ঘোড়া জুড়বার ডান্ডা কী ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ-ই না করছে গ্রীষ্মের তাপে! খেত থেকে মজুরেরা ফিরে আসছে, তারা হাসছে নির্লজ্জের মতো।

আমি বসে আছি আমাদের ছোট দোলনাটাতে, পৈতৃক বাগানের গাছগাছালির মধ্যে বসে জিরিয়ে নিচ্ছি একটু।

বেড়ার ওপাশে হইচই চলছে তো চলছেই। দৌড়াতে থাকা বাচ্চাগুলো এক নিমেষেই হাওয়া, গমের গাড়িগুলোতে ছাওয়া গমের আঁটিগুলোর উপরে আর চারপাশ ঘিরে বসে থাকা পুরুষ মহিলাদের ছায়াতে ঢেকে যাচ্ছে ফুলের বাগানগুলো; সন্ধ্যার কাছাকাছি এক ভদ্রলোককে দেখলাম হাতে দড়ি নিয়ে একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন, আর রাস্তার অন্য দিক থেকে হাত ধরাধরি করে আসতে থাকা একদল মেয়ে তাকে সালাম জানিয়ে সরে গেল পাশের ঘাসে।

এরপর পাখিরা আকাশে উড়ে গেল একটা স্ফুলিঙ্গের বৃষ্টির মতো, আমার চোখ অনুসরণ করল ওগুলোকে, দেখলাম এক শ্বাসে কীভাবে ওরা উপরে উঠে গেল, একসময় মনে হলো ওরা আর উঠছে না, আমি বরং নামছি, আর দোলনার দড়ি শক্ত হাতে আঁকড়ে মূর্ছা যাওয়ার অনুভূতি নিয়ে আমি দুলতে শুরু করলাম খানিকটা। শিগগিরই, চারপাশের বাতাস আরো যত ঠান্ডা হচ্ছে ততই আমি আরো জোরে দোল খাচ্ছি, আর উড়তে থাকা পাখিগুলোর জায়গায় তখন আকাশে কাঁপা-কাঁপা অনেক তারা।

মোমের আলোয় আমাকে দেওয়া হলো রাতের খাবার। প্রায়ই আমি আমার হাত দুটো রাখছি টেবিলের কাঠের উপরে আর ঢুলু ঢুলু চোখে কামড় বসাচ্ছি রুটি ও মাখনে। হাতে-বোনা খসখসে পর্দাগুলো ঢেউ খেলে দুলছে গরম বাতাসে, আর কখনো-সখনো বাইরে দিয়ে হেঁটে যাওয়া কেউ দুই হাতে পর্দাগুলো ধরে চাইছে আমাকে আরো ভালো করে দেখতে কিংবা আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে। সাধারণত মোমবাতি একটু পরেই

নিভে যাবে, তখন জড়ো হওয়া পোকাগুলো আরো কিছুক্ষণ ঘুরপাক খাবে মোমের কালো ধোঁয়ার মধ্যে। জানালা থেকে আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার দিকে এমনভাবে তাকাব যেন দূরের পাহাড় দেখছি কিংবা আকাশ দেখছি, তবে সে-ও যে আমার উত্তরের জন্য খুব ব্যাকুল তা-ও বলা যাবে না।

কিন্তু তাদের কেউ যদি লাফ দিয়ে জানালার চৌকাঠ পেরিয়ে আসে, বলে যে অন্যরা সবাই অপেক্ষা করে আছে বাড়ির সামনে, তাহলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওঠা ছাড়া আমার আর উপায় থাকে না।

'আরে আসো না, দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন? কী হয়েছে? ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? সেটা কি – কাটিয়ে ওঠার মতো না? সত্যিই কি সব শেষ বলতে চাচ্ছ?'

কিছুই শেষ না। আমরা দৌড়ে যাই বাড়ির সামনেটায়। 'থ্যাংক গড, শেষমেশ এলে তুমি?' – 'সবসময় তুমি দেরি করো!' – 'কী বল? আমি?' – 'তুমি। যদি বাইরে আসতে না চাও তো বাসাতেই থাকো।' – 'কোনো মাফ নেই।' – 'কী? মাফ নেই? এটা আবার কী ধরনের কথা?'

আমরা মাথা নুইয়ে ঢুঁ মেরে ঢুকে পড়ি সন্ধ্যার মধ্যে। দিন বলে কিছু নেই, রাত বলেও না। এই আমাদের জ্যাকেটের বোতামগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা দাঁত ঠকঠকানির মতো আওয়াজ তুলছে, এই আমরা দল বেঁধে দৌড়ে যাচ্ছি আমাদের মধ্যে একটা নিয়মিত দূরত্ব রেখে, গ্রীষ্মদেশের পশুদের মতো আগুন ঝরাচ্ছি আমাদের নিশ্বাসে। পুরোনো দিনের যুদ্ধের বর্ম পরা ঘোড়ায় চড়া যোদ্ধাদের মতো পা ঠুকে আর লাফিয়ে লাফিয়ে আমরা একজন আরেকজনকে ধাওয়া করছি গাঁয়ের ছোট গলিপথে আর তারপর, পায়ের উপরই দৌড়ে, সোজা দূরে গাঁয়ের বড় রাস্তায়। আমাদের কেউ কেউ পড়ে গেল রাস্তার পাশের খাদে, অন্ধকার বাঁধের ওপাশে ঠিকমতো তারা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগেই আবার দাঁড়িয়ে গেল মেঠো পথের উপরে, অচেনা লোকের মতো, নিচে তাকিয়ে আছে।

'নিচে নেমে আসো!' – 'আগে তোমরা আসো উপরে!' – 'তাহলে বেশ আমাদের ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলবে, সেটা হচ্ছে না, অত বোকা না আমরা।' – 'তার মানে তোমরা ভয় পেয়েছ। আরো উপরে আসো, আসো না!' – 'ভয় পেয়েছি? তোমাদের? মনে করছ যে আমাদেরকে নিচে ফেলতে পারবে, তাই না? আশাও বটে তোমাদের!'

আমরা আক্রমণ করে বসলাম, বুকে ধাক্কা খেলাম, গিয়ে পড়লাম ঘাসে ভরা খাদে, মনের খুশিতে ওখানে পড়ছি। সবকিছু একই রকম নরম-কোমল, ঘাসে আমাদের না লাগছে গরম, না ঠান্ডা, স্রেফ মনে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

এমন যে, আমরা যদি শরীরটা ডান কাতে ঘোরাই আর কানের নিচে একটা হাত রাখি, তাহলে খুব ইচ্ছা হবে ঘুমিয়ে পড়ি। তার পরও আমরা চাচ্ছি থুতনিটা শূন্যে বাড়িয়ে আবার কষ্ট করে হলেও দু পায়ে খাড়া হতে, তবে তা স্রেফ আরো গভীর কোনো খাদে পড়ার জন্যই। আমরা চাচ্ছি এমনই চলতে থাকুক সারা জীবন।

আমরা আমাদের শেষ বিশ্রামের গর্তটায় সত্যি কী করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব, পুরো

সোজা হয়ে, বিশেষ করে দুই পা টান টান করে, তা কিন্তু এমন একটা জিনিস যা আমরা কেউই বলতে গেলে ভাবি না, এমনকি যখন পিঠের উপর শুয়ে আছি মড়ার মতো, কেঁদে ফেলব ফেলব অবস্থা। আমরা শরীর কুঁচকে ফেলছি যখনই বাঁধের ওখান থেকে কোনো ছেলে আমাদের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ছে রাস্তার উপর, তার পায়ের তলাটা কালো, হাত দুটো শরীরের পাশে এঁটে রাখা।

এরই মধ্যে আকাশে দেখা যাচ্ছে চাঁদ বেশ উপরে উঠে গেছে; এর আলোতে একটা ডাকগাড়ি চলে গেল পাশ দিয়ে। চারপাশে মিষ্টি একটা হাওয়া উঠল, খাদের মধ্যে শুয়েও সেটা ভালোই অনুভব করা যাচ্ছে আর কাছের বনে গাছপালার ঝিরঝির শব্দ শুরু হয়েছে। একা থাকবার ইচ্ছা আমাদের সবার মন থেকে একদম চলে গেছে।

'তোমরা সব গেলে কোথায়?' – 'এই দিকে!'— 'সবাই একসঙ্গে হও!' – 'আরে লুকাচ্ছ কেন, বোকার মতো কোরো না!' – 'দেখোনি যে একটু আগে ডাকগাড়ি চলে গেল?' – 'ওহ্ না! চলে গেছে? এত তাড়াতাড়ি?'– 'কোনো সন্দেহ নেই, তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে সেই সময় চলে গেল।' – 'আমি ঘুমাচ্ছিলাম? কী ফালতু বকছ!' – 'ওহ্, শাট আপ, যে কেউ বলবে ঘুমাচ্ছিলে তুমি।' 'না, সত্যি বলছি, না।' 'ওহ্, রাখো তো! চলো!'

এবার দৌড়ের সময় আমরা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছি, আমাদের অনেকেই হাত ধরাধরিও করে রয়েছে; আমরা আমাদের মাথা বেশি উঁচুতে রেখে দৌড়াতে পারছি না; কারণ, রাস্তা এখন নিচে নেমে যাচ্ছে। কে যেন একটা রেড-ইন্ডিয়ান যুদ্ধের চিৎকার দিয়ে উঠল, আমাদের পাগুলো ঘোড়ার মতো টগবগ করে ছুটছে এখন, আগে এমনটা করিনি আমরা, আমরা যখন শূন্যে লাফ দিয়ে উঠছি, বাতাস এসে আমাদের কোমর উপরে ভাসিয়ে দিচ্ছে। কোনোকিছুই আমাদের থামাতে পারত না; এত জোরেই ছুটছি আমরা যে একজন যখন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি, তখনো আমাদের হাত দুটো ভাঁজ করা আর চারপাশে তাকাচ্ছি কেমন শান্ত ভঙ্গিতে।

পাহাড়ি ছড়াটার উপরের সেতুতে আমরা থামলাম; যারা সামনে এগিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এল। আমাদের নিচে পাথর ও শেকড়বাকড়ের গায়ে পানি আছড়ে পড়ছে; মনেই হচ্ছে না যে এরই মধ্যে রাত নেমে এসেছে। আমাদের মধ্যে কেউ-যে লাফ দিয়ে সেতুর রেলিংয়ে উঠে গেল না, সেটা একটা অবাক করা ব্যাপার।

দূরে গাছগুলোর ঘন ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা রেলগাড়ি বেরিয়ে এল, এর সবগুলো বগিতেই আলো জ্বলছে; কোনো সন্দেহ নেই, জানালাগুলো নামানো। আমাদের একজন খুব চালু একটা গান গাইতে শুরু করল, তবে ততক্ষণে সবাই চাইছে গান গাইতে। রেলগাড়িটা যে গতিতে যাচ্ছে তার চেয়ে দ্রুত গান গাইছি আমরা, আমাদের হাতগুলোও দোলাচ্ছি কারণ শুধু গলা দিয়ে আর চলছে না, সবার গলা একসঙ্গে মিলে একটা হুটোপুটি অবস্থা– খুব মজা পেলাম তাতে। কারো গলা যদি আরেকজনের গলার সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে মনে হয়, বঁড়শিতে মাছের মতো আটকে গেছি।

এভাবেই আমরা গেয়ে চললাম, বনটা আমাদের পেছনের দিকে, আমরা গাইছি দূরে

যারা সফরে আছেন তাদের জন্য। গায়ে বড়রা এখনো জেগে আছে; আমাদের মায়েরা রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানা তৈরি করছে।

এবার সময় হয়ে এল। আমার সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো ছেলেটাকে একটা চুমু খেলাম আমি, পরের তিনজনকে শুধু হাত বাড়িয়ে দিলাম আর তারপর বাড়ির পথে দৌড় শুরু করলাম, কেউই আমাকে ডাকল না পেছন থেকে। প্রথম চারমাথায় এসে, আমাকে ওরা কেউ আর দেখতে পাচ্ছে না, আমি ঘুরে গেলাম আর মেঠো পথ ধরে আবার ফিরে যেতে লাগলাম বনের দিকে। আমি যাচ্ছি দক্ষিণের সেই ছোট শহরের দিকে, যেটা নিয়ে আমাদের গ্রামে গল্প আছে যে :

'অদ্ভুত সব লোক থাকে ওখানে। শুধু ভাবো, ওরা কখনো ঘুমায় না!'

'কেন, কী কারণে?'

'কারণ ওরা কখনো ক্লান্ত হয় না।'

'কেন, কী কারণে?'

'কারণ ওরা সব বোকা।'

'বোকারা কি ক্লান্ত হয় না?'

'বোকারা আবার কী করে ক্লান্ত হবে!'

সাধু সাজা এক ফেরেববাজের মুখোশ উন্মোচন

শেষমেশ রাত দশটার দিকে আমি বিশাল বাড়িটার দরজায় পৌঁছালাম, ওখানে আমাকে দাওয়াত করা হয়েছে একটা পার্টিতে, আমার সঙ্গে এক লোক, তাকে আমি খুবই সামান্য চিনি, আগে এক-দুবার দেখা হওয়ার পরে কোত্থেকে তিনি এসে আবার আমার গায়ে পড়লেন আর পুরো দুটো ঘণ্টা আমাকে অলিগলি ধরে টেনে নিয়ে এলেন এখানে।

'ঠিক আছে!' আমি বললাম, আর দুই হাতে তালির মতো বাজিয়ে বোঝালাম যে আমাদের আলাদা হওয়াটা এখন খুবই জরুরি। এর আগেও আমি বেশ ক'বার একটু ইনিয়ে বিনিয়ে একই চেষ্টাটা করেছি, যথেষ্ট হয়েছে, আর পারছি না।

'আপনি কি সোজা উপরে যাচ্ছেন?' তিনি জানতে চাইলেন। তার মুখ থেকে দাঁত ঠকঠক করার একটা আওয়াজ হলো।

'হ্যাঁ।'

কথা হচ্ছে, এখানে আমার দাওয়াত আছে, শুরুতেই কিন্তু সে কথা তাকে বলেছি আমি। আমার দাওয়াত সিঁড়ি বেয়ে ঐ উপরে যাওয়ার (ওখানে পৌঁছানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি), দাওয়াতটা নিচে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার উল্টোদিকের এই লোকের কান পেরিয়ে সামনে তাকিয়ে থাকার জন্য না। কিংবা এজন্যও না, এই যেমন এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি এই লোকের সঙ্গে, মনে হচ্ছে যেন ঠিক এখানে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা)। কী এক নীরবতা – চারপাশের বাড়িঘরগুলো আর আকাশের তারা পর্যন্ত উঠে যাওয়া অন্ধকার, সব তাতে যোগ দিয়েছে। আর রাস্তায় দেখা-যাচ্ছে-না-এমন পথচারীদের পায়ের শব্দ (তারা কোথায় যাচ্ছে তা আন্দাজ করার ইচ্ছা কারোই নেই), রাস্তার অন্য পাশটা চেপে ধরেছে যে হাওয়া তার শব্দ, কোনো এক ঘরের বন্ধ জানালায় গ্রামোফোনে বাজতে থাকা এক গানের শব্দ – এই নীরবতায় সবকিছু কানে বাজছে স্পষ্ট হয়ে, যেন নীরবতার মালিক এরাই, আগের চিরদিন আর ভবিষ্যতের চিরদিনও।

আর আমার সঙ্গী ভদ্রলোক এই নীরবতায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন নিজের গরজেই এবং – একটু মুচকি হেসে – আমার পক্ষ থেকেও; তিনি দেয়ালের উপরে তার ডান হাত রাখলেন আর চোখ বন্ধ করে ওখানেই ঠেকালেন তার গালটাও।

কিন্তু তার এই হাসিটার শেষ পর্যন্ত দেখা হলো না আমার, কারণ হঠাৎ একটা লজ্জায় মাথা ঘুরে উল্টোদিকে ঘুরে গেলাম আমি। স্রেফ ঐ হাসি দেখেই আমি চিনে ফেলেছি যে এই লোক একজন ভণ্ড সাধু, এ ছাড়া আর কিছুই না। হায় খোদা, এই শহরে কত মাস হলো আমার, আমি ভেবেছিলাম সাধু সাজা ধাপ্পাবাজগুলোকে আমি মাথা-থেকে-পা-পর্যন্ত চিনে ফেলেছি – যেভাবে তারা রাতের বেলায় পাশের গলিগুলো থেকে উদয় হয় আমাদের সামনে, তাদের দুই হাত সরাইখানার মালিকদের মতো দুদিকে বাড়িয়ে; আর যেভাবে তারা কাচুমাচু ঘুরঘুর করে বেড়ায় (মনে হয় যেন পলাপলি খেলছে) বিলবোর্ডের খুঁটির চারপাশে

যখন আমরা ওখানের বিজ্ঞাপনগুলো তাকিয়ে দেখছি; যেভাবে তারা অন্তত এক চোখ খুলে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখে থামের বাঁকের পেছন থেকে; আর আমরা যখন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মাত্র ভীত-বিচলিত হওয়া শুরু করেছি, তখন যেভাবে তারা হঠাৎ উড়ে এসে পড়ে আমাদের সামনে, ফুটপাতের কিনারে! এদের আমি যে কী ভালোভাবে বুঝি, সত্যি বলতে এই শহরে, এখানকার ছোট পানশালাগুলোতে, আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়া লোক এরাই, আর এদের কারণেই আমি প্রথম খোঁজ পাই 'একরোখা' শব্দটার, যা এত দিনে আমার জীবনের এত বড় একটা অংশ হয়ে উঠেছে যে মনে হয় আমি নিজের মধ্যেও একই স্বভাব খুঁজে পাওয়া শুরু করেছি। কী রকম নাছোড়বান্দার মতো এরা লেগে থাকে আমাদের সঙ্গে, এমনকি এদের থেকে পালিয়ে বাঁচার অনেক দিন পর অবধিও, তখন যদি আমাদের ঠকানোর আর কোনো ফন্দি এদের হাতে না থাকে তো তা-ও। কীভাবে তারা বসতেও রাজি হয় না, ভেঙে পড়তেও রাজি হয় না, এর বদলে তখনো (এবার একটু দূরের থেকেই) তারা কীভাবে আমাদের দিকে এত কিছুর পরও বিশ্বাস জাগানো চোখে বিরামহীন তাকিয়েই থাকে। আর এদের তরিকাগুলো সব সময় একই রকম : আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, যতটা পারা যায় জায়গা নিয়ে; যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানে যেন না যাই সেজন্য পীড়াপীড়ি করবে; বলবে যে তার বদলে আমাদের বুকে আসো, আর যদি তখন আমাদের মধ্যে জমে ওঠা চাপা ক্ষোভটা শেষমেশ জ্বলে উঠেই তো তারা সেটা মেনে নেবে আলিঙ্গনের মতো, তার ভেতরে সবার প্রথমে মুখটা বাড়িয়ে নিজেদের সঁপে দেবে তারা।

আর আমার কিনা এবার এই লোকটার সঙ্গে এতক্ষণ লাগল তাদের এই পুরোনো খেলাগুলো বুঝে উঠতে। আমার আঙুলের মাথাগুলো আমি একসঙ্গে জোরে ঘষতে লাগলাম, ওভাবে চেষ্টা করলাম এই লজ্জা মুছে ফেলতে।

তার পরও আমার এই লোক আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল দেয়ালে হেলান দিয়ে, এখনো ভাবছে সে তো সাধুরূপী ফেরেববাজিতে ওস্তাদ; নিজের এই কাজ নিয়ে পরিতৃপ্তি গোলাপি আভা ছড়াল তার আমার দিকে ফেরানো গালে।

'চিনে ফেলেছি!' আমি বললাম, তার কাঁধে একটা আলতো টোকা মারলাম। তারপর ঝটপট উঠে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে, আর অতিথিদের অপেক্ষা করার ঘরে চাকর-নকরদের চেহারায় বাড়াবাড়ি রকমের আত্মনিবেদন দেখে আমার মন ভরে গেল এক মধুর বিস্ময়ে। আমি তাদের সবার দিকে তাকালাম এক-এক করে, তারা তখন আমার কোট খুলছে আর জুতোর ধুলো ঝাড়ছে। তারপর শরীরটা নিজের পুরো উচ্চতায় খাড়া করে নিয়ে, স্বস্তির এক নিশ্বাস ফেলে লম্বা পায়ে ঢুকলাম হলরুমটাতে।

হঠাৎ হাঁটতে বেরোনো

অবশেষে আপনি যখন মনস্থির করেছেন যে সন্ধ্যাটা বাড়িতেই কাটাবেন, তারপর ঘরে পরার জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে রাতের খাবারের পরে বসেছেন বাতি-জ্বলা টেবিলে সেই কাজটা করতে বা সেই খেলাটা খেলতে, যা শেষ করেই সাধারণত আপনি বিছানায় যান, যখন বাইরের আবহাওয়া এতই বিশ্রী যে ঘরে বসে থাকাটাই স্বাভাবিক, যখন টেবিলে আপনি চুপচাপ এতটা বেশি সময় ধরেই বসেছেন যে এখন যদি বাইরে যান তো সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে, যখন সিঁড়িঘর এমনিতেই অন্ধকার আর সামনের দরজায় তালা দেওয়াও শেষ, যখন এই এতকিছুর পরেও হঠাৎ মুহূর্তের এক অস্থিরতায় আপনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন, জ্যাকেট বদলেছেন, বেশি দেরি হয়নি আপনাকে এবার দেখা যাচ্ছে রাস্তায় বেরোনোর পোশাকে, আপনি বোঝাচ্ছেন যে আপনাকে বাইরে যেতেই হবে এবং একটুখানি গুডবাই ইত্যাদি বলে আসলেই আপনি বাইরে বেরোলেন, আন্দাজ করছেন যেভাবে ফ্ল্যাটের দরজা দড়াম করে বন্ধ করলেন তাতে ঘরের লোকজন কতটা বিরক্ত হলো, তারপর যখন নিজেকে রাস্তায় ফিরে পেলেন আপনি, আপনার হাত-পা কী এক চটপটে ভঙ্গিতে সাড়া দিচ্ছে আপনার ওদেরকে উপহার দেওয়া এই আচম্বিত স্বাধীনতায়, যখন দৃঢ়ভাবে এই একবার সিদ্ধান্ত নিতে পারার ঘোরে নিজের অনেক গভীরে আপনার এই অনুভূতি হচ্ছে যে সিদ্ধান্ত নিতে আপনি পিছপা হন না, যখন স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কারভাবে আপনি এটা বুঝলেন যে সবচেয়ে আচমকা পরিবর্তনগুলো ঘটানোর এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যেটুকু শক্তি মানুষের দরকার আপনার তার চেয়ে বেশিই আছে, আর যখন এরকম এক মানসিক অবস্থায় আপনি হেঁটে বেড়াচ্ছেন শহরের দীর্ঘ রাস্তাগুলোয় – তখন ঐ রাতটার জন্য আপনি আসলে নিজেকে পুরোপুরি ছাড়িয়ে নিলেন পরিবারের শৃঙ্খল থেকে, পরিবার বিষয়টা হারিয়ে গেল অনাবশ্যকতায়, আর তখন আপনি নিজে পাথরের মতো দৃঢ়তা নিয়ে (আপনার শরীরের আকারটা দেখাচ্ছে ধারাল কালো) নিজের পাছায় চাপড় মারতে মারতে জেগে উঠলেন আপনার সত্যিকারের মাপে।

আর এই পুরো ব্যাপারটার গাঢ়তা আরো বেড়ে যাবে যদি রাতের ওরকম এক সময়ে আপনি কোনো বন্ধুকে সে কেমন আছে দেখার জন্য খুঁজে ফেরেন।

সংকল্পগুলো

নিজেকে দুর্দশার গহ্বর থেকে তুলে আনা মনে হয় না কঠিন কোনো কাজ, এমনকি জোর করে শক্তি সঞ্চয় করেও যদি করেন। চেয়ার থেকে আমার শরীরটা তুলতে হবে ঝটকা টানে, টেবিলটা ঘিরে তারপর ঘুরব দুলকি চালে, আমার মাথা ও ঘাড় ঢিলে করে দেব, চোখের মধ্যে ভরে নেব আগুন, চোখের চারপাশের পেশিগুলো টান টান করব। আমার সহজাত সব অনুভূতির উল্টো গিয়ে, যদি ক. আসে তো তাকে মহা খুশিতে স্বাগত জানাব, নির্বিবাদে খ.-কে সহ্য করে যাব আমার এই ঘরে, আর গ.-এর সঙ্গে – পেরেশানি ও যন্ত্রণা দুই ই উপেক্ষা করে – সে যা বলবে সব হজম করে যাব লম্বা ঢোক গিলে।

কিন্তু এর সব যদি আমার পক্ষে করা সম্ভবও হয়, তবু একটা কোনো ভুল (আর ভুল তো হবেই) পুরো চেষ্টাটাকে, যত কঠিন বা যত সহজই হোক, হোঁচট খাইয়ে দেবে; তখন আমাকে আবার সেই প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।

এ কারণেই সবচেয়ে ভালো উপদেশ হচ্ছে, যেটাই ঘটুক মেনে নাও, যদি দেখো যে কোনোকিছু তোমাকে উড়িয়ে নিচ্ছে তবু আচরণ করো জড় বস্তুপিণ্ডের মতো, ভুলেও লোভে পোড়ো না একটাও কোনো অহেতুক পা ফেলার, অন্য লোকদেরকে দেখো পশুর চোখ দিয়ে, কোনো অনুশোচনা কোরো না – এক কথায় বললে নিজের হাত দিয়ে দুমড়ে দিয়ো জীবনের একটা অশরীরী টুকরোও যদি তোমার মধ্যে বেঁচে থাকে, তার মানে, কবরে যে শেষ শান্তি মিলবে তাকে আরো গাঢ় কোরো এবং এর বাইরে কোনোকিছুকে আর টিকতে দিয়ো না।

এ ধরনের মানসিক অবস্থায় সাধারণত যে শারীরিক ভঙ্গিটা করতে দেখা যায় তা হলো নিজের কড়ে আঙুল দিয়ে ভ্রু ডলতে থাকা।

পাহাড়ে দল বেঁধে বেড়ানো

'আমি জানি না,' এই ছিল আমার নিঃশব্দ চিৎকার, 'আমি সত্যি জানি না। যদি কেউ না আসে তো, বেশ, কেউ না আসবে। আমি কারো ক্ষতি করিনি, কেউ আমার ক্ষতি করেনি, তবু কেউ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। কেউ না, কেউ না, কেউ না। তবে ব্যাপারটা যদিও ঠিক এরকম না। কথা এটুকুই যে কেউ আমাকে সাহায্য করে না – তা ছাড়া কিন্তু এই অনেক কেউ-না ব্যাপারটা আমার ভালোই লাগে। আমার সত্যিই ভালো লাগবে (না-লাগার তো কারণ নেই) একদল কেউ-না নিয়ে একসঙ্গে বেড়াতে যেতে। পাহাড়ে, অবশ্যই, তা ছাড়া আর কোথায়? কীভাবে এই কেউ-না'র দল একসঙ্গে হয়ে ধাক্কাধাক্কি করে! কত কত হস্ত শরীরের দুই পাশে ছড়ানো আর একসঙ্গে ধরাধরি করা; ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটতে থাকা কত কত পা, আলাদা আলাদা! এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা সবাই রাতের পোশাক পরা। আমরা দল বেঁধে ভালোই এগোচ্ছি, তখন সজোরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে আমাদের একে অন্যের মাঝখানের আর আমাদের হাত-পায়ের ফাঁকগুলো দিয়ে। পাহাড়ে আমাদের গলা কত পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে আমরা গান গাইতে শুরু করিনি।'

ব্যাচেলরের নিয়তি

ব্যাচেলর থেকে যাওয়ার কথা ভাবতে কত ভয়ংকর লাগে : বুড়ো বয়সে যখন ইচ্ছা করবে মানুষের সান্নিধ্যে সন্ধ্যাটা কাটাতে, তখন নিজের মান-মর্যাদার মাথা খুইয়ে কীভাবে ভিক্ষা চাইতে হবে যে আমাকে সঙ্গে নাও; অসুস্থ হলে কীভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে শূন্য ঘরের কোনায় নিজের বিছানায় শুয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে হবে; সব সময় গুডবাই বলে যেতে হবে রাস্তার দিকের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে; সিঁড়িতে কখনোই পাশে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে উপরে উঠতে হবে না; নিজের ঘরে শুধু পাশ-দরজাই থাকবে, যেটা দিয়ে অন্য মানুষের ফ্ল্যাটে যাওয়া যায়; রাতের খাবার হাতে করে বয়ে আনতে হবে বাইরে থেকে; অন্য লোকেদের বাচ্চাকাচ্চাদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাতেই হবে আর 'না, আমার নিজের বাচ্চা নেই' এ-কথাটা লোকজন বারবার করে বলতেও দেবে না; আর তরুণ বয়সে দেখা দু-একজন ব্যাচেলর মানুষের কথা মনে রেখে সেই আদলে নিজের পোশাক-আশাক ও ব্যবহার ঠিক করে নিতে হবে।

ব্যাপারটা হবে এমনই, কোনো সন্দেহ নেই, শুধু এটুকুই যোগ করা যায় যে ব্যাচেলর মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে এবং থাকবে– আজ ও সামনের সব দিনগুলোয় – এক কঠিন বাস্তবতার মধ্যে, একটা দেহ আর একটা সত্যিকারের মাথা নিয়ে, তার মানে একটা কপালও থাকবে তাতে, নিজের হাত দিয়ে চাপড়ানোর জন্য।

ব্যবসায়ী

সম্ভবত কেউ কেউ হয়তো আমার জন্য দুঃখ বোধ করেন, যদিও আমি তা ঠিক ধরতে পারি না। আমার ছোট ব্যবসাটা আমাকে দুশ্চিন্তায় ঘিরে রাখে (তাতে আমার ভুরুর ওখানে আর কপালের পাশ পর্যন্ত ব্যথা করে), ব্যবসাটার আকার এতই ছোট যে আমি তাতে ভবিষ্যতে সন্তুষ্টির কোনো আশা খুঁজে পাই না।

বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আমার এই দোকানদারের স্মৃতি সব সময় সতেজ রাখতে হয়, নিজেকে সাবধান করতে হয় সেইসব ভুল থেকে যা আমার করার আশঙ্কা রয়েছে, আর প্রত্যেক মৌসুমেই মাথা ঘামাতে হয় সামনের মৌসুমের ফ্যাশন নিয়ে, আমি যাদের সঙ্গে চলি তাদেরটা নিয়ে না, গ্রামগঞ্জে যাওয়া-যায়-না-এমন দূরের লোকজনের ফ্যাশন নিয়ে।

আমার আয়-ইনকাম সব অচেনা লোকজনের হাতে; তাদের পরিস্থিতি নিয়ে আমার অনুমান করার কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো ধারণাও নেই তারা কোনো দুর্ভাগ্যের শিকার হতে পারে কি না, অতএব ওটা এড়ানোর কোনো উপায়ও আমার নেই! হতে পারে তারা দুই হাত খুলে টাকাপয়সা ওড়াচ্ছে আর কোনো গার্ডেন-রেস্তোরাঁয় পার্টি দিয়ে চলেছে; অন্যেরা এই পার্টিতে এসে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যাচ্ছে আমেরিকায় নতুন জীবনের খোঁজে পাড়ি দেওয়ার আগে।

কোনো কাজের দিনের শেষে সন্ধ্যায় আমি যখন আমার দোকান বন্ধ করতে আসি, আর হঠাৎ মুখোমুখি হই সামনের ঘণ্টাগুলোর যখন আমি জানি যে আমার ব্যবসার নিরন্তর চাহিদা মেটানোর মতো কোনোকিছু আমার করার ক্ষমতার মধ্যে নেই, তখন সেদিন সকালে যে উত্তেজনা আমি ভবিষ্যতের কথা ভেবে তুলে রেখেছিলাম তা আমার গায়ে আছড়ে পড়ে ধেয়ে আসা ঢেউয়ের মতো, ওখানেই থামে না বরং আমাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়, লক্ষ্যহীনভাবে, কোথায় তা আমার জানা নেই।

তার পরও আমি এই মানসিক পরিস্থিতি আমার কোনো কাজে লাগাতে পারি না, শুধু পারি ঘরে চলে যেতে, কারণ আমার মুখ ও হাত দুটো ময়লা হয়ে আর ঘামে ভিজে আছে, আমার জামাকাপড় দাগে আর ধুলায় ভরে গেছে, আমার মাথায় কাজের-সময়ে পরার টুপি আর আমার জুতো ভরা প্যাকিং বাক্সের পেরেকের দাগ। ও রকম সময়ে আমি হাঁটি কোনো ঢেউয়ে ভাসা মানুষের মতো, কটকট দুই হাতের আঙুল ভাঙতে ভাঙতে আর পথে দেখা বাচ্চাদের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে।

বাসার পথটা খুব সামান্য। মুহূর্তের মধ্যে আমি বাসায় পৌঁছে যাই। লিফটের দরজা খুলি আর ভেতরে ঢুকি।

হঠাৎ দেখি যে আমি এখন একেবারে একা। অন্য লোকজন যাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হচ্ছে তারা উঠতে উঠতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন; হাঁফিয়ে শ্বাস নিতে নিতে তারা অপেক্ষা করেন যে কেউ তাদের ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে দেবে, এতে তারা বিরক্ত ও অধৈর্য হন বটে;

তারপর তারা বাসার হলঘরে ঢোকেন, ওখানে তাদের হ্যাট ঝুলিয়ে রাখেন; এর পরও যতক্ষণ না তারা বারান্দা ধরে বেশ কটা কাচের দরজার সামনে দিয়ে হেঁটে তাদের নিজ কামরায় পৌঁছাচ্ছেন, ততক্ষণ তাদের একা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু আমি লিফটের ভেতরে ঢোকামাত্রই একা, আর আমার হাঁটুতে দুই হাত ঠেকা দিয়ে সরু আয়নায় দেখছি নিজেকে। লিফট উপরে উঠতে শুরু করলে আমি বলি:

'চুপ করো, তোমরা সবাই; এবার পেছনে যাও; গাছের ছায়ায় হারিয়ে যেতে কি মন চায় না, জানালার ঐ পরদার পেছনে, পাতার শামিয়ানার মধ্যে?'

আমার দাঁতকে কথাগুলো বলি আমি, আর দেখি সিঁড়িঘরের হাতলগুলো ঝাপসা কাচের ওপাশে নিচে ভেসে চলে যাচ্ছে কোনো জলপ্রপাতের মতো।

'উড়ে যাও তাহলে; তোমার ডানাগুলো, যা আমি আজও কখনো দেখিনি, তোমাকে বয়ে নিয়ে যাক গাঁয়ে, উপত্যকার ওখানে, কিংবা সোজা প্যারিসে, তোমার মন যদি তা-ই চায়।

তবে জানালা দিয়ে যতটুকু দেখার তা কিন্তু দেখে নিয়ো, যখন তিনটে রাস্তা থেকে একই সময়ে মানুষের মিছিল এসে একসঙ্গে মেলে, কোনোটাই কোনোটাকে পথ দেয় না, শুধু একটার মধ্যে দিয়ে আরেকটা চলে যায় আর তাদের শেষ চলে যেতে থাকা অংশগুলোর মাঝখানে দেখা যায় স্কোয়ারটা আবার ফাঁকা হয়ে এসেছে। তুমি কিন্তু তোমার রুমাল নাড়িয়ো, ভয় পেলে পেয়ো, মন ছুঁয়ে গেলে যেতে দিয়ো, পাশ দিয়ে গাড়িতে সুন্দরী মহিলা গেলে তার তারিফ কোরো।

কাঠের সেতু ধরে পানির স্রোতটা পার হয়ে যেয়ো, গোসল করতে থাকা বাচ্চাদের দিকে মাথা নাড়িয়ে সম্ভাষণ জানিয়ো, আর দূরের যুদ্ধজাহাজে হাজার নাবিকের জেগে উঠতে থাকা উল্লাস শুনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যেয়ো।

যাও, ওই সাদাসিধা চেহারার ছোট মানুষটার পেছন নাও, আর যখন তাকে ওখানে কোনো দরজা পথে ঠেসে ধরতে পেরেছ, তাকে লুটে নাও আর তারপর তোমার দু-পকেটে দুই হাত দিয়ে দেখতে থাকো সে কেমন মন খারাপ করে বাঁ-হাতের রাস্তা ধরে চলে যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুলিশেরা তাদের জোরে ছুটতে থাকা ঘোড়াগুলোর লাগাম টানবে আর তোমাকে বাধ্য করবে পিছিয়ে দাঁড়াতে। করতে দাও; ফাঁকা রাস্তাগুলো দেখে তাদের উৎসাহ দমে যাবে, আমি জানি। কি, তোমাকে বলিনি তারা জোড়ায় জোড়ায় এরই মধ্যে চলে যেতে লেগেছে, ধীরে চলে যাচ্ছে রাস্তার কোনার ওখান দিয়ে, উড়ে যাচ্ছে স্কোয়ারের মাঝ দিয়ে।'

তারপর আমাকে লিফট থেকে বেরোতে হলো, লিফটটা আবার নিচে ফেরত পাঠাতে হলো; আমি দরজার ঘণ্টি বাজালাম আর কাজের মেয়েটা দরজা খুলতে তাকে শুভ সন্ধ্যা জানালাম।

জানালা থেকে আনমনা বাইরে তাকিয়ে

এই দ্রুত এসে পড়তে থাকা বসন্তের দিনগুলোয় আমরা করবটা কী? আজ ভোরে আকাশ ছিল ধূসর, কিন্তু এখন যদি আপনি জানালার ওখানে যান, একদম অবাক হয়ে যাবেন, জানালার খিলে গাল ঠেকিয়ে রাখবেন আপনি।

নিচে রাস্তায় দেখবেন এই এখন ডুবতে থাকা সূর্যের আলো পড়েছে একটা অল্পবয়সী মেয়ের গালে, সে হেঁটে যাচ্ছে, কাঁধ বাঁকিয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে, আর একই সময়ে দেখবেন তার পেছনে এক লোক আরেকটু দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছে, তার ছায়া পড়ছে মেয়েটার গায়ে।

তারপর লোকটা চলে গেল মেয়েটাকে পেরিয়ে আর বাচ্চা মেয়েটার মুখটা বেশ ঝলমলে।

বাড়ির পথে

কোনো ঝড়তুফানের পরে বাতাসের কী এক ক্ষমতা মানুষের মনে বোধ জাগানোর! আমার গুণগুলো তখন মনে হয় আমি ধরতে পারি, ওগুলো আমাকে আচ্ছন্ন আর অভিভূত করে দেয়, যদিও স্বীকার করছি আমিও তেমন কোনো বাধা দিই না।

আমি হাঁটতে থাকি, এমনভাবে পা ফেলে হাঁটি যা রাস্তার এ পাশের সঙ্গে যায়, এই রাস্তার পুরোটার সঙ্গে, শহরের এই অংশের সঙ্গে। আমি যথার্থ কারণেই দায়ী সব দরজায় সব টোকার জন্য, সব টেবিলে সব চাপড়ের জন্যে, পানের আগে সব পানপাত্র তুলে শুভ কামনা জানানোর জন্য, সব প্রেমিকযুগলের জন্য যারা আছে বিছানায়, আছে তৈরি হতে থাকা দালানগুলোর রাজমিস্ত্রিদের ভারার উপরে, অন্ধকার গলিঘুপচির দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে, পতিতালয়গুলোর সোফার মধ্যে।

আমি আমার অতীতকে মূল্যায়ন করি আমার ভবিষ্যতের সঙ্গে তুলনা করে, দেখি যে দুটোই দারুণ, দেখি যে একটাকে আরেকটার চেয়ে বেশি পছন্দ করা যাচ্ছে না, আর কোনোকিছু নিয়ে আমার সমালোচনা নেই, আছে শুধু ভাগ্যবিধাতার অন্যায় নিয়ে যিনি আমার প্রতি এভাবে পক্ষপাত দেখিয়ে গেছেন।

কেবল যখন ঘরে পা দিয়েছি, তার পরেই কিছুটা গভীর ভাবনা আসে আমার মনের মধ্যে, যদিও সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠছিলাম তখন কিন্তু ওরকম ভাবার মতো কোনো বিষয় পাইনি। আর এই যখন জানালা পুরোপুরি খুলে দিলাম, শুনছি কোনো বাগানে এখনো গান বাজছে, তা কিন্তু আমার বিশেষ কোনো কাজে আসছে না।

পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়া মানুষ

যখন রাতের বেলায় কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আর অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছি (কারণ আমাদের সামনে রাস্তার ঢালটা উপরের দিকে উঠে গেছে এবং আকাশে পূর্ণিমা) এক লোক আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে, তখন আমাদের ঠিক হবে না তাকে ধরে থামানো, সে যদি দুর্বল ও ছেঁড়া কাপড় পরা হয় তা-ই, এমনকি যদি দেখি যে অন্য আরেকজনও চিৎকার করে দৌড়ে আসছে তাকে ধরতে তবুও; বরং ঠিক হবে তাকে বাধা না দিয়ে দৌড়ে যেতে দেওয়া।

কারণ এটা রাতের বেলা, আর যদি খালি চাঁদের আলোয় রাস্তার ঢালটা সত্যিই সামনে উপরের দিকে উঠে যায়, সেটা তো আর আমাদের দোষ না, আর তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে এই দুজন মজা করতেই এই ধাওয়াধাওয়ির আয়োজন করেছে, হতে পারে তারা দুজনই আসলে অন্য কোনো তৃতীয় লোককে তাড়া করছে, হতে পারে প্রথম লোকটাকে অন্যায়ভাবে ধাওয়া করা হচ্ছে, হতে পারে দ্বিতীয়জন চায় তাকে মেরে ফেলতে, তাহলে আমরা তো সেই খুনের মধ্যে জড়িয়ে যাব, হতে পারে দুজন একে অন্যকে চেনেও না, আর দুজনেই যার যার মতো করে স্রেফ দৌড়ে যার যার বাসায় যাচ্ছে ঘুমানোর জন্য, সম্ভবত এরা দুজনেই ঘুমের-মধ্যে-হাঁটা মানুষ, সম্ভবত প্রথমজনের কাছে অস্ত্র আছে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমাদেরও তো ক্লান্ত হওয়ার অধিকার আছে, নাকি? আর আমরা কি ওই অতগুলো ওয়াইন খাইনি? আমরা খুশি হলাম যে দ্বিতীয় লোকটাকে আর দেখতে পাচ্ছি না।

যাত্রী

আমি দাঁড়িয়ে আছি ট্র্যামের প্ল্যাটফর্মে, পুরোপুরি অনিশ্চিত লাগছে এই পৃথিবীতে, এই শহরে এবং আমার পরিবারে আমার অবস্থান বিষয়ে। এদের কারো কাছ থেকেই আমার যৌক্তিক প্রত্যাশা কী, সে বিষয়ে মোটের ওপর কিছু বলার মতো ক্ষমতাও আমার নেই। আমি এমনকি এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি কেন, কেন এই ফিতেটা ধরে আছি, নিজেকে কেন ছেড়ে দিচ্ছি ট্র্যামটার হাতে – সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, কেন লোকজন সরে যাচ্ছে ট্র্যাম চলারপথের থেকে কিংবা নীরবে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তায় কিংবা থেমে তাকাচ্ছে দোকানের জানালায় – এমনকি এসবের যৌক্তিকতা নিয়েও কিছু বলতে আমি অপারগ। – এমন না যে কেউ আমাকে বলতে বলছে, কিন্তু কথা সেটা নয়।

ট্র্যাম সামনের একটা স্টপেজে থামতে চলেছে, একটা মেয়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল, নামার জন্য তৈরি। তাকে আমি এতই সাফ সাফ দেখতে পাচ্ছি যে মনে হচ্ছে যেন তার সারা গায়ে আমার হাত দেওয়া হয়ে গেছে। কালো পোশাক পরে আছে সে, তার স্কার্টের ভাঁজগুলো একরকম স্থির হয়ে আছে, তার ব্লাউজটা আঁটসাঁট, ওটার কলার সাদা সূক্ষ্ম লেসের, তার বাঁ হাত ট্র্যামের পাশে চ্যাপটা করে ধরা, তার ডান হাতে ধরা ছাতাটা সিঁড়ির উপর থেকে দ্বিতীয় ধাপে ঠেকানো। তার চেহারা বাদামি রঙের; তার নাক দুই পাশটায় একটু চাপা, আকারে চওড়া আর নাকের আগাটা গোল। তার মাথাভরা বাদামি চুল, এর কয়েকটা পথ হারানো গোছা কপালের ডান পাশে উড়ে পড়েছে। তার ছোট কান মাথার পাশে এঁটে বসানো, তার পরও যেহেতু আমি তার একদম কাছে দাঁড়িয়ে, তাই তার ডান কানের পুরো পেছনটা ও সেই সঙ্গে কান যেখানে মাথার খুলিতে যোগ হয়েছে সেখানের ছায়াটা ভালোমতোই দেখতে পাচ্ছি।

তখন আমি ভাবলাম : কী করে সম্ভব যে সে নিজেকে নিয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়, কী করে সে তার মুখ বন্ধ করে আছে আর এই বিস্ময় নিয়ে কিছুই বলছে না?

পোশাক

আমি যখন দেখি যে নানা কুঁচির, নানা ঝালরের, নানা পাড় দেওয়া পোশাকগুলো সুন্দর শরীরে কী সুন্দর জড়িয়ে আছে, তখন ভাবি এগুলো বেশি দিন ওরকম সুন্দর থাকবে না, ওতে এমন ভাঁজটাজ পড়বে যে ইস্তিরি করেও দূর করা যাবে না, ওদের নকশার কাজগুলোতে এমন পুরু হয়ে ধুলো জমবে যে তা আর ওঠানো যাবে না, আর তা ছাড়া কোনো মহিলাই চাইবেন না একই দামি পোশাক প্রতিদিন সকালে পরে, আবার প্রতি রাতে খুলে রেখে সমাজের কাছে রোজ রোজ নিজেকে হেয় ও হাসাহাসির পাত্র করতে।

তার পরও আমি এমন অনেক মেয়ে দেখি যারা নিঃসন্দেহে সুন্দর, তাদের শরীরে অনেক পুলকিত হওয়ার মতো ছোট্ট পেশি, ছোট সুন্দর হাড়, টান টান ত্বক, মাথাভরা মসৃণ চুল; কিন্তু তাতে কী, ওরা রোজ পরে আসে এই একটাই অনুমেয় ছদ্মবেশ, রোজই এই একই হাতের তালুতে রাখে এই একই মুখ, আর তাদের হাতের আয়নায় তাকিয়ে দেখে একই প্রতিমূর্তি।

শুধু মাঝেমধ্যে, যখন তারা রাতে কোনো পার্টি থেকে ঘরে ফেরে দেরি করে, তখন আয়নায় দেখে তাদের মনে হয় যে পোশাকটার সুতোনাতা সব বেরিয়ে গেছে, হয়ে গেছে ঢলঢলে, ধুলোভরা, সবাই বহুবার দেখে ফেলেছে এই পোশাক এবং ওটা আর পরার মতো নেই।

রূঢ় প্রত্যাখ্যান

যখন আমার কোনো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় আর আমি তাকে মিনতি করে বলি : 'প্লিজ, আমার সঙ্গে চলো', সে আমার কাছ থেকে সরে যায় একটাও কথা না বলে, তখন সে আসলে যা বলতে চায় তা হলো:

'আপনি কোনো বিশাল নামওয়ালা ডিউক নন; রেড ইন্ডিয়ানদের মতো শরীরের গড়ন নিয়ে কোনো চওড়া আমেরিকানও নন, যার দৃষ্টি শক্ত অবিচলিত, যার গায়ের চামড়া মালিশ হয়েছে প্রেইরির খোলা হাওয়ায় আর এর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা নদীর জলে; আপনি কখনো সাত সমুদ্রের কাছে যাননি (ওরা কোথায় তা কে জানে) আর তাতে পাল খাটিয়ে ঘুরেও বেড়াননি। তাই আমি জানতে চাচ্ছি, আমার মতো একটা সুন্দর মেয়ে কেন আপনার সঙ্গে যাবে?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তোমাকেও কেউ কোনো লিমুজিন লম্বা ধাক্কায় দোল খাইয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায় না; এটাও তো ঠিক না যে সুট-বুট-পরা সম্ভ্রান্ত কোনো দেহরক্ষীর দল তোমার পেছন পেছন কঠিন আধা-বৃত্ত তৈরি করে হাঁটে আর তোমার মাথায় বিড়বিড় করে আশীর্বাদ-বাণী ঢালে; বুঝলাম তোমার বডিসের মধ্যে বুক দুখানা সত্যিই সুন্দর পরিপাটি করে রাখা কিন্তু তোমার দুই উরু আর পাছার যে আকার, তাতে ও দুটোর সংযমের তো বারোটা বেজে গেছে; তোমার গায়ে ঐ যে কড়কড়ে রেশমি পোশাক, স্কার্টটা ভাঁজ ভাঁজ, গেল শরতে ওরকমই একটা দেখে আমরা সবাই খুশিতে হইচই করেছিলাম, ঐটা পরেও – ওই ভয়ংকর জিনিসটা গায়ে চাপিয়েও – তুমি সময়ে সময়ে হাসছ।'

'হ্যাঁ, আমরা দুজনেই ঠিক; আর এই সত্যটা অকাট্যভাবে আমাদের মাথায় ঢোকার আগেই আপনি কি মনে করেন না যে ভালো হয় আমরা বরং এখন যার যার পথে বাড়ি যাই গিয়ে।'

শৌখিন ঘোড়সওয়ারদের বিবেচনার জন্য

যদি চিন্তা করেন তো দেখবেন যে কাউকে রেসে জেতার জন্য লোভ-জাগানোর মতো কোনো কিছু আসলে নেই।

ব্যান্ডদলের বাজনা বেজে ওঠার মধ্যে আপনার দেশের সেরা ঘোড়সওয়ার হিসেবে খেতাব পাওয়ার যে গৌরব, তার যে আনন্দ, তা আসলে বেশ উৎকট, এতটাই যে পরের দিন সকালে আপনার অনুতাপ হতে বাধ্য।

আমরা এই যখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে, স্বাগত জানাতে থাকা মানুষের ভিড়ের মধ্যে সরু পথ করে খোলা মাঠে গিয়ে পড়েছি, একটু পরই যখন দূরে দিগন্তরেখার দিকে ছুটে যাওয়া কিছু পরাস্ত ঘোড়সওয়ারের বিন্দুতে পরিণত হয়ে ওঠা আকৃতি বাদে আমাদের সামনে আর কিছু নেই, তখন আমাদের প্রতিপক্ষদের যে ঈর্ষা (ওরা ধূর্ত আর প্রভাবশালীও বটে) তা আমাদের মন খারাপ করে দেবেই।

আমাদের অনেক বন্ধুর কত তাড়া বাজিতে জেতা টাকা পাওয়ার জন্য, ওরা কোনোমতে শুধু দূরে ঘোড়দৌড়ের বাজির স্টলগুলো থেকে কাঁধ বাঁকিয়ে আমাদের দিকে চিৎকার দিয়ে তাদের হুর্‌রেটা জানাল; কিন্তু আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধুরা তো কখনো আমাদের ঘোড়াগুলোর ওপর বাজিই ধরেনি, তারা ভয় পাচ্ছিল আমরা হেরে যাব, তখন আমাদের সঙ্গে তাদের খুব রাগারাগি হয়ে যাবে; আর এখন যখন আমাদের ঘোড়া প্রথম হলো আর তারা এক পয়সাও জিততে পারল না, তখন তাদের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে যাওয়ার সময় তারা ঘুরে দাঁড়াল, দর্শক-স্ট্যান্ডের দিকে তাকিয়ে থাকাটাই বেছে নিল।

আমাদের পেছন দিকে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা, জিনের উপর শক্ত করে বসে আছে, ওদের ওপর যে দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে তার আকার-প্রকারটা বোঝার চেষ্টা করছে, আর ওদের ওপর যেভাবেই হোক যে-অন্যায়টা করা হয়েছে তা-ও বুঝতে চাইছে; ওরা একটা চনমনে চেহারা বানাল, মনে হচ্ছে এখনই যেন নতুন করে আবার রেসটা শুরু হবে – এবার আগেরবারের ছেলেখেলাটার পরে একটা সিরিয়াস রেস।

উপস্থিত অনেক ভদ্রমহিলাই বিজয়ীকে নিয়ে হাসি-তামাশা করছেন, কারণ তাদের চোখে বিজয়ী মানুষটা গর্বে ফেটে পড়ছে, ওদিকে সে জানেও না যে কী করে অবিরাম হ্যান্ডশেক, সালাম, ভক্তিতে গদগদ হয়ে লোকজনের মাথা নোয়ানো আর দূর থেকে হাত নাড়ানো এসব সামাল দিতে হয়; এ সময় হেরে যাওয়া ঘোড়সওয়াররা দেখুন কেমন মুখ বন্ধ করে তাদের ঘোড়াগুলোর (ওগুলোর বেশির ভাগই হ্রেষাধ্বনি করছে) ঘাড়ে আনমনা আদরের চাপড় দিয়ে যাচ্ছে।

আর এতেও যেন হয়নি, তাই আকাশও মেঘমলিন হয়ে উঠেছে, এমনকি বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে।

রাস্তার ধারের জানালা

এমন কারো কথা ভাবুন যে মানুষ জীবন কাটাচ্ছে নিঃসঙ্গভাবে, কিন্তু মাঝেমধ্যেই চাচ্ছে অন্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটুক; যে মানুষ দিনের বিভিন্ন সময়ের, আবহাওয়ার, তার চাকরিসংক্রান্ত পরিস্থিতির এবং এ রকম আরো অনেক কিছুর অবিরাম পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চাচ্ছে কোনো একটা বাহু বা এমন কিছু আঁকড়ে ধরতে – ওরকম কোনো মানুষ বেশিদিন টিকতে পারবে না রাস্তার পাশে একটা জানালা ছাড়া। আর এমনকি ধরা গেল যে সে আসলে কোনোকিছুই চাচ্ছে না, স্রেফ তার জানালার পাশে দাঁড়িয়েছে, ক্লান্ত একজন মানুষ, তার দৃষ্টি উপরের দিকে আর নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষজন ও আকাশের মধ্যে, সেটাও সে করছে নিতান্ত অনিচ্ছায়, তার মাথা বরং পেছনদিকে সামান্য ঝোঁকানো – তার পরেও দেখবেন ঐ নিচের ঘোড়াগুলো তাকে টেনে নিয়ে যাবে ওদের ঘোড়ার গাড়ি আর ওদের হই-হট্টগোলের মধ্যে, মানে শেষমেশ মানবজাতির সঙ্গে একাত্মতার ভেতরে।

রেড ইন্ডিয়ান হওয়ার বাসনা

আহ্, কেউ যদি রেড ইন্ডিয়ান হতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে তৈরি, টগবগ করে ছুটতে থাকা ঘোড়ার উপরে বসে, বাতাসের মধ্যে শরীর ঝুঁকিয়ে, কাঁপতে থাকা মাটির উপর দিয়ে উড়ে যেত দ্রুত কাঁপন তুলে, যেত আর যেত যতক্ষণ না ঘোড়া চালানোর জুতোর নালের আর দরকার নেই, কারণ নাল খুলে চলে যেত, যতক্ষণ না ছুড়ে ফেলত ঘোড়ার লাগাম, কারণ লাগাম বলতে কিছু আদতে ছিলই না, আর বলতে গেলে দেখতেই পেত না যে সামনের বিশাল প্রান্তরটি তার সামনে খুলে গেছে এক সুন্দরভাবে ঘাস-ছাঁটা বিরানভূমি হয়ে, যখন কিনা ঘোড়ার গ্রীবা ও মাথা – দুই-ই এরই মধ্যে হাওয়া।

গাছ

যেহেতু আমরা হচ্ছি তুষারে গাছের গুঁড়িগুলোর মতো। আপাতদৃষ্টিতে ওগুলো মাটিতে, তুষারের উপরে, কী সুন্দর পড়ে আছে আর সামান্য একটা ধাক্কাতেই আমরা যেন ওদের সরাতে পারব মনে হয়। না, আপনি তা পারবেন না, কারণ ওরা শক্ত করে মাটিতে গাঁথা। কিন্তু দেখুন, সেটাও স্রেফ আপাতদৃষ্টিতেই।

বিমর্ষতা

নভেম্বরের এক সন্ধ্যার দিকে যখন সবকিছু এরই মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠেছে, আর আমি আমার ঘরের সরু কার্পেটের উপরে (যেন এটা কোনো ঘোড়দৌড়ের মাঠ) দৌড়ে হাঁটা শুরু করেছি, বাইরের আলো-জ্বলে-ওঠা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে পেছন ফিরেছি, আর ঘরের উল্টো পাশটায়, আয়নার গভীরে, আমার জন্য খুঁজে পেয়েছি একটা নতুন লক্ষ্য, আর জোরে চিৎকার করে উঠেছি (আমার কানে ফিরে এসেছে নিজেরই চিৎকার, এমন চিৎকার যার উত্তরে কিছুই শুনবেন না, কোনোকিছুই পারে না যে-চিৎকারের শক্তিকে খাটো করতে, যার ফলে চিৎকারটা সমানে বাড়তেই থাকে উল্টো কোনো শক্তির অভাবে, আর চিৎকারের শব্দ মরে গেলেও চিৎকারটা থেকে যায়) – সে সময়ে দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল ভেতরের দিকে, কী যে বিদ্যুদ্‌গতিতে (কারণ একমাত্র গতিরই দরকার ছিল), আর নিচের রাস্তায় এমনকি চার-চাকার ঘোড়াগাড়িগুলোর সব ঘোড়া তাদের গলা মেলে ধরে পেছানোর জন্য পায়ের উপরে খাড়া হয়ে গেল, যেন যুদ্ধের মাঠে পাগলা হয়ে ওঠা ঘোড়া ওরা।

গাঢ়-অন্ধকার বারান্দা থেকে, যেখানে এখনো বাতি জ্বলানো হয়নি, একটা ছোট বাচ্চাছেলের ভূত বেরিয়ে এল, তারপর সেটা একটা হালকা দুলতে থাকা মেঝের তক্তায় থামল বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে। ঘরটার আধো-আলোতে সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল তার চোখ, সে এমন একটা ভঙ্গি করল যে দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকবে, কিন্তু তখনই হঠাৎ জানালার দিকে এক পলক তাকিয়ে বিরাট শান্তি পেল সে, এখানে জানালার শিকের বাইরে দেখা যাচ্ছে নিচে রাস্তা থেকে উঠে আসা অস্পষ্ট আলো এসে শেষমেশ মিশে গেছে ঘন অন্ধকারের সঙ্গে। ওখানেই খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল সে, তার ডান কনুই দেয়ালে ঠেস দিয়ে – বাইরে থেকে আসা বাতাস খেলা করছে তার গোড়ালিতে আর বয়ে যাচ্ছে তার ঘাড় ও কপালের দুপাশে।

আমি তার দিকে খানিকক্ষণ তাকালাম, তারপর বললাম, 'শুভ সন্ধ্যা' আর ওখানে অর্ধেক ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাচ্ছি না বলে উনানের সামনেটা ঘের দেওয়া জাফরি থেকে আমার জ্যাকেট হাতে তুলে নিলাম। কিছুক্ষণের জন্য আমি মুখটা হাঁ করে খুলে রাখলাম যেন আমার ভেতরকার উত্তেজনা বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ পায়। আমার মুখে কেমন একটা বাজে স্বাদ পেলাম, আর দেখলাম যে আমার চোখের পাতা থিরথির করে কাঁপছে; আসলে ওর এই এসে হাজির হওয়াটা (স্বীকার করছি আমি তার আশাই করছিলাম) আমার জন্য দরকার ছিল খুবই।

বাচ্চাটা এখনো দেয়ালের পাশে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে; ডান হাত সে হেলান দিয়ে রেখেছে প্লাস্টারের গায়ে আর গাল দুটো লাল বানিয়ে খুবই অবাক হয়ে গেছে যে সাদা রং করা দেয়ালের উপরটা এ রকম আঁশ-আঁশ, আর তাতে করে তার আঙুলের

ডগাগুলো কেমন যেন ছিলে যাচ্ছে। আমি বললাম : 'তুমি কি সত্যি আমাকেই খুঁজছ? ভুল হয়নি তো তোমার? এই বিশাল বিল্ডিংয়ে ভুল করার চেয়ে সোজা আর কোনো কাজ নেই। আমার নাম হলো অমুক-অমুক আর আমি তিনতলায় থাকি। এখন বল, তুমি কি আমার সঙ্গেই দেখা করতে চাচ্ছ?'

'চুপ, চুপ।' বাচ্চাটা বলল দুশ্চিন্তার স্বরে, 'সব ঠিক আছে।'

'তাহলে ভিতরে আসো। আমার দরজা বন্ধ করতে হবে।'

'এই যে আমিই বন্ধ করে দিলাম। তোমার চিন্তা করতে হবে না। একদম শান্ত হও।'

'চিন্তা-টিন্তার কোনো ব্যাপার না এটা। এই বারান্দার সঙ্গে লাগোয়া ঘরগুলোয় অনেক মানুষ থাকে, আমি তাদের সবাইকেই চিনি; মোটামুটি এদের সবারই কাজ থেকে বাসায় ফেরার সময় হয়ে গেছে; এরা যদি কোনো একটা ঘরে কথাবার্তা চলছে শোনে তো ভাবে যে সোজা ঐ ঘরে ঢুকে গিয়ে কী হচ্ছে তা দেখার তাদের পুরো অধিকার আছে। এরকমই নিয়ম এখানে। এদের সবার সারা দিনের কাজকর্ম শেষ; এখন এদের এই সন্ধ্যাবেলার স্বাধীনতার সময়টাতে, মোটামুটি নিজের সময়টাতে, এরা কি আর কারো আদেশ শুনবে! আমি যেমন সেটা বুঝি, তুমিও বোঝো। আমাকে দরজা আটকাতে দাও।'

'কী বলতে চাচ্ছ? তোমার সমস্যাটা কী? সারা বাড়ির সবাই এখানে চলে আসলেও তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আর আবারও বলছি : আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, তোমার কি মনে হয় যে দরজা তুমি একাই বন্ধ করতে পারো? আমি এমনকি তালায় চাবিও দিয়ে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে তাহলে। আমার চাওয়া এটুকুই। তালা দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না। আর তুমি যখন এখানে এসেই গেছ, তাহলে আরাম করে বসো। তুমি আমার মেহমান। আমাকে তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো। আমার ঘরে আরাম করে বসা নিয়ে কোনো ভয়টয় পেয়ো না। আমি তোমাকে থাকতেও জোর করবো না, যেতেও না। আমার কি সেটা সত্যি বলে দিতে লাগবে? তুমি কি আমাকে এত কম চেনো?'

'না। তোমার সত্যিই এ কথাটা বলার দরকার ছিল না। তার চেয়ে বড় কথা, কথাটা তোমার বলা উচিত হয়নি। আমি একটা বাচ্চা ছেলে; আমাকে নিয়ে এত নাটক করার কী আছে?'

'তা আমি করছি না। বাচ্চা ছেলে, অবশ্যই। কিন্তু তাই বলে অত ছোটও তুমি না। ভালোই বড় হয়েছ তুমি। যদি তুমি মেয়ে হতে, তাহলে এভাবে আমার সঙ্গে একটা ঘরে তালা মেরে থাকা সমস্যা হয়ে যেত।'

'ওটা নিয়ে আমাদের চিন্তা না করলেও চলবে। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি : তোমাকে যে এত ভালোভাবে চিনি, তাতে আমার খুব যে বিপদ কেটে যায় তা না; এতে করে স্রেফ তোমার আর আমাকে মিথ্যা বলার কষ্টটা করতে হয় না। ওটুকুই। তার পরও কিনা তুমি আমার প্রশংসা করে যাচ্ছ। বন্ধ করো, আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলছি ওসব বলা বন্ধ করো। তা ছাড়া, আমি তোমাকে সব সময় সবখানে চিনতেও পারি না, বিশেষ করে এই

যেমন এই অন্ধকারে। খুব ভালো হয় তুমি যদি বাতি জ্বালাও। না, তাতে মনে হয় কাজ হবে না। যা-ই বল না কেন, আমি এটা ভুলছি না যে তুমি আমাকে হুমকি-ধমকি দিয়েছ।'

'কী বললা? তোমাকে হুমকি দিয়েছি? প্লিজ। আমি শুধু খুশি যে তুমি শেষমেশ এসেছ। "শেষমেশ" বলছি কারণ বেশ দেরি হয়ে গেছে – এরই মধ্যে। আমি বুঝতে পারি না যে তুমি এত দেরি করে কেন এলে। এমনটা হওয়া খুব সম্ভব যে তোমাকে দেখে খুশি হওয়ার চোটে আমি একটু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি, সেজন্যই আমার কথাটা তুমি ভুল বুঝেছ। আমি আরো দশ-দশবার বলব যে আমি আসলেই গোল পাকিয়ে ফেলেছি; হ্যাঁ, ঠিক আছে, তোমাকে অনেক হুমকি-ধমকি দিয়েছি আমি। – কোনো ঝগড়াঝাঁটি আমরা না করি, খোদার দোহাই! – কিন্তু তুমি এটা বিশ্বাস করতে পারলে কী করে? আমাকে এভাবে আঘাত দিতে পারলে তুমি? তোমার এই সামান্য সময়ের জন্য বেড়াতে আসাটা গুবলেট না করলে কি তোমার চলছে না? একেবারে অচেনা কেউও তো আমার সঙ্গে এর চেয়ে ভালোভাবে মানিয়ে নিতো।'

'তোমার এ কথাটা মানলাম, কিন্তু এটা বলার জন্য কোনো বিরাট বুদ্ধি লাগে না; অচেনা কেউ তোমার যত কাছেই আসুক না কেন, আমি স্বভাবগতভাবে এমনিই তোমার অতটা কাছাকাছি। আর তা ছাড়া তুমি এটা জানো, অতএব এত হা-হুতাশ করছ কেন? তুমি যদি সত্যি নাটক করতে চাও, সোজাসুজি বলে দাও, আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাব।'

'বাব্বা। এমনকি আমাকে এটা বলতেও তোমার বুকে কুলাল? একটু বেশি সাহস হয়ে যাচ্ছে না তোমার? ভুলে যেয়ো না, তুমি এখন আমার ঘরে। ওটা আমার দেয়াল যেটাতে তুমি পাগলের মতো আঙুল ডললে। আমার নিজের ঘর, আমার নিজের দেয়াল! আর তা ছাড়া, তুমি যা বললে তা শুধু ধৃষ্টতাই না, হাস্যকরও। তুমি বললে কী যে, তোমার স্বভাবের কারণে তুমি বাধ্য হয়েছ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে। তাই নাকি? তোমার স্বভাব তোমাকে বাধ্য করেছে? তোমার স্বভাবকে তো তাহলে ধন্যবাদ দিতে হয়! তোমার স্বভাব হচ্ছে আমার স্বভাব, আর আমি যদি স্বভাবগতভাবে তোমার সঙ্গে বন্ধুর আচরণ করি, তাহলে তোমাকেও আমার সঙ্গে তা-ই করতে হবে।'

'এটাকে তুমি বলছ বন্ধুর মতো আচরণ?'

'আমি আগের কথা বলছি।'

'তুমি কি জানো আমি পরে কী রকম হব?'

'আমি কিছুই জানি না।'

আমি হেঁটে গেলাম বিছানার পাশের টেবিলের কাছে, আর মোমবাতি জ্বালালাম। সে সময়ে আমার ঘরে না আছে গ্যাস, না আছে বৈদ্যুতিক বাতি। তারপর টেবিলটাতে বসলাম কিছুক্ষণ, একসময় তাতেও বিরক্তি ধরে গেল, ওভারকোট গায়ে চাপালাম, সোফা থেকে আমার হ্যাটটা তুলে নিলাম আর মোমবাতি নিভিয়ে দিলাম ফুঁ দিয়ে। বাইরে যাওয়ার সময়ে চেয়ারের একটা পায়ায় হোঁচট খেলাম।

সিঁড়িতে আমার তলারই এক ভাড়াটের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'পাজির পাজি, তুমি আমার বাইরে যাচ্ছ?' সিঁড়ির দুই ধাপে দুই পা রেখে বলল সে।

'তা ছাড়া করব কী?' আমি বললাম, 'আমার ঘরে এইমাত্র একটা ভূত এসেছিল।'

'এমন বিতৃষ্ণা নিয়ে বলছ যেন তোমার স্যুপের মধ্যে তুমি একটা চুল পেয়েছ।'

'ঠাট্টা করতে পারো। কিন্তু শুনে নাও : ভূত ভূতই।'

'মানলাম সত্যি। কিন্তু ধরো, কেউ যদি ভূতে বিশ্বাসই না করে?'

'তুমি নিশ্চয় ভাবছ না যে আমি ভূতে বিশ্বাস করি? তবে আমার বিশ্বাস না করাটা কি আমার কোনো কাজে আসছে?'

'খুব সোজা। সেটা হলে পরের বার যখন সত্যি তোমার কাছে ভূত আসবে, তখন তুমি ভয় পাবে না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেই ভয় তো ফালতু একটা ভয়। সত্যিকারের ভয় তো হচ্ছে মরা মানুষের আত্মা কী কারণে ভূত হয়ে এল তা নিয়ে ভয়। আর ওই ভয়টা থেকেই যায়। আমি এখন ওই ভয়টাতে ডুবে আছি, ভয়টার সব রং-রসের মধ্যে।' আমার প্রচণ্ড উদ্বেগ থেকেই আমি আমার সবগুলো পকেট হাতড়াতে লাগলাম।

'কিন্তু ভূতটাতে যেহেতু তুমি ভয় পাওনি, তুমি তো আরামসে ভূত হওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে ওর কাছে জানতে চাইতে পারতে?'

'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তুমি কখনো ভূতের সঙ্গে কথা বলনি। ওদের কাছ থেকে কখনোই কোনো সোজা উত্তর পাওয়া যায় না। ওরা সবই কথা বলে এরকম-ওরকম। নিশ্চিত করে কিছু বলে না। এই ভূতগুলো দেখলে মনে হয় নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের চেয়েও ওদের অনিশ্চয়তা অনেক বেশি, ওদের ওই ভাঙাচোরা অবস্থা দেখলে তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।'

'তবে আমি শুনেছি, ওদের খাইয়ে ঠিকঠাক মোটাতাজা করা সম্ভব।'

'এটা তুমি সত্যি ঠিক শুনেছ, তা করা যায়। কিন্তু কেউ কি আছে যে তা করবে?'

'কেন না? ধরো, ভূতটা যদি মেয়ে-ভূত হয় তো, কেন না?' সে বলল, দুলে গিয়ে দাঁড়াল উপরের ধাপটায়।

'ওহ্ বুঝেছি,' আমি বললাম, 'কিন্তু তার পরও পোষাবে না, কোনো মানে হয় না।'

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম আমি। এরই মধ্যে আমার প্রতিবেশী সিঁড়ির এত উপরেই উঠে গেছে যে সিঁড়িঘরের একটা বাঁক থেকে তাকে ঝুঁকে দেখতে হচ্ছে আমার। 'তার পরও', আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তুমি যদি আমার ভূতটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও, ঐ উপরে, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক শেষ – চিরদিনের জন্য।'

'ওহ্, আমি তো স্রেফ ঠাট্টা করছিলাম,' সে তার মাথা পেছনে সরিয়ে নিয়ে বলল।

'তাহলে ঠিক আছে,' আমি বললাম, এখন আর আমার শান্ত মনে বাইরে গিয়ে একটু হেঁটে আসতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু আমার এত বেশি একা লাগল যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ফেরত গেলাম, আমার বিছানায়।

রায়

ভরা বসন্তের দিনে এক রোববারের সকাল। গেয়র্গ বেন্‌ডেমান, এক তরুণ ব্যবসায়ী, নদীর পাশে লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়ানো ছোট হালকা গাঁথুনির বাড়িগুলোর একটার প্রথম তলায় তার নিজের ঘরে বসে আছে। উচ্চতা আর রঙের ভিন্নতা বাদ দিলে বাড়িগুলো সব দেখতে প্রায় একই রকম। তার এক পুরোনো বন্ধুর উদ্দেশে একটা চিঠি সে মাত্র লেখা শেষ করেছে। বন্ধুটা বর্তমানে বাস করছে বিদেশে। ওটা হাতে নিয়ে খেলার ছলে ধীরে সে খামে ভরল, আর তারপর তার লেখার টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে জানালার বাইরে তাকাল – নদী, সেতু আর নদীর ওপারে হালকা সবুজ পাহাড়গুলোর দিকে।

তার মনে পড়ল, বেশ কত বছর আগে তার এই বন্ধু কীভাবে নিজের দেশে সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে আশাভঙ্গ হয়ে একরকম দৌড়ে পাড়ি জমিয়েছিল রাশিয়ায়। এখন সে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটা ব্যবসা করছে। তার ব্যবসার শুরুটা হয়েছিল খুব ভালোই, কিন্তু আজ বেশ অনেকদিন যাবৎ মনে হয় ভালো যাচ্ছে না। তেমনই সে সব সময় অসন্তোষ নিয়ে বলত তার আস্তে আস্তে বিরল হয়ে উঠতে থাকা বাড়িতে বেড়াতে আসার দিনগুলোয়। ওইখানে পড়ে আছে সে; বিনা কারণে কোনো অচেনা-অজানা দেশে বসে নিঃশেষ করছে নিজেকে। তার বিদেশি চেহারার গালভর্তি দাড়ি গেয়র্গের সেই ছোটবেলা থেকে খুব ভালো করে চেনা মুখটা পুরোপুরি লুকাতে পারেনি; আর তার চামড়ার হলদে ভাবটা যেন জানান দিচ্ছে কোনো লুকিয়ে থাকা অসুখের। তার নিজের কথামতেই, ওখানে বাস করা স্বদেশি লোকজনের সঙ্গে তার সত্যিকারের কোনো যোগাযোগ কখনোই ছিল না, আর রাশিয়ান পরিবারগুলোর সঙ্গেও কোনো সামাজিক মেলামেশা বলতে গেলে সে একেবারেই করে না। সুতরাং সারা জীবন চিরকুমার থেকে যাওয়ার ব্যাপারে নিজেকে তৈরি করে নেওয়া ছাড়া তার তেমন কোনো বিকল্পও নেই।

ওই রকম একটা লোকের কাছে লেখার থাকেই বা কী, যে কিনা আসলেই পথ হারিয়েছে, আর যার জন্য শুধু দুঃখই করা যায়, কিন্তু যাকে সাহায্য করার কোনো সুযোগই নেই? তাকে কি আসলে দেশে ফিরে আসতেই বলা উচিত – এখানে এসে ব্যবসাটা আবার শুরু করো, পুরোনো সব বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগটা চালু করো (তাতে তো সমস্যার কিছু

নেই), আর তারপর বাকিটা ছেড়ে দাও বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতার ওপর? কিন্তু এই কথাগুলো বলার অর্থ তো এটাই দাঁড়াবে (আর যত ভদ্রভাবে বলা হবে, ততই আঘাত আরো বাড়বে) যে তার এই পর্যন্ত নেওয়া সমস্ত চেষ্টাই বিফলে গেছে; তার উচিত এখন ওসব ছেড়েছুড়ে ঘরে ফিরে আসা, তারপর স্থায়ীভাবে-দেশে-ফেরত এক উড়নচণ্ডী হিসেবে সবার হাঁ-করা দৃষ্টির সামনে ছোট হওয়া, আর এটা স্বীকার করা যে শুধু তার বন্ধুরাই বুঝেছে জীবনে কী করে সফল হতে হবে, আর সে ছিল আসলে এক বয়স্ক খোকা, যার কিনা এখন শুধু তা-ই করা উচিত, যা তার সফল বন্ধুরা (যারা দেশে থেকে গিয়েছিল) তাকে করতে বলছে। তা ছাড়া এরই বা নিশ্চয়তা কী যে তাকে এই যন্ত্রণাগুলো দিলে আদৌ সত্যিকারের কোনো কাজ হবে? এই সম্ভাবনা আছে যে, তাকে আদতে দেশে ফিরিয়ে আনাটাই সম্ভব হবে না কখনো – সে নিজেই বলেছে ঘরের সঙ্গে তার সব সুতোই ছিঁড়ে গেছে চিরতরে। ফলে দেখা যাবে, সে রয়ে গেল সেই দূর বিদেশেই; মাঝখান থেকে বন্ধুদের সঙ্গে – তাদের উপদেশে তিক্ত হয়ে – দূরত্বটাই বেড়ে গেল আরো। আর ধরা যাক, সে সত্যিই তাদের উপদেশ শুনল, কিন্তু দেশে ফিরে – কারো কোনো ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা থেকে নয়, বরং স্রেফ পরিস্থিতির কারণেই – হয়ে পড়ল বিষাদগ্রস্ত; দেখা গেল, না পারছে তার বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে, না পারছে তাদের ছাড়া চলতে, নিজেকে সব সময় বোধ করছে অপমানিত, শেষমেশ সত্যিকার অর্থেই হয়ে দাঁড়াল ঘরহীন আর বন্ধুহীন একজন মানুষ – সে ক্ষেত্রে এটাই কি বরং তার জন্য অনেক বেশি ভালো হয় না যে, বিদেশে যেখানে আছে, সেখানেই সে থেকে যায়? এই সবকিছু বিবেচনায় নিলে সত্যিই কি এমনটা ভাবা যায় যে, সে দেশে ফিরে আদৌ জীবনে কোনোকিছু করতে পারবে?

এ সমস্ত কারণেই এই বন্ধুকে – ধরলাম যে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনো ইচ্ছা আদৌ আছে – সেই সত্যি কথাটুকুও বলা যায় না, যা কিনা সবচেয়ে দূরের কোনো পরিচিতজনকেও নিঃসংকোচে বলা সম্ভব। এখন প্রায় তিন বছরেরও বেশি হয়ে গেছে তার এই বন্ধু শেষবার দেশে এসেছে। এর কারণ হিসেবে সে খোঁড়া এক অজুহাত তুলে ধরেছে যে রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত – এতটাই অনিশ্চিত যে তার মতো এক খুদে ব্যবসায়ীর পক্ষে ওখান থেকে একটুকুও অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়, ওদিকে কিনা হাজার হাজার রাশিয়ান মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়াময়। ঠিক এই গত তিন বছরেই, অন্যদিকে, গেয়র্গের নিজের জীবন বদলে গেছে অনেকখানি। দুই বছর আগে মারা গেছেন গেয়র্গের মা – তখন থেকেই গেয়র্গ আর তার বাবা আছেন একা বাসাতেই। সেই খবর ঠিকই পৌঁছেছে তার বন্ধুর কাছে, উত্তরে সমবেদনার যে শুকনো চিঠি পাঠিয়েছে তার বন্ধু, তাতে স্রেফ এটাই পরিষ্কার হয় যে, ওরকম একটা ঘটনার বেদনা কারো পক্ষে দূর বিদেশে বসে অনুভব করা অসম্ভব। যা-ই হোক, তার পর থেকেই গেয়র্গ আরো দৃঢ় সংকল্প নিয়ে শুধু নিজের ব্যবসাই না, অন্য সবকিছুতে ও মন দিয়েছে। হতে পারে, মা বেঁচে থাকতে তার বাবা, নিজের মতো করে ব্যবসা চালাবেন এই গোঁ থেকে গেয়র্গকে ব্যবসায় কোনো স্বাধীনতা দেননি। হতে পারে, মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তার বাবা – যদিও ব্যবসাটাতে

সক্রিয়ই আছেন – নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন পর্দার আড়ালে; হতে পারে (এটার সম্ভাবনাই সব থেকে বেশি) পর পর ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটা অনুকূল ঘটনার ভূমিকাই এতে সব থেকে মুখ্য। যেটাই হোক, এই গত দুই বছরে তাদের ব্যবসা সবচেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ফুলেফেঁপে উঠেছে, কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হয়েছে, বেচা-বিক্রি বেড়েছে পাঁচ গুণ, আর সামনের দিনগুলোয় আরো উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা খুবই পরিষ্কার।

কিন্তু এই পরিবর্তন সম্বন্ধে গেয়র্গের বন্ধুর কোনো ধারণা নেই। আগে – শেষবার সম্ভবত মায়ের মৃত্যুতে লেখা সেই সমবেদনার চিঠিটাতে – সে চেষ্টা করে ছিল গেয়র্গকে রাশিয়ায় পাড়ি জমানোয় রাজি করাতে, সেন্ট পিটার্সবার্গে যে ঠিক গেয়র্গের লাইনের ব্যবসা সফলভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটা বিশদ বোঝাতে। তার ব্যবসার বর্তমানের ব্যাপ্তির হিসাবে সেসব অঙ্ক এখন অতি সামান্যই ঠেকে। কিন্তু গেয়র্গের কখনোই ইচ্ছা হয়নি তার ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা বন্ধুকে লিখে জানায়, আর এত দিন পরে এসে সে কথা বলতে গেলে নিশ্চিত তা সুবিবেচনাসুলভ কাজ হবে না।

এসব কিছু মিলে গেয়র্গ তার বন্ধুকে চিঠিতে গুরুত্বহীন সব ঘটনার কথাই লেখা শুরু করল, এমন সব মামুলি বিষয় যেমনটা কিনা মানুষের মাথায় এসে পারম্পর্যহীনভাবে ভিড় করে রোববারের অলস চিন্তার সময়ে। গেয়র্গের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তার বন্ধু এই দীর্ঘ প্রবাসজীবনে নিজের শহরের যে-ছবিটা মনে মনে সম্ভবত গড়ে নিয়েছে আর যার সঙ্গে নিজেকে মানিয়েও নিয়েছে, সেটা বিঘ্নিত না করা। তাই দেখা গেল, গেয়র্গ তার বন্ধুকে তিনবার তিনটা আলাদা চিঠিতে, একটা থেকে অন্যটা বহুদিন পর পর লেখা, এক গুরুত্বহীন লোকের সঙ্গে সমানভাবে গুরুত্বহীন এক মেয়ের বাগ্‌দানের বিষয়ে লিখে বসল; আর শেষমেশ তার বন্ধু – গেয়র্গের ইচ্ছা কখনোই এটা ছিল না – এই আজগুবি ঘটনাটা নিয়ে কিনা ভালোই আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করল।

তবে গেয়র্গ তার বন্ধুকে এক মাস আগে মিস ফ্রিডা ব্রান্ডেন্‌ফেল্ড নামের এক সচ্ছল ঘরের মেয়ের সঙ্গে নিজের বাগ্‌দান হয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করার চেয়ে বরং ওইসব মামুলি বিষয়ে লেখাটাই বেশি পছন্দ করছে। তার হবু বউয়ের কাছে সে বেশ কবার তার এই বন্ধুর ব্যাপারে গল্প করেছে, দুজনের চিঠি লেখালেখির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছে। 'তাহলে আমাদের বিয়েতে সে তো আসছে না,' মেয়েটি বলেছে, 'তোমার সব বন্ধু নিয়ে আমার কিন্তু জানার অধিকার আছে।' 'আমি ওকে ঝামেলা দিতে চাচ্ছি না,' উত্তরে বলেছে গেয়র্গ,' 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, বললে সে হয়তো আসবে, আমার অন্তত তা-ই মনে হয়, কিন্তু এখানে এসে ওর খুব বেখাপ্পা লাগবে, ওর মনে হবে আমি ওকে একটা অসুবিধার মধ্যে ফেললাম, এমনকি আমাকে নিয়ে ঈর্ষাও হতে পারে ওর, আর এইসব মিলে ও নিশ্চিত মন খারাপ করে বসবে, আর তারপর সেই অসুখী অবস্থা থেকে বের হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছাড়াই ওকে কিনা আবার একা ফিরে যেতে হবে রাশিয়ায়। একা – তুমি কি বুঝতে পারছ কথাটার মানে?' 'হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের বিয়ের কথা সে কি অন্য কোনোভাবে জেনে যাবে না?' 'যেতেই পারে, সেটা তো আমি আর ঠেকিয়ে

রাখতে পারি না। কিন্তু তার জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিলে সে সম্ভাবনা খুব কম।' 'কিন্তু গেয়র্গ, তোমার যদি এই ধরনের বন্ধুবান্ধব থাকে, তাহলে আমি বলব তোমার কখনোই বিয়ের চিন্তা মাথায় আনা ঠিক হয়নি।' 'ঠিক আছে, কিন্তু সেটার দায় তো আমাদের দুজনেরই; তবে এখনো যদি ফের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকে, আমি কিন্তু একই সিদ্ধান্ত নেব।' তারপর যখন গেয়র্গের চুমুর তোড়ে দ্রুত শ্বাস নিতে নিতে মেয়েটি আবারও নালিশ জানিয়ে যাচ্ছে: 'যা-ই বল না কেন, আমি কিন্তু দুঃখ পেলাম,' গেয়র্গের তখন মনে হলো যে আদতে তার বাগ্‌দান হয়ে যাওয়ার পুরো গল্পটা বন্ধুকে লিখে জানানোয় আসলে কোনো অসুবিধা নেই। 'আমি আমিই। বন্ধু হিসেবে আমাকে ঠিক আমি যা, সেভাবেই মেনে নিতে হবে,' মনে মনে বলল গেয়র্গ, 'ওর আরো যোগ্য বন্ধু হতে পারব বলে তো আমি আর নিজেকে বদলে অন্য মানুষ হয়ে যেতে পারি না।'

এভাবেই, সেই রোববারের সকালে, বন্ধুর উদ্দেশে লেখা লম্বা চিঠিটায় গেয়র্গ সত্যিই বিস্তারিত জানাল তার বাগ্‌দানের কথা: 'আমার সবচাইতে সেরা খবরটা শেষে জানাব বলেই রেখে দিয়েছিলাম। মিস ফ্রিডা ব্রান্ডেন্‌ফেল্ড নামের ধনীঘরের এক মেয়ের সঙ্গে আমার বাগ্‌দান হয়েছে। ওরা এখানে এসেছে তুমি চলে যাওয়ার বেশ অনেক পরে, সুতরাং ওদেরকে তোমার চেনার কথা না। আমার এই হবু বধূকে নিয়ে তোমাকে বিস্তারিত লেখার সুযোগ নিশ্চিত পরে আরো আসবে, আজ শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, আমি খুব সুখী; আর এই কারণে আমাদের দুজনের বন্ধুত্বের সম্পর্কে যদি কোনো পরিবর্তনের কথা বলো, সেটা এটুকুই যে আমার মধ্যে এখন থেকে এক সাধারণ সাদামাটা বন্ধুর বদলে তুমি দেখবে এক সুখী বন্ধুকে। তা ছাড়া আমার হবু বধূকেও তুমি পাচ্ছ (সে তোমাকে জানাচ্ছে তার উষ্ণ শুভেচ্ছা আর শিগগিরই সে নিজেই লিখবে তোমাকে) এক খাঁটি মেয়ে- বন্ধু হিসেবে, তোমার মতো একজন ব্যাচেলরের জন্য যা একেবারে ফেলনা বিষয় না। আমি জানি, আমাদের এসে দেখে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার কত সমস্যা, কিন্তু আমার বিয়েটাই তো হতে পারে সেই যথার্থ উপলক্ষ যার জন্য ওসব সমস্যা ঝেড়ে ফেলা যায়। তবে যা হোক, তোমার জন্য ভালো হয় এমনটাই কোরো, আমাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়ার দরকার নেই।'

এই চিঠি হাতে নিয়েই গেয়র্গ অনেকক্ষণ বসে থাকল তার লেখার ডেস্কে, মুখ জানালার দিকে ফিরিয়ে। তার চেনা একজন নিচের রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে তাকে সুপ্রভাত জানাল, কিন্তু গেয়র্গ উত্তর দিল মাত্র একটা আনমনা মৃদু হাসি দিয়ে।

অবশেষে চিঠিটা পকেটে ভরল সে, আর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে একটা সরু বারান্দা ধরে হাজির হলো তার বাবার ঘরে, যেখানে সে পা রাখেনি অনেক মাস। তাদের দিনগুলো সাধারণত যেভাবে যায়, সে হিসেবে বাবার ঘরে যাওয়ার দরকারও পড়েনি গেয়র্গের – কারণ অফিসে বাবার সঙ্গে তার এমনিতেই দেখা হচ্ছে সব সময়, তারা দুজন দুপুরের খাবার খাচ্ছে একই রেস্তোরাঁয়, আর রাতের খাওয়াটা তারা যার যার মতো আলাদা সেরে নিলেও দেখা যায় পরে – যদি গেয়র্গ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায়, বা আজকাল যেটা বেশি

হচ্ছে, তার হবু বধূর সঙ্গে দেখা করতে না গেছে তো – তারা একসঙ্গে খানিকক্ষণ বসছে দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া বসার ঘরটাতে, যার যার খবরের কাগজ হাতে নিয়ে।

এই রোদে ভরা সকালেও খাবারঘরটা এত অন্ধকার দেখে অবাকই হলো গেয়র্গ। সরু উঠানের ওপাশে উঁচু দেয়ালটার ছায়া কী অন্ধকারই না করে রেখেছে সবকিছু। তার বাবা বসে আছেন জানালার পাশে, ঘরের এককোনায় যেখানে জড়ো করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার মায়ের নানা স্মৃতিচিহ্ন। তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন – দৃষ্টিশক্তির একটু অসুবিধার কারণে কাগজটা তার চোখের সামনে বিশেষ একভাবে কাত করে ধরা। টেবিলে পড়ে আছে তার সকালের নাশতার উচ্ছিষ্টটুকু; দেখে মনে হয় না তিনি খেয়েছেন খুব একটা।

'আহ্, গেয়র্গ!' তার বাবা বললেন, আর উঠে এগিয়ে এলেন ছেলের দিকে। তার ভারী ড্রেসিং গাউনটা হাঁটার সময় দুপাশে খুলে যাচ্ছে আর এর ঝুলতে থাকা পাশগুলো পতপত করছে তাকে ঘিরে। 'আমার বাবা আজও কী বিশাল,' মনে মনে বলল গেয়র্গ।

'এই ঘরটায় ভয়ংকর রকম অন্ধকার,' তারপর বলল সে।

'হ্যাঁ, অন্ধকারই,' উত্তর দিলেন তিনি।

'আর আপনি জানালাও বন্ধ করে রেখেছেন?'

'আমার ওভাবেই ভালো লাগে।'

'বাইরে কিন্তু বেশ ঝলমলে', বলল গেয়র্গ, অনেকটা তার আগের কথার সুর ধরেই, তারপর বসল। তার বাবা নাশতার জিনিসগুলো সরিয়ে তৈজসপত্র রাখার আলমারির উপরে রাখলেন।

'আপনাকে আসলে বলতে এসেছি যে,' গেয়র্গ বলতে থাকল, তার চোখ দুটো অসহায়ভাবে অনুসরণ করছে বৃদ্ধ মানুষটার নড়াচড়া, 'আমার বাগ্‌দানের কথাটা এই এখন সেন্ট পিটার্সবার্গে চিঠিতে জানিয়ে দিলাম।' সে চিঠিটা পকেট থেকে সামান্য বের করে আবার সেখানেই রাখল।

'সেন্ট পিটার্সবার্গে?' জিজ্ঞেস করলেন তার বাবা।

'আমার বন্ধুকে, আপনি তো চেনেন,' বলল গেয়র্গ, বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে। 'অফিসে তো ওনাকে দেখতে একটুও এমন লাগে না,' ভাবতে লাগল সে, 'কীভাবে নিজেকে ছড়িয়ে বসে আছেন চেয়ারটায়, হাত দুটো কেমন বুকের উপর ভাঁজ করে রাখা!'

'চিনি। তোমার বন্ধুকে' জোরের সঙ্গে বললেন তার বাবা।

'আপনি তো জানেন বাবা, আমার বাগ্‌দানের খবরটা আমি শুরুতে ওকে জানাতে চাইনি ওর কথা ভেবেই। ওটাই ছিল একমাত্র কারণ। আপনি নিজেই জানেন, ও কী রকম এক জটিল মানুষ। তাই আমি নিজেকে বললাম, অন্য কারোর কাছে থেকে ও হয়তো আমার বাগ্‌দানের কথা ঠিকই শুনবে, তা তো আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারব না, যদিও যেরকম একা একা থাকে সে, তাতে করে সেই সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু যা-হোক না কেন খবরটা আমি নিজে থেকে ওকে দিচ্ছি না।'

'আর এখন কী হলো, মন বদলে ফেললে?' জিজ্ঞেস করলেন তার বাবা, বিশাল খবরের কাগজটা রাখলেন জানালার চৌকাঠে, এবার চশমাটা তার উপরে, তারপর হাত দিয়ে চশমা ঢাকলেন।

'হ্যাঁ, আসলেই বদলে ফেললাম। ভাবলাম, সে যদি আমার সত্যি কোনো ভালো বন্ধু হয়, তবে আমার বাগ্‌দানের এই আনন্দের খবরে সেও তো খুশিই হবে। এটা ভেবেই আর কোনো দ্বিধা রাখলাম না খবরটা তাকে জানাতে। কিন্তু চিঠি ডাকে দেওয়ার আগে মনে হলো আপনাকে জানাই।'

'গেয়র্গ,' তার বাবা বললেন, দাঁতহীন মুখটা বড় রকম হাঁ করে, 'আমার কথা শোনো! আমার কাছে তুমি এ বিষয়ে কথা বলতে এসেছ, আমার মতামত নিতে এসেছ, ভালো কথা। তোমার প্রশংসা করছি আমি সেজন্য, নিঃসন্দেহে। কিন্তু এর আসলে কোনো মানে হয় না, সত্যি বলতে, যতক্ষণ না তুমি আমাকে সব সত্যি খুলে বলছ, ততক্ষণ এর কোনো মানে হয় না বললেও কম বলা হবে। আমি এখানে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ঝড় তুলতে চাচ্ছি না। আমাদের প্রিয় মা মারা যাওয়ার পর থেকে বেশকিছু বাজে জিনিস ঘটছে নিশ্চিত। সেসব নিয়েও কথা বলার সময় বোধ করি আসবে, হতে পারে আমাদের ধারণার আগেই সে সময় আসবে। অফিসে অনেক কিছুই ঘটছে, যে ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারছি না, হতে পারে ওগুলো ইচ্ছে করে আমার থেকে লুকানো হচ্ছে না – আমি আপাতত ভেবে নিচ্ছি আমার থেকে কেউ ইচ্ছে করে লুকাচ্ছে না কিছু – আগের মতো আর শক্তি নেই আমার, স্মৃতিশক্তিও অনেক খারাপ হয়ে গেছে, আর আগের মতো সবকিছুর হিসাব রাখা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। প্রথমত, এটাই প্রকৃতির নিয়ম, আর দ্বিতীয়ত, তোমার মায়ের মৃত্যু তোমাকে না যতটা, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ধাক্কা দিয়েছে আমাকে। – কিন্তু আসো, যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি, তোমার এই চিঠির বিষয়ে, এ ব্যাপারে তোমার দোহাই লাগে গেয়র্গ আমাকে মিথ্যা বোলো না। এটা অতি সামান্য একটা বিষয়, মাথা ঘামানোর মতো কোনো বিষয়ই না, সুতরাং আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা কোরো না। তোমার কি আসলেই সেন্ট পিটার্সবার্গে কোনো বন্ধু আছে?'

বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়াল গেয়র্গ। 'আমার বন্ধুদের কথা বাদ দিন। হাজারটা বন্ধু মিলেও আমার কাছে আমার বাবার জায়গাটা নিতে পারবে না। বুঝছেন তো, আমি কী ভাবছি? আপনি ঠিকমতো নিজের দেখভাল করছেন না। বয়স বাড়লে নিজের অনেক যত্ন নিতে হয়। আপনি খুব ভালোমতোই জানেন, আপনাকে ছাড়া আমাদের ব্যবসা সামাল দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু সেই ব্যবসা যদি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কালই আমি ব্যবসা বন্ধ করে দেব চিরতরে। এভাবে আসলে হবে না। আপনার প্রতিদিনকার রুটিনে আমাদের একটা পরিবর্তন আনতে হবে। একটা সত্যিকারের, সার্বিক পরিবর্তন। এই যেমন আপনি এখানে অন্ধকারে বসে আছেন, ওদিকে বসার ঘরটায় কত আলো-বাতাস। যেভাবে এক কামড়ে নাশতা খেয়ে রেখে দিচ্ছেন

আপনি, তাতে আপনার পুষ্টি আসবে কোত্থেকে? জানালা বন্ধ করে আপনি বসে থাকেন, যদিও জানেন বাইরের হাওয়া আপনার জন্য কত ভালো। না, বাবা! আমি ডাক্তার নিয়ে আসব আর আমরা তার নির্দেশমতো চলব। আমাদের ঘর দুটোও বদলে নেব আমরা; আপনি নেবেন সামনের ঘর আর আমি চলে আসব এই ঘরে। আপনার জন্য কোনো ঝামেলাই হবে না, আপনার সব জিনিসপত্তরও আপনার সঙ্গেই আমি ওই ঘরে নিয়ে দেব। কিন্তু ওসব করার যথেষ্ট সময় হাতে আছে। এখন আপনি বরং কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকুন, সত্যিই আপনার খানিক বিশ্রাম দরকার। আসেন, আমি আপনার জামাকাপড় বদলে দিচ্ছি, এক্ষুনি দেখবেন কী সুন্দর করে আমি তা পারি। কিংবা আপনি সোজা সামনের ঘরটাতেই বরং চলে যান, আপাতত আমার বিছানাতেই গিয়ে শোন। ওটাই সত্যিকারের সবচেয়ে সুবুদ্ধির কাজ হবে।'

গেয়র্গ দাঁড়াল তার বাবার কাছ ঘেঁষে, তিনি তার অগোছালো সাদা চুলে ভরা মাথাটা নুইয়ে রেখেছেন নিজের বুকের উপর।

'গেয়র্গ,' একটুও না-নড়ে নরম গলায় বললেন তার বাবা।

গেয়র্গ সঙ্গে সঙ্গে তার বাবার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল আর বুড়ো মানুষটার ক্লান্ত মুখের মাঝে সে দেখল ওনার বিরাট চোখের মণি দুটো তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্যারাভাবে।

'তোমার সেন্ট পিটার্সবার্গে কোনো বন্ধু নেই। তুমি সব সময় তোমার ঠাট্টা-মশকরা নিয়েই আছো, এমনকি আমার সঙ্গেও সেগুলো করতে ছাড়ছ না। এত জায়গা থাকতে ওখানে কী করে তোমার বন্ধু থাকতে পারে! আমি বিশ্বাসই করি না।'

'একটু পেছনের কথা মনে করে দেখুন, বাবা,' বলল গেয়র্গ। বাবাকে ধরে ওঠাল চেয়ার থেকে আর উনি ওখানে ভীষণ দুর্বলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই সে খুলতে লাগল ওনার ড্রেসিং গাউন। 'নিশ্চিত বছর তিনেক আগের কথা, যখন আমার এই বন্ধু আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল। আমার এখনো মনে আছে, ওকে আপনার খুব একটা পছন্দ হয়নি। অন্তত দুই বার হবে যে আপনি ওর খোঁজ করেছিলেন, আর আমি বলেছিলাম ও চলে গেছে, যদিও সত্যি কথা হচ্ছে, তখন ও দিব্যি বসা আমার ঘরে। ওর প্রতি আপনার অপছন্দের ব্যাপারটা আমি সত্যিই বুঝতে পারতাম; আমার বন্ধুর অদ্ভুত কিছু ব্যাপার তো অবশ্যই অস্বীকার করার মতো না। কিন্তু তবু, পরে দেখা গেল, ওর সঙ্গে আপনার বেশ ভালোই যাচ্ছে। আমার সত্যিই দেখে গর্ব হতো যে আপনি ওর কথা শুনছেন, ও যা বলছে তাতে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছেন, আর ওকে প্রশ্নও জিজ্ঞেস করছেন। মনে করে দেখুন – আপনার নিশ্চিত মনে পড়বে – ও রাশিয়ার বিপ্লব নিয়ে কীসব অবিশ্বাস্য গল্প বলত আমাদের। যেমন ওই গল্পটা, ওই যে সে একটা ব্যবসার কাজে কিয়েভে গিয়েছিল, আর ওখানে এক দাঙ্গার সময়ে এক যাজককে দেখেছিল একটা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাত উপরে তুলে সামনে জড়ো হওয়া ভিড়ের দিকে চিৎকার করে কিছু বলছে – তার হাতের তালুতে রক্ত দিয়ে বড় একটা ক্রুশচিহ্ন কাটা। ওর ওই গল্পটা আপনি নিজেই পরে দু-একবার লোকজনকে বলেছেনও।'

ইতোমধ্যে গেয়র্গ তার বাবাকে সফলভাবে আবার চেয়ারে বসাতে পেরেছে, সাবধানে খুলেছে ওনার লিনেন প্যান্টের উপরে পরা উলে বোনা পাওয়ালা অন্তর্বাস, সেই সঙ্গে পায়ের মোজাও। এইসব নোংরা হয়ে যাওয়া অন্তর্বাসগুলো দেখে তার নিজের প্রতি খেদ হলো বৃদ্ধ পিতাকে এভাবে অবহেলা করার জন্য। সময়মতো বাবার অন্তর্বাস বদলানোর প্রতি চোখ রাখাটা নিশ্চিত তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই এখন পর্যন্ত সে তার হবু বধূর সঙ্গে তার বাবার ভবিষ্যৎ দেখভালের বিষয় নিয়ে কী ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে খোলাসা করে কোনো আলাপ করেনি – তারা দুজনে নীরবে এটাই ধরে নিয়েছে যে এই পুরোনো ফ্ল্যাটেই তিনি নিজের মতো বাস করতে থাকবেন। এখন, যা হোক, মুহূর্তের মধ্যে গেয়র্গ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল যে তার নিজের সংসার হওয়ামাত্র বাবাকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। পরমুহূর্তেই তার এমনকি এটাও মনে হলো যে, যে যত্ন আর মনোযোগ দিয়ে সে তার বাবাকে নিজের বাসায় নিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে, তত দিনে অনেক দেরিও হয়ে যেতে পারে।

বাবাকে কোলে করে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল গেয়র্গ। বিছানার দিকে ওই কয় পা এগোতে গিয়েই ভয়ংকর এক অনুভূতি হলো তার; সে বুঝতে পারল তার বাবা তার কোলের মধ্যে গুটি হয়ে বসে, তার কোটের কলারে লাগানো ঘড়ির চেইনটা নিয়ে খেলছেন। এমন জোরেই তিনি ঘড়ির চেইন আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যে, ওনাকে সোজা বিছানায় শুইয়ে দিতে গেয়র্গের রীতিমতো কষ্টই হলো খানিকটা।

তবে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পরে অবশ্য আর কোনো ঝামেলা হলো না। তিনি নিজেকে নিজেই কম্বলে ঢাকলেন, কম্বল টেনে নিলেন কাঁধেরও বেশ খানিক উপরে। গেয়র্গের দিকে তাকালেন তিনি, মোটামুটি বন্ধুসুলভ দৃষ্টি নিয়েই।

'এখন কী, তোমার মনে পড়ছে তো ওকে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল গেয়র্গ, বাবার প্রতি উৎসাহের ঢঙে মাথা নেড়ে।

'আমাকে ঢাকা হয়েছে ঠিকমতো?' জানতে চাইলেন তার বাবা, মনে হচ্ছে তিনি দেখতে পারছেন না তার পা দুটো কম্বলে ঠিকভাবে গোঁজা রয়েছে কি না।

'বলেছি না, বিছানায় আপনার ভালো লাগবে,' বলল গেয়র্গ, বাবার চারপাশে কম্বল ভালোভাবে মুড়ে দিতে দিতে।

'আমাকে ঢাকা হয়েছে ঠিকমতো?' আরেকবার জিজ্ঞেস করলেন তার বাবা, আর মনে হলো বিশেষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন উত্তরটার জন্য।

'চিন্তা করবেন না, আপনাকে ভালোভাবেই ঢেকে দিয়েছি।'

'না!' গর্জে উঠলেন তার বাবা, এমনভাবে যে উত্তরটার সঙ্গে প্রশ্নটার ধাক্কাধাক্কি লেগে গেল, আর কম্বল তিনি এত জোরে ছুড়ে ফেললেন যে খানিকের জন্য ওটা শূন্যে খুলে গিয়ে ভেসে রইল। বিছানার উপর দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি, তারপর এক হাত দিয়ে ছাদ ধরে নিজের শরীর সোজা করলেন কোনোরকমে। 'আমাকে তুমি যে ঢেকে দিতে চাও তা আমি জানি, আমার বদমাশ বাচ্চা ছেলে। কিন্তু আমাকে ঢাকতে পারোনি এখনো। আমার শরীরের সব শক্তি একদম শেষ হয়ে গেলেও তোমাকে সোজা করার

জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট, যথেষ্টরও বেশি। তোমার বন্ধুকে তো আমি অবশ্যই চিনি। সে আমার এমনই একটা ছেলে হতো যে কিনা আমারই ছায়া। সেজন্যই তো এতগুলো বছর ধরে তুমি তাকে ঠকিয়ে চলেছ, নাকি? তা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে? তোমার কি মনে হয়, তার জন্য আমি কাঁদিনি? সেজন্যই তো অফিসে নিজের কামরা বন্ধ করে বসে থাকো তুমি – বস্ ব্যস্ত, কেউ তাকে বিরক্ত করবে না, যাতে করে রাশিয়ায় ওসব মিথ্যা চিঠির পরে চিঠি লিখে যেতে পারো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে নিজের সন্তানের ভেতরটা পড়ে ফেলার জন্য কোনো বাবারই অন্য কারো কাছ থেকে শেখার কিছু নেই। আর এখন এই যেমন তুমি ভাবলে ব্যাটাকে এবার পেড়ে ফেলেছি, এত শক্ত করে নিচে ফেলেছি যে তার উপর পাছাটা দিয়ে বসব আর ও ব্যাটা নড়তেও পারবে না, এ রকম, এ রকমই একটা সময়ে আমার সুযোগ্য পুত্র কী সিদ্ধান্ত নিল – বিয়ে করবে! বাহ্!'

গেয়র্গ চোখ তুলে তাকাল তার বাবার এই দুঃস্বপ্নময় চেহারার দিকে। সেন্ট পিটার্সবার্গে তার এই বন্ধু, যাকে হঠাৎ করেই তার বাবা এত ভালোভাবে চিনে ফেলেছেন, গেয়র্গের হৃদয় স্পর্শ করল অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে গাঢ়ভাবে। সে ভাবল তাকে নিয়ে, রাশিয়ার বিশালত্বের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া এক মানুষ। তাকে সে দেখল তার ফাঁকা, লুট হয়ে যাওয়া দোকানের দরজার সামনে, কোনোমতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে তার দোকানের ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া তাকগুলো, লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া মালপত্র আর বেঁকেচুরে যাওয়া গ্যাস-বার্নারগুলোর মধ্যখানে। তাকে কেন চলে যেতেই হলো এত এত দূরে?

'আমার দিকে মনোযোগ দাও!' গর্জে উঠলেন তার বাবা, আর গেয়র্গ, কী করছে ঠিকমতো বুঝতেই পারছে না, সবকিছু আঁকড়ে ধরতে ছুটে গেল বিছানার দিকে, কিন্তু শেষে থমকে দাঁড়াল মাঝপথে।

'কারণ কী, কারণ মেয়েটা তার স্কার্ট তুলেছে,' তার বাবা শুরু করলেন বাঁশির সুরে, 'কারণ সে এই এমন করে তার স্কার্ট উঠিয়েছে, জঘন্য বদ মেয়ে কোথাকার', আর ব্যাপারটা দেখাবার জন্য তার বাবা রীতিমতো রাতের ঢোলা জামাটা এতই উপরে ওঠালেন যে ওনার উরুর উপরে যুদ্ধের ক্ষতটা পর্যন্ত দেখা গেল, 'কারণ সে তার স্কার্ট উঠিয়েছে এই এমন করে আর এই এমন করে আর এই এমন করে, আর তাই তুমি ওর পেছনে ছুটলে, আর নির্ঝঞ্ঝাটে যেন ওর সঙ্গে ফুর্তিবাজি করতে পারো তাই তুমি চুনকালি দিলে তোমার মায়ের স্মৃতিতে, প্রতারণা করলে নিজের বন্ধুর সঙ্গে আর নিজের বাবাকে ঠুসে দিলে বিছানাতে, যেন তিনি নড়তে-চড়তে না পারেন। কিন্তু নড়তে তিনি পারেন কি পারেন না?' এবার তিনি দাঁড়ালেন কোনোকিছুর সাহায্য না নিয়েই, লাথি মারতে লাগলেন শূন্যে। আকস্মিক এক উপলব্ধিতে ঝলমল করছেন তিনি।

গেয়র্গ দাঁড়িয়ে আছে এক কোনায়, বাবার থেকে যতটা সম্ভব দূরে পারা যায়। বেশ অনেক আগেই সে মনস্থির করে রেখেছিল যে সবকিছুর ওপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে যেন পেছন থেকে বা উপর থেকে হঠাৎ কোনো আক্রমণে সে হতবিহ্বল কিংবা ধরাশায়ী হয়ে

না যায়। তার মনে পড়ল এই অনেক-আগেই-ভুলে-যাওয়া সিদ্ধান্তের কথা; আর আবার তার মন থেকে পিছলে চলে গেল সেটা, যেভাবে সুইয়ের মুখ দিয়ে ঢোকানোর সময় সরে যায় ছোট সুতো।

'কিন্তু তোমার বন্ধুকে শেষমেশ ঠকাতে তুমি পারোনি!' তার বাবা চিৎকার দিলেন, তার আন্দোলিত তর্জনী সুনিশ্চিত করল কথাটা, 'এই এখানে, ঘটনার ঘটার জায়গাতে, আমিই তার প্রতিনিধি।'

'ভাঁড় একটা!' নিজেকে আর চিৎকার করে ওঠা থেকে থামাতে পারল না গেয়র্গ, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল কী ক্ষতি হয়ে গেছে, আর বিস্ফারিত চোখে সে কামড় দিল – অনেক দেরিতেই – নিজের জিভে, এত জোরে যে ব্যথায় মুচড়ে উঠল তার শরীর।

'হ্যাঁ, ঠিকই তো, আমি তো ভাঁড়! ভাঁড়ামিই চলছে! একদম ঠিক শব্দ! তোমার বউ-মরে-যাওয়া বুড়ো বাপের জন্য আর অন্য কোনো সান্ত্বনা আছে কি? বলো আমাকে – উত্তরটা দেওয়ার সময় আমার জীবিত পুত্র হিসেবেই কথা বোলো – আমার ওই পেছনের ছোট ঘরটাতে অবিশ্বস্ত কর্মচারীদের হাতে হয়রান হয়ে হয়ে আর কী আছে আমার জন্য, হাড্ডির মজ্জা পর্যন্ত হাড়জিরজিরে এই লোকটার জন্য? আর আমার পুত্রধন বেশ বিজয়োল্লাস করে বেড়াচ্ছে দুনিয়াজুড়ে, আমার আনা ব্যবসাগুলো নিয়ে মাতব্বরি ফলাচ্ছে, ফেটে পড়ছে খুশিতে বাগবাগ, আর বাপের কাছ থেকে কী সুন্দর দূরে পালাচ্ছে ভদ্রলোকের কঠিন মুখোশ পরে! তোমার কি মনে হয় আমি তোমাকে ভালোবাসিনি, আমি, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছি?'

এবার উনি সামনে ঝুঁকবেন, ভাবল গেয়র্গ, কী হবে যদি খাটের থেকে পড়ে যান, আর টুকরো টুকরো হয়ে যান! এই কথাগুলো তার মাথার মধ্যে হিস্‌হিস্ করে উঠল।

তার বাবা সামনে ঝুঁকলেন বটে, কিন্তু পড়লেন না। যেহেতু গেয়র্গ সামনে তার দিকে এগিয়ে গেল না যেমনটা তিনি আশা করেছিলেন, আবার তিনি দাঁড়ালেন খাড়া হয়ে।

'যেখানে আছ সেখানেই থাকো, তোমাকে দরকার নেই আমার। ভাবছ, আমার কাছে আসার শক্তি এখনো তোমার আছে, কিন্তু আসছ না মন চাচ্ছে না বলেই। হুঁ, এত নিশ্চিত হোয়ো না। এখনো তোমার চাইতে আমার শক্তিই বেশি। নিজে একা হলে হয়তো আমি পিছিয়ে যেতাম, কিন্তু তোমার মা আমাকে তার শক্তিগুলো দিয়ে গেছেন; তোমার বন্ধুর সঙ্গে একটা চমৎকার জোটও বেঁধে ফেলেছি আমি, তোমার সব কাস্টমার এই আমার পকেটে!'

'তার রাতের জামার আবার পকেটও আছে!' মনে মনে বলল গেয়র্গ, ভাবল এই কথাটার মাধ্যমে সে তার বাপকে সারা দুনিয়ার সামনে এক হাস্যকর চিড়িয়ায় পরিণত করতে পারে। শুধু এক মুহূর্তের জন্যই সে ভাবল সেটা, পুরো সময় ধরে সবকিছুই কেমন যেন ভুলে যাচ্ছে সে।

'তোমার বউয়ের হাতটা ধরে আসো না আমার কাছে! চেষ্টা করে দেখো! একদম তোমার পাশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করব ওই বেটিকে, যদি না করি তো দেখো!'

গেয়র্গ এমন একটা মুখ বানাল যেন তার এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। তার বাবা গেয়র্গের

কোনাটার দিকে মাথা নাড়লেন, নিজের বলা হুমকিটার সত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতেই।

'হাসালে আমাকে তুমি আজ, আমার কাছে জানতে এসেছ তোমার বাগ্‌দানের খবর বন্ধুকে জানাবে কি না! বাহ্‌! সে সব জানে, গর্দভ, সে সবই জানে! আমি নিজে ওকে লিখে জানিয়েছি, আমার লেখার জিনিসগুলো তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে ভুলে গেছ বাছাধন। এজন্যই তো এত বছর সে এখানে আর আসে না। তোমার চাইতে সে শতগুণ ভালো করেই জানে সবকিছু। তোমার চিঠিগুলো না পড়েই সে তার বাঁ হাতে ওগুলো মুচড়ে ফেলে, আর ওদিকে আমার সব চিঠি ডান হাতে ধরে থাকে পড়ার জন্য!'

নিজের মাথার উপরে একটা হাত তিনি দোলাতে লাগলেন মহা উৎসাহের সঙ্গে। 'সে তোমার চেয়ে সবকিছু হাজার গুণ ভালোভাবে জানে!' তিনি চিৎকার করে বললেন।

'দশ হাজার গুণ!' বাপকে নিয়ে মশকরা করার জন্যই বলল গেয়র্গ, কিন্তু শব্দগুলো তার ঠোঁটের থেকে বের হওয়ার আগেই একটা ঐকান্তিক চেহারা নিয়ে নিল।

'বহু বছর ধরে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি কখন তুমি আমাকে এটা জিজ্ঞেস করবে! তোমার মনে হয় অন্য কোনোকিছু নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা আছে? তুমি মনে করো যে আমি ওই খবরের কাগজগুলো আসলেই পড়ি? এই যে!' গেয়র্গের দিকে তিনি ছুড়ে মারলেন খবরের কাগজের একটা পাতা, ওটা কে জানে কীভাবে তার সঙ্গে বিছানায় গিয়ে উঠেছিল। একটা পুরোনো খবরের কাগজ, যার নামটা গেয়র্গের একেবারেই অচেনা লাগল।

'বড় হতে তোমার কত লম্বা সময় লাগল! তোমার মাকে মরতে হলো, সুখের দিনটা তিনি দেখে যেতে পারলেন না, তোমার বন্ধু তার ওই রাশিয়ায় পড়ে পড়ে মরছে; তিন বছর আগেই তাকে দেখতে এত হলদে লাগছিল যে মনেই হচ্ছিল এই দুনিয়াতে তার দিন শেষ, আর আমাকে তো দেখতেই পারছ আমার কী অবস্থা। ওটুকু দেখার তো চোখ আছে তোমার!'

'তো আপনি তাহলে অপেক্ষা করে ছিলেন আমাকে ধরার জন্য!' চিৎকার করে উঠল গেয়র্গ।

সমবেদনার স্বরে তার বাবা হালকা চালে বললেন, 'আমার মনে হয় কথাটা আরো আগে বললে কোনো অর্থ হতো। এখন আর এ কথার কোনো মানে নেই।'

আর এবার আরো উঁচু গলায়: 'সুতরাং আজ তুমি জানলে যে নিজেকে ছাড়াও পৃথিবীতে আর কী কী আছে; এর আগ পর্যন্ত নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বোঝোনি তুমি! নিরপরাধ একটা শিশু ছিলে তুমি, সত্যিই, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য হলো তুমি ছিলে একটা শয়তানতুল্য মানুষ! – আর তাই জেনে নাও: আমি তোমাকে পানিতে ডুবে মরার মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি!'

গেয়র্গের মনে হলো তাকে ঘরটা থেকে বহিষ্কার করা হলো, সে দৌড়ে বের হয়ে যাচ্ছে, তার কানে বাজছে তার বাবার বিছানায় ধপ করে পড়ে যাওয়ার শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সে, এমনভাবে যে যেন কোনো ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে; ঠিকা ঝিটার সঙ্গে ধাক্কা খেল সে, সকালবেলার ঘর পরিষ্কারের কাজ করার জন্য মহিলা যাচ্ছিল উপরের ফ্ল্যাটে। 'যিশু!' চিৎকার দিয়ে উঠল মহিলা, অ্যাপ্রোন দিয়ে মুখ ঢাকল, কিন্তু ততক্ষণে

গেয়র্গ হাওয়া। সামনের দরজা দিয়ে ছিটকে বের হলো সে, তার ঝোড়ো গতি তাকে রাস্তা পার করে নিয়ে চলেছে পানির দিকে। এমনভাবে রেলিংটা আঁকড়ে আছে সে, যেমন কোনো ক্ষুধার্ত মানুষ আঁকড়ে ধরে খাবার। ওটার উপর দিয়ে শরীর ঘুর খাইয়ে সে নিয়ে গেল ওপাশে, ঠিক ছোটবেলার সেই দক্ষ জিমন্যাস্টের মতো, যাকে নিয়ে গর্ব করতেন তার বাবা-মা। দুর্বল হয়ে আসা মুঠিতে তখনো রেলিংটা ধরে, রেলিংগুলোর ফাঁক দিয়ে সে দেখল একটা বাস চলে যাচ্ছে, বুঝল এর আওয়াজে তার পতনের শব্দ সহজেই ঢেকে যাবে, আর নরম গলায় বলে উঠল, 'প্রিয় বাবা-মা, তোমাদের সব সময়ই ভালোবেসেছি আমি,' আর ছেড়ে দিল নিজেকে।

সে সময় সেতুটার উপর দিয়ে পার হচ্ছে এক রীতিমতো অফুরন্ত যানবাহনের স্রোত।

দি স্টোকার

একটি খণ্ডাংশ

যখন ষোলো বছরের কার্ল রসমান – যাকে তার গরিব বাবা-মা আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, কারণ এক কাজের মেয়ের প্রলোভনে পড়ে সে একটা বাচ্চার বাবা হয়ে গেছে – ধীর হয়ে আসা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্ক পোতাশ্রয়ে ঢুকল, তার চোখে পড়ল স্ট্যাচু অব লিবার্টি (অনেক দূর থেকেই সে দেখছিল ওটা) যেন হঠাৎ আরো তীব্র রোদের আলোয় স্নান করছে। তরবারি ধরা হাত এমনভাবে উপরে উঠে গেছে যেন মাত্র তোলা হয়েছে, আর ঐ মহিলার চারপাশে বাতাস খেলে যাচ্ছে বাধাহীন।

'কী উঁচু!' মনে মনে বলল সে। জাহাজ ছাড়ার কোনো চিন্তা তার মাথায় নেই, আর সংখ্যায় বাড়তে থাকা কুলিরা তাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে যাচ্ছে, ওভাবে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে রেলিংয়ের গায়ে পড়ল সে।

এক কমবয়সী লোক, এই সমুদ্রযাত্রায় তার সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল কার্লের, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'তোমার কি এখনো তীরে নামার ইচ্ছা নেই কোনো?' 'ওহ্, আমি তো রেডি,' একটু হেসে বলল কার্ল, আর উচ্ছ্বসিত হয়ে (এবং এ কারণেও যে সে তরতাজা কিশোর) ট্রাংকটা কাঁধে তুলে দেখাল। কিন্তু যখন কার্ল তাকিয়ে দেখছে তার এই পরিচিত লোকটা ভিড়ের চাপে তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, হাতের ছড়িটা এক-দুবার নাড়াচ্ছেন তিনি, আতঙ্কের সঙ্গে তার মাথায় এল – সে তার ছাতা ফেলে এসেছে নিচে। তাড়াতাড়ি সে পরিচিত লোকটাকে বলল – মনে হলো উনি খুশি হলেন না খুব একটা – কিছুক্ষণের জন্য তার ট্রাংকটা দেখে রাখতে, আর ঠিক এই জায়গাটা যেন পরে খুঁজে পেতে সমস্যা না হয় সেজন্য চারপাশে একটু দেখে নিল, তারপর ছুট লাগাল। নিচে নামতেই সে হতাশ হলো যে, গ্যাংওয়েটা, যেটা ধরে গেলে তার পথ অনেক কমে আসত,

---

Stoker কথাটির কোনো জুতসই বাংলা শব্দ নেই। ইঞ্জিনের চুলায় কয়লা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বলা হয় Stoker। অন্য কথায় জাহাজের বয়লার রুমে (যেখানে পানি গরম করে বাষ্প করা হয়) কাজ করা কয়লা-শ্রমিক।

বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই প্রথমবারের মতো, মনে হয় সব যাত্রী যে এখন নামবে তেমন কোনো কারণে। তাকে এখন বেশ কষ্ট করে পথ খুঁজে পেতে হচ্ছে অনেক ছোট ছোট কামরার মধ্য দিয়ে, একটার পর একটা ছোট সিঁড়ি বেয়ে নেমে, এমন অনেক করিডর ধরে হেঁটে যেগুলো শুধু পাক খাচ্ছে বারবার, তারপর একটা খালি কামরার মধ্য দিয়ে গিয়ে যেখানে পড়ে আছে পরিত্যক্ত একটা লেখার টেবিল – এই সব শেষে, যেহেতু এদিকটায় সে আগে মাত্র এক-দুবারই এসেছে আর তাও অন্য মানুষদের সঙ্গে, সে বুঝল সে পথ হারিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি। বিভ্রান্ত হয়ে (আর যেহেতু একটা লোকও সে দেখেনি কোথাও, শুধু মাথার উপরে শুনছে হাজারটা মানুষের বিরামহীন পায়ের আওয়াজ, আর এখন দূরে শোনা গেল ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার সময়ের ধুকধুক দম-থেমে-যাওয়া একটা শেষ শব্দ) কোনোকিছু না-ভেবেই সে বাড়ি মারতে লাগল একটা ছোট দরজায়, ঘুরতে ঘুরতে এমনিই ওখানে এসে হাজির হয়েছে সে।

'তালা দেওয়া নেই,' ভেতর থেকে চিৎকার এল, আর কার্ল সত্যিই স্বস্তির এক শ্বাস ফেলে খুলল দরজাটা। 'এইভাবে পাগলের মতো দরজায় বাড়ি মারছো কেন?' একটা বিরাট মানুষ বললেন, কার্লের দিকে বলতে গেলে তাকালেনই না। কেবিনের ছাদে কীরকম যেন এক ফাঁক দিয়ে ঘন-অন্ধকার-মাখানো আলো – উপরের ডেকটাতে আলো দেওয়ার পরে আর এর বেশি ঔজ্জ্বল্য নেই – এই শোচনীয় কেবিনটাতে ঢুকেছে; এখানে গুদামঘরের মাল-সামানের মতো একসঙ্গে বোঁচকা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একটা দেয়ালে-লাগানো সরু বিছানা, একটা ছোট আলমারি, একটা চেয়ার, আর ওই লোক। 'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি,' বলল কার্ল, 'এত দিনের সাগর পাড়িতে আসলে ঠিকমতো কখনো খেয়াল করিনি, এখন বুঝছি এটা যে কী ভয়ংকর বড় জাহাজ।' 'ঠিকই ধরেছ,' লোকটা বললেন একধরনের গর্ব নিয়ে, একটা ছোট সুটকেসের তালা ধরে উদ্দেশ্যহীন খেলা করছেন তিনি, বারবার দুই হাতে চেপে ধরছেন বল্টুটা আর শুনছেন সেটা কীভাবে ফট্ করে লেগে যায়। 'ভেতরে আসো, তাহলে,' লোকটা বলতে লাগলেন, 'নাকি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে!' 'আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?' কার্ল জিজ্ঞাসা করল। 'ওহ্ খোদা, না, কী যে প্রশ্ন করো!' 'আপনি জার্মান?' জানতে চাইল কার্ল, নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইছে সে, কারণ আমেরিকায় নতুন আসা মানুষেরা কী ভয়াবহ দুর্গতির মধ্যে পড়ে, বিশেষ করে আইরিশদের হাতে, সে গল্প সে অনেক শুনেছে। 'তা আমি বটে, ঠিক ধরেছ,' বললেন লোকটা। কার্ল তার পরও ইতস্তত করছে। তখনই তিনি হঠাৎ দরজার হাতল টেনে দরজা লাগিয়ে দিলেন, কার্লকে এক ঝাঁকিতে কেবিনে নিজের দিকে টেনে নিলেন। 'গ্যাংওয়েতে দাঁড়িয়ে কেউ আমার ঘরে উঁকি মারুক তা আমি একদম পছন্দ করি না,' বললেন তিনি, আবার এখন সুটকেসটা নিয়ে পড়েছেন, 'যে ব্যাটাই এদিক দিয়ে যায়, একটু উঁকি দেবেই, কে আছে তা সারা দিন সহ্য করবে!' 'কিন্তু গ্যাংওয়েতে তো কেউ নেই,' বলল কার্ল, দেয়ালে-লাগানো সরু বিছানাটায় অস্বস্তির সঙ্গে ঠেসে আছে সে। 'হ্যাঁ এখন কেউ নেই,' বললেন লোকটা। 'আমরা তো এখন নিয়েই কথা বলছি নাকি?'

ভাবল কার্ল, 'এই লোকের সঙ্গে কথা বলা তো ভারি কঠিন।' 'বিছানায় শুয়ে পড়ো, ওখানে জায়গা বেশি পাবে,' বললেন তিনি। কার্ল কোনোমতে হামা দিয়ে উঠল, শুরুতে হাতে ভর দিয়ে লাফিয়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা নিয়ে সে হেসে ফেলল জোরে। কিন্তু বিছানায় ঠিকমতো উঠতেও পারেনি, তখন চেঁচিয়ে বলল: 'ওহ্ খোদা, আমার ট্রাংকের কথা তো পুরো ভুলে গেছি।' 'কেন, কোথায় তা?' 'উপরে, ডেকে, আমার চেনা একজন ওটা পাহারা দিচ্ছে। কী যেন তার নাম?' তারপর সে তার মায়ের সেলাই করে দেওয়া এক গোপন পকেট থেকে বের করে আনল একটা ভিজিটিং কার্ড, তার মা এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার কথা মাথায় রেখেই তার জ্যাকেটের লাইনিংয়ের ভেতরে ওটা বানিয়ে দিয়েছেন। 'বাটারবম, ফ্রানৎস বাটারবম।'

'ট্রাংকটা কি খুব দরকার তোমার?' 'অবশ্যই।' 'তাই যদি হয় তাহলে অচেনা এক লোকের কাছে ওটা রেখে এলে কেন?' 'নিচে এখানে আমার ছাতা ফেলে রেখে গিয়েছিলাম। ওটা নেওয়ার জন্য যখন দৌড়ালাম মনে হলো ট্রাংক সঙ্গে টানার কোনো দরকার নেই। তারপর পথ হারিয়ে ফেললাম।' 'তুমি কি একা, সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না?' 'হ্যাঁ আমি একা,' বলল কার্ল, মনে মনে ভাবল, 'মনে হয় এই লোকের সঙ্গে লেগে থাকাটাই ভালো হবে। এর চেয়ে ভালো বন্ধু হঠাৎ করে আর পাব কোথায়?' 'ছাতার কথা বাদই দিলাম, এখন তো তোমার ট্রাংকটাও হারাল।' তারপর লোকটা চেয়ারে বসলেন, মনে হচ্ছে কার্লের ঘটনাটায় উনি একটু আগ্রহ বোধ করা শুরু করেছেন। 'আমার কিন্তু মনে হয় না যে ট্রাংকটা গেছে।' 'যা খুশি তা-ই তুমি মনে করতে পারো,' বললেন লোকটা, তার ছোট, কালো, ঘন চুলে প্রবলভাবে চুলকালেন, 'কিন্তু জাহাজে মানুষের নৈতিক চেহারা বদলে যায় বন্দরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তোমার এই বাটারবম হামবুর্গে হলে মনে হয় ঠিকই তোমার ট্রাংক দেখে রাখত, কিন্তু এখানে যদ্দুর বুঝি, বাটারবম আর ট্রাংক – দুটোই গেছে এতক্ষণে।' 'আমার তো তাহলে এক্ষুনি উপরে গিয়ে দেখা উচিত,' বলল কার্ল, চারপাশে তাকাল কীভাবে বের হবে তা বুঝতে। 'যেখানে আছো সেখানেই থাকো,' বললেন লোকটা, কার্লের বুকে হাত দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে ধাক্কা মেরে ওকে বিছানায় ফেরত পাঠালেন। 'কিন্তু কেন?' রেগে গিয়ে জানতে চাইল কার্ল। 'কারণ ওটার কোনো মানে নেই,' বললেন লোকটা, 'একটু পরেই আমি নিজেও যাচ্ছি, তখন দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। হয় তোমার ট্রাংক চুরি হয়ে গেছে, তাহলে তো করার আর কিছুই নেই; না হয় ওই লোক এখনো ওটা পাহারা দিচ্ছে, তাই যদি হয় তাহলে সে একটা বোকা, তার পাহারা চালিয়ে যাওয়াই উচিত; কিংবা সে আসলেই একজন সৎ মানুষ, তাই ওটা ওখানেই ফেলে রেখে গেছে, সে ক্ষেত্রে জাহাজ যখন একদম খালি হয়ে যাবে, তখন অনেক সহজেই আমরা ওটা খুঁজে পাব। তোমার ছাতার বেলায়ও একই কথা।' 'এই জাহাজের পথঘাট আপনার চেনা?' সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল কার্ল, তার কাছে মনে হলো ফাঁকা জাহাজে তার জিনিসগুলো আরো সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে এই আপাত-যুক্তিসংগত ধারণাটার মধ্যে একটা গোপন কোনো ফ্যাকড়া আছে। 'আমাকে চিনতেই

হবে – আমি বয়লার রুমে কাজ করি,' বললেন লোকটা। 'আপনি স্টোকার!' কার্ল খুশিতে চিল্লিয়ে উঠল, এই আবিষ্কার তার সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে; এবার দুই কনুইতে ভর দিয়ে উঠে আরো কাছে থেকে সে তাকাল লোকটার দিকে। 'স্লোভাকদের সঙ্গে আমি যে ছোট কেবিনটায় ঘুমাতাম, ওটার উল্টো দিকে দেয়ালে একটা ফাঁক ছিল, ওখান থেকে ইঞ্জিনরুমের ভেতরটা দেখা যেত।' 'হ্যাঁ, ওখানেই এদ্দিন কাজ করেছি আমি,' বললেন স্টোকার। 'যন্ত্রপাতির কাজে আমার সব সময়ই আগ্রহ অনেক,' বলল কার্ল, তার চিন্তার সুতো ধরেই, 'আর আমাকে যদি বাধ্য হয়ে আমেরিকা আসতে না হতো, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই একসময় ইঞ্জিনিয়ারই হতাম আমি।' 'বাধ্য হয়ে কেন আসতে হলো?' 'ওহ্ কারণ!' বলল কার্ল, হাত নাড়িয়ে পুরো আলোচনাটা খারিজ করে দিয়ে। একই সঙ্গে সে মুখে একটা হাসি নিয়ে তাকাল স্টোকারের দিকে, যেন যে কথাটা সে বলবে না এমনকি তা নিয়েও ওনার প্রশ্রয় চাচ্ছে। 'নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল,' বললেন স্টোকার, বোঝা যাচ্ছে না তিনি কি কার্লকে কথাটা বলতে উৎসাহিত করছেন, নাকি না। 'এখন আমিও পারব ইঞ্জিন রুমে স্টোকার হতে,' বলল কার্ল, 'আমার বাবা-মা'র আর যায়-আসে না আমি কী হই না হই।' 'আমার চাকরি গেছে,' বললেন স্টোকার, আর এ বিষয়টা পুরো মাথায় রেখেই ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন দুই হাত, পা দুটো সরু বিছানায় ছুড়ে দিলেন – পরনে তার শক্ত, ঢালাই-লোহার রঙের ভাঁজ-ভাঁজ হওয়া ট্রাউজার – টান টান হতে। কার্লকে দেয়ালের দিকে আরো সরে যেতে হলো। 'আপনি কি জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছেন?' 'ঠিক ধরেছো, আজ চলে যাচ্ছি আমরা।' 'কিন্তু কেন? এই কাজ ভালো লাগে না?' 'মানে, পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সব। সব সময় প্রশ্নটা চাকরি পছন্দ করা বা না-করার নয়। আসলে তুমিই ঠিক, আমার ভালো লাগে না। আমার মনে হয় না, তুমি আসলেই স্টোকার হওয়ার কথা চিন্তা করছ, কিন্তু না চিন্তা করলেই হওয়াটা সবচেয়ে সোজা। আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই বলব, স্টোকার হোয়ো না। ওই ইউরোপে যদি তোমার পড়াশোনা করার ইচ্ছে থেকে থাকে, তাহলে এখানে পড়াশোনা করতে অসুবিধা কোথায়? আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলো ইউরোপের থেকে অনেক অনেক ভালো।' 'হতে পারে ওগুলো ভালো,' বলল কার্ল, 'কিন্তু পড়াশোনা করার মতো কোনো টাকাপয়সা আমার নেই। একবার কোথায় যেন পড়েছিলাম – একজন লোক সারা দিন এক দোকানে কাজ করত, তারপর সারা রাত পড়াশোনা করত, একসময় ডক্টরেট করে ফেলল আর তারপর মনে হয় মেয়র হলো, কিন্তু ওরকম হতে গেলে কী সাংঘাতিক মনের জোর লাগে, আপনার মনে হয় না? সত্যি বলি, আমার অত মনের জোর নেই। স্কুলে কখনোই ভালো ছাত্র ছিলাম না আমি, সেই জন্য স্কুলকে গুডবাই বলতে একটুও কষ্ট হয়নি। আমার ধারণা, এখানকার স্কুলগুলো আরো কড়া। আর আমি বলতে গেলে ইংরেজি একদমই জানি না। তা ছাড়া এটাও তো সত্যি, এখানকার লোকেরা বিদেশিদের বিরুদ্ধে অনেক পক্ষপাতে ভরা, আমার তা-ই মনে হয়।' 'তুমি সেটাও বুঝে গেছ, বেশ তো? তাহলে ঠিক আছে। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে ভালোই বন্ধুত্ব হবে। দ্যাখো, এটা একটা জার্মান

জাহাজ, এর মালিক হলো হামবুর্গ-আমেরিকা শিপিং লাইন, তাই যদি হয় তাহলে জাহাজে শুধু জার্মানরা কেন কাজ করছে না? চিফ ইঞ্জিনিয়ার কেন রুমানিয়ান? ওর নাম শুবাল। অবিশ্বাস্য। ওই অসভ্য শুয়োর আমাদের জার্মানদের কিনা জার্মান জাহাজে বসে জুলুম করে। ভেবো না যে' – শ্বাস নেওয়ার জন্য থামলেন তিনি, হাত ঝাপটা দিলেন চারপাশে – 'আমি অভিযোগটা জানাচ্ছি স্রেফ এমনি এমনিই। আমি জানি, তোমার কোনো ক্ষমতা বা প্রভাব নেই, তুমি নিজেও স্রেফ একটা গরিব ছেলে। কিন্তু, সত্যি আক্ষেপ হয়!' এরপর তিনি টেবিলে হাতের মুঠো দিয়ে কয়েকবার বাড়ি মারলেন, তার চোখ দুটো প্রতিটা বাড়ির মধ্যে নিবদ্ধ। 'কত কত জাহাজে আমি কাজ করেছি' – এবার তিনি একনাগাড়ে বিশটা নাম বলে গেলেন, ওরা সব মিলে যেন একটাই শব্দ; কার্লের মাথা চক্কর দিতে লাগল – 'নাম-খ্যাতি সবই হয়েছে, প্রশংসা কম পাইনি, ক্যাপ্টেন যেমন চান ঠিক সে রকমই আমার কাজের মান, এমনকি অনেক বছর কাজ করেছি একই জাহাজে' – তিনি উঠে দাঁড়ালেন যেন এটাই তার কর্মজীবনের প্রধান সাফল্য – 'আর এইখানে এই বেঢপ জাহাজে, সবকিছু এরা করে বই মেনে, মানুষের কোনো বুদ্ধির কোনো দরকারই নেই, আর এখানে কিনা আমাকে দিয়ে চলে না, আমি এখানে সব সময় শুবালের পথের কাঁটা, আমি একটা ফাঁকিবাজ, আমাকে নাকি বের করে দেওয়া উচিত, আর আমি নাকি মাইনে পাচ্ছি স্রেফ দয়ার ওপরে। বুঝতে পারছো এসব তুমি? আমি পারছি না।' 'আপনার উচিত হবে না এসব সহ্য করা,' কার্ল বলে উঠল অনেক উত্তেজিত হয়ে। এখানে নিচে এই স্টোকারের বাংকে তার এত নিজের বাড়ির মতো স্বচ্ছন্দ লাগছে যে সে প্রায় একদম ভুলেই বসেছে কোথাকার এক অচেনা মহাদেশের উপকূলে এক জাহাজের অজানা খোলের ভেতর সে শুয়ে আছে। 'ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়েছেন আপনি? তাকে বলেছেন আপনার অধিকার যেন আপনি পান সেটা দেখতে?' 'ওহ্, ভাগো তুমি, ভাগো। তোমাকে এখানে সহ্য হচ্ছে না আমার। আমি কী বলছি তা তুমি কিছুই শুনছো না, আর তারপর কিনা উপদেশ দিচ্ছ। আমি কী করে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করব!' স্টোকার ক্লান্তিতে ভেঙে আবার বসে পড়লেন, মুখটা ঢাকলেন তার দুই হাতে।

'এর চেয়ে আর কী ভালো উপদেশ দেব ওনাকে?' মনে মনে বলল কার্ল। তার মনে হলো এখানে বসে থেকে এমন উপদেশ দেওয়ার চেয়ে (যে উপদেশকে স্রেফ নির্বুদ্ধিতা ভাবা হচ্ছে) তার বরং ট্রাংক আনতে যাওয়াই অনেক অনেক ভালো হতো। তার বাবা, ট্রাংকটা চিরদিনের জন্য তার জিম্মায় সঁপে দেওয়ার সময়, ঠাট্টা করে জিগ্যেস করেছিলেন: 'কদিন তোমার থাকবে ওটা?' আর এখন এই মূল্যবান জিনিসটা কিনা মনে হচ্ছে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল পাকাপোক্তভাবে। শুধু এটাই সান্ত্বনা যে তার বাবার পক্ষে সম্ভব না তার এখনকার অবস্থা জানা, এমনকি তিনি যদি খোঁজখবর করেন, তা-ও। শিপিং কোম্পানি খুব বেশি হলে এটাই বলতে পারবে যে, সে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পৌঁছেছে। কার্লের সত্যি মন খারাপ হলো যে ট্রাংকের জিনিসপত্তর তার বলতে গেলে ব্যবহারই করা হয়নি, যেমন তার জামাটা – ওটা অনেক আগেই বদলানো উচিত ছিল। হিসাব করে চলার কী

বাজে উদাহরণ; এই এখন, কর্মজীবনের ঠিক গোড়াতে যখন তার দরকার সুন্দর জামাকাপড় পরে থাকা, তাকে কিনা হাজির হতে হবে একটা নোংরা জামা পরে। এটুকু ছাড়া তার ট্রাংক হারানোর তেমন ভয়ংকর কিছু ঘটে যায়নি, কারণ যে সুটটা সে এখনো পরে আছে সেটা ট্রাংকেরটার চেয়ে সত্যি অনেক ভালো। ট্রাংকে রাখা সুটটা আসলে একটা বাড়তি সুট, শুধু জরুরি কোনো দরকারেই পরার জন্য, আর এমনকি সে রওনা হওয়ার আগে তার মাকে ওটাতে ঝটপট কিছু তালিপট্টিও দিতে হয়েছিল। এ সময় তার মনে পড়ল ট্রাংকে একটু ভেরোনিজ সালামিও রয়ে গেছে, তার মা এটা দিয়েছিলেন বিশেষ বাড়তি খাবার হিসেবে, কিন্তু সে শুধু একটুখানিকই খেয়েছে ওটা, সাগরে থাকতে তার খিদে একদম চলে গিয়েছিল, আর জাহাজের সবচেয়ে নিচের ক্লাসের যাত্রীদের যে স্যুপ দেওয়া হতো তাতেই তার ভালোমতো চলে যেত। তবে এখন সালামিটা পেলে সত্যি মন্দ হতো না, স্টোকারকে দিতে পারত সে ওটা। এইরকম লোকদের সামান্য জিনিস উপহার নিয়েও যে কত সহজে মন জয় করা যায়, তা কার্ল শিখেছে তার বাবার কাছ থেকে। তিনি যাদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন এমন নিম্নপদস্থ সব কর্মচারীর মন কীভাবে জয় করে ফেলতেন সামান্য সিগার উপহার দিয়েই। এখন কার্লের দেওয়ার মতো আছে শুধু তার টাকাটাই, আর যদি তার ট্রাংক সত্যিই খোয়া গিয়ে থাকে, তাহলে আপাতত ওতে হাত দেওয়া ঠিক হবে না। আবার তার চিন্তা চলে গেল ট্রাংকটার দিকে, এখন সে সত্যিই বুঝতে পারছে না কেন সে সমুদ্রযাত্রার পুরোটা সময় অমন করে ট্রাংক পাহারা দিয়ে এসেছে (ওটার চিন্তায় বলতে গেলে তার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল), আর তাহলে এখন কেন অত সহজেই ওটা হারিয়ে যেতে দিচ্ছে। তার মনে পড়ল পাঁচ রাত কীভাবে সে সারাক্ষণ এক ছোট স্লোভাক ছেলেকে, যে তার বাঁয়ে দুই বার্থ দূরে ঘুমাত, সন্দেহ করেছে ট্রাংকটা হাতিয়ে নেওয়ার মতলব আঁটছে বলে। এই স্লোভাকটা স্রেফ অপেক্ষা করত কখন কার্ল ক্লান্তির চোটে শেষমেশ এক মুহূর্তের জন্য একটু ঘুমিয়ে পড়বে, যেন তখন সে তার লম্বা লাঠিটা দিয়ে (যেটা নিয়ে সে দিনের বেলায় সারাক্ষণ খেলত কিংবা প্র্যাকটিস করত) ট্রাংকটা নিজের কাছে টেনে নিতে পারে। দিন হলেই এই স্লোভাক একটা গোবেচারা চেহারা বানাত, কিন্তু রাত নামামাত্র একটু পর পর সে উঠে বসত তার বার্থে আর কার্লের ট্রাংকটার দিকে ঠারেঠোরে তাকাত কেমন বিষণ্ন দৃষ্টি নিয়ে। কার্ল এ সবকিছু দেখতে পেত পরিষ্কার, কারণ সব সময়ই এখানে ওখানে কেউ-না-কেউ থাকত যে কি না ইমিগ্র্যান্টের অস্থিরতা নিয়ে জ্বালিয়ে রাখত কোনো ছোট বাতি (জাহাজের নিয়মকানুনে এটা করা মানা) আর ইমিগ্রেশন এজেন্সিগুলোর দুর্বোধ্য সব পুস্তিকার মানে বোঝার চেষ্টা চালাত। ওরকম কোনো বাতি যদি কার্লের কাছাকাছি কোথাও জ্বলত, তাহলে কার্ল একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে পারত, কিন্তু সেটা যদি থাকত দূরে কিংবা সবকিছু যদি থাকত অন্ধকার, তাহলে তাকে চোখে খুলে রাখতে হতো। এই কাজটার চাপে কার্ল পুরোপুরি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, আর এখন মনে হচ্ছে ঐ সব কষ্ট ফাও গেছে। ওহ্, আবার যদি কোথাও কোনো দিন ঐ বাটারবমের সঙ্গে তার একটু দেখা হতো!

সেই সময় কেবিনের বাইরের নীরবতা, এতক্ষণ পর্যন্ত পুরো নীরবই ছিল সব, ভেঙে গেল দূর থেকে আসা অনেক শব্দে – বাচ্চাদের পায়ের টোকার মতো পরপর ছোট, তীক্ষ্ণ তালের টোকা; ওগুলো কাছে চলে এসেছে, নিয়মিত গতিতে বেড়েই চলেছে, অবশেষে শোনাল কুচকাওয়াজ করা লোকেদের শান্ত চলার শব্দের মতো। স্পষ্টত তারা এক লাইনে এগোচ্ছে, সরু গ্যাংওয়েতে অবশ্য এ ছাড়া কোনো উপায়ও নেই, আর মনে হলো অস্ত্রের ঠুনঠানের মতো আওয়াজ শোনা গেল। কার্ল তার ট্রাংক আর স্লোভাকদের নিয়ে সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বিছানায় টান টান হয়ে ঘুমে ঢলে পড়ার মতো অবস্থায় পৌঁছেছে মাত্র, চমকে উঠে বসল আর স্টোকারকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল জলদি সজাগ করার জন্য, কারণ দলটার মাথার দিক মনে হচ্ছে ঠিক তাদের দরজায় পৌঁছে গেছে। 'জাহাজের বাদক দল এরা,' বললেন স্টোকার, 'এ কদিন ডেকের উপর বাজিয়েছে আর এখন বাঁধাছাদা করতে চলে যাচ্ছে। সব এখন শেষ, আমরা যেতে পারি। আসো!' তিনি কার্লের হাত ধরলেন, বাংকের উপরে দেয়ালে ঝোলানো একটা ছোট ফ্রেমে বাঁধা ম্যাডোনার ছবি শেষ মুহূর্তে খুলে নিলেন, বুকের পকেটে ভরলেন সেটা, তারপর তার স্যুটকেস তুললেন, আর তিনি ও কার্ল তড়িঘড়ি কেবিন থেকে বের হলেন।

'এখন আমি অফিসে যাব আর বস্‌দের আমার মনে যা আছে সব একটু ঝাড়ব। যাত্রীরা সব চলে গেছে, এখন আর বলতে বাধা নেই।' এই কথাটাই স্টোকার একটু এদিক-সেদিক করে বারবার বলতে লাগলেন, আর হাঁটতে হাঁটতে এক পা পাশে বাড়িয়ে চেষ্টা করলেন তাদের পথের উপর দিয়ে দৌড়ানো একটা ইঁদুরকে থেঁতলে দেওয়ার, কিন্তু এতে করে ইঁদুরটা স্রেফ বরং আরও জোরে ছুট লাগাল ওর গর্তের ভেতরে, একদম ঠিক সময়ে পৌঁছে গেল। তা ছাড়া, লোকটা চলছেও বেশ ধীরে, তার পা দুটো লম্বা হলেও ঠিক ও কারণেই শরীরের আকার হিসেবে অসুবিধাজনক।

তারা পার হলেন রান্নাঘরের একটা অংশ দিয়ে – ওখানে নোংরা অ্যাপ্রন-পরা বেশ কয়েকটা মেয়ে – অ্যাপ্রনগুলো ভেজাচ্ছে ইচ্ছা করেই – থালাবাসন ধুচ্ছে বড় বড় গামলায়। স্টোকার লাইন নামের একটা মেয়েকে ডাকলেন নিজের কাছে, মেয়েটার কোমরের নিচে বেড় দিয়ে একটা হাত রাখলেন, আর ওকে টেনে সঙ্গে নিয়ে গেলেন একটু দূরে, পুরোটা সময় মেয়েটা ফাজিল একটা ঢঙে শরীর চেপে রেখেছে স্টোকারের বাহুতে। 'আজ তো মজুরি পাওয়ার দিন, আসবে নাকি সাথে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমার কষ্ট করার কী দরকার? তুমি নিয়ে আসো না আমার টাকাটা,' মেয়েটা তার হাতের ফাঁক গলে দৌড়ে পালানোর সময় বলল। 'সুন্দর ছেলেটা পেলে কোথায়?' পেছন থেকে চিৎকার করল সে, কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। সবগুলো মেয়ে একসঙ্গে ফেটে পড়ল হাসিতে, ওরা তাদের কাজ থামিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু কার্ল আর স্টোকার চলতে লাগল। ওরা এসে হাজির হলো একটা দরজার সামনে, দরজার মাথাটা ত্রিকোণ গঠনের, আর সেটাকে ধরে রেখেছে ছোট গিল্টি করা কিছু নারীমূর্তি। কোনো জাহাজের ফিটিং হিসেবে নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি অপচয়। কার্ল বুঝতে

পারল জাহাজের এই অংশে সে আগে কখনো পা রাখেনি; সম্ভবত এত দিন সমুদ্রে এটা ছিল প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত জায়গা, কিন্তু জাহাজটার মহা ধোয়াধুয়ির ঠিক আগে এখন মনে হয় পার্টিশনগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে আসলেও ওদের দেখা হয়েছে কাঁধে ঝাড়ু নিয়ে হাঁটা কিছু লোকের সঙ্গে, স্টোকারকে সম্ভাষণ জানিয়েছে ওরা। এত নানা রকমের কাজকর্ম দেখে অবাক হয়ে গেল কার্ল, নিচে থাকতে এর কিছুই সে প্রায় টের পায়নি। এ ছাড়া গ্যাংওয়ে ধরে লাগিয়ে রাখা হয়েছে বিদ্যুতের তার, একটা ছোট ঘণ্টা বাজছে অবিরাম।

সম্মানের সঙ্গে একটা দরজায় টোকা দিলেন স্টোকার, আর যখন কেউ একজন বলে উঠল, 'ভেতরে আসো'! তিনি কার্লকে হাত নেড়ে বোঝালেন, যেন ভেতরে ঢুকতে সে ভয় না পায়। কার্ল ওভাবেই ঢুকল ভেতরে কিন্তু দরজা থেকে বেশি দূর আর এগোল না। কামরাটার তিনটে জানালার বাইরে সে দেখল সাগরের ঢেউ, ওগুলোর উচ্ছলতা দেখে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল আরো, যেন বা পাঁচ দিন ধরে সে বিরামহীন তাকিয়ে তাকিয়ে সমুদ্র দেখেনি। বড় বড় জাহাজগুলো একটা আরেকটার পথে কাটাকুটি করে যাচ্ছে, উঁচু হয়ে আসা ঢেউয়ের সামনে হার মানছে যার যার ওজন মেনেই। চোখ আধবোজা করে দেখলে মনে হচ্ছে জাহাজগুলো নিজেদের মালের ভারে যেন টলমল করে চলেছে। ওগুলোর মাস্তুলের মাথায় উড়ছে লম্বা কিন্তু সরু কিছু পতাকা, জাহাজের চলার কারণে শক্ত টান টান হলেও কিছুটা পতপত করছে সামনে-পেছনে। তোপধ্বনি শোনা গেল, মনে হয় কোনো যুদ্ধজাহাজ থেকে আসছে; ওরকম একটা জাহাজ চলে গেল একদম কাছ দিয়ে, ওটার কামানের নলে ইস্পাতের বর্মের উপর সূর্যের আলো পড়ে জ্বলছে, মনে হচ্ছে নলগুলো যেন আদর-সোহাগ পাচ্ছে জাহাজটার ঢেউয়ের উপর সোজা, মসৃণ কিন্তু দোল-খেয়ে-চলা থেকে। আকারে ছোট জাহাজ ও নৌকাগুলো, অন্তত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, দেখতে লাগছে ওরা আছে বহু দূরে, আর অবিরাম ঝাঁক বেঁধে চলছে বড় জাহাজগুলোর ফাঁকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই সবকিছুর পেছনে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্ক শহর, এর আকাশছোঁয়া দালানগুলোর লাখো জানালা নিয়ে তাকিয়ে আছে কার্লের দিকে। হুঁ, এই কামরায় বোঝা যায় আপনি আছেন কোথায়।

একটা গোল টেবিলে তিন ভদ্রলোক বসে আছেন, এদের একজন জাহাজের অফিসার – পরনে জাহাজের নীল রঙের ইউনিফর্ম, অন্য দুই অফিসার এসেছেন বন্দর-কর্তৃপক্ষ থেকে, তাদের গায়ে কালো আমেরিকান ইউনিফর্ম। টেবিলের উপর নানা ডকুমেন্ট রাখা বিরাট গাদা করে, জাহাজের অফিসার ওগুলোতে প্রথমে চোখ বোলালেন হাতে একটা কলম নিয়ে, তারপর এগিয়ে দিলেন অন্য দুজনের দিকে, ওনারা এবার পড়ছেন ওগুলো, এবার ওখান থেকে তুলে নিচ্ছেন বিশেষ বিশেষ অংশ, এবার ওগুলো ভরে নিচ্ছেন যার যার ব্রিফকেসে – শুধু ব্যতিক্রম যখন কিনা এ দু'জনের একজন (যিনি সমানে দাঁত দিয়ে সূক্ষ্ম আওয়াজ করে যাচ্ছেন) তার সহকর্মীকে লেখার জন্য বয়ান করছেন কোনোকিছু।

জানালার কাছের একটা ডেস্কে আকারে ছোট এক ভদ্রলোক বসে আছেন পিঠ দরজার দিকে দিয়ে, তিনি ব্যস্ত প্রকাণ্ড সব লেজার খাতা নিয়ে, এক সারিতে ওগুলো তার সামনে রাখা মাথাসমান উঁচু একটা বেশ মজবুত বইয়ের তাকে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা খোলা ক্যাশ বাক্স, যেটা – অন্তত প্রথম দেখায় – মনে হচ্ছে শূন্য।

দ্বিতীয় জানালাটার কাছে কোনোকিছু নেই, ওটা থেকেই সবচেয়ে সুন্দর দেখা যাচ্ছে বাইরে। কিন্তু তৃতীয় জানালার ওখানে দাঁড়িয়ে দুই ভদ্রলোক, কথা বলছেন, নিচুগলায়। এদের একজন জানালার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো, তারও পরনে জাহাজের ইউনিফর্ম, খেলছেন তার তরবারির হাতলটা নিয়ে। তিনি যার সঙ্গে কথা বলছেন সেই ভদ্রলোক জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো, আর মাঝেমধ্যে যেই তিনি নড়ছেন, অন্য মানুষটার বুকে সারি করে লাগানো ডেকোরেশন রিবনগুলোর খানিকটা চোখে পড়ছে। এই পরের জন পরে আছে সিভিলিয়ান পোশাক, তার হাতে একটা পাতলা ছোট বাঁশের ছড়ি যেটাও (তার দুই হাত ওভাবে কোমরের কাছটায় রাখার কারণে) কিনা বের হয়ে আছে তরবারির মতো।

এসব দেখার বেশি সময় কার্ল পেল না, কারণ একটু পরেই একজন পরিচারক এসে হাজির হলো তাদের সামনে আর স্টোকারের দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন স্টোকারের এখানে কোনো কাজ নেই। জিজ্ঞাসা করল, সে এখানে কী চাচ্ছে। স্টোকার উত্তর দিলেন, যে রকম নরম গলায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সেই একই রকম গলায় যে জাহাজের বেতনভাতা ও ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত চিফ পার্সারের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান। পরিচারক হাত নেড়ে এই অনুরোধে নিজের অসম্মতি জানিয়েও পা টিপে, গোলটেবিলটা এড়াতে ওটার চারপাশে বিরাট বৃত্ত বানিয়ে, হেঁটে গেল বিরাট লেজারখাতাগুলো নিয়ে ব্যস্ত ভদ্রলোকের কাছে। এই ভদ্রলোক – পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে – পরিচারকের কথা শুনে জমে বরফ হয়ে গেলেন, কিন্তু শেষে ঘুরে তাকালেন সেই লোকের দিকে যে তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে, আর তারপর ভয়ংকর অঙ্গভঙ্গি করে স্টোকারকে (সেই সঙ্গে কোনো ঝুঁকি না-নেওয়ার জন্য পরিচারককেও) ইশারা দিতে লাগলেন সোজা বিদায় হওয়ার। তখন পরিচারক ফিরে এল স্টোকারের কাছে, আর যেন বা গোপন কোনো বার্তা তাকে বলছে সেরকম গলায় বলল: 'এই কামরা থেকে এক্ষুনি ভাগো!'

এই কথা শুনে স্টোকার মাথা নিচু করে কার্লের দিকে তাকালেন, মনে হচ্ছে কার্ল যেন তার প্রেয়সী যার কাছে তিনি নীরবে তার দুঃখের কথা জানাচ্ছেন। আর অন্য কিছু না-ভেবেই কার্ল ছুটে গেল সোজা কামরাটার উল্টো পাশে, এমনকি একটু ঘষাও খেল অফিসারের চেয়ারের সঙ্গে; পরিচারক দৌড়াল তার পিছু পিছু, নিচু হয়ে, দুই হাত বাড়িয়ে তৈরি তাকে ধরার জন্য, মনে হচ্ছে সে যেন কোন একটা বড় পোকামাকড় ধরছে; কিন্তু চিফ পার্সারের ডেস্কে কার্লই পৌঁছাল প্রথমে, ডেস্কটা আঁকড়ে থাকল যেন পরিচারক তাকে টেনে বের করে দিতে না পারে।

স্বাভাবিক যে পুরো কামরাটা তৎক্ষণাৎ সরগরম হয়ে উঠল। টেবিলে বসা জাহাজের অফিসার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসারেরা চুপচাপ কিন্তু মন দিয়ে দেখতে লাগলেন; জানালায় দাঁড়ানো দুই ভদ্রলোক এখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেছেন; পরিচারক যখন দেখল এইসব উঁচু পদের আর ক্ষমতাশালী লোকজনও এখন ব্যাপারটায় আগ্রহ দেখাচ্ছে, সে বুঝল তার আর এখানে দরকার নেই, পিছপা হলো সে। দরজার কাছে স্টোকার চাপা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সেই সময়ের জন্য, যখন তার সাহায্যের দরকার পড়বে। অবশেষে চিফ পার্সার ওনার হাতলওয়ালা চেয়ারে বোঁ করে শরীরটা জোরে ঘোরালেন ডান দিকে।

কার্ল তার গোপন পকেট হাতড়াতে লাগল, ওখানে কী আছে তা সবাইকে দেখাতে তার কোনো অস্বস্তি নেই। এরপর নিজের পরিচয় নিয়ে কিছু বলার বদলে সে তার পাসপোর্ট বের করে খুলে রাখল ডেস্কটাতে। চিফ পার্সার মনে হলো এই পাসপোর্টকে কোনো দামই দিলেন না, তিনি ওটা দু আঙুলে গুঁতো দিয়ে সরিয়ে দিলেন, এরপরই কার্ল (যেন এই অনুষ্ঠানিকতাটুকু ভালোভাবে শেষ হয়ে গেছে) ওটা আবার ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।

'আমাকে যদি একটু বলার অনুমতি দেন,' এরপর শুরু করল সে, 'আমার মতে এই স্টোকার ভদ্রলোকের ওপরে অন্যায় করা হয়েছে। জাহাজে শুবাল নামের এক লোক আছে যে ওনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এই স্টোকার অনেক জাহাজে কাজ করেছেন, সবগুলোর নাম ওনার মুখস্থ, আর সবগুলোতেই ওনার কাজে সবাই পুরো সন্তুষ্ট ছিল; অনেক পরিশ্রমী মানুষ তিনি, খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নেন নিজের কাজটুকু, তাই আমি বুঝতেই পারি না কেন স্রেফ এই জাহাজে, যেখানে পালতোলা জাহাজগুলোর মতো তেমন বিরাট কোনো খাটাখাটনির কাজ নেই, তিনি ঠিকভাবে নিজের কাজ সামলাতে পারবেন না। তার মানে, অন্য কিছু নয়, স্রেফ মিথ্যা বদনামের কারণেই ওনার উন্নতি হচ্ছে না, এই মিথ্যা অপবাদ ওনার নিশ্চিত প্রাপ্য সুনামটুকু কেড়ে নিচ্ছে। আমি শুধু বিষয়টার ওপর একটু সাধারণ আলোকপাত করলাম; এবার উনি নিজে ওনার অভিযোগগুলো আপনাদের খুলে বলবেন।' কার্ল তার ভাষণটা দিল এখানে উপস্থিত সব কজন ভদ্রলোকের উদ্দেশে, কারণ সবাই আসলে তার কথা শুনছিলেন আর কার্লের কাছে এটাও মনে হলো যে এখানে অন্তত একজন তো ন্যায়পরায়ণ লোক থাকবেন আর একা চিফ পার্সারই সেই ন্যায়পরায়ণ লোক হওয়ার বদলে এতগুলো লোকের মধ্যে কোন একজনের সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেই সঙ্গে চালাকি করে কার্ল এই সত্য গোপন করল যে স্টোকারের সাথে তার পরিচয় হয়েছে মাত্র কিছু আগে। তবে তার ভাষণ আরো অনেক ভালো হতো যদি ছোট বাঁশের ছড়িওয়ালা ভদ্রলোকের (ছড়িটা আসলেও তার এখনকার জায়গা থেকেই প্রথমবারের মতো তার চোখে পড়ল) লাল মুখটা তার মনোযোগ নষ্ট না করত।

'সব সত্যি কথা, প্রত্যেকটা শব্দ,' বললেন স্টোকার, কেউ তাকে তখনো কিছু জিজ্ঞাসা করেনি কিংবা তার দিকে তাকায়ওনি। স্টোকারের এই অতিরিক্ত তড়িঘড়ি মারাত্মক কোনো সর্বনাশই ডেকে আনত যদি-না ডেকোরেশন রিবন লাগানো ভদ্রলোক

– কার্ল এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে উনিই আসলে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন – এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত না নিয়ে ফেলতেন যে তিনি স্টোকারের কথা শুনবেন। তিনি তার হাত বাড়ালেন আর স্টোকারকে ডাকলেন: 'এখানে আসো!' তার গলা এমন কঠিন যে মনে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়েও বাড়ি মারা যাবে। তবে এখন সবকিছু নির্ভর করছে স্টোকারের আচরণের ওপর, যদিও তার কেস্‌টার ন্যায়বিচার পাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে কার্লের কোনোই সন্দেহ নেই।

সৌভাগ্য বলতে হয়, এ সময় পরিষ্কার হয়ে উঠল যে স্টোকার পৃথিবীর নানা ঘাট-দেখা অভিজ্ঞ একজন মানুষ। ব্যতিক্রমী এক শান্ত ভঙ্গিমায় তিনি তার ছোট সুটকেসে হাত ঢুকিয়ে, যা খুঁজছিলেন তা প্রথমবারেই খুঁজে পেয়ে, এক তোড়া কাগজ বের করে আনলেন, সেই সঙ্গে একটা নোট বই; তারপর তিনি পার্সারকে পুরো উপেক্ষা করে (যেন এটাই পরিষ্কার তার যাওয়ার রাস্তা) ওগুলো নিয়ে পৌঁছালেন ক্যাপ্টেনের কাছে আর জানালার চৌকাঠের উপর বিছিয়ে রাখলেন তার তথ্য-প্রমাণ। চিফ পার্সারের আর কোনো উপায় থাকল না ঐ দুজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া। 'নালিশ জানানোর ব্যাপারে এই লোকের বিরাট কুখ্যাতি রয়েছে,' ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো করে বলতে লাগলেন তিনি, 'ইঞ্জিন রুমে যতক্ষণ না থাকে তার চেয়ে বেশি সময় সে থাকে আমার অফিসে। ওর কারণে শুবালের, এমনিতে কত শান্ত মানুষ সে, প্রায় মাথা বিগড়ে যাওয়ার দশা। এখন তুমি শোনো!' – এ সময় তিনি ঘুরলেন স্টোকারের দিকে – 'এই দফায় তুমি তোমার ধৃষ্টতার চূড়ান্ত করে ছাড়ছ। মজুরি রুম থেকে বলো এরই মধ্যে কতবার একেবারে উচিত কারণে তোমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে তোমার ঐসব পুরোপুরি, সম্পূর্ণ আর সব সময়ই অযৌক্তিক দাবিদাওয়াগুলোর জন্য? তখন কতবার বলো তুমি দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছ এই পার্সারের অফিসে? কতবার বলো তোমাকে ভদ্রভাবে বলা হয়েছে যে শুবালই তোমার ঊর্ধ্বতন বস্‌, আর স্রেফ তাকেই, স্রেফ তাকেই খুশি করে কাজ করতে হবে তোমার? আর তুমি এখন সোজা একেবারে ক্যাপ্টেনের এখানে এসে হাজির, এমনকি নির্লজ্জের মতো জ্বালাচ্ছ ওনাকে, আর কত বড় সাহস যে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ এই বাচ্চা ছোঁড়াকে, ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে এনেছ তোমার ফালতু নালিশগুলো বলার মুখপাত্র বানিয়ে – ঐ ছোঁড়াকে আমি তো এর আগে জাহাজে দেখিইনি কখনো।'

বেশ কষ্টে কার্ল নিজেকে সামলাল সামনে লাফিয়ে পড়া থেকে। কিন্তু এরই মধ্যে ক্যাপ্টেন হস্তক্ষেপ করে বসেছেন এই কথা বলে: 'লোকটা কী বলে আমরা শুনব। শুবাল আসলেই আমার চাওয়ার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করা শুরু করেছে, যদিও এই কথা বলে আমি তোমার পক্ষে বলছি না কিছু।' এই শেষ কথাটা স্টোকারকে উদ্দেশ করে বলা হলো; খুব স্বাভাবিক যে তিনি হঠাৎ একবারেই তার পক্ষে চলে যেতে পারেন না, কিন্তু মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিক পথেই আগাচ্ছে। স্টোকার শুরু করলেন তার কথা, অনেক নারাজির সঙ্গে শুবালকে 'সাহেব' বলে সম্বোধন করলেন তিনি। চিফ পার্সারের খালি ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে কার্লের কী আনন্দই না হচ্ছিল, স্রেফ মজা করতেই সে বারবার চিঠির ওজন মাপার যন্ত্রটা চাপ দিতে লাগল। – শুবাল সাহেব পক্ষপাতদুষ্ট! শুবাল সাহেব

বিদেশিদের পক্ষ নিয়ে চলেন! শুবাল সাহেব স্টোকারকে ইঞ্জিনরুম থেকে বের করে দিয়েছেন, তাঁকে দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করিয়েছেন, নিঃসন্দেহে স্টোকারের কাজ নয় তা! – একবার এমনকি শুবাল সাহেবের কাজ পারা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হলো, বলা হলো তার কর্মদক্ষতা যতটুকু না বাস্তব, তার চেয়ে বেশি বাহ্যিক। এ সময় কার্ল একাগ্র চোখে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে, এমন এক বিশ্বাসের ভঙ্গি নিয়ে যে উনি যেন তার সহকর্মী – কার্ল চাচ্ছে স্টোকারের এই কিছুটা আনাড়ির মতো কথা বলার কারণে ক্যাপ্টেন যেন আবার তার বিপক্ষে চলে না যান। কিন্তু সবকিছুর পরেও এটাই সত্যি যে কোনো নির্দিষ্ট কিছু পাওয়া গেল না তার এই এক ঝুড়ি কথার মধ্যে থেকে, আর যদিও ক্যাপ্টেন এখনো একঠায় তাকিয়ে আছেন সামনে (তার দুচোখে সংকল্প যে এই দফায় তিনি স্টোকারের কথা একদম শেষ পর্যন্ত শুনেই ছাড়বেন), অন্য ভদ্রলোকেরা এরই মধ্যে অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগলেন, আর এটা খুব অলক্ষুনে ব্যাপার যে একটু বাদেই কামরাটাতে স্টোকারের গলার সেই ভরাট রাজত্ব আর থাকল না। প্রথমে সিভিলিয়ান পোশাক-পরা ভদ্রলোক তার বাঁশের ছড়ি নিয়ে খেলা শুরু করলেন, নকশা করা কাঠের মেঝেটাতে টোকা দিতে লাগলেন মৃদুভাবে। স্বভাবতই অন্য ভদ্রলোকেরা মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছেন ওনার দিকে; বন্দর-কর্তৃপক্ষ থেকে আসা লোক দুজন, তাদের পরিষ্কার অনেক তাড়া, আবার দেখতে শুরু করলেন কাগজপত্র, কিছুটা অন্যমনস্কভাবে তারা ওল্টাতে লাগলেন ওগুলো; জাহাজের অফিসার আবার তার টেবিলটার কাছে ফিরে গেলেন, আর চিফ পার্সার, বুঝে গেছেন যে তিনি একরকম জিতেই গেছেন, একটা শ্লেষভরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। একমাত্র পরিচারক ছাড়া আর সবার মধ্যেই এই মনোযোগ হারানোর ব্যাপারটা দেখা গেল; বড় ও ক্ষমতাবান লোকজনের বুড়ো আঙুলের নিচে গরিবের কী হাল হয় সে ব্যাপারে একটু হলেও তার সমবেদনা আছে – সে কার্লের দিকে একনিষ্ঠ তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে যেন তার বলার আছে কিছু।

ইতোমধ্যে জানালার বাইরে বন্দরের জীবন বয়ে চলেছে নিজের গতিতে; পাহাড়সমান উঁচু ড্রামের গাদা নিয়ে একটা মালবাহী জাহাজ ধীরে চলে গেল পাশ দিয়ে, ড্রামগুলো নিশ্চয়ই খুব চমৎকার করে বাঁধা, যে জন্য তারা গড়িয়ে পড়ছে না – ওটার কারণে এই কামরাটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এল; ছোট ছোট মোটরবোটগুলো, হাতে সময় থাকলে কার্ল যেগুলো আরো ভালো করে দেখতে পারত, পানির উপর দিয়ে সোজা তীরের মতো উড়ে চলেছে, স্টিয়ারিং হুইল ধরে খাড়া দাঁড়ানো মানুষগুলোর সামান্য ছোঁয়াও মেনে চলছে একদম; এখানে-ওখানে অদ্ভুত কিছু ভাসমান বস্তু নিজেদের খেয়ালখুশিমতো মাথা তুলছে অস্থির ঢেউয়ের ভেতর থেকে, আবার তখুনি তার অবাক চোখের সামনে ডুব মারছে ওরা; সমুদ্রগামী জাহাজগুলো থেকে নৌকাভর্তি যাত্রী নিয়ে নাবিকেরা ঘামতে ঘামতে দাঁড় টানছে, যাত্রীরা চুপচাপ আর আশা নিয়ে বসে আছে সেই একই আসনে, যেখানে তাদের ঠেসে বসানো হয়েছে, যদিও এদের কেউ কেউ মাথা ঘুরিয়ে চারপাশের চলমান দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে

পারছে না। বিরামহীন এক চলাচল, অস্থির শক্তির কাছ থেকে অস্থিরতা প্রবাহিত হয়ে চলেছে অসহায় মানবজাতি আর তাদের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে!

কিন্তু এখন যেখানে প্রয়োজন দ্রুত, স্পষ্ট আর সবচেয়ে নির্ভুল বর্ণনার, সেখানে স্টোকার করছেটা কী? কোনো সন্দেহ নেই সে সবকিছু একটা ফেনা বানিয়ে ফেলেছে আর তার হাত দুটো কিছুক্ষণ যাবৎ এমন কাঁপছে যে জানালার চৌকাঠের উপর কাগজগুলো ধরে রাখতেই তার কষ্ট হচ্ছে; কম্পাসের যতগুলো দিক আছে সবগুলো থেকে তার মাথায় এসে বন্যার মতো এসে জমা হচ্ছে শুবালের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, তার হিসেবে এদের প্রতিটাই যথেষ্ট শুবালকে চিরদিনের মতো কবরে ঠুসে দিতে – কিন্তু বাস্তবে ক্যাপ্টেনের জন্য সে যা দাঁড় করাল তা সবকিছুর একটা করুণ জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই না। এখন বেশ কিছুটা সময় ধরে বাঁশের ছড়ি হাতে ভদ্রলোক ছাদের দিকে তাকিয়ে হালকা শিস বাজাচ্ছেন; বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসাররা জাহাজের অফিসারকে তাদের টেবিলে শেষমেশ ঠেসে ধরেছেন এবং মনে হচ্ছে না তাকে আর একবারও ওখান থেকে উঠতে দেবেন; চিফ পার্সারকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শুধু ক্যাপ্টেনের শান্ত-স্থির ভাবটার কারণেই তিনি ফেটে পড়া থেকে নিজেকে সামলে নিচ্ছেন; পরিচারক দাঁড়িয়ে আছে সামরিক কায়দার 'সাবধান' ভঙ্গিতে, অপেক্ষা করছে তার ক্যাপ্টেন থেকে যেকোনো সময় স্টোকারের জন্য আদেশ আসার।

এ অবস্থায় এসে কার্ল আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারল না। সে, অতএব, আস্তে এগোল এই দলটার দিকে, মাথার মধ্যে খুব দ্রুত ভেবে নিচ্ছে কী করে কতটা সুনিপুণভাবে তাকে সামাল দিতে হবে পুরো পরিস্থিতি। সত্যিই, এখনই সময় তা করার; আর যদি সে সামান্য দেরিও করে, দেখা যাবে তাদের দুজনকেই ধরে বের করে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে। ক্যাপ্টেন হয়তো বা আসলেই একজন ভালো মানুষ আর তা ছাড়া বিশেষ করে এখন (এমনটাই ভাবল কার্ল) তার হয়তো কোনো নির্দিষ্ট কারণ আছে নিজেকে ন্যায়পরায়ণ প্রভু হিসেবে দেখানোর, কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও তিনি তো অমন কোনো বাদ্যযন্ত্র না, যা আপনি ধুমধাম পেটাতেই থাকবেন যতক্ষণ না সেটা ভেঙেচুরে পড়ছে – তবে স্টোকার তাকে ঠিক ওরকম কিছুই ভেবে নিয়েছেন, যদিও মেনে নিচ্ছি, তা তার বুকের ভেতরের অপরিসীম ক্রোধের কারণেই।

অতএব কার্ল স্টোকারকে বলল: 'আপনাকে কথাগুলো আরো সহজ করে বলতে হবে, আরো পরিষ্কারভাবে, আপনি এখন যেভাবে বলছেন তাতে ক্যাপ্টেন তো আপনার কথার সঠিক মূল্যায়ন করে উঠতে পারছেন না। আপনার কি মনে হয় ক্যাপ্টেন জাহাজের সব ইঞ্জিনিয়ার, সব ছেলেছোকরাকে নামে চেনেন, তাদের ডাকনামে চেনা তো বাদই দিন, আর তাই আপনাকে কার কথা বলছেন তা বোঝানোর জন্য স্রেফ এদের কারো একটা নাম বললেই হয়ে যাবে? আপনার নালিশগুলো একটু বাছাই করে নিন, সবচেয়ে দরকারিগুলো আগে বলুন আর বাকিগুলো তারপর গুরুত্ব বুঝে বুঝে একটার পর একটা, তাহলে দেখবেন আপনার হয়তো আর বেশিরভাগ নালিশই জানানোও লাগছে না। আপনি সব সময় আমাকে তো কত পরিষ্কারভাবে বলেছেন কথাগুলো!' আমেরিকায় যদি কেউ ট্রাংক চুরি

করতে পারে তো তাহলে মাঝে মধ্যে একটু গুল মারলে কিছু যায় আসে না, অজুহাতের মতো করে নিজেকে বোঝাল সে।

আহ্ শুধু যদি এতেই হয়ে যেত সব! নাকি এরই মধ্যে আসলে অনেক দেরি হয়ে গেছে? স্টোকার এই পরিচিত কণ্ঠ শোনামাত্র আসলেই থামিয়ে দিলেন তার কথা, কিন্তু তার দুচোখ আত্ম-অহমিকার আঘাতে আঘাতে, ভয়ংকর সব স্মৃতির তাড়নায় আর তার এখনকার চূড়ান্ত রকম দুঃখ-বেদনা মিলে অশ্রুর ভারে এতই অন্ধ হয়ে গেছে যে তিনি কার্লকে প্রায় আর চিনতেই পারছেন না। কিন্তু কীভাবে – কার্লের মাথায় এল চিন্তাটা, সে এখন নীরব হয়ে গেছে একই রকম নীরব স্টোকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে – কিন্তু কীভাবে এখন তিনি হঠাৎ করে তার কথা বলার ভঙ্গি বদলে ফেলবেন, বিশেষ করে যখন তিনি বিশ্বাস করেন যে শ্রোতাদের কাছ থেকে সামান্যতম সাড়া না পেয়েও তার যা-যা বলার ছিল সবই তিনি এরই মধ্যে বলে ফেলেছেন, আর অন্যদিকে এটাও মনে করছেন যে এখনো তার কথা শুরুই হয়নি, তবে এই ভদ্রলোকেরা পুরো জিনিসটা আবার যে একদম শুরু থেকে শুনবেন সে আশা প্রায় দুরাশাই। আর ঠিক এ রকম একটা সময় কিনা কার্ল, তার একমাত্র মিত্র, এসে হাজির, আর তাকে ভালো ভালো উপদেশ ঝাড়তে ঝাড়তে বরং দেখিয়ে দিচ্ছে যে, হ্যাঁ, সবকিছুর একদম গুড়ে বালি।

'আহ্ আমি যদি জানালার বাইরে না তাকিয়ে থেকে আরেকটু আগে এগিয়ে আসতাম,' মনে মনে বলল কার্ল এবং স্টোকারের সামনে মাথা নিচু করে সে তার শরীরের দুই পাশে ট্রাউজারের সেলাইতে চাপড় মারতে লাগল – এটা সংকেত যে সব আশা শেষ।

কিন্তু স্টোকার ভুল বুঝলেন এটা, কার্লের ব্যবহারে তিনি সম্ভবত তার প্রতি কোনো গোপন তিরস্কার ঝাড়ার গন্ধ পেয়েছেন, কার্লের ধারণা বদলাবার সৎ ইচ্ছা থেকে তিনি এবার এগিয়ে গেলেন নিজের অপকর্মের মাথায় মুকুট পরাতে – কার্লের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। এটা করার আর সময় পেলেন না তিনি, এখনই করতে হলো যখন কিনা গোলটেবিলে বসা ভদ্রলোকেরা বহু আগেই মেজাজ হারিয়ে বসেছেন এই অনর্থক বকবকানি শুনে শুনে, যা তাদের দরকারি কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, যখন চিফ পার্সার একটু একটু করে আর বুঝে উঠতে পারছেন না ক্যাপ্টেনের ধৈর্যের বিষয়টা, মনে হচ্ছে হুমকি দিচ্ছেন যেকোনো সময় রাগে ফেটে পড়ার, যখন পরিচারক বেচারা (তার প্রভুদের জগতে আবার পুরোপুরি নিজেকে বসিয়ে নিয়েছে সে) স্টোকারকে মাপছে বুনো চোখে তাকিয়ে, এবং যখন শেষমেশ বাঁশের ছড়িঅলা ভদ্রলোক (ক্যাপ্টেন নিজে যার দিকে বন্ধুত্বের চোখে তাকাচ্ছেন মাঝে মধ্যে) স্টোকারের প্রতি পুরোপুরি আগ্রহ হারিয়ে আর সত্যি বলতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একটা ছোট নোটবই বের করেছেন আর শুরু করেছেন (তার মন নিঃসন্দেহে অন্য কিছুর মধ্যে) একবার নোট বই আরেকবার কার্লের দিকে তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে বেড়াতে।

'হ্যাঁ আমি জানি, আমি জানি,' বলল কার্ল, তার কষ্ট হচ্ছে স্টোকার তাকে মুষলধারে যা বলে যাচ্ছে তা সহ্য করে যেতে, তবু ঝগড়ার চূড়ান্ত মুহূর্তেও সে কোনোমতে বন্ধুত্বের

একটা হাসি মুখে ঝুলিয়ে রেখে দিল ঠিকই, 'আপনার কথাই ঠিক, আপনার কথাই যে ঠিক, আমার তা নিয়ে কখনোই সন্দেহ হয়নি।' কার্লের ভয় হচ্ছিল স্টোকারের সামনে পেছনে সমানে নড়তে থাকা হাত হয়তো তাকে ঘুষিই মেরে বসবে, তাই হয়তো তার মন চাইছিল ও দুটো ধরে বসার, কিন্তু তার থেকেও বেশি সে চাইছিল স্টোকারকে ঠেলে এককোনায় নিয়ে যাবে, কানে কানে কিছু শান্ত করার মতো কথা বলবে, এমন কথা যা অন্য কারো শোনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্টোকার আর নিজের মধ্যে নেই। কার্লের এমনকি এটা ভেবে একটু সান্ত্বনাও মিলল যে ওনার এই মহা বেপরোয়া অবস্থার শক্তি দিয়ে উনি এই সাত ভদ্রলোককে একদম ভ্যাবাচ্যাকাও খাইয়ে দিতে পারেন। যা-ই হোক না কেন, ডেস্কের দিকে চটজলদি একটু তাকালেই তো দেখা যাচ্ছে অনেক পুশ-বাটনওয়ালা একটা প্যানেল পড়ে আছে, ওগুলো লাগানো বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে; ওটার উপর হাত দিয়ে একটামাত্র চাপ দিলেই তো পুরো জাহাজ আর এর সব গ্যাংওয়ে ভরা শত্রুভাবাপন্ন মানুষজন, সবাই সোজা ঝাঁপিয়ে পড়বে বিদ্রোহে।

এ সময় বাঁশের ছড়িওয়ালা ভদ্রলোক, এতক্ষণ যিনি কোনো আগ্রহই দেখাননি, কার্লের কাছে এলেন, আর অত জোরে না তবে স্টোকারের চিৎকার ছাপিয়ে শোনার মতো জোরে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমার নামটা কী জানতে পারি আমি?' ঠিক সে সময়, যেন ভদ্রলোকের এই কথাটার জন্য দরজার পেছনে কেউ ওঁত পেতে ছিল, একটা টোকা শোনা গেল। পরিচারক তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। ক্যাপ্টেন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। তা দেখে পরিচারক দরজার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝারি গড়নের এক লোক, পরনে একটা ফ্রক-কোট; তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যে ঠিক ইঞ্জিনের কাজ করার জন্য মানানসই তিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা-ই – শুবাল। কার্ল যদি সবার চোখ দেখে এটা না-ও বুঝতে পারত যে এই লোকটাই শুবাল (সবার চোখেই সে দেখল একধরনের তৃপ্তি, ক্যাপ্টেনও তা থেকে বাদ যান না), তবু সে ঠিকই শেষমেশ, আতঙ্ক নিয়েই, তা বুঝতে পারত স্টোকারকে দেখেই – তিনি নিজের বাড়িয়ে রাখা দুহাতের মাথায় মুঠি দুটো এমন শক্তি দিয়ে পাকিয়ে রেখেছেন যে মনে হচ্ছে এই মুঠি পাকানোই তার অস্তিত্বের সবচেয়ে মৌলিক বিষয়, এর জন্য তিনি তার শরীরের সবটুকু প্রাণশক্তিও বিসর্জন দিতে রাজি। তার পুরো শক্তি, এমনকি যেটুকু শক্তির বলে তিনি সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তা-ও সব কেন্দ্রীভূত তার দুই মুঠোয়।

তাহলে এই সেই শত্রু, তাকে তার জমকালো স্যুটে দেখাচ্ছে বেশ তাজা আর প্রাণচঞ্চল, তার বগলে একটা হিসাবের খাতা সম্ভবত, এটাতে আছে স্টোকারের কাজের ও মজুরির হিসাব; তিনি লজ্জাহীনভাবে এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন – সবগুলো মুখের দিকে পর পর তাকিয়ে – যে তার প্রথম লক্ষ্য এখানে উপস্থিত প্রতিটা মানুষের মেজাজ-মর্জি বোঝা। এমনিতেই এই সাত ভদ্রলোক নিশ্চয় আগে থেকেই তার বন্ধুমানুষ আর ক্যাপ্টেনের যদি তার ব্যাপারে আগে কিছুটা ভিন্নমত থেকেও থাকে – কিংবা তিনি হয়তো সেটার ভানই করেছিলেন শুধু – এখন স্টোকার তাকে এরকম জ্বালাতন করার

পর মনে হয় আর তিনি শুবালের মধ্যে সামান্য দোষও দেখছেন না। স্টোকারের মতো একজন মানুষের জন্য কোনো শাস্তিই যথেষ্ট কঠিন নয়; সে হিসেবে শুবালকে যদি আগে কোনো কারণে ভর্ৎসনা করা যায় তা হচ্ছে তিনি কেন এত দিনেও স্টোকারের অবাধ্যতাকে যথেষ্ট বশে আনতে পারেননি, যে কারণে আজ স্টোকার ক্যাপ্টেনের সামনে হাজির হওয়ারও সাহস দেখাতে পারল।

তা সত্ত্বেও এমন ভাবা অযৌক্তিক নয় যে স্টোকার আর শুবালের মধ্যেকার এই বিবাদ আরো উঁচু কোনো বিচারালয়ের মনে যে প্রতীতি জন্মাত, মানুষের মনেও ঠিক একই হবে; কারণ শুবাল ছদ্মবেশে নিজের ধূর্ততা যতই লুকিয়ে রাখুক না কেন, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে চিরকাল সে সেটাই করে যেতে পারবে। তার চারিত্রিক শয়তানির মাত্র একটা ঝলক এই ভদ্রলোকগুলোর সামনে সব সাফ-সাফ তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট; কার্ল দেখে ছাড়বে যেন তা-ই ঘটে। এরই মধ্যে সে এই মানুষগুলোর চাতুর্য, তাদের দুর্বলতা, তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মন-মেজাজ বিষয়ে একটা ধারণা পেয়েছে, সেদিক থেকে দেখলে এখানে যে-সময়টা সে এতক্ষণ ব্যয় করেছে তা একেবারে বৃথা যায়নি। শুধু যদি স্টোকার আরেকটু শক্তভাবে দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু মনে হচ্ছে উনি লড়াই পুরো ছেড়ে দিয়েছেন। যদি কেউ তার সামনে শুবালকে একটু ধরে রাখত, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে তার হাতের মুঠি দিয়েই শুবালের ঘৃণ্য মাথাটা ফেড়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু ঐ সামান্য কটা পা সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি সম্ভবত তার আর নেই। কেন তাহলে কার্ল আগে থেকেই দেখতে পেল না, যেটা কিনা সহজেই অনুমান করা সম্ভব ছিল – যে শুবাল শেষমেশ এখানে হাজির হবেই, নিজের ইচ্ছায় নাও যদি হয় তাহলে ক্যাপ্টেনের ডাকে? কেন সে এখানে একটা দরজা দেখে স্রেফ ঢুকে পড়ার বদলে (ঠিক যেটা তারা আসলেই করেছে একদম ক্ষমার অযোগ্য রকমের বিনা প্রস্তুতিতে) বরং আসার পথে স্টোকারের সঙ্গে যুদ্ধের একটা নিখুঁত পরিকল্পনা আলোচনা করে আসেনি? স্টোকার কি আদৌ কথা বলতে পারবেন, বলতে পারবেন হ্যাঁ বা না, যেমনটা তার বলা লাগবে জেরার মুখোমুখি পড়লে? সবকিছু ঠিকমতো চললে আশা করা যায় যে জেরা-পর্ব হবে। স্টোকার দাঁড়িয়ে থাকলেন ওখানে, পা দুটো ফাঁক করে, হাঁটু সামান্য নুইয়ে, মাথা অল্প তুলে, আর তার হাঁ-করা মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকছে ও বেরোচ্ছে যেন নিজের শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো ফুসফুস আর তার ভেতরে নেই।

অন্যদিকে কার্লের নিজেকে মনে হচ্ছে খুবই তেজিয়ান আর সজাগ, যেমনটা সম্ভবত কখনোই বাড়িতে মনে হয়নি তার। আহ্, শুধু যদি তার বাবা-মা তাকে দেখতে পারত এখন – একটা ভালো উদ্দেশ্যের জন্যে কোন বিদেশ-বিভুঁইয়ে, সম্মাননীয় সব লোকজনের সামনে এক লড়াইতে নেমেছে সে, যদিও এখনো বিজয়ী হয়নি, তবু চূড়ান্ত বিজয়ের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। তার ব্যাপারে তারা কি মন বদলাবেন না? তাদের দুজনের মাঝখানে তাকে বসিয়ে কি তার প্রশংসা করবেন না? একবার, শুধু কি একবার তার এই গভীর অনুরক্তিতে ভরা চোখের দিকে তাকাবেন না? কী অনিশ্চিত সব প্রশ্ন আর এগুলো জিজ্ঞাসা করার জন্য কী অনুপযুক্ত এক সময় !

'আমি এখানে এসেছি, কারণ আমার বিশ্বাস, স্টোকার আমাকে একধরনের অসততার দায়ে দোষী করছে। রান্নাঘরের এক মেয়ে আমাকে বলেছে সে স্টোকারকে এখানে আসতে দেখেছে। ক্যাপ্টেন, স্যার, এবং আপনারা অন্য ভদ্রমহোদয় যারা আছেন, আমি আমার কাগজপত্র দিয়ে তার প্রতিটা অভিযোগ খণ্ডন করতে তৈরি আছি, আর যদি দরকার হয়, তাহলে অনেক নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্ত সাক্ষীরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যারা তাদের বক্তব্য দেবে।' এই হচ্ছে শুবালের কথা। নিঃসন্দেহে স্বচ্ছ পুরুষোচিত বক্তব্য, আর শ্রোতাদের চেহারায় যে পরিবর্তন এল তা দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন দীর্ঘক্ষণের মধ্যে এই প্রথম কোনো মানুষের কথা শুনলেন। তাই আর আশ্চর্য কী যে তারা ধরতেই পারলেন না এই সুন্দর বক্তব্যের মধ্যেও যে আসলে কতটা ফাঁক আছে। কেন 'অসততা'কেই তার প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হিসেবে তুলে ধরলেন তিনি? তার জাতীয়তাসংক্রান্ত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী 'অসততা' বিষয়ে শুরু হয়েছিল, নাকি তা ছিল তার জাতীয়তাবিষয়ক কুসংস্কার নিয়ে? রান্নার ওখানের একটা মেয়ে স্টোকারকে এই অফিস আসতে দেখল আর তাতেই শুবাল সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললেন সবকিছু? তার এই বুঝে ফেলার পেছনে কি আসলে নিজের অপরাধবোধই কাজ করেনি? আর তিনি একেবারে সাক্ষীদের ধরে নিয়ে হাজির করালেন, উপরন্তু এটাও বলে ফেললেন যে তারা নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্ত? কী নির্লজ্জ নোংরা চালাকি, একদম নির্লজ্জ নোংরা চালাকি! আর এই ভদ্রলোকেরা তা সহ্য করে গেলেন, এমনকি এটা ওনারা সদাচরণ হিসেবে মেনেও নিলেন? কেন তিনি রান্নাঘরের মেয়েটার খবর দেওয়া আর তার এখানে আসার মধ্যে পরিষ্কার এতগুলো সময় ব্যয় হতে দিলেন? এর কি একটাই কারণ ছিল না যে স্টোকার এই ভদ্রলোকদের ধাপে ধাপে এতটাই ক্লান্ত করে ফেলুক, যেন তারা তাদের স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধির (ওটাতেই তো শুবালের সবচেয়ে ভয়) পুরোটাই খুইয়ে বসেন? তিনি তো দরজার ওপাশে নিঃসন্দেহে লম্বা সময় ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু টোকা কি স্রেফ তখনই দিলেন না যখন শুনলেন ঐ ভদ্রলোক একটা মামুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, মানে যখন তার মনে যথেষ্ট আশা জাগল যে স্টোকার ব্যাটা খতম?

সবই একদম পরিষ্কার, শুবাল না-বুঝেই সব পরিষ্কার করে দিয়েছেন সবার কাছে, কিন্তু ঐ ভদ্রলোকদের বোঝার সুবিধা করে দিতে সবকিছু একটু ভিন্ন ও আরো সাফ-সাফ তুলে ধরতে হবে ওনাদের সামনে। ওনাদের একেবারে নাড়িয়ে দিতে হবে। চলো তাহলে কার্ল, জলদি, সাক্ষীরা এসে পড়ার আর সবকিছু ডুবিয়ে দেওয়ার আগে তোমার হাতে যে কটা মিনিট আছে অন্তত তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করো।

কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তেই ক্যাপ্টেন হাত তুলে শুবালকে থামিয়ে দিলেন, তাতে করে শুবাল (যেহেতু তার বক্তব্য মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত করা হলো) চটজলদি পাশে সরে গেলেন আর বিড়বিড় করে আলাপ শুরু করলেন পরিচারকের সঙ্গে। পরিচারক শুরু থেকেই এঁটে আছে তার সঙ্গে। তাদের আলাপের মধ্যে তারা অনেকবার পাশে তাকাচ্ছেন স্টোকার ও কার্লের দিকে, আর খুবই জোরাল সব আকার-ইঙ্গিত করে যাচ্ছেন। শুবালকে

দেখে মনে হচ্ছে, তিনি তার পরবর্তী মহাভাষণের জন্য মহড়া দিচ্ছেন।

'মিস্টার জ্যাকব, আপনি কী যেন জানতে চাচ্ছিলেন এই কিশোর ছেলেটার কাছে?' চুপচাপ এমন সময়ে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন বাঁশের ছড়ি হাতে ভদ্রলোককে।

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' বললেন ঐ লোক, তাকে দেখানো সৌজন্যটুকুর উত্তরে একটু মাথা নোয়ালেন। তারপর আবার তিনি কার্লকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নামটা কী, জানতে পারি?'

কার্ল ভাবল এই মহা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটায় সবচেয়ে বড় অবদান রাখার সোজা পথ হচ্ছে তার এই একগুঁয়ে প্রশ্নকর্তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পথের থেকে সরিয়ে দেওয়া, তাই অতি সংক্ষেপে উত্তর দিল সে, এমনকি পাসপোর্ট দেখিয়ে (ওটা তাকে খুঁজে পাওয়ার ঝক্কি সামলাতে হতো) নিজের পরিচয় দেওয়ার রীতিও না মেনে: 'কার্ল রসমান।'

'সত্যি, তাই!' জ্যাকব নামের ভদ্রলোক বললেন, 'তারপর প্রথমে এক পা পেছালেন মুখে প্রায় অবিশ্বাসের এক হাসি নিয়ে। ক্যাপ্টেন, সেই সঙ্গে চিফ পার্সার, জাহাজের অফিসার, সত্যি বলতে এমনকি পরিচারকও—সবাই কার্লের নাম শুনে মহা বিস্ময়ের ভঙ্গি করলেন। একমাত্র বন্দর-কর্তৃপক্ষের অফিসার দুজন আর শুবাল কোনো বিকার দেখালেন না।

'সত্যি তাই!' মিস্টার জ্যাকব আবার বললেন আর কিছুটা শক্ত হয়ে হেঁটে কার্লের কাছে গেলেন, 'তাহলে আমি তো তোমার মামা জ্যাকব আর তুমি আমার প্রিয় ভাগনে। আমার একেবারে শুরু থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল!' ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে গিয়ে বললেন তিনি, তারপর কার্লকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন; নীরবে এর সবটা সহ্য করে গেল কার্ল।

'আর আপনার নামটা?' কার্ল জিগ্যেস করল আলিঙ্গন থেকে ফের ছাড়া পেয়ে, খুবই বিনয়ের সঙ্গে কিন্তু একটুও বিচলিত না হয়ে সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে ঘটনার এই নতুন মোড় স্টোকারের জন্য কী ফল বয়ে আনতে পারে তা অনুমান করার। তবে এ মুহূর্তে কোনোভাবেই মনে হচ্ছে না যে এর থেকে শুবাল কোনো লাভ ঘরে তুলতে পারবেন।

'ইয়ং ম্যান, মনে হচ্ছে তুমি তোমার সৌভাগ্যের বিষয়টা বুঝতে পারোনি,' ক্যাপ্টেন বললেন, তার বিশ্বাস কার্লের প্রশ্নটা মিস্টার জ্যাকবের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়েছে, কারণ এই ভদ্রলোক জানালার কাছে সরে গেছেন, এটা পরিষ্কার যে তিনি অন্যদের কাছ থেকে তার চেহারার অস্থিরতাটুকু লুকাতে চাচ্ছেন, মুখ হালকা চাপড় দিয়ে দিয়ে মুছছেন একটা রুমালে। 'তোমাকে যিনি তোমার মামা হিসেবে পরিচয় দিলেন, উনি সিনেটর এডওয়ার্ড জ্যাকব। সুতরাং তুমি যেমনটা আগে ভাবছিলে তার ঠিক উল্টো, এখন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে একটা উজ্জ্বল কর্মজীবন। এই কথাটা হঠাৎ এই ঘটনার চমকের মধ্যেও যদ্দুর পারো ভালোভাবে বুঝে নাও আর নিজেকে সংহত করো!'

'এটা সত্যি যে আমার আমেরিকায় জ্যাকব নামের এক মামা আছেন,' বলল কার্ল, ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে, 'কিন্তু যদি আমি ঠিকভাবে বুঝে থাকি, জ্যাকব হচ্ছে এই সিনেটরের স্রেফ বংশনাম।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' ক্যাপ্টেন বললেন, প্রত্যাশাভরা গলায়।

'কিন্তু আমার মামা জ্যাকব, যিনি আমার মায়ের ভাই, তার তো জ্যাকব হচ্ছে নামের প্রথম অংশ, আর তার বংশনাম তো হবে আমার মায়ের যা বংশনাম তা-ই; আমার মায়ের বিয়ের আগের পারিবারিক নাম ছিল বেন্ডেলমেয়ার।'

'জেন্টেলমেন!' কার্লের এই কথা শুনে জোরে বলে উঠলেন সিনেটর, জানালার পাশে নিজেকে সুস্থির করে তোলার এই বিরতির পরে তিনি এখন প্রফুল্ল। বন্দর-কর্তৃপক্ষের দুই অফিসার বাদে বাকি যারা আছেন সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন – কারো হাসি মনে হচ্ছে সহানুভূতির, কারোটা আবার দুর্বোধ্য।

'কিন্তু আমি তো এত হাস্যকর কিছু বলিনি,' ভাবল কার্ল।

'জেন্টেলমেন,' আবার বললেন সিনেটর, 'আপনারা আমার বা আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একটা ছোট পারিবারিক ব্যাপারে অংশ নিয়ে ফেলেছেন, আর তাই আমার আর ব্যাখ্যা না দিয়ে কোনো উপায় নেই, কারণ আমার মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন বাদে' – ক্যাপ্টেনের নাম বলতেই দুই জনের মধ্যে মাথা নোয়ানুয়ি বিনিময় হলো একচোট – 'আর কেউ পুরো পরিস্থিতিটা ধরতে পারছেন না।'

'এবার তো আমাকে প্রতিটা শব্দ মন দিয়ে শুনতে হয়,' কার্ল মনে মনে বলল; সে একটু আড়চোখে দেখে খুশি যে স্টোকারের মধ্যে আবার প্রাণ ফিরে আসা শুরু হয়েছে।

'এই যে এতগুলো বছর আমি আমেরিকায় সাময়িক ডেরা বেঁধেছি – যদিও সাময়িক কথাটা আমার মতো মনেপ্রাণে একজন আমেরিকার নাগরিকের জন্য ঠিকভাবে খাটে না – এই দীর্ঘ এতগুলো বছর আমি এখানে আছি আমার ইউরোপিয়ান আত্মীয়দের কাছ থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। তার কারণ যদি বলতে হয়, তাহলে প্রথম কথা হলো, এখানে তা বলাটা সমীচীন না আর দ্বিতীয়ত, ওগুলো বলা আমার জন্য সত্যি অনেক কষ্টের। আমার এমনকি ভাবতে ভয় হয় যে হয়তো আমার এই প্রিয় ভাগনেকে ওগুলো একসময় বলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না; আমার ভয়, তা করতে গেলে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে তার বাবা-মা আর তাদের ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে মুখ খুলে বসতে হবে।'

'উনি আমার মামা – কোনো সন্দেহ নেই', কার্ল মনে মনে বলল, কান খাড়া করে শুনছে সে, 'খুব সম্ভব উনি নিজের নাম বদলেছেন।'

'আমার প্রিয় এই ভাগনেকে – কোদালকে কোদাল বলতে আমাদের কোনো ইতস্তত করা উচিত না – তার বাবা-মা স্রেফ বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, ঠিক যেভাবে কেউ কোনো দুষ্টু বিড়ালকে ঘর থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। আমার ভাগনে কী করেছে যে তাকে এত বড় শাস্তি পেতে হলো, সেটা আড়াল করার আমার কোনোভাবেই কোনো ইচ্ছা নেই, আর আমেরিকায় কোনোকিছু আড়াল করার সংস্কৃতিও নেই, কিন্তু তার অপরাধটা এমনই যে স্রেফ ওটার নাম উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট ক্ষমা এমনিতেই হয়ে যায়।'

'বাহ্, খারাপ বলেননি তো উনি,' ভাবল কার্ল, 'কিন্তু তাই বলে উনি সবাইকে সবটা বলে দেন সেটাও চাচ্ছি না। তবে এমনিতেই ওনার সব জানা সম্ভবও নয়। কোত্থেকে জানবেন?'

'ঘটনা হচ্ছে,' বলতে লাগলেন তার মামা, বাঁশের ছড়িটা সামনে মেঝেতে পুঁতে ওতে ভর দিয়ে মাঝেমধ্যে হালকা সামনের দিকে নুয়ে নুয়ে (পুরো আলোচনাটা নিশ্চিত একটা অকারণ গাম্ভীর্য পেয়ে যেত, কিন্তু এমনটা করে তিনি সেটা এড়াতে সক্ষম হলেন), 'ঘটনা হচ্ছে একটা কাজের মেয়ে ওকে কুকর্মে প্রলুব্ধ করেছিল, ইয়োহান্না ব্রামার নাম ওই মেয়ের, পঁয়ত্রিশের মতো বয়স হবে। "কুকর্মে প্রলুব্ধ হওয়া" কথাটা ব্যবহার করে আমি কিন্তু কোনোভাবেই আমার ভাগনেকে অসম্মান করতে চাচ্ছি না, কিন্তু অন্য কোনো একই রকম উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন।'

কার্ল এরই মধ্যে তার মামার বেশ কাছে চলে এসেছে, এ সময়ে সে এই গল্প শুনে অন্যদের প্রতিক্রিয়া কী হলো তা এখানে উপস্থিত সবার মুখ দেখে আঁচ করার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কেউই হাসছে না, সবাই শুনছে ধৈর্য ধরে আর গভীর মনোযোগে। আর যা-ই হোক একজন সিনেটরের ভাগনেকে নিয়ে তো আর সুযোগ-পেলাম-আর-হেসে-ফেললাম এমনটা হয় না। খুব বেশি হলে স্টোকার হয়তো কার্লকে নিয়ে একটু হাসছে, যদিও খুব মৃদুভাবে; তা যদি হয়ও তা তো ভালোই, তার মানে ওনার মধ্যে জীবন ফিরে আসছে, আর দ্বিতীয় কথা হলো, ওনার হাসি ক্ষমাও করা যায়, কারণ নিচে ওনার কেবিনে কার্ল ঠিক এই গল্পটাই লুকাতে চাইছিল, যা এখন এভাবে সবার সামনে কীভাবে খোলাসা হয়ে গেল।

'এখন কী হয়েছে, এই ব্রামার মেয়েটার,' কার্লের মামা বলতে লাগলেন, 'কার্লের ঔরসে একটা সন্তান হলো, এক স্বাস্থ্যবান পুত্রসন্তান, যাকে ব্যাপ্‌টাইজ করা হলো জ্যাকব নাম দিয়ে, বোঝাই যাচ্ছে আমার, মানে এই অধমের নামটা মাথায় রেখে; আমার ভাগনে নিশ্চয় তাকে আমার কথা এমনিই গল্প-টল্পে বলেছিল কিন্তু মেয়েটার মধ্যে সেটাই হয়তো গভীর ছাপ ফেলেছিল আমার ব্যাপারে। আমাকে বলতেই হবে, ভাগ্য ভালো যে এমনটা হয়েছিল। কারণ বাচ্চা ও মায়ের খোরপোশ কিংবা আর কোনো পারিবারিক কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্য যখন ছেলের বাবা-মা – এখানে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে ওই দেশে এসব বিষয়ে কী আইন কিংবা ছেলের বাবা-মার অন্য আর অবস্থা কেমন সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই – তাদের ছেলেকে, মানে আমার ভাগনেকে, আমেরিকার জাহাজে তুলে দিলেন, ছেলের থাকা-খাওয়া ভরণ-পোষণের সামান্য কোনো ব্যবস্থা না করেই তারা করলেন সেটা, যা আপনারা পরিষ্কার দেখতেই পাচ্ছেন; তার মানে এই কিশোর বালক শিগগিরই, তার নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে গিয়ে খুবই সম্ভব যে হয়তো নিউ ইয়র্ক জাহাজঘাটার কোনো অলিগলিতে লজ্জাকর এক নিয়তিকে মেনে নিত (যদিও অন্তত আমেরিকায় যে এখনো অলৌকিক ঘটনাও ঘটে, তা আমি অস্বীকার করছি না), যদি না ঐ কাজের মেয়েটা আমাকে একটা চিঠি পাঠাত, যে চিঠি লম্বা পথ ঘুরে আমার হাতে এসেছে মাত্র গত পরশু, সেখানে মেয়েটা পুরো গল্প লিখে জানিয়েছে আমাকে, সেই সঙ্গে আমার ভাগনের বিষয়ে একটা বিবরণও দিয়ে পাঠিয়েছে আর বেশ বুদ্ধি করে

জাহাজের নামও লিখে জানিয়েছে। জেন্টেলমেন, আপনাদের যদি মজা দেওয়ার আমার ইচ্ছা থাকত তাহলে ঐ চিঠি থেকে একটা বা দুটো অংশ জোরে পড়লেই চলত' – তিনি এ সময়ে পকেট থেকে দুটো বিশাল বড়, ঘন হাতে লেখা নোট বইয়ের পাতা বের করলেন আর ওগুলো দেখালেন – 'নিঃসন্দেহে লেখাটা আপনাদের মন কেড়ে নিত, বেশ সাধারণ কিন্তু সৎ একধরনের চাতুরীর সঙ্গে ওটা লেখা, আর বাচ্চার বাবার জন্য অনেক ভালোবাসায় ভর্তি। কিন্তু আপনাদের গল্পটা বোঝানোর জন্য যতটুকু নিতান্ত দরকার তার চেয়ে বেশি কাউকে মজা দিতে চাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে নেই, কিংবা আমার সঙ্গে এই প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তে আমার ভাগনের এমন কোনো অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাই না আমি, যা খুব সম্ভব সে এখনো নিজের ভেতরে লালন করছে; সে যদি চায় তো চিঠিটা সে এখনই মন ভালো করার জন্য নিজের কামরায় গিয়ে চুপচাপ পড়তে পারে, কামরা তার জন্য তৈরিই আছে।

কিন্তু কার্লের ঐ মেয়ের জন্য কোনো টান নেই। অবিরাম পেছনে সরতে থাকা এক অতীতের ভিড়ে ভরা মুখগুলোর মধ্যে ঐ সে বসে আছে ওখানটায় তার রান্নাঘরের বাসনকোসন রাখার আলমারির পাশে, তার কনুই দুটো মার্বেলের স্ল্যাবের উপরে রেখে। যখনই সে রান্নাঘরে আসবে বাবার জন্য এক গ্লাস পানি নিতে কিংবা মায়ের কোনো নির্দেশ তাকে জানাতে, তখনই মেয়েটা তাকাবে তার দিকে। কখনো দেখা যাবে সে চিঠি লিখছে আলমারিটার ওমাথায় তার বেঢপ আসনে বসে, আর কার্লের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রেরণা নিচ্ছে ওটা লেখার। কখনো চোখের উপরে একটা হাত রাখা থাকবে তার, তখন আর তার কাছে কোনো শুভেচ্ছা-সম্ভাষণ পৌঁছানো যাবে না। কখনো সে রান্নাঘরের পাশে তার ছোট কামরায় দেখা যাবে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, একটা কাঠের ক্রসের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছে; কার্ল তখন ওই ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে হালকা খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখবে লাজুক ভঙ্গিতে। কখনো রান্নাঘরে ছুটোছুটি করে বেড়াবে সে, আর যদি কার্ল গিয়ে তার পথের ওপরে পড়ে, তাহলে ডাকিনী মেয়েদের মতো হাসতে হাসতে লজ্জায় পিছিয়ে যাবে সে। কখনো কার্ল ভেতরে ঢোকার পরে সে বন্ধ করে দেবে রান্নাঘরের দরজা, আর যতক্ষণ না কার্ল বাইরে যেতে দেওয়ার জন্য কাতর মিনতি করছে, ততক্ষণ দরজার হাতল আঁকড়ে ধরে থাকবে। কখনো সে এমন জিনিস এনে দেবে যা কার্ল মোটেই চায়নি তার কাছে আর নীরবে ওগুলো গুঁজে দেবে কার্লের হাতের মুঠোয়। কিন্তু একদিন সে তাকে ডাকল 'কার্ল' বলে, আর তাকে (তখনো সে এই অপ্রত্যাশিত ঘনিষ্ঠতার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারেনি) অনেক মুখ ভেংচিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে নিয়ে গেল তার ছোট ঘরটায়, উদ্যত হলো ওটার দরজা তালা দিতে। দুই বাহু দিয়ে কার্লের গলা পেঁচিয়ে ধরল সে, প্রায় দম বন্ধ করে দিচ্ছিল তার, আর কার্লকে তার কাপড় খুলে দেয়ার মিনতি জানাতে জানাতে সে আসলে কার্লেরই কাপড়চোপড় খুলে নিল আর তাকে এমনভাবে শোয়ালো তার বিছানায় যে মনে হলো সে কার্লকে আর কোনো দিনও চলে যেতে দিতে চায় না, চায় যে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তাকে সে আদর দিয়ে বুকে পুষে রাখবে। 'ওহ্

কার্ল, ওহ্ কার্ল আমার!' সে চিৎকার করতে লাগল, তার দিকে তাকাল এমনভাবে যে সে যেন নিশ্চিত করতে চাচ্ছে কার্ল তারই, কার্ল তখন দেখতে পারছে না কোনোকিছুই, তার শুধু ওই অতগুলো উষ্ণ বিছানার চাদর-টাদরে (মেয়েটা যেগুলো কার্লের সুবিধার জন্যই মনে হয় উঁচু গাদা করে রেখেছিল) অস্বস্তিই লাগছিল বরং। তারপর সে শুলো কার্লের পাশে, চেষ্টা করল কার্লের কাছ থেকে কিছু গোপন কথা বের করতে, কিন্তু কার্ল তাকে কোনো গোপন কিছুই বলতে পারল না, এতে সে অসন্তুষ্ট হলো খানিকটা, হয় ঢং করে, নয়তো সত্যি সত্যিই। সে ঝাঁকাল কার্লকে, তার হৃৎস্পন্দন শুনল, তার স্তন দুটো সে কার্লকে দিল একই কাজ করার জন্য, কিন্তু কার্লকে রাজি করানো গেল না তাতে; সে তার নগ্ন পেট চেপে ধরল কার্লের গায়ে, কার্লের দুই পায়ের মাঝখানে হাত দিয়ে হাতড়াতে লাগল (এটাতে কার্লের এমন ঘেন্না হলো যে সে বালিশ থেকে তার মাথা ও ঘাড় ঝাঁকিয়ে তুলে ফেলল), তারপর মেয়েটা তার পেট দিয়ে কার্লকে ধাক্কা দিল বেশ কয়েকবার; কার্লের মনে হলো মেয়েটা তার শরীরেরই একটা অংশ, আর হয়তো সে কারণেই সে পরাভূত হলো নৈরাশ্যের এক ভয়ংকর অনুভূতির কাছে। শেষমেশ কার্ল কাঁদতে কাঁদতে পৌঁছাল নিজের বিছানায়, মেয়েটা তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করল যেন সে আবার আসে। পুরো ঘটনা স্রেফ এটুকুই, আর তার মামা এটাকে কী বিরাট এক কেচ্ছা বানিয়ে ছেড়েছেন। আচ্ছা তাহলে মেয়েটা তার কথাও মনে করেছে আর এখানে তার পৌঁছানোর কথা তার মামাকে জানিয়েছে। মন বড় আছে তো মেয়েটার; কার্ল আশা করছে তার এই ঋণ একদিন সে শোধ করতে পারবে।

'তাহলে এখন,' জোরে বললেন সিনেটর, 'আমি তোমার কাছ থেকে পরিষ্কার শুনতে চাই আমি কি তোমার মামা, নাকি না?'

'আপনি আমার মামা,' বলল কার্ল, ওনার হাতে চুমু খেল, উত্তরে নিজের কপালে একটা চুমু পেল সে। 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি অনেক খুশি, কিন্তু এটা আপনার ভুল ভাবনা যে আমার বাবা-মা শুধু আপনার বদনামই করেন। ওটা যদি বাদও দেন, তবু আপনার বক্তব্যে বেশ কিছু ভুল ছিল, তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি যেমনটা বললেন, বাস্তবে সব আসলে তেমন ঘটেনি। তবে এটাও সত্যি, এত দূর থেকে কোনোকিছুর বিচার করা খুব কঠিন আর আমার ধারণা এমন কোনো বিষয়ে যাতে এখানে উপস্থিত ভদ্রলোকদের এমনিতেই কোনো বিশেষ আগ্রহ থাকার কথা নয়, সে রকম কোনো বিষয়ের খুঁটিনাটি যদি ঠিকভাবে বলা না-ও হয়, তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি নেই।'

'খুবই ভালো বলেছ,' সিনেটর বললেন, কার্লকে নিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেনের কাছে, ক্যাপ্টেন দেখেই মনে হচ্ছে কার্লের প্রতি সমব্যথী। তারপর জিগ্যেস করলেন: 'কি, আমার ভাগনে কী চমৎকার না?'

'আমি খুশি,' বললেন ক্যাপ্টেন, এমনভাবে মাথা নোয়ালেন যা কেবল সামরিক প্রশিক্ষণ পাওয়া লোকদের পক্ষেই করা সম্ভব, 'যে আপনার ভাগনের সঙ্গে পরিচয় হলো, মিস্টার সিনেটর। আমার জাহাজের জন্য এটা বিশেষ সম্মানের যে আপনাদের সাক্ষাৎ

আমাদের জাহাজেই হলো। কিন্তু জাহাজের সবচেয়ে নিচের ক্লাসে এই এত বড় সমুদ্রযাত্রা এক অগ্নিপরীক্ষা বটে; তবে আমরা জানবই বা কী করে যে নিচে ওখানে কারা আছে? কোনো সন্দেহ নেই ওই ক্লাসের যাত্রীদের ভ্রমণটা যেন যদ্দুর সম্ভব সহনীয় হয় তার সব চেষ্টাই আমরা করি, আমেরিকান শিপিং কোম্পানিগুলোর থেকে অনেক বেশি তো বটেই, তবু আমাকে স্বীকার করতেই হবে তাদের এই ভ্রমণকে আমরা এখনো আনন্দের করে তুলতে পারিনি।'

'আমার কোনো ক্ষতি হয়নি এতে,' বলল কার্ল।

'আমার কোনো ক্ষতি হয়নি এতে!' সিনেটর একই কথা বললেন জোরে হাসতে হাসতে।

'শুধু আমার ভয় যে আমি মনে হয় আমার ট্রাংক হারিয়ে – ' আর এই সঙ্গেই সবকিছু ফিরে এল কার্লের মাথায়, যা যা ঘটেছে আর যা যা আরো করা বাকি – সব। সে তার চারপাশে তাকাল, দেখল তারা সবাই তার দিকে স্থির তাকিয়ে তাদের যার যার আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ের ধাক্কায় বোবা হয়ে। শুধু বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসার দুজন, অন্তত তাদের কঠিন ও আত্মতুষ্ট চেহারা দেখে যেটুকু বোঝা গেল, আক্ষেপ করছেন এরকম একটা অসময়ে এসে হাজির হওয়ার জন্য; আর যা-কিছু চলছে কিংবা আরো যা-কিছু ঘটতে পারে – ঐ সবের চেয়ে মনে হচ্ছে তাদের কাছে অনেক বেশি অর্থ বহন করে এখন টেবিলের উপরে রাখা তাদের পকেটঘড়িটা।

মজার ব্যাপার যে ক্যাপ্টেনের পরে প্রথম যে মানুষটা কার্লকে নিজের সহানুভূতির কথা জানালেন, তিনি স্টোকার। 'মন থেকে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি,' বললেন তিনি আর কার্লের হাত ধরে ঝাঁকালেন, এটা করতে গিয়ে চেষ্টা করলেন কৃতজ্ঞতা-জাতীয় কিছু একটা প্রকাশ করারও। তারপর যখন তিনি সিনেটরের দিকে ঘুরলেন একই কথা বলতে আর একই কাজ করতে, সিনেটর এমনভাবে এক পা পিছিয়ে গেলেন যেন স্টোকার তার সীমা অতিক্রম করে ফেলছেন; সঙ্গে সঙ্গে স্টোকার নিবৃত্ত করলেন নিজেকে।

কিন্তু অন্যরা এবার বুঝতে পারল কী তাদের করা উচিত, তারা দেরি না করেই কার্ল আর সিনেটরকে ঘিরে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে গেলেন সবাই। ফলে এটাও ঘটল যে কার্ল এমনকি শুবালের কাছ থেকেও শুভেচ্ছাবাক্য পেল, সে তা গ্রহণ করল এবং তাকে ধন্যবাদ জানাল। সবকিছু ফের শান্ত হওয়ার পরে সবার শেষে এলেন বন্দর কর্তৃপক্ষের ঐ দুজন, তারা ইংরেজিতে দুটো শব্দ বললেন, তাতে বেশ একটা হাসি-তামাশার জোগাড় হলো।

সিনেটর এখন এই আনন্দজনক ঘটনাটা পুরোপুরি উপভোগ করার মেজাজে আছেন, তিনি তার নিজের ও অন্যদের সুবিধার্থে কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ের কথা স্মরণ করতে লাগলেন; কোনো সন্দেহ নেই, সবাই সেগুলো স্রেফ বরদাস্তই করলেন না, আগ্রহভরে শুনতেও লাগলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি সবার মনোযোগ কাড়লেন এটা বলে যে তিনি কার্লকে চেনার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্নগুলো (যেগুলোর কথা মেয়েটা তার চিঠিতে লিখেছে) তার নোট বইতে টুকে রেখেছিলেন, যাতে করে দরকার পড়লে তক্ষুনি সেগুলো দেখে নিতে পারেন। তারপর স্টোকার যখন তার বাকসর্বস্ব বক্তৃতা দিয়ে চলছিল

তিনি তখন স্রেফ কিছু একটা করতে হবে, তাই নোট বইটা বের করে মজা করার জন্যই কার্লের চেহারার সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন মেয়েটার বর্ণনার – গোয়েন্দার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেগুলো নিশ্চিতভাবেই খুব কাজের কিছু ছিল না। 'নিজের ভাগনেকে তাহলে এভাবেই খুঁজে পেতে হয়!' সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি, এমন একটা স্বরে কথাটা বললেন যে তিনি চাইছেন আবার একবার সবাই তাকে অভিনন্দন জানাক।

'এখন স্টোকারের কী হবে?' কার্ল তার মামার শেষ কথাটা উপেক্ষা করে জানতে চাইল। তার এই নতুন অবস্থায় তার মনে হলো মাথায় যা আসে সেটাই সে বলে ফেললেও কোনো অসুবিধা নেই।

'স্টোকার তার যা প্রাপ্য তা-ই পাবে,' সিনেটর বললেন, 'ক্যাপ্টেন যেটা ঠিক মনে করেন। তা ছাড়া আমার মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্টরও বেশি হয়েছে এই স্টোকারকে নিয়ে, আর আমি নিশ্চিত, এখানে উপস্থিত প্রত্যেক ভদ্রলোকই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।'

'কিন্তু যখন প্রশ্নটা ন্যায়বিচারের তখন তো তা বললে হবে না,' বলল কার্ল। সে দাঁড়িয়ে আছে তার মামা এবং ক্যাপ্টেনের মাঝখানে আর তার মনে হচ্ছে, সম্ভবত এ জায়গায় দাঁড়ানোর কারণেই, যে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এখন তারই হাতে।

তবে স্টোকারকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তার হাত দুটো তিনি অর্ধেক গুঁজে রেখেছেন ট্রাউজারের বেল্টের মধ্যে, তার উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গির কারণে বেল্টটা আর সেই সঙ্গে তার নকশা-করা শার্টের একটুখানি এখন বেরিয়ে এসেছে। এটা নিয়ে তার সামান্য মাথাব্যথাও নেই; এখন যেহেতু তার দুঃখের সব কথা উগরে দেওয়া শেষ, তারা সবাই তার শরীরে ঝুলে থাকা ক'টা ছেঁড়া কাপড়চোপড় দেখলেই পারেন, তারপর তারা তাকে তুলে নিয়ে গেলেও পারেন। তিনি কল্পনা করলেন যে এখানে উপস্থিত সবার মধ্যে সবচেয়ে নিচু পদের লোক হিসেবে পরিচারক ও শুবালের কাঁধেই পড়বে তার প্রতি এই শেষ দায়টুকু দেখানোর দায়িত্ব। এরপরে কী শান্তিই না মিলবে শুবালের, কেউ আর তার মাথা বিগড়ে দেবে না, যেমনটা বলেছিলেন চিফ পার্সার। ক্যাপ্টেনের তখন জাহাজে শুধু রুমানিয়ানদের নিতে কোনো বাধা থাকবে না, সবখানে শুধু রুমানিয়ান ভাষাতেই কথা বলা হবে, হতে পারে ওভাবে সবকিছু সত্যিই আরো ভালো চলবে। পার্সারের অফিসে আর কোনো স্টোকারকে শোনা যাবে না উচ্চ স্বরে বক্তৃতা করছে, শুধু তার এই শেষ বাকসর্বস্ব বক্তৃতাটুকু মানুষ দয়া করে মনে রাখবে, যেহেতু সিনেটর পরিষ্কার বলেছেন যে ওই বক্তৃতাই ছিল তার ভাগনেকে চিনতে পারার পেছনে পরোক্ষ কারণ। এই ভাগনে অবশ্য এমনিতেই আগে বেশ কবার চেষ্টা করেছে তাকে সাহায্য করতে, অতএব মামা-ভাগনের পরিচয় হওয়ার পেছনে তার যে অবদান, সেটার পুরস্কার তার অনেক আগেই পুরোপুরি পাওয়া হয়ে গেছে; কার্লের কাছ থেকে আর বেশি কিছু চাওয়ার কোনো কথা স্টোকারের এখন এমনকি মাথাতেই নেই। তা ছাড়া, সে যদি কোনো সিনেটরের ভাগনেও হয়, তবু সে তো আর এই জাহাজের ক্যাপ্টেন নয়; আর বলা বাহুল্য, ক্যাপ্টেনের মুখ থেকেই তো আসবে সেই ভয়ংকর রায়। – তার চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই স্টোকার

সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন কার্লের দিকে তাকানোটা এড়ানোর, যদিও শত্রুতে ভরা এই কামরাটায় দুর্ভাগ্যক্রমে চোখ দুটো বিশ্রাম দেওয়ার মতো অন্য আর কোনো জায়গা নেই।

'পরিস্থিতিটাকে ভুল বুঝো না,' সিনেটর কার্লকে বললেন, 'হতে পারে বিষয়টা ন্যায়বিচারের, কিন্তু একই সঙ্গে এটা শৃঙ্খলারও বিষয়। আর জাহাজে ক্যাপ্টেনকেই নিষ্পত্তি করতে হয় দুটো বিষয়েরই, বিশেষ করে শেষেরটার।'

'তা ঠিক,' বিড়বিড় করে বললেন স্টোকার। যারা এটা শুনতে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন, তারা মৃদু হাসলেন অস্বস্তি নিয়ে।

'আমরা কিন্তু এরই মধ্যে ক্যাপ্টেনকে তার অফিশিয়াল কাজে অনেক বেশি সময় ধরে বাধা দিয়ে ফেলেছি, নিউ ইয়র্কে জাহাজ মাত্র পৌঁছেছে, কোনো সন্দেহ নেই বিশাল কাজের স্তূপ জমে আছে ওনার, তাই আসলে আমাদের এক্ষুনি জাহাজ ছেড়ে যাওয়া উচিত, কোনো দরকার নেই দুই ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যেকার এই অতি তুচ্ছ বিষয়ের বিরাট ঝগড়াটায় একদম অদরকারি নাক গলিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বানিয়ে ফেলার আর সবকিছু আরো খারাপ করার। প্রিয় ভাগনে আমার, তোমার আচরণের ধরনটা আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, আর ঠিক সে কারণেই আমার অধিকার আছে তোমাকে এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে যাওয়ার।'

'আপনার জন্য আমি এক্ষুনি একটা নৌকা নামিয়ে দিতে বলছি,' বললেন ক্যাপ্টেন, একবারও (এটা খুবই অবাক করল কার্লকে) সামান্য কোনো আপত্তি জানালেন না তার মামার কথাগুলোতে, যদিও ওগুলোকে নিজের মর্যাদা নিজে হারানোর পরিষ্কার উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। চিফ পার্সার ছুটে গেলেন তার ডেস্কে আর টেলিফোনে সারেংকে জানালেন ক্যাপ্টেনের আদেশ।

'সময় খুব জলদি চলে যাচ্ছে,' মনে মনে বলল কার্ল, 'কিন্তু সবার মনে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। আমি তো সত্যি এখন আমার মামাকে ছেড়ে যেতে পারি না, মাত্র উনি আমাকে খুঁজে পেয়েছেন। ক্যাপ্টেন নিঃসন্দেহে মার্জিত ভদ্রলোক, কিন্তু ওটা ঐ পর্যন্তই। যখন বিষয়টা শৃঙ্খলা নিয়ে কিছু, ওনার ঐ মার্জিত আচরণ তখন হাওয়া হয়ে যাবে; আমি নিশ্চিত, আমার মামা ক্যাপ্টেনের একেবারে মনের কথাটাই বলছিলেন। শুবালের সঙ্গে আমি কথা বলতে যাচ্ছি না; আমার বরং আক্ষেপ যে তার সঙ্গে আমি হাত মিলিয়েছি আর এখানে উপস্থিত অন্যরা তো স্রেফ গোনার মধ্যেই পড়ে না।'

মনের মধ্যে এসব ভাবতে ভাবতেই কার্ল ধীরে স্টোকারের ওখানটায় গেল, তার ডান হাত বেল্ট থেকে টেনে বের করে নিজের হাতে রাখল, যেন হালকাভাবে ওজন নিচ্ছে ওটার। 'কিছু বলছেন না কেন আপনি?' জিজ্ঞাসা করল সে। 'পড়ে পড়ে সব সহ্য করে যাচ্ছেন কেন?'

স্টোকার শুধু তার ভুরু কোঁচকালেন, মনে হচ্ছে তিনি মনের কথা বলার কোনো পথ খুঁজছেন। তিনি মাথা নিচু করে তাকালেন কার্লের এবং তার হাতের দিকে।

'আপনার ওপর অন্যায় করা হয়েছে, এই জাহাজের অন্য যে-কারো ওপরে এতটা

হয়নি; এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।' কার্ল তার আঙুলগুলো স্টোকারের আঙুলের মধ্যে দিয়ে সামনে-পেছনে করতে লাগল। স্টোকার চকচক করতে থাকা চোখে চারপাশে তাকালেন; মনে হচ্ছে, তিনি উপভোগ করছেন কোনো পরম সুখ যেটা নিয়ে কারোরই উচিত না তার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়ার।

'কিন্তু আপনাকে তো আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে, হ্যাঁ বা না, একটা তো বলতে হবে, নতুবা মানুষ সত্য জানবে কী করে? আমি যেভাবে বলছি আপনি শপথ করেন যে তেমনটা করবেন, কারণ আমার অনেক ভয় হচ্ছে, সংগত কারণেই ভয় হচ্ছে যে আমি আর নিজে আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।' আর এবার কার্ল স্টোকারের হাতে চুমু খাওয়ার সময় ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে দিল, সে ওই ভাঁজ-পড়া ও প্রায় প্রাণহীন হাতটা নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরল তেমন কোনো এক সম্পদের মতো, যার মালিকানা এবার ছেড়ে দিতে হবে। – কিন্তু এরই মধ্যে তার সিনেটর মামা তার পাশে চলে এসেছেন, কার্লকে সরিয়ে নিয়েছেন তিনি, অতি সামান্যই জোর করতে হয়েছে তাকে।

'স্টোকার তো মনে হয় তোমাকে জাদু করে ফেলেছে,' তিনি বললেন, আর কার্লের মাথার উপর দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে গভীর বোঝাবুঝির একটা দৃষ্টিতে তাকালেন। 'তোমার নিঃসঙ্গ লাগছিল, তুমি স্টোকারকে সঙ্গী হিসেবে পেলে, আর এখন তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ; এর সবকিছুই তোমার গুণের কথা। কিন্তু এসব জিনিস অন্তত আমার কথা ভেবে হলেও বেশি দূর নিতে নেই; আর তোমাকে তো তোমার অবস্থানটাও বোঝার চেষ্টা করতে হবে।'

দরজার বাইরে একটা হাঙ্গামা শোনা গেল; চিৎকার কানে আসছে, এমনকি শুনতে মনে হচ্ছে কাউকে নিষ্ঠুরভাবে দরজার উপর ঠেসে ধরা হয়েছে। একজন নাবিক কিছুটা আলুথালু অবস্থায় ভেতরে ঢুকল, তার কোমরে একটা মেয়েদের অ্যাপ্রন বাঁধা। 'বাইরে একগাদা মানুষ জড়ো হয়েছে,' সে চিৎকার দিয়ে উঠল, তার কনুই দিয়ে গুঁতো মারার ভঙ্গি করছে, যেন এখনো তাকে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কিয়ে চলতে হচ্ছে। অবশেষে সে সুস্থির হলো, ক্যাপ্টেনকে এবার স্যালুট দিতে যাবে তখন তার চোখে পড়ল অ্যাপ্রনটা, টেনে সে ছিঁড়ে ফেলল ওটা, ছুড়ে মারল মেঝেতে আর চিৎকার দিয়ে বলল: 'কী জঘন্য কাজ, তারা আমাকে মেয়েদের অ্যাপ্রন পরিয়ে দিয়েছে।' কিন্তু এরপর সে আওয়াজ তুলল গোড়ালিতে আর স্যালুট ঠুকল। কে যেন হেসে ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু ক্যাপ্টেন কঠোরভাবে বললেন: 'সবাই খুব চাঙা দেখছি। বাইরে এসব লোকজন কারা?'

'ওরা সব আমার সাক্ষী,' সামনে এগিয়ে এসে বললেন শুবাল, 'আমি ওদের বদ আচরণের জন্য বিনয়ের সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। সমুদ্রযাত্রা শেষ হলে যা হয়, ক্রুরা সব কখনো কখনো একটু মাথা-খারাপ মতো হয়ে ওঠে।'

'সবগুলোকে এক্ষুনি ভেতরে ডাকো!' ক্যাপ্টেন আদেশ দিলেন, আর তারপর সঙ্গে সঙ্গে সিনেটরের দিকে ঘুরে বিনয়ের স্বরে কিন্তু তড়বড় করে বললেন: 'আপনাকে কি মিস্টার সিনেটর আমি সম্মানের সঙ্গে বলতে পারি যে দয়া করে আপনার ভাগনেকে নিয়ে এই নাবিকের সঙ্গে যাবেন? ও আপনাদের নৌকার কাছে নিয়ে যাবে। আমার বলার

কোনো দরকারই থাকে না যে, মিস্টার সিনেটর, আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এই পরিচয় হওয়াতে আমি কত খুশি আর নিজেকে কত সম্মানিত বোধ করছি। আমার এখন শুধু এটাই আশা যে আপনার সঙ্গে শিগগির আবার ঐ আমেরিকান জাহাজের অবস্থা নিয়ে আমাদের মাঝপথে থেমে যাওয়া আলোচনাটা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ মিলবে, আর হতে পারে আজকের মতো এরকম আনন্দের সঙ্গেই আমাদের আলোচনা সেদিনও থেমে যাবে ফের একবার।'

'আপাতত এই একটা ভাগনেই যথেষ্ট,' হাসতে হাসতে বললেন কার্লের মামা। এখন অনুগ্রহ করে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নিন; বিদায়। এমনটা কোনোভাবেই অসম্ভব না যে আমরা, আমাদের এর পরের বারের ইউরোপ যাত্রায়' – তিনি কার্লকে উষ্ণভাবে জড়িয়ে ধরলেন – 'আপনার সঙ্গে আরো একটু বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পাব।'

'আমি তাতে অনেক খুশি হব,' বললেন ক্যাপ্টেন। দুই ভদ্রলোক হাত মেলালেন; কার্ল স্রেফ নীরবে চটজলদি ক্যাপ্টেনের দিকে একটু বাড়াতে পারল তার হাত, কারণ ক্যাপ্টেন ইতোমধ্যে ব্যস্ত হয়ে গেছেন জন পনেরো মানুষ নিয়ে, যারা বানের তোড়ের মতো এই কামরায় ঢুকছে শুবালের নেতৃত্বে, ওদের চোখে সামান্য ভীতির চিহ্ন কিন্তু ঠিকই এখনো অনেক হইচই করে যাচ্ছে। নাবিক সিনেটরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইল, তারপর ভিড়ের মাঝখান দিয়ে পথ বের করে দিল তার ও কার্লের জন্য, তাদের কোনো কষ্টই হলো না মাথা-নোয়ানো সারিগুলির মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে। মনে হচ্ছে যে এই মানুষেরা, যারা আসলেই একদল সরল হাস্যকৌতুকে ভরা লোক, শুবালের সঙ্গে স্টোকারের ঝগড়াকে একটা ঠাট্টা হিসেবে নিয়েছে, এমনকি ক্যাপ্টেনের সামনে এসেও তারা তাদের সেই মজা করা থামাতে পারছে না। এদের মধ্যে কার্লের চোখে পড়ল লাইন নামের সেই রান্নাঘরের মেয়েকেও, সে কার্লের দিকে একবার বা দুবার উচ্ছ্বসিত চোখ টিপে নাবিকের মেঝেতে ছুড়ে দেওয়া অ্যাপ্রনটা বেঁধে গায়ে পরতে লাগল, কারণ ওটা তার।

তখনো তারা হাঁটছেন নাবিকের পেছন পেছন, অফিস থেকে বের হয়ে একটা ছোট গ্যাংওয়ে দিয়ে গিয়ে আর কয়েক পা হাঁটার পর তারা এসে হাজির হলেন একটা ছোট দরজার সামনে, ওটা থেকে একটা ছোট সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে তাদের জন্য তৈরি রাখা নৌকায়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া নাবিক একটামাত্র লাফেই গিয়ে উঠল নৌকাটায়, ওটার নাবিকেরা সব উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল। সিনেটর কার্লকে মাত্র সতর্ক করছেন যে খুব সাবধানে নামতে হবে সিঁড়ি দিয়ে, তখন কার্ল – তখনো সে সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে – ভয়ংকর ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল। সিনেটর তার ডান হাত রাখলেন কার্লের চিবুকের নিচে, তাকে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন শক্ত করে আর বাঁ হাতটা গায়ে বুলিয়ে শান্ত করতে লাগলেন তাকে। এভাবেই তারা ধীরে নিচে নেমে এলেন, এক পা এক পা করে, আর জড়াজড়ি করেই নৌকায় গিয়ে উঠলেন; নৌকায় সিনেটর কার্লকে বসালেন ঠিক তার সামনের ভালো একটা সিটে। সিনেটরের কাছ থেকে ইশারা পেয়ে নাবিকেরা ধাক্কা মেরে নৌকা ছাড়িয়ে নিল জাহাজ থেকে এবং তখনই যাত্রা

শুরু করল, দাঁড় টানতে লাগল পুরো টান মেরে মেরে। জাহাজ থেকে নৌকা তখনো মাত্র কয়েক গজ দূরেও যায়নি, অপ্রত্যাশিতভাবে কার্ল আবিষ্কার করল তাদের নৌকা জাহাজের ঠিক সেই পাশটাতে যেখানে পার্সারের কামরার জানালা থেকে তাদের দেখা যাচ্ছে। তিনটে জানালাতেই ভিড় করে আছে শুবালের সাক্ষীরা, তাঁরা খুবই আপন বন্ধুর ভঙ্গিতে স্যালুট করছে আর হাত নাড়ছে তাদের উদ্দেশে; এমনকি কার্লের মামাও হাত তুললেন এর উত্তরে, আর নাবিকদের একজন তার দাঁড় টানার মসৃণ তাল না-ভেঙেই কী করে যেন সক্ষম হলো তাদের দিকে ফুঁ দিয়ে একটা চুমু ছুড়ে দিতে। সত্যি মনে হচ্ছে যেন স্টোকার বলে আর কেউ নেই। কার্ল তার মামার দিকে তাকাল আরো ভালো করে, ওনার দুই হাঁটু প্রায় ছুঁয়ে আছে তার দুটো, আর কার্লের সন্দেহ জাগা শুরু হলো এই লোক কোনো দিন তার মনে স্টোকারের জায়গাটা নিতে পারবে কি না তা নিয়ে। তার মামা কার্লের চোখ এড়িয়ে গেলেন, তিনি তাকিয়ে থাকলেন তাদের নৌকা দোলাতে থাকা ঢেউগুলোর দিকে।

রূপান্তর

এক সকালে গ্রেগর সামসা অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখে সে তার বিছানায় পড়ে আছে এক দৈত্যাকার পোকায় রূপান্তরিত হয়ে। তার কঠিন খোলার মতো পিঠের উপর সে শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, আর মাথা অল্প তুলতেই তার চোখে পড়ল গম্বুজ আকারের বাদামি পেট, শক্ত ধনুকের মতো বাঁকানো অসংখ্য শিরায় ভাগ ভাগ, আর তার উপর লেপটা ঝুলে আছে কষ্টেসৃষ্টে, মনে হচ্ছে পুরোপুরিই পিছলে পড়বে যেকোনো সময়। তার অগুনতি পা, শরীরের বাকি অংশের তুলনায় শোচনীয় রকম সরু সরু, অসহায়ভাবে লাফাচ্ছে চোখের সামনে।

'কী হলো আমার?' ভাবল সে। কোনোকিছুই স্বপ্ন না। এই তো তার ঘর, মানুষ থাকার সাধারণ একটা কামরা, তবে আয়তনে খানিক ছোটই – শান্ত পড়ে আছে পরিচিত চার দেয়ালের মাঝে। টেবিলের উপরদিকে, টেবিলটায় মোড়কখোলা অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কাপড়ের গাদা গাদা নমুনা – সামসা একজন ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান – দেয়ালে ঝুলছে সেই ছবিটা যা সে কদিন আগে একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিন থেকে কেটে রেখে দিয়েছিল সুন্দর গিল্টি করা ওই ফ্রেমের মধ্যে। ওতে দেখা যাচ্ছে ফারের টুপি আর ফারের গাউন পরা এক মহিলা টান টান বসে দর্শকের দিকে বাড়িয়ে ধরেছে পুরু এক ফারের দস্তানা যার মধ্যে হারিয়ে গেছে তার হাতের প্রায় পুরোটাই।

এরপর গ্রেগরের চোখ ঘুরল জানালার দিকে, বাইরের বিশ্রী আবহাওয়া – জানালার ধাতব কার্নিশে শোনা যাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ – খুব বিষণ্ন করে তুলল তার মন। 'ফের খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে বেশ হয়, এই আজগুবি ব্যাপারটা ভুলে থাকা যাবে,' ভাবল সে। কিন্তু তা পুরোপুরি অসম্ভব, কারণ তার অভ্যাস ডান কাতে শোয়া আর এই অবস্থায় ডান দিকে ফেরার মতো ক্ষমতা তার নেই। যতই জোরে সে ডানদিকে ঘোরার চেষ্টা করছে না কেন, বারবার পিঠের ওপরেই পড়ে যাচ্ছে চিৎ হয়ে। কম করে হলেও ১০০ বার হবে এই চেষ্টাটা সে করেছে, দুই চোখ বন্ধ করে থেকেছে যাতে করে ছটফট করা ওই পাগুলো দেখতে না হয়। শেষমেশ শুধু তখনই ক্ষান্ত দিল সে, যখন পিঠের পাশটায় শুরু হলো এক মৃদু, ভোঁতা যন্ত্রণা – অনুভূতিটা তার কাছে একেবারেই নতুন।

'ও খোদা', ভাবল সে, 'কী এক ক্লান্তির কাজই না আমি বেছে নিয়েছি! দিনের পর

দিন চলছি তো চলছিই। অফিসে বসে কাজ করার চাইতে এ কাজের ব্যবসার দিকটা কত কত বেশি ঝামেলার, তার ওপর আছে এই এত এত ঘুরে বেড়ানোর অমানুষিক কষ্ট, ট্রেন পাওয়া-না-পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা, বাজে আর নিয়মছাড়া খাওয়াদাওয়া, আর নিয়মিত নতুন নতুন সব মুখের সঙ্গে পরিচয়, যাদের সঙ্গে কোনো রকম উষ্ণ স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্ভাবনা কখনোই নেই। 'ওহ্, জাহান্নামে যাক এসব।' পেটের উপর খানিক চুলকানি অনুভব করল সে; পিঠে ধাক্কা মেরে ধীরে ধীরে যাওয়ার চেষ্টা করল খাটের মাথার দিকটায় যাতে মাথা তোলাটা আরেকটু সহজ হয়; খুঁজে পেল চুলকানির জায়গাটা, দেখল ওখানটা ভরে আছে অসংখ্য ছোট সাদা সাদা ফোঁটায়, এর কোনো ব্যাখ্যা পেল না সে; এরপর পাগুলোর একটা দিয়ে এই জায়গাটা পরীক্ষা করতে চাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই টেনে নিল পা, কারণ ওখানে প্রথম ছোঁয়াতেই তার মধ্যে বয়ে গেছে ঠান্ডা একটা কাঁপুনি।

পিছলে নেমে আবার সে তার আগের আসনে ফিরে গেল। 'এই সাতসকালে ঘুম থেকে উঠলে লাগে আহাম্মকের মতো,' ভাবল সে। 'ঘুম সবারই দরকার। অন্য সেলস্ম্যানরা তো জীবন কাটায় হারেমের মেয়েদের মতো। এমন, সকালবেলা আমি যখন অর্ডারগুলো লিখতে হোটেলে ফিরে যাই, তখনো ঐসব ভদ্রলোকেরা দেখা যায় বসে বসে নাশতা করছে। অমন চেষ্টা আমি যদি কখনো আমার বড়কর্তার সঙ্গে করি, তক্ষুনি আমার চাকরি খাওয়া হবে। অবশ্য তা যে আমার জন্য ভালোই হবে না, তা কে বলতে পারে! বাবা-মায়ের কথা ভেবে যদি আমাকে আঁকড়ে থাকতে না হতো, তাহলে কবেই ইস্তফা দিয়ে দিতাম, চিঠিটা নিয়ে সোজা চলে যেতাম বড়কর্তার কামরায় আর তার মুখের ওপর ঝেড়ে আসতাম মনের কথাগুলো। চেয়ার থেকে উল্টে ফেলে দিতাম তাকে, স্রেফ কথা দিয়েই! ও ব্যাটার কাজকামের ধরনই তো কেমন হাস্যকর – নিজের বেঞ্চে বসে ঐ উপর থেকে কথা বলে নিচে দাঁড়ানো কর্মচারীদের সঙ্গে, তাও আবার কানে খাটো বলে সবাইকেই উঁচু হয়ে এগিয়ে যেতে হয়। হুঁ, এখনো আমি সব আশা ছাড়িনি; ওর কাছে আমার বাবা-মায়ের যা ধার আছে তা শোধ করার মতো টাকা একবার জমুক না – পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে তা হয়ে যাওয়ার কথা – তখন কোনো ভুল নেই আমি ইস্তফা দিচ্ছি। আবার নতুন করে সব শুরু করব তখন। যাকগে, এখন বরং ওঠা যাক, কারণ ট্রেন ছাড়বে পাঁচটায়।'

বিছানার পাশে টেবিলের উপর টিকটিক করতে থাকা অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে তাকাল সে, 'হায় খোদা!' সে ভাবল। সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে, ঘড়ির কাঁটা নীরবে এগিয়ে যাচ্ছে আরো সামনে, আসলে সাড়ে ছয়টার বেশিই হবে, প্রায় পৌনে সাত বলা যায়। অ্যালার্ম কি বাজেনি তাহলে? বিছানা থেকে দেখা যাচ্ছে, ঠিকঠাক চারটের অ্যালার্মই দেওয়া আছে; তার মানে নিশ্চিত বেজেছিল ওটা। হুঁ, কিন্তু ওই রকম কান-ফাটানো আওয়াজের মধ্যে কি শান্তিমতো ঘুমিয়ে থাকতে পারে কেউ? আসবাবগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যও তো ওই আওয়াজ যথেষ্ট। না, শান্তির ঘুম সে ঘুমায়নি, তবে সম্ভবত ওই আওয়াজ না-শোনার মতো ঘুম ছিল ওটা। কিন্তু এখন সে করবে কী? পরের ট্রেন ছেড়ে যাবে সাতটায়; ওটা ধরতে হলে সব সারতে হবে পাগলের মতো, আর কাপড়ের নমুনাগুলো এখনো বাঁধাছাদাই

হয়নি; সেই সঙ্গে নিজেকেও তো ঝরঝরে আর সক্রিয় বলে মনে হচ্ছে না কোনো বিচারেই। আর যদি ঐ ট্রেনটা ধরা সম্ভব হলো, তবু তো বড়কর্তার গালিগালাজ এড়ানো যাবে না, কারণ ওর পিয়নটা নিশ্চিত পাঁচটার ট্রেন ধরেছে, আর এতক্ষণে জানানো হয়ে গেছে সে আসেনি। ও হচ্ছে স্রেফ বড়কর্তার চামচা, মেরুদণ্ডহীন একটা গবেট। আচ্ছা, ধরা যাক সে আজ অসুস্থ বলে কাজে গেল না? কিন্তু তা খুব বেখাপ্পা আর সন্দেহজনক দেখাবে, কারণ গ্রেগর তার চাকরির পাঁচ বছরে অসুস্থ হয়নি একবারও। বড়কর্তা নিশ্চিত তাহলে নিজেই এখানে হাজির হয়ে যাবেন স্বাস্থ্যবিমার ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে, তার বাবা-মাকে খোঁটা দেবেন তাদের পুত্রের আলসেমির জন্য, আর বিমা-ডাক্তারের কথার উল্লেখ করে করে সব রকম অজুহাত নাকচ করতে থাকবেন, যে ডাক্তারের মতে কিনা এ পৃথিবী সব রীতিমতো সুস্থ কিন্তু কাজ ফাঁকি দেওয়া লোকে ভর্তি। তবে, খুব কি ভুলও হবে যদি তিনি অমনটা করেন? কারণ গ্রেগরের তো আসলেই নিজেকে বেশ সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে, শুধু যা একটু ঢুলুঢুলু ভাব – অমন লম্বা ঘুমের পরে যা সত্যি বেশ বাড়াবাড়িই বটে, আর এমনকি অস্বাভাবিক রকমের খিদেও লেগেছে তার।

খুব দ্রুত সে এসব নিয়ে ভাবছে, বিছানা ছেড়ে ওঠার ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে পারেনি – অ্যালার্ম ঘড়িটায় এইমাত্র পৌনে সাতটার আওয়াজ হলো – তখনই বিছানার মাথার দিকের দরজায় শোনা গেল একটা সতর্ক টোকা। 'গ্রেগর,' তার মায়ের গলা, 'পৌনে সাতটা বাজল যে। তুমি কি ট্রেন ধরবে না নাকি?' সেই স্নিগ্ধ গলা! উত্তর দিতে গিয়ে নিজের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল গ্রেগর, কোনো ভুল নেই এ তার সেই পুরোনো কণ্ঠস্বর, কিন্তু এর সঙ্গে মিশে আছে – যেন বা কোন্ নিচ থেকে আসছে – এক অদম্য, যন্ত্রণাকাতর চিঁ চিঁ শব্দ; ওই শব্দের তোড়ে মাত্র মুহূর্ত খানিক পষ্ট থাকল তার কথা, তার পরই তারা এমন বিকৃত হয়ে গেল যে কেউ তা ঠিকভাবে শুনতে পেল কি না, তা আর বলা সম্ভব না। গ্রেগরের ইচ্ছে বিস্তারিত উত্তর দেয় আর সবকিছু বুঝিয়ে বলে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে শুধু এটুকুই বলল সে: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ মা, এই এক্ষুনি উঠছি আমি।' মাঝখানের কাঠের দরজার জন্য গ্রেগরের স্বরের এই পরিবর্তন মনে হয় বাইরে থেকে বোঝা গেল না, কারণ তার মা ওই কথাতে আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলেন পা টেনে টেনে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বাক্যবিনিময়ে পরিবারের অন্যরা জেনে গেল যে গ্রেগর – এমনটা তারা আশা করেনি – এখনো বাড়িতে, আর তার বাবা এরই মধ্যে পাশের দরজার একটার গায়ে মুঠি দিয়ে হালকা টোকা দিতে লাগলেন। 'গ্রেগর, গ্রেগর,' তিনি ডাকলেন, 'কী হয়েছে?' আর খানিক পরই আরো গাঢ় স্বরে ফের জানাতে লাগলেন তার তিরস্কার: 'গ্রেগর! গ্রেগর!' এরই মধ্যে অন্য পাশ-দরজা থেকে ভেসে এল তার বোনের মৃদু বিলাপের গলা: 'গ্রেগর? তোমার কি শরীর খারাপ করেছে? কোনোকিছু লাগবে?' 'আমি আসছি এক্ষুনি,' দু-দিকেরই উত্তর দেওয়ার মতো করে বলল গ্রেগর, খুব সাবধানে কথাগুলো উচ্চারণ করে, প্রতিটা শব্দের মধ্যে লম্বা বিরতি দিয়ে দিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করল নিজের কণ্ঠ যদ্দুর সম্ভব স্বাভাবিক রাখার। আসলেই তার বাবা নাশতার টেবিলে ফিরে গেলেন, তবে তার বোন

ফিসফিসিয়ে তখনো বলল: 'দরজা খোলো, গ্রেগর, প্লিজ দরজা খোলো।' কিন্তু দরজা খোলার কোনো ইচ্ছা গ্রেগরের নেই, বরং সে নিজেকে ধন্যবাদ জানাল রাতে শোয়ার সময়, এমনকি যখন বাড়িতে আছে তখনো, সবগুলো দরজায় তালা দিয়ে ঘুমানোর যে বিচক্ষণ অভ্যাসটা সে ভ্রাম্যমাণ সেলস্ম্যান হিসেবে রপ্ত করেছে তার জন্য।

প্রথম যে কাজটা সে করতে চাইছে তা হলো, চুপচাপ ও শান্তিতে বিছানা ছেড়ে ওঠা, কাপড়চোপড় পরে নেওয়া, আর সবচেয়ে দরকার – নাশতাটা সারা; কেবল তার পরই সে ভাববে পরের কাজগুলো নিয়ে, কারণ তার কাছে এটা পরিষ্কার, বিছানায় শুয়ে চিন্তা করে কোনো সুবিবেচনার সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। তার খেয়াল হলো, আগে বহুবার বিছানায় অল্পস্বল্প অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার অভিজ্ঞতা তার আছে, ওগুলো খুব সম্ভব বেকায়দায় শোয়া থেকেই, কারণ পরে বিছানা ছেড়ে উঠলে দেখা গেছে ও রকম কিছু আসলে নেই, আর এখন সে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে কীভাবে আজ সকালের কল্পনাটাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। সেই সঙ্গে তার গলার স্বর বদলে যাওয়াটাও যে স্রেফ একটা কঠিন ঠান্ডা লাগারই পূর্বলক্ষণ – ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানদের এই এক স্থায়ী অসুখ – সে ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

গা থেকে লেপ সরাতে কোনো ঝামেলাই হলো না; নিজেকে শুধু খানিক ফোলাতে হলো তার, আর আপনা-আপনিই গড়িয়ে পড়ল লেপটা। কিন্তু এর পরে সবকিছু হয়ে উঠল কঠিন, বিশেষ করে তার আকার যেহেতু এমন অস্বাভাবিক চওড়া। নিজেকে উঠে বসানোর জন্য লাগত হাত আর বাহু; কিন্তু বদলে তার আছে শুধু এই অসংখ্য পা, বিরামহীন যেগুলো নড়াচড়া করছে নানা আলাদা কায়দায়, আর আরো বড় কথা, ওদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তার। যেই-না সে ওদের একটাকে বাঁকাতে চেষ্টা করছে, অমনি সবার আগে টান টান হয়ে যাচ্ছে সেটা; আর যদি শেষমেশ এই পা'টাকে সে নিজে যা চায় তা করানোও গেল, তো দেখা যাচ্ছে এরই মধ্যে অন্য সব কটা পা নাচানাচি শুরু করেছে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো – যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতার এক চূড়ান্ত অবস্থায়। 'এমন অলসের মতো বিছানায় পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না,' আপন মনে বলল গ্রেগর।

সবার আগে সে চেষ্টা করল শরীরের নিচের অংশ বিছানা থেকে নামাতে, কিন্তু এই নিচের অংশ, যা আসলে সে এখনো দেখেনি আর এমনকি খুব একটা আন্দাজও করতে পারছে না, নড়াচড়া করানো খুবই কষ্টসাধ্য ঠেকল; খুব ধীরে আগাচ্ছে সে; আর শেষমেশ যখন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে, সমস্ত শক্তি জড়ো করে বেপরোয়া নিজেকে ছুড়ে মারল সামনের দিকে, দেখল তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, ধপাস করে সে গিয়ে পড়েছে বিছানার পায়ের দিকটায়; সেই সঙ্গে শরীর অসাড় করা এক যন্ত্রণা তাকে জানিয়ে দিল – এই এখন শরীরের ঠিক এই নিচের অংশটাই সম্ভবত তার সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ।

অতএব প্রথমে শরীরের উপরের দিকটা বরং বাইরে নামানোর চেষ্টা করল সে, আর সাবধানে মাথা বাঁকাল বিছানার কিনারার দিকে। এটুকু করতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না; আর শেষে তার শরীরের আসল ভারী অংশ, যথেষ্ট চওড়া আর ওজনদার হওয়া

সত্ত্বেও, ধীরে অনুসরণ করল মাথার গতিপথ। কিন্তু সর্বশেষে যখন মাথাটা খাটের কিনারা থেকে বাইরে শূন্যে নিয়ে যেতে পেরেছে, তখন আর সাহস হলো না সামনে এগোনোর, কারণ এভাবে যদি সে নিচে গিয়ে পড়ে তাহলে মাথায় আঘাত না-পাওয়াটা হবে রীতিমতো এক অলৌকিক ঘটনা। আর এখন এ মুহূর্তে কোনো অবস্থাতেই তার সংজ্ঞা হারানো চলবে না; তার চেয়ে বরং বিছানাতেই, যেখানে আছে সেখানেই, শুয়ে থাকা ভালো।

কিন্তু একই রকম আরেকবার চেষ্টার পর যখন সে তার আগের জায়গায় শুয়ে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে, ফের দেখছে যে তার অতি খুদে পাগুলো সম্ভবত আগের চেয়েও বেশি প্রচণ্ডতায় জড়াজড়ি করছে একটা আরেকটার সঙ্গে, আর ওদের এই হুটোপুটি কমিয়ে ওগুলোকে কোনো ধরনের শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার কোনো পথই তার জানা নেই, তখন সে আবার নিজেকে বলল – বিছানায় শুয়ে থাকাটা অসম্ভব, আর সবচেয়ে বিচক্ষণ কাজ হবে বিছানা ছেড়ে ওঠার সামান্যতম আশা যদি থাকে তবে সেটুকুর জন্যই সর্বস্ব পণ করে ঝুঁকি নেওয়া। কিন্তু একই সঙ্গে নিজেকে এ কথা মনে করিয়ে দিতেও সে ভুলল না যে ঠান্ডা মাথায়, একেবারে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে কাজ করাটা বেপরোয়া কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়ার চেয়ে অনেক শ্রেয়। যখন সে এমন ভাবছে তখন তার দৃষ্টি, যতখানি স্থিরভাবে সম্ভব, নিবদ্ধ রয়েছে জানালার উপর, যদিও দুর্ভাগ্য সকালবেলার কুয়াশার সেই দৃশ্য দেখে – এতই ঘন কুয়াশা যে সরু রাস্তার ও পাশটা পর্যন্ত অস্পষ্ট – কোনো ভালো উৎসাহ বা সাহস পাওয়া গেল না। 'এরই মধ্যে সাতটা বেজে গেছে' অ্যালার্ম ঘড়ি আরো একবার ঘণ্টা বাজাতেই আপন মনে সে বলল, 'সাতটা বাজল, আর এখনো কি না ও রকম কুয়াশা।' এবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল সে, শ্বাস নিতে লাগল নিঃশব্দে, যেন অমন নিঃশব্দতার মধ্য দিয়ে আশা করছে ফিরে যেতে পারবে স্বাভাবিক, রোজকার বাস্তবে।

কিন্তু তারপর সে নিজেকে বলল: 'সোয়া সাতটা বাজার আগেই যে করে হোক বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে, উঠতেই হবে। তা ছাড়া, ততক্ষণে, অফিস থেকেও কেউ-না-কেউ চলে আসবে আমার খোঁজ নিতে, অফিস তো খোলে সাতটার আগেই।' আর এবার সে মন দিল পুরো শরীর একই তালে দোলাতে দোলাতে বিছানার বাইরে নিয়ে যাওয়ার কাজে। যদি সে এভাবে খাট থেকে নিচে পড়ে তাহলে তার মাথা – যা সে চাচ্ছে পতনের সময় ঝট করে উঁচুতে তুলে ফেলবে – মনে হয় আঘাত থেকে বেঁচে যাবে। পিঠটা বেশ শক্ত বলেই মনে হচ্ছে; কার্পেটের উপর গিয়ে পড়লে খুব একটা ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তার মূল চিন্তা ওই পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজটা নিয়ে, ওটা ঠেকানোর কোনো উপায় তার জানা নেই; দরজার ও পাশে ওই আওয়াজ আতঙ্ক না হলেও অন্তত দুশ্চিন্তার জন্ম তো দেবেই। কিন্তু এ ঝুঁকিটুকু তাকে নিতেই হচ্ছে।

এরই মধ্যে গ্রেগর যখন শরীরটা খাট থেকে অর্ধেক বাইরে নিয়ে এসেছে – তার এই নতুন পন্থা যতটা না শারীরিক কসরত তার চেয়ে বেশি খেলা, কারণ তাকে স্রেফ এপাশে-ওপাশে দুলতে হচ্ছে শুধু – তখন তার মনে হলো, কেউ যদি একটু সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসত তাহলে কত সহজই না হয়ে যেত কাজটা। দুজন শক্তপোক্ত কেউ – তার

বাবা আর ঝিয়ের কথা ভাবল সে – হলেই যথেষ্ট হতো; তাদের শুধু তার বাঁকানো পিঠের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে, ওভাবেই খাট থেকে তুলে, বোঝাটাসহ নিচের দিকে ঝুঁকে, তারপর সাবধানে তাকে মেঝের উপর ডিগবাজি খেয়ে পড়তে দিলেই চলত; ওখানে আশা করা যায় তার এই ছোট ছোট পাগুলো তখন কাজে আসবে। তাহলে কি (যদিও সবগুলো দরজাই বন্ধ) সত্যিই তার উচিত সাহায্যের জন্য ডাক দেওয়া? এই কথা ভেবে, এ রকম চরম দুর্দশার মধ্যেও, হাসি চাপতে পারল না সে।

ইতিমধ্যে এমন এক অবস্থানে সে পৌঁছে গেছে যেখানে সে যদি জোরের সঙ্গে এভাবে দুলতে থাকে তাহলে আর বেশিক্ষণ নিজের ভারসাম্য বজায় রাখা যাবে না; আর শিগগিরই এখন তাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, কারণ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সোয়া সাতটা বাজবে – তখনই সামনের দরজার ঘন্টি বেজে উঠল। 'অফিসের কেউই হবে,' মনে মনে এ কথা বলতেই আতঙ্কে সে প্রায় জমে গেল; তার ছোট ছোট পাগুলো তখন নাচতে লাগল আরো চটপট। এক মুহূর্তের জন্য সবকিছু নিশ্চুপ। 'ওরা কেউই দরজা খুলবে না,' এক যুক্তিহীন আশায় বুক বেঁধে বলল গ্রেগর। কিন্তু এর পরই, অন্য সময়ের মতোই, ঝি'টা তার ভারী পা ফেলে দরজার কাছে গেল, খুলে দিল দরজা। গ্রেগরকে শুধু অতিথির সম্ভাষণের প্রথম শব্দটা শুনতে হলো মাত্র, তখনই সে বুঝে গেল লোকটা কে – প্রধান কেরানি স্বয়ং। হায় এ কী ভাগ্য, এমন এক অফিসে কাজ করার শাস্তি কেন সে ভোগ করছে যেখানে সামান্য বিচ্যুতিও সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে গভীর সন্দেহের জন্ম দেয়? এ মানুষটার কাছে তাহলে কি সমস্ত কর্মচারীই বদমাশ; তাদের মধ্যে কি এমন একজনও বিশ্বস্ত, নিবেদিতপ্রাণ কর্মচারী নেই যে কিনা এক সকালে অফিসকে এক কি দুই ঘণ্টা শ্রম দিতে না পারার ব্যর্থতায় অনুশোচনায় পাগল হয়ে যায়, – এতই অনুশোচনা যে বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলে? ধরে নিচ্ছি এভাবে খোঁজ নেওয়ার আদতেই দরকার আছে, তবুও কি সেই কাজে একজন নিচের কাউকে পাঠানোই আসলে যথেষ্ট হতো না? স্বয়ং প্রধান কেরানিকেই কি আসা লাগত, এটা কি এই পুরো নিরপরাধ পরিবারটাকে দেখানোর জন্যই যে ঘটনাটা এত বেশি সন্দেহজনক, অতএব তার তদন্তকাজ একমাত্র অমন উচ্চপদস্থ কারোর বিচারবুদ্ধির ওপরই ছাড়া যায়? কোনো খাঁটি সিদ্ধান্ত থেকে না, বরং এসব চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে এবার গ্রেগর শরীরের সমস্তটা দিয়ে নিজেকে ছুড়ে দিল বিছানার বাইরে। জোরে ধপাৎ করে শব্দ হলো একটা, যদিও কোনোকিছু ভেঙেচুরে পড়ার মতো শব্দ না। তার এই পতন খানিকটা সহনীয় হয়েছে কার্পেটের কারণে, আর সেই সঙ্গে পড়ার পরে পিঠটায় গ্রেগরের আন্দাজের থেকে বেশি দোল হয়েছে – সে কারণেই এই ভোঁতা, তুলনামূলক মার্জিত ধপাৎ আওয়াজ। শুধু বিষয় হলো, মাথাটা যথেষ্ট সাবধানের সঙ্গে উঁচু করা যায়নি আর তাই ওটা আঘাত পেয়েছে। ব্যথা আর বিরক্তির সঙ্গে মাথাটা ঘুরিয়ে কার্পেটের উপর ডলতে লাগল সে।

'কিছু একটা পড়েছে ওই ঘরে,' বাঁ পাশের ঘর থেকে প্রধান কেরানি বলে উঠলেন। আজ তার ভাগ্যে যা ঘটেছে, অমন কিছু একদিন প্রধান কেরানির ভাগ্যেও ঘটতে পারে

কি না, তা ভাবতে লাগল গ্রেগর; মানতেই হবে – তেমন ঘটা অসম্ভব না। কিন্তু এ প্রশ্নেরই কড়া জবাব হিসেবে যেন পাশের কামরায় প্রধান কেরানি কয়েকবার জোর পায়ে হাঁটাহাঁটি করলেন, তার বার্নিশ করা চামড়ার বুট জুতো থেকে শব্দ উঠল মচমচ। ডান পাশের কামরা থেকে গ্রেগরের বোন তাকে অবস্থাটা জানানোর জন্যই ফিসফিসিয়ে বলল: 'গ্রেগর তোমার বস্ এসেছেন।' 'আমি জানি,' নিজের মনে জবাব দিল গ্রেগর, তার বোনের শোনার মতো জোরে কথা বলা সাহসে কুলাল না তার।

'গ্রেগর,' বাঁ-পাশের ঘর থেকে এবার বলে উঠল তার বাবা, 'প্রধান কেরানি সাহেব এসেছেন, উনি জানতে চাচ্ছেন কেন তুমি ভোরের ট্রেনে রওনা দাওনি। আমরা তাকে কী বলব বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া উনি তোমার সঙ্গে নিজে কথা বলতে চান। তাই প্লিজ, দরজা খোলো। ভয় নেই, তোমার ঘরের অগোছানো অবস্থা দেখে উনি কিছু মনে করবেন না।' 'সুপ্রভাত, হের সামসা,' প্রধান কেরানি এর মধ্যে বলে উঠলেন সদাশয় ভঙ্গিতে। 'ওর শরীরটা আসলে ভালো নেই,' তারা বাবা যখন দরজার ও-পাশ থেকে কথা বলে যাচ্ছেন, তখন প্রধান কেরানিকে বলল তার মা। 'ওর শরীরটা ভালো নেই, সত্যি বলছি। তা না হলে গ্রেগর ট্রেন মিস করবে কেন? ও তো নিজের কাজ ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে ভাবেই না। সন্ধ্যায় কখনো বেড়াতে পর্যন্ত বেরোয় না, আমি তো প্রায় রেগেই যাই; গত সপ্তাহের পুরোটাই ও এই শহরে ছিল আর প্রত্যেক সন্ধ্যা ঘরে বসেই কাটিয়েছে। হয় ঐ বসায় ঘরের টেবিলে বসে চুপচাপ খবরের কাগজ পড়েছে, না হয় খুঁটে খুঁটে তার রেলের সময়সূচি দেখেছে। শখ বলতে ওর তো ওই একমাত্র কাঠের নকশার কাজ। এই তো, দু-তিন সন্ধ্যা ধরে একটা ছোট ছবির ফ্রেম বানাল; আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন কত সুন্দর হয়েছে ওটা। ছবিটা ওর ঘরে ঝোলানো; গ্রেগর দরজা খুললেই আপনি দেখতে পাবেন। আপনি এসেছেন, আমি সত্যিই খুশি হয়েছি স্যার। আমরা নিজেরা মনে হয় ওকে দরজা খুলতে রাজি করাতে পারতাম না কখনোই; কী যে গোঁয়ার ও। আর ও যে অসুস্থ, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, যদিও সে বলছে সকালের দিকে ভালোই ছিল শরীর।' 'আমি এক্ষুনি আসছি,' ধীরে এবং চেপে চেপে বলল গ্রেগর, নিঃসাড় পড়ে থাকল, যেন ঐ কথাবার্তার একটা শব্দও তার কান এড়িয়ে না যায়। 'আমি নিজেও তো ম্যাডাম এ ছাড়া অন্য কোনো কারণের কথা ভাবতে পারছি না', বললেন প্রধান কেরানি, 'আশা করছি, খুব সিরিয়াস কিছু না। যদিও অন্যদিকে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমরা যারা বিজনেসে আছি – আমাদের দুর্ভাগ্যই বলুন আর সৌভাগ্যই বলুন – বিজনেসের স্বার্থেই আমাদের যাবতীয় টুকটাক অসুস্থতা ঝেড়ে ফেলতে হয়।' 'আচ্ছা, তাহলে প্রধান কেরানি সাহেব কি তোমার ঘরে এখন ঢুকতে পারেন?' অধৈর্যের সঙ্গে বললেন তার বাবা, ফের টোকা দিতে লাগলেন দরজায়। 'না', বলল গ্রেগর। বাঁ-পাশের কামরায় নেমে এল এক অস্বস্তিকর নীরবতা: আর ডান পাশের কামরায় তার বোন ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

কেন যে তার বোনটা ঐ ঘরে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না? মনে হয় মাত্র সে বিছানা ছেড়ে উঠেছে আর এখনো কাপড়চোপড়ই ঠিকমতো পরে ওঠেনি। আর সে কাঁদছে

কী জন্য? এ জন্যই কি যে গ্রেগর বিছানা থেকে ওঠেনি, প্রধান কেরানিকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি এবং এবার তার চাকরিটা যাওয়ার ভয় আছে, আর এখনই তার অফিসের বড়কর্তা তার বাবা-মাকে চাপতে শুরু করবেন পুরোনো ধার-দেনাগুলো শোধ করতে? এগুলো সব অযথা আশঙ্কা, আপাতত অযথাই। গ্রেগর এখনো পাশেই আছে আর নিজের পরিবারকে ছেড়ে যাওয়ার সামান্য ইচ্ছাও তার নেই। হুঁ, ঠিক এ মুহূর্তে সে শুয়ে আছে কার্পেটের উপর; আর তার এখনকার অবস্থা সম্পর্কে জানে না এমন যে কেউ তো আশা করতেই পারে যে মুখ্য কেরানিকে সে ঘরে ঢুকতে দেবে। তাই বলে এই সামান্য অসৌজন্যতা – পরে কিনা ভালোমতোই যার কারণ ব্যাখ্যা করা যাবে – তো কোনোভাবেই গ্রেগরের তাৎক্ষণিক বরখাস্তের কারণ হতে পারে না। গ্রেগরের মনে হলো, তারা যদি এখন তাকে এসব কান্নাকাটি আর অনুরোধ-উপরোধে বিরক্ত করার বদলে একটু শান্তিতে থাকতে দিত, সেটাই অনেক বেশি বিচক্ষণতার কাজ হতো। তবে সত্যি যে, অনিশ্চয়তার ব্যাপারটাই ওদের অমন অস্থির করে তুলেছে, সে কারণেই ওদের এমন আচরণ।

'সামসা সাহেব', এবার প্রধান কেরানি খানিক উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হলোটা কী আপনার? আপনি নিজেকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছেন, কোনো জবাবের বেলায় শুধু হ্যাঁ-না বলে যাচ্ছেন, আপনার বাবা-মাকে রেখেছেন এক অহেতুক মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে, আর তা ছাড়া – কথা প্রসঙ্গে বলতেই হচ্ছে – অপরিষ্কার দৌরাত্ম্য দেখিয়ে নিজের অফিসের প্রতি দায়িত্বে অবহেলা করে যাচ্ছেন। আমি এখানে আপনার বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে, আপনার নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে বলছি, আপনাকে সত্যিই মিনতি জানাচ্ছি, আমাকে এক্ষুনি এর একটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিন। আমি অবাক, অবাক। আপনাকে আমি সব সময়ই একজন শান্ত আর যুক্তিপরায়ণ মানুষ বলে ভেবে এসেছি, আর আপনি কিনা হঠাৎ এসব অদ্ভুত বাতিক দেখানো শুরু করে দিলেন। অবশ্য, আপনার অফিসে না-আসার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ইঙ্গিতে আজ সকালে আমাকে বড় বস্ বলেছেন – পাওনা টাকা আদায়ের যে কাজটা কিছুদিন হয় আপনাকে দেওয়া হয়েছে, ইঙ্গিতটা তা নিয়েই – কিন্তু আমি আমার কথার সম্মানের দোহাই পর্যন্ত পেড়ে ওনাকে বলেছি, এটা ঠিক না। তবে এখন আপনার এই অবিশ্বাস্য গোঁয়ার্তুমি নিজ চোখে দেখার পর সত্যি বলছি, আপনার কোনো রকম পক্ষ নেওয়ার ইচ্ছা আমার চলে গেছে। আর নিশ্চয়ই জানেন, অফিসে আপনার অবস্থা কোনোভাবেই সুরক্ষিত না। আমার আসলে ইচ্ছা ছিল এসব কথা আপনাকে গোপনে বলি, কিন্তু আপনি যে রকম অনর্থক আমাকে এখানে সময় নষ্ট করতে বাধ্য করছেন, তাই আমি এখন আর কোনো কারণই দেখছি না যে কেন আপনার নিরীহ বাবা-মাও এসব শুনবেন না। সুতরাং আমাকে বলতেই হচ্ছে – বেশ অনেক দিন ধরে আপনার কাজকর্ম পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে; মানছি যে ব্যবসা করার এটা কোনো দারুণ মৌসুম না। হ্যাঁ, এ কথা আমরা মানছি তবে কোনো ব্যবসার জন্যই এটা কোনো মৌসুমই না, তা তো আর হতে পারে না সামসা সাহেব, তা হতে দেওয়া যায় না।'

'কিন্তু স্যার,' খুব বিচলিত হয়ে আর উত্তেজনায় বাকি সবকিছু ভুলে গিয়ে বলে উঠল

গ্রেগর, 'আমি এক্ষুনি দরজা খুলে দিচ্ছি, এই এখনই। সামান্য একটু অসুস্থতা, সামান্য মাথা ঝিমঝিম, এ কারণেই আজ ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। এখনো বিছানায় শোয়া। তবে ঠিক এখন আবার বেশ সুস্থ বোধ করছি। এই তো, এক্ষুনি উঠে পড়ছি বিছানা ছেড়ে। আধা সেকেন্ড ধৈর্য ধরুন! না, যতটা ভেবেছিলাম ততটা সুস্থ না আমি। তবে সত্যি ঠিকঠাকই আছি। কেমন হঠাৎ করেই না এসব অসুখ মানুষকে ধরে বসে। এই তো গত রাতেও বেশ সুস্থ ছিলাম, আমার বাবা-মাকে আপনি জিগ্যেস করে দেখুন। তবে গত রাতে অসুখের আভাসও খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিলাম বটে। নিশ্চয়ই কিছু আভাস আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। হায় রে, খোদা জানে কেন যে আমি নিজে থেকে অফিসে খবর পাঠাইনি। মানুষ তো সব সময়ই ভাবে নিজে নিজে অসুখ থেকে সেরে ওঠার জন্য বাড়িতেই যে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ওহ্ স্যার! আমার বাবা-মাকে রেহাই দিন! যেসব অভিযোগ আপনি এখন করলেন, সব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; এর আগে এসব নিয়ে আমাকে কেউ কোনো দিন একটা কথাও বলেনি। মনে হচ্ছে, আপনি এখনো আমার শেষের পাঠানো অর্ডারগুলো দেখেননি। যাক, আটটার ট্রেন ধরে কাজে যাচ্ছি আমি; এই অল্প ক'ঘণ্টার বিশ্রামে বরং খানিক উপকারই হলো। আপনাকে স্যার আর আটকে রাখতে চাচ্ছি না; অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নিজে নিজেই পৌঁছে যাচ্ছি অফিসে, দয়া করে বস্‌কে গিয়ে বলবেন সে-কথাটা আর ওনাকে আমার সালাম জানাবেন!'

গ্রেগর যখন বোকার মতো ঝটপট এসব কথা বলে যাচ্ছে – কী বলছে সে ব্যাপারে নিজেরই কোনো চেতন নেই – তখন বেশ সহজেই আলমারিটার কাছে পৌঁছে গেল সে, খুব সম্ভব বিছানায় শুয়ে এরই মধ্যে যে-অভ্যাসটা রপ্ত করেছে সে জন্যই কাজটা সহজ হলো এত, আর এখন সে চেষ্টা করছে আলমারির গায়ে শরীরটা খাড়া করে তুলতে। মনেপ্রাণেই সে দরজাটা খুলতে চাইছে, মনেপ্রাণেই চাইছে বের হতে আর প্রধান কেরানির সঙ্গে কথা বলতে; অন্যেরা – যারা তার জন্য একান্ত অপেক্ষায় – তাকে দেখে কী বলবে তা জানার জন্য উৎসুক সে। যদি তারা আতঙ্কিত হয়, তাহলে তো আর গ্রেগরের কোনো দায়িত্ব থাকে না, তখন সে বিশ্রাম নিতে পারে শান্তিতে। কিন্তু যদি তারা সবকিছু শান্তভাবে মেনে নেয়, তখন তারও তো আর উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না, আর তখন সবকিছু একটু জলদি সারলে সত্যিই সে আটটার মধ্যে স্টেশনে পৌঁছাতে পারবে। শুরুর দিকটায় মসৃণ আলমারির গা বেয়ে বারকয়েক পিছলে পড়ল সে, কিন্তু শেষমেশ শরীর উপর দিকে একটা চূড়ান্ত ধাক্কা দিয়ে খাড়া হলো; এখন আর শরীরের নিচের দিকের ব্যথাতে তার কোনো মনোযোগ নেই, যদিও ব্যথা বেশ তীব্রই। এবার সে শরীরটা ফেলল কাছেই দাঁড়ানো এক চেয়ারের পেছনটায়, তার ছোট পাগুলো আঁকড়ে ধরল এর কিনার। সেই সঙ্গে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণও এল তার, চুপ করে থাকল সে; প্রধান কেরানি এবার কী বলেন এখন তা ভালোমতো শোনা যাবে।

'আপনারা কি ওর একটা কথাও বুঝতে পারলেন?' প্রধান কেরানি জিগ্যেস করছেন তার বাবা-মাকে, 'সে আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করছে না তো?' 'ওহ্ খোদা,'

কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠল তার মা, 'মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ ও, আর আমরা কি না ওকে এখানে বসে জ্বালাচ্ছি। গ্রেটি! গ্রেটি!' তিনি ডাকতে লাগলেন। 'মা?' অন্য পাশ থেকে জবাব দিল তার বোন। গ্রেগরের কামরার দুই পাশ থেকে কথা বলছে দুজনে। 'এক্ষুনি ডাক্তার ডেকে আন। গ্রেগর অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে দৌড়া, জলদি। গ্রেগর কীভাবে কথা বলছিল শুনেছিস?' 'পশুর গলার মতো শুনাচ্ছিল,' বললেন প্রধান কেরানি, তার মায়ের তীক্ষ্ণ চিৎকারের তুলনায় ওনার স্বর লক্ষণীয় রকমের নিচু। 'আন্না! আন্না!' হলঘরটার মধ্য দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন তার বাবা, হাততালি দিচ্ছেন তিনি, 'এক্ষুনি একটা তালাওয়ালা ডেকে আনো!' এরই মধ্যে এই দুই মেয়ে স্কার্টের শোঁ-শোঁ শব্দ তুলে হলঘর দিয়ে দৌড়ে যেতে লেগেছে – তার বোন এত তাড়াতাড়ি কাপড় পরতে পারল কী করে? – আর ধড়াম করে সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল তারা। দরজা বন্ধ করার কোনো শব্দ হলো না; অনুমান করা যায়, ওরা দরজা খুলেই রেখে গেছে, ঠিক যেমনটা ঘটে কোনো বাড়িতে বিরাট কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে।

তবে গ্রেগর অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে। সত্য যে তার কথাগুলো আসলেই আর বোধগম্য হওয়ার মতো নেই, যদিও তার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট বলেই মনে হয়েছে, আগের চেয়ে স্পষ্ট তো বটেই, মনে হয় তার কান ঐ ধ্বনির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। যা হোক, এতক্ষণে অন্য সবাইকে অন্তত এটুকু তো বোঝানো গেল যে তার কিছু একটা সমস্যা সত্যিই হয়েছে, আর সে কারণেই তারা এখন তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। যে রকম সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রথম নির্দেশগুলো দেওয়া হলো, তাতে স্বস্তি পেল গ্রেগর। তার মনে হতে লাগল, আবার সে ফিরে এসেছে মনুষ্য-সঙ্গে আর সে আশা করতে লাগল, ডাক্তার ও তালাওয়ালা – এদের মধ্যে যথার্থ কোনো পার্থক্য না টেনেই – দুজনের কাছ থেকেই চমৎকার ও বিস্ময়কর কোনো সফলতার। আসন্ন চূড়ান্ত আলাপটার কথা ভেবে গলা যদ্দুর সম্ভব সাফ করে নিতে একটু কাশল সে, যদিও সাবধান থাকল খুব নিঃশব্দে ওটা করার ব্যাপারে, কারণ তার কাশিও তো পুরোপুরি মানুষের মতো শোনাতে না পারে, আর এ ব্যাপারে নিজের বিচারবুদ্ধির ওপরেই তার আর ভরসা নেই। এরই মধ্যে পাশের ঘরে নেমে এসেছে একদম নীরবতা। হতে পারে, প্রধান কেরানির সঙ্গে তার বাবা-মা বসে আছেন টেবিলে, ফিসফিস করছেন; হতে পারে, তারা সবাই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার উপর আর কান পেতে শুনছেন।

নিজেকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে দরজার কাছে নিয়ে যেতে লাগল গ্রেগর, চেয়ারটা আঁকড়ে ধরে থেকে; তারপর ওটা ছেড়ে দিয়ে শরীর ছুড়ে দিল দরজার গায়ে, ওখানে ঠেস দিয়ে খাড়া হলো এবার – তার পাগুলোর তলার দিকটা খানিক আঠালো মতো – এই খাটুনির ফলে এখন জিরিয়ে নিতে হচ্ছে খানিকক্ষণ। এরপর মুখ দিয়ে তালায় চাবি ঘুরানোর কাজে এগিয়ে গেল সে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখা গেল, তার ঠিক দাঁত বলতে কিছু নেই – তাহলে চাবিটা সে শক্ত করে ধরবে কী দিয়ে? – তবে অন্যদিকে, দাঁতের বদলে, নিশ্চিত খুবই শক্তিশালী এক চোয়াল পেয়েছে সে; চোয়াল দিয়ে চাবিটা সে এমনকি

ঘুরাতে সফলও হলো, কিন্তু নিঃসন্দেহে এতে যে তার বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে কোনো হুঁশই ছিল না – তার মুখ থেকে বের হতে লাগল বাদামি একটা রস, চাবির গা বেয়ে তা ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে মেঝের উপর। 'ঐ শুনুন,' পাশের ঘরে বলে উঠলেন প্রধান কেরানি, 'উনি চাবি ঘুরাচ্ছেন।' সন্দেহ নেই, এই কথাটা গ্রেগরের জন্য বিরাট উৎসাহের; কিন্তু তাদের সবারই উচিত তাকে সরবে উৎসাহিত করে যাওয়া, উচিত তার বাবা-মায়েরও: 'চালাও গ্রেগর, চালিয়ে যাও,' তাদের সবারই উচিত চিৎকার করে বলতে থাকা, 'ধরে থাকো, চাবি ঘুরাতে থাকো।' সবাই তার এই চেষ্টাটা তীব্র উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ করছে, এমনটা কল্পনা করে সে মরিয়া হয়ে চোয়াল দিয়ে সেই মুহূর্তের সবটুকু শক্তিতে চেপে ধরে থাকল চাবি। যেই না ওটা ঘুরতে শুরু করল, সেও অমনি গোল হয়ে ঘুরতে লাগল তালার চারদিকে; এখন শুধু মুখ দিয়ে ধরেই সে শরীর ঝুলিয়ে রেখেছে শূন্যে, আর হয় চাবি ধরে ঝুলে থাকছে নয়তো শরীরের সব শক্তি দিয়ে আবার চাবি দরকারমতো ঠেসে ধরছে নিচের দিকে। শেষমেশ তালাটার খট্ করে খুলে যাওয়ার পরিষ্কার আওয়াজ আক্ষরিক অর্থেই গ্রেগরকে জাগিয়ে তুলল। স্বস্তির এক গভীর শ্বাস ফেলে সে নিজেকে বলল: 'তাহলে তালাওয়ালার আর দরকার পড়ল না আমার,' আর সেই সঙ্গে দরজা টেনে খোলার জন্য মাথাটা রাখল হাতলের গায়।

যেহেতু এই কায়দায় দরজা খুলতে হলো তাকে, তাই ওটা হাট হয়ে খুলে যাওয়ার পরে গ্রেগর কিন্তু রয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। এখন প্রথম তাকে দরজার এই পাল্লাটা ঘিরে আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে, খুব সতর্কতার সঙ্গে তাকে করতে হচ্ছে এই কাজ, কারণ ওই ঘরে ঢোকার সময় পিঠের উপর চিত হয়ে পড়ে যাওয়া চলবে না কোনোমতেই। এই কঠিন কাজে গ্রেগর যখন মগ্ন, অন্য কোনোদিকে মনোযোগ দেওয়ার কোনো ফুরসত নেই, তখন সে শুনল প্রধান কেরানি একটা সুউচ্চ 'ওহ্!' শব্দ করলেন – দমকা বাতাসের মতো শোনাল তা – আর এখন সে ওনাকে দেখতেও পাচ্ছে – হাঁ করা মুখটায় হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার খুব কাছেই, তারপর পেছাতে শুরু করেছেন ধীরে ধীরে, যেন-বা অদৃশ্য কোনো শক্তির অটল চাপে তাড়িত। তার মা – প্রধান কেরানির উপস্থিতি সত্ত্বেও এখনো রাতের চুল ঠিকঠাক না করে ও রকম এলোমেলো চুলেই দাঁড়িয়ে আছেন – শুরুতে নিজের দুই হাত এঁটে থেকে তাকালেন তার স্বামীর দিকে, তারপর গ্রেগরের দিকে দুই পা এগিয়ে এসেই ঢলে পড়লেন মেঝেয়; স্কার্টটা গোল হয়ে ঢেউ খেলে থাকল মহিলার চারপাশে আর তার মুখ ডুবে গেল বুকের আড়ালে, দেখা যাচ্ছে না মুখটা। গ্রেগরের বাবা একটা ভীতি-জাগানো ভঙ্গি করে নিজের মুঠো পাকালেন, যেন তিনি পিটিয়ে গ্রেগরকে তার ঘরে ফেরত পাঠাতে চাচ্ছেন, তারপর এক অনিশ্চিত দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলেন বৈঠকখানার চারপাশটা, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, কান্নায় ফুলে উঠতে লাগল তার চওড়া বুক।

এরপর গ্রেগর আর ঢুকল না ওই ঘরে, দরজার অন্য পাল্লার হুড়কার গায়ে হেলান দিয়ে থাকল সে, এ কারণে তার শরীরের শুধু অর্ধেকটাই দেখা যেতে লাগল, ধড়ের উপরে

মাথাটা একদিকে কাৎ করা, অন্য সবাইকে দেখছে পিটপিটিয়ে। এরই মধ্যে বাইরে অনেক বেশি ফরসা হয়ে উঠেছে; রাস্তার ওপারে উল্টোদিকে অফুরন্ত লম্বা, কালো-ধূসর দালানটার একাংশ এখন দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার – ওটা একটা হাসপাতাল – ওটার সামনের অংশে শক্ত খোপ খোপ সারি করে জানালাগুলো বসানো; বৃষ্টি পড়ছে এখনো; বড় ফোঁটাগুলো দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা করে, আর মনে হচ্ছে একটা একটা করেই যেন মাটির দিকে নেমে আসছে ফোঁটাগুলো। টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে অনেক পদের নাশতা, কারণ গ্রেগরের বাবার কাছে সকালের নাশতাটাই সারা দিনের প্রধান খাবার, ওগুলো খেতে খেতে তিনি কত রকমের যে খবরের কাগজ পড়বেন ঘন্টার পর ঘন্টা। ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালে ঝুলে আছে গ্রেগরের সেনাবাহিনীর দিনগুলোর একটা ছবি, এতে দেখা যাচ্ছে সে একজন লেফটেন্যান্ট, তরবারির উপর রাখা এক হাত, আর মুখে এক ভাবনাহীন হাসি, তার ভাবসাব আর গায়ের উর্দির কারণে দেখতে শ্রদ্ধাই জাগছে। হলঘরের দিকে যাওয়ার দরজাটা খোলা আর যেহেতু ফ্ল্যাটের সদর দরজাও খোলা, তাই সিঁড়ির ল্যান্ডিং আর সিঁড়িঘরের ওপরের দিকটাও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

'আচ্ছা,' বলল গ্রেগর – শুধু তারই যে মানসিক স্থিতি অক্ষুণ্ন আছে, এ বিষয়ে সে পুরোপুরি সচেতন – 'এক্ষুনি ঝটপট জামাকাপড় পরে, কাপড়ের নমুনাগুলো বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি। আমাকে যেতে দেবেন তো, নাকি? দেখতেই তো পারছেন স্যার, আমি গোঁয়ার লোক না, আমার কাজ আমার অনেক পছন্দের; ঘুরে বেড়ানোর এই চাকরিতে ক্লান্তি অনেক, কিন্তু এটা ছেড়ে বাঁচব না আমি। স্যার, আপনি যাচ্ছেন কোথায়? অফিসে চললেন? সত্যিই এই ঘটনার একটা সাচ্চা রিপোর্ট জমা দেবেন তো? যে-কেউই কাজ করতে সাময়িক অক্ষম হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তখনই তো তার অতীতের সেরা কাজগুলো মনে করার সঠিক সময় আর সেই সঙ্গে এমনটা ভাবারও যে, পরে যখন তার সমস্যা আর থাকবে না, তখন কোনো সন্দেহ নেই আরো বেশি শক্তি আর মনোযোগ নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে কাজে। বসের প্রতি আমার নৈতিক বাধ্যবাধকতা খুবই বিরাট, তা আপনি ভালোমতোই জানেন। অন্যদিকে বাবা-মা আর বোনটার ওপরও আমার দায়িত্ব কম না। কঠিন অবস্থার মধ্যে আছি আমি, তবে এ থেকে বেরোনোর পথ ঠিকই করে নেব। আপনি শুধু আমার কঠিন অবস্থাকে দয়া করে আরো কঠিন করে তুলবেন না। অফিসে আমার পক্ষ নিয়ে দাঁড়ান! আমি জানি, ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানদের সবাই পছন্দ করে না। লোকের ধারণা ওরা বাক্স বাক্স টাকা কামায় আর বিলাসের জীবন কাটায়। এ রকমই সবাই ভাবে, আর ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখারও কারো কোনো গা নেই। কিন্তু আপনার তো স্যার অফিসের অন্য কারো চাইতে সবকিছু নিয়ে বেশি দখল আছে, সত্যি বলতে কি – খুব গোপনেই বলছি – বসের চেয়েও বেশি দখল রাখেন আপনি; বস্ মালিক বলে সহজেই তার বিচার-বিবেচনা যেকোনো কর্মচারীর প্রতি অবিচার ঘটিয়ে বসতে পারে। এটাও তো আপনি ভালোমতোই বোঝেন, কত সহজেই একজন ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান, যে কিনা প্রায় সারাটা বছরই কাটায় অফিসের বাইরে বাইরে, কত সহজেই সে নানা গুজব,

দুর্ভাগ্য আর ভিত্তিহীন অভিযোগের শিকার হতে পারে – যেসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে তার কিছুই করার থাকে না, কারণ সাধারণত এর কিছুই তার কানে পৌঁছায় না, শুধু যখন সে ঐসব লম্বা ঘোরাঘুরি শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফেরে, তখনই তাকে হঠাৎ এসবের পরিণতির মুখে পড়তে হয় – তদ্দিনে মূল কারণগুলোর কোনো হদিস বের করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। কিন্তু স্যার, আপনি যাবেন না। আমার কথাগুলোর অন্তত কিছুটা হলেও যে ঠিক বলে আপনি মনে করছেন, সে রকম কিছু না বলে আপনি চলে যাবেন না!'

তবে গ্রেগরের প্রথম কথাগুলো শুনেই প্রধান কেরানি এরই মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, শুধু পেছন ফিরে তার কাঁপতে থাকা কাঁধের উপর দিয়ে মুখটা হাঁ করে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। আর গ্রেগর যখন কথা বলছিল, তখন এক মুহূর্তের জন্যও স্থির দাঁড়াননি তিনি, তার ওপর থেকে চোখ না-সরিয়েই দরজার দিকে পিছু হটছিলেন, যেন কোনো গোপন আদেশ তাকে নিষেধ করছিল এই ঘর ছেড়ে যেতে। তবে এরই মধ্যে তিনি দরজা আর হলঘরের সংযোগের জায়গায় পৌঁছে গেছেন, তবে যে রকম হঠাৎ তাড়ার সঙ্গে তিনি বৈঠকখানা থেকে তার শেষ পা'টা ফেলেছেন, তাতে মনে হবে – এই এক্ষুনি যেন তিনি পুড়ে ফেলেছেন তার পায়ের তলা। হলঘরে পৌঁছে তিনি নিজের সামনের দিকে সিঁড়ির উদ্দেশে বাড়িয়ে দিলেন তার ডান হাত, মনে হচ্ছে যেন এখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে কোনো অলৌকিক মুক্তি।

গ্রেগর বুঝতে পারল, যদি অফিসে নিজের অবস্থানটা মারাত্মক কোনো বিপদের আশঙ্কা থেকে বাঁচাতে হয়, তাহলে কোনোমতেই প্রধান কেরানিকে এ রকম মানসিক অবস্থা নিয়ে এখান থেকে যেতে দেওয়া যাবে না। তার বাবা-মা অবস্থাটা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন না; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, এ অফিসে গ্রেগরের চাকরি আজীবনের জন্য সুরক্ষিত আর তা ছাড়া তাদের এ মুহূর্তের দুশ্চিন্তাগুলো নিয়েই তারা এত মগ্ন যে সামনের দিকে দেখার সব শক্তি তাদের লোপ পেয়েছে। কিন্তু এ শক্তি গ্রেগর হারায়নি। প্রধান কেরানিকে থামাতেই হবে, শান্ত করতে হবে, বোঝাতে হবে আর সবশেষে তার মনটা জয় করতে হবে; গ্রেগর ও তার পরিবারের পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর ওপর! আহ্, শুধু যদি তার বোনটা থাকত এখন! যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে সে, গ্রেগর যখন চুপচাপ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, এমনকি তখনই সে কাঁদছিল। প্রধান কেরানির মতো একজন মেয়েপাগল মানুষ যে ওর মাধ্যমে গলে যেতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; বোনটা ঠিকই সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওনার সঙ্গে হলঘরে কথা বলে ওনার আতঙ্ক কাটিয়ে দিত। কিন্তু বলে কী লাভ, বোনটা তো এখানে নেই; তাই গ্রেগরের নিজেকেই সবকিছু করতে হচ্ছে। চলার ক্ষমতা তার কতখানি আছে, সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই আর তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য না থেমে, এমনকি তার কথাগুলো যে এবারও কেউ বুঝতে পারেনি সে সম্ভাবনার কথা – সম্ভাবনা কেন? নিশ্চিতই পারেনি – বিবেচনা না করেই গ্রেগর ছেড়ে দিল দরজাটা; ফাঁকের মধ্য দিয়ে সজোরে ঠেলা দিল শরীর; আর আগানোর চেষ্টা করল প্রধান কেরানির দিকে, যিনি এরই মধ্যে

খুবই এক হাস্যকর কায়দায় দুই হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের হাতল; ঠিক তক্ষুনি ভর দেওয়ার জন্য একটা কিছু হাতড়াতে হাতড়াতে ছোট্ট এক চিৎকার দিয়ে গ্রেগর পড়ে গেল তার অগুনতি পায়ের উপর। পড়া মাত্রই পুরো সকালে এই প্রথমবারের মতো সে বোধ করল শারীরিক সুস্থতার একটা অনুভূতি; তার পাগুলো শক্ত করে বসা মেঝের উপর; আনন্দের সঙ্গে সে খেয়াল করল, ওগুলো পুরোপুরি মানছে তার কথা; এমনকি যেদিকে তার পছন্দ সে দিকেই তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে ওরা; এতক্ষণে গ্রেগর নিশ্চিত হলো, সমস্ত ভোগান্তি থেকে তার চূড়ান্ত মুক্তি একবারে হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু ঠিক তখনই – যখন সে তার মায়ের মোটামুটি কাছে আর ঠিক উল্টোদিকে মেঝের উপর দুলছে ধীর, চাপা তালে – তখনই তার মা (ওনাকে মনে হচ্ছিল পুরোপুরি আত্মমগ্ন হয়ে হাঁটু গেড়ে আছেন) হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে আর আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; চিৎকার করে বললেন: 'বাঁচাও, দোহাই খোদার, বাঁচাও!'; সামনের দিকে তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন মাথা, যেন চাচ্ছেন আরেকটু ভালোভাবে গ্রেগরকে দেখতে, তার পরই পুরো বেমানান এক ঢঙে গ্রেগরের কাছ থেকে তিনি পাগলের মতো পিছু হটতে লাগলেন; ভুলে গেলেন যে নাশতার সাজানো টেবিলটা তার ঠিক পেছনেই; ওখানে পৌঁছেই ঝটপট গিয়ে বসলেন টেবিলের উপর, যেন মন্ত্রমুগ্ধ; আর ততক্ষণে বড় কফিপাত্রটা যে ঠিক তার পাশেই উল্টে গিয়ে এক বিরামহীন ধারায় নিজেকে খালি করতে লেগেছে কার্পেটের উপর, সে বিষয়ে মনে হলো ওনার কোনো হুঁশই নেই।

'মা, মা,' মৃদু গলায় বলল গ্রেগর আর উপরমুখো হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। এখন প্রধান কেরানির কথা তার মন থেকে পুরোপুরি মুছে গেছে; অন্যদিকে, কফি বয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখে চোয়ালগুলোর শূন্যে কয়েকবার কট্‌কট্ করে ওঠা সে থামাতে পারল না কিছুতেই। তা দেখে তার মা আরেকটা তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে টেবিল ছেড়ে পালাতে লাগলেন, গিয়ে পড়লেন গ্রেগরের বাবার দুই বাহুর মধ্যে, যিনি স্ত্রীর দিকে এগিয়ে আসছিলেন তড়িঘড়ি করে। কিন্তু এখন ঠিক বাবা-মায়ের পেছনে নষ্ট করার মতো সময় গ্রেগরের হাতে নেই; প্রধান কেরানি এরই মধ্যে সিঁড়িতে পৌঁছে গেছেন; সিঁড়ির হাতলে থুতনি রেখে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছেন পেছন দিকটা। তাকে ধরাটা যতখানি পারা যায় সুনিশ্চিত করতেই দৌড়ে গেল গ্রেগর; প্রধান কেরানি নিশ্চিত কিছু একটা আঁচ করতে পারলেন, কারণ তা দেখে তিনি সিঁড়ির বেশ কটা ধাপ একটা লাফ দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখনো তিনি চেঁচিয়ে যাচ্ছেন 'উউহ্!' আর পুরো সিঁড়ি জুড়ে প্রতিধ্বনি হচ্ছে সেটার। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সময় গ্রেগরের বাবা, এতক্ষণ যিনি ছিলেন তুলনামূলক শান্ত, প্রধান কেরানির এই পালানো দেখে যেন পুরো তালগোল পাকিয়ে ফেললেন সবকিছু, কারণ ঐ লোকের পেছনে দৌড়ানোর বদলে কিংবা অন্তত গ্রেগরকে ছুটে যাওয়ায় বাধা না দেওয়ার বদলে তিনি ডান হাতে তুলে নিলেন প্রধান কেরানির হাঁটার ছড়িটা – কেরানি এটা একটা চেয়ারের উপর ফেলে রেখে গেছেন তার হ্যাট ও ওভারকোটের সঙ্গে – আর

বাঁ হাতে টেবিলের উপর থেকে টেনে নিলেন বিরাট এক খবরের কাগজ; এবার তিনি মেঝেতে জোরে পা ঠুকতে ঠুকতে ছড়ি আর খবরের কাগজটা নেড়ে গ্রেগরকে তাড়িয়ে ফেরত পাঠাতে লাগলেন তার কামরায়। গ্রেগরের ওজর-আপত্তিতে কোনো কাজ হলো না, আসলে সেগুলো বোধগম্যই হলো না ওনার; যতই ভদ্রভাবে গ্রেগর তার মাথা নাড়ায়, ততই জোরের সঙ্গে তিনি পা ঠোকেন মেঝেয়। ঘরের অন্যদিকে তার মা বাইরের ঠান্ডা সত্ত্বেও একটা জানালা খুলে দিলেন, হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে তিনি ঝুঁকে আছেন জানালার বাইরে। রাস্তা থেকে সিঁড়িঘর বেয়ে ধেয়ে এল একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়া, পর্দাগুলো উঠে গেল উঁচুতে, টেবিলের উপর খবরের কাগজগুলো ফর্‌ফর্‌ শব্দ করতে লাগল, আর আলগা পাতাগুলো মেঝেজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এদিক-ওদিক। নির্মমভাবে তার বাবা তাকে খেদিয়ে যাচ্ছেন পেছনের দিকে, জংলির মতো হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ করছেন তিনি। পেছনদিকে হাঁটার অভ্যাসটা এখনো গ্রেগরের হয়ে ওঠেনি, তাই সে পেছাচ্ছে আসলেই খুব ধীরে। শুধু যদি তাকে একটু উল্টো ঘোরার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে নিজের কামরায় চলে যেতে পারত সে; এখন এই এত সময় নিয়ে চক্রাকারে ঘোরাটা তার বাবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে এই ভয়ে সে ভীত, কারণ তার মনে হচ্ছে ওনার হাতের ঐ ছড়ি যেকোনো সময় তার পিঠে কিংবা মাথায় মারাত্মক আঘাত হেনে বসতে পারে। শেষমেশ গ্রেগরের অবশ্য আর কোনো বিকল্প রইল না, কারণ সে আতঙ্কের সঙ্গে দেখল পেছনে চলতে গিয়ে সে এমনকি নিজের গতিপথও ঠিক রাখতে পারছে না; তাই সে শুরু করল, বারবার বাবার দিকে ভয়ার্ত টেরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে, যত দ্রুত পারা যায় – আসলে হচ্ছে খুবই ধীরে – শরীরটা উল্টো ঘোরানোর। মনে হয় তার বাবা তার এই সদিচ্ছা বুঝতে পারলেন, তিনি তার ঐ কাজে কোনো রকম বাধা দিলেন না, বরং একটু পর পরই দূর থেকে ছড়ির মাথা দিয়ে কাজটা পরিচালনা করতে লাগলেন যেন। শুধু যদি তার বাবার মুখ থেকে বেরোনো ঐ অসহ্য হিস্‌হিস্‌ আওয়াজটা না থাকত! গ্রেগরকে পুরো দিশেহারা করে দিচ্ছে ওটা। তার ঘোরা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন ঐ হিস্‌হিস্‌ শব্দে পুরো মগ্ন থাকার কারণেই সে একটা ভুলও করে বসল – বাবার দিকেই বরং ঘুরে গেল খানিকটা। তবে শেষমেশ যখন সে তার মাথা দরজাপথের ঠিক সামনে নিয়ে এসেছে, দেখা গেল ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়ে তার অতিরিক্ত রকমের চওড়া এই শরীরটা ঢুকবে না। তার বাবাও, নিজের এখনকার মানসিক অবস্থার কারণেই, গ্রেগরকে দরকারি জায়গাটুকু করে দিতে একটু ভাবলেনও না যে দরজার অন্য পাল্লাটা খুলে দেওয়া উচিত। তার স্রেফ একটাই চিন্তা – যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেগরকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া। অন্যদিকে গ্রেগর যে শরীরটা খাড়া করে উপরে তুলে ওভাবেই দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকে যাবে – সেটুকু করতে যে পরিমাণ বিশদ প্রস্তুতির দরকার, তিনি তা গ্রেগরকে দেবেন না কোনোমতেই। এর বদলে তিনি এখন গ্রেগরকে এমনভাবে তাড়াতে লাগলেন যেন দরজাটা গ্রেগরের জন্য কোনো বাধাই না, আর সেই সঙ্গে অসম্ভব বেশিরকম আওয়াজ করতে লাগলেন মুখ দিয়ে; গ্রেগরের আর মনে হচ্ছে না যে তার পেছনে এটা স্রেফ মাত্র একজন বাবার আওয়াজ;

এখন আর কোনোকিছু নিশ্চিতই ঠাট্টা-তামাশার পর্যায়ে নেই, তাই যা হওয়ার হোক এই ভেবে গ্রেগর তার শরীর ছুড়ে মারল দরজাপথের ভেতর দিয়ে। উঁচু হয়ে থাকল তার শরীরের একটা পাশ, দরজাপথে কাৎ হয়ে পড়ে রইল সে, শরীরের পাশগুলো ঘষা খেয়ে রীতিমতো ছাল-চামড়া উঠে গেল, সাদা দরজা ভরে গেল কুৎসিত সব দাগে, পরক্ষণেই সে আটকে গেল পুরোপুরি, নিজে নিজে নড়ার কোনো ক্ষমতাই আর তার নেই, এক পাশে ছোট ছোট পাগুলো শূন্যে কাঁপছে থিরথিরিয়ে আর অন্য পাশেরগুলো খুব ব্যথা নিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে পড়েছে মেঝের উপর – ঠিক এ সময়ে তার বাবা পেছন থেকে তাকে প্রচণ্ড একটা গুঁতো দিলেন, যথার্থই সেটা মুক্তি দিল তাকে, সে ছিটকে পড়ল ঘরের একেবারে ভেতরের দিকে, প্রচুর রক্ত ঝরছে তখন। ছড়িটা দিয়ে সশব্দে বন্ধ করা হলো দরজা, আর তারপর অবশেষে সবকিছু নীরব-নিথর।

২.

গভীর এক ঘুম থেকে যখন গ্রেগর জাগল, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ঘুম নয়, মূর্ছা বলাই ঠিক। কোনো সন্দেহ নেই কিছুক্ষণ পরে এমনিতে নিজেই জেগে উঠত সে, অন্য কেউ তার ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটালেও, কারণ যথেষ্টই ভালো ঘুম আর বিশ্রাম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তার; তবে তার অনুমান, হন্তদন্ত একটা পায়ের আওয়াজ আর হলঘরে যাওয়ার দরজা চুপিসারে বন্ধ করার শব্দই জাগিয়ে তুলেছে তাকে। ঘরের সিলিঙে এখানে-ওখানে আর আসবাবের উপরের দিকটায় রাস্তার বৈদ্যুতিক বাতির আলো কেমন বিষণ্ন রশ্মি ফেলেছে, কিন্তু নিচে যেখানে গ্রেগর শুয়ে আছে সে জায়গাটা অন্ধকার। ধীরে ধীরে – তখনো সে জবুথবু হাতড়ে বেড়াচ্ছে তার শুঙগুলো দিয়ে, ওগুলোর উপকারিতা প্রথমবারের মতো সে বুঝতে শুরু করেছে – সে শরীরটা ঠেলে নিল দরজার দিকে, ওদিকে কী হচ্ছে তা দেখতে চায়। শরীরের পুরো বাঁ পাশ তার এক লম্বা, অসহনীয় টনটনে ঘা বলে মনে হচ্ছে, আর তাকে চলতে হচ্ছে দুই সারি পায়ের উপর নিয়মিত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার ওপর সকালের ঐ ঘটনায় তার একটা পা জখম হয়েছে মারাত্মক – প্রায় অলৌকিক ব্যাপার যে শুধু একটা পা-ই জখম হলো – আর সেটা অকেজো অবস্থায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আসছে তার পেছনে।

দরজার কাছে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি আসলে কোন জিনিসটা তাকে এদিকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে এল: খাবারের গন্ধ। মেঝেতে পড়ে আছে এক পাত্র সর ওঠা দুধ, তাতে ভাসছে সাদা পাউরুটির ছোট ছোট টুকরো। খুশির চোটে গ্রেগর প্রায় হেসেই ফেলছিল, কারণ সকালের চেয়েও এখন সে অনেক বেশি ক্ষুধার্ত; একটুও দেরি না করে দুধের মধ্যে সে চুবিয়ে দিল তার মাথা, প্রায় একেবারে চোখ অবধি। কিন্তু একটু পরেই মাথা তুলে আনল হতাশ হয়ে; শুধু এ না যে শরীরের বাঁ পাশের কাঁচা অবস্থার

কারণে খেতে কষ্ট হচ্ছে তার – আর তার মুমূর্ষু গোটা শরীরটা একসঙ্গে নড়লেই কেবল খেতে পারছিল সে –, সেই সঙ্গে দুধটা খেতেও বিস্বাদ লাগছে, যদিও দুধ তার সব সময়ই প্রিয় আর তার বোন যে সে কথা ভেবেই দুধ রেখে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; আসলেই, প্রায় এক গা-ঘিনঘিন ভাব নিয়ে সে সরে গেল পাত্রটা থেকে আর হামা দিয়ে দিয়ে গেল ঘরের মাঝখানে।

এর মধ্যে বসার ঘরে জ্বলে উঠেছে গ্যাসবাতি, দরজার ফাটলের মধ্য দিয়ে তা দেখতে পাচ্ছে গ্রেগর; কিন্তু এ সময়ে তার বাবার যেখানে অভ্যাস সন্ধ্যার খবরের কাগজের বাছাই অংশগুলো জোরে তার মা আর মাঝেসাঝে বোনকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়া, সেখানে এখন বিরাজ করছে এক পিনপতন নীরবতা। তার মানে, ওনার জোরে জোরে পড়ার এই অভ্যাসটা – যা নিয়ে বোনটা সব সময়ই তাকে বলত কিংবা চিঠিতে লিখে জানাত – ইদানীং যেভাবেই হোক তিনি ছেড়েছেন। কিন্তু সব দিকেই যে একই রকম নীরবতা, যদিও নিশ্চিত বাসাটায় লোকজন অবশ্যই আছে। 'কী শান্তির এক জীবনই না কাটাচ্ছে এই পরিবারটা,' আপন মনে বলল গ্রেগর, আর ওখানে বসে যখন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন তার গর্ব হলো এ রকম সুন্দর একটা বাসায় নিজের বাবা-মা ও বোনকে এমন একটা জীবনের ব্যবস্থা করে দিতে পারার কারণে। কিন্তু এখন যদি এই যাবতীয় শান্তি, যাবতীয় আরাম-আয়েশ আর তৃপ্তির কোনো ভয়ংকর সমাপ্তি ঘটে? এসব চিন্তার মধ্যে নিজেকে না ডুবিয়ে গ্রেগর বরং হাঁটা শুরু করল আর হামা দিয়ে ঘুরতে লাগল তার ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা।

দীর্ঘ সন্ধ্যায় একবার এদিকের, আরেকবার ওদিকের দরজা সামান্য ফাঁক করে খোলা হলো, ফের বন্ধ করে দেওয়া হলো জলদি; মনে হয় কেউ প্রথমে ভেতরে আসার তাড়া বোধ করেছিল, কিন্তু পরে অস্বস্তি বোধ করে বসে। গ্রেগর এবার সোজা বৈঠকখানার দরজার কাছে গিয়ে বসে থাকল, ঐ দ্বিধান্বিত দর্শনার্থীকে যে করেই হোক ভেতরে আনার ব্যাপারে সে বদ্ধপরিকর, অন্তত মানুষটা কে তা সে দেখতে চায়; কিন্তু দরজা এর পরে আর খোলা হলো না একবারও, আর বৃথাই অপেক্ষা করতে লাগল সে। সকালে দরজাগুলো যখন তালা দেওয়া ছিল, তখন তো সবাই তাকে দেখতে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছে; আর এখন, নিজে সে একটা দরজার তালা খোলার পরও, সেই সঙ্গে অন্যসব দরজা পরিষ্কার সারা দিন তালা খোলা অবস্থায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও, কেউই আর আসছে না; এমনকি চাবিগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাইরের দিকে তালায় লাগিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো।

বৈঠকখানার বাতি নিভিয়ে দিতে দিতে অনেক রাত নেমে এল, গ্রেগর খুব সহজেই বলতে পারে তার বাবা-মা আর তার বোনটাও এত রাত পর্যন্ত জেগেই আছে, কারণ তাদের তিনজনেরই পা টিপে টিপে চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। এটা এখন নিশ্চিত, সকালের আগে কেউই আর গ্রেগরের কাছে আসছে না; সুতরাং জীবনটা কী করে সবচেয়ে ভালোভাবে ঢেলে সাজানো যায়, তা নিয়ে চুপচাপ শান্তিতে ভাবার তার হাতে এখন প্রচুর সময়। কিন্তু এই উঁচু, বিশাল ঘরটা – যার মধ্যে কিনা মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে

হচ্ছে তাকে – এমন এক উদ্বেগের মধ্যে তাকে ফেলে দিল যার কোনো ব্যাখ্যা সে খুঁজে পাচ্ছে না – যেহেতু আর যা-ই হোক, এ তার নিজেই ঘর, গত পাঁচ বছর ধরে সে বাস করে আসছে এখানে –, এবং প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারে নড়ে উঠে, কিছুটা লজ্জার অনুভূতি নিয়েই, সে তড়িঘড়ি প্রায় পালিয়ে ঢুকল সোফার নিচে। ওখানে তার পিঠটা যদিও খানিক চাপাচাপির মধ্যে থাকল আর মাথা তোলা হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব, তবু সঙ্গে সঙ্গেই বেশ আরাম বোধ করল সে, শুধু একটাই আক্ষেপ – শরীরটা এতই চওড়া যে পুরোটা সোফার নিচে ঢোকানো যাচ্ছে না।

ওখানেই সে থাকল সারা রাত, কখনো তন্দ্রায় – যা থেকে ক্ষুধার জ্বালা তাকে জাগিয়ে তুলল বারবার –, কখনো শঙ্কা আর অনিশ্চিত আশায় ডুবে। এর সবই একই উপসংহারে গিয়ে ঠেকল যে আপাতত তাকে শান্ত থাকতে হবে, আর ধৈর্য ও পরম বিবেচনার সঙ্গে তার পরিবারকে এই ঝামেলার ভার বহনে সাহায্যের চেষ্টা করতে হবে, তার এখনকার অবস্থার বিচারে যে-ঝামেলা পরিবারের ঘাড়ে না চাপিয়ে তার কোনো উপায়ও নেই।

পরদিন খুব ভোরে, আলো ফোটারও খানিক আগে, গ্রেগরের সুযোগ মিলে গেল নিজের নতুন সিদ্ধান্তগুলোর শক্তি পরীক্ষা করার, যখন তার বোন, প্রায় ফিটফাট হয়ে হলঘরের দিক থেকে একটা দরজা খুলে বিচলিত ভাবে উঁকি দিল ভেতরে। গ্রেগরকে সে প্রথমে দেখতে পেল না, কিন্তু যখন সোফার নিচে তাকে খুঁজে পেল – হায় খোদা, কোথাও তো তাকে থাকতে হবে, সে তো আর উড়ে চলে যেতে পারে না – তখন এত বেশি চমকে উঠল যে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল আবার। কিন্তু যেন নিজের ব্যবহারেই অনুতপ্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফের সে দরজাটা খুলল, তারপর পা টিপে টিপে ঢুকল ভেতরে, যেন সে দেখতে এসেছে খুব অসুস্থ কাউকে কিংবা একদম অচেনা কোনো মানুষকে। গ্রেগর সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে তার মাথা সোফার একেবারে কিনারায় নিয়ে এসেছে আর দেখছে তার বোনকে। তার বোন কি দেখতে পাচ্ছে যে সে দুধ খায়নি, আর তা কোনোমতেই এ কারণে না যে তার খিদে নেই; তার জন্য আরেকটু জুতসই হয় এমন অন্য কোনো খাবার সে কি দেবে না তাকে? তার বোন নিজে থেকেই যদি এটা না করে, তাহলে বোনকে এটা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বদলে সে বরং উপোস করেই মরবে; তবে সত্যি হচ্ছে, সোফার নিচ থেকে ছুটে বেরিয়ে তার বোনের পায়ের কাছে নিজেকে ছুড়ে দিয়ে ভালো কোনো খাবারের মিনতি জানানোর এক প্রচণ্ড তাড়না অনুভব করছে গ্রেগর। ঠিক এ সময়ই তার বোন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল দুধের পাত্র তখনো ভরা, শুধু কিনারগুলোর আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দু-একটা ফোঁটা; তখুনি সে তুলে নিল পাত্রটা – না, খালি হাতে না, বরং একটা ন্যাকড়া দিয়ে ধরে – আর বাইরে নিয়ে গেল। দুধের বদলে সে তার জন্য কী নিয়ে আসে, তা জানতে খুব কৌতূহলী হয়ে রইল গ্রেগর আর এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন হলো। কিন্তু তার বোন, বিশাল উদারতা দেখিয়ে বাস্তবে যা করল, তা গ্রেগরের অনুমানের বাইরে। কী সে পছন্দ করে তা বুঝতে নানা ধরনের একগাদা খাবার সে

নিয়ে এসেছে তার জন্য, ওগুলো বিছানো একটা পুরোনো খবরের কাগজে। ওতে আছে বাসি, আধা-পচা শাকসবজি; সাদা জমাট সসে ঢাকা গত রাতের খাবারের হাড়গোড়; কয়েকটা বাদাম আর কিশমিশ; কদিন আগে খাওয়ার অযোগ্য বলে গ্রেগরেরই ঘোষণা করা কিছু পনির; শুকনো রুটির একটা টুকরো, মাখন দেওয়া এক ফালি পাউরুটি, আর আরেক ফালির সঙ্গে খানিক লবণ। এগুলোর সঙ্গে আগের পাত্রটাও সে নামিয়ে রাখল – এখন থেকে এ পাত্রটা সম্ভবত স্থায়ীভাবে গ্রেগরেরই জন্য – ওর মধ্যে সে ঢেলে রেখেছে অল্প একটু পানি। তারপর বেশ বুদ্ধির সঙ্গেই সে – যেহেতু সে জানে তার উপস্থিতিতে গ্রেগর খাবে না – চলে গেল ওখান থেকে; আর এমনকি গ্রেগর যেন বুঝতে পারে এখন সে নিজের খুশিমতো খাওয়া শুরু করতে পারে, তাই তালাটাও লাগিয়ে দিল। যেহেতু খাবার দেওয়া হয়েছে, তাই তার ছোট ছোট পা ওদিকে ছুটল সরসর করে। তার ঐসব আঘাত নিশ্চয়ই সেরে গেছে, কারণ চলতে গিয়ে কোনো বাধাই অনুভব করল না সে; ব্যাপারটা অবাক করল তাকে, সে ভাবতে লাগল কীভাবে, এক মাস আগে, ছুরিতে সামান্য আঙুল কেটে গিয়েছিল তার, আর কীভাবে মাত্র এই গত পরশু দিনও, ব্যথা করছিল সেখানে। 'তাহলে কি মনে হয় আমার অনুভূতিশক্তি আগের চাইতে কমে গেছে?' ভাবল গ্রেগর; ততক্ষণে লোভাতুর হয়ে চুষতে লেগেছে পনিরটা, ওটার দিকে সে তৎক্ষণাৎ আর যেন বাধ্যের মতো আকর্ষিত হয়েছে অন্য যেকোনো খাবারের চেয়ে বেশি। পালা করে খুব ঝটপট, দুচোখে তৃপ্তির কান্না ঝরাতে ঝরাতে সে সাবাড় করল পনির, শাকসবজিগুলো আর সসটা; অন্যদিকে তাজা খাবারগুলোতে তার রুচি হলো না, সে আসলে ওগুলোর গন্ধও সহ্য করতে পারছে না, আর তাই তার পছন্দের খাবারগুলো সে এমনকি সরিয়ে নিয়ে গেল খানিক দূরে। অনেকক্ষণ হলো তার খাওয়া শেষ হয়েছে, ওই জায়গাতেই সে পড়ে আছে অলসের মতো আর এ সময় তার বোন – তাকে সরে যাওয়ার সংকেত জানাতেই যেন – চাবি ঘুরানো শুরু করল ধীরে ধীরে। হঠাৎ তাকে চমকে তুলল সেই শব্দ, তার প্রায় ঝিমুনিমতো এসে গিয়েছিল, আর আবার সে শাঁই করে ছুটে গেল সোফার নিচে। মাত্র অল্পক্ষণ তার বোন থাকল এই ঘরে, কিন্তু ঐটুকু সময়ও সোফার নিচে থাকতে গ্রেগরকে বিরাট মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে হলো, কারণ এত খাওয়ার পর তার শরীর খানিক ফেঁপে ওঠায় সোফার নিচের ঐ ঠাসাঠাসি জায়গায় তার শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

দম আটকে আসা অনুভূতির ফাঁকে ফাঁকেই গ্রেগর তার অল্প ফোলা চোখ দুটো দিয়ে দেখতে লাগল তার বোন – এসবে অসন্দিহান মেয়েটা – একটা ঝাড়ু হাতে নিয়ে ঝাঁট দিয়ে শুধু তার খাওয়া উচ্ছিষ্টগুলোই সরাচ্ছে না, সেই সঙ্গে সরিয়ে নিচ্ছে এমনকি তার না-ছোঁয়া খাবারগুলোও, যেন ওগুলোও আর কোনো কাজে আসবে না; তারপর সবকিছু তাড়াতাড়ি একটা বালতির মধ্যে ফেলে, কাঠের এক তক্তা দিয়ে বালতি ঢেকে সে ওটা নিয়ে চলে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার জন্য তার বোন ঘোরামাত্রই সোফার নিচে থেকে শরীর টেনে বাইরে নিয়ে এল গ্রেগর – একটু লম্বা হয়ে পেটটা ফোলাবে বলে।

এভাবেই রোজ চলতে লাগল গ্রেগরকে খাবার দেওয়া, প্রথমবার ভোরে যখন তার বাবা-মা আর কাজের মেয়ে তখনো ঘুমিয়ে, আর আরেকবার সবার দুপুরের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে, যখন তার বাবা-মা আরেকবার দুপুরের ছোট ঘুম দিতেন আর মেয়েটাকে তার বোন পাঠিয়ে দিত বাইরে কোনো একটা কাজে। গ্রেগর উপোস করে থাকুক, এটা নিশ্চিত তার বোনের মতোই অন্যেরাও কেউ চায় না, কিন্তু সম্ভবত তার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ওই পরোক্ষ জ্ঞানটুকুই তাদের বহন ক্ষমতার শেষ সীমা; কিংবা খুব সম্ভব তার বোন তাদের সামান্য পীড়াদায়ক কোনো অভিজ্ঞতাও দিতে চাচ্ছে না, কারণ এটা সত্যি যে তারা এমনিতেই রয়েছেন যথেষ্ট ভোগান্তিতে।

সেই প্রথম সকালে ডাক্তার ও তালাওয়ালা ফ্ল্যাটে আসবার পরে কী বলে তাদের আবার বিদায় করা হয়েছিল। তা জানা গ্রেগরের পক্ষে সম্ভব হয়নি; অন্যরা যেহেতু তার কথা বোঝে না তাই তাদের মাথায়, এমনকি তার বোনের মাথায়ও, এটা কখনোই ঢোকেনি যে গ্রেগর তাদের কথাবার্তা বুঝতে পারছে; তাই তার বোন যখন এ ঘরে আসে তখন গ্রেগরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় কেবল তার হঠাৎ হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস আর সেইন্টদের নাম জপা শুনেই। কেবল পরের দিকেই, যখন তার বোন নতুন অবস্থাটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করল – তাই বলে কখনোই পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠার তো কোনো প্রশ্নই আসে না –, তখন গ্রেগর কখনো-সখনো শুনতে পেত তার দু-একটা মন্তব্য, ওগুলোর মধ্যে দরদ কিংবা অমন কিছুর সুরটা বুঝতে পারত সে। 'আজ দেখি খাবারটা ওর সত্যিই পছন্দ হয়েছে,' সে হয়তো বলত যখন দেখা যেত গ্রেগর মানুষের মতো পেট পুরে খেয়েছে, আর যখন উল্টোটা ঘটত – ইদানীং তেমনটা খুব ঘন ঘন হওয়া শুরু হয়েছে – তখন সে প্রায় বিমর্ষ হয়ে বলত: 'আজ তো দেখি খাবার সব পড়ে আছে।'

যদিও কোনো খবর সরাসরি পাওয়া গ্রেগরের পক্ষে সম্ভব না, তবু পাশের ঘরগুলোর বেশ কিছু কথাবার্তা ঠিকই তার কানে এসে পৌঁছাত, আর যখনই কোনো গলার আওয়াজ পেত সে, অমনি সোজা দৌড়ে যেত সেই দরজার দিকে, পুরো শরীর ঠেসে ধরত এর গায়। বিশেষ করে প্রথমদিকের দিনগুলোয় এমন কোনো আলাপই হতো না যা কোনো-না-কোনোভাবে, স্রেফ পরোক্ষভাবে হলেও, গ্রেগরের বিষয়ে না। পুরো দুই দিন প্রত্যেক বেলা খাবার সময়ই এখনকার করণীয় নিয়ে শলাপরামর্শ শোনা যেত; আর খাবারের মাঝখানের সময়েও একই বিষয়ে আলোচনা চলত; সব সময়ই পরিবারের অন্তত দুজন বাড়িতে থাকতই, হয়তো এ কারণে যে কেউই একা থাকতে চাইত না এ ফ্ল্যাটে, আর ফ্ল্যাট পুরোপুরি খালি ফেলে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। এ ছাড়া কাজের মেয়েটাও গ্রেগরের মায়ের কাছে এসেছিল একেবারে প্রথম দিনেই – এই ঘটনা বিষয়ে তার জ্ঞান কতটুকু ছিল তা পুরো স্পষ্ট না – আর হাঁটু গেড়ে মিনতি করেছিল যেন তাকে এক্ষুনি বিদায় করে দেওয়া হয়; মিনিট পনেরো পরে তার বিদায়ের সময় কাঁদতে কাঁদতে সে ধন্যবাদ দিয়েছিল সবাইকে – যেহেতু তাকে এই কাজ থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে, এ বাড়িতে যেন তার প্রতি করা এটাই আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় উপকার –, সেই সঙ্গে কেউ কিছু তাকে

না বললেও নিজের থেকেই ধর্মের নামে কঠিন শপথ করে সে বলেছিল যে এ বিষয়ে কাউকেই কখনো কোনোকিছু বলবে না।

অতএব এখন গ্রেগরের বোনকে, তার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে, রান্নাবান্নার কাজও করতে হচ্ছে; যদিও সত্যি হলো, এটা কোনো বিরাট পরিশ্রমের কাজই না, কারণ এই পরিবারের কেউ এখন বলতে গেলে কিছুই খায় না। গ্রেগর সব সময়ই শোনে তারা একে অন্যকে খাওয়ার নিষ্ফল অনুরোধ করে যাচ্ছে, আর কখনো উত্তর পাচ্ছে না কোনো, স্রেফ: 'না থ্যাংকস্, যথেষ্ট খেয়েছি আমি,' কিংবা এ রকমই কিছু। মনে হয়, তারা এমনকি কোনো ড্রিংকস্‌ও ছোঁয় না। প্রায়ই তার বোন বাবাকে জিগ্যেস করে তিনি একটু বিয়ার খাবেন কি না, যথেষ্ট দরদ দিয়ে নিজে বাইরে গিয়ে সেটা নিয়ে আসারও কথা বলে; আর যখন তার বাবা কোনো জবাব দেন না তখন ওনার সব দ্বিধা দূর করার জন্যই সে বলে, ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকারকে এই কাজে যেকোনো সময়ই বাইরে পাঠানো যায়; কিন্তু শেষমেশ তার বাবা একটা দৃঢ় 'না' বলে দেন আর সেই সঙ্গে শেষ হয় এ নিয়ে সব আলাপ।

ঘটনার একেবারে প্রথম দিনেই তার বাবা তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে তার মা ও বোনের কাছে একটা বিশদ বিবরণ দিলেন। একটু পর পরই তিনি টেবিল ছেড়ে উঠলেন আর ছোট সিন্দুকটা থেকে বের করে আনলেন কোনো রসিদ বা নোট বই, পাঁচ বছর আগে তার ব্যবসা বসে যাওয়ার সময় থেকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন ওগুলো। এই শোনা গেল তার জটিল তালা খোলার শব্দ, আর যা খুঁজছেন তা বের করে নিতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল সিন্দুক। তার বন্দিদশা শুরু হওয়ার পর তার বাবার দেওয়া এই বিবরণটাই, পুরোটা না হলেও অন্তত এর কিছুটা, ছিল গ্রেগরের শোনা প্রথম আশ্বস্ত হওয়ার মতো কথা। সে ধরে নিয়েছিল বাবার পুরোনো ব্যবসায় একটা পয়সাও আর অবশিষ্ট নেই, অন্তত এ ধারণার উল্টো কোনোকিছু তার বাবা কখনোই বলেননি, যদিও এ-ও সত্য গ্রেগর তাকে কখনো কিছু জিগ্যেসও করেনি। সে সময় গ্রেগরের একমাত্র চিন্তাই ছিল সম্ভাব্য সবকিছু করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পরিবারটাকে ঐ ব্যবসা বসে যাওয়ার ধাক্কা ভুলতে সাহায্য করা, যে ধাক্কা তাদের সবাইকে ছুড়ে দিয়েছিল চরম এক হতাশ অবস্থার মধ্যে। আর তাই অস্বাভাবিক এক উদ্যম নিয়ে কাজে নেমে পড়েছিল গ্রেগর, ফলে প্রায় রাতারাতি এক সামান্য কেরানি থেকে পদোন্নতি পেয়ে হয়েছিল ভ্রাম্যমাণ সেলস্‌ম্যান – এর ফলে তার সামনে এল টাকা কামানোর পুরো নতুন এক পথ যেহেতু সেলস্‌ম্যানের চাকরিতে কাজের ফলাফল, যদি সে সফল হয়, সোজা রূপান্তরিত হয়ে যায় কমিশন হিসেবে পাওয়া মোটা টাকায়; যা সে বাড়িতে নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগল তার পরিবারের বিস্মিত ও আনন্দিত দৃষ্টির সামনে। কত সুখে ভরা সব দিন ছিল সেগুলো, সেসব দিন আর ফিরে আসেনি কখনোই, অন্তত ওরকম জাঁকজমক নিয়ে না; যদিও পরে এত টাকাই গ্রেগর কামাতে লাগল যে একসময় তার পরিবারের পুরো ব্যয়ভার তার পক্ষেই বহন করা সম্ভবপর হয়ে উঠল, আর সে তা করতেও লাগল। একসময় সবাই ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, পরিবার ও গ্রেগর – দুই পক্ষই;

তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েই টাকাটা নেওয়া হতো তার হাত থেকে, আর খুশি মনেই সে পরিবারের হাতে তুলে দিত ওটা, কিন্তু খুব বেশি দিন আলাদা কোনো আর উষ্ণতা থাকল না ব্যাপারটাতে। একমাত্র তার বোনের সঙ্গেই যা অন্তরঙ্গ রয়ে গেল গ্রেগর। তার একটা গোপন সংকল্প ছিল যে বোনকে – যে কিনা খুবই সংগীতপ্রিয় (গ্রেগর একদমই না) আর বেহালা বাজাতে পারে একেবারে হৃদয়ছোঁয়া সুরে – পরের বছর সংগীত-বিদ্যালয়ে পাঠাবে সে, তাতে খরচ অনেক লাগলে লাগবে, সে জানত কোনো-এক-রকমভাবে চেষ্টা করে খরচটা সামলানো যাবে। মাঝেমধ্যে সামান্য কদিনের জন্য যখন গ্রেগরের কাজ পড়ত এই শহরে, তখন তার বোনের সঙ্গে আলাপের সময় প্রায়ই উঠত সংগীত-বিদ্যালয়ের কথাটা, অবশ্য সব সময়ই সুন্দর কোনো এক স্বপ্ন হিসেবেই, যে-স্বপ্নের বাস্তবায়ন অসম্ভব, আর এ নিয়ে এমনকি এসব নির্দোষ পরোক্ষ কথাবার্তাও তার বাবা-মা খুব একটা পছন্দ করতেন না; তবে এ বিষয়ে মনে মনে খুব স্পষ্ট করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গ্রেগর, সে চাচ্ছিল এই ক্রিসমাসেই বেশ আনুষ্ঠানিকভাবে সে ঘোষণা করবে তার সংকল্পের কথা।

এসব চিন্তাই – তার বর্তমান অবস্থার বিচারে একেবারে অন্তঃসারশূন্য চিন্তা – ওখানে দরজা ধরে খাড়া হয়ে দরজার সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে অন্যদের কথা শোনার সময় ঝড় তুলত গ্রেগরের মনে। কখনো হয়তো বা স্রেফ ক্লান্তি থেকেই সে আর মনোযোগ রাখতে পারত না, আর অসাবধানে দুম করে মাথাটা ঠুকে বসত দরজায়, কিন্তু তক্ষুনি আবার সোজা হয়ে যেত, কারণ দেখা যেত এই সামান্য শব্দই পাশের ঘরের সবার কানে যাওয়ার জন্য আর তাদের আলাপ থামিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। 'এখন আবার কী চাচ্ছে ও?' একটু থেমে তার বাবা বলতেন, নিশ্চিত দরজার দিকে ঘুরে; শুধু তার পরই তাদের থেমে যাওয়া আলাপ আস্তে আস্তে শুরু হতো আবার।

গ্রেগর এখন খুব ভালোমতো বুঝতে পারল যে – কারণ তার বাবা একই জিনিস বারবার করে ব্যাখ্যা করলেন, কিছুটা এ কারণে যে বহুদিন হয়ে গেছে তিনি এসব নিয়ে শেষবার মাথা ঘামিয়েছেন আর কিছুটা এ কারণে যে গ্রেগরের মা সব সময় সবকিছু প্রথমবারে ধরতে পারেন না – সর্বনাশা সেই বিপর্যয় সত্ত্বেও কিছু পরিমাণ টাকা, সত্যি যে খুবই সামান্য কিছু, বেঁচে গেছে সেই পুরোনো দিনগুলো থেকে, আর এই এত দিনের জমতে থাকা সুদের কারণে তা খানিকটা বেড়েছেও বটে। এর পাশাপাশি, প্রতি মাসে যে টাকা গ্রেগর বাড়িতে দিত – সামান্য কিছু খুচরো পয়সাই কেবল সে ফেলে রাখত নিজের জন্য – তার পুরোটা খরচ করা হয়নি, আর সেটাই জমতে জমতে রূপ নিয়েছে একটা মোটামুটি মূলধনে। গ্রেগর, দরজার পেছনে শরীর রেখে, অধীর হয়ে মাথা ঝাঁকালো, এই অভাবনীয় মিতব্যয়িতা আর দূরদৃষ্টির কথা শুনে সে উল্লসিত। সে আসলে এই বাড়তি টাকাটা বসের কাছে তার বাবার ঋণ আরো বেশি বেশি করে শোধ করার কাজে ব্যবহার করতে পারত, তা করলে তার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার দিনটা হয়তো আরো খানিক এগিয়ে আনা যেত, কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে তার বাবা যা করেছেন সেটাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ঠিক কাজ ছিল।

এই সামান্য কটা টাকার সুদের ওপর কিংবা ও-ধরনের কিছুর ওপর নির্ভর করে অবশ্য এই গোটা পরিবারের খুব বেশি দিন চলবে না; এতে এক বছর টিকে থাকা যাবে, কিংবা খুব বেশি হলে দুই বছর, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সত্যি বলতে, এ-ঠিক এমনই কয়টা টাকা যা ছোঁয়া উচিত না, বরং জরুরি দরকারের জন্য রেখে দেওয়াই উচিত; তাই রোজকার খবরের ব্যাপারে কথা হলো, তা কামাই করা ছাড়া অন্য পথ নেই। গ্রেগরের বাবা সত্যিকার অর্থে এখনো স্বাস্থ্যবান আছেন, কিন্তু এই বুড়ো মানুষটা গত পাঁচ বছর ধরে কোনো কাজ করেননি, আর এখন যে খুব বেশি কিছু করতে পারবেন সে আশা করা তার নিশ্চিত উচিত না; এই পাঁচ বছরে – যা তার কঠোর খাটুনির কিন্তু ব্যর্থ এই জীবনের প্রথম বিশ্রাম –, শরীরে তিনি অনেক চর্বি জমিয়ে ফেলেছেন, ফলে তার চলাফেরা হয়ে গেছে চোখে পড়ার মতো ঢিমেতালের। আর গ্রেগরের বৃদ্ধ মায়ের ব্যাপারে বলতে হয়, হাঁপানির রোগী তিনি; কী করে তিনি পয়সা রোজগার করবেন যখন কিনা এমনকি ফ্ল্যাটে হেঁটে বেড়াতেও কষ্ট হয় তার, আর প্রতি একদিন পর পর জানালা খুলে সেখানে পাশের সোফায় শুয়ে দম ফুরিয়ে শ্বাস নিতে হয় তাকে? তাহলে কি কাজ করার জন্য তার বোনই বেরোবে ঘর থেকে, যে এখনো সতেরো বছর বয়সের একটা বাচ্চার বেশি না; ও যেভাবে দিন কাটায় তাতে বাধা দেওয়া হবে তো অপরাধেরই শামিল – সুন্দর জামাকাপড় পরা, অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমানো, ঘরের কাজে টুকটাক সাহায্য করা, ছোটখাটো আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়া আর, সবার ওপরে, বেহালা বাজানো, এই তো তার জীবন? দরজার ওপাশের কথাবার্তা যখনই টাকা রোজগারের আবশ্যিকতার দিকে ঘুরে যায়, গ্রেগর তখন সঙ্গে সঙ্গে দরজা থেকে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে, ছুঁড়ে দেয় পাশের ঠান্ডা চামড়ার সোফার উপর, কারণ তখন তার সারা শরীরে সে বোধ করতে থাকে লজ্জা ও মর্মপীড়ার তাপ।

প্রায়ই সে সারা রাত পড়ে থাকে ওখানে, একফোঁটা ঘুমায় না, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু আঁচড় কাটে সোফার গায়ে। কিংবা জানালার কাছে একটা হাতলওয়ালা চেয়ার ঠেলে নেওয়ার কষ্টকর কাজে ব্যস্ত হয়, একসময় বুকে ভর দিয়ে উঠে যায় জানালার চৌকাঠে, চেয়ারের উপরে শরীরের ভার ঠেকিয়ে শার্সির গায়ে ঝুঁকে থাকে, আর স্পষ্টই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে মুক্তির সেই স্বাদের স্মৃতিচারণা করে, জানালার বাইরে তাকিয়ে যে স্বাদটা সে আগে সব সময় পেত। আর এখন দেখা যাচ্ছে সামান্য দূরের জিনিসও দিন দিন আরো ঝাপসা হয়ে আসছে তার চোখে; এখন আর সে রাস্তার ওপাশের হাসপাতালটা একদমই দেখতে পায় না, আগে যেটা সব সময় চোখের সামনে পড়ে থাকত বলে গালিও দিত সে; যদি সে একেবারে নিশ্চিতভাবেই না জানত যে এটা শান্ত, আর পুরো শহুরে সেই শার্লট স্ট্রিট, তাহলে হয়তো সে ধরে নিত জানালার বাইরে ওটা বরং কোনো বিরানভূমি, যেখানে ধূসর আকাশ আর ধূসর মাটি একেবারে একাকার হয়ে গেছে। তার সুবিবেচক বোনটার শুধু দুই বার দেখতে হলো যে হাতলওয়ালা চেয়ারটা পড়ে আছে জানালার পাশে; তার পর থেকে সে কামরা সাফ করা শেষ হলেই যত্নের সঙ্গে ফের চেয়ার ঠেলে রাখত জানালার ওখানে আর এমনকি জানালার ভেতর দিকের শার্সিও শুরু করল খুলে রেখে যাওয়া।

শুধু যদি গ্রেগর তার বোনের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারত, আর তার বোন দয়া করে তার জন্য যা কিছু করছে সেজন্য খানিক ধন্যবাদ জানাতে পারত – তাহলে তার এসব সেবাযত্ন নেওয়া কিছুটা সহজ হতো গ্রেগরের পক্ষে; ওটা ছাড়া এগুলো তাকে মানসিক চাপ দিচ্ছে। পুরো ব্যাপারটার অপ্রীতিকরতা ধামাচাপা দেওয়ার সব চেষ্টা, বলতেই হয়, তার বোন করে যাচ্ছে, আর স্বাভাবিক যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ কাজে সে আরো পটু হয়ে উঠছে, কিন্তু সমানভাবে, যত সময় যাচ্ছে গ্রেগর আরো ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারছে সবকিছু। যেভাবে তার বোন ঘরে ঢোকে সেটাই তার কাছে রীতিমতো আতঙ্কের; ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই, দরজা বন্ধ করার জন্যও না-থেমেই – অন্যদের যেন গ্রেগরের ঘর কখনো দেখতে না হয় সেজন্য তার সব সময় কী চেষ্টা – সে সোজা ছুটে যায় জানালার কাছে আর অস্থির হাতে হুড়মুড় করে খুলে দেয় জানালা, যেন তার দম বন্ধ হয়ে গেছে; আর বাইরে এত ঠান্ডা সত্ত্বেও গভীর শ্বাস নিতে নিতে ওখানে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। এসব শব্দ আর তাড়াহুড়া দিয়ে প্রতিদিন দুবার সে আতঙ্কিত করে গ্রেগরকে; পুরো সময় ভয়ে কেঁপে সে পড়ে থাকে সোফার নিচে; সে ভালো করেই বোঝে যে এই অত্যাচার থেকে তার বোন তাকে ঠিকই রেহাই দিত শুধু যদি তার পক্ষে সম্ভব হতো গ্রেগর আছে এমন কোনো ঘরে জানালা বন্ধ করে থাকাটা।

একদিন – নিঃসন্দেহে গ্রেগরের রূপান্তরের এক মাস পেরিয়ে গেছে, তাই তার চেহারা দেখে বিস্মিত হওয়ার কোনো বিশেষ কারণ তার বোনের থাকার কথা নয় – সে স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা আগে এসে ঢুকল এই ঘরে আর গ্রেগরকে দেখল জানালায় ঠেস দিয়ে, স্থির হয়ে আর সবচেয়ে ভয়ার্ত এক চেহারা নিয়ে, তাকিয়ে রয়েছে বাইরে। তার বোন যদি ভেতরে আসার সিদ্ধান্ত না নিত, সেটাই স্বাভাবিক লাগত গ্রেগরের কাছে, কারণ জানালার ওখানে গ্রেগরের থাকার কারণে তক্ষুনি জানালাটা খোলা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না; কিন্তু সে যে শুধু ভেতরে এল না তা-ই নয়, এমনকি ভয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল আর দড়াম করে আটকে দিল দরজা; অপরিচিত কেউ হলে এটা দেখে নিশ্চিত ভেবে বসত, তাকে কামড়ানোর ইচ্ছা নিয়েই যেন ঘাপটি মেরে গ্রেগর বসে ছিল ভেতরে। কালবিলম্ব না করে সে লুকিয়ে গেল সোফার নিচে, কিন্তু দুপুর পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হলো তার বোনের ফিরে আসার, আর যখন সে এল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি অস্বস্তিতে আছে সে। এ থেকেই গ্রেগর বুঝে নিল, তার চেহারাটা এখনো তার বোনের কাছে ঘিনঘিনে কিছুই আর সেটা তা-ই সেটাই থেকে যাবে; সোফার নিচ দিয়ে বেরিয়ে থাকা তার শরীরের ওই অল্প একটুখানিক দেখেই তার বোনকে নিশ্চয় ভীষণ কষ্টে দমিয়ে রাখতে হচ্ছে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা। তাই এ দৃশ্যটুকু থেকেও তাকে রেহাই দিতেই একদিন গ্রেগর পিঠে করে সোফার কাছে বয়ে নিয়ে এল একটা চাদর – এ কাজটুকু করতেই তার লেগে গেল চার ঘণ্টা – চাদরটা এমন এক কায়দায় সে বিছাল যার ফলে তার পুরো শরীর ঢাকা পড়ে গেল এর নিচে, এখন তার বোন যদি এমনকি নিচের দিকে ঝুঁকেও পড়ে, তাহলেও তাকে দেখতে পাবে না। তার বোনের

কাছে যদি এই চাদরটা অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হতো, তাহলে সে তো তা সরিয়ে দিত কোনো দ্বিধা না করেই, কারণ এটা তো পরিষ্কার, গ্রেগরের মনে এমন কোনো ফুর্তি লাগেনি যে অমনভাবে নিজের শরীর পুরো ঢেকে রাখবে; কিন্তু দেখা গেল চাদরটা যেখানে আছে সেখানেই থাকতে দিল তার বোন, আর এই নতুন ব্যবস্থাটা সে কীভাবে নিয়েছে তা দেখার জন্য যখন গ্রেগর সাবধানে মাথা দিয়ে চাদর অল্প তুলল, তখন মনে হয় তার বোনের চোখে এমনকি একবার একটু কৃতজ্ঞতার ছাপও সে দেখতে পেল যেন।

প্রথম দুই সপ্তাহ গ্রেগরের বাবা-মা তার কাছে আসার ব্যাপারে সাহস করে উঠতে পারলেন না; প্রায়ই গ্রেগর শুনত যে তারা তার বোনের এখনকার কাজের বিরাট প্রশংসা করছেন, যেখানে আগে প্রায়ই তারা বোনটার ওপর বিরক্ত থাকতেন, ওকে নিষ্কর্মা এক মেয়ে বলেই মনে করতেন। কিন্তু এখন তারা দুজনেই, তার বাবা ও মা, বোন ঘর সাফ করার সময় প্রায়ই অপেক্ষা করে থাকেন দরজার বাইরে, আর তার বোন বের হওয়া মাত্রই তাদের কাছে নিখুঁত বর্ণনা করতে হয় ঘরটা সে আজ কেমন দেখল, গ্রেগর কী খেয়েছে, আজ কেমন ব্যবহার করেছে, আর সামান্য উন্নতি কি দেখা যাচ্ছে – এসব। এর মধ্যে তার মা বেশ তাড়াতাড়িই বায়না শুরু করে দিলেন গ্রেগরকে দেখবেন; গ্রেগরের বাবা ও বোন প্রথমে নানা যুক্তি দেখিয়ে নিরস্ত করলেন তাকে; যুক্তিগুলো গ্রেগর শুনল খুবই মনোযোগ দিয়ে আর একমত হলো। কিন্তু পরের দিকে তার মাকে আটকে রাখতে বলপ্রয়োগের দরকার পড়ল; এরপর যখন তিনি চিৎকার শুরু করলেন: 'গ্রেগরের কাছে আমাকে যেতে দাও, ও যে আমার দুর্ভাগা নিজের সন্তান! তোমরা কি দ্যাখো না আমাকে ওর কাছে যেতেই হবে?' গ্রেগর তখন ভাবতে লাগল, তার মা যদি ভেতরে ঢোকেন তাহলে খুব মন্দ হয় না, অবশ্য রোজ রোজ না, মোটামুটি সপ্তাহে এক দিন হলেই চলবে; নিঃসন্দেহে তার মা তার ঐ বোনটার চেয়ে সবকিছু অনেক ভালো বোঝেন, যথেষ্ট মনের জোর থাকা সত্ত্বেও বোনটা তো একটা বাচ্চা মেয়েই মাত্র, আর সবকিছুর পরও মনে হয়, সে এ রকম কষ্টদায়ক একটা কাজ ঘাড়ে তুলে নিয়েছে স্রেফ বাচ্চাদের বেপরোয়া মানসিকতা থেকেই।

মাকে দেখার ইচ্ছা গ্রেগরের শিগগিরই পূর্ণ হলো। দিনের বেলা শুধু তার বাবা-মায়ের কথা বিবেচনা করেই জানালার সামনে দাঁড়ানোটা এড়িয়ে চলত সে, অন্যদিকে মেঝের এই অল্প কয়েক গজ জায়গাও বুকে ভর দিয়ে হাঁটাহাঁটির জন্য যথেষ্ট মনে হতো না তার; আর সটান শুয়ে থাকাটা, এমনকি রাতেও, একরকম অসহ্যই লাগত তার, ওদিকে বেশি দিন লাগল না খাওয়াদাওয়া থেকে তার পুরো রুচি উঠে যেতে, সুতরাং, বিনোদনের স্বার্থেই, দেয়াল আর ছাদের সবটা জুড়ে বুকে ভর দিয়ে চলার অভ্যাস গড়ে নিল সে। বিশেষ করে ছাদ থেকে ঝুলে থাকতে বেশ মজা লাগে তার; মেঝেতে শুয়ে থাকার সঙ্গে এর বিরাট ফারাক; আরো খোলামেলা শ্বাস নেওয়া যায় ওখানে, সারা শরীরে কেমন যেন মৃদু এক কাঁপ ওঠে, আর ওখানে খুশির চোটে আনমনা হয়ে কখনো-সখনো সে নিজেকেই দারুণ অবাক করে দিয়ে, হাত পা ছেড়ে ধপাস করে পড়ে মেঝের উপর। এখন সন্দেহ নেই

আগের থেকে সে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে তার শরীর, তাই দেখা যায় অত উঁচু থেকে পড়লেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। শিগগিরই গ্রেগরের বোনের চোখে পড়ল তার অবসর-বিনোদনের এই নতুন পন্থা, তাকে বুকে ভর দিয়ে চলতে হয় বলেই তার পেছনে পেছনে, এখানে-ওখানে থেকে যায় আঠালো শরীরের কিছু চিহ্ন। এর পরই বোনটা তাকে তার চলাফেরার জন্য যতখানি পারা যায় জায়গা করে দেওয়ার কথা ভাবল, ভাবল তার চলার পথে দাঁড়িয়ে থাকা আসবাবগুলো সরিয়ে ফেলার কথা, যার মানে সবার আগে আলমারি আর লেখার টেবিলটা। যা হোক, তার একার পক্ষে তো আর এ কাজ করা সম্ভব না; সাহায্যের জন্য বাবাকে বলারও সাহস হলো না তার; ওদিকে কোনো সন্দেহ নেই, ঝি-টা কোনো রকম সাহায্যই করবে না, কারণ আগের রান্নার মেয়েটা চলে যাওয়ার পর থেকে এই ষোলো বা সে রকম বয়সের বাচ্চা মেয়েটা যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে এখানে লেগে আছে ঠিকই, কিন্তু সে এক বিশেষ অনুমতি চেয়ে বসেছে যে, রান্নাঘরের দরজা সে সব সময় তালা দিয়ে রাখবে আর কেবল কোনো জরুরি কারণে তাকে বিশেষভাবে ডাকা হলেই সে খুলবে ওই দরজা। সুতরাং একদিন তার বোনের জন্য, যখন বাবা বাড়িতে নেই, তার মাকে ডেকে নেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প রইল না। তার মা বিরাট আনন্দ আর উত্তেজনা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন বটে, কিন্তু গ্রেগরের ঘরের দরজায় পৌঁছেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ভেতরে সব ঠিকঠাক আছে কি না সে ব্যাপারে তার বোন অবশ্য প্রথমেই নিশ্চিত হয়ে নিল; কেবল তার পরেই সে ঢুকতে দিল তার মাকে। ঝটিকা গতিতে গ্রেগর আরো নিচে টেনে নামাল তার সোফার চাদর, ভাঁজ বানাল আরো অনেক কটা; পুরো জিনিসটা সত্যিই এমন দেখাল যে যেন কেউ সোফার উপর বেখেয়ালে ফেলে রেখেছে চাদরটা। এ দফায় চাদরের তলা দিয়ে উঁকি মেরে তাকানো থেকেও নিরস্ত থাকল গ্রেগর; তার মায়ের এখানে এই প্রথম আসা সত্ত্বেও মায়ের মুখটা দেখা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখল সে, তিনি যে শেষমেশ এসেছেন স্রেফ তাতেই সে খুশি। 'আসো, ভেতরে আসো, ওকে দেখা যাচ্ছে না,' বলল তার বোন, আক্ষরিক অর্থেই মাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। এবার গ্রেগর শুনতে পেল এই দুই রোগা মহিলা আগের জায়গা থেকে সরাচ্ছেন পুরোনো আলমারিটা, ওটা সত্যি ওজনে খুব ভারী, আর মায়ের সতর্কবাণী সত্ত্বেও তার বোন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একগুঁয়ের মতো সামলে চলেছে এই কাজের মূল ধাক্কা, তার মা উদ্বিগ্ন মেয়েটার পেশিতে না আবার টান পড়ে। কাজটা করতে খুব লম্বা সময় লাগল। সম্ভবত মিনিট পনেরো চেষ্টার পরে তার মা বললেন, আলমারি যেখানে ছিল সেখানেই বরং থাক, কারণ প্রথম কথা ওটা ওজনে খুব ভারী, তার বাবা বাড়ি আসার আগে তারা কোনোমতেই শেষ করতে পারবে না এই কাজ আর তখন দেখা যাবে গ্রেগরের চলাফেরা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে ওটা ফেলে রাখতে হচ্ছে ঘরের মাঝখানে; আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এমনও তো মোটেই নিশ্চিত না যে আসবাবগুলো সরিয়ে তারা গ্রেগরের আসলেই কোনো উপকার করছেন। তার মায়ের কাছে মনে হলো উল্টোটাই বরং সত্যি; দেয়ালের ঐ ন্যাংটো চেহারা তার কাছে রীতিমতো মর্মঘাতী ঠেকল; আর গ্রেগরের প্রতিক্রিয়াও তো একইরকম হবে,

সে তো এই আসবাবে অভ্যস্ত আজ বহুদিন, শূন্য ঘরে নিজেকে তো পরিত্যক্ত বলেই মনে হবে তার। 'এ রকম কি লাগবে না যে', খুব নিচু স্বরে উপসংহার টানলেন তার মা, আসলে পুরোটা সময় ধরেই তিনি কথা বলেছেন ফিসফিস করে, যেন তিনি নিশ্চিত করতে চাইছেন যে গ্রেগর যে জায়গাতেই থাকুক না কেন, তার গলার আওয়াজ যেন সে না শোনে, কারণ তিনি এক শ ভাগ বিশ্বাস করেন, সে তাদের কথা বুঝতে পারবে না, 'এ রকম কি লাগবে না যে আমরা তার আসবাবগুলো সরিয়ে তাকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছি – তার সুস্থ হয়ে ওঠা নিয়ে আমরা সব আশা ছেড়ে দিয়েছি আর তাকে নিষ্ঠুরের মতো ছেড়ে যাচ্ছি স্রেফ তার নিজের ওপরেই? আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে যদি আমরা ঘরটা ঠিক আগের অবস্থায়ই রাখার চেষ্টা করি, কারণ তাহলে গ্রেগর যখন আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে তখন সে দেখবে কিছুই বদলায়নি আর তখন এই মাঝখানের সময়টায় যা কিছু ঘটল, সব সে ভুলে যেতে পারবে আরো সহজে।'

মায়ের কথাগুলো শুনে গ্রেগরের উপলব্ধি হলো, এই দুই মাস মানুষের সঙ্গে কোনো রকম সরাসরি সম্পর্ক না হওয়াতে আর সেই সঙ্গে পরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে থাকার একঘেয়েমি মিলে তার চিন্তাভাবনা নিশ্চিত গুলিয়ে গেছে, নতুবা তার ঘর খালি করা হোক এমনটা সে আসলেই কী করে মন থেকে চাচ্ছিল এ কথার ব্যাখ্যা মাথায় এল না তার। সে কি আসলেই চায় যে পুরোনো পারিবারিক আসবাবে এত আরাম করে সাজানো তার এই উষ্ণ ঘরটা কোনো গুহায় রূপ নিক, যেখানে নিঃসন্দেহে সে সারা ঘর বাধাহীন ঘুরে বেড়াতে পারবে বুকে ভর দিয়ে – কিন্তু তার বদলে তার মনুষ্য অতীতটাও মুছে যাবে আরো দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে? এটা ঠিক, এরই মধ্যে সেই অতীত ভুলে যাওয়ার কিনারাতেই এসে পৌঁছে গেছে গ্রেগর, শুধু তার মায়ের গলা, সেই গলা যা সে বহুদিন ধরে শোনেনি, তাকে ফিরিয়ে আনল চেতনায়। না, একটা জিনিসও সরানো যাবে না; অবশ্যই সবকিছু থাকবে; নিজের অবস্থাটার ওপর আসবাবের সুপ্রভাব সে কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেবে না; আর এসব আসবাব যদি তার অনর্থক বুকে ভর দিয়ে চলাচলতিতে কোনো বাধাও সৃষ্টি করে, তা বরং ভালোই, কোনো অসুবিধা নেই তাতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার বোন অন্য রকম চিন্তা করল; গ্রেগরের ব্যাপার নিয়ে যেকোনো আলোচনায় সে – অবশ্য তার এ আচরণের পেছনে যুক্তিও আছে বটে – এখন অভ্যস্ত তার বাবা-মায়ের সঙ্গে বিশেষজ্ঞের মতো কথা বলতে; তাই তার মায়ের এ প্রস্তাবে নেই ঠেলার জন্য তার তো কোনো কারণের অভাব নেই; কেবল আলমারি ও লেখার টেবিলটা সরানোই না – যদিও প্রথমে শুধু এটুকুই ইচ্ছে ছিল তার – সে বরং জোর করতে লাগল একমাত্র ঐ অবশ্য প্রয়োজনীয় সোফা ছাড়া এই ঘরের আর সব আসবাব সরিয়ে ফেলতে হবে। নিশ্চিত, তার এমন দাবির পেছনে শুধু তার শিশুসুলভ একগুঁয়েমি কিংবা তার সেই আত্মবিশ্বাসই – ইদানীং যে আত্মবিশ্বাস সে অর্জন করেছে খুব আকস্মিক আর বেদনাদায়ক এক পথে – কাজ করেনি, সেই সঙ্গে পরিষ্কার অর্থেই সে দেখছিল যে, গ্রেগরের চলাফেরা করে বেড়ানোর জন্য যথেষ্ট জায়গা দরকার, আর অন্যদিকে

আসবাবগুলো যে গ্রেগরের বিন্দুমাত্র কোনো কাজে আসছে তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া সম্ভবত তার বয়সী মেয়েদের রোমান্টিক চিন্তাভাবনাও, যা কিনা সুযোগ পেলেই বের হওয়ার পথ খোঁজে, এ ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা রেখেছে – গ্রেটিকে তা উৎসাহিত করেছে ভাইয়ের দুর্দশা আরো বেশি ভয়াবহ করে তুলতে, যাতে করে আরো বড় বড় সব কৃতিত্ব দেখিয়ে তার উপকার সে করে যেতে পারে। সে জানে, এমন একটা ঘরে, গ্রেগর যেখানে একা শূন্য দেয়ালগুলোয় রাজত্ব করে বেড়ায়, সম্ভবত সে ছাড়া আর কেউই কখনো সাহস পাবে না পা ফেলার।

না, তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারলেন না তার মা, তিনি স্রেফ গ্রেগরের ঘরে আছেন এ-থেকেই প্রচণ্ড উদ্বেগে মনে হয় নিজে কী চান তা-ই ঠিকমতো আর বুঝতে পারছেন না। তাই বেশি দেরি হলো না যে চুপ করে গেলেন তিনি আর আলমারিটা বাইরে টেনে নিতে তার মেয়েকে সাধ্যমতো সাহায্য করতে লাগলেন। ঠিক আছে, উপায়ন্তর না থাকলে আলমারি ছাড়াও গ্রেগর নিজের কাজ চালিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু এর বেশি কিছু না; লেখার টেবিলটা এ ঘরে থাকতেই হবে। আর এই দুই মহিলা গোঙানি ও হাঁসফাঁস করতে করতে আলমারি ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে-না-যেতেই সোফার নিচ থেকে গ্রেগর বের করল তার মাথা; সে চায় সাবধানে, যদ্দুর সম্ভব কৌশলে ওদের বাধা দেবে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ থাকলে যা হয়, গ্রেটিকে পাশের ঘরে ছেড়ে – সেখানে সে দুই হাতে আলমারিটা বেড় দিয়ে ধরে একা দোলাচ্ছে সামনে-পেছনে, যদিও নড়াতে পারছে না এক ইঞ্চিও – তার মা-ই প্রথমে ফিরে এলেন এ ঘরে। তার মায়ের তো আর গ্রেগরকে দেখার অভ্যাস নেই; এই চেহারা তাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে, এ রকম আশঙ্কায় গ্রেগর দ্রুত সোফার শেষ মাথার দিকে পিছু হটতে লাগল কিন্তু সামনের দিকে চাদরটার সামান্য দুলে ওঠা ঠেকাতে তার যথেষ্ট দেরি হয়ে গেল। তার মায়ের চোখে পড়ে গেল সে। তিনি থেমে গেলেন, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন পাথর হয়ে, তারপর ফিরে গেলেন গ্রেটির কাছে।

যদিও গ্রেগর নিজেকে আশ্বস্ত করছে অস্বাভাবিক কোনো কিছুই ঘটছে না, শুধু কয়েকটা আসবাব এক পাশে সরিয়ে রাখা হচ্ছে মাত্র, তবু শিগগিরই তাকে মানতে হলো এই দুই মহিলার আসা-যাওয়া, একজন আরেকজনকে এই ডাকাডাকি, মেঝের উপর আসবাবের টানাহেঁচড়ার আওয়াজ – এসব কিছু তাকে জ্বালাচ্ছে চারদিক থেকে ফুঁসে ওঠা কোনো বিশাল গোলযোগের মতো; আর তাই যত সে চেষ্টা করছে হাত-পা গুটিয়ে, মেঝের ভেতর শরীরটা নিয়ে সেঁধিয়ে যেতে, তত তাকে অত্যাবশ্যক এই উপসংহারে আসতেই হচ্ছে যে, আর বেশিক্ষণ এসব সহ্য করতে পারবে না সে। ওরা তার ঘর থেকে সবকিছু সরিয়ে নিচ্ছে; তার প্রিয় সব জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাকে; আলমারিটা, যার মধ্যে আছে তার সরু করাত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, এরই মধ্যে সরানো হয়ে গেছে; এখন ওরা আলগা করে আনছেন তার লেখার টেবিলও, মেঝেতে প্রায় গেঁথেই বসে ছিল টেবিলটা, ওটাতেই গ্রেগর সব সময় – বাণিজ্য অ্যাকাডেমির ছাত্র থাকতে, ব্যাকরণ স্কুলের ছাত্র হিসেবে, হ্যাঁ, এমনকি তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিনগুলোতেও – তার হোমওয়ার্ক করে

এসেছে; আর এখন এই দুই মহিলার সৎ উদ্দেশ্য পরিমাপ করার মতো সময় তার হাতে নেই, সত্যি হচ্ছে এ দুজন যে এখানে আছেন সে কথাই সে প্রায় ভুলতে বসেছে, কারণ তারাও এখন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে কাজ করছেন নীরবে আর তাদের শ্রান্ত, হোঁচট খেয়ে চলা পায়ের আওয়াজ ছাড়া অন্যকিছুই শোনা যাচ্ছে না।

অতএব গ্রেগর তার গোপন জায়গা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল – দুই মহিলা তখন পাশের ঘরে টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে মাত্র খানিক জিরিয়ে নিতে শুরু করেছেন – চারবার সে তার দিক বদলাল, কারণ সে সত্যিই বুঝে উঠতে পারছে না কোন জিনিসটা প্রথম আগলাতে হবে, তারপর তার চোখ আটকাল সেই পুরো ফারে ঢাকা মহিলার ছবিটাতে, খুবই নজরকাড়াভাবে ওটা ঝুলে আছে একদম শূন্য দেয়ালে, দ্রুত হামা দিয়ে ওটার কাছে উঠে গেল সে, শরীর চেপে ধরল কাচের উপরে, কাচটা তাকে এঁটে রাখল শক্ত করে আর তার তপ্ত পেটটাতে আরাম দিল খানিকটা। হুঁ, অন্তত এই ছবিটা – গ্রেগরের শরীর যা এখন পুরোপুরি ঢেকে রেখেছে – তাহলে সরাতে পারছে না কেউ। বৈঠকখানার দরজার দিকে সে ঘুরিয়ে রাখল তার মাথা, যেন মহিলা দুজন ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখতে পায়।

বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিলেন না তারা, ফিরে আসা শুরু করলেন; তার মাকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে এককথায় বয়ে নিয়ে আসছে গ্রেটি। 'আচ্ছা, এবার কী নেব আমরা?' এ কথা বলে গ্রেটি তাকাল চারদিকে। তখনই তার সঙ্গে চোখাচোখি হলো গ্রেগরের, দেয়াল থেকে নিচে বোনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। সম্ভবত তার মা আছে বলেই নিজেকে সংবরণ করে নিল গ্রেটি, মায়ের মাথার কাছে ঝুঁকিয়ে নিয়ে এল নিজের মাথা, মায়ের দেখার পথে যাতে বাধা পড়ে সেটাই তার উদ্দেশ্য, আর সেই সঙ্গে খানিকটা হড়বড় করে কাঁপা গলায় বলল: 'আসো মা, আমরা বরং কিছুক্ষণের জন্য বসার ঘরে ফিরে যাই?' বোনের উদ্দেশ্য গ্রেগরের কাছে পরিষ্কার: সে তার মাকে আগে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে চাইছে, এরপর তাকে সে দেয়াল থেকে তাড়িয়ে নামাবে। হুঁ, আসুক না তাড়াতে! তার ছবিটার গায়ে এঁটে থাকবে সে, ওটা ছাড়বে না কোনোমতেই, বরং উড়ে গিয়ে বসবে গ্রেটির মুখে।

কিন্তু গ্রেটির কথাগুলো তার মাকে বরং আগের চেয়েও উদ্বিগ্ন করে তুলল; তিনি এক পাশে সরে গেলেন, এবার ফুলের নকশা করা ওয়াল পেপারের গায়ে বিশাল বাদামি বস্তুটা তার চোখে পড়ল, আর তিনি যা দেখছেন তা আসলে গ্রেগর, একথা সত্যিকার তার মাথায় আসার আগেই ভাঙা আর সুতীক্ষ্ণ এক গলায় তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন: 'ওহ্ খোদা! ওহ্ খোদা!' সেই সঙ্গে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে ঢলে পড়লেন সোফার উপর যেন তিনি সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন; আর পড়ে রইলেন মড়ার মতো। 'তুমি। গ্রেগর!' দুই হাত মুঠো পাকিয়ে তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল তার বোন। গ্রেগরের রূপান্তরের পর তার উদ্দেশে বলা এই-ই তার প্রথম সরাসরি কথা। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মায়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে এবার সে ছুটে গেল পাশের ঘরে, কোনো সুগন্ধি তেলটেল-জাতীয় কিছু আনার জন্য; গ্রেগরও চাচ্ছে সাহায্য করতে, ছবিটা বাঁচানোর সময় পরেও

অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু কাচের উপর এত শক্ত হয়েই সে এঁটে গেছে যে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য তাকে অনেক মোচড়ামুচড়ি করতে হলো; তারপর সেও দৌড়ে গেল পাশের ঘরে, যেন তার বোনকে অতীতের মতো আজও কোনো উপদেশ দেবে; ওখানে পৌঁছে তাকে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো বোনের পেছনে; অগুনতি ছোট ছোট বোতল হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ তার বোন মাথা ঘোরাল, চমকে উঠল ভয়ে; একটা বোতল ভেঙে গেল মেঝেতে পড়ে; এক ধরনের ঝাঁঝালো ওষুধ ছলকে পড়ল গ্রেগরের চারপাশে; তারপর গ্রেটি, আর কোনো রকম দেরি না করেই, যতগুলো ছোট বোতল হাতের মধ্যে ধরা যায় তা নিয়ে দৌড়ে গেল মায়ের কাছে আর তার পেছনে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল পা দিয়ে। গ্রেগর এখন মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, যিনি সম্ভবত তারই কারণে মরতে বসেছেন; দরজা খোলার সাহস তার হলো না, পাছে তার বোন ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, ওকে এখন মায়ের কাছে থাকা অবশ্যই প্রয়োজন; অপেক্ষা করা ছাড়া গ্রেগরের আর কিছুই করার নেই; আত্মধিক্কার আর দুশ্চিন্তার পীড়নে অস্থির হয়ে সে বুকে ভর দিয়ে চলতে শুরু করলে, সব জিনিসের গা বেয়ে হামা দিতে লাগল সে – দেয়াল, যাবতীয় আসবাব, ছাদ – যতক্ষণ না শেষমেশ পুরো ঘরটাই বনবন্‌ করে ঘুরতে শুরু করল তার চারপাশে আর হতাশায় বিদ্ধ হয়ে সে ধপাস্‌ করে পড়ে গেল বড় টেবিলটার মাঝখানে।

কিছুটা সময় পার হলো; নিস্তেজ হয়ে গ্রেগর পড়ে আছে ওখানেই; চারদিকে সবকিছু একদম শান্ত; মনে হচ্ছে এটা কোনো সুলক্ষণ। তারপর বেজে উঠল দরজার ঘণ্টি। ঝি-টা নিশ্চয়ই তালা মেরে পড়ে আছে রান্নাঘরে, তাই গ্রেটিকেই গিয়ে উত্তর দিতে হলো। তার বাবা ফিরেছেন। 'কী হয়েছে?' এটাই তার প্রথম কথা; নিশ্চিত গ্রেটির চেহারাই তাকে সব বলে দিয়েছে। চাপা গলায় জবাব দিল গ্রেটি, তার বাবার বুকে মুখ গুঁজে বলল: 'মা মূর্ছা গেছিলেন, তবে এখন অনেকটা ভালো। গ্রেগর বেরিয়ে পড়েছে।' 'ঠিক যা আমি ভেবেছিলাম', বললেন তার বাবা, 'ঠিক যা আমি তোমাদের বলতাম, কিন্তু তোমরা মহিলারা তো তা শুনবে না।' গ্রেগরের কাছে এটা পরিষ্কার, তার বাবা গ্রেটির এই অতি সংক্ষেপ বক্তব্যের সবচেয়ে বাজে এক ব্যাখ্যা করে বসেছেন, তিনি ধরে নিয়েছেন গ্রেগর কোনো একটা হিংসাত্মক কিছু করে বসেছে। তার মানে, গ্রেগরকে এখন অবশ্যই তার বাবাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে, সবকিছু তাকে বুঝিয়ে বলার মতো সময় কিংবা সুযোগ, কোনোটাই গ্রেগরের নেই। তাই সে নিজের ঘরের দরজার কাছে ছুটে গেল, ওটার গায়ে ঠেসে রাখল শরীর, যাতে করে তার বাবা বারান্দা থেকে এ ঘরে ঢোকামাত্রই দেখতে পান যে সোজা নিজের ঘরে ফেরত যাওয়ার মতো সদিচ্ছা গ্রেগরের রয়েছে, তাই তাকে তাড়িয়ে ঢোকানোর কোনোই দরকার নেই; শুধু যদি দরজাটা খোলা থাকত, তাহলে সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত এক্ষুনি।

কিন্তু ও রকম সূক্ষ্ম বাছবিচার লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থা তার বাবার নেই; 'আহ!' ঘরে ঢুকতেই তিনি এমন এক গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন যা একই সঙ্গে ক্রুদ্ধ আর মহা-উল্লসিত। দরজার কাছ থেকে মাথাটা টেনে নিল গ্রেগর আর বাবার দিকে উঁচু করে

ধরল। তার বাবাকে সে যেমনটা কল্পনা করেছিল, ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ওই লোকটার তো মোটেই তেমন চেহারা নয়; অবশ্য, মানতেই হবে, ইদানীং বুকে ভর দিয়ে হাঁটাহাঁটির এই নতুন খেলা নিয়ে সে এতটাই মগ্ন যে বাড়ির অন্যখানে কী ঘটছে, সে ব্যাপারে আগের মতো আর খোঁজখবর নেওয়া হয়ে ওঠেনি; তার আসলেই উচিত ছিল পরিস্থিতি যে বদলে গেছে সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকা। তার পরও, তার পরও এ লোকই কি আসলেই তার বাবা? ইনি কি সেই একই মানুষ, যিনি কিনা গ্রেগরের ব্যবসার কাজে বেরিয়ে পড়ার দিনগুলোয় ক্লান্ত শরীরে ডুবে থাকতেন নিজের বিছানায়; সব সময় তার ড্রেসিং গাউন পরে বসে থাকতেন নিজের আরামকেদারায় আর সন্ধ্যাবেলা গ্রেগর ফিরে এলে তাকে সম্ভাষণ জানাতেন; যিনি সত্যিকার বলতে গেলে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতেই পারতেন না, তাই খুশি প্রকাশের জন্য কেবল হাত দুটোই তুলতেন; আর যিনি, সেই দুর্লভ দিনগুলোতে যখন প্রতিবছর অল্পকিছু রোববার আর লম্বা ছুটিগুলোয় পুরো পরিবার একসঙ্গে বেড়াতে বেরোত, নিজের পুরোনো ওভারকোটটায় শরীর মুড়ে সব সময় খানিকটা ধীরগতিতে কষ্ট করে, প্রতিবার পা ফেলার জন্য যত্নের সঙ্গে তার বাঁকানো হাতলওয়ালা ছড়ি সামনে ঠুকে ঠুকে হাঁটতেন গ্রেগর ও তার মায়ের মাঝখানে – যারা নিজেরাই হাঁটত ধীরে ধীরে – আর যখনই কিছু বলার থাকত প্রায় অবধারিত থেমে দাঁড়িয়ে পুরো বাহিনীকে জড়ো করতেন তার চারপাশে? অন্যদিকে এখন, তাকে লাগছে কী চমৎকার, ঋজু শরীরের কেউ, পরনে প্লিট করা বোতাম বসানো নীল রঙের এক আঁটসাঁট ইউনিফর্ম, যেমনটা পরে থাকে ব্যাংকের পিয়নেরা; জ্যাকেটের উঁচু শক্ত কলারের উপর দিয়ে ফেটে বেরোচ্ছে তার মোটা জোড়া-চিবুক; তার জংলি দুই ভ্রুর নিচের কালো চোখ দুটো থেকে বেরোচ্ছে তীব্র সতর্ক আর বিদ্ধকরা দৃষ্টি; তার সাদা চুলগুলো, আগে যা থাকত খুবই এলোমেলো, আঁচড়ানো সুন্দর করে আর সেগুলো চিকচিক করছে একদম নিখুঁত করে কাটা সিঁথির দুই পাশে। চওড়া এক বৃত্ত বানিয়ে ঘরের পুরো দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে সোফার দিকে তিনি ছুড়ে দিলেন তার টুপিটা, ওতে লাগানো একটা সোনালি মনোগ্রাম, সম্ভবত কোনো ব্যাংকের হবে; আর দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে, লম্বা ইউনিফর্মের জ্যাকেটের কোনা পেছনে ভাঁজ করে নিয়ে এক হিংস্র মুখভঙ্গি করে তিনি এগিয়ে এলেন গ্রেগরের দিকে। মনে হচ্ছে, নিজেই জানেন না কী করতে যাচ্ছেন তিনি; তার পরও তিনি তার পা'টা তুললেন অস্বাভাবিক উঁচুতে; তার বুট জুতোর তলার প্রকাণ্ড আকৃতি দেখে বিস্মিত হলো গ্রেগর। কিন্তু এ মুহূর্তে তার এই ভাবনাটা আর দীর্ঘ করল না সে; তার এই নতুন জীবনের একেবারে শুরুর দিন থেকেই সে জেনে এসেছে, তার সঙ্গে আচরণের বেলায় তার বাবা শুধু সবচেয়ে কঠিন পন্থাগুলোই ঠিক বিবেচনা করে আসছেন। সুতরাং সে তার বাবার আগে আগে ছুটল, যখন তিনি থামলেন তখন সেও থামল, আর তিনি সামান্য নড়ে উঠতেই, সে ছুট লাগাল আবার। এভাবে কোনো চূড়ান্ত কিছু ঘটা ছাড়াই তারা ঘরটায় গোল হয়ে ঘুরল কয়েকবার আর এত ধীরে চলতে লাগল এই ঘোরা যে পুরো ব্যাপারটা দেখলে মনেই হবে না কেউ কাউকে তাড়াচ্ছে। গ্রেগর আপাতত ঠিক করল

মেঝেতেই থাকবে, কারণ সে ভয় পেল দেয়াল বা ছাদের দিকে তার কোনো রকম উড়াল দেওয়াটা তার বাবা সাক্ষাৎ কোনো বদমায়েশি বলেই ধরে না বসেন। তবে গ্রেগরকে মানতেই হচ্ছে, এ রকম অলস দৌড়াদৌড়িও তার পক্ষে আর বেশিক্ষণ চালানো সম্ভব নয়; কারণ তার বাবা যেখানে মাত্র একটা পা ফেলছেন, সেখানে তাকে করে উঠতে হচ্ছে পুরো একগাদা নড়াচড়া। দম ফুরিয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে তার, আর সত্যি বলতে আগের জীবনেও ফুসফুস দুটো তার কখনোই পুরোপুরি ভরসা করার মতো ছিল না। এভাবেই সে যখন টলমলিয়ে চলছে, দুই চোখ বলতে গেলে বুজেই রেখেছে যাতে করে সমস্ত শক্তি স্রেফ দৌড়ের ওপরই নিবিষ্ট রাখা যায়, এমনকি এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যে দৌড় ছাড়া উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নিয়ে চিন্তাও করছে না, আর দেয়ালগুলো যে তার আয়ত্তের মধ্যে আছে সে কথাও প্রায় ভুলেই গেছে – যদিও মানতে হবে তীক্ষ্ণ সব কোনা আর পেরেকে ভরা সুন্দর খোদাইয়ের কাজ করা নানা আসবাবে পথ আটকে আছে দেয়ালগুলোর – ঠিক তখন হঠাৎ তার পাশ দিয়ে কিছু একটা ধেয়ে এল, হালকা করে ছুড়ে দেওয়া কিছু একটা; সেটা পড়ল মেঝেতে, তারপর গড়াতে লাগল তার সামনে। একটা আপেল; প্রথমটার পরই সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এল আরেকটা; আতঙ্কে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রেগর; আর কোনো ছোটাছুটি এখন অর্থহীন, কারণ তার বাবা তাকে বিধ্বস্ত করার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন। খাবার ঘরের পাশের তাকে রাখা ফলের পাত্র থেকে নিয়ে তিনি তার পকেটগুলো ভরেছেন আর এখন ছুড়ে মারছেন একটার পর একটা আপেল, তেমন নিখুঁত নিশানা ছাড়াই। ছোট এই আপেলগুলো গড়াচ্ছে মেঝে জুড়ে, মনে হচ্ছে ওগুলো বিদ্যুতায়িত, লাফিয়ে পড়ছে একটার গায়ে আরেকটা। একটা আপেল, হালকা জোরে ছোড়া, গ্রেগরের পিঠে আলতো ছোঁয়া দিয়ে কোনো ক্ষতি না করেই ছুটে গেল তির্যকভাবে। কিন্তু আরেকটা, যেটা উড়ে এল আগেরটার পরপর, আসলেই গেঁথে বসল তার পিঠে; শরীর সামনে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল গ্রেগর, যেন বা জায়গা বদলালেই দূর হয়ে যাবে এই সাংঘাতিক, অবিশ্বাস্য ব্যথা; কিন্তু মনে হলো ওই জায়গাতেই যেন পেরেকে গাঁথা সে; এবং তার সব ইন্দ্রিয় অনুভূতির এক চরম তালগোল পাকানো অবস্থায় শরীরটা মেঝেতে সোজা ছড়িয়ে দিল গ্রেগর। শেষ সজ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে সে তার ঘরের দরজা খুলে যেতে দেখল, দেখল তার মা ছুটে আসছেন তার চিৎকার করতে থাকা বোনের আগে আগে; মায়ের পরনে একটা শেমিজ, কারণ তিনি যখন জ্ঞান হারান তখন তাকে শ্বাস নিতে সাহায্য করার জন্য তার বোন তার পোশাক খুলে দিয়েছিল; সে দেখল তার বাবার দিকে দৌড়ে আসছেন তার মা, পেছনে মেঝেতে একটার পর একটা ছেড়ে আসছেন তার ঢিলে করে দেওয়া পেটিকোটগুলো; আর কেমন করে তিনি সেগুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিজেকে ছুড়ে দিলেন তার বাবার গায়ের উপর, জড়িয়ে ধরলেন তাকে, পুরোপুরি এক হয়ে গেছেন তার সঙ্গে – কিন্তু এরই মধ্যে ঝাপসা হয়ে এসেছে গ্রেগরের দৃষ্টি – আর দুই হাত দিয়ে তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে মিনতি জানাচ্ছেন যেন গ্রেগরকে প্রাণে মারা না হয়।

৩.

গ্রেগরের সেই গুরুতর ক্ষত, এক মাসেরও বেশি যা তাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে – আপেলটা এখনো তার মাংসে গেঁথে আছে কোনো চাক্ষুষ স্মারক হয়ে, কারণ ওটা সরিয়ে নেওয়ার সাহস কারোরই নেই –, এমনকি তার বাবাকেও যেন ভালোমতো বোঝালো যে তার এখনকার শোচনীয় ও ঘেন্না-জাগানো আকৃতি সত্ত্বেও সে এই পরিবারেরই একজন সদস্য, তাই তাকে শত্রু হিসেবে দেখাটা অনুচিত, বরং পারিবারিক দায়িত্ববোধের শর্ত মেনে তাদের উচিত তাদের ঘৃণার ভাবটা হজম করে যাওয়া, আর তাকে ধৈর্যের সঙ্গে, স্রেফ ধৈর্যের সঙ্গে, সহ্য করে যাওয়া।

অন্যদিকে এই ঘায়ের ফলে যদিও গ্রেগর সম্ভবত তার চলাফেরার ক্ষমতা চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলেছে – আজকাল এই ঘরের মধ্যে চলতে ফিরতে তার অথর্ব বুড়োদের মতো কষ্টকর লম্বা সময় লেগে যায়, আর দেয়াল ও ছাদে আগের মতো বুকে ভর দিয়ে হাঁটার তো কোনো প্রশ্নই আসে না –, তবু তার মনে হলো সে তার এই অবস্থার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছে: প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৈঠকখানার দরজা, যেটার দিকে এক-দুই ঘণ্টা আগে থেকেই সে তাকিয়ে থাকে গভীর মনোযোগে, খুলে দেওয়া হয় যেন সে তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে – বৈঠকখানা থেকে তাকে দেখা যায় না – দেখতে পায় পুরো পরিবারটাকে, তারা বসে আছে বাতি-জ্বালানো টেবিলটা ঘিরে, আর সে শোনে তাদের কথাবার্তা, সবার সাধারণত সম্মতি নিয়েই যেন; অন্য কথায়, আগের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতি।

সত্য যে এসব আলাপ-আলোচনা আর আগের দিনের মতো প্রাণবন্ত না, তার মনে আছে সে সব সময় ওগুলোর কল্পনা করত যখন তাকে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়তে হতো কোনো সস্তা ছোট হোটেলঘরের স্যাঁতসেঁতে বিছানায়। এখন বেশির ভাগ সময়ই সবকিছু খুব চুপচাপ। রাতের খাবারের পরই তার বাবা ঘুমিয়ে পড়েন আরামকেদারায়; তার মা ও বোন একজন আরেকজনকে সাবধান করে চুপ থাকার জন্য; তার মা, একেবারে বাতির নিচের দিকে ঝুঁকে, কোনো একটা সুন্দর অন্তর্বাস সেলাই করতে থাকেন একটা ফ্যাশন দোকানের জন্য; তার বোন, যে কিনা সেলস্ গার্লের চাকরি নিয়েছে, নিজের অবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় সন্ধ্যারাত থেকে শিখতে থাকে শর্টহ্যান্ড আর ফরাসি ভাষা। কখনো কখনো তার বাবা জেগে ওঠেন, তিনি যে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই, ওভাবেই গ্রেগরের মাকে বলেন: 'আজ আবার তুমি সেই একগাদা সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসেছ!' আর সোজা আবার ডুবে যান ঘুমের মধ্যে, তখন দুই মহিলা নিজেদের মধ্যে হাসেন একটুখানি ক্লান্তির হাসি।

স্বেচ্ছাচারী একটা একরোখামি নিয়ে গ্রেগরের বাবা এমনকি ঘরেও তার পিয়নের পোশাকটা খুলতে রাজি হন না; তার ড্রেসিং গাউন দেখা যায় অলস ঝুলে আছে কাপড় রাখার হুকে, অন্যদিকে তিনি আরামকেদারায় ঘুমাচ্ছেন পুরোদস্তুর পোশাক-আশাক পরে,

যেন বা যেকোনো মুহূর্তেই কাজে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি আর এমনকি ঘরে বসেও অপেক্ষায় আছেন তার বসের হুকুমের। এর ফলে, গ্রেগরের মা ও বোনের সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও, ইউনিফর্মটা – অবশ্য শুরুতেও যেটা পুরো আনকোরা ছিল না – তার চকচকে ভাব হারাতে শুরু করল; আজকাল গ্রেগর প্রায়ই পুরো সন্ধ্যা কাটিয়ে দেয় এই ইউনিফর্ম জ্যাকেটের দিকে তাকিয়ে, পুরোটা ভরে আছে দাগে দাগে আর স্থায়ীভাবে পালিশ-করা বোতামগুলো কিছুটা উজ্জ্বল, আর ওটার মধ্যে বুড়ো মানুষটা বসে আছেন খুব অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কিন্তু একই সঙ্গে ঘুমাচ্ছেন শান্তিতে।

ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা বাজতেই তার মা হালকা দু-একটা কথা বলে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন গ্রেগরের বাবাকে, তারপর তাকে বিছানায় যাওয়ার জন্য রাজি করাতে থাকেন, কারণ ওখানে তার একদমই ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না; ঘুমই তার সবচেয়ে বেশি দরকার যেহেতু ঠিক ভোর ছটায় তাকে কাজে বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু সেই একই একরোখামি নিয়ে – ব্যাংকের পিয়ন হওয়ার পর থেকেই তার মধ্যে এটা চেপে বসেছে – তিনি সব সময় আরো বেশিক্ষণ আরামকেদারায় থাকার জন্য জেদ করে যান, যদিও এরপরই আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এবার তাকে আরামকেদারা ছেড়ে বিছানায় যেতে রাজি করানোর কাজটা হয়ে পড়ে ভয়ংকর কষ্টকর। গ্রেগরের মা ও বোন যতই তাকে ছোটখাটো বকা দিয়ে অনুরোধ করুক না কেন, পুরো পনেরো মিনিট তিনি ধীরে ধীরে দোলাবেন তার মাথা, বন্ধ করে রাখবেন চোখ দুটো আর উঠতে রাজি হবেন না। গ্রেগরের মা তার জামার হাতা ধরে টানতে থাকবেন, ফিসফিস করে মিষ্টি কথা বলবেন তার কানে, বোন হোমওয়ার্ক রেখে চলে আসবে মাকে সাহায্য করতে, কিন্তু তার পরও উনি পড়ে থাকবেন অসাড় হয়ে – বরঞ্চ আরো গভীরভাবে ডুবে যাবেন আরামকেদারার মধ্যে। যতক্ষণ না দুই মহিলা তার হাতের নিচ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরছেন, চোখ খুলবেন না তিনি; এরপর দুজনের দিকে পালা করে তাকিয়ে আউড়ে যাবেন রোজকার কথাটা: 'কী এক জীবনই না কাটাচ্ছি। এই হচ্ছে আমার বুড়ো বয়সের শান্তি।' শেষমেশ দুই মহিলার উপর ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়াবেন অনেক কষ্টে, যেন তিনি নিজেই নিজের দুর্বহ বোঝা, দরজা পর্যন্ত শরীরটা ছেড়ে রাখবেন ও-দুজনের উপর, ওখানে পৌঁছে হাত নেড়ে বিদায় দেবেন তাদের আর এবার আগাবেন নিজে নিজে; তখন গ্রেগরের মা তার সেলাই আর বোন তার কলম ফেলে বাবার পেছন পেছন ফের ছুটে যাবেন আরো একটু সাহায্য করার জন্য।

এই হাড়ভাঙা খাটুনি আর ক্লান্তিতে ডোবা পরিবারে, একদম প্রয়োজনীয়টুকু বাদে কার সময় আছে গ্রেগরকে নিয়ে আর বেশি ভাবার? আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা হয়েছে সংসারের খরচ; ঝি-টাকে শেষমেশ বিদায় করে দেওয়া হয়েছে; এখন এক বড়সড়, হাড় বের করা ঠিকে-ঝি, ঘন একঝাঁক অগোছালো সাদা চুলে মাথা ভরা, রোজ সকাল ও সন্ধ্যায় আসে ভারী কাজগুলো করে দিতে; বাদবাকি সবকিছু তার মা-ই করেন সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি। এমনকি বেশকিছু পারিবারিক অলংকার – যেগুলো আগে নানা পার্টি আর উৎসবে তার মা ও বোন পরত দারুণ আনন্দ নিয়ে – বেঁচে দেয়া হলো; কত দাম পাওয়া

গেছে তা নিয়ে কথাবার্তা শুনে এক সন্ধ্যায় সেটা জানতে পারল গ্রেগর। কিন্তু সব সময় আসল অভিযোগ এটাই যে, তারা ফ্ল্যাটটা ছেড়ে যেতে পারছে না – তাদের বর্তমান অবস্থার বিচারে এই ফ্ল্যাট তাদের জন্য বেশি বড় হয়ে যায় – কারণ গ্রেগরকে কী করে সরানো হবে তা মাথায় আসছে না তাদের। তবে গ্রেগর খুব ভালোমতোই দেখতে পাচ্ছে তাদের এই বাড়ি না-ছাড়ার পেছনে সেই একমাত্র কারণ না – বাতাস চলার জন্য কিছু ফুটো আছে এমন কোনো উপযুক্ত বাক্সে তো তাকে খুব সহজেই নেওয়া যায়; তাদের আসলে বরং যে-জিনিসটা ঠেকিয়ে রাখছে তা হলো তাদের চূড়ান্ত নিরাশার ভাব, এ রকম এক অনুভূতি যে, যে দুর্ভাগ্যের শিকার তারা হয়েছেন, তার সঙ্গে তাদের সব বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-পরিজন কারো দুর্ভাগ্যেরই কোনো তুলনা চলে না। দরিদ্র লোকদের কাছ থেকে পৃথিবী যা-কিছু দাবি করে থাকে তার সবই তারা পূরণ করে যাচ্ছেন চরম সীমা অবধি: ব্যাংকের নিচের দিকের অফিসারদের জন্য তার বাবা বয়ে নিয়ে যান সকালের নাশতা, তার মা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন অচেনা লোকজনের জন্য অন্তর্বাস বানানোর কাজে, তার বোন খদ্দেরদের হুকুম তামিল করতে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে কাউন্টারের পেছনে; এর বেশি আর করার শক্তি এই পরিবারের নেই। গ্রেগরের পিঠের ব্যথাটা ফের তাকে পীড়া দিতে শুরু করে – যেন বা তার ঘা'টা খুলে যায় আবার – যখনই তার মা ও বোন ফিরে আসে বাবাকে বিছানায় পৌঁছে দিয়ে, ওভাবেই ফেলে রাখে তাদের কাজ, চেয়ার দুটো টেনে নেয় কাছাকাছি আর ওখানে বসে থাকে একজন আরেকজনের গালে গাল ঠেকিয়ে; তারপর তা মা গ্রেগরের ঘরের দিকে দেখিয়ে বলেন: 'গ্রেটি, ওই দরজাটা বন্ধ করে দাও,' আর সে ফের ডুবে যায় অন্ধকারে, তখন হয়তো পাশের ঘরে ঐ দুই মহিলা তাদের চোখের পানি এক করে দিচ্ছেন কিংবা শুকিয়ে যাওয়া চোখে হয়তো তাকিয়ে আছেন টেবিলটার দিকে।

দিন আর রাতগুলো গ্রেগর পার করে দিতে লাগল প্রায় পুরো নির্ঘুম অবস্থায়। মাঝেমধ্যে সে ভাবে, পরের বার যখন দরজা খোলা হবে তখন সে আবার হাতে তুলে নেবে সংসারের যাবতীয় দায়ভার, ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতো; আবার একবার, এক দীর্ঘ বিরতির পর, তার ভাবনার মধ্যে আসে তার অফিসের বস্ ও প্রধান কেরানি, ভ্রাম্যমাণ সেলস্ম্যান ও শিক্ষানবিশরা, অসম্ভব বোকা সেই পিয়ন ছেলেটা, অন্য কোম্পানির দু-তিনজন বন্ধু, মফস্বলের এক হোটেলের এক পরিচারিকা – এক মধুর ও ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি–, একটা হ্যাটের দোকানের এক ক্যাশিয়ার মেয়ে, যার অনুরাগের জবাব সে দিয়েছিল মন থেকেই কিন্তু একটু বেশি গা-ছাড়া ভাবে – এরা সবাই তার সামনে হাজির হয় অচেনা লোকজন কিংবা এরই মধ্যে ভুলে যাওয়া লোকজনের সঙ্গে মিলে, কিন্তু তাকে ও তার পরিবারকে কোনো সাহায্য করে না এরা, রয়ে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে; তাই গ্রেগর খুশিই হয় যখন অদৃশ্য হয়ে যায় এসব লোকজন। এ ছাড়া অন্য সময়গুলোতে পরিবারকে নিয়ে চিন্তা করার মতো মানসিক অবস্থা তার মোটেই থাকে না, কত বিশ্রীভাবে তার যত্ন নেওয়া হচ্ছে তা দেখে স্রেফ ক্রোধে ভরে ওঠে তার মন; যদিও তার ক্ষুধা জাগাতে পারে এমন কোনো খাবারের কথা তার মাথায় আসে না, তবুও যে করেই হোক ভাড়ার ঘরে গিয়ে তার

জন্য বরাদ্দ করা খাবারটুকু – যদি সে ক্ষুধার্ত নাও থাকে তবুও – আদায় করে নেওয়ার পরিকল্পনা এঁটে চলে গ্রেগর। আজকাল গ্রেগরের পছন্দ-অপছন্দ কোনো রকম বিবেচনা না করেই তার বোন সকালে ও দুপুরে কাজে দৌড়ানোর সময় পা দিয়ে গ্রেগরের ঘরে যেকোনো বাসি-পচা খাবার ঢুকিয়ে চলে যায়; তারপর সন্ধ্যাবেলা, খাবারটা সে একটুও চেখে দেখেছিল নাকি ছোঁয়ইনি – সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঘন ঘন এমনটাই ঘটতে লাগল –, সেসব কোনো রকম গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে, ঝাঁটার এক বাড়ি দিয়ে তার বোন খাবারটা ঠেলে নিয়ে যায়। গ্রেগরের ঘর সাফ করার কাজটা, যা এখন সে সব সময় সন্ধ্যাবেলায় করে, এর থেকে তড়িঘড়ি আর করা সম্ভব নয়। দেয়ালের গায়ে ধুলো-ময়লার আঁকাবাঁকা দাগ হয়ে আছে, এখানে-সেখানে পড়ে আছে ময়লার দলা। এই আচরণের শুরুতে তার বোন যখন ঘরে ঢুকত, তখন ঘরের ভেতর গ্রেগর এমন কোনো কোনায় গিয়ে দাঁড়াত যেখানে নোংরা ময়লা পড়ে আছে বেশি বেশি। এর মাধ্যমে বোনের প্রতি একধরনের তিরস্কার করাটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে দেখল, যদি সে ওখানে সপ্তাহের পর সপ্তাহও বসে থাকে, তবু তার বোনের আচরণে কোনো পরিবর্তন আসবে না; ওসব নোংরা-ময়লা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে, তার বোনও নিশ্চয়ই তেমনি দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটা সাফ সাফ মনস্থির করে রেখেছে ওই নোংরা-ময়লা ওভাবেই ফেলে রাখার। একই সঙ্গে তার বোন আবার এ ব্যাপারেও একরোখা যে – তা আবার এমন এক অভিমানী ঢঙে যা তার নিজের কাছেই নতুন আর যা আসলে পুরো পরিবারের ওপরই প্রভাব ফেলছে – গ্রেগরের ঘর সাফ করার কাজটা স্রেফ তার একার এখতিয়ারেই থাকবে। একদিন গ্রেগরের মা ঠিক করলেন ঘরটা পুরোদস্তুর সাফ-সুতরো করবেন, স্রেফ কয়েক বালতি পানি ঢেলে তিনি ভাবলেন কাজটা করা হয়েও গেল বটে – তবে এই স্যাঁতসেঁতে ভাবটাতে মহা বিরক্ত হলো গ্রেগর, সোফার উপর সে শুয়ে থাকল রাগে মুখ ভার করে আর স্থির হয়ে – কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পেতে তার মায়ের খুব দেরি হলো না। সেই সন্ধ্যায়ই গ্রেগরের বোনের চোখে পড়ল ঘরের এই পরিবর্তন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড খেপে রাগে সে ছুটে গেল বসার ঘরে, আর তার মা দুই হাত উঁচু করে মিনতি করা সত্ত্বেও ফেটে পড়ল ফোঁপানিতে, তখন তার বাবা-মা দুজনেই – স্বাভাবিক, তার বাবা চমকে উঠে বসেছেন আরামকেদারাটায় – প্রথমে অসহায় বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন তার বোনের দিকে, তারপর তারাও শুরু করলেন উত্তেজিত হওয়া; তার বাবা ডানদিকে দাঁড়ানো মাকে গালমন্দ করতে লাগলেন যে কেন তিনি গ্রেগরের ঘর সাফ করার কাজটা ওর বোনের ওপরেই ছেড়ে দেননি; আর ওদিকে বাঁয়ে দাঁড়ানো বোনটার উদ্দেশেও চেঁচিয়ে বললেন, তাকে আর কখনোই গ্রেগরের ঘর সাফ করতে দেওয়া হবে না; এরই মধ্যে গ্রেগরের মা শোবার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন তার রাগে-প্রায়-দিশেহারা বাবাকে; গ্রেগরের বোন, ফোঁপাচ্ছে কেঁপে কেঁপে আর ছোট মুঠো দুটো দিয়ে বাড়ি মারছে টেবিলে; সেই সময় ভীষণ চটে গিয়ে জোরে হিস্ হিস্ আওয়াজ করে উঠল গ্রেগর কারণ এদের কারো মাথায়ই দরজা একটু বন্ধ করে দেওয়ার, আর এই দৃশ্য, এই হইচই থেকে তাকে রেহাই দেওয়ার কথাটা আসেনি।

যদিও তার বোন আগের মতো যত্ন করে গ্রেগরের দেখাশোনা করছে না – তার প্রতিদিনের চাকরি তাকে একেবারে ক্লান্ত করে ফেলেছে –, তাই বলে এমনটা তো কথা হয় না যে, গ্রেগরের অবহেলা না হওয়ার ভার তার মাকে নিতে হবে, ওনাকে নিজেই সব কাজ করতে হবে। কারণ এখন সেই ঠিকে ঝিটা তো রয়েছে। এই বয়স্কা বিধবা, শরীরের শক্ত হাড় ওঠা কাঠামোটা যাকে নিশ্চিত দীর্ঘজীবনের বিশ্রী সব ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে, গ্রেগরকে দেখে সত্যিই কোনো ঘেন্না বোধ করে না। বিশেষ কোনো কৌতূহল ছাড়াই সে একদিন ঘটনাক্রমে তার ঘরের দরজা খুলে ফেলল, আর গ্রেগরকে দেখে – যদিও তাকে কেউ তাড়াচ্ছে না তবুও পুরোপুরি বিস্মিত হয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল গ্রেগর – হাত দুটো সামনে ভাঁজ করে সে শুধু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সেখানেই। তারপর থেকে রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় দরজা সামান্য ফাঁক করে গ্রেগরকে একনজর দেখে নিতে সে ভোলে না কখনোই। প্রথমদিকে সে গ্রেগরকে কাছে ডাকত পর্যন্ত, এমন সব কথা বলে ডাকত যা স্নেহ-ভালোবাসারই ইঙ্গিত, যেমন: 'এদিকে আসো তো দেখি, আমার বুড়ো গুবরে পোকা!' কিংবা 'দেখো, এখন আমাদের বুড়ো গুবরেটাকে দেখো!' এমনতরো সম্ভাষণের গ্রেগর কোনো জবাব দিত না, যেখানে আছে সেখানেই নিথর পড়ে থাকত সে, যেন দরজা আদৌ খোলাই হয়নি। শুধু যদি এই ঠিকে-ঝিটাকে যখন মন চাচ্ছে তখনই তাকে এ রকম অর্থহীন জ্বালাতন করতে দেওয়ার বদলে তার ঘরটা রোজ ঝাড়-মোছা করার আদেশ দেওয়া হতো! একদিন, খুব ভোরে – জোর বৃষ্টির ঝাপটা এসে পড়ছিল জানালার শার্সিতে, খুব সম্ভব বসন্ত যে আসছে তারই ইঙ্গিত – যখন ঠিকে-ঝি আবার তার সেই গৎবাঁধা কথাগুলো আওড়াতে শুরু করেছে, গ্রেগর এত বেশি খেপে উঠল যে সে ছুটে গেল তার দিকে, যেন তাকে আক্রমণ করতে চায়, তবে তার গতি ছিল ধীর আর খুব নিস্তেজ। কিন্তু ভয় পাওয়ার বদলে বরং ঠিকে-ঝি দরজার পাশে পড়ে থাকা চেয়ারটা তুলে ধরল অনেক উঁচুতে, আর মুখ হাঁ করে যখন সে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল তখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, ওই মুখ বন্ধ করার কোনো ইচ্ছে তার ততক্ষণ পর্যন্ত নেই যতক্ষণ না হাতের চেয়ারটা ভেঙেচুরে পড়ছে গ্রেগরের পিঠে। 'তাহলে, আর তো কাছে আসছিস না, না কি?' গ্রেগর উল্টো ঘুরতেই সে জিজ্ঞাসা করল, তারপর চেয়ারটা আস্তে ফের নামিয়ে রাখল কোনায়।

আজকাল বাস্তবে গ্রেগর প্রায় কিছুই খায় না। শুধু যখন তার জন্য রাখা খাবারের পাশ দিয়ে ধরা যাক সে হেঁটে যাচ্ছে, তখন হয়তো স্রেফ মজা করতেই একটা কামড় বসায় ওতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখেই রেখে দেয় ওটা, আর বেশির ভাগ সময়ই থু করে ফেলে দেয় আবার। প্রথমদিকে সে ভাবত, তার ঘরের অবস্থা দেখে মন খারাপ থাকার কারণেই বুঝি সে খেতে পারছে না, কিন্তু আসলে এর পেছনে ঘরটার ইদানীংকার পরিবর্তনগুলোই দায়ী, যদিও ওসবের সঙ্গে খুব দ্রুতই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে। আজকাল পরিবারের সবার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সব মালপত্র এ ঘরে ভরে রাখা যেগুলো অন্য কোথাও রাখার জায়গা মিলছে না, আর এ ধরনের মালপত্রেরও কমতি নেই কোনো, কারণ ফ্ল্যাটের

একটা ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে তিন ভদ্রলোকের কাছে। এই গম্ভীর তিন ভদ্রলোক – তিনজনেরই দাড়ি আছে, গ্রেগর একদিন দেখেছে দরজার ফাঁক দিয়ে – পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে, আর তা যে শুধু তাদের নিজেদের ঘরের বেলায় তা-ই না, সেই সঙ্গে – যেহেতু এখন তারা এখানে এ বাড়িরই সদস্যের মতো আছেন – পুরো বাড়িরই, বিশেষ করে রান্নাঘরের। সামান্য কোনো ফেলে দেওয়া বাতিল জিনিসই, আর তা নোংরা হলে তো কথাই নেই, তারা বরদাশত করতে পারেন না। তাদের নিজেদের সংসারের অধিকাংশ জিনিসই তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফলে অসংখ্য জিনিস বাড়তি হয়ে গেছে – সেগুলো বিক্রি করার মতো না বটে, তবু ফেলেও তো দেওয়া যায় না। এ ধরনের সমস্ত জিনিসই ঠাঁই পেল গ্রেগরের ঘরে। আর ওভাবেই, রান্নাঘর থেকে ছাইয়ের বালতি আর আবর্জনা ফেলার টুকরিটাও। এখন কাজে লাগছে না এমন যেকোনো কিছুই ঠিকে-ঝিটা, যে সব সময়ই আছে প্রচণ্ড তাড়ার মধ্যে, ছুড়ে দেয় গ্রেগরের ঘরে; ভাগ্য ভালোই বলতে হয় যে তাকে সাধারণত শুধু ছুড়ে দেওয়া ঐ জিনিস আর ওটা ধরে রাখা ঝিয়ের হাত ছাড়া অন্য কিছু দেখতে হয় না। হতে পারে সময়-সুযোগমতো মালপত্রগুলো আবার সরিয়ে নেওয়ার কিংবা সবগুলো একসঙ্গে ধরে বাইরে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে ঠিকে-ঝিটার আছে; কিন্তু বাস্তবে ওগুলো ঠিক যেখানে শুরুতে রাখা হয় সেখানেই পড়ে থাকে; এর একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে তখন যখন গ্রেগর আবর্জনার স্তূপের মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠেলে চলে আর ওগুলো নড়েচড়ে যায়; প্রথমদিকে প্রয়োজনের তাগিদেই এমনটা করত গ্রেগর, কারণ চলাফেরার জন্য আর কোনো খোলা জায়গাই রইল না তার, কিন্তু পরে সে তা করতে লাগল নিয়মিত বেড়ে চলা আনন্দের সঙ্গে, যদিও ওই অভিযানগুলোর পর তাকে নিশ্চল শুয়ে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় আর শোচনীয় অবস্থায়।

যেহেতু এই ভাড়াটেরা প্রায়ই তাদের রাতের খাওয়াটাও বাড়িতে সারেন – সবাই ব্যবহার করে যে বসার ঘরটা, সেখানেই – তাই সেই সন্ধ্যাগুলোতে বন্ধ রাখা হয় বসার ঘরের দিকের দরজা; তবে দরজা বন্ধ আছে বলে কোনো কষ্টবোধ করে না গ্রেগর; সত্যি বলতে, এরই মধ্যে অসংখ্যবার এমন হয়েছে যে ওটা সন্ধ্যায় খুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে গ্রেগরের কিছুই যায় আসেনি, বরং সে পরিবারের সবার চোখের আড়ালে শুয়ে থেকেছে তার ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোনো কোনায়। কিন্তু একদিন তাদের ঠিকে-ঝি বসার ঘরের দিকের দরজা সামান্য খোলা রেখে চলে গেল, আর এমনকি ভাড়াটেরা সন্ধ্যাবেলায় যখন ওই ঘরে গিয়ে বসলেন, বাতি জ্বালালেন, তখনো খোলাই রয়ে গেল দরজাটা। তারা বসলেন টেবিলের মাথার দিকে, যেখানে আগে গ্রেগরের বাবা-মা ও গ্রেগর বসত, তারপর ন্যাপকিনের ভাঁজ খুলে হাতে তুলে নিলেন ছুরি ও কাঁটা চামচ। একটু পরই তার মা দরজার মুখে হাজির হলেন একটা মাংসের বাটি নিয়ে, ঠিক পেছনেই তার বোন, হাতে ধরা একটা উঁচু করে বোঝাই আলুর বাটি। খাবার থেকে উঠছে ঘন ধোঁয়া। ভাড়াটেরা সামনে রাখা বাটির উপরে ঝুঁকলেন, যেন খাওয়া শুরু করার আগে ওগুলো তারা পরীক্ষা করে নিতে চাচ্ছেন, আর সত্যিই মাঝখানে বসা লোকটা – যাকে দেখতে অন্য দুজনের

বস্ বলে মনে হয় – বাটিতে রাখা অবস্থায়ই এক টুকরো মাংস কাটলেন, স্পষ্টই তিনি দেখে নিতে চাচ্ছেন ওটা যথেষ্ট নরম হয়েছে না কি আসলে রান্নাঘরে ফেরত পাঠানো উচিত। তিনি সন্তুষ্ট হলেন, আর মা ও বোন দুজনেই – যারা শঙ্কাকুল হয়ে লক্ষ করছিল – আবার সহজ শ্বাস ফেলে হাসতে লাগল।

গ্রেগরের পরিবারের লোকজন আজকাল রান্নাঘরে সারে তাদের খাওয়াদাওয়া। তার পরও, রান্নাঘরে যাওয়ার আগে গ্রেগরের বাবা একটু বসার ঘরে এলেন আর টুপিটা হাতে নিয়ে, মাথা নিচু করে লম্বা সালাম জানিয়ে, টেবিলের চারপাশে ঘুরলেন একবার। ভাড়াটেরা তিনজনই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, দেখতে মনে হলো তারা একটা মাত্র মানুষ, আর তাদের দাড়ির আড়ালে বিড়বিড় করে বললেন কিছু একটা। ফের যখন আর অন্য কেউ নেই, তারা খাওয়া শুরু করলেন একদম চুপচাপ। গ্রেগরের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হলো যে, খাওয়ার নানা রকম শব্দের মধ্যে বিরামহীনভাবে তার কানে আসছে দাঁত দিয়ে চিবানোর শব্দটা, যেন তারা গ্রেগরকে দেখাতে চাচ্ছেন যে খাওয়ার জন্য দাঁত লাগে আর সবচেয়ে সুন্দর চোয়ালও যদি দাঁতহীন হয়, তাহলে কোনোই কাজে আসে না। 'অনেক খিদে আছে আমার,' দুঃখ করে নিজেকে বলল গ্রেগর, 'কিন্তু ওই সব খাওয়ার জন্য নয়। এই ভাড়াটেগুলো কী রকম গিলে চলেছে, আর আমি কি না শুকিয়ে মরছি!'

সেদিনই সন্ধ্যায় – এত দিনে একবারও কখনো বেহালা শুনেছে কি না মনে করতে পারল না গ্রেগর – রান্নাঘরের দিক থেকে ভেসে এল বেহালার সুর। এরই মধ্যে ভাড়াটেদের খাওয়া শেষ হয়েছে, মাঝখানের জন একটা খবরের কাগজ বের করেছেন আর অন্য দুজনকে দিয়েছেন তার একটা করে পাতা; আর এবার তারা চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ছেন আর ধূমপান করে যাচ্ছেন। এবার বেহালা যখন বাজানো শুরু হলো, তারা কান খাড়া করলেন, উঠে দাঁড়ালেন, পা টিপে টিপে গেলেন হলঘরের দরজার ওখানটায়, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন একজোট হয়ে। রান্নাঘর থেকে নিশ্চয় তাদের আওয়াজ টের পাওয়া গেছে, কারণ গ্রেগরের বাবা ডেকে উঠলেন: 'আপনারা কি বেহালাতে বিরক্ত হচ্ছেন জনাব? চাইলে এক্ষুনি থামিয়ে দেব।' 'বরং উল্টোটাই', মাঝখানের ভাড়াটে জবাব দিলেন, 'আপনার মেয়ে কি এখানে, বসার ঘরে এসে বাজাতে পারে না, এখানে তো কত খোলামেলা আর আরাম আছে?' 'ওহ্, সে তো খুশির কথা', চিৎকার করে বললেন তার বাবা, যেন তিনিই বেহালাবাদক। ভাড়াটেরা বসার ঘরে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাদের পেছন পেছন এসে ঢুকলেন গ্রেগরের বাবা, হাতে মিউজিক-স্ট্যান্ড; তার মা, হাতে স্বরলিপির খাতা; আর তার বোন, সঙ্গে বেহালা। বাজানোর জন্য চুপচাপ সবকিছু সাজিয়ে নিল তার বোন; তার বাবা-মা – যারা আগে কখনো ঘর ভাড়া দেননি বলে ভাড়াটেদের সঙ্গে অতিরিক্ত বিনয়ী ব্যবহার করছেন – এমনকি নিজেদের চেয়ারে বসারও সাহস করে উঠতে পারছেন না; দরজার গায়ে হেলান দিয়ে আছেন তার বাবা, পরনে বোতাম-আঁটা ইউনিফর্মের জ্যাকেট, তার ডান হাত দুই বোতামের মধ্য দিয়ে ঢোকানো; তার মাকে, যাক, একজন ভদ্রলোক একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন, আর যেখানে

তিনি চেয়ারটা রাখলেন তার মা বসে পড়লেন ঠিক সেখানেই, একটা কোনার মধ্যে ঠেসে।

বাজাতে শুরু করল গ্রেগরের বোন; তার বাবা ও মা, বোনের দুই পাশ থেকে, মন দিয়ে লক্ষ করছেন তাদের মেয়ের হাতের নড়াচড়া। গ্রেগর, বাজনার সুরে আকৃষ্ট হয়ে, সাহস করে খানিকটা সামনে এগিয়ে এল, এরই মধ্যে তার মাথাটা ঢুকে পড়েছে বসার ঘরে। আজকাল যে অন্যের প্রতি তার বিবেচনাবোধ অনেক কমে এসেছে, সেটা তাকে খুব একটা বিচলিত করে না; যদিও আগে নিজের এই বিবেচনাবোধ নিয়ে গর্ব হতো তার। এখন তো তার আগের চেয়েও বেশিই লুকিয়ে থাকা উচিত, কারণ তার ঘরে পুরু হয়ে থাকা ঐসব ধুলোময়লায় – যা কিনা সামান্য নড়াচড়ায় ওড়াউড়ি শুরু করে দেয় – সে নিজেও পুরো মুড়ে আছে নোংরা হয়ে; তার পিঠ ও শরীরের দুই পাশে সে আজকাল বয়ে নিয়ে চলে সুতো-ন্যাতা, চুল আর খাবারের উচ্ছিষ্ট; সবকিছুতে তার উদাসীনতা এতই বেড়ে গেছে যে চিৎ হয়ে শরীরটা ঘষে খানিক সাফসুতরো হতে আর ইচ্ছে হয় না তার, যেমনটা একসময় সে দিনে বহুবার করত। নিজের এই হাল সত্ত্বেও ধীরে বসার ঘরের তকতকে মেঝের দিকে একটু এগিয়ে যেতে কোনো রকম লজ্জা বোধ করল না সে।

নিশ্চিত, কেউই তাকে খেয়াল করল না। পরিবারের সবাই পুরো বুঁদ হয়ে আছে বেহালার সুরে; তবে ভাড়াটে তিনজন, প্রথমে যারা পকেটের মধ্যে দুই হাত ঢুকিয়ে তার বোনের মিউজিক-স্ট্যান্ডের পেছনে জড়ো হয়েছিলেন – এতই কাছে চলে এসেছিলেন যে স্বরলিপিগুলো পর্যন্ত পড়তে পারছিলেন, যাতে নিশ্চিত তার বোন বিরক্ত হচ্ছিল এতে – একটু পরে তারা চলে গেলেন জানালার কাছে, মাথা নিচু করে নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কিছু বলতে লাগলেন, আর ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন; ওদিকে গ্রেগরের বাবা তখন চিন্তিত মুখে দেখতে লাগলেন তাঁদের। এটা এখন খুবই পরিষ্কার যে, চমৎকার কিংবা উপভোগ্য কোনো বেহালা শোনার আশাটা তাদের পূরণ হয়নি; এটা বাজানো তাদের যথেষ্টই শোনা হয়ে গেছে, এখন তারা স্রেফ ভদ্রতার খাতিরেই সহ্য করে যাচ্ছেন শান্তি নষ্ট করা এই অত্যাচার। বিশেষ করে, যেভাবে তারা নাক ও মুখ দিয়ে ছাদের দিকে সিগারের ধোঁয়া ছুড়ে দিচ্ছেন, তা চরম বিরক্তিরই ইঙ্গিত। কিন্তু তার পরও কত সুন্দরভাবে বাজিয়ে চলেছে তার বোন। তার মুখটা একদিকে হেলানো, আর সন্ধানী ও বিষণ্ন এক দৃষ্টি নিয়ে তার চোখ দুটো অনুসরণ করে যাচ্ছে স্বরলিপি। হামা দিয়ে আরেকটু সামনে এগোল গ্রেগর, মাথাটা সে মেঝের সঙ্গে চেপে রেখেছে, যাতে বোনের সঙ্গে তার চোখাচোখি সম্ভব হয়। সংগীত যদি তার মনকে এভাবে নাড়া দেয়, তাহলে কী করে হয় যে সে একটা পশু? তার মনে হলো সেই অজানা খাদ্য, যা সে এতদিন ধরে খুঁজে আসছিল, সেটার দিকে যাওয়ার পথ বুঝি আজ খুলে গেছে। গ্রেগর পণ করল তার বোনের কাছে সে পৌঁছাবেই, তার স্কার্ট ধরে টান দেবে আর অমনি করেই তাকে বুঝিয়ে দেবে, তার উচিত বেহালাটা সঙ্গে নিয়ে গ্রেগরের ঘরে চলে আসা, কারণ এখানে উপস্থিত কেউই তার বেহালা শোনার যোগ্য নয়, যতখানি যোগ্য সে। তারপর গ্রেগর তাকে আর কখনোই ঘরটা থেকে বেরোতে দেবে না, অন্তত যত দিন সে বেঁচে আছে তত দিন তো নয়ই; হ্যাঁ, এই প্রথমবারের মতো

শরীরের ভয়ংকর আকৃতিটা তার কোনো কাজে আসবে; তার ঘরের সবগুলো দরজায় একযোগে সে দাঁড়িয়ে যাবে, হিস্‌হিস্ শব্দ তুলবে আর থুতু ছিটাবে সব অনধিকার প্রবেশকারীদের দিকে; তবে বোনকে তার সঙ্গে থাকার ব্যাপারে কোনো জোর খাটানো উচিত হবে না, থাকলে সে তার নিজের ইচ্ছাতেই থাকবে; সোফাতে সে বসবে গ্রেগরের পাশে, তার মুখের কাছে ঝুঁকে নামিয়ে আনবে কান, তারপর গ্রেগর তাকে জানাবে গোপন কথাটা – তাকে সংগীত বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে সে জোর সংকল্প করেছে, শুধু এই দুর্ভাগ্যটা যদি মাঝপথে এসে বাধা না দিত তাহলে কবেই গত ক্রিসমাসে – নিশ্চয়ই ক্রিসমাস এত দিনে পার হয়ে গেছে, না কি? – সে সবার উদ্দেশে ঘোষণা করত এটা, কারো আপত্তিতে কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ না করেই। এই কথা শুনে তার বোন এতই অভিভূত হয়ে পড়বে যে সে ভেঙে পড়বে কান্নায়, তখন গ্রেগর শরীরটা বোনের কাঁধ পর্যন্ত তুলবে, চুমু খাবে তার গলায়, যা এখন সে বাইরে কাজ করে বলেই আর কোনো ফিতা বা কলার দিয়ে ঢাকা থাকে না।

'সামসা সাহেব!' মাঝখানের ভাড়াটে চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রেগরের বাবার উদ্দেশে, এবং আর কোনো শব্দ খরচ না করে তর্জনী তুলে দেখালেন ধীরে এগিয়ে আসতে থাকা গ্রেগরকে। বেহালা থেমে গেল, মাঝখানের ভাড়াটে প্রথমে তার মাথা ঝাঁকিয়ে মুচকি হাসলেন বন্ধুদের উদ্দেশে আর তারপর আবার তাকালেন গ্রেগরের দিকে। গ্রেগরকে তাড়িয়ে বের করার বদলে বরং ভাড়াটেদের শান্ত করাই বেশি জরুরি মনে হলো তার বাবার কাছে, যদিও ওদের মোটেই বিক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে বেহালা-বাদনের চাইতে তারা গ্রেগরকেই উপভোগ করছেন বেশি। গ্রেগরের বাবা জলদি তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন, সামনে দুই হাত বাড়িয়ে চেষ্টা করলেন তাদের ঘরে যেতে রাজি করানোর আর একই সঙ্গে নিজের শরীর দিয়ে গ্রেগরকে তাদের দৃষ্টির আড়াল করে রাখার। এবার তারা সত্যি একটু রেগে উঠলেন – তবে এটা স্পষ্ট না যে তাদের এই রাগের পেছনে গ্রেগরের বাবার আচরণটা দায়ী নাকি এ মুহূর্তে তাদের মনে জাগতে থাকা এই উপলব্ধি যে, গ্রেগরের মতো অমন এক পাশের ঘরের পড়শি আছে তাদের আর তারা কিনা তা এদ্দিন জানতেনই না! গ্রেগরের বাবার কাছে তারা ব্যাখ্যা দাবি করলেন, তার মতো করে হাত দুটো উপরে তুলে তুলে; অস্বস্তি নিয়ে নিজেদের দাড়ি ধরে টানতে লাগলেন আর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ঘরের দিকে হাঁটা ধরলেন। এতক্ষণে গ্রেগরের বোন জেগে উঠেছে তার আনমনা ভাবটা থেকে, তার বেহালা-বাদন অমন রূঢ়ভাবে বাধা পাওয়ার পর যে ভাবটা ঘিরে ধরেছিল তাকে; বেহালা ও ছড়িটা এক মুহূর্ত নিজের ঝুলন্ত হাতে আলগা করে ধরে আর স্বরলিপির দিকে একটু তাকিয়ে, যেন সে বাজাচ্ছে এখনো, হঠাৎ সে উঠে পড়ল, বেহালাটা রাখল তার মায়ের কোলে – তিনি এখনো বসে আছেন চেয়ারে, হাঁপ উঠেছে বলে খুব কষ্ট করে শ্বাস নিতে চেষ্টা করছেন – আর একদৌড়ে গিয়ে ঢুকল ভাড়াটেদের ঘরে, গ্রেগরের বাবার তাড়া খেয়ে ভাড়াটেরা এখন যেটার দিকে আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছেন। দেখা গেল, তার বোনের পাকা হাতের ছোঁয়ায় তাদের লেপ

আর বালিশগুলো শূন্যে উঠে গিয়ে ফের সুন্দর সাজিয়ে পড়ল জায়গামতো। ভাড়াটেরা তাদের ঘরে পৌঁছাতেও পারেননি, এর আগেই তার বোন বিছানা গোছানো সেরে বেরিয়ে এল চুপচাপ। তার বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের একগুঁয়েমিতে তিনি এতখানি আচ্ছন্ন যে ভাড়াটিয়াদের প্রাপ্য সামান্য সম্মানটুকু দেখাতেও তিনি পুরোপুরি ভুলে গেছেন। তাদের তিনি ঠেলছেন তো ঠেলছেনই, যতক্ষণ না ঠিক শোবার ঘরের দরজায় পৌঁছে মাঝখানের ভাড়াটে প্রচণ্ড জোরে এক পা মেঝেতে ঠুকে তাকে থামালেন। 'এই আমি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিলাম যে,' তিনি বললেন, হাত উঁচুতে তুলে আর গ্রেগরের মা ও বোনকেও যেন দেখতে পান সে জন্য চোখটা চারপাশে ঘুরিয়ে, 'এ বাড়ি আর এই পরিবারে বিদ্যমান জঘন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে' – এ পর্যায়ে তিনি উত্তেজিতভাবে থুতু ফেললেন মেঝের উপর – 'এখনই আমি ঘর ছাড়ার নোটিশ দিচ্ছি। খুব স্বাভাবিক, এই যে কদিন এখানে থাকলাম তার জন্য একটা পয়সাও আমি দেব না; বরং উল্টো আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিপূরণের অভিযোগ আনব কি না, তা আমি ভেবে দেখব, যা প্রমাণ করা – নিশ্চিত থাকতে পারেন – একদমই কোনো কঠিন কাজ হবে না।' তিনি থামলেন, সোজা সামনের দিকে তাকালেন, যেন কোনো একটা কিছুর আশা করছেন। আর সত্যিই, তার দুই বন্ধুও চটপট এই কথার সুরে তাল মেলালেন: 'আমরাও এই এক্ষুনি, আমাদের নোটিশও দিয়ে দিলাম।' এর পরই তিনি দরজার হাতলটা ধরে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গ্রেগরের বাবা টলমলে পায়ে, হাত দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে তার আরামকেদারার কাছে গেলেন আর ভেঙে পড়লেন এটার উপর; দেখে লাগছে তিনি যেন তার রোজকার সন্ধ্যার ঘুমে গা এলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তার মাথার ভয়ংকর দুলুনি দেখে – যেন তা পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে – বোঝা যাচ্ছে তিনি জেগে রয়েছেন। এতক্ষণ ধরে গ্রেগর ঠিক সে জায়গাতেই নিথর পড়ে আছে যেখানে তাকে প্রথম দেখেছিলেন ভাড়াটেরা। তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার দুঃখ আর সম্ভবত দীর্ঘদিন উপোস থাকার ফলে দুর্বলতা – দুয়ে মিলে তার পক্ষে নড়াচড়া করাটা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সে এখন মোটামুটি নিশ্চিত এক আতঙ্কের মধ্যে আছে যে এই এক্ষুনি সবকিছু দল বেঁধে ভেঙেচুরে পড়বে তার মাথার উপর, আর সেটারই অপেক্ষা করতে লাগল সে। এমনকি বেহালাটা যখন তার মায়ের কাঁপতে থাকা আঙুল থেকে পিছলে কোল থেকে মেঝেতে গিয়ে পড়ল, তখনো একটুও নড়ে উঠল না গ্রেগর।

'প্রিয় বাবা, মা,' বলল তার বোন, হাতটা টেবিলের উপর চাপড়াল তার কথার ভূমিকা হিসেবে, 'এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। মনে হচ্ছে, আপনারা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমি পারছি। এই দৈত্যের সামনে আমার ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করতে আমার মুখে বাধে, তাই আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই: এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। এর দেখভাল মানুষের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তা আমরা করেছি, একে সহ্য করে গেছি, আমি বিশ্বাস করি না আপনাদেরকে কেউ এ ব্যাপারে সামান্য কটু কথাও শোনাতে পারবে।'

'ওর কথা দশ গুণ সত্য', আপন মনে বললেন গ্রেগরের বাবা। তার মা, যিনি এখনো শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁপাচ্ছেন, চোখে এক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে একটা ফাঁপা শব্দ করে, মুখে হাত চেপে, কাশতে শুরু করলেন।

গ্রেগরের বোন মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে তার কপালে একটা হাত রাখল। মনে হচ্ছে তার বোনের কথাগুলো শুনে গ্রেগরের বাবার চিন্তা-ভাবনা আগের থেকে পরিষ্কার হয়ে এসেছে; পিঠ সোজা করে বসে তিনি তার ইউনিফর্মের টুপিটা নিয়ে খেলা করছেন ভাড়াটেরা খেয়ে ওঠার পর থেকে এখনো টেবিলের উপর পড়ে থাকা প্লেটগুলোর ফাঁকে; আর থেকে থেকে তাকাচ্ছেন গ্রেগরের নিশ্চল মূর্তিটার দিকে।

'আমাদের অবশ্যই একে বিদায় করার চেষ্টা করতে হবে', বলল তার বোন, এবার শুধু তার বাবাকে লক্ষ করে, যেহেতু তার মা কাশির চোটে শুনতে পাচ্ছেন না একটা কথাও, 'আপনারা দুজনেই এর কারণে মারা পড়বেন, আমি সেটার আভাস দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মতো যারা এত পরিশ্রম করে, কীভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব ঘরেও এমন স্থায়ী অত্যাচার সহ্য করে যাওয়া? আমি অন্তত আর পারছি না।' এই কথা বলে তার বোন এমন প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ল যে তার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল তার মায়ের মুখের উপরেও, যন্ত্রের মতো সে হাত দিয়ে মুছে দিল তা।

'কিন্তু মা,' দরদ আর স্বচ্ছ বোধশক্তি নিয়ে বললেন তার বাবা, 'আমরা কী করতে পারি বলো?'

গ্রেগরের বোন শুধু কাঁধ ঝাঁকালো, তার আগের আত্মবিশ্বাসের উল্টো এ-এমনই এক অসহায়ত্বের প্রকাশ যেটা তার ওপর চেপে বসেছে কান্নার ঐ দমকের সময়।

'যদি ও বুঝতে পারত যে আমরা কী বলছি,' অর্ধেকটা প্রশ্নের মতো করে বললেন তার বাবা; কিন্তু সেটা কতখানি অসম্ভব এক ব্যাপার তা দেখাতে গ্রেগরের বোন – তখনো ফোঁপাচ্ছে – প্রবলভাবে তার হাত নাড়তে লাগল।

'আহ্, যদি ও বুঝত যে আমরা কী বলছি,' আবার বললেন বুড়ো লোকটা আর দু চোখ বন্ধ করে তার বোনের বিশ্বাসকেই মেনে নিলেন যে, তা ঘটা অসম্ভব, 'তাহলে মনে হয়, ওর সঙ্গে কোনো একটা দফারফায় আসতে পারতাম আমরা। কিন্তু যেমন দেখছি – '

'ওকে যেতেই হবে,' চিৎকার করল তার বোন, 'এটাই একমাত্র সমাধান বাবা। আমাদের শুধু এই ধারণাটা মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে যে ও গ্রেগর। ওটাই আমাদের সত্যিকারের সর্বনাশ, এই যে আমরা এতদিন ধরে ওকে গ্রেগর বলে বিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু ও কী করে গ্রেগর হয়? যদি ও গ্রেগরই হতো, তাহলে অনেক আগেই বুঝত যে মানুষের পক্ষে ওরকম একটা জন্তুর সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা অসম্ভব আর ও তার নিজের ইচ্ছেতেই বিদায় হতো। তখন আর আমাদের কোনো ভাই থাকত না, কিন্তু আমরা তো তার স্মৃতি সম্মানের সঙ্গে মনে রেখে স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারতাম। কিন্তু কী ঘটছে? এই জানোয়ারটা আমাদের হয়রান করে মারছে, আমাদের ভাড়াটেদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, পরিষ্কার চাচ্ছে পুরো ফ্ল্যাট দখল করে নিয়ে আমাদের পথে বসাতে। দেখুন বাবা,' হঠাৎ

সে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠল, ‘আবার শুরু করেছে ও!’ আর ভয়ে দিশেহারা হয়ে – কেন, তা গ্রেগরের কাছে মোটেই বোধগম্য নয় – সে তার মায়ের পাশ থেকে উঠে গেল, চেয়ারের পেছনটা ধরে ওনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে লাগল, যেন গ্রেগরের কাছে থাকার চেয়ে বরং মাকে ফেলে দিতেও সে রাজি; তারপর ছুটে গেল তার বাবার পেছনে, যিনি নিজেও তার মেয়ের আচরণে খুব ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন আর মেয়েকে বাঁচানোর জন্যই যেন ওর সামনে নিজের দুই হাত অর্ধেক তুলে ধরেছেন।

কিন্তু গ্রেগরের সামান্য ইচ্ছাও নেই কাউকে ভয় দেখানোর, তার বোনকে তো নয়ই। ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য সে ঘুরাতে শুরু করল তার শরীর; মানতেই হবে, দেখার মতো এক দৃশ্য হলো তা, কারণ শারীরিক দুর্বলতার জন্য এই কষ্টকর কাজে তাকে তার মাথারও সাহায্য নিতে হচ্ছে, বারবার মাথা উপরে তুলে আর মেঝের সঙ্গে বাড়ি মেরে মেরে। সে থামল, তাকাল চারপাশে। তার সদিচ্ছাটা মনে হয় সবাই বুঝতে পারল; তাদের আতঙ্ক কেটে গেল একটু পরেই। এখন তারা সবাই নিঃশব্দে ও বিষণ্ন চোখে তাকে দেখছে। দুই পা একসঙ্গে চেপে রেখে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে তার মা বসে আছেন চেয়ারটায়, ক্লান্তিতে প্রায় বুজে আসছে তার চোখ দুটো; তার বাবা ও বোন বসে আছে পাশাপাশি, বোনটা হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে বাবার গলা।

‘মনে হচ্ছে এখন আমার ঘুরতে কোনো অসুবিধা নেই,’ ভাবল গ্রেগর আর ফের শুরু করল তার চেষ্টা। কষ্টের চোটে এক ধরনের ফোঁসফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে তার মুখ থেকে, ওটা সে চেপে রাখতে পারছে না, আর একটু পর পর জিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে সে। এমন না যে কেউ তাকে হয়রান করছে কোনোভাবে, পুরোপুরি তার নিজের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সব। ঘোরা শেষ হওয়া মাত্র, একটুও দেরি না করে, সে তার যাত্রা শুরু করল একটা সরলরেখায়। তার ও তার ঘরের মাঝখানের দূরত্বটা দেখে সে খুব অবাক হলো, তার মাথায় আসছে না যে কিছুক্ষণ আগে এই দুর্বল শরীর নিয়ে সে কীভাবে এতটা পথ পেরিয়েছিল, একদম টেরই পায়নি সে। স্রেফ জোরে বুকে ভর দিয়ে হেঁটে যাওয়া নিয়ে সে এতটাই মগ্ন যে তার খেয়ালই হলো না কেউ বা কোনো কিছুই তার এগিয়ে যাওয়াতে বাধা দিচ্ছে না – না একটা কোনো কথা, না তার পরিবারের কারো মুখ থেকে কোনো বিস্ময়ধ্বনি। কেবল ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে যাওয়ার পরই সে ঘোরাল তার মাথা, অবশ্য পুরোটা না, কারণ সে টের পেল তার ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেছে; কিন্তু যতটা ঘোরাল তা-ই এটুকু দেখার জন্য যথেষ্ট যে তার পেছনের সবকিছু – শুধু তার বোনটার উঠে দাঁড়ানো ছাড়া – আগের মতোই আছে। শেষ দেখল সে তার মাকে, এরই মধ্যে তিনি গভীর ঘুমে।

গ্রেগর তার ঘরে পুরো ঢুকতেও পারেনি, প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো দরজাটা, খিল তুলে লাগিয়ে দেওয়া হলো তালা। পেছনের এই আকস্মিক শব্দে গ্রেগর এতটাই চমকে গেল যে শরীরের নিচে অবশ হয়ে গেল তার পাগুলো। এই তাড়াহুড়াটা করেছে তার বোন। ওইখানে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে আর অপেক্ষা

করছিল, তারপর সে লাফিয়ে এসেছে সামনের দিকে, গ্রেগর মোটেই শুনতে পায়নি তার এগিয়ে আসা; আর তালায় চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে সে চিৎকার দিল তার বাবা-মায়ের উদ্দেশেঃ এতক্ষণে!'

'এখন?' চারপাশের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গ্রেগর নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল। একটু পরই বুঝতে পারল যে এখন সে নড়াচড়ায় পুরো অক্ষম। এতে অবাক হলো না সে একটুও; তার কাছে বরং এটাই অস্বাভাবিক ঠেকল কীভাবে সে তার এই সরু, ছোট ছোট পায়ে ভর দিয়ে এতক্ষণ ধরে শরীরটা ঠেলে এগিয়ে নিতে পেরেছে। এটুকু ছাড়া তার বরং আগের থেকে ভালোই লাগছে। এটা সত্যি যে তার সারা শরীরে সে বোধ করছে যন্ত্রণা, কিন্তু মনে হলে ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে ব্যথাগুলো, আর শেষমেশ তা পুরো দূর হয়ে যাবে। তার পিঠের উপরের পচতে থাকা আপেল আর এর চারপাশের দগদগে জায়গাটুকু – পুরোটাই ঢেকে আছে নরম ধুলোয় – তাকে আর তেমন কোনো ব্যথাই দিচ্ছে না। স্নেহ আর ভালোবাসা নিয়ে তার ভাবনা আবার ফিরে গেল নিজের পরিবারের দিকে। তাকে যে অবশ্যই চলে যেতে হবে এ ব্যাপারে তার নিজের সিদ্ধান্ত – যদি সম্ভব হয় তো – তার বোনের চেয়েও দৃঢ়। টাওয়ারের ঘড়িতে রাত তিনটে বাজার ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত সে ডুবে থাকল এ রকম শূন্য ও প্রশান্তি ভরা ভাবনার মধ্যে বুঁদ হয়ে, তার জানালার বাইরে সবকিছু আলো হয়ে আসার প্রথম আভাসটুকু দেখার মতো চেতনা তার তখনো ছিল। তারপর আপনা থেকেই নিচে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল তার মাথা আর নাসারন্ধ্র বেয়ে বের হলো তার ক্ষীণ শেষ নিঃশ্বাস।

ভোরবেলা যখন ঠিকে-ঝি এসে হাজির – গায়ের জোর আর অধৈর্য মিলে সে সব সময়ই অনেকবার তাকে মানা করা সত্ত্বেও, দরজাগুলো এমন জোরে বন্ধ করে যে সে আসার পরে ফ্ল্যাটের কারোই আর শান্তিতে ঘুমানো সম্ভব হয় না – তখন শুরুতে, রোজকার মতো একটু খানিকের জন্য গ্রেগরের কাছে গিয়ে কোনো অস্বাভাবিক কিছুই তার চোখে পড়ল না। সে ভাবল গ্রেগর ইচ্ছে করেই অমন নিথর শুয়ে আছে, একটু অভিমান দেখাচ্ছে মাত্র; ঝি-টা গ্রেগরকে সব রকম ধূর্ততায় পাকা বলেই মনে করে। ঘটনাক্রমে যেহেতু তার হাতে লম্বা ঝাঁটাখানা রয়েছে, তাই ওটা দিয়ে সে দরজা থেকেই চেষ্টা করল গ্রেগরকে খানিক সুড়সুড়ি দেওয়ার। যখন তাতেও কোনো সাড়া মিলল না, চটে গেল সে আর গ্রেগরের গায়ে খোঁচা মারল কয়েকটা, তারপর যখন সে গ্রেগরকে ধাক্কা মেরে ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তবু কোনো বাধা পাচ্ছে না, কেবল তখনই সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। প্রকৃত ঘটনা বুঝে নিয়ে সে তার দুই চোখ বিস্ফারিত করে একটা নিচু শিস দিল; তারপর কোনো রকম সময় নষ্ট না করে শোবার ঘরের দরজাটা জোরে খুলে ভেতরে ঢুকল আর সবচেয়ে জোরের সঙ্গে চিৎকার দিয়ে উঠল অন্ধকারের মধ্যেঃ 'আসুন গো, দেখে যান, ওটা শেষ; ওইখানে মরে পড়ে আছে, একদম শেষ!'

সামসা-দম্পতি উঠে বসলেন তাদের বিয়ের দিনের বিছানায়; আর ঠিকে-ঝি কী বলছে তা বুঝে ওঠার আগে তাদের প্রথমে কাটিয়ে উঠতে হলো ঐ মহিলার চেঁচামেচির

ধাক্কাটা। তারপর, যা হোক, হের ও ফ্রাউ সামসা দ্রুত উঠে এলেন বিছানা ছেড়ে, দুজনে দুই পাশ থেকে; হের সামসা কাঁধ বেড় দিয়ে জড়িয়ে নিলেন একটা কম্বল, ফ্রাউ সামসা চলে এলেন স্রেফ তার রাত্রিবাসটা পরেই; এ পোশাকেই দুজনে পা রাখলেন গ্রেগরের ঘরে। এরই মধ্যে বসার ঘরের দরজাও খুলে গেছে, ভাড়াটেরা আসার পর থেকেই ওখানে ঘুমায় গ্রেটি; পুরো পোশাক পরা আছে সে, যেন বা একটুও ঘুমায়নি সারা রাত, আর তার মলিন মুখখানা সাক্ষ্য দিচ্ছে এই অনুমানের পক্ষে। 'মরে গেছে?' বললেন ফ্রাউ সামসা, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ঠিকে-ঝির দিকে, যদিও তিনি নিজেই পরীক্ষা করতে পারেন ব্যাপারটা; তার আসলে ঠিক দরকারও নেই, কারণ সবকিছু তো তিনি পরিষ্কার দেখতেই পাচ্ছেন। 'আমার তো তা-ই মনে হয়,' বলল ঠিকে-ঝি, আর তা প্রমাণ করতে হাতের ঝাঁটাটা দিয়ে গ্রেগরের মৃতদেহ ধাক্কা দিয়ে এক পাশে ঠেলে সরাল বেশ অনেকটা দূর। ফ্রাউ সামসা নড়ে উঠলেন, যেন ঝাঁটাটাকে বাধা দিতে চান, কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেলেন তিনি। 'বেশ,' বললেন হের সামসা, 'এবার খোদাকে ধন্যবাদ।' তিনি ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন আর তিন মহিলা অনুসরণ করল তাকে। গ্রেটি, যার দৃষ্টি একবারও মৃতদেহ থেকে সরেনি, বলল: 'দেখো, দেখো কত শুকিয়ে গেছিল ও। অনেক দিন হয় কিছুই খায়নি। খাবারটা যেমন দিতাম ঠিক তেমনই ফেরত আসত।' সত্যিই গ্রেগরের দেহটা পুরো সমান আর শুষ্ক; আর সত্যিই এখন প্রথমবারের মতো দেখা যাচ্ছে, তার ছোট ছোট পাগুলো শরীরের ভার বওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, এ ছাড়া ওই শরীরখানায় দেখার মতো আর কিছু নেই।

'গ্রেটি, তুমি একটু আসো তো আমাদের সঙ্গে,' দুঃখের এক হাসি দিয়ে বললেন ফ্রাউ সামসা, এবং গ্রেটি তাদের পেছন পেছন ঢুকল তাদের শোবার ঘরে, পেছন ফিরে একবার মৃতদেহটার দিকে তাকাল সে। ঠিকে-ঝি দরজাটা বন্ধ করে হাট করে খুলে দিল জানালা। এমন ভোর সকালেও ঠান্ডা হাওয়াটার মধ্যে একধরনের কোমলতা রয়েছে। কারণ মার্চ মাস তো প্রায় শেষ এখন।

তিন ভাড়াটে বেরিয়ে এলেন তাদের ঘর থেকে, বিস্ময়ের চোখে চারদিকে তাকালেন তাদের সকালের নাশতার জন্য; ওদের কথা কারোই মনে নেই। 'আমাদের নাশতা কই?' কর্কশ গলায় ঠিকে-ঝির কাছে জানতে চাইলেন মাঝখানের ভাড়াটে। কিন্তু সে তার ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল, আর একটাও কথা না বলে তাদের জলদি ইশারা করে ঢোকাল গ্রেগরের ঘরের মধ্যে। তারা ঢুকলেন আর সেখানে – এতক্ষণে ঘর পুরো আলো হয়ে এসেছে – গ্রেগরের লাশটা ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালেন, তাদের হাত ঢোকানো প্রায় মলিন হয়ে যাওয়া জ্যাকেটের পকেটগুলোয়।

এ সময় সামসাদের শোবার ঘরের দরজা খুলে গেল, আর হের সামসা এক বাহুতে তার স্ত্রী, অন্য বাহুতে কন্যাকে ধরে বেরিয়ে এলেন ইউনিফর্মটা গায়ে চাপিয়ে। তাদের সবাইকে কিছুটা অশ্রুসিক্ত দেখাচ্ছে; একটু পর পর গ্রেটি তার মুখ চেপে ধরছে বাবার জামার হাতায়।

'এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান!' বললেন হের সামসা, আর মহিলা দুজনকে ধরে রেখেই দরজার দিকে আঙুল দেখালেন। 'কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?' খানিকটা হকচকিত হয়ে, মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বললেন মাঝের ভাড়াটে। অন্য দুজন পেছনে হাত রেখে তা ঘষতে লেগেছেন, যেন তারা অনেক খুশি নিয়ে অনুমান করতে পারছেন কোনো সত্যিকারের লড়াইয়ের, যে লড়াই থেকে তারা নিশ্চিত বেরিয়ে আসবেন বিজয়ীর বেশে। 'আমি যা বলেছি ঠিক তা-ই বলতে চাচ্ছি,' জবাবে বললেন হের সামসা, দুই মহিলাকে পাশাপাশি রেখেই তিনি এগিয়ে গেলেন মাঝখানের ভাড়াটের দিকে। শুরুতে ওই ভদ্রলোক একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তার দুই চোখ মাটির দিকে নামানো, যেন তার মনের মধ্যে নতুন কোনো ধাঁচে রূপ নিচ্ছে সবকিছু। 'হ্যাঁ, তাহলে মনে হচ্ছে চলেই যেতে হবে আমাদের,' বললেন তিনি আর এমনভাবে চোখ তুলে হের সামসার দিকে তাকালেন যে মনে হলো, বিনয়ের হঠাৎ তোড়ে তিনি এখন তার এই পুরোনো সিদ্ধান্তটার জন্য যেন নতুন করে অনুমোদন কামনা করছেন। হের সামসা তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে স্রেফ কবার একটু মাথা ঝাঁকালেন লোকটার উদ্দেশে। তা দেখে এই ভাড়াটে সত্যিই রওনা দিলেন হলঘরটার দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে; তার বন্ধু দুজন, যাঁরা এই এতক্ষণ পুরো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন সবকিছু – একদম থেমে গেছে তাদের হাত-ঘষাঘষি – এখন পরিষ্কার লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটলেন তার পেছনে, যেন তাদের ভয় যে হের সামসা আগেই দরজার ওখানে পৌঁছে যাবেন আর তাদের আলাদা করে দেবেন তাদের নেতা থেকে। হলঘরে তারা তিনজনই কোট রাখার তাক থেকে তুলে নিলেন যার যার হ্যাট, ছাতা রাখার জায়গাটা থেকে বের করে নিলেন যার যার ছড়ি, কোনো শব্দ না করে কুর্নিশ জানালেন আর বেরিয়ে গেলেন ফ্ল্যাট থেকে। দুই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হের সামসা – পরে অবশ্য বোঝা গেল, এই অবিশ্বাসের কোনো দরকার ছিল না – তাদের পেছন পেছন গেলেন একেবারে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত; সিঁড়ির হাতলের উপর ঝুঁকে তারা দেখতে লাগলেন ঐ তিন ভদ্রলোক আস্তে আস্তে কিন্তু সুনিশ্চিত লম্বা সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যাচ্ছেন, প্রতিটা তলায় এসে সিঁড়িপথের একটা নির্দিষ্ট বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন তারা আর কয়েক মুহূর্ত পরই আবির্ভূত হচ্ছেন আবার; যত তারা নিচে নামতে লাগলেন, তাদের ব্যাপারে সামসা-পরিবারের আগ্রহও ততই কমতে লাগল; আর যখন এক কসাই বালক মাথায় ট্রে নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিমায় উঠে আসতে লাগল তাদের দিকে আর পাশ কাটিয়ে দুলে দুলে উঠে গেল উপরে, তখন সিঁড়ির হাতল ছেড়ে চলে এলেন হের সামসা ও মহিলারা; তারা সবাই, যেনবা বোঝামুক্ত, ফিরে গেলেন ফ্ল্যাটে।

তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আজ দিনটা বিশ্রাম করে ও একটু বেড়িয়ে কাটাবেন; এত দিন পরিশ্রমের পর এই বিশ্রামটুকু শুধু তাদের প্রাপ্যই না, খুব দরকারিও বটে। তাই তারা বসলেন টেবিলে গিয়ে, মাফ চেয়ে লেখা শুরু করলেন তিনটে চিঠি – হের সামসা তার ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের কাছে, ফ্রাউ সামসা সেই লোকের কাছে যিনি তাকে সেলাইয়ের কাজ পাঠান, আর গ্রেটি তার দোকানের মালিকের কাছে। তারা যখন লিখছেন, ঠিকে-ঝি

ভেতরে ঢুকল যাওয়ার কথা বলতে, কারণ সে তার সকালের কাজ শেষ করে এনেছে। তিন চিঠি-লেখক প্রথমে চোখ না তুলেই শুধু মাথা নাড়লেন, কিন্তু ঠিকে-ঝি যখন ওখানেই ঘুরঘুর করতে লাগল, তখন তারা বিরক্তি নিয়ে মাথা তুলে তাকালেন। 'হ্যাঁ, বলো?' বললেন হের সামসা। ঠিকে-ঝি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকল দরজার কাছে, যেন এদের জন্য তার কাছে এক মহা ভালো খবর আছে – কিন্তু যতক্ষণ-না তাকে ঠিকভাবে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, ততক্ষণ সে বলবে না কিছু। তার হ্যাটে লাগানো ছোট অস্ট্রিচ পাখির পালকটা – ওটা এখন প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে – হের সামসা ওটার ওপর মহা বিরক্ত এই ঠিকে-ঝি কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই – ধীরে দুলছে সব দিকে। 'তুমি চাচ্ছটা কী?' জিগ্যেস করলেন ফ্রাউ সামসা, যাকে ঠিকে-ঝি অন্য সবার চেয়ে বেশি সম্মান করে। 'হ্যাঁ, মানে,' জবাবে বলল ঠিকে-ঝি আর এমন নিরীহ রস করা হাসি হাসতে লাগল যে খানিকক্ষণ কথাই বলতে পারল না, 'পাশের ঘরের ঐ জিনিসটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে বলছিলাম, মানে, আপনাদের আর ও নিয়ে ভাবতে হবে না। ব্যবস্থা করে ফেলেছি।' ফ্রাউ সামসা ও গ্রেটি তাদের চিঠির উপরে ঝুঁকল, যেন তারা চাচ্ছে স্রেফ লেখাটা চালিয়ে যেতে; হের সামসা বুঝতে পারলেন ঠিকে-ঝি এখন খুব চাচ্ছে সবকিছু বিস্তারিত খুলে বলতে, তিনি একটা হাত সামনে বাড়িয়ে শক্ত করে থামিয়ে দিলেন তাকে। গল্পটা বলার অনুমতি যেহেতু পাওয়াই গেল না, তাই ঠিকে-ঝির মনে পড়ে গেল তার খুবই তাড়া আছে; স্পষ্টই মন খারাপ করে সে বলে উঠল, 'গুডবাই সবাই', শাঁ করে ঘুরল প্রচণ্ডভাবে আর ভয়ংকর শব্দে দরজাগুলো বন্ধ করতে করতে বিদায় হলো ফ্ল্যাট ছেড়ে।

'এ মহিলাকে আজ সন্ধ্যারই চলে যেতে বলব,' বললেন হের সামসা, কিন্তু তার স্ত্রী বা মেয়ে, কারো কাছ থেকে কোনো উত্তর পেলেন না; মনে হচ্ছে ঠিকে-ঝি এদের দুজনের এই কিছুক্ষণ আগে পাওয়া মানসিক প্রশান্তি একদম ভেঙে দিয়ে গেছে। তারা উঠলেন, জানালার কাছে গেলেন, আর একজন আরেকজনকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন সেখানে। হের সামসা চেয়ারে বসেই তাদের দিকে ঘুরলেন, তাদের চুপচাপ দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর তিনি ডেকে উঠলেন: 'এদিকে আসো, এদিকে আসো এখন। এসব পুরোনো ঝামেলা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো তো! আমার জন্যও তো খানিকটা চিন্তা করবে, নাকি?' দুই মহিলা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন তার ইচ্ছা পূরণে, দ্রুত কাছে গেলেন তার, হাত বুলিয়ে আদর করলেন তাকে, তারপর ঝটপট শেষ করলেন তাদের চিঠি।

তারপর তারা তিনজন একসঙ্গে বের হলেন ফ্ল্যাট থেকে – বেশ কয়েক মাসের মধ্যে এই-ই প্রথম – আর ট্রামে চেপে যেতে লাগলেন শহরের বাইরে খোলা গ্রামাঞ্চলের দিকে। তাদের কামরাটা, ওখানে তারাই একমাত্র যাত্রী, বেশ ভরে আছে উষ্ণ সূর্যের আলোয়। আরামের সঙ্গে তারা যার যার আসনে হেলান দিয়ে ভবিষ্যতের নানা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন, আর খুঁটিয়ে দেখার পর মনে হলো, ভবিষ্যৎ একদম খারাপ না, কারণ তারা তিনজনই চাকরি করছেন – যদিও একজন আরেকজনের কাছে সত্যি বলতে কখনোই এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানতে চাননি তারা – যথেষ্ট ভালো চাকরিই বলা

যায়, আর বিশেষ করে ভবিষ্যতে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে ওগুলোতে। তাদের অবস্থার উন্নতিটা – একেবারে প্রধান ও তাৎক্ষণিক উন্নতি – নিঃসন্দেহে স্রেফ বাসাবদল করার মাধ্যমেই সহজে চলে আসবে; এবার তারা এখনকারটার চেয়ে – যেটা গ্রেগর খুঁজে দিয়েছিল – ছোট ও সস্তা, কিন্তু একই সঙ্গে আরো সুবিধাজনক এক জায়গায়, সব মিলে আরো ভালোভাবে দেখে রাখা যায় এমন একটা ফ্ল্যাট নেবেন। যখন তারা এসব নিয়ে আলাপ করছেন, তখন হের ও ফ্রাউ সামসার মাথায় – তাদের মেয়ের বাড়ন্ত উচ্ছলতা লক্ষ করতে-করতে – প্রায় একই সময়ে এই ভাবনাটা এল যে, এত খাটাখাটনিতে মেয়েটার গাল দুটো কেমন মলিন হয়ে গেলেও ইদানীং সে এক সুশ্রী ও সুগঠন তরুণী হিসেবে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। এবার তাঁরা আরো চুপ হয়ে গিয়ে, আর অনেকটা নিজেদের অজান্তেই চোখে চোখে কথা বলে, একমত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, ওর জন্য একটা ভালো বর দেখে দেওয়ারও উপযুক্ত সময় এসে গেছে। এবং তাদের এই নতুন স্বপ্ন ও সদিচ্ছার এক নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবেই যেন, যাত্রার শেষে তাদের কন্যাই উঠে দাঁড়াল সবার আগে আর টান টান করল তার তরুণী শরীর।

দণ্ড উপনিবেশে

'এক অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র এটা,' পর্যটককে বললেন অফিসার, আর একরকম মুগ্ধতা নিয়ে দেখতে লাগলেন যন্ত্রটা; ওটা তার কাছে নিঃসন্দেহে অনেক চেনা। পর্যটক ভদ্রলোক মনে হয় স্রেফ ভদ্রতার খাতিরেই কমান্ড্যান্টের অনুরোধ গ্রহণ করেছিলেন – অবাধ্যতা ও উর্ধ্বতনের প্রতি অসম্মানজনক আচরণের কারণে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া এক সৈনিকের দণ্ড কার্যকর হওয়া দেখার অনুরোধ। প্রাণদণ্ড কার্যকর হওয়া নিয়ে অবশ্য স্বয়ং এই শাস্তি উপনিবেশেই কারো মধ্যে তেমন বিরাট কোনো আগ্রহ নেই। যা হোক, অফিসার আর পর্যটক ছাড়া এখানে – এই গভীর বালুভরা ছোট উপত্যকায়, যেটাকে ঘিরে রেখেছে মরুময় সব ঢাল – আর শুধু আছে দণ্ডিত লোকটা, আলুথালু চেহারার বোকা-বোকা মুখ-হাঁ-করা এক জীব, আর একজন সৈনিক যার হাতে ধরা রয়েছে ভারী একটা শেকল। ওটাতে জড়ো করা আছে ছোট ছোট আরো শেকল, যেগুলো দিয়ে বাঁধা আছে দণ্ডিত লোকের গোড়ালি, কবজি আর ঘাড়; আর এই বড় ও ছোট শেকলগুলো আবার জোড়া দেওয়া আছে একসঙ্গে। সত্যি বলতে, দণ্ডিত লোকটার মধ্যে এমন এক পোষা কুকুর গোছের মনিবভক্তির ব্যাপার আছে যে মনে হচ্ছে তাকে চারপাশের ঢালগুলোতে যদি দৌড়াদৌড়ির জন্য ছেড়েও দেওয়া হয়, তবু চিন্তা নেই, দণ্ড কার্যকরের ঠিক আগেভাগে স্রেফ একটা বাঁশি বাজালেই সে ফিরে আসবে।

যন্ত্রটার ব্যাপারে পর্যটকের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ নেই। তিনি দণ্ডিত লোকটার পেছনে প্রায় পরিষ্কার এক অনাগ্রহী চেহারা নিয়ে এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছেন; ওদিকে অফিসার ব্যস্ত শেষ সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে, এই হামা দিয়ে চলে যাচ্ছেন যন্ত্রটার তলায় – গভীরভাবে ওটা পোঁতা আছে মাটিতে – তো এই একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন এর উপরদিককার অংশগুলো দেখতে। এসব কাজ একটা সামান্য কোনো মেকানিককে দিয়ে দিলেই হয়, কিন্তু না, অফিসার নিজেই খুব উৎসাহ নিয়ে সারছেন ওগুলো – হতে পারে তিনি এই যন্ত্রটার বিরাট ভক্ত কিংবা অন্য কোনো কারণ আছে, যেজন্য এই কাজগুলো অন্য আর কাউকে দেওয়া সম্ভব না। 'সবকিছু এখন রেডি!' তিনি শেষমেশ হাঁক দিলেন আর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন নিচে। ভয়ংকর ক্লান্ত তিনি, মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছেন; তার উর্দির কলারে গোঁজা রয়েছে মেয়েদের দুটো হালকা রুমাল। 'এই

উর্দিগুলো গ্রীষ্মমণ্ডলের এসব দেশের হিসাবে বেশি ভারী,' বললেন পর্যটক; অফিসার ভেবেছিলেন উনি যন্ত্রের বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করবেন। 'তা ঠিক,' অফিসার বললেন, তৈরি-রাখা এক বালতি পানিতে তিনি তার হাতে লেগে থাকা তেল-কালি ধুচ্ছেন, 'কিন্তু ওগুলো পরলে মনে হয় দেশে আছি; দেশের ছোঁয়া আমরা হারাতে চাই না। এখন আসুন, যন্ত্রটা দেখুন একটু,' ঝট করে বললেন তিনি, একটা তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছেন আর একই সঙ্গে যন্ত্রটার দিকে দেখাচ্ছেন, 'এ পর্যন্তই হাত লাগানোর কাজ, এরপর যন্ত্রটা চলবে একদম নিজে নিজেই।' মাথা নাড়লেন পর্যটক আর অফিসারকে অনুসরণ করলেন। সম্ভাব্য যেকোনো ঘটন-অঘটন থেকে নিজেকে বাঁচাতে অফিসার এবার যোগ করলেন: বলছি না যে মাঝেমধ্যে এটা বসে যায় না; আশা করছি আজ তেমন কিছু ঘটবে না, কিন্তু কিছু সম্ভাবনা তো থাকেই। যা-ই বলেন না কেন, টানা বারো ঘণ্টা তো চলতে হয় ওটাকে। কিন্তু ওরকম কিছু ঘটলেও দেখা যায় সেগুলো খুব সামান্য ব্যাপার, আমরা মেরামত করে ফেলি মুহূর্তের মধ্যে।'

'বসুন না?' অবশেষে বললেন তিনি, একগাদা বেতের চেয়ার থেকে একটা টেনে এনে পর্যটককে দিলেন; না করতে পারলেন না পর্যটক। তিনি দেখলেন তিনি বসে আছেন একটা গর্তের কিনারায়, ওটার ভেতরটা একনজর দেখে নিলেন। বেশি গভীর না ওই গর্ত। গর্তের এক পাশে কোদলানো মাটিগুলো ঢিবি করে একটা বাঁধ বানিয়ে রাখা; ওটার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে এই যন্ত্র। 'জানি না,' বললেন অফিসার, 'কমান্ড্যান্ট সাহেব আপনাকে যন্ত্রটা ব্যাখ্যা করেছেন কি না।' পর্যটক একটা অনিশ্চিত অঙ্গভঙ্গি করলেন; এটাই চাইছিলেন অফিসার, যাতে করে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করতে পারেন যন্ত্রটাকে। 'এই যন্ত্র,' বললেন তিনি, একটা সংযোজক রড ধরে ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, 'আমাদের এর আগের কমান্ড্যান্টের আবিষ্কার। একদম প্রথম দিককার পরীক্ষাগুলোতে আমি নিজে অংশ নিয়েছিলাম; এই কাজের প্রতিটা স্তরেই – একদম শেষ হওয়া পর্যন্ত – জড়িত ছিলাম। কিন্তু এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব ওনার একার। আপনি আমাদের প্রাক্তন কমান্ড্যান্টের কথা শুনেছেন কখনো? না? আচ্ছা। আমি একটুও বাড়িয়ে বলব না যদি বলি এই শাস্তি-উপনিবেশ তৈরি হওয়া আর এটা চালানোর পুরো কাজটাই ওনার করা। যখন তিনি মারা যান, আমরা – তার বন্ধুরা – তত দিনে বুঝে গেছি এই উপনিবেশকে উনি এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়েছেন যে তার উত্তরাধিকারীর মাথা যদি নতুন আইডিয়াতে গিজগিজও করে, তবুও ওনার রেখে যাওয়া ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তনও কেউ করতে পারবে না, অন্তত সামনের বেশ অনেক বছর তো নয়ই। আমাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণীই বাস্তবে ফলেছে; নতুন কমান্ড্যান্ট একই কথা স্বীকার করেছেন। আহা, আপনি আমাদের আগের কমান্ড্যান্টকে দেখেননি! – তবে,' নিজেকেই থামালেন অফিসার, 'এই যে আমি বকেই যাচ্ছি, আর ওনার অমর সৃষ্টি এই যে আমাদের সামনেই। দেখতেই পাচ্ছেন, এর মোট তিনটা অংশ। সময়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা অংশের আলাদা আলাদা ডাকনাম তৈরি হয়েছে। নিচের অংশের নাম বিছানা, উপরেরটা নকশাবিদ, আর এই যে মাঝের অংশ,

আগের দুটোর মাঝখানে ঝুলে আছে, এর নাম আঁচড়া।' 'মানে জমিতে দেওয়ার মই?' জিগ্যেস করলেন পর্যটক। খুব একটা মনোযোগের সঙ্গে কথা শুনছিলেন না তিনি; এই ছায়াহীন উপত্যকায় রোদের তেজ ফেটে পড়ছে; মাথা ঠিক রাখাটাই এক সমস্যা। তবে সে কারণেই অফিসারের প্রশংসা না করে পারছেন না তিনি, লোকটা তার আঁটসাঁট কুচকাওয়াজি উর্দি পরে – ওটা থেকে ঝুলছে কাঁধের ভারী সামরিক অলংকরণগুলো আর অনেক রেশমি কাজের বিনুনি – বিষয়টা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন কী মহা উৎসাহে আর একই সঙ্গে হাতের স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কোথাও কোনো ঢিলা স্ক্রু পেলেই সেটা টাইট করে চলেছেন। অন্যদিকে সৈনিকটার অবস্থা মনে হচ্ছে পর্যটকের মতোই। সে তার দুই কবজিতে লাগিয়ে রেখেছে দণ্ডিত মানুষটার শেকলগুলো, আর এক হাত রাইফেলে ঠেকিয়ে মাথা পেছনে বেঁকিয়ে, মনোযোগ দিচ্ছে না কোনোকিছুতেই। পর্যটক তাতে অবাক হলেন না একটুকুও, কারণ অফিসার কথা বলছেন ফরাসিতে; সৈনিক কিংবা দণ্ডিত মানুষ – কেউই ফরাসি ভাষা বোঝে না। সেজন্য ব্যাপারটা অদ্ভুত যে, ভাষা না-বোঝা সত্ত্বেও দণ্ডিত লোকটা ওরকম মন দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে অফিসারের কথা বোঝার। ঢুলুঢুলু এক একগুঁয়েমি নিয়ে সে সেদিকেই তাকাচ্ছে যেদিকে অফিসার আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন, আর যখন পর্যটক কোনো কথা জিগ্যেস করে থামিয়ে দিচ্ছেন অফিসারকে, তখন সেও, অফিসারের মতোই, দৃষ্টি ঘোরাচ্ছে পর্যটকের দিকে।

'হ্যাঁ, আঁচড়া,' বললেন অফিসার, 'একদম উপযুক্ত নাম। আঁচড়ার দাঁতের মতো করেই এতে সুইগুলো বসানো, আর পুরো জিনিসটা কাজ করে আঁচড়ার মতোই, শুধু পার্থক্য এটুকু যে এটা এক জায়গাতেই থাকে আর এর কাজ আঁচড়ার চাইতে অনেক বেশি শৈল্পিক। একটু পরেই আপনি দেখতে পারবেন। এখানে, বিছানায়, শোয়ানো হয় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে। – দেখুন, আমি আগে চাচ্ছি আপনাকে যন্ত্রটা একটু বোঝাতে, তারপর আসল কাজের জন্য ওটা চালু করা যাবে। ওভাবে আগালে আপনি পুরো ব্যাপারটা অনেক ভালোভাবে ধরতে পারবেন। তা ছাড়া, নকশাবিদ অংশের একটা খাঁজকাটা চাকা অনেক বেশি পুরোনো হয়ে গেছে; ঘোরার সময় ওটা মারাত্মক খরখর আওয়াজ করে; তখন আপনি নিজের কথাও নিজে শুনতে পাবেন না; খুচরা যন্ত্রপাতি এখানে পাওয়া কি যে দুর্ভাগ্যজনক সমস্যা। – তো, এই হচ্ছে বিছানা, যেমনটা বলছিলাম আর কী। এর পুরোটা ঢাকা আছে ভারী তুলোর আস্তর দিয়ে, উদ্দেশ্যটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে খানিক পরেই। এই তুলোর আস্তরের উপরে আসামিকে শোয়ানো হয় উপুড় করে, অবশ্যই ন্যাংটো অবস্থায়; তাকে শুইয়ে রাখার জন্য এই যে চামড়ার বাঁধুনিগুলো – এগুলো হাতের জন্য, এগুলো পায়ের, আর এইটা গলার। এখানে বিছানার এই মাথায় আছে – যেখানে আমি বলেছি যে শুরুতেই আসামিকে শোয়ানো হয় মুখ নিচের দিকে দিয়ে – তুলোর এই পিণ্ড, যেটা আমরা আসামির মুখের মধ্যে সোজা ঢুকিয়ে দেওয়ার সময় সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এর কাজ হচ্ছে চিৎকার থামানো আর দণ্ডিতকে জিভে কামড় দিতে বাধা দেওয়া। তুলোর পিণ্ড মুখে ভরে নেওয়া ছাড়া কোনো

গতিও নেই, কারণ তা না করলে গলার বাঁধুনি সোজা ঘাড় ভেঙে দেবে।' 'পেঁজা তুলো এগুলো?' সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন পর্যটক। 'অবশ্যই,' মৃদু হেসে বললেন অফিসার, 'নিন না, নিজেই দেখুন।' পর্যটকের হাত ধরে তিনি বিছানার উপরে হাতটা বুলিয়ে দিলেন। 'বিশেষভাবে বানানো ব্যান্ডেজের তুলো এগুলো, সেজন্যই আপনার কাছে এত অচেনা লাগছে; একটু পরেই আপনাকে বলছি এর কাজ কী।' এতক্ষণে পর্যটকের কিছুটা আগ্রহ হওয়া শুরু হলো যন্ত্রটা নিয়ে; তিনি মাথা উঁচু করে ওটার দিকে তাকালেন, এক হাত তুলে সূর্যের আলো থেকে চোখ ঠেকিয়ে। বিরাট একটা জিনিস। বিছানা আর নকশাবিদ দুটো আকারে সমান, দেখতে মনে হয় কালো রঙের দুটো সিন্দুক। নকশাবিদটা বিছানার প্রায় দুই মিটার উপরে লাগানো; চার কোনায় চারটে পেতলের রড দিয়ে জোড়া দেওয়া আছে ওদুটো, রডগুলো যেন ঝিলিক দিচ্ছে সূর্যের আলোয়। দুই সিন্দুকের মাঝ বরাবর, একটা স্টিলের বেল্টের উপর, ঝুলছে আঁচড়া।

অফিসার কিন্তু পর্যটকের প্রথম দিককার অন্যমনস্কতা বলতে গেলে খেয়ালই করেননি, কিন্তু এখন তার মধ্যে যে আগ্রহ জেগে উঠেছে তা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন; তাই পর্যটককে ভালোমতো যন্ত্রটা দেখার সময় দেওয়ার জন্য তিনি তার ব্যাখ্যায় বিরতি দিলেন একটু। দণ্ডিত আসামি পর্যটকের নকল করে চলেছে; পার্থক্য এটুকু যে সে তার হাত তুলে চোখ ঢাকতে পারছে না, না-ঢাকা চোখে পিটপিট করে উপরে তাকিয়ে আছে তীব্র আলোর দিকে।

'অল রাইট, বুঝলাম, মানুষটা শুয়ে আছে বিছানায়,' বললেন পর্যটক; তিনি চেয়ারে পেছনে ভর দিয়ে বসলেন তার পায়ের উপর পা তুলে।

'হ্যাঁ,' বললেন অফিসার, মাথার ক্যাপ সামান্য পেছনে সরিয়ে আর তার তাপে পোড়া মুখটায় হাত বুলিয়ে, 'এবার শুনুন! বিছানা আর নকশাবিদ – দুটোরই আছে নিজস্ব বৈদ্যুতিক ব্যাটারি; বিছানার নিজের জন্যই লাগে ওটা, আর নকশাবিদের ব্যাটারি আঁচড়ার জন্য। মানুষটাকে যেই বেঁধে শোয়ানো হবে, বিছানা ঘোরা শুরু করবে। পাশাপাশি আর উপর-নিচ – একই সঙ্গে দুদিক থেকেই থরথর কাঁপবে ওটা, খুব সূক্ষ্ম আর দ্রুত গতির ঝাঁকানি। স্বাস্থ্যনিবাসগুলোয় এই ধরনের জিনিস আপনি দেখে থাকবেন; কিন্তু আমাদের বিছানার ক্ষেত্রে এর প্রতিটা নড়াচড়াই নিখুঁতভাবে হিসাব করা; হতেই হবে, আঁচড়ার চলার সঙ্গে একদম এক তালে সংগতি রাখার অন্য কোনো উপায় নেই। আর এই আঁচড়াই হচ্ছে শাস্তি কার্যকর করার মূল জিনিস।'

'কিন্তু এই শাস্তির ধরনটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?' পর্যটক জিজ্ঞাসা করলেন। 'আপনি সেটাও জানেন না?' ঠোঁট দুটো কামড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন অফিসার: 'মাফ করবেন – আমার ব্যাখ্যাগুলো একটু এলোমেলো লাগতে পারে, আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সত্যি হচ্ছে, আগের কমান্ড্যান্ট নিজেই এই ব্যাখ্যাগুলো দিতেন, কিন্তু নতুন কমান্ড্যান্ট সে দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন; তার পরও আপনার মতো সম্মাননীয় একজন ভিজিটরকেও যে' – পর্যটক দুই হাত দিয়ে চেষ্টা করলেন এই

সম্মান এড়াতে, কিন্তু অফিসার অনড় – 'আপনার মতো সম্মাননীয় একজন ভিজিটরকেও যে আমাদের শাস্তি কী চেহারা নেয় তা এমনকি একটু বলাও হবে না, তা ওনার আরেকটা নতুন রীতি যা কিনা –' এই পর্যায়ে তিনি ঠিক কোনো গালি ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিয়ে স্রেফ বললেন: 'আমাকে এ ব্যাপারে জানানো হয়নি; আমার দোষ না। তবে কথা হচ্ছে, আমিই আসলে আমাদের এই শাস্তির ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়ার কাজে সবচেয়ে উপযুক্ত অবস্থায় আছি, কারণ আমার কাছে এই এখানে আছে' – তিনি তার বুকপকেটে টোকা দিলেন – 'আমাদের আগের কমান্ড্যান্টের নিজ হাতে আঁকা এ বিষয়ের নকশাগুলো।'

'কমান্ড্যান্টের নিজের আঁকা?' জিগ্যেস করলেন পর্যটক: 'উনি কি তাহলে একই সঙ্গে এতকিছু ছিলেন? সৈনিক, বিচারক, প্রকৌশলী, ওষুধ-বিশেষজ্ঞ, নকশাবিদ – সব?'

'আসলেই তাই,' বললেন অফিসার, মাথা নাড়লেন একটা ভাবুক, চকচকে চোখে। তারপর নিজের হাত দুটো ভালো করে দেখলেন; ওরা এই নকশাগুলো ধরার জন্য উপযুক্ত সাফ বলে মনে হলো না তার; অতএব বালতির কাছে গেলেন তিনি, হাত দুটো আবার ধুলেন। এরপর তিনি বের করলেন একটা ছোট চামড়ার ফোল্ডার, বললেন: 'আমাদের শাস্তি খুব কঠিন কিছু না। দণ্ডিত আসামি যে আইন ভেঙেছে তা তার গায়ে লেখা হবে আঁচড়াটা দিয়ে। যেমন ধরুন, এই আজকের আসামি' – অফিসার দণ্ডিত লোকটাকে দেখালেন – 'ওর গায়ে লেখা হবে: সম্মান করো তোমার ঊর্ধ্বতনকে!'

পর্যটক দণ্ডিত মানুষটাকে দ্রুত একনজর দেখলেন: অফিসার তার দিকে আঙুল তুলতেই সে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল, মনে হচ্ছে তার শ্রবণশক্তির সবটা দিয়ে চেষ্টা করছে অফিসারের কথা বুঝতে। কিন্তু তার পুরু আর অসন্তোষে বাঁকানো ঠোঁট দুটোর নড়াচড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে, সে কিছুই ধরতে পারেনি। পর্যটকের মাথায় ঘুরছে অনেকগুলো প্রশ্ন, কিন্তু লোকটাকে দেখতে দেখতে তিনি শুধু এটুকুই জিজ্ঞাসা করলেন: 'ও কি ওর শাস্তিটা জানে?' 'না,' অফিসার বললেন, চাচ্ছিলেন কথাটা ব্যাখ্যা করতে কিন্তু পর্যটক থামিয়ে দিলেন তাকে: 'তার নিজের শাস্তি সে জানে না?' 'না,' আবার বললেন অফিসার, এক মুহূর্তের জন্য থামলেন যেন বা আশা করছেন পর্যটক তাকে প্রশ্নটা জিগ্যেস করার ব্যাখ্যা দেবেন, এরপর বললেন: 'ওটা তাকে জানানোর তো কোনো মানে হয় না। সে তো তার গায়ের মাংসেই জেনে যাচ্ছে সেটা।' পর্যটক – আর কিছু বলার নেই ওনার – অনুভব করলেন যে দণ্ডিত মানুষটা তার দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে জানতে চাইছে, তাকে বলা পুরো কার্যপ্রণালিতে তার সায় আছে কি না। সুতরাং, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা অবস্থা থেকে আবার সামনে ঝুঁকলেন পর্যটক, নতুন প্রশ্ন করলেন: 'কিন্তু সে জানে তো যে তার বিরুদ্ধে রায় হয়ে গেছে?' 'না, তাও জানে না সে,' বললেন অফিসার, পর্যটকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন যেন বা তার কাছ থেকে আরো অদ্ভুত কিছু কথাবার্তা শোনার আশা করছেন। 'মানে বলতে চাচ্ছেন,' ভুরু মুছতে মুছতে বললেন পর্যটক, 'এই এখন পর্যন্ত সে জানে না তার আত্মপক্ষ সমর্থনটা কীভাবে নেওয়া হয়েছে?' 'তার আত্মপক্ষ

সমর্থনের তো কোনো সুযোগই ছিল না,' অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন অফিসার, যেন তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন আর পর্যটককে এসব স্বতঃসিদ্ধ জিনিস শোনার বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে চাইছেন। 'কিন্তু আসামির তো তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ অবশ্যই থাকা উচিত,' বললেন পর্যটক, – বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

অফিসার বুঝতে পারছেন তার যন্ত্র ব্যাখ্যা করার ব্যাপারটা লম্বা সময়ের জন্য ঝুলে যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছেন তিনি; তাই তিনি পর্যটকের কাছে গেলেন, তার হাত ধরলেন, দণ্ডিত আসামির দিকে দেখালেন – যেহেতু এটা পরিষ্কার যে সে-ই এখন সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, তাই এখন সে শক্ত হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে – সৈনিকও একটা টান মারল তার শেকলে – আর বললেন: 'ব্যাপারটা এমন। শাস্তির এই উপনিবেশে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিচারক হিসেবে। আমার বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও। কারণ আমি ছিলাম সব দণ্ডবিধি বিষয়ে আগের কমান্ড্যান্টের সহকারী আর যন্ত্রটা অন্য কারো চেয়ে যেহেতু আমিই বেশি জানি। যে নীতির ওপরে আমি আমার সিদ্ধান্তগুলো নিই তা হচ্ছে: অপরাধ সব সময়েই প্রশ্নাতীত একটা ব্যাপার। অন্য আদালতগুলো এই নীতিতে চলতে পারে না কারণ, সেগুলোতে থাকে একের অধিক সদস্য, আর তা ছাড়া সেগুলোর উপরেও থাকে আরো আদালত। এখানে বিষয়টা সে রকম নয়, কিংবা আমাদের আগের কমান্ড্যান্টের সময়ে অন্তত সে রকম ছিল না। স্বীকার করতে হচ্ছে, নতুনজন আমার রায়ে হস্তক্ষেপ করার কিছু আগ্রহ এরই মধ্যে দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি ওনাকে নিরস্ত করতে সফল হয়েছি, আর আমি তা করতেই থাকব। – আপনি নির্দিষ্ট করে এই কেস্‌টার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাচ্ছিলেন; সাধারণ একটা কেস্ এটা, সবগুলোই তাই। আজ সকালে আমাকে একজন ক্যাপ্টেন জানাল যে এই লোক – যাকে রাখা হয়েছে ঐ ক্যাপ্টেনের চাকর হিসেবে, তার দরজার বাইরে সে শোয় – কাজের সময়ে ঘুমাচ্ছিল। দেখুন, এ ব্যাটার কাজই হচ্ছে প্রতিবারের ঘণ্টা বাজতেই উঠে দাঁড়ানো আর ক্যাপ্টেনের দরজায় স্যালুট করা। বিরাট কোনো কঠিন কাজ নয়, তবে খুব দরকারি কাজ তো বটেই; কারণ ওর ঊর্ধ্বতনকে পাহারা দেওয়া আর তার জন্য অপেক্ষা করা – দুটো কাজের জন্যই ওর দরকার সব সময় সতর্ক থাকা। গত রাতে ক্যাপ্টেন চাইল দেখবে যে এই চাকর ব্যাটা ঠিকমতো তার দায়িত্ব পালন করছে কি না। রাত দুটো বাজতে ক্যাপ্টেন দরজা খুলল, দেখল এ লোক কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ক্যাপ্টেন তার ঘোড়ার চাবুকটা নিয়ে এল আর মারল এর মুখে। তখন উঠে ক্ষমা চাওয়ার বদলে, এই লোক তার প্রভুর পা পেঁচিয়ে ধরল, তাকে ঝাঁকি দিল আর চেঁচিয়ে বলল: "ওই চাবুক ফেলে দে, নয়তো আমি তোকে গিলে খাব।" – এই হচ্ছে এই কেসের ফ্যাক্টস্। এক ঘণ্টা আগে ক্যাপ্টেন এসেছিলেন আমার কাছে; আমি তার বক্তব্যটা লিখে নিলাম আর তারপরই রায় দিয়ে দিলাম। আর ওকে শেকল পরাতে বললাম। সোজাসাপটা ব্যাপার। আমি যদি এর বদলে ওকে প্রথমে ডাকতাম, জেরা করতাম, তাতে বিভ্রান্তি বাড়তই শুধু। সে মিথ্যা বলত; আমি যদি সফলও হতাম ওর মিথ্যাগুলো খণ্ডন করতে, তখন ও সেগুলোর বদলে বলত আরো নতুন সব মিথ্যা; তারপর

আরো। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার কাছে ধরা খেয়ে গেছে ও, আমি ওকে ছাড়ছি না। – এখন সব পরিষ্কার? সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, দণ্ড কার্যকর করা শুরু হয়ে যাওয়া উচিত আর আমি এখনো যন্ত্রটা আপনাকে পুরো ব্যাখ্যা করেই উঠতে পারিনি।' পর্যটককে নিজের আসনে বসার জন্য চাপ দিয়ে অফিসার ফিরে গেলেন যন্ত্রের কাছে, শুরু করলেন: 'দেখতেই পাচ্ছেন, আঁচড়ার আকৃতি মানুষের শরীরের আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে করা; এই হচ্ছে শরীরের উপরের অংশের জন্য আঁচড়া, আর এগুলো পায়ের জন্য আঁচড়া। মাথার জন্য রাখা আছে শুধু এই ছোট্ট খোদাইযন্ত্রটা। আপনার কাছে এখন পরিষ্কার তো সব?' তিনি বন্ধুত্বের ঢঙে ঝুঁকলেন পর্যটকের দিকে, সবচেয়ে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে তৈরি।

পর্যটক আঁচড়া দেখতে লাগলেন ভুরু কুঁচকে। বিচারপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যা জানলেন তিনি, তাতে তিনি অসন্তুষ্ট। তাকে অবশ্য মানতে হচ্ছে যে এটা একটা শাস্তি-উপনিবেশ, এখানে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার আছে, আর সামরিক বিধিব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে চলা ছাড়া এখানে কোনো বিকল্পও নেই। তবে তিনি নতুন কম্যান্ড্যান্টের ওপর খানিক আশা রাখছেন, ওনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যত ধীরেই উনি এগোতে চাচ্ছেন নতুন কোনো ধরনের বিধিব্যবস্থা চালু করতে, এই অফিসারের সীমিত বিচারবুদ্ধি যেগুলো বুঝতে অক্ষম। এই চিন্তা থেকেই পর্যটক জিজ্ঞাসা করলেন: 'কম্যান্ড্যান্ট কি রায় কার্যকর হওয়া দেখতে আসবেন?' 'তার নিশ্চয়তা নেই,' আকস্মিক এই প্রশ্নে বিব্রত হয়ে বললেন অফিসার, তার বন্ধুত্বপূর্ণ চেহারা কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। 'ঠিক এ কারণেই আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো কোনো সময় নেই। আমাকে আসলে আমার ব্যাখ্যা সংক্ষেপ করে ফেলতে হচ্ছে, আফসোস থেকে গেল। কিন্তু আগামীকাল যন্ত্রটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলার পর – এর একমাত্র সমস্যা হলো এটা কী যে নোংরায় মাখামাখি হয়ে যায় – অতি অবশ্যই আমি আপনাকে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেব। তাহলে এখনকার মতো, শুধু দরকারি ব্যাখ্যাগুলো। – মানুষটাকে যখন বিছানায় শোয়ানো হবে, আর কাঁপতে থাকবে বিছানা, আঁচড়া নেমে আসবে শরীরের উপর। আঁচড়া অটোমেটিক নিজেকে ঠিক করে নেবে যেন সুঁইয়ের মাথাগুলো ঠিক শরীর ছুঁয়ে থেমে যায়; ঠিকঠাকমতো ওটা হয়ে যাওয়ার পরে, সঙ্গে সঙ্গে এই স্টিলের বেল্টটা টান টান হয়ে যাবে, একটা রডের মতো। এবার শুরু হবে আসল কাজ। সাধারণ চোখে শাস্তিগুলোর মধ্যে বাহ্যিক কোনো পার্থক্য ধরা পড়বে না। আঁচড়াটা দেখে মনে হবে যে সে তার কাজ করে যাচ্ছে একই ছন্দে। আঁচড়া কাঁপছে, সুচগুলো ঢুকে যাচ্ছে শরীরে, আর বিছানার কাঁপুনিতে কেঁপে কেঁপে শরীর নিজেকে তুলে ধরছে আঁচড়ার কাছে। যাতে করে সবাই শাস্তি কার্যকর হওয়াটা নিখুঁতভাবে দেখতে পারে, আঁচড়াটা তাই কাচ দিয়ে বানানো। সুচগুলো কাচের উপর চড়ানো বেশ টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছিল বটে, কিন্তু অনেকবার পরীক্ষার পর আমরা পেরেছি। কোনো চেষ্টাই বাদ যায়নি, বুঝতেই পারছেন। এখন দেখেন কাচের মধ্য দিয়ে যে-কেউ দেখতে পাবে শরীরের উপর খোদাইয়ের কাজটা কীভাবে চলে। এখানে আসুন না, নাকি, সুচগুলো একটু কাছ থেকে ভালো করে দেখুন।'

পর্যটক ধীরে দুপায়ে দাঁড়ালেন, সামনে হেঁটে গেলেন, ঝুঁকলেন আঁচড়ার উপর। 'দেখুন এখানে আছে,' অফিসার বললেন, 'বেশ করকম ভাবে রাখা মোট দুই ধরনের সুচ। প্রত্যেকটা লম্বা সুচের পাশে আছে একটা করে ছোট সুচ। লম্বাগুলো দিয়ে লেখা হয়, আর ছোটগুলো সব সময় রক্ত ধুয়ে ফেলার আর লেখাটা পরিষ্কার রাখার জন্য পানি ছিটিয়ে চলে। রক্ত আর পানির মিশ্রণটা তারপর চলে যায় এই ছোট চ্যানেলগুলোয়, শেষে ওগুলো গিয়ে পড়ে এই বড় চ্যানেলে, তারপর ওটা থেকে একটা ড্রেনপাইপ দিয়ে বাইরের গর্তে।' অফিসার তার আঙুল দিয়ে রক্ত-পানির তরল যাওয়ার পথটা নিখুঁতভাবে দেখিয়ে দিলেন। এরপর তিনি যখন দৃশ্যটা সর্বোচ্চ সম্ভব জীবন্ত করার স্বার্থে পাইপের মুখে তার হাত গোল করে ধরেছেন, যেন পাইপ থেকে বেরোনো তরলটা ধরবেন, পর্যটক মাথা তুললেন আর এক হাত নিজের পেছনদিক ঠাহর করে করে চেয়ারের দিকে পেছনে হাঁটা শুরু করলেন। তারপর আতঙ্কের সঙ্গে তিনি খেয়াল করলেন – আঁচড়াটা কাছ থেকে পরীক্ষা করার অফিসারের সেই আমন্ত্রণ দণ্ডিত মানুষটাও গ্রহণ করেছে। শেকলের সাহায্যে সে ঘুমকাতর সৈনিককে টেনে খানিক সামনে নিয়ে এসেছে, আর কাচের উপর ঝুঁকে দেখছে। একটা ধাঁধা-লাগা চোখে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে ওই দুই ভদ্রলোক কী দেখছিল ওখানটায় এবং কোনো ব্যাখ্যা না-পাওয়ার কারণে সে খুঁজে পাচ্ছে না কিছুই। একবার সে এদিকে ঝুঁকছে তো আরেকবার ওদিকে, তার দুই চোখ বারবার পড়ছে গিয়ে কাচের উপরে। পর্যটক চাইলেন ওকে সরিয়ে দিতে, কারণ তার এই আচরণ নিশ্চিত কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু অফিসার এক হাত দিয়ে পর্যটককে শক্ত করে ধরে, অন্য হাতে বাঁধের ওখানটা থেকে একদলা মাটি তুললেন, আর সৈনিকের দিকে ছুড়ে মারলেন। সৈনিক চমকে গিয়ে চোখ খুলল, দেখল দণ্ডিত লোকটা কী দুঃসাহসের কাজ করেছে, সে হাতের রাইফেল ফেলে দিল, মাটিতে পা ঠুকল জোরে, আর এমন জোরে দণ্ডিত লোকটাকে পেছনের দিকে টান দিল যে সে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে; তারপর সৈনিক ওর পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ওকে – মাটিতে পড়ে মোচড়াচ্ছে তার ঝনঝন আওয়াজ করা শেকলগুলোয় পেঁচিয়ে গিয়ে। 'দাঁড়া করাও ওকে!' চিৎকার করলেন অফিসার, তিনি বুঝতে পেরেছেন দণ্ডিত মানুষটার জন্য পর্যটকের মনোযোগে বিরাট ব্যাঘাত ঘটছে। পর্যটক এমনকি আঁচড়ার উপর ঝুঁকে পড়েছেন, তার কোনো খেয়ালই নেই সে-ব্যাপারে, তিনি শুধু ব্যস্ত মানুষটার ভাগ্যে কী ঘটছে তা দেখতে। 'ওর ব্যাপারে খেয়াল নাও!' আবার চিৎকার দিলেন অফিসার। যন্ত্রটার পাশ দিয়ে ঘুরে দৌড়ে গেলেন তিনি, দণ্ডিত লোকটার বগলের নিচ দিয়ে নিজহাতে তাকে আঁকড়ে ধরলেন আর সৈনিকের সঙ্গে মিলে অনেক আছাড়-পাছাড়ের পরে সক্ষম হলেন ওকে খাড়া করাতে।

'আমি এখন এর পুরোটাই বুঝতে পারছি,' অফিসার ফিরে আসতেই পর্যটক বললেন। 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা ছাড়া,' বললেন অফিসার, পর্যটকের বাহু ধরে উপরের দিকে তাক করে: 'ওখানে উপরে নকশাবিদ-এর মধ্যে আছে আঁচড়ার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করার কলকবজা, আর ওগুলো বসানো হয়েছে ঠিক সেই নকশা অনুযায়ী যা কিনা

শাস্তিটাকে ফুটিয়ে তুলবে। আমি এখনো আগের কমান্ড্যান্টের নকশাগুলোই ব্যবহার করছি। এই যে এগুলো' – তিনি চামড়ার ফোল্ডার থেকে বেশ কটা কাগজ বের করলেন – 'তবে আপনাকে ধরতে দিতে পারছি না ওগুলো, ওরা আমার সবচেয়ে দামি সম্পত্তি। আপনি বসুন, আমি আপনাকে এখান থেকেই দেখাচ্ছি, আপনি সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাবেন।' তিনি প্রথম কাগজটা মেলে ধরলেন। পর্যটক খুশিই হতেন যদি কোনো প্রশংসার কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি অনেকগুলো কাটাকাটি করা রেখার এক গোলকধাঁধা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না, রেখাগুলো পুরো কাগজ জুড়ে এত ঘন করে আঁকা যে ওদের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাগুলো খুঁজে পাওয়ার কাজটা সহজ না। 'এটা পড়ুন,' বললেন অফিসার। 'পারছি না,' বললেন পর্যটক। 'কিন্তু পরিষ্কার তো দেখা যাচ্ছে,' অফিসার বললেন। 'অনেক শিল্পিত আঁকা,' পাশ-কাটানোর মতো করে পর্যটক বললেন, 'কিন্তু আমি এর পাঠোদ্ধার করতে পারছি না'। 'ইয়েস,' হাসতে হাসতে অফিসার বললেন, ফোল্ডারটা সরিয়ে রাখলেন আবার, 'এটা বাচ্চাদের স্কুলে খাতায় আদর্শলিপি লেখার মতো কিছু না। অনেকক্ষণ ধরে একে দেখা লাগবে আপনার, কিন্তু আমি নিশ্চিত, শেষে গিয়ে আপনিও ঠিকই ধরতে পারবেন যে কী লেখা আছে এতে। দেখুন, এটা সরল সোজা কোনো লেখনী হতে পারে না; ব্যাপার হচ্ছে, শুরুতেই এ কাউকে মেরে ফেলতে পারবে না, গড়ে বারো ঘণ্টা পরে হতে হবে মৃত্যু; আর গুণে গুণে ছয় ঘণ্টার মাথায় আসতে হবে সেই সন্ধিক্ষণ। কাজেই আসল লেখাটিকে ঘিরে থাকতে হবে অনেক অনেক অলংকরণ। শুধু যদি লেখাটার কথা বলেন, ওটা তো শুধু কোমর বেড় দিয়ে একটা সরু বৃত্তই আঁকবে মাত্র; শরীরের বাকি পুরোটাই, সেটা তাহলে থাকছে অলংকরণের জন্য। আপনি এখন কি আঁচড়া আর পুরো যন্ত্রটার কাজ ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারছেন? – ঠিক আছে, তাহলে শুধু দেখুন এবার!' সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে গেলেন তিনি, একটা চাকা ঘোরালেন, নিচে চেঁচিয়ে বললেন: 'দয়া করে সরে যান!' আর চলতে শুরু করল যন্ত্র। শুধু ঐ ঘর্ঘর-শব্দ-তোলা চাকাটা না থাকলেই সবকিছু চমৎকার হতো। এই বিরক্তিকর চাকাটা যেন ওনার কাছে বিস্ময় হয়ে এসেছে, তেমনভাবে অফিসার ওটার দিকে ঘুষি পাকিয়ে দেখালেন, তারপর মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে দুই হাত বাড়ালেন পর্যটকের দিকে, আর ঝটপট নেমে এলেন যন্ত্রের কাজটা নিচের থেকে দেখবেন বলে। এখনো কিছু একটাতে সমস্যা হচ্ছে, কিছু একটা যা একমাত্র তার পক্ষেই বোঝা সম্ভব; তারপর তিনি উপরে উঠে গেলেন, দুই হাত ঢুকিয়ে দিলেন নকশাবিদ অংশটার মধ্যে, আর তারপর দ্রুত নামার জন্য সিঁড়ি না ধরে সোজা একটা পোল বেয়ে নামতে লাগলেন; আর যেন এই বিরাট আওয়াজের মধ্যেও পর্যটক শুনতে পান তার কথা, তাই পর্যটকের কানে চিৎকার করে বললেন যত জোরে পারা যায়: 'কোনটার পর কোনটা হচ্ছে ধরতে পারছেন? আঁচড়া লেখা শুরু করে; আসামির পিঠে প্রথম খসড়াটা লেখা শেষ হওয়া মাত্র পেঁজা তুলোর স্তরটা ঘুরে যায়, শরীরকে ঘুরিয়ে নেয় নিজের দিকে, আঁচড়া তখন পেয়ে যায় লেখার জন্য নতুন জায়গা। ততক্ষণে লেখালেখি হয়ে যাওয়া কাঁচা অংশটা তুলোর উপরে একটু জিরিয়ে নেয়, তুলোগুলো

বিশেষভাবে তৈরি বলেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় তখনই, তার ফলে ওগুলোর উপরে আবার আরো গভীর করে লেখা সম্ভব হয়। তারপর শরীরটা যখন আবার আগের জায়গায় ঘুরে আসে, এখানে আঁচড়ার ধার ঘেঁষে থাকা দাঁতগুলো ক্ষত থেকে ছিঁড়ে উঠিয়ে নেয় তুলো, সোজা গর্তে ফেলে দেয় ওগুলো, তারপর আবার শুরু হয় আঁচড়ার কাজ। এভাবেই গভীর থেকে গভীরে লিখে চলে আঁচড়া, পুরো বারো ঘণ্টা ধরে। প্রথম ছয় ঘণ্টা আসামি মোটামুটি স্বাভাবিক বেঁচে থাকার সময়ের মতোই কাটায়, বলতে গেলে খুব কোনো ব্যথাই লাগে না। দুঘণ্টা পার হলে ওর মুখ থেকে তুলোর পিণ্ড সরিয়ে নেওয়া হয়, কারণ ওর আর তখন চিৎকার করার শক্তি নেই। এখানে এই যে ওর মাথার কাছে বৈদ্যুতিকভাবে গরম রাখা পাত্রে আমরা ওর জন্য চালের ক্ষীর রেখে দিই, ওর যদি মন চায় জিভ বাড়িয়ে যতটা পারা যায় খেতে পারে। ওদের একটাও এই সুযোগ ছাড়ে না। আমার অভিজ্ঞতা তো কম হলো না, আমি কিন্তু কাউকে ছাড়তে দেখিনি। ছয় ঘণ্টা আসা পর্যন্ত ভোজনের এই আনন্দটা ওর থাকে। ওই সময়টাতে আমি সাধারণত হাঁটু গেড়ে এখানে বসি আর বিস্ময়কর এই ব্যাপারটা দেখি। আসামি শেষ ঢোকটা সাধারণত গেলে না, সে স্রেফ মুখের মধ্যে ওটা ঘুরায় আর থু করে ফেলে দেয় গর্তে। আমাকে তখন ঝট করে বসে পড়তে হয়, না হলে ওর থুতু তো এসে আমার মুখে লাগবে। ছয়তম ঘণ্টায় এসে কী নিশ্চুপই না হয়ে যায় সে! সবচেয়ে জড়বুদ্ধির লোকটাও তখন বুঝতে শুরু করে। বোঝাটা শুরু হয় চোখের পাশ ঘিরে। ওখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে তা। এমন একটা দৃশ্য যে লোভ হয় ওর পাশে আঁচড়ার নিচে গিয়ে শুয়ে পড়ি। এরপর আর ঘটে না কিছুই, মানুষটা স্রেফ লেখার মর্মোদ্ধার করা শুরু করে, তার ঠোঁট দুটো এমনভাবে কোঁচকায় যে মনে হয় সে শুনছে কিছু। আপনি দেখেছেন যে চোখ দিয়ে লেখাটার মর্মোদ্ধার করা সোজা নয়; আর আমাদের আসামি এর মর্মোদ্ধার করে নিজের শরীরের ক্ষত দিয়ে। কোনো সন্দেহ নেই, এটা কঠিন কাজ; ছয় ঘণ্টা লাগে তার এ পর্যায়ে পৌঁছাতে। কিন্তু তারপর আঁচড়া তাকে পুরো বর্শাবিদ্ধ করে ফেলে, ছুড়ে তাকে ফেলে দেয় গর্তে, ওখানে গিয়ে তার শরীরটা ঝপাৎ করে পড়ে রক্ত পানি আর পেঁজাতুলোর উপর। এই সঙ্গে শেষ হয় বিচার; আর আমরা, সৈনিক ও আমি বেলচা দিয়ে ওর উপরে ছিটিয়ে দিই কিছু মাটি।'

পর্যটক তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে, একটা কান অফিসারের দিকে দিয়ে, যন্ত্রটার কাজ দেখতে লাগলেন। দণ্ডিত মানুষটাও একই রকম দেখছে, কিন্তু না বুঝেই। সামান্য সামনে ঝুঁকে সে যখন চেষ্টা করছে দোল খাওয়া সুচগুলো চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে, তখন অফিসারের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে সৈনিকটা একটা ছোরা বের করল আর পেছন থেকে এক ঝটকায় কেটে ফেলল দণ্ডিতের জামা ও পাজামা, ওগুলো খুলে পড়ল তার গা থেকে; নিজের নগ্নতা ঢাকতে দণ্ডিত মানুষ চেষ্টা করল খুলে পড়া জামাকাপড়গুলো ধরতে, কিন্তু ততক্ষণে সৈনিক তাকে তুলে ফেলেছে শূন্যে আর তাকে ঝাঁকিয়ে তার গায়ের থেকে খুলে ফেলছে শেষ কাপড়টুকুও। অফিসার যন্ত্রটা থামালেন, এর পরে নীরবতা – আর এরই মধ্যে দণ্ডিত মানুষটাকে শোয়ানো হলো আঁচড়ার নিচে। ঢিলা করে দেয়া হলো শেকলগুলো,

ওগুলোর জায়গায় বাঁধুনি দিয়ে বাঁধা হলো তাকে; প্রথম মুহূর্তে ব্যাপারটা তার কাছে স্বস্তির বলেই মনে হলো বোধহয়। আর এবার আঁচড়া নামানো হলো আরেকটু নিচুতে, কারণ লোকটা বেশ পাতলা গড়নের। যখন সুচের প্রান্তগুলো তাকে ছুঁলো, একটা কাঁপুনি বয়ে গেল তার চামড়ার উপর দিয়ে; সৈনিক যখন তার ডান হাতটা নিয়ে ব্যস্ত, সে তার বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল কোন দিকে তা জানেও না; কিন্তু হাতটা গিয়ে পড়ল যেদিকে পর্যটক দাঁড়ানো সেই বরাবর। অফিসার চোখের পাশ দিয়ে বারবার দেখছেন পর্যটককে, যেন তার মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করছেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার ব্যাপারটা – যা তিনি অন্তত ভাসা ভাসা হলেও ব্যাখ্যা করেছেন – তাকে কতটা মুগ্ধ করেছে।

হাতের কবজির বাঁধুনিটা ছিঁড়ে পড়ল; মনে হচ্ছে, সৈনিক ওটা বেশি জোরে টেনে ফেলেছে। অফিসারের সাহায্য দরকার হয়ে পড়ল, সৈনিক তাকে ফিতের ছেঁড়া অংশটা দেখাল। সুতরাং অফিসার তার কাছে গেলেন আর মুখটা পর্যটকের দিকে ঘুরিয়ে বললেন: 'যন্ত্রটা এত জটিল, একটা কিছু ছেঁড়া বা ভাঙা ঘটবেই এখানে বা ওখানে; কিন্তু তাই বলে তা দিয়ে যন্ত্রটার মহত্ত্ব বিচার করতে যাবেন না যেন। যাই হোক, ছেঁড়া বাঁধুনির বদলে নতুন কিছু আসতে সময় লাগবে না, আমি ওর বদলে একটা শেকল দিয়ে কাজ চালাব; যদিও মেনে নিচ্ছি ডান হাতের ওখানে যন্ত্রের কাঁপুনির সূক্ষ্মতা এতে খানিকটা নষ্ট হবে,' আর শেকলটা লাগাতে লাগাতে তিনি যোগ করলেন: 'এই যন্ত্রের ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থের সংস্থান এখন বিরাট এক সমস্যা। আগের কমান্ড্যান্টের আমলে শুধু যন্ত্রের জন্য সরিয়ে রাখা একটা তহবিল ছিল আমার, এখানে একটা গুদামমতো ছিল, যাতে যন্ত্রের জন্য দরকারি সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ পাওয়া যেত। স্বীকার করছি, আমি প্রায় দুহাতে নিতাম ওখান থেকে – আগের আমলে; এখন না, যেমনটা কিনা নতুন কমান্ড্যান্ট বলতে চান। অবশ্য উনি তো সবকিছুর মধ্যেই আমাদের পুরোনো ব্যবস্থাকে আক্রমণ করার অজুহাত খুঁজে পান। এখন মেশিনের তহবিলটা থাকে ওনার নিজের নিয়ন্ত্রণে আর আমি যদি নতুন ফিতার জন্য পাঠাই তো পুরোনো ভাঙা ফিতাটা সাথে দেওয়া লাগবে প্রমাণ হিসেবে, তার পরও নতুনটা আসবে দশ দিন পরে আর আসার পরে দেখা যাবে খুবই বাজে মানের সেটা, কোনোকিছুর জন্যই কাজে লাগানোর মতো নয়। কিন্তু আমি তদ্দিন পর্যন্ত কী করে বাঁধুনি ছাড়া যন্ত্রটা চালাবো তা নিয়ে কারোই মাথাব্যথা নেই।'

পর্যটক ভাবতে লাগলেন: অন্যের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে নাক গলানো সব সময়েই গুরুতর একটা সিদ্ধান্ত। না তিনি এই দণ্ড উপনিবেশের কোনো নাগরিক, না তিনি সেই রাষ্ট্রের, যার অংশ এটা। এখন তিনি যদি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এই প্রক্রিয়ার নিন্দা জানাতে যান কিংবা এটা বন্ধ করতে চান, এরা তাকে বলবে: আপনি একজন বিদেশি, নিজের চরকায় তেল দিন। এ কথার কোনো উত্তর তিনি দিতে পারবেন না; তিনি হয়তো শুধু এটুকুই যোগ করতে পারবেন যে, এ বিষয়ে তার নিজের ব্যবহারেই তিনি নিজেই বিস্মিত, যেহেতু তিনি স্রেফ একজন দর্শক হিসেবেই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোনোভাবেই অন্য কোনো দেশের আইনি পদ্ধতি বদলানোর বিষয়ে খবরদারি করতে নয়। তবে

এখানকার কাণ্ডকারখানা নিশ্চিতই তাকে প্রলুব্ধ করছে তা করতে। এই পদ্ধতিটার অবিচার আর দণ্ড কার্যকরের অমানবিকতাটুকু নিয়ে তার কোনো সন্দেহই নেই। আর যেহেতু দণ্ডিত মানুষটাকে তিনি চেনেনই না, সে তার স্বদেশিও নয়, আর এমন কোনো লোকও নয় যার ব্যাপারে বিশেষ কোনো সহানুভূতি জাগতে পারে – কারো এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে পর্যটকের কোনো নিজস্ব স্বার্থ আছে এতে। পর্যটকের সঙ্গে আছে নামী-দামি মানুষের তাকে নিয়ে লেখা সুপারিশপত্র, তাকে এখানে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে, আর তাকে যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রক্রিয়াটা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাতে এমনও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিচারপ্রক্রিয়াটা নিয়ে তার মতামত বরং প্রত্যাশাই করা হচ্ছে। সেটা হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি যেহেতু কমান্ড্যান্ট, যেমন তিনি এইমাত্র শুনলেন একদম পরিষ্কার ভাষায়, এই বিচার-প্রক্রিয়ার কোনো সমর্থক নন আর অফিসারের প্রতি ওনার আচরণ একরকম বৈরিতার পর্যায়েই পড়ে।

ঠিক এ সময়ে পর্যটক শুনলেন, অফিসার রাগে চিৎকার করছেন। এইমাত্র তিনি অনেক কষ্টের পরে দণ্ডিত মানুষটার মুখের মধ্যে তুলোর পিণ্ড পুরে দিতে সক্ষম হয়েছেন, আর তখনই মানুষটা, বমি করার প্রচণ্ড তাড়নায় চোখ দুটো বুজে দিল বমি করে। তাড়াতাড়ি অফিসার চেষ্টা করলেন তুলোর পিণ্ডটা থেকে তাকে দূরে সরাতে, আর তার মাথাটা ঘুরিয়ে গর্তের দিকে দিতে; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, বমি গড়িয়ে পড়ছে যন্ত্র বেয়ে। 'সব ঐ কমান্ড্যান্টের দোষ!' চিৎকার করে বলতে লাগলেন অফিসার, এক অন্ধ রাগে হাতের কাছের পেডেলের রডগুলো ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন, 'আমার যন্ত্রটা শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো নোংরা করা হলো।' কাঁপা হাতে তিনি পর্যটককে দেখাতে লাগলেন কী ঘটেছে। 'আমি কি কম্যান্ড্যান্টকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরিষ্কার করে বুঝাইনি যে শাস্তির পুরো এক দিন আগে থেকে সব খাবার দেওয়া বন্ধ করতে হবে? কিন্তু না, এখনকার ক্ষমাশীলতা বলে অন্য কথা। কম্যান্ড্যান্টের মহিলারা মানুষটাকে এখানে পাঠানোর আগে পেট ভরে মিষ্টিমুখ করিয়েছে। সারা জীবন সে খেল গন্ধ-পচা মাছ, আর এখন কিনা তাকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে। ঠিক আছে, তাতে আমার কী সমস্যা, কিন্তু আমাকে একটা নতুন তুলোর পিণ্ড দিতে তাদের এত আপত্তি কেন, আজ তিন মাস ধরে আমি ওটা চেয়ে চেয়ে মরছি। ঐরকম একটা পিণ্ড মুখে নিয়ে কেউ কীভাবে অসুস্থ না হয়ে পারে বলুন, যেখানে এর আগে এক শরও বেশি মানুষ মরার সময় ওটা চুষেছে আর চিবিয়েছে?'

দণ্ডিত মানুষটা তার মাথা ঝুলিয়ে রেখেছে নিচমুখো করে, তার চেহারায় বেশ একটা শান্তি; সৈনিক ব্যস্ত ওর জামা দিয়ে যন্ত্র মোছামুছির কাজে। অফিসার এগিয়ে গেলেন পর্যটকের কাছে; পর্যটক এক অচেনা উদ্বেগ থেকে পেছনে সরে গেলেন এক পা, কিন্তু অফিসার তার হাতে ধরে ফেললেন, নিয়ে গেলেন এক পাশে। 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করে কিছু কথা বলতে চাই,' তিনি বললেন, 'যদি আপনি অনুমতি দেন।' 'অবশ্যই,' পর্যটক উত্তর দিলেন আর নিচের দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগলেন।

'এই পদ্ধতির আর শাস্তির এই ধরনটার – আপনি যেটার এখন প্রশংসা করতেই পারেন – বর্তমানে আমাদের উপনিবেশে আর কোনো প্রকাশ্য সমর্থক নেই। আমি এর একমাত্র পক্ষের লোক, আর একই সঙ্গে আমিই আগের কমান্ড্যান্টের রেখে যাওয়া ঐতিহ্যের একমাত্র সমর্থক। এই ব্যবস্থার আর কোনো উন্নতি নিয়ে আমার তো কোনো আশাই নেই, স্রেফ যা আছে সেটুকু ধরে রাখতেই আমার সব শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগের কমান্ড্যান্ট বেঁচে থাকতে এই উপনিবেশ ভরা ছিল তার সমর্থকে; ওনার বিশ্বাসের যে শক্তি তার কিছুটা আমার তো অবশ্যই আছে, কিন্তু ওনার ক্ষমতার কিছুই আমার নেই; এর ফলে ওনার সব সমর্থকেরা মিলিয়ে গেল একসময়, এখনো আসলে তারা সংখ্যায় কম না, কিন্তু তারা কেউ সে কথা স্বীকার করবে না প্রকাশ্যে। আপনি যদি আজকে চা-ঘরে যান, আজ মানে এই শাস্তি কার্যকরের দিনে, আর যদি শোনেন যে মানুষজন কী বলছে, মনে হয় না আপনি অস্পষ্ট আর অনিশ্চিত কিছু মন্তব্য ছাড়া অন্য কিছু শুনবেন। ওরা সবাই দেখবেন যে এই ব্যবস্থার সমর্থক, কিন্তু বর্তমান কমান্ড্যান্টের অধীনে আর তার এখনকার বিশ্বাসের কারণে, তাদের ঐ সমর্থন আমার তো সামান্যও কাজে আসবে না। আপনার কাছে আমি এখন জানতে চাচ্ছি: সারা জীবনের একটা ভালো কাজ' – যন্ত্রটা দেখালেন তিনি – 'কি এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এই কমান্ড্যান্টের জন্য আর তাকে চালানো মেয়েলোকগুলোর জন্য? তা কি হতে দেওয়া যায়? যদি কেউ আমাদের দ্বীপে মাত্র কদিনের জন্য ভিনদেশি হিসেবেও আসেন, এমনকি তিনিও কি পারেন তা হতে দিতে? কিন্তু হাতে সময় একদমই নেই, আমার বিচারক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে তারা; কমান্ড্যান্টের হেডকোয়ার্টারে এরই মধ্যে মিটিং চলছে, আমাকে রাখা হয় না সেখানে; এমনকি আজ এখানে আপনার আসাটাও আমার কাছে বর্তমান সময়েরই একটা সংকেত বলে মনে হচ্ছে; ওরা সব কাপুরুষের দল, আপনাকে পাঠিয়েছে, বিদেশি এক লোককে, আগাম সব খবরাখবর নেওয়ার কাজে। – আহা, আগের সেই দিনগুলোয় কী অন্যরকমই না ছিল শাস্তি কার্যকর হওয়ার ব্যাপারটা! দণ্ড কার্যকরের পুরো এক দিন আগে থেকে সম্পূর্ণ উপত্যকা ভরে যেত লোকে, সব আসত শুধু দেখতে; ভোরবেলায় কমান্ড্যান্ট হাজির হতেন তার ভদ্রমহিলাদের নিয়ে; বিউগলের শব্দে জেগে উঠত পুরো ক্যাম্প; আমি সামরিক কায়দায় জানাতাম যে সবকিছু প্রস্তুত; গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা – উচ্চপদস্থ সবাইকেই হাজির থাকতে হতো – যন্ত্রটা ঘিরে দাঁড়িয়ে যেতেন; এই বেতের চেয়ারের স্তূপ সেই সময়ের দুঃখজনক স্মৃতি বইছে মাত্র। যন্ত্র নতুন করে সাফসুতরো করা হতো, ঝলমল করত ওটা; প্রায় প্রত্যেক শাস্তির আগে আমি ওটাতে নতুন খুচরা যন্ত্রাংশ লাগাতাম। শতজোড়া চোখের সামনে – একেবারে ঐ ঢালের মাথা পর্যন্ত দর্শকেরা দাঁড়িয়ে থাকত উত্তেজনায়, তাদের পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে – আসামিকে আঁচড়ার নিচে শোয়াতেন কমান্ড্যান্ট স্বয়ং, নিজে। আজ একটা সাধারণ সৈনিক যে কাজগুলো করে, তখন প্রধান বিচারক হয়েও আমার কাজ ছিল সেগুলোই, আর আমি সেটা নিতাম সম্মান হিসাবেই। তারপর শুরু হতো শাস্তি! কোনো বেসুরো শব্দে ব্যাঘাত ঘটত না যন্ত্রের কাজে। অনেকে এমনকি দেখা বন্ধ করে

দিত, তাদের চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ত বালির উপর; তারা সবাই জানত: ন্যায়বিচার এখন নিজের গতিতে চলছে। ঐ নীরবতার মধ্যে দণ্ডিত মানুষটার গোঙানি ছাড়া, তুলোর পিণ্ডের অর্ধেক কমে যাওয়া গোঙানি ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যেত না। এখন তো যন্ত্রটা আসামির মুখ থেকে এমন কোনো গোঙানির আওয়াজ বের করায় না যা কিনা তুলোর পিণ্ডের ঢেকে দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু তখনকার দিনে লেখার সুচগুলো থেকে বের হতো একধরনের গা-পুড়িয়ে দেওয়া তরল পদার্থ; ওটা ব্যবহারের অনুমতি আর আমাদের এখন নেই। আহ্, আর তারপর আসত সেই ছয়তম ঘণ্টার সন্ধিক্ষণ। সবাই কাছ থেকে দেখতে চাইত, অসম্ভব হয়ে পড়ত অত অনুরোধ রক্ষা করা। কমান্ড্যান্ট ওনার প্রজ্ঞার বলে নিয়ম জারি করলেন যে, শিশুরা পাবে অগ্রাধিকার; আমি নিজে অবশ্য, আমার পদাধিকারের কারণে, সব সময় যন্ত্রের কাছেই থাকতে পারতাম; প্রায়ই আমি ঐ ওখানটায় মাটিতে উবু হয়ে বসতাম দুই হাতে দুই বাচ্চা নিয়ে। কীভাবে আমরা যন্ত্রণাভরা ঐ মুখটায় আলোকপ্রাপ্তি ঘটার দৃশ্য, গিলতাম, কীভাবে এই ন্যায়বিচারের ঝলকানির সামনে পেতে দিতাম আমাদের গাল দুটো – শেষমেশ অর্জিত আর দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া এক ন্যায়বিচার! ও কমরেড, কীসব দিন ছিল সেগুলো!' অফিসার স্বাভাবিকভাবেই ভুলে গেছেন যে তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন; তিনি পর্যটককে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরেছেন আর মাথা রেখেছেন তার কাঁধে। পর্যটক মহা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লেন, অফিসারের মাথার উপর দিকে অধৈর্য নিয়ে তিনি তাকাচ্ছেন ইতিউতি। সৈনিক এরই মধ্যে শেষ করেছে তার যন্ত্র-মোছার কাজ আর মাত্র একটা টিনের কৌটা থেকে কিছু চালের ক্ষীর ঢেলেছে খাবার পাত্রটায়। দণ্ডিত লোকটা তা দেখামাত্রই – ওকে দেখে মনে হচ্ছে পুরো সুস্থ হয়ে উঠেছে আবার – জিভ দিয়ে চেষ্টা করছে ক্ষীরটা ধরতে। সৈনিক ওকে ধাক্কা দিয়ে শুধু সরিয়েই দিচ্ছে, কারণ ক্ষীরটা আরেকটু পরে দেওয়ার জন্য রাখা; কিন্তু এটাও ভারি অনুচিত কাজ যে সৈনিক তার নোংরা হাত ওই ক্ষীরে ডুবিয়ে দেবে আর দণ্ডিত মানুষটার বুভুক্ষু দৃষ্টির সামনে তা খানিক খাবেও।

অফিসার দ্রুত নিজেকে সংবরণ করে নিলেন। 'আপনার অনুভূতি নিয়ে কোনো খেলা করার ইচ্ছা আমার নেই,' তিনি বললেন, 'আমি জানি এই আজকের দিনে বসে তখনকার ঐ সময়গুলো বোঝানো কত অসম্ভব। যা হোক, যন্ত্রটা এখনো কাজ করে আর নিজেই সে নিজের যথার্থতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট, পুরো দ্বীপে সে একা দাঁড়িয়ে থাকলেও এ কথা সত্য। আর শেষের ধাপে এসে এখনো অবিশ্বাস্য এক মসৃণতায় মৃতদেহ পড়ে গর্তে গিয়ে, যদিও এখন আর আগের মতো শত শত লোক মাছির মতো জড়ো হয় না গর্তের চারপাশে। আমাদের তখন গর্ত ঘিরে একটা শক্ত রেলিং পর্যন্ত দিতে হয়েছিল; বহু আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তা।'

পর্যটক অফিসারের কাছ থেকে তার মুখ লুকাতে চাইলেন, লক্ষ্যহীনভাবে তাকাতে লাগলেন অফিসারের চারপাশে। অফিসার ভাবলেন যে পর্যটক এই উপত্যকার হতশ্রী অবস্থা নিয়েই চিন্তামগ্ন; তিনি পর্যটকের হাত ধরলেন, তার চোখে

তাকিয়ে কথা বলার জন্য ঘুরে এলেন সামনে আর জিজ্ঞাসা করলেন: 'কী অপমান আর লজ্জার সবকিছু, দেখতে পাচ্ছেন?'

কিন্তু পর্যটক কিছু বললেন না। অফিসার খানিকের জন্য তাকে একা ছাড়লেন; পা দুটো ফাঁক করে, কোমরের পেছনে হাত রেখে, তিনি শান্ত দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলেন মাটির দিকে। তারপর পর্যটকের দিকে একটা উৎসাহের হাসি দিয়ে তিনি বললেন: 'কাল যখন কমান্ড্যান্ট আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন, আমি তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমন্ত্রণটা আমি শুনলাম। কমান্ড্যান্টকে আমি চিনি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম, আপনাকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে ওনার উদ্দেশ্য কী। যদিও আমার বিরুদ্ধে এগোনোর ক্ষমতা তার আছে, তবু সে সাহস এখনো করেননি তিনি; তিনি শুধু চাইছেন আপনার মতো একজন সম্মানিত বিদেশির বিচার-বিবেচনার সামনে আমাকে খোলাসা করে দিতে। সবকিছু নিখুঁতভাবে হিসাব করে নিয়ে নেমেছেন তিনি। এই দ্বীপে আপনার দ্বিতীয় দিন আজ, আগের কমান্ড্যান্ট এবং তার বিশ্বাসের ব্যাপারে আপনি জানেন না কিছুই, আপনার চিন্তা ইউরোপিয়ান ধ্যানধারণার ওপরে দাঁড়ানো, সম্ভবত আপনি নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ড বিষয়টাকেই সাধারণ অর্থে সমর্থন করেন না, আর বিশেষ অর্থে এই জাতীয় যান্ত্রিক মৃত্যুদণ্ড তো নয়ই, তা ছাড়া আপনি আরো দেখেছেন যে এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে জনগণের কোনো অংশগ্রহণ ছাড়াই, একদম নিরানন্দ এক পরিবেশে, আর মোটামুটি নষ্ট হয়ে যাওয়া এক যন্ত্রের ওপরে – এই সবকিছু মিলে (কমান্ড্যান্টের ভাবনা এমনই) আপনার কি এটাই মনে হবে না যে আমার প্রক্রিয়াটা ভুল? আর তা-ই যদি আপনার মনে হয় (আমি এখনো কমান্ড্যান্টের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছি), আপনি তো তা আর লুকিয়ে রাখবেন না, কারণ আপনি যাচাই-বাছাই করে নিয়ে যা বিশ্বাস করেন তার ওপর আপনার নিশ্চিত আস্থা অগাধ। অন্যদিকে আপনি নানা দেশের নানা ধরনের মানুষের এত রকম বিচিত্র জিনিস সম্মান করতে শিখেছেন যে, সম্ভবত আপনি আমাদের বিচার-প্রক্রিয়া নিয়ে অত জোর গলায় মুখ খুলবেন না, যেমনটা আপনি হয়তো করবেন নিজের দেশে। কিন্তু কমান্ড্যান্টের আসলে তার দরকারও নেই। মাত্র একটা আলগা কথার-কথায় বলা মন্তব্যই তার জন্য যথেষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মন্তব্য ওনার কাজে লাগছে, ততক্ষণ কিছু আসে যায় না তা আপনার সত্যিকারের মতামত কি না। তিনি আপনাকে প্রশ্ন করবেন ভয়ংকর ধূর্ততার সঙ্গে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আর তার মেয়েলোকগুলো চারপাশে বসে থাকবে গোল হয়ে, খাড়া করে রাখবে তাদের কান; আপনি হয়তো বলবেন, যেমন ধরুন: "আমাদের বিচারব্যবস্থা অন্যরকমের" কিংবা "আমাদের দেশে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার আগে তার কথা শোনা হয়", কিংবা "আমরা দণ্ডিতকে তার শাস্তির কথা জানিয়ে থাকি", কিংবা "মৃত্যুদণ্ড বাদে আমাদের দেশে অন্য শাস্তিও আছে", কিংবা "একমাত্র মধ্যযুগেই আমরা নিপীড়নের পদ্ধতি ব্যবহার করতাম"। এই মন্তব্যগুলোর কোনোটাই মিথ্যা কথা নয়, আপনার কাছে তো ওগুলো প্রমাণ ছাড়াই প্রমাণিত – নির্দোষ সব মন্তব্য যা আমার বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে না কোনোভাবেই। কিন্তু

কমান্ড্যান্টের প্রতিক্রিয়া কী হবে ওগুলো শুনে? আমি ওনাকে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এই সুবোধ কমান্ড্যান্ট, একপাশে ধাক্কা দিয়ে সরাবেন তার চেয়ার, ছুটে যাবেন তার ব্যালকনির দিকে, পরিষ্কার দেখছি তার মেয়েলোকগুলো দৌড়ে যাচ্ছে তার পেছন পেছন, আমি শুনতে পাচ্ছি তার গলা – মেয়েলোকগুলো ওটাকে বলে বাজখাই গলা –, তিনি যা বলছেন তা হলো: "পশ্চিমের এক বিখ্যাত গবেষক, যাকে সারা পৃথিবীর সব দেশের বিচারব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখার কাজ দেওয়া হয়েছে, তিনি এইমাত্র বললেন যে আমাদের নিজেদের ব্যবস্থাটা, পুরোনো প্রথার ওপর দাঁড়ানো আমাদের ব্যবস্থাটা – অমানবিক। ওরকম একজন সম্মানিত মানুষের রায় যেহেতু এটা, আমি তাই, খুবই স্বাভাবিক যে, ব্যবস্থাটা আর চলতে দিতে পারি না। আজ থেকে আমি তাই এই ঘোষণা করলাম যে – ইত্যাদি।" আপনি তখন চাচ্ছেন এ কথার প্রতিবাদ জানাতে, তিনি আপনি যা বলেছেন বলে দাবি করছেন, আপনি তা বলেননি, আপনি আমার বিচারপদ্ধতিকে অমানবিক বলেননি, আপনার গভীর বিশ্বাস হলো আমার এই ব্যবস্থাটাই বরং সবচেয়ে মানবিক আর মর্যাদাকর, আপনি এমনকি এই যন্ত্রের প্রশংসাও করেন – কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে; আপনার পক্ষে আর ব্যালকনিতে পৌঁছানোই সম্ভব নয়, ওটা ততক্ষণে ভরে গেছে মেয়েলোকগুলোতে; আপনি চাচ্ছেন আপনার দিকে সবাই তাকাক, আপনি চাচ্ছেন চিৎকার করতে, কিন্তু একজন মহিলার হাত চেপে ধরেছে আপনার মুখ – আর সেই সঙ্গে আমি আর আগের কমান্ড্যান্টের কাজ, দুটোই শেষ।'

পর্যটককে হাসি চাপা দিতে হলো; তাহলে যে কাজটা তিনি অত কঠিন ভেবেছিলেন, তা এত সোজা। তিনি এড়িয়ে যাওয়ার ঢঙে বললেন: 'আমার ক্ষমতাকে আপনি বাড়িয়ে দেখছেন; কমান্ড্যান্ট আমার নামে লেখা সুপারিশপত্রগুলো পড়েছেন, তিনি জানেন আইনি পদ্ধতির বিষয়ে আমি কোনো জ্ঞানী কেউ না। আমি যদি কোনো মতামত দিই-ই, তা হবে একজন সাধারণ মানুষের মতামত মাত্র, অন্য কারো মতামতের চেয়ে তার ওজন বেশি হবে না একটুও, আর নিশ্চিত কমান্ড্যান্টের চাইতে তো অনেক কম হবেই, ওনার তো যতটুকু বুঝলাম এই দণ্ড-উপনিবেশে বিশাল ক্ষমতা। আর এই ব্যবস্থা নিয়ে ওনার মতামত যদি এতই সোজাসাপটা হয়ে থাকে যেমনটা আপনি বললেন, তাহলে বলতেই হচ্ছে এই ব্যবস্থার ইতি হতে আর দেরি নেই আর আমার ওই একটুখানি সহযোগিতার দরকার নেই কারো।'

অফিসার কি এখন বুঝতে পেরেছেন? না, পারেননি তিনি। তিনি প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকালেন, একটুখানির জন্য তাকালেন দণ্ডিত আসামি ও সৈনিকের দিকে – ওরা দুজনেই একটা ঝাঁকির সঙ্গে রেখে দিল তাদের ক্ষীর – পর্যটকের খুব কাছে ঘেঁষে এলেন, তার চোখের দিকে না তাকিয়ে বরং তার কোটের কোথাও চোখ রেখে নিচু গলায় বললেন: 'আপনি কমান্ড্যান্টকে চেনেন না; তার কাছে এবং আমাদের বাকি সবার কাছে আপনার অবস্থান – মাফ করবেন যে আমাকে এমনটা বলতে হচ্ছে – সত্যি বলতে কি, কোনো বিষ নেই ওতে; আপনার প্রভাব বা ক্ষমতা অনেক বেশি এমন ভাবার কোনো কারণই

নেই। আমি যখন শুনলাম, মৃত্যুদণ্ডটা আপনি একা দেখবেন, খুশিই হলাম আমি। কমান্ড্যান্টের এই আদেশের লক্ষ্য ছিলাম আমি, কিন্তু আমি এখন তা কাজে লাগাব আমারই সুবিধায়। অন্য কারো মিথ্যা ফিসফিস কিংবা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে মনোযোগ না হারিয়ে (আরো বেশি লোক এখানে থাকলে তা-ই হতো) আপনি বরং আমার ব্যাখ্যা শুনতে পেলেন মন দিয়ে, দেখতে পেলেন যন্ত্রটা আর এখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে দেখার আপনার সামান্য বাকি। কোনো সন্দেহ নেই আপনার রায় এরই মধ্যে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে; যদি সামান্য কোনো সন্দেহ থেকেও থাকে, মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্য সেটুকু মুছে দেবে। সুতরাং আপনাকে আমি এখন মিনতি করছি দয়া করে কমান্ড্যান্টের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন!'

পর্যটক তাকে আর বলতে দিলেন না। 'কিন্তু সেটা আবার কীভাবে সম্ভব?' তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন। 'খুবই অসম্ভব। আমি না পারি আপনাকে সাহায্য করতে, না পারি আপনার স্বার্থের কোনো ক্ষতি করতে।'

'আপনি পারেন,' বললেন অফিসার। কিছুটা আশঙ্কার সঙ্গে পর্যটক খেয়াল করলেন যে, অফিসার তার মুঠো দুটো পাকাচ্ছেন। 'হ্যাঁ আপনি পারেন,' আবার বললেন অফিসার, আরো জোর দিয়ে। 'আমার একটা পরিকল্পনা আছে, যা সফল হতে বাধ্য। আপনি মনে করছেন আপনার প্রভাব যথেষ্ট নয়। আমি জানি, যথেষ্ট ওটা। তবে ধরলাম যে আপনার কথাই ঠিক, তবু এই পুরোনো ব্যবস্থা যদি টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের সব রকম পথেই তো চেষ্টা চালাতে হবে, এমনকি যদি ছোটখাটো পথও হয়, নাকি? আপনাকে আমার পরিকল্পনাটা বলছি, শুনুন। এটা সফল করার জন্য খুব দরকার একটা কাজ হচ্ছে আজকে এই উপনিবেশে এই ব্যবস্থা নিয়ে আপনার রায় বিষয়ে যতটা পারা যায় আপনাকে চুপ থাকতে হবে। যতক্ষণ আপনাকে কেউ সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা না করছে, আপনার কোনো মতামতই দেওয়া উচিত হবে না; তবে যদি বলতেই হয়, তা হতে হবে সংক্ষিপ্ত আর গা-ছাড়া গোছের কিছু; এমনটাই যেন মনে হয় যে আপনার পক্ষে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা কঠিন, যে আপনার সবকিছু মিলে তিক্ত লাগছে, যে আপনাকে যদি খোলাখুলি কথা বলতে হয় তাহলে আপনি বরং গালিগালাজ আর অভিশাপ দেওয়া শুরু করতে পারেন। আমি আপনাকে কোনো মিথ্যা কথা বলতে বলছি না, একটুও না; শুধু বলছি খুব অল্প কথায় আপনার উত্তরগুলো দিতে, যেমন, "হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ড দেখলাম", অথবা, "হ্যাঁ, সব ব্যাখ্যাই শুনেছি।" ওইটুকুই, এর বেশি না। আপনার তিক্ততার ব্যাপারটা, যেটা আমরা চাচ্ছি ওরা অনুভব করুক, অবশ্যই যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত, যদিও কমান্ড্যান্ট ঠিক ওভাবে চাচ্ছেন না জিনিসটা ঘটুক। কোনো সন্দেহ নেই তিনি ওটার পুরোপুরি একটা ভুল ব্যাখ্যা করবেন আর সবকিছু তার স্বার্থের অনুকূলেই ব্যাখ্যা করবেন। আমার পরিকল্পনা নির্ভর করছে এ বিষয়টুকুর ওপরই। আগামীকাল বিরাট এক মিটিং হবে কমান্ড্যান্ট হেডকোয়ার্টারে, প্রশাসনের সব উচ্চপদস্থ অফিসাররা থাকবেন সেখানে, কমান্ড্যান্ট নিজেই সভাপতিত্ব করবেন। নিঃসন্দেহে ওই মিটিং পাবলিকের দেখার বস্তু বানানোয় কমান্ড্যান্ট

সফলকাম হয়েছেন। তিনি একটা গ্যালারি বানিয়েছেন যা সব সময় দর্শকে ভরা থাকে। আমাকেও বাধ্য হয়ে আলোচনায় অংশ নিতে হয়, যদিও ঘৃণা আর বিরক্তিতে কাঁপতে থাকি আমি। এখন কথা হচ্ছে, আপনাকে ওই মিটিংয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হবে নিশ্চিত; আজ যদি আপনি আমি যেমন বললাম সেভাবে কাজ করেন তাহলে আপনার আমন্ত্রণটা বরং হয়ে উঠবে জরুরি অনুরোধ। কিন্তু যদি কোনো অজ্ঞাত কারণে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো না হয়, সে ক্ষেত্রে আপনাকে সেটা চেয়ে নিতে হবে; তখন আর পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপার থাকবে না ওটা। অতএব, আগামীকাল আপনি ওখানে, কম্যান্ড্যান্টের বক্সে বসে আছেন মেয়েলোকগুলোর সঙ্গে। তিনি বারবার তাকাচ্ছেন নিশ্চিত হতে যে আপনি উপস্থিত। তারপর স্রেফ দর্শকদের মন জোগানোর কথা মাথায় রেখে বলা কিছু ফালতু, হাস্যকর বিষয়ের পরে – বেশিরভাগ সময়েই ওগুলো জাহাজঘাটার কাজ বিষয়ে কোনো কথা, সারাক্ষণ ওরা জাহাজঘাটার কাজ নিয়ে কথা বলতেই থাকে! – আমাদের বিচারব্যবস্থার প্রশ্নটা তোলা হলো আলোচনার জন্য। কমান্ড্যান্ট যদি কথাটা তুলতে ভুলে যান, কিংবা তাড়াতাড়ি না তোলেন, তাহলে আমি ব্যবস্থা নেবো যেন তা তোলা হয়। আমি দাঁড়িয়ে পড়ব আর আজকের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে রিপোর্ট করব। অতি সংক্ষেপে, শুধু এটুকুই বলব যে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ওই জাতীয় রিপোর্ট ওখানে দেওয়াটা স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ে না, তবুও আমি দেব। কমান্ড্যান্ট তখন আমাকে একটা মধুর হাসি দিয়ে ধন্যবাদ জানাবেন, যেমনটা তিনি সব সময়ে করেন, আর তারপর নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে, তিনি সুযোগটা নেবেন। "আমরা এইমাত্র শুনলাম", তিনি বলবেন, এরকমই কিছু একটা বলবেন, "একটা মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবেদন। এর সঙ্গে আমি শুধু এটুকুই যোগ করতে চাই যে এবারের এই মৃত্যুদণ্ডটায় হাজির ছিলেন এক বিখ্যাত গবেষক যিনি, আপনারা সবাই জানেন, আমাদের উপনিবেশকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন তার আগমনের মাধ্যমে। আমাদের আজকের সভাকে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে করেছেন আরো তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা কি এখন বরং এই বিখ্যাত গবেষকের কাছ থেকে শুনতে চাইবো না যে আমাদের সনাতন প্রথার মৃত্যুদণ্ড এবং এতে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে ওনার মতামত কী?" চারদিকে তখন হাততালি পড়ছে, নিশ্চিত; সবাই একমত, অন্য কারো চেয়ে আমিই বেশি চেঁচাচ্ছি। কমান্ড্যান্ট আপনাকে কুর্নিশ করলেন আর বললেন: "তাহলে, স্যার, আমাদের সবার তরফ থেকে আমিই প্রশ্নটা করছি আপনাকে।" এবার আপনি হেঁটে যাবেন কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটাতে। হাতটা কিন্তু এমন জায়গায় রাখবেন, যাতে করে সবাই দেখতে পায়, তা না হলে ঐ মেয়েলোকেরা ওগুলো ধরবে আর আপনার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করবে। – আর এবার শেষমেশ আপনি বলা শুরু করলেন। আমি জানি না ঐ মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকা অতগুলো ঘণ্টার উত্তেজনা আমি সহ্য করব কী করে। আপনার বক্তৃতায় আপনি অবশ্যই কোনো সংযমের তোয়াক্কা করবেন না, সত্যকে বেরিয়ে আসতে দিন, রেলিংটার উপরে ঝুঁকে আসুন, কমান্ড্যান্টকে চিৎকার করে বলুন, সত্যিই চিৎকার করে ওনাকে জানান

আপনার মতামত, আপনার অনড় মতামত। কিন্তু সম্ভবত ওভাবে বক্তৃতা দিতে চাইবেন না আপনি, আপনার স্বভাবের সঙ্গে ওটা যায় না, সম্ভবত আপনার দেশে ওরকম অবস্থায় মানুষ ভিন্নভাবে আচরণ করে, তাতে অসুবিধা নেই, ওটুকুতেই ভালোমতো চলবে, আপনাকে এমনকি উঠে না দাঁড়ালেও চলবে, স্রেফ দু একটা কথা বললেই হবে, নিচে অফিসাররা যেন শুনতে পায় সেটুকু জোর ফিসফিস করে বললেই হবে, তা-ই যথেষ্ট, আপনাকে এমনকি মৃত্যুদণ্ড নিয়ে জনসাধারণের অনাগ্রহ বিষয়েও কিছু বলা লাগবে না, ক্যাঁচকোঁচ করা চাকা নিয়ে বা ভাঙা ফিতা বা ঐ বমি-জাগানো তুলোর পিণ্ড নিয়েও কিছু বলতে হবে না, ঐ সবকিছু আপনি আমার ওপরে ছাড়তে পারেন, আর বিশ্বাস করুন আমার বক্তৃতা যদি তাকে তখন হলঘরটা থেকে বের করে না-ও ছাড়ে, তো অন্তত তাকে বাধ্য করবে দুই হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে, ওনাকে তখন কবুল করতেই হবে: "প্রাক্তন কমান্ড্যান্ট, আপনার শক্তির কাছে আমি মাথা নত করছি।" – এটাই আমার পরিকল্পনা; এটার বাস্তবায়নে কি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন? অবশ্যই আপনি করবেন – কী বলছি আমি? – আপনাকে করতেই হবে।' অফিসার পর্যটকের দুই বাহু ধরে বসলেন আর তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, শ্বাসের জন্য হাঁপাচ্ছেন। শেষের কথাগুলো তিনি এমন উঁচুমাত্রায় চিল্লিয়ে বলেছেন যে এমনকি সৈন্য আর দণ্ডিত আসামি দুজনেই নড়ে উঠল; যদিও ওরা বুঝতে পারল না কিছুই, তবু খাওয়া থামাল খানিকক্ষণের জন্য আর চিবাতে চিবাতে তাকিয়ে থাকল পর্যটকের দিকে।

পর্যটক কী উত্তর দেবেন তা আর নিজের কাছে একেবার শুরু থেকেই পরিষ্কার, তার জীবনে এতকিছু ঘটেছে যে এখানে হোঁচট খাওয়ার প্রশ্নই আসে না; তিনি মৌলিক অর্থেই একজন সৎ আর নির্ভীক মানুষ। এসব সত্ত্বেও তিনি এখন, সৈনিক আর দণ্ডিত আসামির সামনে দাঁড়িয়ে, খানিক ইতস্তত করলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি বললেন, তাকে বলতেই হতো: 'না।' অফিসার বেশ কবার চোখ পিটপিট করলেন, তবে চোখ দুটো পর্যটকের দিকেই নিবদ্ধ। 'আপনাকে কি ব্যাখ্যা করে বলব?' পর্যটক জিজ্ঞাসা করলেন। অফিসার 'হ্যাঁ' বললেন নীরবে মাথা নেড়ে। 'আমি এই বিচারব্যবস্থার বিপক্ষের মানুষ,' পর্যটক এবার বলতে লাগলেন, 'আপনি আমাকে আপনার বিশ্বাসের মধ্যে নেওয়ার আগে থেকেই – যে বিশ্বাস আমি নিশ্চিত কোনো অবস্থাতেই ভাঙব না – আমি চিন্তা করছিলাম যে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমার দাঁড়ানো যুক্তিসংগত হবে কি না, আর আমার হস্তক্ষেপ থেকে সফলতা আসার সামান্য সুযোগও আছে কি না। প্রথমে কার সঙ্গে কথা বলতে তা আমার কাছে পরিষ্কার ছিল শুরু থেকেই: অবশ্যই কমান্ড্যান্ট সাহেব। আপনি সেটা আরো পরিষ্কার করলেন, তার মানে আবার এটা বুঝবেন না যে আমার সিদ্ধান্ত আমি আপনার কথাতেই পাকাপোক্ত করেছি; বরং তার উল্টোই সত্যি, আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাস আমার মনে বরং সহানুভূতি জাগিয়েছে, যদিও আমার সিদ্ধান্তের ওপরে তা কোনো প্রভাব ফেলেনি।'

অফিসার চুপ থাকলেন, যন্ত্রের দিকে ঘুরলেন, পেতলের রডগুলোর একটা ধরলেন আর তারপর, সামান্য পেছনে ঝুঁকে, উপরে নকশাবিদ-অংশটার দিকে

তাকালেন যেন বা পরখ করছেন সবকিছু ঠিক আছে কি না। সৈনিক আর দণ্ডিত আসামিকে দেখে মনে হচ্ছে ওদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব হয়েছে; আসামি সৈনিকের দিকে কিছু একটা ইঙ্গিতে বলছে, যদিও কাজটা কঠিন; কারণ, ফিতেগুলোতে শক্ত করে বাঁধা সে; সৈনিক তার দিকে নত হলো; দণ্ডিত মানুষটা তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলল আর সৈনিক মাথা ঝাঁকাল।

পর্যটক অফিসারের কাছে গেলেন আর বললেন: 'আপনি এখনো জানেন না আমি কী করতে চাচ্ছি। আমি নিঃসন্দেহে কমান্ড্যান্টকে জানাব আপনাদের পদ্ধতিটা নিয়ে আমার কী ভাবনা, কিন্তু আমি তা করবো একান্তে, কোনো পাবলিক সভায় না; আর আমি এখানে অতক্ষণ থাকছিও না যে আমাকে সভায় ডাকা যাবে; কাল ভোরেই আমি নৌকা ছাড়ব, না হলে অন্তত আমার জাহাজে গিয়ে তো উঠবই।'

মনে হলো না যে অফিসার তার কোনো কথা শুনেছেন। 'তাহলে আমাদের পদ্ধতিতে আপনি আস্থা রাখতে পারছেন না?' তিনি বিড়বিড় করে বললেন, হাসছেন যেভাবে কোনো বুড়ো মানুষ কোনো বাচ্চার অর্থহীন কথায় হাসে, আর সেই হাসির আড়ালে তার সত্যিকারের চিন্তা লোকের কাছ থেকে লুকায়।

'তাহলে সময় হয়েছে,' তিনি অবশেষে বললেন, আর হঠাৎ তাকালেন পর্যটকের দিকে। তার চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যে ধরা কোনো ধরনের আহ্বান, কোনো যোগসাজশে অংশ নেওয়ার জন্য একটা ডাক।

'কিসের সময় হয়েছে?' অস্থিরতার সঙ্গে জিগ্যেস করলেন পর্যটক, কিন্তু কোনো জবাব পেলেন না।

'তুমি মুক্ত,' অফিসার দণ্ডিত আসামিকে বললেন তার দেশীয় ভাষায়। মানুষটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারল না। 'বললাম তো, তুমি মুক্ত,' বললেন অফিসার। প্রথমবারের মতো দণ্ডিতের মুখ ঝলমল করে উঠল প্রাণশক্তিতে। এটা কি সত্যি? এটা কি অফিসারের সাময়িক কোনো খেয়াল যা একটু পরেই চলে যাবে? বিদেশি অতিথিই কি তার ক্ষমার ব্যবস্থা করলেন? কী হতে পারে আসলে? তার চেহারায় এসব প্রশ্ন। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য না। যা-ই হোক হবে, সে চাইছে যদি পারে তাহলে আসলেই মুক্ত হতে, আর আঁচড়ার নিচে যতটা পারা সম্ভব, নিজের শরীর এপাশে-ওপাশে ততটা ঝাঁকাতে লাগল সে।

'তুমি আমার ফিতাগুলো ছিঁড়ে ফেলবে,' অফিসার চিৎকার করে বললেন, 'নড়াচড়া বন্ধ করো। আমরা খুলে দিচ্ছি।' তিনি সৈনিককে একটা ইঙ্গিত করলেন আর তারা দুজনে শুরু করল বাঁধন খুলে দেওয়ার কাজ। দণ্ডিত মানুষটা বলল না কিছু, শুধু মুখ টিপে নীরবে হাসতে লাগলো, একবার তার মাথা ঘোরাচ্ছে বাঁয়ে অফিসারের দিকে, একবার ডানে সৈনিকের দিকে,আর দুজনের মাঝে দাঁড়ানো পর্যটকের দিকেও।

'ওকে টেনে তোলো,' অফিসার আদেশ দিলেন সৈনিককে। কাজটা করতে খানিক বিশেষ যত্নের দরকার পড়ল আঁচড়ার কারণে। দণ্ডিত আসামির পিঠ এরই মধ্যে কয়েকটা জায়গায় সামান্য ছিঁড়ে কেটে গেছে তার অস্থিরতার ফলস্বরূপ।

তবে এর পর থেকে অফিসার আর দণ্ডিত মানুষটার দিকে তেমন খেয়ালই দিলেন না। তিনি পর্যটকের কাছে হেঁটে গেলেন, তার ছোট চামড়ার ফোল্ডারটা বের করলেন আরেকবার, ওটার পাতা উল্টাতে লাগলেন, আর শেষ খুঁজে পেলেন তার খুঁজতে থাকা পাতা; সেটা দেখালেন পর্যটককে। 'পড়ুন' বললেন তিনি। 'আমি পড়তে পারি না,' পর্যটক বললেন, 'আপনাকে আগেই বলেছি এ লেখার কিছুই আমি বুঝি না।' 'স্রেফ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকুন লেখাটার দিকে,' বললেন অফিসার, পর্যটকের পাশে এসে দাঁড়ালেন একই সঙ্গে পড়বেন বলে। যখন এতেও কাজ হলো না, তিনি হাতের একটা ছোট আঙুল বের করলেন শূন্যে আর ওটা কাগজের উপর দিয়ে – বেশ উপর দিয়ে যেন কাগজটায় কোনোভাবেই কোনো ছোঁয়া না লাগে – চালিয়ে গেলেন যেন পর্যটকের জন্য পড়াটা একটু সহজ হয়। আর পর্যটক সত্যি সব চেষ্টাই করলেন, কারণ তিনি চাচ্ছেন অফিসারকে অন্তত এ ব্যাপারটায় একটু খুশি করতে, কিন্তু তার পরও পড়তে পারলেন না কিছুই। অফিসার তারপর বানান করে করে পড়া শুরু করলেন লেখাটা, শেষে পুরো পড়লেন একসঙ্গে: '"ন্যায়নিষ্ঠ হও", এতে লেখা। এখন তো নিশ্চয় পড়তে পারছেন, নাকি?' পর্যটক কাগজের উপরে এতখানি ঝুঁকে এলেন যে অফিসার ওটা আরো দূরে সরিয়ে নিলেন, তার ভয় যদি ওটাতে ছোঁয়া লেগে যায়! পর্যটক কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি এখনো পড়তে পারছেন না কিছু। 'এতে লেখা "ন্যায়নিষ্ঠ হও"' – আবার বললেন অফিসার। 'তাই হবে,' বললেন পর্যটক, 'আপনার কথা বিশ্বাস করছি আমি।' 'ঠিক আছে,' অফিসার বললেন, কিছুটা হলেও খুশি তিনি; এরপর কাগজটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন; খুব যত্নের সঙ্গে তিনি কাগজটা ঢোকালেন নকশাবিদ-এর মধ্যে, এরপর তাকে দেখে মনে হলো তিনি যন্ত্রের চলাটা পুরো ঢেলে সাজাচ্ছেন। প্রচণ্ড খাটুনির কাজ এটা – সবচেয়ে ছোট ছোট ছোট চাকাগুলোও ঠিক করতে হচ্ছে, আর এতই কাছ থেকে যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করতে হচ্ছে যে মাঝেমধ্যেই অফিসারের মাথা পুরো হারিয়ে যাচ্ছে নকশাবিদ-এর ভেতরে।

পর্যটক নিচের থেকে বিরামহীন দেখতে লাগলেন এই কাজ, তার ঘাড় শক্ত হয়ে এল, আর তার চোখ ব্যথা করতে লাগল আকাশ ভাসিয়ে দেওয়া রোদের আলোয়। সৈনিক আর দণ্ডিত লোক ব্যস্ত শুধু নিজেদের নিয়েই। দণ্ডিতের জামা আর পাজামা ফেলে দেওয়া হয়েছিল গর্তে, ওগুলো সৈনিক টেনে তুলল তার বেয়নেটের আগা দিয়ে। জামাটা এত নোংরা হয়ে গেছে যে বলার মতো না; দণ্ডিত লোকটা সেটা ধুলো বালতির পানিতে। এরপর সে তখন জামা আর পাজামা পরল, সে নিজে আর সৈনিক – দুজনেই ফেটে পড়ল হাসিতে, কারণ দুটো কাপড়েরই পেছনটা যে ফাড়া। মনে হয় দণ্ডিত লোকটা ভাবল যে সৈনিককে একটু মজা দেওয়া তার দায়িত্ব, তাই সে ঐ কাঁটা-ফাড়া কাপড়গুলো পরে সৈনিকের সামনে গোল হয়ে চক্কর দিয়ে নাচতে লাগল আর সৈনিক মাটিতে পা ফাঁক করে বসে হাসির দমকে চাপড়াতে লাগল নিজের হাঁটু। তবে এখানে ভদ্রলোকেরা আছে বলে তারা দুজনেই নিজেদের সামলেও নিতে লাগল কিছুটা।

অফিসার যখন অবশেষে উপরে তার কাজ শেষ করলেন, তিনি আরেকবার পুরো জিনিসটা মনোযোগ দিয়ে দেখলেন – এর সবগুলো যন্ত্রাংশ – মুখে হাসি নিয়ে; এইবারে তিনি নকশাবিদ-এর ঢাকনা বন্ধ করলেন সজোরে, ঢাকনা এতক্ষণ খোলা ছিল; তারপর নেমে এলেন, তাকালেন গর্তটাতে, এরপর দণ্ডিত আসামির দিকে, দেখে খুশি হলেন যে সে তার কাপড়গুলো তুলেছে, হাত ধোওয়ার জন্য হেঁটে গেলেন পানির বালতির কাছে, গা-গোলানো নোংরা পানি খেয়াল করতে তার দেরি হয়ে গেল, তিনি দুঃখ পেলেন যে এখন আর তার পক্ষে হাত ধোওয়ার কোনো রাস্তা নেই, শেষমেশ হাত দুটো ঢুকিয়ে দিলেন – এই বিকল্পে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না তিনি, কিন্তু তাকে মেনে নিতেই হচ্ছে – বালির মধ্যে, এরপর ওখানেই দাঁড়িয়ে তার উর্দির বোতামগুলো খোলা শুরু করলেন। ওই সময় একসঙ্গে তার হাতের উপর পড়ল মহিলাদের রুমাল দুটো, ওগুলো তিনি গুঁজে রেখেছিলেন উর্দির কলারের ভাঁজে। 'এই যে – তোমার রুমাল,' তিনি বললেন, ওগুলো ছুড়ে মারলেন দণ্ডিত আসামির দিকে। আর ব্যাখ্যার ভঙ্গিতে পর্যটককে বললেন: 'মহিলাদের থেকে পাওয়া উপহার।'

দৃশ্যমান তড়িঘড়ির সঙ্গে তিনি প্রথমে তার উর্দি, পরে গা থেকে অন্য সব জামাকাপড় খুললেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে প্রতিটা কাপড় খুব যত্ন নিয়েই ধরলেন, এমনকি তার উর্দির রুপার বিনুনি সূক্ষ্মভাবে ছুঁলেন আঙুল দিয়ে, আর একটা নকশাদার সুতা ঝাঁকিয়ে সোজা করলেন অন্যগুলোর সঙ্গে। কিন্তু তার এত যত্নের কোনো মানে হয় না; কারণ প্রতিটা কাপড় যে-ই না ওভাবে তিনি ধরছেন, পরক্ষণেই সেটা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন গর্তের মধ্যে, রুষ্ট এক ঝাঁকির সঙ্গে। তার কাছে এখন শেষ জিনিসটা বলতে তার বেল্টসহ ছোট তরবারিটাই আছে। খাপ থেকে ওটা খুললেন তিনি, টুকরো টুকরো করে ভাঙলেন, সব টুকরো জড়ো করলেন একসঙ্গে – তরবারি, খাপ আর বেল্টের টুকরোগুলো; আর এমন প্রচণ্ডতা নিয়ে ওগুলো ছুড়ে মারলেন নিজের কাছ থেকে যে, গর্তের নিচে একসঙ্গে ঠনঠান শব্দ তুলে পড়ল ওগুলো।

এবার তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে – উলঙ্গ। পর্যটক ঠোঁট কামড়ালেন, বললেন না কিছু। তিনি জানেন যে কী ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু অফিসারকে কোনোভাবে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার তার নেই। যদি অফিসারের অতি পছন্দের এই বিচার-প্রক্রিয়া সত্যিই উচ্ছেদ হওয়ার দোরগাড়ায় পৌঁছে গিয়ে থাকে – সম্ভবত পর্যটকের হস্তক্ষেপের কারণে, সে ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব এড়াচ্ছেন না তিনি – তাহলে তিনি যা করতে যাচ্ছেন তাকে বেঠিক বলা যাবে না; তার জায়গায় হলে পর্যটকও ঠিক একই কাজ করতেন।

সৈনিক ও দণ্ডিত আসামি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না, শুরুতে তো তারা এদিকে দেখছিলই না। দণ্ডিত লোকটা খুশিতে ডগমগ যে সে তার রুমালগুলো ফিরে পেয়েছে, কিন্তু বেশিক্ষণ আর ওগুলো নিয়ে আনন্দ করার সুযোগ মিলল না তার, কারণ সৈনিক তার কাছ থেকে ওগুলো এক ঝটকায় ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এবার দণ্ডিত লোকটা চেষ্টা করছে সৈনিকের বেল্টের নিচ থেকে ওগুলো – সৈনিক রুমাল দুটো নিরাপদে রাখার জন্য

গুঁজে রেখেছে তার বেল্টের মধ্যে – টেনে নিতে, কিন্তু সৈনিক সে-ব্যাপারে সতর্ক। এভাবেই ওরা দুজন নিজেদের মধ্যে লাগাল কাড়াকাড়ি-মারামারি, অর্ধেক ফুর্তির ছলে। অফিসার পুরো নগ্ন হওয়ার পরেই কেবল এদিকে খেয়াল করা শুরু করল ওরা। বিশেষ করে দণ্ডিত লোকটাকে মনে হলো, কোনো বিরাট অবস্থান-উলটে-যাওয়া ঘটনার অনুমান সে করতে পারছে। যা ঘটছিল তার ক্ষেত্রে, এখন তা-ই ঘটছে অফিসারের ক্ষেত্রে। সম্ভবত এইবার একেবারে চূড়ান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে ঘটনাটা। সম্ভবত বিদেশি এই পর্যটক আদেশ দিয়েছেন এভাবে। একেই বলে প্রতিশোধ। তার নিজেকে ভুগতে হয়নি শেষটা পর্যন্ত, কিন্তু সে শোধ নিতে যাচ্ছে একদম ঐ শেষবিন্দু অবধিই। একটা চওড়া, নীরব হাসি ছড়িয়ে পড়ল এবার তার মুখে, আর লেগে থাকল ওখানেই।

অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন যন্ত্রটার দিকে। আগে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে তিনি যন্ত্রটা খুব ভালো বোঝেন, কিন্তু এখন তিনি ওটা কীভাবে সামলাচ্ছেন আর কীভাবে যন্ত্রটাও তার কথা শুনছে তা দেখে হতবিহ্বল হতে হয়। তাকে শুধু আঁচড়ার দিকে একটা হাত বাড়াতে হলো – তাতেই আঁচড়া উপর-নিচে ওঠানামা করল কয়েকবার, তাকে বরণ করার জন্য সঠিক অবস্থানে পৌঁছা পর্যন্ত; তিনি স্রেফ বিছানার পাশটা ছুঁলেন আর ওতেই বিছানা কাঁপতে শুরু করল; তুলোর পিণ্ড তার মুখের কাছে চলে এল, অফিসার যে ওটা চাচ্ছিলেন না তা বোঝা গেল, কিন্তু তার এই বিরক্ত ভাব শুধু খানিকের জন্যই, শিগগিরই তিনি মেনে নিলেন, গ্রহণ করলেন পিণ্ডটিকে। সবকিছু এখন তৈরি, শুধু ফিতাগুলো এখনো ঝুলছে দুপাশে, তবে ওগুলোর কোনো কাজও নেই, অফিসারকে বিছানায় বেঁধে রাখার কোনো দরকার হবে না। কিন্তু দণ্ডিত লোকটার চোখে পড়ল ওই ঝুলতে থাকা ফিতাগুলো, তার হিসেবে এই চামড়ার ফিতা দিয়ে আসামিকে বাঁধা না পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড হয় না আসলে, সে প্রবলভাবে ডাকল সৈনিককে আর তারা দুজনেই দৌড়ে গেল অফিসারকে বাঁধার জন্য। অফিসার এরই মধ্যে এক পা বাড়িয়েছেন নকশাবিদকে চালানোর হাতলে লাথি মারার জন্য; তখন তিনি দেখলেন যে ওরা দুজন এসে পাশে হাজির; সুতরাং তিনি সরিয়ে নিলেন তার পা, নিজেকে ফিতায় বন্দী হওয়ার জন্য সমর্পণ করলেন। কিন্তু এবার আর হাতলটা তার পায়ের নাগালে থাকল না; সৈনিক কিংবা আসামি কেউই খুঁজেও পাবে না যে হাতল কোথায়, আর পর্যটকও নিশ্চয় হাত লাগাবেন না এসবে। অবশ্য দরকার পড়ল না ওসব কিছুর, শেষ ফিতা বাঁধা মাত্রই যন্ত্র চলা শুরু করল; বিছানা কেঁপে উঠল, সুচগুলো নেচে উঠল চামড়ার উপরে, আঁচড়া সুন্দরভাবে উপর-নিচ করতে লাগল। পর্যটক খানিক সময় তাকিয়ে থাকলেন ওটার দিকে, এরপর তার মাথায় এল যে নকশাবিদের একটা চাকার তো ঘর্ঘর শব্দ করার কথা; কিন্তু কই, সবই তো নিশ্চুপ, এমনকি ক্ষীণতম শোঁ-শোঁ শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

এরকম নিঃশব্দে চলার কারণে যন্ত্রের দিকে আর মনোযোগ থাকল না পর্যটকের। তিনি তাকালেন সৈনিক আর দণ্ডিত আসামির দিকে। দুজনের মধ্যে দণ্ডিতকেই বেশি হাসিখুশি লাগছে, যন্ত্রের সবকিছুতেই তার অনেক আগ্রহ, এই সে নিচু হচ্ছে ঝুঁকে, এই

উপরে হাত বাড়াচ্ছে, সব সময়েই তার তর্জনী উঁচিয়ে আছে সৈনিককে কিছু একটা দেখানোর কাজে। পর্যটক অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যে একেবারে শেষ পর্যন্ত এখানে থাকবেন, কিন্তু এই দুজনের কাণ্ডকারখানা আর সহ্য করতে পারছেন না তিনি। 'বাড়ি যাও,' বললেন তিনি। সৈনিকের মনে হয় বাড়ি যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু দণ্ডিত আসামির কাছে এই আদেশটা লাগল শাস্তির মতো। সে তার দুই হাত জোড় করে মিনতি জানাল এখানে থাকার জন্য, আর পর্যটক যখন তার মাথা নেড়ে 'না' জানালেন, বোঝালেন যে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, আসামি তখন একেবারে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল প্রার্থনার ঢঙে। পর্যটক বুঝলেন আদেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই, তিনি উদ্যত হলেন ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে খেদিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই সময় মাথার উপরে নকশাবিদ-এ একটা আওয়াজ শুনলেন তিনি। উপরে তাকালেন। সেই খাঁজকাটা চাকাই কি ঝামেলা বাধাতে শুরু করল? না, অন্য কিছু। আস্তে আস্তে নকশাবিদ-এর ঢাকনা খুলতে লাগল, একসময় পুরো খুলে পড়ল। একটা খাঁজকাটা চাকার দাঁতগুলো দেখা গেল, দাঁতগুলো উপরে উঠছে, একটু বাদেই পুরো চাকা হাজির হলো চোখের সামনে, মনে হলো কোনো দুর্দান্ত শক্তি যেন বা চেপে ধরেছে নকশাবিদকে, যে-কারণে এই চাকার জন্য ভেতরে আর কোনো জায়গা নেই; নকশাবিদ-এর প্রান্তসীমায় পৌছানো পর্যন্ত ঘুরল চাকা, মাটিতে পড়ল, তারপর বালিতে খাড়া হয়ে দৌড়াল কিছুটা পথ, আর শেষমেশ পড়ে গেল ডিগবাজি খেয়ে। কিন্তু উপরে দ্বিতীয় আরেকটা চাকা আবির্ভূত হতে শুরু করেছে, ওটার পেছনে আরো অনেকগুলো – বড় চাকা, ছোট চাকা, একদম ছোট ছোট চাকা যেগুলো আলাদা করে বোঝাই মুশকিল – সবগুলোর ভাগ্যে ঘটল একই ঘটনা। ভাববেন যে এতক্ষণে নিশ্চয় নকশাবিদের ভেতরটা খালি হয়ে গেছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা নতুন, সংখ্যায় অনেক বেশি এমন একটা দল, হাজির – ওগুলো মাথা তুলছে, মাটিতে পড়ছে, বালিতে দৌড়াচ্ছে আর তারপর ডিগবাজি খেয়ে শুয়ে পড়ছে। এই দৃশ্যে বিমোহিত হয়ে দণ্ডিত আসামি একদমই ভুলে গেছে পর্যটকের আদেশ, খাঁজকাটা চাকাগুলোয় পুরো মোহগ্রস্ত হয়ে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে একটাকে ধরবার আর সৈনিককে পীড়াপীড়ি করছে সেই কাজে তাকে সাহায্য করতে, কিন্তু প্রতিবারই ভয়ে হাত পিছিয়ে নিতে হচ্ছে তাকে; কারণ, ওটার পেছন পেছনই এসে পড়ছে আরেকটা চাকা যা – অন্তত যেই না মাটিতে গড়িয়ে দৌড় মারছে – তাকে করে তুলছে আতঙ্কিত।

পর্যটকের ব্যাপারে বলতে হয়, তিনি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত; দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে যন্ত্রটা খুলে পড়ছে; এর নির্ঝঞ্ঝাট কাজ করে যাওয়াটা এক অলীক মায়া ছিল মাত্র; তার মনে হলো অফিসারকে রক্ষা করা এখন তারই কর্তব্য, কারণ নিজের খেয়াল নিজে নেওয়ার মতো অবস্থায় অফিসার এখন আর নেই। কিন্তু নিচে পড়তে থাকা খাঁজকাটা চাকাগুলো তার সম্পূর্ণ মনোযোগ এমনভাবেই দখল করে রেখেছিল যে, যন্ত্রের বাকি অংশের দিকে তাকানোর কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন; তবে এখন, শেষ খাঁজকাটা চাকাটা নকশাবিদ থেকে বের হয়ে আসার পরে, তিনি ঝুঁকলেন আঁচড়ার উপর – আর

এক নতুন ও আরো বেশি পীড়াদায়ক বিস্ময়ের মুখোমুখি হলেন। আঁচড়া লিখছে না, সোজা কথায় – ছুরি বসাচ্ছে; আর বিছানা শরীরটা উল্টে দেওয়ার বদলে স্রেফ ওটাকে কাঁপতে কাঁপতে জোরে ছুড়ে ছুড়ে মারছে সুচগুলোর উপর। পর্যটক চাইলেন বাধা দেবেন, যদি পারা যায় তো পুরো যন্ত্রটাই থামিয়ে দেবেন – কারণ অফিসার যে ধরনের নিপীড়ন ভোগ করতে চাচ্ছিলেন, এটা তা না, এটা পরিষ্কার খুন। তিনি হাত দুটো বাড়ালেন। কিন্তু আঁচড়া শরীরটা শিকে গাঁথার মতো গেঁথে নিয়ে এরই মধ্যে দুলে এক পাশে হেলে গেছে, যেমনটা সে করে বারোতম ঘণ্টায়। শতধারায় বয়ে যাচ্ছে রক্ত, তাতে পানি মেশানো না, পানি ছিটানোর নলগুলোও এইবার কাজ করেনি। আর এখন একদম শেষ জিনিসটাও কাজ করল না: লম্বা সুচগুলো থেকে মুক্ত হলো না শরীর, রক্ত ঝরতে লাগল অঝোরে, আর নিচে না পড়ে বরং গর্তের উপরে ঝুলতে লাগল শরীরটা। আঁচড়া তার আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া শুরু করল, কিন্তু যেন বা বুঝতে পারল সে তার বোঝা থেকে এখনো মুক্ত হয়নি, তাই যেখানে ছিল সেখানেই গর্তের উপরে দাঁড়িয়ে থাকল। 'আসো, সাহায্য করো!' পর্যটক চেঁচিয়ে বললেন সৈনিক ও দণ্ডিত আসামিকে আর তিনি নিজে ধরলেন অফিসারের পা দুখানা। তিনি চাচ্ছেন তার এদিক থেকে পা দুটো চাপ দিতে, আর ওদিকে ওরা দুজন ধরবে অফিসারের মাথা, যাতে করে তাকে ধীরে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় সুচগুলো থেকে। কিন্তু ওই দুজন যন্ত্রের কাছে আসার ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে পারছে না; দণ্ডিত আসামি তো রীতিমতো অন্যদিকে ঘুরে হাঁটা দিল; পর্যটককে ওদের কাছে হেঁটে গিয়ে ওদের বাধ্য করতে হলো অফিসারের মাথার দিকে দাঁড়ানোর জন্য। এটা করতে গিয়ে তার চোখে পড়ল – অনেকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই – মৃতদেহের চেহারা। জীবিত অবস্থায় যেমন, তেমনই লাগছে মুখটা; ওনার বলা সেই 'আলোকপ্রাপ্তি'র কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না ওতে; অন্য সবাই এই যন্ত্রের থেকে যা পেয়েছে, অফিসার তা পাননি; তার ঠোঁট দুটো শক্ত করে একসঙ্গে আঁটা, তার চোখ দুটো খোলা, দেখে মনে হয় তিনি জীবিত, চোখের দৃষ্টিতে একটা শান্ত প্রত্যয়ের ছাপ, আর তার কপাল ফুঁড়ে চলে গেছে বিশাল লোহার শলার সুচাল মুখটা।

পর্যটক যখন সৈনিক আর দণ্ডিত আসামিকে সঙ্গে নিয়ে, ওরা হাঁটছে তার পেছনে, উপনিবেশের প্রথম বাড়িগুলোর কাছে পৌঁছালেন, সৈনিক ওগুলোর একটা দেখিয়ে বলল: 'ঐ যে চা-ঘর।'

দালানগুলোর একটার নিচতলায় এক গভীর, নিচু, গুহার মতো কামরা – ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে এর ছাদ আর সব দেয়াল। রাস্তার দিকে এর পুরো প্রস্থের দিকটা খোলা। এই চা-ঘরকে উপনিবেশের অন্য বাড়িগুলো থেকে আলাদা করার মতো কিছু নজরে পড়ে না; সবগুলো বাড়িরই – শুধু কমান্ড্যান্টের হেডকোয়ার্টারের প্রাসাদতুল্য বাড়িগুলো বাদ দিলে – খুব জরাজীর্ণ অবস্থা; তা সত্ত্বেও পর্যটকের কাছে ওগুলো কোনো অতীতকালের অবশেষ বলে মনে হলো, তিনি ওগুলোতে খুঁজে পেলেন এক বিগত কালের শক্তি। চা-ঘরের দিকে আগালেন তিনি, ঘরটার সামনে রাস্তায় পড়ে থাকা খালি

টেবিলগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে নিলেন, পেছনে এল তার দুই সঙ্গী; তারপর ভেতর থেকে আসা ঠান্ডা,আর্দ্র বাতাসে শ্বাস নিলেন। 'বুড়োটাকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে,' সৈনিক বলল, 'পুরোহিত তাকে কবরখানায় কবর দিতে রাজি হননি। কিছুটা সময় ওনারা বুঝে উঠতে পারছিলেন না কোথায় তাকে কবর দেবেন, শেষমেশ এখানে কবর দিলেন তাকে। অফিসার আপনাকে এ কথা বলতেন না কোনোভাবেই, কারণ তার জন্য এটাই সবচেয়ে লজ্জার বিষয়। তিনি কয়েকবার রাত্রিবেলায় এমনকি চেষ্টাও চালিয়েছেন বুড়োকে কবর থেকে তুলতে, কিন্তু প্রতিবারই তাড়া খেয়েছেন।' 'কবরটা কোথায়?' পর্যটক জানতে চাইলেন, সৈনিকের কথা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজন, সৈনিক আর দণ্ডিত আসামি, দৌড়ে গেল সামনের দিকে আর হাত বাড়িয়ে কবরের জায়গাটা দেখাল। তারা পর্যটককে নিয়ে গেল পেছনের দেয়ালের কাছে, সেখানে কয়েকটা টেবিলে বসে আছে কাস্টমারেরা। দেখে মনে হচ্ছে ওরা সব ডক শ্রমিক, শক্তপোক্ত কিছু মানুষ, মুখে ছোট কালো চিকচিকে দাড়ি। কারোরই গায়ে জ্যাকেট নেই, আর তাদের জামাগুলো ছেঁড়া; সব গরিব, নিপীড়িত মানুষ। পর্যটক এগিয়ে যেতেই ওদের কয়েকজন উঠে দাঁড়াল, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। 'বিদেশি লোক,' চারপাশে এই ফিসফিস, 'কবর দেখতে এসেছে।' তারা একটা টেবিল সরাল এক পাশে, আর ওর নিচে আসলেই একটা সমাধিফলক। সাধারণ একটা পাথর, টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখার মতো নিচু। ওটার গায়ে খুব ছোট অক্ষরে খোদাই করে কিছু লেখা, পর্যটককে হাঁটু মুড়ে বসতে হলো তা পড়ার জন্য। ওতে লেখা: 'এখানে শুয়ে আছেন প্রাক্তন কমান্ড্যান্ট। তার অনুসারীরা, যাদের হয়তো এখন কোনো নাম নেই, তার জন্য এই কবর খুঁড়েছেন আর এই পাথরের ফলকটা বসিয়েছেন। এমনটা ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে নির্দিষ্ট কিছু বছর পরে কমান্ড্যান্ট আবার পুনরুজ্জীবিত হবেন, আর এই বাড়ি থেকে তার অনুসারীদের নিয়ে বেরিয়ে যাবেন উপনিবেশটা আবার দখলে নিতে। আস্থা রাখুন আর দেখতে থাকুন।' পর্যটক যখন পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন, তিনি দেখলেন তাকে ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলো মিটিমিটি হাসছে, যেন বা তারাও তার সঙ্গে পড়েছে অভিলিখনটা, ওটা তাদের কাছে লেগেছে হাস্যকর, আর পর্যটকের মতামতও যেন একই রকম হয় সেই অনুরোধ জানাচ্ছে। পর্যটক ভান করলেন যে তিনি তাদের ওসব দেখেননি, তারপর তিনি তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন কিছু পয়সা, টেবিলটা কবরের উপরে ফের টেনে আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, চা-ঘর থেকে বেরোলেন আর পা বাড়ালেন জাহাজঘাটার দিকে।

সৈনিক ও দণ্ডিত আসামি চা-ঘরটাতে কিছু পরিচিতের দেখা পেয়েছে, তারা আটকে দিয়েছে ঐ দুজনকে। তবে ওরা খানিক পরে নিশ্চয় নিজেদের ছিঁড়ে বের করে নিয়ে এসেছে, কারণ পর্যটক নৌকার দিকে নামার লম্বা সিঁড়ির মাত্র মাঝামাঝি ধাপে পৌঁছেছেন, ওরা ছুটে আসতে লাগল তার দিকে। সম্ভবত ওরা শেষ মুহূর্তে এসে পর্যটককে জোর করতে চাইছে তার সঙ্গে তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি যখন সিঁড়ির নামায় একটা

মাঝির সঙ্গে আপস-মীমাংসা করছেন তাকে স্টিমার অবধি পৌছে দেওয়ার জন্য, ঐ দুজন দৌড়ে নামতে লাগল সিঁড়িটা বেয়ে, নীরবে, চিৎকার করে ডাকার সাহস হলো না তাদের। কিন্তু ওরা যখন সিঁড়ির গোড়ায় পৌছাল, ততক্ষণে পর্যটক নৌকায় উঠে গেছেন আর মাঝি মাত্র নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে। তার পরেও ওদের পক্ষে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে পড়া অসম্ভব ছিল না, কিন্তু পর্যটক নৌকার পাটাতন থেকে হাতে তুলে নিয়েছেন মোটা গিঁরার একটা ভারী রশি, ওটা দিয়ে তিনি ভয় দেখাতে লাগলেন ওদের, আর ওভাবেই ওদের বিরত রাখলেন লাফ দেওয়া থেকে।

এক গ্রাম্য ডাক্তার

কিছু ছোট কাহিনি

নতুন উকিল

আমাদের এক নতুন উকিল আছেন, ড. বুসেফেলাস। তার বাইরের চেহারা দেখে বোঝাই কষ্ট যে তিনি একসময় মেসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের যুদ্ধের ঘোড়া ছিলেন, যদিও বিষয়টা সম্বন্ধে ভালো জানে এমন কারো চোখে দু-একটা জিনিস ধরা পড়বে বটে। হতে পারে, কিন্তু সেদিন আদালত ভবনের সিঁড়িতে আমি দেখলাম যে একজন খুব সাধারণ এক দ্বাররক্ষকও রেস দেখতে যাওয়ার দক্ষ চোখ নিয়ে এই উকিলকে তাকিয়ে দেখল, দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল যে কীভাবে তিনি তার পাগুলো উঁচুতে তুলে তুলে উপরে উঠে যাচ্ছেন, তার পায়ের খুরের প্রতিটা শব্দ কীভাবে মার্বেলের ওপরে ধ্বনি তুলছে।

সবকিছু মিলে বার-সমিতি বুসেফেলাসকে উকিল হিসেবে কাজ করতে সম্মতি দিয়েছে। অসামান্য বোধশক্তিই বলতে হবে যে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, আজকালকার দিনের সমাজব্যবস্থায় বুসেফেলাস বেশ কঠিন এক অবস্থায় পড়েছেন, আর সে কারণেই, এ ছাড়া তার ঐতিহাসিক অবদানের জন্যও, সবার উচিত তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে এখন আর কোনো আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নেই। মানতে হচ্ছে, এখনো কেউ কেউ জানে যে কীভাবে মানুষ হত্যা করতে হয়, এমনকি ভোজসভার টেবিলে কীভাবে অন্য পাশে বসা বন্ধুকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে মারতে হয় সেই কুশলতাটাকু আজও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি; অনেক মানুষ আছেন যাদের কাছে মেসিডোনিয়া আজ খুব, খুবই ছোট এক জায়গা, তাই তারা তার বাবা ফিলিপকে গালমন্দও করেন – কিন্তু কেউ, আর কেউই নেই যে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতে নিয়ে যেতে পারবে। এমনকি সেই তখনকার দিনেও ভারতের দরজায় পৌঁছানোর কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু রাজার তরবারি অন্তত এটুকু দেখিয়ে দিয়েছিল যে কোথায় সেই দরজা। আর আজ ভারতে ঢোকার এই দরজাগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে একদম অন্য কোথাও, আরো দূরে, আরো উঁচু কোনো জায়গায়; কেউ নেই যে পথ দেখাবে; অনেকেরই হাতে তরবারি আছে, কিন্তু তা স্রেফ শূন্যে

ঘোরানোর জন্যই, আপনি যদি ওই তরবারি অনুসরণ করতে চান তো দেখবেন আপনার দৃষ্টি তালগোল পাকিয়ে গেছে।

অতএব, তাই, সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে বোধ হয় বুসেফলাস যা করেছেন তা-ই করা, আইনের বইয়ের মধ্যে ডুবে যাওয়া। মুক্ত, তার শরীরের দুই পাশে এখন আর কোনো সওয়ারি তাকে আঁকড়ে নেই, আলেকজান্ডারের যুদ্ধগুলোর হট্টগোল থেকে অনেক দূরে, বাতির স্থির আলোয় তিনি পড়ছেন আর ওল্টাচ্ছেন আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলোর পাতা।

এক গ্রাম্য ডাক্তার

বিরাট দ্বিধার মধ্যে রয়েছি আমি; জরুরি এক ডাকে বেরোতে হবে আমাকে; খুবই অসুস্থ এক রোগী আমার জন্য অপেক্ষা করছে দশ মাইল দূরের এক গ্রামে; তার আর আমার মধ্যেকার বিশাল পথটা ভরে আছে ঘন ঝোড়ো তুষারে; চার-চাকার একটা ঘোড়াগাড়ি আছে আমার, বড় বড় চাকাওয়ালা হালকা এক গাড়ি, আমাদের গাঁয়ের রাস্তার জন্য একদম ঠিক জিনিস; আমার ফারের কোটটায় শরীর মুড়িয়ে নিয়ে, ডাক্তারির জিনিপত্তরের ব্যাগ হাতে ধরে, রওনা দেওয়ার জন্য পুরো তৈরি হয়ে আমি উঠোনে দাঁড়ালাম; কিন্তু ঘোড়াটা কোথাও নেই, ঘোড়াটা। আমার নিজের ঘোড়া কাল রাতে এই বরফমোড়া শীতকালের বেশি খাটাখাটনিতে ক্লান্ত হয়ে মারা গেছে, এখন আমার কাজের মেয়ে সারা গ্রাম দৌড়ে বেড়াচ্ছে একটা ঘোড়া ধার করবে বলে; কিন্তু আমি জানি, ওতে কোনো কাজ হবে না; নিরর্থক আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে, তুষারে ঢাকা পড়ছি আরো আরো বেশি করে, আর ততই বেশি নড়বার ক্ষমতা হারিয়ে বসছি; কাজের মেয়েটাকে দেখা গেল গেটে দাঁড়িয়ে আছে, একা, হাতের লণ্ঠন দোলাচ্ছে; ঠিকই তো, কে এই এত রাতে এরকম একটা সফরের জন্য তার ঘোড়া ধার দেবে? আবার একবার উঠানে পায়চারি করলাম আমি; কোনো বুদ্ধি মাথায় এল না; না বুঝেই, এরকম এক হতাশ অবস্থায় হাবুডুবু খেয়ে, আমি এক লাথি মেরে বসলাম শুয়োরের খোঁয়াড়টার পচে যাওয়া দরজায়, খোঁয়াড়টা ব্যবহার করা হয়নি অনেক বছর। দরজা খুলে গেল, কবজার উপর দাঁড়িয়ে বাড়ি খেতে লাগল এদিক-ওদিক। ভেতর থেকে একটা ভাপ বেরোল, আর ঘোড়ার মতো একটা গন্ধ। ভেতরে একটা দড়িতে ঝুলছে একটা টিমটিমে আস্তাবলের লণ্ঠন। একজন মানুষ পাছায় ভর দিয়ে গুটিগুটি বসে রয়েছে ঐ নিচু ছাউনির খোঁয়াড়ের মধ্যে, সে তার নীল চোখের অমায়িক মুখ তুলে তাকাল। 'আমি কি ঘোড়াগুলো জুড়ব গাড়িতে?' সে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল। কী বলব তা বুঝে পেলাম না আমি, কেবল মাথা নোয়ালাম ঐ খোঁয়াড়ে আর কী আছে তা দেখার জন্য। কাজের মেয়েটা আমার পাশে দাঁড়ানো, সে বলল, 'নিজের ঘরের মধ্যে কী লুকানো আছে তা নিজেরই কখনো জানার উপায় নেই,' আর হেসে ফেললাম আমরা দুজনে। 'ও ভাই গো, ও বোন গো!' ডাক দিল সহিস আর দুটো ঘোড়া, পুরু-মোটা পাছার দুই প্রকাণ্ড জীব, একটার পেছনে অন্যটা, স্রেফ ওদের মোচড়ানো শরীরের শক্তি দিয়েই ঘুরে বেরিয়ে এল সামনের দিকে, ওদের পাগুলো শরীরের ভাঁজে টান টান হয়ে আছে, সুঠাম মাথা দুটো নুয়ে আছে উটের মতো; দরজার ফুটো গলে – এটা ভরে গেছে তাদের শরীরের আয়তনে – বেরিয়ে এল ওরা। পরমুহূর্তে লম্বা পায়ের উপরে উঁচু হয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা, ওদের লোম থেকে বেরোচ্ছে একটা ঘন বাষ্পের মেঘ। 'ওকে একটু সাহায্য করো,' আমি বললাম, কাজের-মেয়ে নিজের থেকেই জলদি এগিয়ে এল সহিসকে ঘোড়া জুতবার জিনিসগুলো দিতে। কিন্তু মেয়েটা ঠিকমতো তার কাছে যেতেও পারেনি, সহিস তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল, নিজের মুখ চেপে ধরল মেয়েটার

মুখে। মেয়েটা চিৎকার করে ছুটে এল আমার কাছে; তার গালে দুই সারি দাঁতের লাল চিহ্ন পড়ে গেছে। 'অই জানোয়ার,' আমি রাগে চিৎকার দিলাম, 'চাবকানো লাগবে নাকি তোকে?' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল যে এ এক অচেনা লোক; আমি জানিও না কোত্থেকে সে এসেছে, আর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সে এগিয়ে এসেছে আমাকে সাহায্য করতে, যখন সবাই কিনা আমাকে হতাশ করেছে। যেন সে জানে যে আমি কী ভাবছি, তাই আমার ধমকটাতে কোনো মনঃক্ষুণ্ন হলো না সে, কেবল – ঘোড়াগুলো নিয়ে ব্যস্ত অবস্থায় – একবার ঘুরে দেখল আমাকে। 'উঠুন,' বলল সে, আর আসলেই সবকিছু তৈরি। আমি খেয়াল করলাম, এর আগে কোনো দিন এত সুন্দর দুটো ঘোড়ার গাড়িতে উঠিনি, তাই খুশিমনে চড়ে বসলাম। 'গাড়ি আমি চালাব, তুমি পথ চেনো না,' বললাম আমি। 'অবশ্যই,' সে বলল, 'আমি তো আপনার সঙ্গে আসছিই না, আমি রোজের সঙ্গে থাকছি।' 'না,' তীক্ষ্ণ চিৎকার দিল রোজ, আর নিজের অবধারিত নিয়তিকে ঠিকভাবে অনুমান করতে পেরেই দৌড়ে পালাল ঘরের মধ্যে; আমার কানে এল দরজায় সে শিকল বাঁধছে ঝনঝন শব্দ করে; শুনলাম তালা লাগানোর শব্দও; এমনকি আমি দেখতে পাচ্ছি কীভাবে সে নিভিয়ে দিচ্ছে বসার ঘরের বাতি, তারপর সবগুলো ঘরে দৌড়ে দৌড়ে ওগুলোও অন্ধকার করে দিচ্ছে, যেন তাকে খুঁজে বের করা না যায়। 'তুমি আমার সঙ্গে আসছো,' সহিসকে বললাম আমি, 'তা না হলে যত জরুরিই হোক না কেন, আমি যাওয়া বাতিল করছি। তোমার ঘোড়ায় চড়ার দাম হিসাবে তো আমি আর মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না।' 'হেঁট, হেঁট!' চিৎকার করল সে; হাত দিয়ে তালি বাজাল; ঘোড়ার গাড়িটা ঘূর্ণি খেয়ে উড়ে গেল স্রোতের মধ্যে কোনো কাঠের টুকরোর মতো; আমি কেবল ওটুকুই শুনতে পেলাম যে সহিসের ধাক্কার মুখে আমার বাড়ির দরজা দড়াম করে খুলে ভেঙে পড়েছে, এরপর একটা প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় আমার চোখ, কান আর বাকি সব ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে এল। কিন্তু সেটাও কেবল এক মুহূর্তের জন্য, কারণ মনে হলো আমার নিজের বাসার গেট যেন সোজা খুলে গেছে সেই রোগীর বাসার উঠানে – আমি হাজির; ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে শান্ত হয়ে, বরফ পড়া থেমেছে; চারপাশে চাঁদের আলো; আমার রোগীর বাবা-মা ছুটে এলেন বাড়ির ভেতর থেকে; রোগীর বোন ওদের পেছনে; গাড়ি থেকে আমাকে বলতে গেলে কোলে তুলে নেওয়া হলো; এদের হিজিবিজি কথাবার্তার কিছুই ধরতে পারছি না আমি; রোগীর ঘরের হাওয়ায় প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসবে এমন অবস্থা; ফেলে রাখা স্টোভ থেকে ধোঁয়া উঠছে; আমাকে ধাক্কা দিয়ে জানালা খুলতে হলো; কিন্তু সবার আগে আমি চাচ্ছি রোগিকে দেখতে। দুবলা-পাতলা, গায়ে কোনো জ্বর নেই, গা না-ঠান্ডা না-গরম, চোখে শূন্যদৃষ্টি, গা খালি, কিশোর-বয়সী ছেলেটা বিছানার চাদর থেকে শরীর তুলল, আমার গলা জড়িয়ে ধরল আর কানে ফিসফিস করে বলল: 'ডাক্তার, আমাকে মরতে দিন।' আমি তাকালাম চারপাশে; কেউ শোনেনি; ছেলের বাবা-মা কোনো শব্দ না করে সামনে ঝুঁকে আছেন আর আমার রায়ের অপেক্ষা করছেন; ওর বোন আমার ব্যাগ রাখার জন্য একটা চেয়ার নিয়ে এসেছে। আমি ব্যাগ খুলে ডাক্তারির জিনিসপত্তরের মধ্যে ঘাঁটতে লাগলাম;

ছেলেটা বারবার তার অনুরোধ মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বিছানা থেকে আমার কাছে আসতে চেষ্টা করছে; ছোট সাঁড়াশিটা হাতে তুললাম আমি, মোমের আলোয় ওটা পরখ করলাম, তারপর আবার রেখে দিলাম ব্যাগের মধ্যে। 'হ্যাঁ,' অধার্মিকের মতো ভাবছি আমি, 'এরকম অবস্থায় পৌছানোর পরে খোদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, হারানো ঘোড়া ফেরত পাঠান, তাড়া বুঝতে পেরে আরো একটা ঘোড়া যোগ করে দেন, আর ষোলোআনা পূরণ করতেই একটা সহিসও পাঠান' – এ পর্যন্ত এসে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল রোজ মেয়েটার কথা; আমার করার আছেই বা কী, কী করে আমি বাঁচাব ওকে, কী করে ওকে এই সহিসের শরীরের নিচ থেকে টেনে বের করব, ওর থেকে এই দশ মাইল দূরে, আর আমার গাড়িতে এক জোড়া বেপরোয়া ঘোড়া নিয়ে? এই ঘোড়াগুলো, ওদের লাগাম যেন ওরা কী করে খুলে ফেলেছে; বাইরে থেকে গুঁতো দিয়ে কী করে যেন জানালাও খুলেছে, কী করে আমি জানি না; ওরা দুটো দুই আলাদা জানালা দিয়ে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে, আর এ বাসার লোকজনের চিৎকারে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে গভীর মন দিয়ে দেখছে রোগীকে। 'খুব শিগগির বাড়ি ফিরছি আমি,' মনে মনে বললাম, যেনবা ঘোড়াগুলো আমাকে যাত্রা শুরু করার জন্য ডাকছে, তারপরও আমি বাধা দিলাম না যখন রোগীর বোন – সে ভাবছে আমার খুব গরম লাগছে – আমার ফারের কোট খুলে দিতে লাগল। আমার সামনে রাখা হলো এক গ্লাস রাম, বুড়ো লোকটা আমার কাঁধে চাপড় দিলেন, তার এই মহামূল্যবান সম্পদ আমাকে খেতে দিয়ে তিনি আমার আপন হওয়ার অধিকার পেয়ে গেছেন। আমি মাথা ঝাঁকালাম; বুড়ো মানুষটার চিন্তার সংকীর্ণতা দেখে আমার নিজেকে অসুস্থ লাগছে; ঠিক এ কারণেই আমি ফিরিয়ে দিলাম তার রামের গ্লাস। ছেলের মা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন ওখানে; আমি তাই করলাম, আর যখন একটা ঘোড়া জোরে চিঁ-হি-হি করে ছাদের দিকে মাথা তুলে ডেকে উঠল, আমি ছেলেটার বুকে মাথা রাখলাম, আমার ভেজা দাড়ির ছোঁয়ায় কাঁপতে লাগল সে। যা আমি এরই মধ্যে আন্দাজ করে ফেলেছি, তাই নিশ্চিত হলো: এই ছেলের কিছুই হয়নি, তার মা দুশ্চিন্তার তোড়ে তাকে এত বেশি কফি খাইয়েছেন যে তার রক্ত চলাচল খানিক ক্ষীণ হয়ে গেছে, কিন্তু ওটুকুই, তার স্বাস্থ্য একদম ভালো, আরো ভালো হয় এক্ষুনি ওকে লাথি মেরে বিছানা থেকে উঠিয়ে দিলে। কিন্তু পুরো দুনিয়া ঠিক করার আমি দায়িত্ব নিয়ে আসিনি, তাই আমি তাকে শুয়ে থাকতেই দিলাম। আমি চাকরি করি জেলা প্রশাসনের আওতায়, আমার কাজ আমি করি একটা মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তার চেয়েও বেশি নিবেদিত প্রাণে। যদিও মাইনে পাই খুব সামান্য, তার পরও মানুষের জন্য আমার দয়ামায়ার কমতি নেই, গরিব মানুষের জন্য আমি সব সময় খাটতে রাজি। রোজের দেখভালের বিষয়টাই আমাকে যা ভাবায়; তারপর এই অসুস্থ ছেলে শুধু নয়, আমি নিজে মরে গেলেও আমার আর দুঃখ থাকবে না। এই বিরামহীন শীতকালে আমি করছিটাই বা কী এখানে! আমার নিজের ঘোড়া হাওয়া হয়ে গেছে, আর গ্রামে একটা লোকও নেই যে তারটা আমাকে ধার দেবে। শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে আমাকে এই এক জোড়া বার করতে হলো; ওরা যদি

ঘোড়া না হতো, তাহলে আমাকে মাদী শুয়োরের পিঠে চেপে আসতে হতো এখানে। ব্যাপারটা এমনই। আমি মাথা নাড়লাম পরিবারের লোকজনের উদ্দেশে। এরা এসবের কিছুই জানে না, আর যদি জানতও, তবু বিশ্বাস করত না। প্রেসক্রিপশন লেখা সোজা, কিন্তু গাঁয়ের লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলা অনেক কঠিন। হুঁ, আমার আজকের ভিজিট তাহলে মনে হচ্ছে এখানেই শেষ; আরো একবার আমাকে জ্বালানো হলো বিনা কারণে; আমার অভ্যাস হয়ে গেছে এসবে, আমার বাড়ির কলিং বেল বাজিয়ে পুরো জেলার লোকজন আমাকে উত্ত্যক্ত করে; কিন্তু তাই বলে এবার যা হলো, রোজকে ফেলে রেখে আসতে হলো, আহারে ফরসা বাচ্চামেয়েটা কত বছর ধরে আমার বাড়িতে, কখনোই বলতে গেলে ওর খেয়ালই নেওয়া হয়নি আমার, – এই কোরবানি অনেক বেশি হয়ে গেছে, যেকোনোভাবে হোক এখন আমাকে এটা মাথার মধ্যে হালকা করে আনতে হবে, না হলে আমার সব রাগ গিয়ে পড়বে এই পরিবারটার ওপর, হায়রে ওরা সারা দুনিয়ার সদিচ্ছা নিয়েও তো আর রোজকে আমার কাছে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু তারপর, আমি যখন আমার ব্যাগ বন্ধ করছি, ফারের কোটটা আমাকে দিতে ইশারা করছি, যখন পুরো পরিবার একসঙ্গে ওখানে দাঁড়িয়ে, ছেলের বাবা রামের গ্লাস নাকে নিয়ে শুঁকছেন, ছেলের মা খুব সম্ভব আমার ব্যাপারে হতাশ হয়ে – আচ্ছা, মানুষ আশা করেটা কী? – চোখ ছলছল করে তার ঠোঁট কামড়াচ্ছেন, আর যখন ছেলের বোন একটা রক্তে-ভেজা রুমাল হাতে তুলে নাড়াচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে তখন শেষমেশ আমি মোটামুটি মানতে রাজি হলাম যে ছেলেটা হয়তো আসলেই অসুস্থ। আমি ওর কাছে গেলাম, সে আমার উদ্দেশে হালকা একটু হাসল, যেনবা আমি ওর জন্য সবচেয়ে পুষ্টিকর কোনো স্যুপ নিয়ে এসেছি। আহ্, এখন দুটো ঘোড়াই ডাক ছাড়ছে; কোনো সন্দেহ নেই ওকে আমার পরীক্ষা করে দেখার কাজটা সহজ করার জন্যই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ থেকে আদেশ এসেছে এই ডাক দেওয়ার – আর এবার আমি দেখলাম: হ্যাঁ, ছেলেটা অসুস্থ। তার ডান পাশে, পাছা ও কোমরের দিকটায়, আমার হাতের তালুর মতো বড় আকারের একটা ক্ষত খুলে বেরিয়ে আছে। গোলাপের মতো লাল অনেক আভা নিয়ে, গভীর অংশে কালো আর কিনারের দিকে রংটা হালকা হয়ে – সূক্ষ্ম দানা দানা মতো, বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত চুইয়ে বেরোচ্ছে – ক্ষতটা হাঁ করে আছে মাটিতে পোঁতা বোমার মতো। দূর থেকে দেখতে এমনই লাগছে। কাছ থেকে দেখলে বিষয়টা আরো জটিল। কার সাধ্য ওটা দেখবে মুখে হালকা শিস্ না বাজিয়ে? অনেক পোকা, আমার কড়ে আঙুলের মতো মোটা আর লম্বা, ওগুলোরও রক্তগোলাপ রং আর তার সঙ্গে রক্তের ছোপে ভরা, আঁকড়ে আছে ক্ষতের গভীরে, ওদের সাদা সাদা মাথা আর অসংখ্য ছোট ছোট পা নিয়ে কিলবিল করে মুচড়িয়ে উঠে আসতে চাইছে আলোর দিকে। হতভাগা কিশোর, তোমাকে সারিয়ে তোলার আর সাধ্য নেই। তোমার বিশাল ক্ষতটা আমি খুঁজে পেয়েছি, তোমার শরীরের পাশের এই ফুল তোমাকে খতম করে দিচ্ছে। পরিবারটা এখন খুশি, তারা দেখছে আমি মন দিয়ে কাজ করছি; বোনটা বলছে মাকে, মা বলছেন বাবাকে, আর বাবা বলছেন দেখতে আসা কিছু

লোককে, যারা পা টিপে টিপে খোলা দরজার চাঁদের আলোর মধ্য দিয়ে, তাদের দুই হাত দুপাশে ভারসাম্য রাখার জন্য বাড়িয়ে, এই ঘরে ঢুকেছেন। 'আপনি বাঁচাবেন আমাকে?' ফোঁপানি দিয়ে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল ছেলেটা, তার এই জীবন্ত ক্ষত তাকে একদম হতবিহ্বল করে দিয়েছে। এই হচ্ছে আমার জেলার লোকজন। সব সময় ডাক্তার সাহেবকে অসম্ভব সব আবদার জানানো তাদের স্বভাব। তাদের আগের সেই ধর্মবিশ্বাস আর নেই; পুরোহিত মশাই ঘরে বসে রয়েছেন, তার বেদিতে পরার কাপড়গুলো এক-এক করে ছিঁড়ে কেটে ফেলছেন; কিন্তু ওদিকে ডাক্তারের কাছ থেকে আশা যে তিনি তার শল্যচিকিৎসকের নাজুক হাত দিয়ে অলৌকিক জিনিস ঘটিয়ে দেবেন। তাহলে তা-ই হোক: আমি তো আর স্বেচ্ছায় রাজি হইনি, তোমরা যদি আমাকে পুজো-অর্চনার কাজেও ভুলভাবে লাগিয়ে দাও, আমি তাতেও বাধা দেব না কোনো; এর চেয়ে ভালো আর কীই-বা আমি আশা করব, আমি, বুড়ো এক গ্রাম্য ডাক্তার, যার কাছ থেকে কাজের মেয়েটাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে! তারপর এগিয়ে এলেন তারা, পুরো পরিবার এবং গ্রামের সব প্রবীণ লোকজন, তারা সবাই মিলে আমাকে ন্যাংটো করলেন; স্কুলে পড়া বাচ্চাদের একটা ধর্মগীতি গাইয়ের দল, দলের নেতৃত্বে তাদের শিক্ষক, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে খুব সাদামাটা সুরে গাওয়া শুরু করল:

> কাপড় খোলো ওর, তবেই তিনি অসুখ সারাবেন
> যদি না সারান তো মেরে ফেল তাকে!
> এক ডাক্তারই তো তিনি, স্রেফ ডাক্তারই তো শুধু।

ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি, উলঙ্গ, মাথা নিচু করে আর দাড়িতে আঙুল বুলিয়ে শান্তভাবে দেখছি উপস্থিত সবাইকে। পুরো শান্ত স্থির আমি, এদের সবার চেয়ে উঁচুতে আমার মর্যাদা, আর আমি সেটাই থাকব, যদিও তাতে আমার লাভ হচ্ছে না কারণ তারা এবার আমার মাথা ও পা-দুটো ধরে তুলে ফেলেছেন উপরে আর নিয়ে গেছেন বিছানায়। এরা আমাকে শুইয়েছেন দেয়ালের পাশটায়, ক্ষতের দিকটাতে। তারপর সবাই এরা চলে গেলেন ঘর ছেড়ে; দরজা বন্ধ করা হলো; গান থামল; মেঘ ঢেকে দিল চাঁদকে; আমার চারপাশে পড়ে আছে গরম কাঁথা-কম্বল; খোলা জানালাগুলোতে ঘোড়ার মাথা দুটো সামনে পেছনে দুলছে ছায়ার মতো। 'আপনি জানেন কি,' একটা গলা শুনলাম আমার কানে বলছে, 'আপনার ওপর আমার তেমন কোনো বিশ্বাস নেই। অন্যদের মতোই আপনাকেও যেন কোত্থেকে ভাসিয়ে আনা হয়েছে, এমনো না যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে আপনি নিজেই এসেছেন। আমার উপকার করার বদলে আপনি বেশ আমার মরবার বিছানায় আমার নিজের জায়গাটুকুও দখল করে নিয়েছেন। খুব চাচ্ছি যে আপনার চোখ দুটো খুঁচে তুলে ফেলি।' 'তুমি ঠিকই বলেছ,' আমি বললাম, 'কী লজ্জা! কিন্তু কী আর করার, আমি তো ডাক্তার। কী করার আছে আমার? বিশ্বাস করো, আমার জন্যও ব্যাপারটা সহজ নয়।'

'আপনার এই অজুহাতে আমি সন্তুষ্ট থাকব চাইছেন? ওহ্, মনে হয় তাই থাকতে হবে। সব সময় আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই দুনিয়াতে আমি এসেছি সুন্দর একটা ঘা নিয়ে; আমার সৌন্দর্য বলতে স্রেফ ওটুকুই।' 'বাচ্চা ছেলে বন্ধু আমার,' আমি তাকে বলি, 'তোমার সমস্যা হচ্ছে: তোমার দেখার চোখটা খুব সংকীর্ণ। আশপাশে যত রোগীর ঘর আছে, সব দেখা হয়ে গেছে আমার; তোমায় শুধু এটুকুই বলতে পারি: তোমার ঘায়ের অবস্থা অন্যদের মতো অত খারাপ নয়। কুড়ালের দুটো নিখুঁত বাঁকা আঘাতে এর জন্ম। অনেক লোক আছে যারা তাদের শরীরের পাশটা সামনে বাড়িয়ে দেয়, তারপরও বনে কুড়ালের আওয়াজ তাদের প্রায় কানেই আসে না, আর ওটা যে ওদের কাছে এগিয়ে আসছে সেটা বোঝার কথা তো বাদই দাও।' 'আসলেই তাই? নাকি আপনি আমার জ্বরের সুযোগ নিয়ে আমাকে যা-খুশি মিথ্যা বলছেন?' 'সত্যিই তাই, একজন সরকারি ডাক্তার হিসেবে জবান দিচ্ছি তোমাকে।' সে কথাটা বিশ্বাস করল, স্থির হলো। কিন্তু এবার আমি নিজে এখান থেকে কী করে বেরোব তা ভাবার পালা। ঘোড়াগুলো এখন বিশ্বস্ত দাঁড়িয়ে আছে ওদের জায়গায়। আমি কাপড়চোপড়, ফারের কোট আর ব্যাগ জড়ো করলাম তাড়াতাড়ি; ঠিকমতো সেজেগুজে বের হওয়ার জন্য নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই; ঘোড়া দুটো যে গতিতে এসেছে যদি সেই একই গতিতে ফেরত যায়, তাহলে তো এটা স্রেফ আমার এই বিছানা থেকে নিজের বিছানায় লাফ দেওয়ার ব্যাপার হবে। একটা ঘোড়া বাধ্যগত সেবকের মতো জানালা থেকে সরল; আমি আমার সব জিনিসের পুঁটলিটা ছুড়ে মারলাম ঘোড়ার গাড়িতে; ফারের কোটটা উড়ে যাচ্ছিল একটু বেশিই দূরে, এটার এক হাতা কোনোমতে একটা হুকে গিয়ে আটকে গেল। তাতেই চলবে। আমি লাফ দিয়ে উঠলাম ঘোড়ার পিঠে। লাগামগুলো ঢিলে হয়ে হেঁচড়ে চলেছে পেছন পেছন, দুই ঘোড়া বলতে গেলে একসঙ্গে জোড়াই নেই, গাড়িটা পেছনে কোথায় কোনোমতে সঙ্গে চলেছে, শেষমেশ ফারের কোটটা আসছে মাটিতে তুষারে ঘসটে। 'এবার চল বিদ্যুতের বেগে!' আমি চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু কোনো কাজ হলো না তাতে; বুড়োমানুষদের মতো ধীরে আমরা হামা দিয়ে চলেছি তুষারের তেপান্তরে; অনেকক্ষণ ধরে আমরা পেছন দিকে শুনতে পেলাম বাচ্চাদের নতুন কিন্তু ভুল এক গান:

ও রোগীরা সব, ফুর্তি-মনে থাকো
ডাক্তার শুয়ে আছেন বিছানায় তোমাদের পাশে!

এভাবে কোনোদিনও আমি বাড়ি পৌঁছাতে পারব না; আমার ফুলেফেঁপে উঠতে থাকা ডাক্তারি চর্চার এই শেষ; এর পরের জন এসে আমার যা আসে সব কেড়ে নেবে, কিন্তু লাভ কী – আমার জায়গা নিতে কোনো দিনও পারবে না সে; আমার বাড়িতে ঐ জঘন্য সহিস সবকিছু তোড়ফোঁড় করছে; রোজ নামের মেয়েটা তার শিকার; ওসব নিয়ে ভাবতে রাজি নই আমি। উলঙ্গ, সবচেয়ে দুর্ভাগা এই সময়ের তুষারের কাছে অসহায় উন্মুক্ত হয়ে,

পার্থিব এক চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি আর অপার্থিব ঘোড়াগুলো নিয়ে, এই বুড়ো লোক আমি উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার ফারের কোট গাড়িটার পেছনে থেকে ঝুলছে, কিন্তু ওটার কাছে পৌঁছাতে পারছি না আমি, আর আমার ব্যস্ত রোগীদের দলের কেউ আমাকে সাহায্য করতে একটা আঙুলও তুলছে না। জোচ্চুরি হলো আমার সঙ্গে! জোচ্চুরি হলো! রাতের-ঘন্টার ভুল আওয়াজে একবার সাড়া দিয়েছে কী – সেই ভুলের মাশুল দেওয়া শেষ হবে না, কোনো দিন।

উপরে, গ্যালারিতে

যদি ধরুন কোনো দুর্বল, যক্ষ্মারোগে ভোগা সার্কাসের চতুর ঘোড়সওয়ারি মেয়েকে তার এক নিষ্ঠুর, চাবুক-ঘোরানো রিংমাস্টার মাসের পর মাস কোনো বিশ্রাম না দিয়ে ক্লান্তিহীন সব দর্শকের সামনে তার পড়োপড়ো অবস্থার সার্কাসের ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ঘোরাতে থাকে আর ঘোরাতেই থাকে, ধরুন ওভাবে সে ঘুরছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, চুমু ছুড়ে মারছে দর্শকদের দিকে, দুলছে কোমরের উপর থেকে, আর ধরুন যদি এই খেলা দেখানো চলতেই থাকে – অর্কেস্ট্রার অবিরাম শিঙ্গাধ্বনি ও বায়ুচলাচল পথের গর্জনের সঙ্গে – অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতেই থাকে এক ধূসর ভবিষ্যতের দিকে, আর সঙ্গে থাকে উল্লাস করতে থাকা অসংখ্য হাতের হাততালির মিলিয়ে যাওয়া আর আবার উঠতে থাকা, যা সত্যিকার অর্থে বাষ্পেচলা-হাতুড়ির শব্দ ছাড়া আর কিছু নয় – তখন বোধ হয় উপরে ওই গ্যালারিতে বসা এক তরুণ দর্শক দৌড়ে নেমে আসবে গ্যালারির সিঁড়ির লম্বা ধাপ বেয়ে, সারির পর সারির মধ্য দিয়ে, ধুম করে ঢুকে পড়বে রিং-এর ভেতরে আর নিয়ত উপস্থিতমতো সুর বদলানো অর্কেস্ট্রার ট্রাম্পেট-বিউগলের ঝংকারের মধ্যে চিৎকার দিয়ে বলবে: ‘থামো!’

কিন্তু যেহেতু এমনটা ঘটে না, তাই দেখা যায় এক সুন্দরী মহিলা গোলাপি ও সাদা পোশাক পরে উড়ে আসে পর্দাগুলোর ফাঁক দিয়ে, তার জন্য ওগুলো গর্বের সঙ্গে ফাঁক করে ধরেছে তার বিশেষ ইউনিফর্ম-পরা সহচরেরা; সাকার্সের ম্যানেজার সুবিনয়ের সঙ্গে চেষ্টা করেন তার দৃষ্টি আকর্ষণের পশুর মতো হামা দেওয়া ভক্তিতে ফোঁসফোঁস শ্বাস ছাড়েন মহিলার দিকে; দরদ দিয়ে তাকে তুলে ধরেন ধূসর রঙের উপর গাঢ় ছোপ দেওয়া ঘোড়ার পিঠে, এমনভাবে যেন সে তার অতি আদরের নাতনি যে কিনা বিপজ্জনক কোনো যাত্রা শুরু করেছে; চাবুক দিয়ে ঘোড়াকে সংকেত দেওয়ার ব্যাপারে তিনি মন ঠিক করে উঠতে পারেন না; তবে শেষমেশ, মন না চাইলেও, বেশ জোরে সপাং এক চাবুক মেরে বসেন; মুখ হাঁ করে দৌড়াতে থাকেন ঘোড়াটার পাশে; তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ রাখেন সওয়ারি মহিলার প্রতিটা লাফের দিকে; সওয়ারির দক্ষতার ব্যাপারটা ঠিকভাবে বুঝে উঠতেই পারেন না; চিৎকার করে তাকে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে সাবধান করে দিতে থাকেন সামনের বিপদগুলোর ব্যাপারে; আংটা ধরে থাকা সহিসদের প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে উপদেশ দিতে থাকেন, যেন তারা সর্বোচ্চ সাবধানের সঙ্গে কাজ করে; আর সবচেয়ে বড় সেই ডিগবাজিটার আগে হাত দুটো উপরে তুলে অর্কেস্ট্রা দলকে মিনতি জানান বাজনা একটু থামানোর জন্য; তারপর এতক্ষণে, ছোট এই মহিলাকে তুলে আনেন তার কাঁপতে থাকা ঘোড়ার পিঠ থেকে, তাকে চুমু দেন দুই গালে, আর দর্শকরা যতই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানাতে থাকুক না কেন, তার কাছে তা যথেষ্ট মনে হয় না; ওই সময় মহিলা নিজে, ম্যানেজারের গায়ে হেলান দিয়ে, পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে, নিজের চারপাশে ধুলো উড়িয়ে, দুই হাত দুদিকে বাড়িয়ে, মাথা পেছনে নিয়ে, কামনা করতে থাকে পুরো সার্কাস

তার আনন্দের সঙ্গী হোক – যেহেতু ব্যাপারটা আসলে এমন, তাই, উপরে গ্যালারির ওই দর্শক রেলিংয়ে গাল ঠেকিয়ে রেখেছে আর সার্কাস শেষ হওয়ার কুচকাওয়াজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে গভীর কোনো এক স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাওয়ার মতো করে, সে চোখের পানি ফেলতে শুরু করেছে নিজেরই অজান্তে।

পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা

আমাদের পিতৃভূমি রক্ষার বিষয়ে মনে হয় অনেক কিছুতেই অবহেলা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে খুব বেশিদিন হয়নি যে আমরা মাথা ঘামিয়েছি, সব সময়ে বরাবরের মতো আমরা আমাদের যার যার কাজকর্ম চালিয়ে গেছি; কিন্তু এই ইদানীংকালে ঘটা কিছু ঘটনা আমাদের উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

সম্রাটের প্রাসাদের সামনে স্কোয়ারে আমার একটা মুচির দোকান আছে। ভোরে আমার দোকানের দরজা ঠিকমতো খোলাও হয়নি, দেখি অস্ত্রহাতে লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে এই স্কোয়ারে আসার প্রতিটি রাস্তার মাথায়। এরা আমাদের সৈন্য না, তবে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা সব উত্তরের যাযাবর। আমার বোঝার অগম্য কোনো একটা উপায়ে এরা একেবারে রাজধানী পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে, যদিও সীমান্ত থেকে এ অনেক লম্বা পথ। যেটাই বলি, কথা হচ্ছে ঐ যে ওরা; আর প্রত্যেক সকালেই দেখে মনে হচ্ছে ওদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

যেমন এদের অভ্যাস, এরা তাঁবু খাটিয়েছে খোলা জায়গায়, কারণ স্থায়ী বাড়িঘরে এদের পোষায় না। এদের সময় কাটছে তরবারি শান দিয়ে, তিরগুলো ছুঁচালো করার কাজে আর তাদের ঘোড়া চালানোর অনুশীলন করে করে। এরা এই শান্ত স্কোয়ারটাকে – যেটা সব সময় নিখুঁত সাফসুতরো করে রাখা হতো – রীতিমতো একটা শুয়োরের খোঁয়াড় বানিয়ে ছেড়েছে। আমরা মাঝেমধ্যে চেষ্টা করি আমাদের দোকানগুলো থেকে ছুটে গিয়ে সবচেয়ে নোংরার নোংরা জিনিসগুলো সরিয়ে দিতে, কিন্তু যত সময় যাচ্ছে আমাদের এ-ব্যাপারটা ততই কমে আসছে, কারণ ওটা করে কোনো লাভ নেই; তা ছাড়া, এতেও ঝুঁকিও আছে, আমরা ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে মরতে পারি, নয়তো চাবুকের বাড়িতে আহত হতে পারি।

এই যাযাবরদের সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব। এরা আমাদের ভাষা বোঝে না, সত্যি বলতে এদের নিজেদেরও কোনো ভাষা নেই বললেই চলে। এরা একে অন্যের সঙ্গে কথাটিথা বলে অনেকটা দাঁড়কাকের মতো করে। দাঁড়কাকদের এই কর্কশ তীক্ষ্ণ স্বর অবিরাম আমাদের কানে বাজতে থাকে। আমাদের জীবনধারা, আমাদের নানা প্রতিষ্ঠান – এসব এরা না বোঝে, আর না বুঝতে চায়। তার ফলে কোনো ইশারার ভাষাতেও এদের কোনো আগ্রহ দেখি না। আপনি আপনার চোয়াল জায়গা থেকে সরিয়ে দেন কি আপনার হাতের কবজি মুচড়িয়ে হাড়ের জোড়া থেকে খুলে ফেলেন, এরা তখনো আপনাকে বুঝতে পারেনি, আর কোনো দিন পারবেও না। প্রায়ই দেখা যায় এরা মুখ ভেংচাচ্ছে; তারপর এরা এদের চোখের সাদা অংশ দেখাবে আর মুখের ঘন গেঁজা দেখাবে, কিন্তু এমনটা করে এরা যে কিছু বোঝাতে চাইছে তা নয়, এমনকি কোনো হুমকিও নয়; এরা এমন করে স্রেফ এজন্যই যে এমনটাই করা এদের খাসলত। যেটারই এদের দরকার পড়বে, তা এরা নিয়ে নেবে। এটা বলা যাবে না, এরা কাজটা করে জোরজুলুমের মাধ্যমে। যখন এরা কোনোকিছু ছিনিয়ে নিতে আসে, আপনি তখন স্রেফ পাশে সরে দাঁড়ান আর সবকিছু ওদের হাতে ছেড়ে দেন। আমার দোকান

থেকেও ওরা ওদের ভাগের যা তা নিয়ে গেছে। কিন্তু আমার এ নিয়ে নালিশ করার বলতে গেলে কিছুই থাকে না, যখন দেখি, উদাহরণস্বরূপ বলছি, ওই ওখানের কসাইয়ের সঙ্গে তারা কী করেছে। সে তার বিক্রির মাল আনতেও পারেনি, তার আগেই এই যাযাবরগুলো তার কাছে থেকে সব কেড়ে নিয়েছে, তারপর গিলেছে গোগ্রাসে। এমনকি এদের ঘোড়াগুলোও মাংস খায়; প্রায়ই দেখা যায় কোনো সওয়ারি আর তার ঘোড়া শুয়ে আছে পাশাপাশি, দুজনেই দুই দিক থেকে খাচ্ছে মাংসের একটাই টুকরো। কসাই বেচারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, তার সাহস নেই মাংসের জোগান বন্ধ করার। আমরা এটা বুঝতে পারি, তাই আমরা চাঁদা তুলে সাহায্য করি তাকে। যাযাবরগুলো যদি মাংস না পায়, তাহলে কে জানে কী এদের মাথায় চড়ে বসবে; সেই অর্থে বললে, কে জানে এরা এদের রোজকার মাংস খেতে পেলেও বা কী করে বসতে পারে।

ক'দিন আগে এই কসাইর মাথায় একটা বুদ্ধি এল – আমি তো অন্তত পশু জবাইয়ের ঝামেলা থেকে বাঁচতে পারি; পরের দিন সকালে সে নিয়ে এল এক জ্যান্ত ষাঁড়। তাকে এই কাজটা দ্বিতীয়বার আর করতে দেওয়া যাবে না। মনে হয় এক ঘণ্টা হবে, আমি আমার দোকানের একদম পেছনে সোজা খড়ের উপর শুয়ে ছিলাম, আমার সব কাপড়চোপড়, কম্বল, কোলবালিশ গায়ের উপর চাপিয়ে – শুধু যেন আমাকে ষাঁড়টার ঐ তীব্র আর্তনাদ শুনতে না হয় সেজন্য; যাযাবরগুলো ওর শরীরের সব পাশ থেকে তাদের দাঁত দিয়ে ওর গায়ের মাংস খুবলে খাবে বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি যতক্ষণে দোকান থেকে বেরিয়েছি তার বেশ কিছু আগে থেকেই সব শান্ত সুনসান; মদের পিপার চারপাশে যেভাবে মাতালেরা শুয়ে থাকে, সেভাবেই এরা সবাই শুয়ে আছে ষাঁড়টার শরীরের উচ্ছিষ্ট ঘিরে – মহাতৃপ্ত।

ঠিক ওই সময়েই মনে হয় আমি স্বয়ং সম্রাটকে একঝলক দেখি তার প্রাসাদের অনেক জানালার একটাতে; তিনি সাধারণত কখনোই এই বাইরের দিকের ঘরগুলোয় পা রাখেন না, সব সময় তিনি থাকেন তার একদম ভেতর দিককার বাগানবাড়িতে; কিন্তু এবার তিনি দাঁড়িয়ে, কিংবা ওরকমই মনে হয় আমার, তার জানালাগুলোর একটায়, মাথা নিচু করে নিচে তার গেটের সামনের হট্টগোলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

'এবার কী ঘটবে?' আমরা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করি, 'কতকাল আমরা এই বোঝা, এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারব? সম্রাটের প্রাসাদ লোভ দেখিয়ে যাযাবরদের এখানে টেনে এনেছে, কিন্তু তারা জানে না কী করে এদের খেদাবে। গেট সব সময় তালা দেওয়া থাকছে; দ্বাররক্ষীরা, যারা আগে সব সময় বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে কুচকাওয়াজ করে ভেতরে ঢুকত আর বেরোতো, তারা এখন খিল-আঁটা জানালাগুলোর ওপাশেই থাকে। শত্রুর হাত থেকে পিতৃভূমি রক্ষার সব দায়িত্ব এখন আমাদের মতো এই কারিগর আর ব্যাপারীদের হাতে ন্যস্ত; কিন্তু অমন একটা কাজের কোনো যোগ্যতা আমাদের নেই; আর না আমরা কোনো দিন দাবি করেছি যে সে যোগ্যতা আমাদের আছে। ব্যাপারটা একটা ভুল-বোঝাবুঝি; আর আমাদের ধ্বংসও নেমে আসবে এ কারণেই।

আইনের দরজায়

আইনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক দারোয়ান। গ্রাম থেকে আসা এক লোক ঐ দারোয়ানের কাছে গিয়ে হাজির হয় আর তাকে আইনের কাছে ঢুকতে দেওয়ার জন্য বলে। কিন্তু দারোয়ান জানায় ঠিক এ মুহূর্তে তাকে ঢোকার অনুমতি সে দিতে পারবে না। মানুষটা চিন্তা করে, পরে জিজ্ঞাসা করে, এর মানে কি এমন যে ভবিষ্যতে কোনো দিন তাকে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব। 'তা সম্ভব,' বলে দারোয়ান, 'তবে এখন নয়।' যেহেতু আইনের কাছে পৌঁছার ঐ দরজা সব সময়ের মতো আজও খোলা আর দারোয়ান এক পাশে সরে গেছে, লোকটা ঘাড় নিচু করে দরজাপথের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করে ভেতরটা দেখতে। দারোয়ান তা দেখে হাসে আর বলে: 'এতই যদি লোভ হয় তো আমার নিষেধ সত্ত্বেও চেষ্টা করে দেখো না ভেতরে ঢোকার। কিন্তু মনে রেখো: আমি ক্ষমতাশালী। আর আমি হচ্ছি সবচেয়ে নিচুপদের এক দারোয়ান। ভেতরে হলের পরে হলে অন্য দারোয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকেই আগের জনের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। স্রেফ তৃতীয়জনের চেহারার দিকে তাকানোই এমনকি আমার সাধ্যে কুলোয় না।' গ্রাম থেকে আসা লোকটা এ রকম কঠিন কিছুর আশা করেনি; আইনের কাছে, সে ভাবে, সবারই সব সময় যাওয়ার অধিকার থাকা উচিত; কিন্তু এখন যেই সে আরো কাছের থেকে দারোয়ানকে দেখল – ফারের কোট পরা, লম্বা সুচাল নাক, মুখে লম্বা-পাতলা-কালো তাতারদের দাড়ি, সে সিদ্ধান্ত নিল – ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই তার জন্য বরং ভালো হবে। দারোয়ান তাকে বসার একটা টুল দিয়েছে, আর তাকে দরজার এক পাশে বসতে দিয়েছে। ওখানে সে বসে থাকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। অনেকবার সে চেষ্টা-চরিত্র করে ভেতরে ঢোকার, আর তার অনুনয়বিনয় শুনতে শুনতে দারোয়ান ক্লান্ত হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে দারোয়ান তাকে একটু জেরা করার মতো অনেককিছু জিজ্ঞাসা করে – তার বাড়ির ব্যাপারে ও অন্য আরো কিছু নিয়ে; কিন্তু ওগুলো স্রেফ পদস্থ লোকেদের ভাববাচ্যে কিছু জিজ্ঞাসা করার মতোই, আর প্রতিবারই সে এই একই কথা আবার বলে শেষ করে যে তাকে সে এখনো ঢুকতে দিতে পারবে না। লোকটা তার এই সফরের সব প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে, সে তার যা-কিছু আছে, যতটুকু মূল্যবানই তা হোক না কেন, সব ব্যয় করে দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিলের জন্য। দারোয়ান সব সময় তাকে যা দেওয়া হয় সব নেয়, কিন্তু নেওয়ার সময় বলে: 'আমি নিচ্ছি শুধু যেন তোমার মনে না হয় যে সব চেষ্টা তুমি করোনি'। অনেক বছর হয়ে গেছে লোকটা দারোয়ানকে দেখছে বিরামহীন। সে ভুলে গেছে অন্য দারোয়ানদের কথা, তার কাছে মনে হচ্ছে এই প্রথম দারোয়ানই তার আইনের কাছে যাওয়ার পথের একমাত্র বাধা। সে তার দুর্ভাগ্যকে গালমন্দ করে, প্রথমদিকের বছরগুলোয় প্রচণ্ডভাবে আর উঁচুগলায়; পরের দিকে, সে যখন বুড়ো হয়ে এসেছে, স্রেফ নিজের সঙ্গে ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট বিড়বিড়ানিই করে যায়। বাচ্চাদের মতো হয়ে পড়ে সে, দারোয়ানকে এই দীর্ঘকাল ধরে দেখতে দেখতে সে এমনকি দারোয়ানের ফারের

কলারের মাছিগুলোও চিনে ফেলে, মাছিগুলোর কাছেও সে মিনতি জানায় দারোয়ানের মন বদলাতে তাকে সাহায্য করার জন্য। অবশেষে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, সে জানে না তার চারপাশে আসলে কি অন্ধকার হয়ে আসছে, নাকি তার চোখ স্রেফ তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু ঐ অন্ধকারের মধ্যে সে আসলেই উপলব্ধি করতে পারে আইনের দরজাপথ থেকে ভেসে আসছে অনির্বাণ একটা দীপ্তি। এখন আর মরার বেশিদিন বাকি নেই তার। মৃত্যুর আগে তার মনের মধ্যে জড়ো হয় এতগুলো দীর্ঘ বছরের সব অভিজ্ঞতা, ওরা সব মিলে একটা প্রশ্নে রূপ নেয়, যে প্রশ্ন সে এখন পর্যন্ত কোনো দিন দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করেনি। সে তাকে কাছে আসতে বলে, কারণ তার শরীর আর চলে না, উঠে দাঁড়াবার কোনো শক্তি তার নেই। দারোয়ানকে একেবারে তার শরীরের উপর ঝুঁকে পড়তে হয়, কারণ এদের দুজনের শরীরের উচ্চতার ফারাকে, লোকটার জন্য অসুবিধা তৈরি করে, অনেক বদল ঘটে গেছে। 'এখনো তুমি কী জানতে চাচ্ছ?' দারোয়ান জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার তৃপ্তি কোনো দিন মেটানো যাবে না।' 'নিশ্চিত যে প্রত্যেকেই চেষ্টা করে আইনের কাছে পৌঁছুতে,' লোকটা বলে, 'তাহলে এটা কী করে হয় যে এই এতগুলো বছরে আমি ছাড়া আর অন্য কেউ একবারও আইনের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল না?' দারোয়ান বুঝতে পারে লোকটা তার জীবনের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, তার অকেজো হয়ে যাওয়া কানে কথাগুলো যেন পৌঁছায় তাই গলা উঁচু করে সে, জোরে চিৎকার করে তাকে বলে: 'এখানে অন্য কেউ কোনো দিন ঢুকতে পারত না, কারণ ঢোকার এই দরজা শুধু তোমার একার জন্যই ছিল। এখন আমি ওটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি।'

শেয়াল ও আরব

মরূদ্যানে তাঁবু গেড়েছি আমরা। আমার সঙ্গীরা ঘুমিয়ে। একজন আরব, লম্বা সাদা পোশাক পরা একজন, পাশ দিয়ে হেঁটে গেল; সে তার উটগুলো দেখাশোনা করছিল, আর এখন যাচ্ছে তার ঘুমানোর জায়গায়।

ঘাসে পিঠ দিয়ে শুলাম আমি; ঘুমাতে চাচ্ছি; পারলাম না; দূরে একটা শেয়ালের বিলাপ করা চিৎকার; আমি আবার উঠে বসলাম। আর অনেক দূরের ঐ জিনিসটা হঠাৎ খুব কাছে চলে এল। আমার চারপাশে গিজগিজ করছে একপাল শেয়াল; জ্যোতিহীন সোনালি চোখগুলো চকচক করছে আর নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে; রোগা শরীরগুলো সুশৃঙ্খল ও ক্ষিপ্র গতিতে নড়ছে, যেন কোনো চাবুকের নির্দেশ মেনে চলছে ওরা।

আমার পেছনদিক থেকে এল একটা, আমার হাতের নিচ দিয়ে গুঁতো মেরে গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে এল যেন সে আমার গায়ের গরম নিতে চাচ্ছে; তারপর সে প্রায় চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়াল আর বলল:

'এ অঞ্চলের সবচেয়ে বুড়ো শেয়াল আমি। তোমাকে এখানে আজও অভ্যর্থনা জানাতে পারছি এজন্য আমি খুশি। আমি আশা করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, কারণ আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি যুগযুগ ধরে, শুনে বলা যাবে না কত যুগ; আমার মা অপেক্ষা করে ছিল, তার মা, তার একেবারে সব শেয়ালের প্রথম মা পর্যন্ত সব মা। বিশ্বাস করো!'

'অবাক হচ্ছি শুনে,' আমি বললাম, ধোঁয়া দিয়ে শেয়াল তাড়ানোর জন্য তৈরি করে রাখা কাঠের গাদায় আগুন দিতেও ভুলে গেছি, 'আমি শুনে খুবই অবাক হয়ে গেলাম। দূরের উত্তর থেকে আমি স্রেফ ভাগ্যচক্রেই এখানে এসেছি, আমার সফরও বেশি দিনের জন্য না। তা তোমরা শেয়ালেরা চাচ্ছটা কী?'

আর আমার এই কথাগুলো – খুব সম্ভব বেশি বন্ধুত্বের স্বরে বলে ফেলেছি – তাদের যেন সাহস দিল, তারা আমার অনেক কাছে চলে এল গোল হয়ে; দ্রুত শ্বাস ফেলছে তারা সবাই, তাদের গলায় গরগর শব্দ হচ্ছে।

'আমরা জানি,' সবচেয়ে বুড়োটা শুরু করল, 'তুমি উত্তর থেকে এসেছ; আমাদের আশাও ঠিক এটার কারণেই। ঐ উত্তরের লোকেরা সবকিছু যেভাবে বোঝে তা এই এখানের আরবেরা বোঝে না। তুমি তো বোঝোই, তাদের শীতল ঔদ্ধত্যের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধির সামান্য কোনো ঝলকও নেই। তারা পশু মারে তাদের খাওয়ার জন্য, আর পচা মাংসে তাদের কী অভক্তি।'

'এত জোরে কথা বোলো না,' বললাম আমি, 'কাছেই আরবরা শুয়ে আছে।'

'তুমি বোধ হয় আসলেই এখানে একদম নতুন,' শেয়াল বলল, 'না হলে তুমি জানতে কোনো দিন কোনো ইতিহাসে নেই যে কোনো শেয়াল কোনো আরবকে ভয় পেয়েছে। তোমার কেন মনে হয় যে আমরা ওদের ভয় পাব? ওদের মতো প্রাণীদের সঙ্গে যে

আমাদের থাকতে পাঠানো হয়েছে, তাই কি যথেষ্ট দুর্ভাগ্য নয়?'

'হতে পারে, হতে পারে,' বললাম আমি, 'আমার চিন্তা থেকে অনেক দূরের এমন কোনোকিছুর বিচার করা আমার ধাতে নেই; শুনে মনে হচ্ছে খুব খুবই পুরোনো কোনো বিবাদ এটা; তার মানে সম্ভবত রক্তে বয়ে আসছে এটা; তার মানে রক্তেরই দরকার হবে এটা মিটাতে।'

'তুমি অনেক বুদ্ধিমান,' বুড়ো শেয়াল বলল; আর এবার তারা সবাই শ্বাস ফেলছে আরো ত্বরিত বেগে; এদের ফুসফুসে চাপ পড়ছে, তার পরও সোজা দাঁড়িয়ে আছে এরা; এদের হাঁ-করা মুখ থেকে একটা বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে, আমাকে মাঝেমধ্যে দাঁত কিড়মিড়িয়ে সহ্য করতে হচ্ছে তা, 'তুমি অনেক বুদ্ধিমান; তুমি যা বললে তা আমাদের একটা প্রাচীন শিক্ষার সঙ্গে মিলে যায়। অতএব, আমাদেরকে ওদের খুন ঝরাতে হবে, তবেই শেষ হবে এই বিবাদ।'

'ওহ্!' আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলাম, যতটা চেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি উত্তেজিত হয়ে, 'ওরা তো নিজেদের রক্ষা বোঝে; ওদের বন্দুক দিয়ে ওরা তোমাদের গুলি করে মারবে দলে দলে।'

'আমাদের বোঝোনি তুমি,' সে বলল, 'মানুষদের স্বভাবমতোই, মনে হচ্ছে দূরের উত্তরের মানুষদেরও একই স্বভাব। ওদের মেরে ফেলার সামান্য কোনো চিন্তা আমাদের মাথায় নেই। নীল নদের সমস্ত পানি দিয়ে ধুলেও আমাদের কোনো দিন সাফ করা যাবে না। ওদেরকে জ্যান্ত দেখলেই তো আমরা বিশুদ্ধ একটু বাতাসের জন্য দৌড়ে পালাই, সোজা মরুভূমির দিকে, তাই তো ওখানেই আমাদের ঘর।'

আর আমাকে ঘিরে থাকা সব শেয়াল, দূর থেকে এসে নতুন অনেকে যোগ হয়েছে বলে সংখ্যায় তারা এখন আরো বেড়েছে, মাথা নিচু করল তাদের সামনের দু-পায়ের মাঝখানে, থাবা দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল পা দুটো; দেখে মনে হচ্ছে তারা তাদের ঘৃণা লুকাতে চাচ্ছে, এমন তীব্র সেই ঘৃণা যে আমার মনে হলো একটা বিরাট লাফ দিয়ে এদের এই দল থেকে সোজা পালিয়ে চলে যাই।

'তাহলে কী করবে বলে ঠিক করেছ তোমরা ?' আমি জিগ্যেস করলাম, চেষ্টা করছি উঠে দাঁড়াতে, কিন্তু পারলাম না; আমার পেছন দিকে দুটো কমবয়সী জানোয়ার আমার কোট আর জামায় তাদের দাঁত বসিয়ে রেখেছে; আমাকে বসেই থাকতে হলো। 'ওরা তোমার কাপড়ের পেছনটা ধরে আছে,' গম্ভীর গলায় ব্যাখ্যা করল বুড়ো শেয়াল, 'এটা তোমাকে সম্মান দেখানোর জন্যই।' 'ওদের আমাকে ছাড়তে বল!' আমি চিৎকার দিলাম, একবার তাকাচ্ছি বুড়ো শেয়ালের দিকে, একবার কমবয়সীগুলোর দিকে। 'আরে, অবশ্যই ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে,' বুড়োটা বলল, 'যদি তাই তুমি চাও, তা-ই হবে। কিন্তু অল্প একটু সময় লাগবে, কারণ আমাদের প্রথামত ওরা একেবারে গভীর কামড় বসিয়ে দিয়েছে, এখন তো প্রথমে আস্তে আস্তে চোয়াল ঢিলা দিতে হবে। এই মাঝের সময়টুকুতে তুমি যদি একটু আমাদের আবেদনটা শুনতে।' 'তোমাদের আচরণের কারণে আমি কোনোকিছু ঠিক

শোনার মেজাজে নেই,' আমি বললাম। 'আমাদের অমার্জিত আচরণের জন্য আমাদের ওপর খেপে যেয়ো না,' সে বলল, আর প্রথমবারের মতো তার স্বভাবসিদ্ধ কান্নার মতো সুরে বলতে লাগল, 'আমরা হতভাগা জন্তু, দাঁত ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই; আমরা যা-ই করতে চাই, ভালো হোক বা মন্দ, সবকিছুর জন্য ওই দাঁতই আমাদের একমাত্র ভরসা।' 'তাহলে চাচ্ছটা কী তোমরা, বল?' আমি বললাম, মাথা সামান্য ঠান্ডা হয়েছে।

'প্রভু,' সে চিৎকার দিল, সব শেয়ালও একসঙ্গে বিলাপধ্বনি করে উঠল; অনেক দূরের থেকে যেসব ধ্বনি এল তা আমার কানে শুনতে লাগল কোনো গানের সুরের মতো। 'প্রভু, আপনাকে এই বিবাদ থামাতে হবে, এই বিবাদে পৃথিবী ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রাচীন শেয়ালেরা বলে গেছে যে আপনিই সেই মানুষ যে কিনা এই বিবাদ থামাতে পারবে। আরবদের হাত থেকে আমরা মুক্তি চাই; চাই সেই বাতাস, যাতে আমরা শ্বাস নিতে পারব; দিগন্তের পুরো বৃত্তটা ওদের বিদায়ে শুদ্ধ হয়ে যাক তা-ই চাই; আরবের চাকুতে জবাই হওয়া কোনো ভেড়ার আর্তচিৎকার আর কোনো দিন না; যত ধরনের পশু আছে সবাই যেন শান্তিতে মরতে পারে; ওই পশুদের রক্ত খেয়ে পুরো খালি করে দেওয়ার সময়, এবং ওদের হাড় পর্যন্ত চেটেপুটে সাফ করার সময় আর যেন কেউ আমাদের ত্যক্ত না করে। শুদ্ধতা, শুদ্ধতাই আমাদের একমাত্র কামনা।' – এবার ওরা সব একসঙ্গে কাঁদছে আর ফোঁপাচ্ছে – 'কী করে আপনি এসব এই পৃথিবীতে সহ্য করে যাবেন, আপনার হৃদয় তো শুদ্ধ, আপনার পেটের ভেতরটা তো বিশুদ্ধ! ওদের সাদা কাপড়গুলো নোংরা; ওদের কালোগুলোও নোংরা; ওদের দাড়ি দেখলে তো বমি আসে; ওদের চোখের কোনাগুলো দেখলে থুতু ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না; আর যখন ওরা হাত উপরে তোলে, জাহান্নামের গর্তটা হাঁ করে থাকে ওদের বগলে। সুতরাং, ও প্রভু, সুতরাং, ও আমাদের ভালোবাসার প্রভু, আপনার এই মহা শক্তিশালী হাত দুটো দিয়ে, আপনার এই মহাশক্তিশালী দুই হাতের সাহায্যে, এখানের এই কাঁচিটা তুলে নিন আর ওদের গলা কেটে দিন!' তারপর বুড়োর মাথা নাড়িয়ে একটা ইশারা, একটা শেয়াল এল দুলতে দুলতে, ওটার মুখের কোনার দিকের একটা দাঁত থেকে ঝুলছে বহু পুরোনো মরচেতে ঢাকা একটা ছোট সেলাইয়ের কাঁচি।

'আচ্ছা, শেষমেশ তাহলে আমরা কাঁচি পর্যন্ত চলে এসেছি, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট!' আমাদের কাফেলার আরব নেতা চিৎকার করে বলল, সে বাতাসের উল্টোদিকে হামা দিয়ে দিয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছে, আর এখন তার বিশাল চাবুক দিয়ে সপাং সপাং মারছে।

সব শেয়াল দৌড়াল পড়িমড়ি, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল একসঙ্গে জড়ো হয়ে; এতগুলো পশু একসঙ্গে এমন শক্ত আর এটেসেঁটে আছে যে তাদের দেখতে লাগছে একটা ছোট দেয়ালের মতো, তাদের ঘিরে আছে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা আলেয়ার আলো।

'তাহলে, প্রভু, এবার তো মচ্ছবটা আপনিও দেখলেন আর শুনলেন,' বলল আরব, ততটাই মন খুলে হাসছে যতটা তার জাতির ভারিক্কি ভাবের মধ্যে কুলায়। 'তো তুমি জানো, ওই জন্তুগুলো কী চাচ্ছে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'নিঃসন্দেহে, প্রভু,' সে বলল,

'এ তো সবার জানা; যতদিন ধরে আরবেরা আছে তত দিন এই কাঁচি মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত ওটা আমাদের সঙ্গে ঘুরবে। প্রত্যেক ইউরোপিয়ানকেই কাঁচিটা দেওয়া হয়েছে মহান কাজটা সমাধা করার জন্য; তারা যে ইউরোপিয়ানকেই দেখে, তাকেই ভাবে ইনিই সেই লোক যাকে পাঠানো হয়েছে এই মহান কাজ শেষ করার জন্য। কাণ্ডজ্ঞানহীন এক আশা ওদের, ওই জানোয়াগুলোর; ওরা বোকা, সাক্ষাৎ বোকা। আর সেজন্য আমরা ওদের ভালোও বাসি; ওরা আমাদের কুকুর; আপনার যা আছে তার চেয়ে সুন্দর কুকুর। এবার দেখুন, গত রাতে একটা উট মরেছে, আমি মড়াটা এখানে আনার ব্যবস্থা করেছি।'

চার বাহক হাজির হলো, বিশাল মড়া ছুড়ে ফেলল আমাদের সামনে। ওটা মাটিতে পড়তেও পারেনি, শেয়ালগুলো তাদের ডাক ছাড়া শুরু করেছে। যেন তাদের প্রত্যেককেই টানা হয়েছে এক অদৃশ্য দড়ি দিয়ে, এভাবে আসছে তারা ইতস্তত করতে করতে, ওদের পেট ঘসটাচ্ছে মাটিতে। আরবদের কথা তারা ভুলে গেছে, তাদের ঘৃণার কথাও ভুলে গেছে; সবকিছু মিলিয়ে গেছে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা এই দুর্গন্ধ ছড়ানো মড়ার সামনে। একটা শেয়াল এরই মধ্যে উটের গলা ধরে ঝুলে পড়েছে, প্রথম কামড়েই সোজা দাঁত বসিয়ে দিয়েছে ধমনিতে। এর শরীরের প্রতিটা মাংসপেশি কেঁপে কেঁপে আর ঝাঁকি দিয়ে উঠছে, ঠিক একটা খ্যাপাটে ছোট পাম্পের মতো – নাছোড়বান্দা ও আশাহীন একটা পাম্প – ওটার যেন কাজ পড়েছে দাউদাউ জ্বলতে থাকা কোনো আগুন নেভাবার। এরই মধ্যে মড়াটার উপর ওরা সব ঢিবির মতো উঁচু হয়ে হামলে পড়েছে, প্রত্যেকে ব্যস্ত আগের শেয়ালটার মতো একই রকম।

এ সময়ে নেতা তার চাবুক চালাতে শুরু করল শেয়ালগুলোর পিঠের উপরে – শাঁ শাঁ করে, এদিকে ওদিকে। তারা মাথা তুলেছে; এখনো তাদের পরম খুশি ও ঘোরের মধ্যে অর্ধেক ডুবে আছে; এবার দেখল তাদের সামনে আরবরা দাঁড়িয়ে; এবার চাবুকের কামড় পড়ল তাদের লম্বা চোয়াল বরাবর; তারা পেছন দিকে লাফিয়ে, সরে গেল কিছুটা। কিন্তু তাতে কী, এরই মধ্যে উটের রক্তে মাটিতে নালা হয়ে গেছে, ভাঁপ উঠছে উঁচুতে; ওটার শরীরের নানা জায়গাই ছিঁড়ে ফেড়ে হাঁ হয়ে আছে। তারা আর লোভ সামলাতে পারল না; আবার একবার ফিরে এল; আবার একবার নেতা তার চাবুক তুলল; আমি তাকে হাত ধরে আটকালাম।

'আপনিই ঠিক, প্রভু,' সে বলল, 'ওরা ওদের কাজ করুক; তা ছাড়া, তাঁবু গোটানোরও সময় হয়ে এসেছে। যা হোক, আপনি তো ওদের দেখলেন এবার। অদ্ভুত জন্তু সব, নাকি? আর আমাদের কত ঘৃণা করে ওরা!'

খনি পরিদর্শন

আজ প্রধান প্রকৌশলীরা আমাদের দেখতে নিচে নেমে এসেছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ জারি করেছেন নতুন একটা টানেল খোঁড়ার কাজ শুরু করতে হবে, তারপরই এসেছে এই প্রকৌশলীদের দল – প্রাথমিক জরিপ সারবার উদ্দেশ্যে। এরা বয়সে কত কম, কিন্তু এ-বয়সেও একজন আরেকজন থেকে কত আলাদা! এরা সব গড়ে উঠেছে স্বাধীনভাবে, আর এরকম কম বয়সেও এদের মধ্যে কেমন সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে যার যার নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো।

একজন, কালো চুলের ও প্রাণবন্ত ধরনের, সব দিকে তাকাচ্ছে, সবকিছুর দিকে।

দ্বিতীয় একজনের হাতে নোটপ্যাড, হাঁটতে হাঁটতে নোট নিচ্ছে, তাকাচ্ছে চারপাশে, পার্থক্য বিচার করছে, আবার লিখছে আরো কিছু।

তৃতীয় একজন, তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে – এর ফলে তার সবকিছুই দেখতে লাগছে টান টান, টেনশনে ভরা – হাঁটছে শক্ত খাড়া হয়ে, কী এক গাম্ভীর্য তার আচরণে; শুধু তার অবিরাম ঠোঁট কামড়ানো দেখেই না বোঝা যাচ্ছে কেমন অধৈর্য আর বাঁধ-না-মানা বয়সের এক যুবক সে।

চতুর্থজন তৃতীয়জনকে কীসব ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে, যদিও সে তার কাছে ঐ ব্যাখ্যা চেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না; সে তৃতীয়জনের চেয়ে খাটো, তার পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে কোনো তদবিরকারীর মতো, তার তর্জনী উঁচুতে তুলে মনে হচ্ছে চারপাশে যা যা আছে সবকিছু নিয়ে সবিস্তারে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চম জন, সে-ই মনে হচ্ছে দলের মধ্যে পদের দিক থেকে সবার বড়, কাউকে সঙ্গে হাঁটতে বোধহয় মানা করে দিয়েছে; এই এক্ষুনি সে সামনে, এই আবার একেবারে পেছনে; পুরো দল তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছে; এর চেহারা ফ্যাকাশে আর স্বাস্থ্য দুর্বল; দায়িত্বের ভারে এর দু-চোখ কেমন কোটরে ঢুকে গেছে; মাঝেমধ্যে সে কপালে হাত ঠেকিয়ে চিন্তা করে নিচ্ছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম জন হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, সামনে একটু ঝুঁকে, মাথা একসঙ্গে করে খুব অন্তরঙ্গ কোনো আলাপ সারছে এরা; এটা যদি এরকম সুস্পষ্ট আমাদের কয়লাখনি না হতো, সবচেয়ে গভীর এক টানেলে আমাদের কাজের জায়গা না হতো, তাহলে এই রোগা, পিণ্ডাকৃতি নাকওয়ালা, মুখে দাড়ি ছাড়া এই ভদ্রলোকদের দেখে যে-কারো মনে হতো, এরা কমবয়সী একদল কেরানি। এ দলের একজন নিজের মনে হাসছে বিড়ালের মতো গরগর আওয়াজ করে; অন্যজন, সেও হাসছে, সে-ই বলছে বেশিরভাগ কথা, আর তার হাত খুশিমতো ঝাঁকিয়ে কেমন যেন সময়ের তাল রেখে চলেছে কথা বলতে বলতে। এ দুজন তাদের চাকরির ব্যাপারে কত নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বেগ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের খনি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এদের গুরুত্বের প্রমাণ (যদিও বয়সে এরা তরুণ) এরা এরই মধ্যে কত

ভালোভাবেই না দিয়েছে যে, এরকম এক জরুরি পরিদর্শনে এসেও, আর একেবারে এদের বসের দুচোখের সামনেই এরা কেমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে এদের ব্যক্তিগত আলাপ সালাপ, কিংবা অন্তত এমন কোনো আলাপ যার সঙ্গে এই এখনকার কাজের কোনো যোগাযোগ নেই। নাকি আসলে এমন হতে পারে যে এদের এই এত হাসাহাসি আর এই গা ছাড়া ভাব আসলে একটা ধোঁকা – বাস্তবে কোনো সত্যিকারের দরকারি বিষয়ই এদের চোখ এড়াচ্ছে না? এ জাতীয় ভদ্রলোকদের ব্যাপারে নিশ্চিত করে কোনো উপসংহার টানার ঝুঁকি বলতে গেলে কেউই নেবে না।

অন্যদিকে এটা প্রশ্নাতীত যে অষ্টমজন, যতখানি তার কাজে নিবিষ্ট আর বিষয়ে-উপস্থিত তার সঙ্গে অন্য কারোই তুলনা চলে না, নিঃসন্দেহে তা সে ঐ দুজন বা অন্য যে-কারো থেকে বেশি। যেখানেই যাচ্ছে, সেখানেই কোনোকিছু ছুঁয়ে দেখতে হবে তাকে, ছোট এক হাতুড়ি দিয়ে টোকা দিতে হবে, মনে হচ্ছে অনন্তকাল সে এই হাতুড়ি তার পকেট থেকে বার করছে আর ফের ঢুকিয়ে রাখছে। প্রায়ই ধুলোর মধ্যে, তার এই সুন্দর পোশাক সত্ত্বেও, হাঁটু দিয়ে বসছে সে, টোকা দিচ্ছে মাটিতে, তারপর আবার যেতে যেতে টোকা দিচ্ছে খনির দেয়ালে ও মাথার উপরের ছাদে। একবার সে মেঝেতে শুয়ে পড়ল টান টান হয়ে, স্থির পড়ে থাকল; আমরা ভাবা শুরু করেছি যে নিশ্চিত কোনো কিছু ঘটেছে তার; কিন্তু তারপর তার ছিপছিপে শরীরটায় একটা ছোট ঝাঁকি দিয়ে লাফ মেরে সে আবার উঠে দাঁড়াল দুই পায়ে। তার মানে কোনো একটা কিছুর পরীক্ষা করছিল সে। আমাদের ধারণা আমাদের এই খনি আমরা চিনি, এর শিলার স্তর বিষয়েও জ্ঞান রাখি, কিন্তু এভাবে এই প্রকৌশলী সাহেব লাগাতার কী নিরীক্ষা-অন্বেষণ করে চলেছে তা আমাদের মাথায় আসে না।

নবম জন একটা বাচ্চাদের চার চাকার স্ট্রলারের মতো জিনিস ঠেলে নিয়ে চলেছে, ওটার ভেতর সব মাপজোঁকের যন্ত্রপাতি। প্রচণ্ড দামি জিনিস ওগুলো; একদম সেরা তুলো-গজের মধ্যে বসানো। স্ট্রলার ঠেলার কাজ আসলে কোনো পিয়ন-টিয়নের হওয়ার কথা, কিন্তু ওরকম কারো ওপর ভরসা রাখা যায়নি। রীতিমতো একজন প্রকৌশলীই দরকার পড়েছে স্ট্রলার ঠেলতে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এ কাজ সে করছে খুশিমনেই। মনে হয় এর বয়সই সবার চেয়ে কম, সম্ভবত এখনো সে যন্ত্রপাতিগুলো ভালোভাবে চেনেও না, তাতে কী, একনাগাড়ে সে তাকিয়ে আছে ওগুলোর দিকে; এতে করে মাঝেমধ্যে খনির দেয়ালে প্রায় ধাক্কা খেয়ে বসার জোগাড় হচ্ছে তার।

কিন্তু স্ট্রলারটার পাশে হাঁটছে অন্য আরেকজন প্রকৌশলীও, তার কারণেই দেয়ালে ধাক্কা খাওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে ওটা। এটা স্পষ্ট যে এই লোক যন্ত্রপাতিগুলো একদম বিশদভাবে চেনে-জানে, দেখেও মনে হচ্ছে সে-ই আসলে আছে ওগুলোর দায়িত্বে। একটু পর পর স্ট্রলার না-থামিয়েই সে হাতে তুলে নিচ্ছে কোনো একটা যন্ত্র, ওটার ভেতরে তাকাচ্ছে, ওটার স্ক্রু খুলছে বা বন্ধ করছে, ওটা ঝাঁকি দিচ্ছে বা টোকা দিচ্ছে, কানের মধ্যে ধরছে, শুনছে; আর শেষে, স্ট্রলার ঠেলতে থাকা লোকটা যেই একটু থেমে দাঁড়াচ্ছে (এমনটা সে করছে নিয়মিতই), ছোট জিনিসটা, যেটা দূর থেকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না

ঠিকমতো, সে আবার রেখে দিচ্ছে স্ট্রলারে, খুব সাবধানে, ওটার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়। এই প্রকৌশলীর আচরণ একটু আধিপত্যসুলভ, কিন্তু সে যদি তা হয়ও,তা স্রেফ ওই যন্ত্রগুলোর কারণেই। তার আঙুলের নীরব ইশারায় আমাদের, স্ট্রলারের কমপক্ষে দশ-পা আগে থাকতেও, স্ট্রলার চলার পথ করে দিতে সরে যেতে হচ্ছে, এমনকি যখন পাশে সরার মতো কোনো জায়গা নেই, তখনো।

এই দুই ভদ্রলোকের পেছনে আসছে পিয়নমতো সহচরটা, কোনো কাজ নেই তার। এই ভদ্রলোকেরা – বোঝাই যায় যে তাদের বিশাল জ্ঞানের কারণে – তাদের আচরণের মধ্যে থেকে বহু আগেই যখন কিনা সব অহমিকা ঝেড়ে ফেলেছে, এই পিয়নকে দেখলে কিন্তু মনে হচ্ছে ওগুলো সব সে জড়ো করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে বসেছে। তার শরীরের পেছনে একটা হাত গুঁজে দিয়ে, আর অন্যটা তার ইউনিফর্মের সুন্দর কাপড় কিংবা গিল্টি করা বোতামগুলোতে বোলাতে বোলাতে, সে অনবরত মাথা নেড়ে চলেছে একবার ডান দিকে, একবার বাঁয়ে, তার ভাবটা এরকম যেন আমাদের কাছ থেকে সে বোধ হয় সালাম পেয়েছে, কিন্তু তার ঐ বিরাট উঁচু অবস্থানের কারণে, সে আসলে নিশ্চিত হতে পারছে না আমরা সত্যি তা তাকে দিয়েছি কি না। এটা তো আর বলতে হয় না যে তাকে এ রকম কোনো সালাম-টালাম আমরা দিইনি, যদিও তার চেহারা দেখে আপনার প্রায় এমনই ধারণা হবে যে আমাদের খনি-কোম্পানির অফিস-পিয়ন হতে পারার মধ্যে সত্যি তাক লাগানো কোনো ব্যাপার আছে। কোনো সন্দেহ নেই, এ ব্যাটা সামনে গেলে ওর পেছনে আমরা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করছি, তবে যেহেতু কোনো বজ্রপাতেরও ক্ষমতা নেই তাকে পেছনে ফেরায়, তাই যেভাবেই হোক আমাদের কাছে সে এক বোধের অগম্য চরিত্র হিসেবেই রয়ে গেল।

আজ আর বেশি কোনো কাজকর্ম হবে না; নিত্যদিনের কাজে আজকের এই বাধা লম্বা সময় ধরে চলেছে; এরকম একটা পরিদর্শনের তোড়ে সব কাজের চিন্তা মাথা থেকে উড়ে যেতে বাধ্য। তার চেয়ে বরং আমাদের সবারই লোভ হচ্ছে, ওখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকি ঐ ভদ্রলোকদের দিকে যারা এখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন পরীক্ষামূলক-টানেলের অন্ধকারের মধ্যে। তা ছাড়া, আমাদের শিফট্ও তো আর কিছুক্ষণ পরেই শেষ হচ্ছে; তারা যখন ফিরে আসবে তখন আমরা আর এখানে থাকব না।

পাশের গ্রাম

আমার দাদা বলতেন: 'জীবন আশ্চর্য রকমের ছোট। এখন যখন আমি পেছন ফিরে তাকাই, দেখি আমার স্মৃতিতে সবকিছু এত ঘন হয়ে আছে যে আমি, উদাহরণ হিসেবে বলছি, আমি বলতে গেলে বুঝতেই পারি না কীভাবে কোনো যুবক মনস্থির করে সে ঘোড়ায় করে পাশের গ্রামে যাবে, কীভাবে এ ব্যাপারে তার কোনো ভয় হবে না যে – সম্ভাব্য যেকোনো দুর্ঘটনার কথা বাদই দিলাম – একটা স্বাভাবিক, সুখী জীবনের পুরো সময়কালও ওরকম এক সফরের জন্য একেবারেই যথেষ্ট নয়।'

সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা

কথিত আছে, সম্রাট তার মৃত্যুশয্যায় তোমার কাছে, কেবল তোমার কাছে – তুমি, যে তার এক দুর্ভাগা প্রজা, যে কিনা সাম্রাজ্যের সূর্য থেকে পালিয়ে যাওয়া এক ক্ষুদ্র ছায়ামাত্র – নির্দিষ্ট করে সেই তোমার কাছেই পাঠিয়েছেন একটি বার্তা। বার্তাবাহককে তিনি তার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে বলেছেন, তারপর ফিসফিস করে তাকে বার্তাটা দিয়েছেন; এই বার্তা নিয়ে তার এতই উদ্বেগ যে তিনি বাহককে আবার সেটা তার নিজের কানে ফিসফিস করে পুরো শোনাতেও বাধ্য করেছেন। নিজের মাথা একবার নাড়িয়ে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, হ্যাঁ, বাহক যা বলল তা ঠিক আছে। আর তার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে জড়ো হওয়া সব মানুষজনের সামনে – পথে বাধা তুলে দাঁড়ানো সব দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে, সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য যত মানুষ তাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐ উপরে উঠে যাওয়া, প্রশস্ত সিঁড়িপথ ধরে – এদের সবার সামনে, তিনি বার্তাবাহককে রওনা করিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ বার্তাবাহক বের হলো তখুনি সফরে; শক্তিশালী, ক্লান্তিহীন এক মানুষ সে; একবার এই হাত সামনে বাড়িয়ে, আরেকবার ওই হাত, সে দৃঢ়ভাবে সামনে আগাতে লাগল জনতার ভিড় ঠেলে; যখনই সে তার পথে বাধা পাচ্ছে, আঙুল তুলে তার বুকের দিকে দেখাচ্ছে – ওখানে আছে সূর্যের প্রতীকী চিহ্ন; আর যে রকম অটল-অনড় স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তার কোনো তুলনা চলে না। কিন্তু জনতার ভিড় এত বিশাল; এদের বাসাবাড়ির কোনো শেষমাথা নেই; আহ্ সে যদি খোলা প্রান্তরে পৌঁছাতে পারত তাহলে কি ক্ষিপ্র বেগেই না সে উড়ে চলত, কত জলদিই না তুমি তোমার দরজায় শুনতে পেতে তার মুষ্টির রাজকীয় ধুপধুপ আওয়াজ। তার বদলে, সে যা করে যাচ্ছে তা কত খামোকা; এখনো সে কেবল একদম ভেতর-প্রাসাদের শোবার ঘরগুলো ঠেলেঠুলে পার হচ্ছে, কোনো দিন সে পারবে না এগুলোর শেষ মাথায় পৌঁছুতে; আর যদি সে-চেষ্টায় সে সফলও হয়, তাতে কোনোই লাভ হবে না; এবার সিঁড়ি বেয়ে তাকে লড়াই-সংগ্রাম করে নামতে হবে; আর যদি সে-চেষ্টায় সে সফলও হয়, তাতেও কোনো লাভ হবে না; প্রাসাদের উঠানগুলো পেরোতে হবে তাকে; আর উঠানগুলোর পরে দ্বিতীয়, বাইরের দিকের প্রাসাদ; আবারও কত সিঁড়িপথ, কত উঠান; আর আবার একটা প্রাসাদ; এমনটাই হাজার বছর ধরে, আরো আরো; তারপর সবশেষে যদি সবচেয়ে বাইরের তোরণ দিয়ে সে ছিঁড়েফেড়ে বেরও হয় – কিন্তু কোনো দিন, কোনো দিনও তা হবে না – এবার এখনো তার পার হওয়া বাকি থাকবে সাম্রাজ্যের রাজধানী, পৃথিবীর কেন্দ্র তা – উঁচু হয়ে আছে এর গাদে, এর তলানিতে। কেউই পারবে না সেখান থেকে বেরোবার পথ করে নিতে, আর একজন মৃত ব্যক্তির বার্তা নিয়ে তো একেবারেই না। – কিন্তু তুমি, তুমি বসো তোমার জানালায় আর যখন সন্ধ্যা নেমে আসে, স্বপ্ন দেখতে থাকো ঐ বার্তার।

পরিবারের প্রধানের জন্য একটি সমস্যা

এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে ওড্রাডেক শব্দটা এসেছে স্লাভোনিক ভাষা থেকে, আর তারা শব্দটার ব্যুৎপত্তিও ঐ ভাষার মধ্যেই খোঁজে। আবার অন্য অনেকে আছে যারা বলে এটা একটা জার্মান শব্দ; স্লাভোনিক দিয়ে সামান্য প্রভাবিত, এই যা। দুটো ব্যাখ্যাই অনিশ্চিত, তাই সম্ভবত এমন উপসংহার টানা ভুল না যে একটা ব্যাখ্যাও সঠিক নয়, বিশেষ করে যখন দুটোর কোনোটাই এই শব্দের অর্থ উদ্ধারে কোনো সাহায্য করতে পারছে না।

অবশ্য যদি বাস্তবেই ওড্রাডেক নামের কোনো প্রাণী না থাকত, তাহলে এই শব্দটি নিয়ে কেই বা মাথা ঘামাত? প্রথম দেখায় একে মনে হবে এক সমতল ও তারা-আকৃতির সুতোর নাটাই, আর সত্যিই একে দেখতে লাগে সুতো দিয়ে প্যাঁচানো কিছুর মতো; কিংবা বরং এমন কিছু যা দেখতে বহুদিন আগের কোনো সুতোর ছেঁড়া ছেঁড়া প্রান্তের মতো, বিচিত্র সব রং ও ধরনের, সব একসঙ্গে গিঁট বাঁধা, এমনকি একটা অন্যটার সঙ্গে জট পাকিয়ে আছে বলা যায়। তবে ওটা স্রেফ নাটাই নয়, কারণ তারার মাঝখান থেকে বেরিয়ে আছে একটা ছোট কাঠের ক্রসবার, সেটা থেকে আবার সমকোণে বেরিয়ে গেছে অন্য একটা ছোট ক্রসবার। এক পাশে পরের এই বার আর অন্য পাশে তারার এক বাহুর মাথা, এই দুয়ে মিলে পুরো জিনিসটা মাটিতে দাঁড়াতে পারে খাঁড়া হয়ে, মনে হবে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনার এমন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে যে এই কাঠামোটির নকশার মধ্যে আগে একটা প্রায়োগিক ব্যাপার ছিল আর তাই এর এখনকার চেহারাটা আসলে ভাঙা কোনো চেহারা। কিন্তু মনে হয় না ব্যাপারটা তেমন কিছু; অন্তত সেরকম কিছুর আভাস এর মধ্যে নেই; এর কোথাও কোনো চিড়-ফাট কিংবা ভাঙা-কাটার পরের অবশিষ্ট অংশ নেই যা দেখে ওরকম কিছু ভাবা যায়; পুরো জিনিসটাই নিশ্চিত মনে হবে অর্থহীন, তার পরও এর নিজের মতো করে সম্পূর্ণ। এর চেয়ে নির্দিষ্ট করে একে নিয়ে কিছু বলা অসম্ভব, কারণ ওড্রাডেক অস্বাভাবিক সচল আর একে ধরার কোনো উপায়ই নেই।

সে পালা করে বাস করে চিলেকোঠায়, সিঁড়িতে, বারান্দায় আর বাড়িতে ঢোকার পথটায়। কখনো এমন হয় যে একে কয়েক মাস দেখা যায় না; মানে আপনি অনুমান করে নিতে পারেন সে অন্য কোনো বাড়িতে গিয়েছে; কিন্তু তারপর নিশ্চিত একদিন সে আবার ফিরে আসে আমাদের বাসায়। মাঝেমধ্যে যখন আপনি, ধরুন, বেরিয়েছেন আপনার ঘর থেকে, আর একই সময় সে নিচে সিঁড়ির হাতলে ভর দিয়ে খাড়া হচ্ছে, তখন আপনার মন চাইবে এর সঙ্গে কথা বলি। স্বাভাবিক যে একে আপনি কোনো কঠিন প্রশ্ন করবেন না; সবাই একে – এর ক্ষুদ্র আকারের কারণে ব্যাপারটা আরো বেশি হয় – বাচ্চা হিসেবেই দেখে। 'কী নাম তোমার?' আপনি জিগ্যেস করলেন। 'ওড্রাডেক,' সে বলল। 'তা, তুমি থাকো কোথায়?' 'কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই,' সে বলল আর হাসল; কিন্তু তা এমন

একধরনের হাসি যা কেবল ফুসফুস না-থাকলেই হাসা সম্ভব – শুনতে অনেকটা ঝরা পাতার ঝিরঝির আওয়াজের মতো। সাধারণত আলাপের এখানেই শেষ। এমনও হতে পারে, সে হয়তো আপনাকে এত কিছু উত্তর করলই না; প্রায়ই সে বোবা হয়ে থাকে দীর্ঘদিন – তার শরীর যে কাঠ দিয়ে বানানো মনে হয়, সেই কাঠের মতো বোবা।

মিছেমিছি আমি মনে মনে ভাবি, ওড্রাডেকের ভাগ্যে কী আছে। ওর পক্ষে কি মরা সম্ভব? যা-কিছুরই মৃত্যু হয় তার আগে কোনো-না-কোনো লক্ষ্য থাকে, কোনো-না-কোনো ক্রিয়াকর্ম থাকে, দেখা যায় সেই ক্রিয়াকর্ম করতে গিয়েই তার ক্ষয় হয়েছে; ওড্রাডেকের বেলায় এ কথা খাটে না। তাহলে কি এমন হতে পারে যে দেখা যাবে একদিন ওড্রাডেক তখনো সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে – তার পেছনে ঝুলে ঝুলে আসছে সুতোর মাথাগুলো – হাজির হয়েছে আমার ছেলেমেয়ের আর আমার ছেলেমেয়েরও ছেলেমেয়ের পায়ের সামনে? কোনো সন্দেহ নেই, সে কারো কোনো ক্ষতি করে না; কিন্তু এই চিন্তা যে সে এমনকি আমার পরেও বেঁচে থাকতে পারে, এটা ভাবতে আমার কেমন যেন কষ্ট হয়।

এগারো ছেলে

আমার এগারো ছেলে।

প্রথম ছেলের চেহারায় বিশেষত্ব কিছু নেই, কিন্তু সে সিরিয়াস ও বুদ্ধিমান; তা সত্ত্বেও ওকে নিয়ে আমার কোনো উঁচু ধারণা নেই, যদিও আমি ওকে ভালোবাসি আমার অন্য সব ছেলের মতোই। ওর চিন্তাভাবনা আমার কাছে মনে হয় একটু বেশি সোজা। সে ডান-বাঁ কোনো দিকেই তাকায় না আর তার দৃষ্টি খুব দূরে যায় না; সে সারাক্ষণ ছুটে বেড়ায় তার চিন্তার সীমিত গণ্ডির ভেতরেই, কিংবা বলা যায়, এর মধ্যেই ঘুরপাক খায়।

দ্বিতীয় ছেলে দেখতে সুন্দর, পাতলা গড়নের, সুগঠিত শরীর; তরবারি খেলার সময় নিজেকে সে যেভাবে সামলায় তা দেখে ভালো লাগে। সেও বুদ্ধিমান বটে, আর পৃথিবীতে চলার কায়দায় দড়; অনেক কিছু দেখেছে সে, তাই যারা বাড়িতে থেকে গেছে তাদের চেয়েও আমাদের দেশজ গাছপালা-প্রাণীকুল এসব মনে হয় অনেক ভালো বোঝে সে। তবে তার এই গুণ যে কেবল, কিংবা প্রাথমিকভাবে, তার অনেক ভ্রমণের কারণে হয়েছে কোনোভাবেই তা বলা যাবে নয়; বরং এটার কারণ এই ছেলের অনুনকরণীয় সহজাত প্রতিভা, যে প্রতিভার ছাপ, উদাহরণস্বরূপ, যে-কারোই চোখ পড়বে যখন কেউ তার সেই চোখ-ধাঁধানো উঁচু থেকে পানিতে ডাইভ দেওয়া নকল করার চেষ্টা করবে, কত কত বার শরীর মুচড়িয়ে কিন্তু তার পরও সবকিছু, এত আবেগ নিয়ে শক্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখে সে। স্প্রিং-বোর্ডের একদম শেষ মাথা পর্যন্ত তার মতো করে ডাইভ দেওয়ার ইচ্ছা ও সাহস হয়তো ভালোভাবে বজায় থাকবে, কিন্তু তারপর তার নকলকারী ডাইভ দেওয়ার বদলে হঠাৎ বসে পড়বে আর হাত তুলে মাফ চাইতে থাকবে। তবে এসব সত্ত্বেও – যদিও পিতা হিসেবে আমার উচিত এ রকম এক ছেলে নিয়ে গর্ব হওয়া – তার প্রতি আমার অনুভূতি পুরোপুরি পক্ষপাতমূলক নয়। তার বাঁ চোখ ডানেরটার চেয়ে সামান্য ছোট, আর ওটা অনেক বেশি পিটপিট করে; কোনো সন্দেহ নেই, খুব সামান্য একটা খুঁত, যা বরং তার চেহারাকে দিয়েছে আরেকটু বাড়তি আত্মবিশ্বাস ও আত্মতৃপ্তির ছাপ, আর তার কাছে-যাওয়া-যায়-না এমন নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি ও তার ব্যক্তিত্বের নিখুঁত বৈশিষ্ট্যের কারণে কারো কাছেই ঐ ছোট, পিটপিট করা চোখকে কোনো খুঁত বলেও মনে হবে না। কিন্তু আমি, তার বাবা, তা-ই মনে করি। নিশ্চিত, তার এই শারীরিক খুঁত নিয়ে আমার কোনো কষ্ট নেই, আমার কষ্ট তার এই খুঁতের সঙ্গে কীভাবে যেন তাল মেলানো তার এক মানসিক অসমতা নিয়ে, ওটা তার রক্তের মধ্যে চলা এক বিষের মতো, তার জীবনের ছক – যা শুধু আমিই দেখতে পাই – সুসংহত করার এক বিশেষ অক্ষমতা নিয়ে। অন্যদিকে, বলতেই হবে, ঠিক এই বৈশিষ্ট্যই তাকে বানিয়েছে আমার সত্যিকারের পুত্র, কারণ তার এই দোষ একই সঙ্গে আমাদের পুরো পরিবারেরই দোষ, স্রেফ তার মধ্যে সেটা একটু প্রকট এই যা।

তৃতীয় ছেলেও একই রকম দেখতে সুন্দর, কিন্তু আমি যে ধরনের সুন্দর চেহারা পছন্দ করি তেমনটা নয়। তার সৌন্দর্য গায়কের সৌন্দর্য: বাঁকা ঠোঁট; স্বপ্নিল চোখ; এমন মাথা যার

সৌষ্ঠব ঠিকমতো ফুটে ওঠার জন্য পেছনে মঞ্চের পর্দা থাকার দরকার পড়বে; অতিরিক্ত রকমের চিতিয়ে থাকা বুক; দুই হাত যা ঝাপটা দিয়ে উপরে ওঠে ত্বরিত গতিতে, আর তারও বেশি ত্বরিত গতিতে নিচে নামে; দ্বিধাগ্রস্ত দুই পা, কারণ শরীরের ভার বইবার সামর্থ্য ওদের নেই। এর ওপরে আরো বলতে হয়: তার গলার স্বরে আছে অপূর্ণতা, ক্ষণিকের জন্য ওটা আপনাকে মিষ্টি কিছুতে ভোলাবে; সমঝদার বিচারক কান খাড়া করবে; কিন্তু একটু পরেই তা মিলিয়ে যাবে কোথাও। – সার্বিক বিচারে যদিও আমার খুব লোভ হয় যে এই ছেলেকে দেখিয়ে জাহির করে বেড়াই, তবু শেষমেশ আমার পছন্দ একে নেপথ্যেই রাখা; সেও নিজেকে সামনের দিকে বেশি ধাক্কা দেয় না, যদিও এ কারণে না যে নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সে জানে, বরং তার সরলতা থেকেই সে এমনটা করে। আরো বলতে হয়, আমাদের এই সময়ের সঙ্গে সে পুরো খাপ খায় না; মনে হবে সে যেন কেবল আমার পরিবারের কেউই না, অন্য কোনো পরিবারেরও একজন, যেটা তার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে বহু আগে, তাই প্রায়ই সে বিষণ্ন, কোনোকিছুই পারে না তার মনমেজাজ চাঙা করে তুলতে।

আমার চতুর্থ ছেলে সম্ভবত বাকি সবগুলোর চেয়ে বেশি সামাজিক। তার সময়ের জন্য একদম ঠিক একটা মানুষ; সবাই তাকে বোঝে; সবাই যেখানে দাঁড়িয়ে, তার দাঁড়ানোর মাটি সেটাই; আর প্রত্যেকেরই তার দিকে মাথা ঘুরাতে শখ হয়। খুব সম্ভব তার প্রতি সবার এই সর্বজনীন হ্যাঁ-বোধক ভাব তার চরিত্রে দিয়েছে একধরনের লঘুতা, তার চলাফেরার মধ্যে একধরনের স্বাধীনচেতা ভঙ্গি, তার বিচারবুদ্ধিতে একধরনের উদাসীনতা। তার অনেক ক'টা কথা আছে যা বারবার আওড়ানোর যোগ্য, কিন্তু কোনোভাবেই তার সব কথার ক্ষেত্রে এটা খাটে না, কারণ মোদ্দা কথা হলো যে সে ভোগে – আবারও বলছি – বাড়তি রকমের লঘুতায়। সে হচ্ছে ওরকম কোনো লোক যে মাটি থেকে উড়াল দিয়েছে চমৎকার, সোয়ালো পাখির মতো উড়ছে বাতাস কেটে, কিন্তু তাতে কী, শেষে দুঃখজনকভাবে গিয়ে পড়েছে নিষ্ফলা ধুলোয়, স্রেফ একটা শূন্য। এসব চিন্তাই এই ছেলের ব্যাপারে আমার সব আনন্দে ইতি টেনে দেয়।

পাঁচ নম্বর ছেলেটা দয়ালু ও ভাল; যতটা সম্ভাবনা দেখিয়েছিল, বাস্তবে অর্জন করেছে তার থেকে বেশি; আগে সে এতই তুচ্ছ কিছু ছিল যে তার উপস্থিতিতে যে-কারোরই আসলে একা থাকার অনুভূতি হতো; কিন্তু এসবের পরেও একধরনের সম্মানের একটা জায়গায় পৌঁছেছে সে। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তা কী করে সম্ভব হলো, আমি ঠিকভাবে জানিও না তখন উত্তরে কী বলব। হতে পারে, এই পৃথিবীর যুদ্ধরত শক্তিগুলোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পথ কেটে যাওয়ার সবচেয়ে ভাল পথই হচ্ছে – সারল্য; আর সরল নিষ্পাপ সে নিঃসন্দেহে। বরং একটু বোধ হয় বেশিই সরল। সবার সঙ্গেই বন্ধুর মতো মেশে সে। একটু বোধ হয় বেশিই বন্ধুত্বপূর্ণ। আমাকে স্বীকার করতেই হবে: মানুষ যখন আমার কাছে তার প্রশংসার গীত গায়, আমি খুশি হই না। আমার এই ছেলের মতো পরিষ্কার প্রশংসার যোগ্য কাউকে যদি ওভাবে প্রশংসা করা হয়, তাহলে তো মনে হবেই যে প্রশংসা পাওয়া খুব সহজ একটা বিষয়।

আমার ছয় নম্বর ছেলে, অন্তত প্রথম দেখায় মনে হবে, বাকি সবগুলোর চেয়ে বেশি গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে মাথা ঝুলিয়ে রাখবে নিচের দিকে, কিন্তু একই সঙ্গে সে আবার বাচাল প্রকৃতির। এই দ্বিমুখী স্বভাবের কারণে তার সঙ্গে চলা সহজ কথা নয়। যদি সে কখনো হেরে যায়, দেখা যাবে অদম্য এক বিষণ্ণতা গ্রাস করছে তাকে; আর যদি সে থাকে সবার ওপরে, তাহলে আরো বকবক করে জায়গাটা ধরে রাখছে। তার পরও, আমি অস্বীকার করব না তার মধ্যে একধরনের নিঃস্বার্থ আবেগের ব্যাপার আছে; সবার চোখের সামনে দেখা যায় সে নিজের ভাবনাগুলোর সঙ্গে এমনভাবে লড়াই করে চলেছে যেন সে আছে কোনো স্বপ্নের ঘোরে। সে অসুস্থ নয় – তার স্বাস্থ্য বরং বেশ ভালই বলতে হবে – কিন্তু কখনো সখনো, বিশেষ করে দিনের শেষে, হাঁটবে টলমল করে, তবু তার কোনো সাহায্যের দরকার হবে না, কখনোই পড়ে যাবে না সে। সম্ভবত তার শারীরিক বৃদ্ধিই ব্যাপারটার জন্য দায়ী, বয়সের তুলনায় সে খুব বেশি লম্বা। ফলে তার পুরো দেহসৌন্দর্যের মধ্যে একধরনের অপ্রীতিকর ব্যাপার চলে আসে, যদিও অনুপুঙ্খ দেখলে, যেমন তার হাত বা তার পা, আলাদা আলাদাভাবে ওরা চোখে পড়ার মতো সুন্দর। তবে তার কপালটা দেখতে সুন্দর বলা যাবে না; তার কপালের চামড়া ও হাড়ের কাঠামো দুটোই আমার কাছে লাগে যেন কুঁচকে রয়েছে।

সপ্তম ছেলেটা বোধ হয় অন্য সবগুলোর চেয়ে বেশি আমার। পৃথিবী তাকে সঠিক মূল্যায়নে অক্ষম; কেউ তার অদ্ভুত ধরনের রসিকতা বুঝতে পারে না। তাকে আমি অতিমূল্যায়ন করছি না; আমি জানি, সে সীমিত আর সামান্য; স্রেফ তার মূল্যায়ন না হওয়াই যদি পৃথিবীর ভুল হয়, তাহলে পৃথিবীর সৌন্দর্যের কোনো হানি হবে না। কিন্তু পারিবারিক পরিমণ্ডলের কথা যদি বলি, এই ছেলে ছাড়া থাকতে আমার ভালো লাগবে না। তার মধ্যে আছে বিশেষ ধরনের এক অস্থিরতা, কিন্তু প্রথার প্রতি শ্রদ্ধার কোনো কমতি নেই তার; অন্তত আমার হিসেবে খুব সফলভাবে এ দুটো বিষয় সে একসঙ্গে মিলিয়েছে, দুয়ে মিলে জন্ম দিয়েছে অকাট্য এক সম্পূর্ণতার। এটা সত্য যে তার নিজের কোনো ধারণা নেই এই সম্পূর্ণ জিনিসটা নিয়ে সে কী করবে; ভবিষ্যতের চাকা সে ঘুরিয়ে দেবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই; কিন্তু তার সামগ্রিক মেজাজ এতখানি উদ্দীপনা জাগাবে, এতখানি আশা জাগাবে যে বলার মতো নয়; আমি চাই তার বাচ্চাকাচ্চা হোক, ওদেরও অনেক সন্তান হোক। দুর্ভাগ্য যে এই চাওয়া পূরণ হওয়ার খুব একটা আশা দেখি না। আমি বুঝি কিন্তু একই সঙ্গে অপছন্দ করি এমন একধরনের আত্মতৃপ্তি নিয়ে – যার সঙ্গে তার ব্যাপারে চারপাশের সবাই যা বলে, তার কোনো মিলই পাই না – সে ঘুরে বেড়ায় নিজের মনে, মেয়েদের দিকে কোনো নজর দেয় না, যদিও কখনোই হারায় না তার রসবোধ।

আমার অষ্টম ছেলে নিয়ে আমার যত সমস্যা, যদিও আমি সত্যি করে জানি না কেন এমন হলো। সে আমার দিকে তাকায় অচেনা লোকের মতো, যদিও আমার তরফে তার প্রতি গভীর পিতাসুলভ টান আমি ঠিকই বোধ করি। সময় অনেককিছু সারিয়ে তুলেছে; আগে স্রেফ তার কথা মনে পড়লেই কেঁপে উঠতাম আমি। সে চলে গেছে তার নিজের পথে; আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করেছে; আমার কোনো সন্দেহ নেই, তার শক্ত

মাথার খুলি ও ছোট অ্যাথলেটের শরীর নিয়ে – শুধু ছোট থাকতে তার পা একটু দুর্বল ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সে সমস্যা এখন আর নেই – সে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে খুব ভালোমতোই পৌঁছাবে। প্রায়ই আমার মনে হয় তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনি; জিগ্যেস করি সবকিছু কেমন যাচ্ছে, কেন সে তার বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আর জীবনে সে কী করতে চায়; কিন্তু এরই মধ্যে সে এত দূরে চলে গেছে আর এত সময়ই পার হয়ে গেছে যে একইসঙ্গে এটাও মনে হবে, সবকিছু বরং যেমন আছে তেমনই থাকুক। আমার কানে আসে, আমার ছেলেদের মধ্যে একমাত্র সেই দাড়ি রেখেছে; তার মতো খাটো লোকে দাড়ি রাখলে কি ভালো দেখায়?

আমার নবম ছেলে খুব কেতাদুরস্ত, আর তার আছে মেয়েদের মন-গলানো এক চেহারা। এত গলে-পড়া চেহারা যে কোনো কোনো সময় এমনকি আমিও তাতে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি, যদিও আমি জানি ঐ স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য মুছে দেওয়ার জন্য আক্ষরিক অর্থে একটা ভেজা স্পঞ্জই যথেষ্ট। কিন্তু এই ছেলের অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েদের প্রলুব্ধ করার কোনো বাসনাই তার নেই; তার সারা জীবন সোফায় শুয়ে কাটাতে পারলেই সে খুশি, ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে সে তার মায়াবী চোখে তাকানোর ক্ষমতা নিঃশেষ করবে, কিংবা তার হিসেবে আরো ভালো হয়, যদি তার চোখের পাতার নিচেই ঐ মায়াবী দৃষ্টির অবলুপ্তি ঘটে। যখন সে তার এই প্রিয় ভঙ্গিমায় শুয়ে থাকে, তখন তার পছন্দ কথা বলা; কথা ভালোই বলে সে, সংক্ষেপে আর স্পষ্টভাবে; কিন্তু তার সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে না গিয়ে; এর বেশি যদি সে করতে যায় – তার চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে যা কিনা ঘটতে বাধ্য – তাহলে দেখা যাবে তার কথাগুলো ফাঁপা শোনাচ্ছে। আপনি যদি এটুকু আশা করতে পারতেন যে, তার ঢুলুঢুলু চোখ দিয়ে সে আসলেই দেখবে, তাহলে আপনি নিশ্চিত তাকে যথেষ্ট হয়েছে বলে এ-সময় ইশারা দিতেন।

আমার দশ নম্বর ছেলের খ্যাতি আছে অসৎ মানুষ হিসেবে। এটা আমি পুরো অস্বীকারও করি না, পুরো নিশ্চিতও করছি না। শুধু এটুকু নিশ্চিত যে চেহারায় তার বয়সের চেয়ে বেশি গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে কেউ যখন তাকে এগিয়ে আসতে দেখে – পরনে সব সময় শক্ত করে বোতাম আঁটা তার ঐ ফ্রক কোট, মাথায় পুরোনো কিন্তু যত্ন করে ব্রাশ-করা একটা কালো হ্যাট, চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি নেই, কেমন যেন বাইরে বেরিয়ে আসা চিবুক, চোখের পাতাগুলো দুচোখের ওপরে ভারী হয়ে ফুলে আছে, মাঝেমধ্যে হাতের দু-আঙুল ঠোঁটের উপর রাখছে – যে-কেউ তাকে এভাবে দেখলেই ভাববে: এই লোক একটা পুরোদস্তুর ভণ্ড। কিন্তু তারপর কেবল শুনুন তার কথা! কীরকম স্বচ্ছ উপলব্ধি; কীরকম বিচারবিবেচনা; একদম সংক্ষেপ আর একেবারে মূল বিষয়ে; আপনার প্রশ্ন সে থামিয়ে দিচ্ছে কেমন চতুর সূক্ষ্মতায়; পুরো পৃথিবীর সঙ্গে কেমন বিস্ময়কর, স্বতঃপ্রমাণিত আর প্রাণবন্ত এক মৈত্রী; এমন এক মৈত্রী যার কারণে তাকে ঘাড় আরো টান টান করতে হচ্ছে, মাথা আরো উঁচু করে রাখতে হচ্ছে। অনেকেই আছে, যারা নিজেদের খুব জ্ঞানী ভাবে; তাই তার এই বাহ্যিক চেহারা দেখে তাদের অসম্ভব

বিরক্তি হয় – সেই তারাও তার কথাতে কত বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তা হতে পারে, কিন্তু অন্য অনেকেই আছে তার বাহ্যিক চেহারা নিয়ে যাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, কিন্তু তার কথাকে তারা ভণ্ডামি মনে করে। আমি তার পিতা হিসেবে বলতে যাব না যে কারা বা কোনটা ঠিক, কিন্তু আমাকে মানতেই হবে, পরের যারা তাদেরকে আগের লোকদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখাটাই সমীচীন।

আমার এগারোতম ছেলে নাজুক প্রকৃতির, সম্ভবত সবগুলো ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্বল; কিন্তু তার দুর্বলতাকে ভুল বোঝা খুব সহজ; সময়ে সময়ে সে দেখা যায় বেশ শক্তিশালী ও দৃঢ়সংকল্প, তবে তা সত্ত্বেও দুর্বলতাই তার চরিত্রের মৌলিক বিষয়, এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু এই দুর্বলতা নিয়ে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই, এটা শুধু আমাদের এই পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকেই দুর্বলতা। সে অর্থে কি আকাশে ওড়ার ক্ষমতাও, উদাহরণস্বরূপ বলছি, একধরনের দুর্বলতা নয়? ওড়ার মধ্যেও তো আছে কেমন টলমলে, অস্থির পাখা ঝাপটানি আর দ্বিধাগ্রস্ত একটা ব্যাপার! আমার এই ছেলের আচরণও সেরকম কিছু। এগুলো কোনো পিতার জন্যই নিঃসন্দেহে সুখকর কোনো আবিষ্কার নয়; কারণ স্পষ্টতই এ ধরনের আচরণ একটা পরিবারে ভাঙন ধরাতে পারে। কখনো-কখনো সে আমার দিকে তাকায়, যেন বলতে চায়: 'তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব, বাবা।' তখন আমি মনে মনে বলি: 'ভরসা করার ব্যাপারে তুমি হচ্ছো আমার কাছে সবচেয়ে শেষের জন।' তখন তার চেহারা দেখে মনে হবে সে বলছে: 'ঠিক আছে, আমাকে অন্তত শেষের জনই হতে দাও।'

এই আমার এগারো ছেলে।

ভাইয়ের হত্যা

প্রমাণিত হয়ে গেছে যে খুনটা হয়েছিল এইভাবে:

এক পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাতে, নয়টার দিকে, শ্‌মার, খুনি, অপেক্ষা করতে লাগল রাস্তার সেই কোনাটাতে যেখানে ভেজে, তার শিকার, অফিস থেকে বাড়ি আসার পথে মোড় নেবে।

রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া যে-কারো হাড় পর্যন্ত জমিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু শ্‌মার পরে আছে শুধু পাতলা নীল একটা জামা; এমনকি তার জ্যাকেটের বোতামও লাগানো নেই। তার কোনো ঠান্ডা লাগছে না; তা ছাড়া, অনবরত হাঁটাহাঁটি করছে সে। খুন করার জন্য রাখা অস্ত্রটা, অর্ধেক বেয়নেট, অর্ধেক রান্নাঘরের ছুরি, তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা আর খাপ খোলা, যে-কারো চোখে পড়বে। চাঁদের আলোয় সে এটা পরীক্ষা করল; ছুরির ফলা ঝিকমিকিয়ে উঠল; শ্‌মারের তাতে মন ভরল না; সে ফুটপাতের ইটের গায়ে ওটা ঘসতে লাগল – ফুলকি উড়িয়ে; সম্ভবত তাতে খেদ হলো তার; সেই অনুশোচনা থেকে সে ছুরিটা তার জুতোর তলিতে ঘষতে লাগল বেহালার ছড়ের মতো করে; এ সময় সে দাঁড়িয়ে এক পায়ে, শরীর ঝুঁকে আছে সামনে, শুনছে নিজের জুতোয় ছুরি ঘষার শব্দ, আর একই সঙ্গে কান খাড়া করে আছে দুর্ভাগা পাশের রাস্তা থেকে কোনো শব্দ আসে কি না শুনতে।

কেন প্যাল্লাস নামের শৌখিন [illegible] ভদ্রলোক এ সবকিছু ঘটতে দিল, তাকিয়ে তাকিয়ে সব শুধু কাছে থেকে দেখল তার দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে? সে মানবপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছিল! কলার তুলে, তার প্রশস্ত শরীরটাতে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে, সে তাকিয়ে থাকল নিচে – রাস্তায় খুনের ঘটনাস্থলে, মাথা নাড়তে নাড়তে।

আর ওটা থেকে পাঁচ বাড়ি পরে, রাস্তার কোনাকুনি ওপাশে, রাতে পরার ঢিলা পোশাকের উপর শেয়ালের লোমের কোট চাপিয়ে, মিসেস ভেজে বাইরে তাকিয়ে আছে স্বামীর পথের দিকে, ভাবছে সে তো কখনো বাড়ি ফিরতে এত দেরি করে না।

অবশেষে ভেজে-এর অফিসের দরজার ঘন্টি বাজল, দরজার ঘন্টি হিসাবে আওয়াজটা অনেক বেশি; সারা শহর জুড়ে, একদম উপরে আসমান অবাধ প্রতিধ্বনিত হলো তা; আর এই পরিশ্রমী, রাতের-কর্মী ভেজে – তখনো তাকে দেখা যাচ্ছে না রাস্তা থেকে, তখনো শুধু ঘন্টির শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে সে এদিকে আসছে – রওনা দিল তার অফিস বিল্ডিং থেকে; ফুটপাতে গোনা যাচ্ছে তার শান্ত-চুপচাপ পায়ের শব্দ।

কোনোকিছু যেন দেখার বাকি না থাকে, প্যাল্লাস তাই তার জানালা থেকে অনেক বাইরে ঝুঁকে এল। ঘন্টির শব্দ শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে মিসেস ভেজে তার জানালা বন্ধ করলেন খটাং করে। শ্‌মার বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে; তখন তার শরীরের বাকি সব অংশ ঢাকা, শুধু মুখ ও হাত দুটো বেরিয়ে আছে, সে ওগুলো চেপে ধরে থাকল রাস্তার পাথরে; সবকিছু শীতে জমে যাচ্ছে, কিন্তু শ্‌মার উত্তেজনায় পুড়ছে।

দুটো রাস্তা যে-দাগে এসে ভাগ হয়েছে, ভেজে থামল সেখানটায়, তার হাতের

ছড়ি বাড়িয়ে দিল বাড়ি যাওয়ার রাস্তার দিকে। একটা খেয়াল। রাতের আকাশ, ঘন নীল আর সোনালি, তাকে মুগ্ধ ও খেয়ালি করে দিয়েছে। একদম সন্দেহমুক্ত মনে সে আকাশের ধেয়ানে আছে, একদম সন্দেহমুক্ত মনে সে মাথার হ্যাট উপরে উঠিয়ে, চুলে আঙুল চালাচ্ছে পেছনদিকে; উপরে আকাশে এমন কোনোই নকশা নেই যা দেখে সে নিজের একটু পরের ভবিষ্যৎটা জানতে পারবে; সবকিছু যার যার অর্থহীন, রহস্যময় জায়গায়। আপাতদৃষ্টিতে এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে ভেজে হাঁটতে থাকবে, কিন্তু সে হেঁটে গেল শ্‌মারের ছুরির দিকে।

'ভেজে!' পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে চিৎকার করে উঠল শ্‌মার, তার হাত উপরের দিকে বাড়ানো, ছোরা তীক্ষ্ণভাবে নিচুমুখো করা, 'ভেজে! জুলিয়া খামাখা অপেক্ষা করছে!' আর ডানদিক থেকে গলার মধ্যে, বামদিক থেকে গলার মধ্যে, এরপর তৃতীয়বার পেটের গভীরে ছুরি চালাল শ্‌মার। নর্দমার ইঁদুরের পেট ফেড়ে ফেললে যে শব্দ হয়, ভেজে ঠিক সেরকম শব্দ করল।

'শেষ,' বলল শ্‌মার, আর সবচেয়ে কাছের বাড়িটার সামনে ছুড়ে মারল তার অনর্থক রক্তমাখা বোঝা। 'ওহ্ খুন করার স্বর্গসুখ! মুক্তি, অন্য মানুষের রক্ত ঝরানোর উত্তুঙ্গ জোশ! ভেজে, বুড়ো রাতের পাখি, বন্ধু আমার, মদ খাওয়ার সাথি আমার, রাস্তার নিচে অন্ধকারে পড়ে থেকে তুই কেমন চুইয়ে চুইয়ে যাচ্ছিস। কেন তুই স্রেফ একটা রক্তমাখা থলি হলি না, তাহলে কেমন দাপাতাম তোর উপরে আর পুরো হাওয়া হয়ে যেতিস তুই। সব ইচ্ছা পূরণ হয় না, সব ফুল-ধরা স্বপ্ন বাস্তব হয় না, তোর ভারী মড়াটা এখানে শুয়ে আছে, আমার কোনো লাথিতেই ওটার কোনো খবর নেই। আমাকে তুই যে নিঃশব্দ প্রশ্ন করে যাচ্ছিস, তার আর কী মানে হয় রে?

প্যাল্লাসের বাড়ির দুই পাল্লার দরজা ধড়াম করে খুলে গেল; সে দাঁড়িয়ে চৌকাঠে, তার শরীরে খুবলাতে থাকা দুর্বার ক্রোধ কোনোমতে দমন করছে। 'শ্‌মার! শ্‌মার! সব দেখেছি, কিছুই বাদ পড়েনি।' প্যাল্লাস ও শ্‌মার একজন আরেকজনকে দেখতে লাগল। প্যাল্লাস সন্তুষ্ট; শ্‌মার কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

মিসেস ভেজে ছুটে আসছে, তার দু-পাশে মানুষের ভিড়, তার মুখ ভয়ানক আতঙ্কে বেশ বুড়িয়ে গেছে। তার পশুর চামড়ায় বানানো কোট খুলে পড়েছে, সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভেজের শরীরে; রাতের ঢিলে পোশাক পরা তার শরীরটা ভেজের, আর পশুর লোমের কোট – ওটা কবরের উপরের ঘাসের মতো ঢেকে আছে এই জুটিকে – ভিড়ের মানুষগুলোর।

শ্‌মার তার বিবমিষার শেষ দমকটুকু অনেক কষ্টে ভেতরে চেপে মুখটা রাখল পুলিশ কনস্টেবলের কাঁধে, যে কিনা দ্রুত পায়ে তাকে নিয়ে চলে গেল।

একটি স্বপ্ন

জোসেফ কে. স্বপ্ন দেখছে:

সুন্দর একটা দিন আর কে.-র মন চাইছে হাঁটতে বেরোতে। কিন্তু কয় কদমও যেতে পারেনি, এই মধ্যে সে পৌঁছে গেল কবরখানায়। ওখানের পথগুলো খুবই প্যাঁচানো নকশার, অবাস্তব রকমের বাঁক খাওয়া, কিন্তু ওরই একটা ধরে সে নেমে যাচ্ছে সরসর করে, যেন খরস্রোতা কোনো পানিতে ভেসে যাচ্ছে টানা, অবিচল এক গতিতে। কিছুটা দূর থেকে তার চোখ আটকে গেল কবরের একটা ঢিবির উপর, নতুন বানানো ঢিবি, ওখানে সে থামতে চাইছে। এই ঢিবির মধ্যে মুগ্ধ হওয়ার মতো কী যেন একটা আছে, তার মনে হচ্ছে ওখানে পৌঁছুতে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবার মাঝেমধ্যেই ঢিবিটা সে দেখতে পাচ্ছে না; অনেকগুলো পতাকা – একবার খুলছে, একবার বন্ধ হচ্ছে, প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খাচ্ছে একটা আরেকটার গায়ে – তার দেখার পথে বাধা হয়ে আছে; এই পতাকাগুলো যারা বয়ে নিচ্ছে তাদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে বিরাট কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান চলছে যেন।

তখনো সে তাকিয়ে আছে দূরে, কিন্তু হঠাৎই তার চোখে পড়ল সেই একই কবরের ঢিবিটা, তার পথের পাশে; সে আসলে ওটা অনেকখানি পেরিয়েও এসেছে। সে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ঘাসে নেমে গেল। যেহেতু লাফ দেওয়ার সময়ে তার পায়ের নিচের মাটি দ্রুত ছুটে সরে গেল, সে ভারসাম্য হারাল, এক হাঁটুর উপরে গিয়ে পড়ল ঠিক ঐ কবরের ঢিবির সামনে। দুজন লোক ওটার পেছনে দাঁড়ানো, তাদের মাঝখানে শূন্যে তারা ধরে আছে একটা কবর-ফলক; কে. ওখানে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফলকটা আচমকা ঠেলে ঢুকিয়ে দিল মাটিতে, ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল যেন মাটিতে গাঁথা। তক্ষুনি তৃতীয় এক লোক বের হলো একটা ঝোপের মধ্য থেকে; কে. সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল – একজন শিল্পী। তার পরনে শুধু ট্রাউজার আর যেনতেন করে বোতাম লাগানো একটা জামা; তার মাথায় একটা মখমলের টুপি; তার হাতে একটা সাধারণ পেনসিল, ওটা দিয়ে সে – এমনকি হেঁটে আসতে আসতেও – শূন্যে কোনো একটা কিছু লিখছে বা আঁকছে।

এবার সে কবর-ফলকের উপরের দিকে পেনসিলটা চালাতে এগিয়ে গেল; অনেক উঁচু এক পাথরের ফলক এটা, তাকে একটুও শরীর নোয়াতে হলো না; তবে তাকে সামনের দিকে গলা অনেক বাড়াতে হলো – কারণ কবরের ঢিবিটা তার ও পাথরটার মাঝখানে, আর ঢিবিতে পা ফেলতে চাচ্ছে না সে কোনোভাবেই। অতএব সে দাঁড়িয়ে আছে পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে, পাথরের সমতল গায়ে বাঁ হাতে ঠেস দিয়ে নিজেকে খাড়া রেখেছে। কী রকম এক দক্ষ চাতুরীর মাধ্যমে সে এই সাধারণ পেনসিল দিয়েই সক্ষম হলো সোনার অক্ষরে লেখা বানাতে; সে লিখল: 'এখানে শায়িত –'। প্রতিটা অক্ষরই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার ও সুন্দর, গভীরভাবে খোদাই করা আর সবচেয়ে নির্ভেজাল সোনায় বানানো। এই শব্দ দুটো লেখা শেষে সে কে.-র দিকে পেছন ফিরে তাকাল; কে. খুব চাচ্ছে দেখবে যে অক্ষর

খোদাইয়ের কাজটা কীভাবে এগোয়, তাই লোকটার দিকে তেমন নজরই দিচ্ছে না সে, স্থির তাকিয়ে দেখছে পাথরটা। নিশ্চিত, লোকটা আবার লেখা শুরু করার জন্য তৈরি হয়েছে, কিন্তু লিখতে পারল না সে, কী একটা যেন তাকে থামিয়ে দিয়েছে, তার হাত থেকে পেনসিল পড়ে গেল টুপ করে, সে আরো একবার কে.-কে দেখবে বলে ঘুরে গেল। এই দফা কে. তাকাল শিল্পীর দিকে, দেখল সে মহা বিব্রত, কিন্তু কেন তা কে. বুঝতে পারল না। শিল্পীর এর আগের সব উচ্ছলতা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এতে কে.-ও বিব্রত বোধ করতে লাগল; তারা দুজনে অসহায়ের দৃষ্টি বিনিময় করল; দুজনের মধ্যে কোনো মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, যা তাদের কারো পক্ষেই মীমাংসা করা সম্ভব না। ঠিক এই সময়ে কবরস্থানের গির্জায় একটা ছোট ঘণ্টা বাজতে শুরু করল, তবে শিল্পী তার ডান হাত উপরে তুলে ইশারা করতেই থেমে গেল ঘণ্টা। অল্প একটু পরে আবার বাজতে লাগল সেটা; এইবার খুব নিচু আওয়াজে; কিন্তু এইবার কাউকে কোনো বিশেষ অনুরোধ করতে হলো না, ঘণ্টা থেমে গেল নিজে নিজেই; ব্যাপারটা এমন যেন ঘণ্টা নিজের শব্দ নিজে পরীক্ষা করে দেখছিল। শিল্পীর দুর্দশা দেখে কে.-র অবস্থা সান্ত্বনাতীত, সে কাঁদতে শুরু করল, মুখ হাত দিয়ে ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। কে. শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শিল্পী, তারপর অন্য আর কোনো উপায় না খুঁজে পেয়ে ঠিক করল, যা-ই হোক, লেখাটা চালিয়ে যাবে। তার প্রথম ছোট টানটাতে হাঁফ ছেড়ে খুশি হলো কে., যদিও পরিষ্কার, শিল্পীকে এই টানটুকু দিতে নিজের অনেক অনীহা কাটিয়ে উঠতে হয়েছে; আর তার লেখাও আগের মতো অত সুন্দর নেই, বিশেষ করে মনে হচ্ছে সোনালি ব্যাপারটা হারিয়ে গেছে, লেখা কেমন মলিন আর টলমলে, অক্ষরের আকার বেঢপ বড়। অক্ষরটা 'জো', এরই মধ্যে লেখা প্রায় শেষ যখন শিল্পী উন্মত্ত হয়ে এক পা জোরে ঠুকল কবরের ঢিবির উপর, এত জোরে যে কবরের মাটি চারপাশে, উপরদিকে, শূন্যে ছিটকে গেল। কে. অবশেষে শিল্পীর মনের ভাব বুঝতে পেরেছে; তার মন বদলাবার মিনতি জানানোর জন্য আর সময় হাতে নেই; হাতের সবগুলো আঙুল দিয়ে সে মাটি খুঁড়ে চলেছে, বাধাহীন, স্বচ্ছন্দে খুঁড়ছে; সবকিছু মনে হচ্ছে আগের থেকেই সাজানো; মাটির পাতলা একটা স্তর ঢিবি করে রাখা হয়েছে শুধু লোক দেখানোর কাজে; ঠিক এর নিচেই একটা অত্যন্ত খাড়া দেয়ালের বড় গর্ত হাঁ করে আছে, আর ওটার মধ্যে – মৃদু একটা ঢেউয়ে তার পিঠের উপর চিৎ হয়ে যাওয়া শরীরে – ডুবে গেল কে.। তবে গর্তের তলদেশে যখন এরই মধ্যে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে ঐ গহন অতলে, তার মাথা তখনো বাইরে বেরিয়ে আছে গলার উপর থেকে, সে দেখল বাইরে, উপরে, তার নামটা প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতের টানে লেখা হয়ে যাচ্ছে, দৌড়ে যাচ্ছে পাথরের ফলকটায়।

এই দৃশ্যে বিমুগ্ধ-বিহ্বল হয়ে সে জেগে উঠল।

অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন

অ্যাকাডেমির সম্মানিত ভদ্র মহোদয়গণ!

আমার এর আগের শিম্পাঞ্জির জীবন নিয়ে আমাকে অ্যাকাডেমির কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে বলে আপনারা আপনাকে সম্মানিত করেছেন।

আমার আক্ষেপ, যেমন করে অনুরোধটা আমাকে সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে তা পূরণে আমি অসমর্থ। আমার শিম্পাঞ্জির জীবন সেই প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা, ক্যালেন্ডারের হিসেবে হয়তো খুব বেশি সময় না, কিন্তু আমাকে যেভাবে চার-পা তুলে লাফিয়ে আসতে হয়েছে সে হিসেবে অনন্তকাল – সেই আসার পথে পথে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে কিছু চমৎকার মানুষ, তাদের উপদেশ, হাততালি, অর্কেস্ট্রার বাজনা; তবে তার পরও আমি মূলত থেকে গেছি একা, যেহেতু আমার ঐ সব সঙ্গীই – রূপক অর্থে বলতে গেলে – সব সময়ে থেকে গেছে শিকগুলোর অনেক ওপাশে। এই অর্জন কখনোই সম্ভব হতো না যদি আমি একরোখার মতো আমার শেকড় ও আমার তরুণ বয়সের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইতাম। আমার প্রথম শাস্ত্রীয় নীতি হিসেবে আমি নিজের ওপর আরোপ করলাম নিজের সব ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিসর্জন; আমি, মুক্ত এক শিম্পাঞ্জি, নিজেকে সমর্পণ করলাম সেই জোয়ালে। এর ফলে কী হলো – আমার স্মৃতিগুলো আমার থেকে সরে যেতে লাগল দূরে, আরো দূরে। প্রথমদিকে – মানুষ যদি চাইত – আমার ফিরে যাওয়ার রাস্তা হয়তো খোলা ছিল, পৃথিবী বেড় দেওয়া আসমানের ঐ বিরাট তোরণপথ দিয়ে আমি হয়তো ফিরে যেতে পারতাম, কিন্তু আমার বিবর্তনের ধাপে ধাপে আমাকে যতই চাবকে সামনে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল, ঐ তোরণপথ ততই আরো নিচু, আরো ছোট হয়ে এল; মানুষের পৃথিবীতে আরো বেশি স্বচ্ছন্দ হলাম আমি, আরো বেশি নিভৃতে জায়গা পেলাম; আমার অতীত থেকে আমার উদ্দেশে ধেয়ে আসা ঝড়টা কমে এল; আজ আর ওটা ঝড় না, স্রেফ আমার গোড়ালি ঠান্ডা করা একটুখানি হাওয়া; আর দূরের যে ফুটো থেকে ঐ হাওয়াটা আসছে, যে ফুটো দিয়ে একদিন আমি এসেছি, সেটা এতই ছোট হয়ে গেছে যে আমার যদি অত দূর পেছনে যাওয়ার শক্তি ও ইচ্ছা থেকেও থাকে, তবুও ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে ঢোকাতে গেলে আমার শরীর থেকে সব লোম-পশমওয়ালা চামড়া আমাকে আগে খুলে নিতে হবে। সাফ সাফ বলতে গেলে – অলংকারবহুল কথাই পছন্দ আমার – সাফ-সাফ বলতে গেলে: ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিজেদের বানর-শিম্পাঞ্জির জীবনও, নিশ্চয় জানেন যে আপনাদের পেছনেও ওরকম একটা জীবন থেকে থাকতে পারে, আপনাদের থেকে ততটাই দূরের যতটা আমার থেকে দূরে আমার নিজেরটা। এই পৃথিবীতে হেঁটে চলা সবারই গোড়ালিতে ঐ একই চুলকানি: ছোট শিম্পাঞ্জি থেকে শুরু করে মহান ঐ একিলিস পর্যন্ত, সবার।

যা হোক, খুব সীমিত অর্থে আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া আর সেটাই আমি এখন করতে যাচ্ছি আনন্দের সঙ্গে। যে জিনিসটা আমি প্রথম শিখেছিলাম তা হলো হ্যান্ডশেক করা; হ্যান্ডশেক আন্তরিকতারই পরিচায়ক; আজ, আমার কর্মজীবনের এই চূড়ায় দাঁড়িয়ে, সেই প্রথম আন্তরিক হ্যান্ডশেকটা সম্পূর্ণ হোক আজকের আমার এই কথাগুলোর আন্তরিকতা যোগ হয়ে। অ্যাকাডেমির কাছে আমি যা বলতে যাচ্ছি তাতে প্রকৃত অর্থে নতুন কিছু হয়তো নেই, আমি জানি আপনাদের প্রত্যাশার অনেক পেছনে থাকব আমি, আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার এই বিবৃতি আপনাদের মনের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না – তারপরও আমার এই বিবৃতি থেকে আপনারা আগে শিম্পাঞ্জি ছিল কিন্তু এখন মানুষের পৃথিবীতে প্রবেশ করে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, এমন একজনের জীবন চলার পথ নিয়ে একটা সাধারণ ধারণা পাবেন। তার পরও, নিজের সম্বন্ধে আমার যদি পুরো আত্মবিশ্বাস না থাকত আর এই সভ্য দুনিয়ার সব বড় বিচিত্রানুষ্ঠান মঞ্চে আমি যদি এরকম সুনিশ্চিত-সুরক্ষিত অবস্থান অর্জন করতে না পারতাম, তাহলে নিচে যে সামান্য কথা কটা বলা হলো, তা বলার অধিকার আমার নিশ্চিতই থাকত না:

আমি এসেছি গোল্ড কোস্ট থেকে। আমার ধরা পড়ার গল্পটুকুর জন্য আমাকে ভরসা করতে হচ্ছে অন্যের কথার ওপর। হাগেনবেক নামের এক শিকার অভিযান ফার্ম একদিন – কথার কথায় বলে রাখছি, এই ফার্মের নেতা মানুষটার সঙ্গে তারপর এত দিনে কত যে ভালো ভালো রেড ওয়াইনের বোতল শেষ করেছি আমি! – একদিন নদীর পাশের ঝোপে লুকিয়ে ছিল, সন্ধ্যায় আমাদের একটা দলের সঙ্গে আমি ওখানে পানি খেতে নিচে নেমে এলাম। ওরা আমাদের ওপর গুলি চালাল; কেবল আমিই গুলি খেলাম; দুই দফা।

প্রথমবার আমার গালে; সামান্য আঘাত; কিন্তু ওর থেকেই তৈরি হলো একটা বড়, লোমহীন, লাল দাগ, যে কারণেই আমার নাম দেওয়া হলো – খুবই জঘন্য আর পুরোপুরি বেঠিক এক নাম – রেড পিটার। ছি! কোনো শিম্পাঞ্জিরই মাথা থেকে বোধ হয় এসেছে এই জঘন্য নাম – এতে মনে হচ্ছে এই সেদিন মারা যাওয়া, অল্প নামডাকওয়ালা সেই খেলা-দেখানো শিম্পাঞ্জি পিটারের সঙ্গে আমার ফারাক বুঝি স্রেফ আমার গালের ঐ লাল দাগটুকুই। কথার কথা বললাম আর কী!

দ্বিতীয় গুলি লাগল আমার কোমর ও পাছার নিচ দিকটায়; ওটা ছিল বেশ বড় আঘাত; আমি যে আজও একটু খুঁড়িয়ে হাঁটি তা আসলে ওই কারণেই। কিছুদিন আগে আমি একটা লেখা পড়লাম, কাগজে আমাকে নিয়ে লিখতে থাকা ঐ হাজার দশেক ফালতু-বকা লোকেরই একজন লিখেছে ওটা, ওই লেখায় সে বলতে চাচ্ছে, আমার শিম্পাঞ্জির স্বভাব আজও যায়নি; এর প্রমাণ হলো, দর্শকেরা আমাকে যখন দেখতে আসে, আমি নাকি ইচ্ছে করে তখন আমার প্যান্ট খুলে ফেলি, তাদের দেখাতে চাই যে কোথায় গুলিটা ঢুকেছিল। ওই ব্যাটার লেখার হাতের প্রতিটা আঙুল এক-এক করে গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। যার সামনে ইচ্ছে আমার প্যান্ট আমি খুলব, যার সামনে খুশি, সেটা আমার ইচ্ছা; ওখানে

সুন্দর পরিপাটি একগোছা লোমের আস্তর ছাড়া, আর একটা ক্ষত ছাড়া – এই প্রসঙ্গে আমরা আসুন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে বিশেষ এক শব্দই স্পষ্ট করে বরং ব্যবহার করি, তবে আশা করি আপনারা কেউ তা ভুল বুঝবেন না – দায়িত্বজ্ঞানহীন এক গুলি থেকে, দুর্বৃত্ত এক গুলি থেকে তৈরি হওয়া একটা ক্ষত ছাড়া ওখানে আর কিছুই কেউ খুঁজে পাবে না। সবকিছুই সবার চোখের সামনে খোলা, সাফ-সাফ; লুকানোর তো কিছু নেই। প্রশ্নটা যখন সত্যের, তখন তো উন্নতচেতা যে-কেউই ভাষা-রুচি ইত্যাদির বিশুদ্ধতা পাশে সরিয়ে রাখবে। তবে, দর্শকেরা আসার পর ঐ প্রতিবেদনের লেখক ধরুন তার নিজের প্যান্ট খুলল, সেটা নিশ্চিত একদমই আলাদা একটা ব্যাপার হবে, সে যে তা করে না তার জন্য আমি তার তারিফই করছি। তা-ই যদি হয়, তাহলে আমাকেও সে তার ওই সহৃদয় অনুভূতিগুলো থেকে রেহাই দিক!

গুলি খাওয়ার পরে আমি জেগে দেখি – এখান থেকেই ধীরে ধীরে শুরু আমার স্মৃতি ফিরে আসা – হাগেনবেক্ কোম্পানির জাহাজে দুই ডেকের মাঝখানে একটা খাঁচায় আমি বন্দী। এটা কোনো চারপাশ ঘেরা সাধারণ শিক দেওয়া খাঁচা ছিল না; বদলে এর ছিল তিনটে পাশ, একটা বাক্সের সঙ্গে লাগানো; বাক্সটাই ছিল খাঁচার চার নম্বর পাশ। পুরো জিনিসটা এত নিচু ছিল যে দাঁড়ানো যায় না, আর আড়ে এত চাপা যে বসা যায় না। অতএব আমাকে বসতে হতো মেঝে ছুঁয়ে, উবু হয়ে, ভাঁজ হওয়া হাঁটু বিরামহীন কাঁপত, আর এর সঙ্গে আমার মুখ থাকত – যেহেতু আমি প্রথমদিকে কাউকে দেখতে চাইতাম না, চাইতাম সব সময় অন্ধকারে বসে থাকি – বাক্সের দিকে ফেরানো, আমার পিঠের দিকে খাঁচার শিকগুলো মাংস কেটে ঢুকে যেতে চাইত। বুনো জন্তুদের আটকে রাখার এই পদ্ধতি প্রথম কিছুদিনের জন্য সঠিক পদ্ধতি হিসেবে ধরা হয়, আর আজ, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কথাটা আসলেই সত্যি।

কিন্তু সেই তখন আমি এভাবে ভাবতাম না। জীবনে প্রথমবারের মতো দেখলাম যে আমার বেরোবার কোনো পথ নেই; অন্তত সোজা সামনের দিকে কিছু নেই বাক্সটা ছাড়া, তক্তার পরে তক্তা লাগানো শক্ত করে। তবে মানছি, তক্তাগুলোর মাঝখানে একটা ফাঁক ছিল, প্রথম যখন আমার এটা চোখে পড়ে আমি না-বুঝেই বোকার মতো খুশিতে চিৎকার দিয়ে ফাঁকটাকে স্বাগত জানাই, কিন্তু পরে দেখি, ওটা এমনকি লেজ ঢোকানোর মতোও বড় না, আর কোনো শিম্পাঞ্জির সেই শক্তি নেই যে ওটাকে আরো বড় বানায়।

আমার যারা দেখাশোনা করত তাদের কাছ থেকে পরে শুনেছি, আমি নাকি খুবই সামান্যই হইচই করতাম, অস্বাভাবিক রকমের কম; ওটা থেকেই তারা এই উপসংহারে এল যে হয় আমার মারা যাওয়ার আর বেশি বাকি নেই, না-হয় আমারই – প্রথম দিককার এই সংকটময় সময় একবার কাটিয়ে উঠতে পারলে – সম্ভাবনা আছে প্রশিক্ষণ পর্বে খুব বাধ্যগত থাকার। আমি সময়টা কাটিয়ে উঠতে পারলাম। চাপা কান্না, কষ্টকর মাছি তাড়ানো, ক্লান্তিকর কোনো নারকেল চেটে যাওয়া, বাক্সের দেয়ালে মাথা দিয়ে বাড়ি মারতে থাকা, যে-ই কাছে আসছে তার দিকে জিভ বের করে দেওয়া – নতুন জীবনে এগুলোই

ছিল আমার প্রথম দিককার একমাত্র কাজ। কিন্তু এ সবকিছুর মধ্যেই কেবল একটা, একটাই মাত্র অনুভূতি: বেরোবার পথ নেই। শিম্পাঞ্জি হিসেবে তখন আমার এই যে অনুভূতি তা আজ আমার পক্ষে কেবল মানুষের ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব, তাতে করে ঘটনার বিবরণ ভুল হতে বাধ্য; আমার পক্ষে তো এখন আর সেই পুরোনো শিম্পাঞ্জি-সত্যের নির্ভুলতায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তার পরও আমি যা বলছি তা যে সেই সত্যেরই মোটামুটি কাছাকাছি কিছু, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যখনকার কথা বলছি তার আগে পর্যন্ত আমার সব সময়ই বেরোবার কত কত পথ ছিল, আর এখন একটাও নেই। আমার সব পথ রুদ্ধ। এরা যদি আমাকে পেরেক দিয়েও গেঁথে রাখত, আমার নড়াচড়া করার স্বাধীনতা কিন্তু এ-ই থাকত, এর চেয়ে কম আবার হবে কী করে? কিন্তু তা কেন? পায়ের আঙুলের ফাঁকে চুলকে চুলকে ক্ষত করে ফেল, কারণ খুঁজে পাবে না। শরীর পেছনে গরাদে ধাক্কা দিতে থাকো যতক্ষণ না প্রায় কেটে দু-টুকরো হয়ে যাচ্ছ, কারণ খুঁজে পাবে না। আমার কোনো পথ খোলা ছিল না, কিন্তু আমাকে একটা পথ বের করতেই হতো, কারণ তা ছাড়া আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব লাগছিল। সারা দিন পিঠ ঠেকিয়ে আছি ঐ বাক্সে – না, কোনো সন্দেহ নেই আমি তাতে নিশ্চিত শেষ হয়ে যেতাম। কিন্তু হাগেনবেক্ কোম্পানিতে তো শিম্পাঞ্জিরা সারা দিন বাক্সে পিঠ ঠেকিয়েই থাকে – ভালো, তাহলে শিম্পাঞ্জি হয়ে থাকা বন্ধ করে দিলেই হয়। কেমন পরিষ্কার, সুন্দর-সংহত চিন্তা, আমি নিশ্চিত আমার পেট দিয়েই এত সুন্দর একটা চিন্তা করে উঠতে পারলাম, পেট দিয়ে, শিম্পাঞ্জিরা চিন্তা করে ওভাবেই।

আমার আশঙ্কা, পথ খোলা থাকা বা বেরোবার পথ বলতে আমি ঠিক কী বোঝাচ্ছি তা আপনারা হয়তো ধরতে পারছেন না। এই শব্দগুচ্ছ আমি ব্যবহার করছি এর সবচেয়ে সাধারণ ও সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অর্থে। ইচ্ছে করেই আমি এড়িয়ে যাচ্ছি 'স্বাধীনতা' শব্দটা। চারধারে উপলব্ধি হতে থাকা স্বাধীনতার ঐ প্রবল অনুভূতির কথা বলছি না আমি। ওরকম অনুভূতির সঙ্গে আমার হয়তো পরিচিতি ছিল আগে, শিম্পাঞ্জি জীবনে, আর অনেক মানুষ আমি দেখেছি যারা ঐ অনুভূতির জন্য হা-পিত্যেশ করে। তবে আমার ব্যাপারে বলতে গেলে, না তখন আমি স্বাধীনতার পেছনে ছুটেছি, না এখন। প্রসঙ্গক্রমে বলছি: মানুষের ঐ স্বাধীনতার অনুভূতি প্রায়ই দেখা যায় নিজেকে ঠকানো একটা বোধ মাত্র। আর আমাদের অনুভূতিগুলোর মধ্যে স্বাধীনতা যদি হয়ে থাকে সবচেয়ে মহীয়ান কোনো অনুভূতির নাম, তাহলে এর মধ্যেকার ধোঁকার যে-ব্যাপার তা-ও তো সবচেয়ে মহীয়ান ধোঁকাই হবে। অনেকবার আমি নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের মঞ্চে আমার পালা আসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে দেখেছি, ছাদের ঐ উঁচুতে কসরতবাজদের কোনো জোড়া কীভাবে তাদের ট্র্যাপিজে খেলা দেখাচ্ছে। তারা হাতে ঝুলছে, দোল খাইয়ে শরীর উপরে তুলছে, শাঁ করে উপরে লাফ দিচ্ছে, একজন আরেকজনের বাহুতে ভেসে আসছে, দাঁত দিয়ে চুলের মধ্যে ধরে একজন ঝুলিয়ে রেখেছে আরেকজনকে। 'এটার নামও মানুষের স্বাধীনতা,' আমি ভাবলাম, 'খেয়ালখুশিমতো শরীর একটু এদিক-ওদিক করতে পারা।'

প্রকৃতির নির্মলতা নিয়ে কী এক ফাজলামি! এই দৃশ্য দেখে তো শিম্পাঞ্জিদের দল অট্টহাসি দেবে যে তাতে কোনো বিল্ডিং ধসে পড়বে।

না, আমি যা চেয়েছিলাম তা স্বাধীনতা নয়। শুধু একটা বেরোবার পথ, এ-ই ছিল আমার চাওয়া; ডান দিকে, বাঁ দিকে, যেকোনো দিকেই হোক যায়-আসে না; আর কিছু তখন আমি চাইনি; যদি বেরোবার পথটা ছলনারও হয় তা-ই সই; চাওয়াটা ছিল ছোট, ছলনা সেখানে আর কতই বা বড় হবে! সামনে, সামনের দিকে! সব ঠিক আছে, শুধু আর না ঐ হাত উঁচু করে, বাক্সের এক পাশে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে থাকা।

আজ আমি সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি: মনের ভেতরের এক গভীরতম প্রশান্তি ছাড়া আমি কোনো দিনই পারতাম না ঐ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে। জাহাজে প্রথম কদিন থাকার পরে আমার মধ্যে যে-প্রশান্তি আসে, তা ছাড়া আসলেই আমি হয়তো জীবনে এ জায়গায় পৌঁছুতে পারতাম না। আর সেই প্রশান্তির জন্য, আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমি জাহাজের কয়েকজন মানুষের কাছে ঋণী।

সবকিছুর পরেও, তারা সত্যি ভাল মানুষ। আমি আজও আনন্দের সঙ্গে মনে করতে পারি, যখন আধোঘুমে থাকতাম তখন কীভাবে তাদের ভারী পায়ের শব্দ আমার মাথার মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলত। যেকোনো কাজ খুব, খুবই ধীরে করা তাদের স্বভাবের মধ্যে ছিল। এদের কেউ যদি ধরতো একটু চোখ ডলবে, তো সে তার হাত এমনভাবে উপরে তুলত যেন ওতে কোনো ভার চাপানো হয়েছে। তাদের ঠাট্টা-কৌতুকগুলো ছিল মোটা দাগের কিন্তু দিলখোলা। তাদের হাসির মধ্যে সব সময় কেমন একটা কর্কশ ভাব পাওয়া যেত, শুনতে মনে হতো বিপজ্জনক, তবে বাস্তবে অমন কিছু না। তাদের মুখে থু করে ফেলার জন্য সব সময় কিছু-না-কিছু থাকত, আর কোথায় তারা সেই থু-টা ফেলছে সে ব্যাপারে কোনোকিছুর তোয়াক্কা করত না। তারা সবসময় অভিযোগ করত যে আমার গায়ের মাছি লাফ দিয়ে তাদের কাছে গিয়ে পড়ছে; তার পরও এ নিয়ে আমার ওপরে তাদের কাউকেই আমি সত্যিকারের রাগতে দেখেনি; তারা মোট কথা জানত যে আমার বিশাল লোমের মধ্যে ওইসব রক্তপায়ী কীটপতঙ্গ বিস্তার লাভ করে, আর ওগুলো লাফাতে ওস্তাদ; সুতরাং তারা বিষয়টা মেনে নিল। মাঝেমধ্যে যখন বিশ্রামের সময় হতো, তাদের কয়েকজন এসে আমাকে ঘিরে বসত আধা বৃত্ত হয়ে; খুব একটা কথা বলত না তারা, শুধু একজন আরেকজনের দিকে কু-কু করে বোধ হয় বিরক্তি জানাত; পাইপ ধরাত, বাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসত; আমি সামান্য একটু নড়লেই হাঁটু চাপড়াতো, আর একটু পরপর তাদের কেউ একটা লাঠি নিয়ে আমার গায়ে, যেখানে যেখানে আমি সুড়সুড়ি পছন্দ করতাম, সেখানে সুড়সুড়ি দিত। আজ যদি আমাকে সেই জাহাজটায় চড়ে সমুদ্রযাত্রার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলে নিশ্চিত আমি সেটা গ্রহণ করব না; কিন্তু এটাও একই রকম নিশ্চিত যে দুই ডেকের মাঝখানে বসে আমি যেসব স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যাব তার সবগুলোই বাজে স্মৃতি হবে না।

সবচেয়ে বড় কথা, এই লোকগুলোর সঙ্গে থেকে মনের যে প্রশান্তি আমি অর্জন করেছিলাম, তা আমাকে পালানোর কোনো চেষ্টা নেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। আজ পেছন ফিরে তাকালে আমার কাছে মনে হয়, আমি তত দিনে নিশ্চিতই বুঝে গিয়েছিলাম যদি বাঁচতে হয় তাহলে আমাকে বেরোবার একটা পথ বের করতেই হবে, কিন্তু এটাও বুঝেছিলাম সেই পথ মানে পালানোর পথ না। এখন আর বলতে পারব না, পালানো সত্যি আসলে সম্ভব ছিল কি না, যদিও আমার বিশ্বাস যে তা ছিল; কোনো শিম্পাঞ্জির জন্য পালিয়ে যাওয়া সব সময়ই সম্ভব। এখন আমার দাঁতের যে অবস্থা তাতে সাধারণ একটা বাদাম ভেঙে খেতে গেলেও খুব সাবধান হওয়া লাগে, কিন্তু তখন তো মনে হয় আমি ঠিকই পারতাম দরজার তালা সময়মতো কামড়ে ভেঙে পালিয়ে যেতে। আমি তা করিনি। তাতে আমার ভালোই বা কী হতো? খাঁচা থেকে আমার মাথা বের করা মাত্রই তো তারা আবার আমাকে ধরে ফেলত, একেবারে তালা দিয়ে কোথায় ফেলে রাখত – নিশ্চিত আরো জঘন্য কোনো খাঁচায়; কিংবা আমি হয়তো না দেখেই গিয়ে পড়তাম অন্য জন্তুদের মধ্যখানে, হতে পারে উল্টোদিকের অজগরজাতীয় সাপগুলোর মধ্যে, আর ওদের হাতেই শেষ নিশ্বাস ছাড়তে হতো আমাকে; কিংবা হয়তো আমি আসলেই চুপিসারে ডেকের উপর পৌছাতে পারতাম, তারপর পারতাম লাফিয়ে পড়তে, সে ক্ষেত্রে কী হতো? ওই গভীর জলে কিছুক্ষণ হয়তো দোল খেতাম, আর তারপরে সলিলসমাধি। বেপরোয়া সব প্রতিকারের পথ। এরকম, মানুষের মতো, হিসাবনিকাশ করে আমি অবশ্যই এগোইনি, কিন্তু আমার পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় আমি যা করলাম তা মানুষের মতোই ছিল।

যা বললাম, অত হিসাব-নিকাশ আমি করিনি; কিন্তু সবকিছু আমি খেয়াল করতে লাগলাম খুব শান্তভাবে। আমি দেখতাম ঐ মানুষগুলোকে, তারা হাঁটছে এ মাথা থেকে ও মাথা, সব সময় একই মুখ, একই চলাচল, প্রায়ই আমার মনে হতো ওরা সবাই মিলে একটাই এবং একই লোক। তো, এই মানুষটা কিংবা এই মানুষগুলো হাঁটাচলা করত অবাধে। বিরাট এক স্বপ্ন ভর করতে শুরু করল আমার মাথায়। কেউ আমাকে এমন কোনো প্রতিজ্ঞা করেনি যে আমি যদি তাদের মতো হয়ে যাই, তাহলে তারা আমার খাঁচা খুলে দেবে। ওরকম প্রতিজ্ঞা – যখন তা কিনা এমন কিছু করার জন্য যা পূরণ করা অসম্ভব – কখনোই করা হয় না। তবে যা পূরণ করার তা আগে পূরণ করো, প্রতিজ্ঞা যথাসময়ে পরে আসবে, ঠিক সে-জায়গাতেই আসবে যেখানে আগে তুমি ব্যর্থ হয়ে খুঁজেছিলে ওসব প্রতিজ্ঞা। এখন কথা হচ্ছে, এই মানুষগুলোর মধ্যে এমন বিশেষ কিছু আমি কখনোই পাইনি, যা আমাকে তাদের মতো হয়ে যাওয়াতে প্রলুব্ধ করতে পারে। একটু আগের বলা ঐ স্বাধীনতার যদি আমি পূজারী হতাম, তাহলে এই মানুষগুলোর বিষণ্ণ দৃষ্টির মধ্যে বেরোবার পথের যে ছায়া আমি দেখতাম তার চেয়ে আমার নিশ্চিত অনেক বেশি ভালো লাগত সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেই। যা-ই হোক, এসব ভাবনা মাথায় আসার বহুদিন আগে থেকেই তাদের আমি পর্যবেক্ষণ করছিলাম; সত্যি বলতে, আমার সেই বহুদিন ধরে করা একটু একটু পর্যবেক্ষণই আমাকে প্রথম ঠিক পথে ঠেলে দিল।

দেখলাম এসব লোককে নকল করা কত সোজা ব্যাপার। মাত্র অল্প কিছুদিনেই শিখে গেলাম কী করে থুতু ফেলতে হয়। তারপর আমরা একজন আরেকজনের মুখে থুতু মারতাম; একমাত্র ফারাক হলো, এরপর আমি আমার মুখ চেটে সাফ করতাম, যা তারা করত না। শিগগিরই আমি পাকা ধূমপায়ীর মতো পাইপ টানা শুরু করলাম, আর আমি যদি পাইপের ছোট বাটির মতো জায়গাটায় আমার বুড়ো আঙুল চেপে ধরতাম তো জাহাজের সব ক্রু খুশিতে বিরাট চিৎকার দিয়ে উঠত; শুধু কথা হচ্ছে, আমার এই পার্থক্য বুঝতে অনেক দিন লাগল যে কখন পাইপটা খালি আর কখন সেটা ভরা।

আমাকে সবচেয়ে ঝামেলা দিত মদের বোতল। রামের গন্ধ আমার জন্য ছিল একটা অত্যাচার; সমস্ত শক্তি দিয়ে জোর করে গিলতাম একটুখানি; কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজের সেই বাধা আমি উতরে গেলাম। অবাক ব্যাপার, লোকগুলো আমার এই নিজের সঙ্গে সংগ্রামের বিষয়টা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে নিল। আজ যখন ওই দিনগুলোর কথা ভাবি, আমি তাদের আলাদা আলাদা করে মনে করতে পারি না, তবু মনে আছে এদের মধ্যে একজন ছিল যে বহুবার আসত আমার কাছে, একা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে, দিনে আসত, রাতে আসত, যেকোনো সময়ে আসত; আমার সামনে সে বসত বেশ কায়দা করে – হাতে তার মদের বোতল, আর মুখে আমার জন্য নানা নির্দেশ। আমাকে সে বুঝে উঠতে পারত না, আমরা শিম্পাজিরা কী করে বেঁচে থাকি সেই ধাঁধার সমাধান বের করতে চাইত সে। সে ধীরে ধীরে বোতলের ছিপি খুলত, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করত আমি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি কি না; আমি কবুল করছি, সব সময় আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম সবচেয়ে বুনো, সবচেয়ে অতি-ক্ষিপ্র মনোযোগ দিয়ে; সারা পৃথিবী খুঁজেও কোনো মানুষ-শিক্ষক ও রকম মনোযোগী কোনো মানুষ-ছাত্র খুঁজে পাওয়ার আশা করতে পারবে না; ছিপি খোলা হয়ে যাওয়ার পরে সে ওটা মুখের সামনে তুলত; আমি তাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতাম, একদম যেন তার গলার ভেতর পর্যন্ত; সে মাথা নাড়ত, আমার ওপর খুশি, বোতলটা ছোঁয়াত তার ঠোঁটে; আমি, ধীরে ধীরে জ্ঞানের সন্ধান লাভ করার তুরীয় আনন্দে, তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করতে করতে আমার সারা গা চুলকাতাম, এখানে, সেখানে, সবখানে – যেমন খুশি; সে খুব মজা পেত, বোতল তুলে ধরত মুখে আর এক ঢোক খেত; আমি তাকে নকল করার জন্য তখন অধীর ও অস্থির, মলমূত্র বেরিয়ে যেত আমার, নিজেকে নোংরা করে ফেলতাম, এটা দেখে সে আরো বিরাট মজা পেত; এরপর সে তার শরীরের এক হাতে সামনে বোতল ধরে আর ঝট করে তা ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে এক ঢোকে পুরো বোতল শেষ করত, কেমন স্কুলশিক্ষকদের মতো মহা পণ্ডিতির ঢঙে পেছনে ঝুঁকে যেত তার শরীর। আমি তখন মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষায় কাতর, আর তাকে দেখার মতো শক্তি শরীরে অবশিষ্ট নেই, হেলে পড়তাম শিকের গায়ে; এবার নিজের পেটে হাত বোলাতে বোলাতে আর একটা দেঁতো হাসি দিয়ে আমাকে শিক্ষাদানের তত্ত্বীয় পাঠ শেষ করে আনত সে।

কেবল এরপরই শুরু হতো ব্যবহারিক অংশ। এত এত তাত্ত্বিক অংশের পরে আমি তো ততক্ষণে মহা ক্লান্ত; নাকি? আসলেই বিরাট ক্লান্ত হয়ে পড়তাম আমি। কিন্তু কী আর করা, আমার নিয়তি-ই তো তাই। যাক, এবার বোতল আমার দিকে ধরা হলে আমি সেদিকে যতটা পারা যায় শরীর বাড়াতাম; ছিপি খুলতাম, রীতিমতো কাঁপছি তখন; ছিপি খোলার কাজে সফল হলে পরে দেখতাম আমার শক্তি ধীরে ধীরে ফেরত আসছে; বোতল হাতে তুলতাম, মূল বোতল থেকে ওটা আলাদা করার প্রায় আর কোনো উপায়ই নেই; ঠোঁটে ছোঁয়াতাম ওটা আর – ওটাকে ছুঁড়ে মারতাম ঘৃণায়, ঘৃণায়, যদিও বোতল খালি এবং মদের গন্ধ ছাড়া কিছুই ওতে নেই, তবু নিচে মেঝের দিকে ছুড়ে মারতাম ঘৃণাভরে। আমার শিক্ষক তখন হতাশ, আমিও আরো বেশি হতাশ আমার নিজের ওপর; আমার এরপরের কাজেও দুজনের মনে কোনো শান্তি আসতো না – আমি বোতল ছুড়ে মেরেছি বটে, কিন্তু এর পরপর যে আমাকে খুব দর্শনীয় ভঙ্গিতে পেটে হাত বোলাতে হবে, সেই সঙ্গে দাঁত বের করে হাসতে হবে, সে-কথা আমি ভুলে যাইনি।

প্রায়ই দেখা যেত, তার এসব প্রশিক্ষণের এই হাল হচ্ছে। আমার শিক্ষকের প্রশংসা করতে হয়, সে আমার ওপর খেপে যেত না; মাঝে মাঝে আসলেই হয়তো সে তার জ্বলন্ত পাইপ ঠেসে ধরত আমার গায়ের লোমে, হাত যায় না এ রকম কোনো কোনো জায়গায় এমনকি ধিকিধিকি জ্বলে উঠত আগুন, কিন্তু তারপর সে; সে সবসময় তার বিরাট, দয়ালু হাতে আবার তা নিভিয়ে দিত নিজেই, আমার ওপর রাগ হতো না সে বুঝতে পারল যে আমরা দুজনেই একই দলের হয়ে লড়াই করছি শিম্পাঞ্জির স্বভাবের বিরুদ্ধে, আর দুজনের মধ্যে আমার লড়াইটাই বেশি কঠিন।

সে হিসেবে তার ও আমার দুজনের জন্যই কত বড় বিজয় ছিল ওটা যখন একদিন সন্ধ্যায়, অনেক অনেক দর্শকের সামনে – মনে হয় ওটা ছিল বড় কোনো এক পার্টি, একটা গ্রামোফোন বাজছিল, একজন অফিসার ক্রুদের মধ্যে এদিক-ওদিক হাঁটছিল – সেই সন্ধ্যায়, ঠিক যখন দেখলাম যে আমাকে কেউ লক্ষ্য করছে না, আমি আমার খাঁচার সামনে বেখেয়ালে রেখে যাওয়া একটা মদের বোতল হাতে তুলে নিলাম, যেভাবে শেখানো হয়েছে তেমন করেই ওটার ছিপি খুললাম, উপস্থিত সবার ধাপে ধাপে বাড়তে থাকা মনোযোগের মধ্যে বোতলটা নিলাম ঠোঁটের কাছে, আর কোনো রকম দোনোমনা না করেই, কোনোরকম মুখ ভেংচি না কেটেই, পেশাদার মদখোরের মতো চোখ বড় বড় গোল করে আর গলায় গলগল শব্দ করে, সত্যি, সত্যিই একটানে খালি করে দিলাম ওটা; তারপর ছুড়ে মারলাম বোতল, এবার আর হতাশায় না বরং এক দক্ষ শিল্পীর মতো; আসলেই ভুলে গেলাম যে আমাকে পেটে হাত বোলাতে হবে; তার বদলে, যেহেতু নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না, যেহেতু মনে হলো যে এ ছাড়া আমার আর উপায় নেই, যেহেতু আমার সব ইন্দ্রিয়ে ঝড় উঠল, আমি 'হ্যালো' বলে একটা ছোট, তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠলাম, মানুষের ভাষায় শব্দ করে উঠলাম, আর এই চিৎকারের মধ্য দিয়ে ভিড়ে গেলাম মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে, আর অনুভব করলাম তাদের তরফে

উত্তরটা – 'শোনো, শিম্পাঞ্জিটা কথা বলছে!' – আমার পুরো ঘাম-জবজবে শরীরের ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছে কোনো স্নেহস্পর্শের মতো।

আমি আবারও বলছি: মানুষের নকল করার কোনো অভিলাষ আমার ছিল না, আমি তাদের নকল করলাম শুধু এ কারণেই যে আমি একটা বেরোবার পথ খুঁজছিলাম, অন্য আর কোনো কারণ নেই। আর ঐ প্রথম বিজয় যে আমাকে অনেক দূর নিয়ে গেল তা না। এর ঠিক পরপরই আমার সেই কথা বলার ব্যাপারটা আবার হারিয়ে গেল; অনেক মাস লাগল ওটা ফিরে আসতে; মদের বোতলে আমার বিতৃষ্ণা এমনকি আগের চেয়েও অনেক শক্তভাবে ফিরে এল। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও, আমার পথ আমার জন্য ততদিনে নির্দিষ্ট হয়ে গেল, চিরদিনের মতো।

হামবুর্গে আমাকে যখন আমার প্রথম প্রশিক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া হলো, আমি শিগগিরই বুঝে গেলাম যে আমার সামনে দুটো সম্ভাবনা খোলা আছে: চিড়িয়াখানা অথবা বিচিত্রানুষ্ঠানের মঞ্চ। আমি কোনো দ্বিধা করলাম না। নিজেকে বললাম: বিচিত্রানুষ্ঠানে ঢোকার জন্য তোমার ক্ষমতায় যেটুকু সম্ভব তা করো; ওখানেই আছে বেরোবার পথ; চিড়িয়াখানা তো স্রেফ আরেকটা শিক-দেওয়া খাঁচা; ওটাতে গিয়েছ কি মরেছ।

আমি শেখা শুরু করলাম, ভদ্রমহোদয়গণ। উহ্, যখন শিখতেই হবে তখন আপনি ঠিকই শিখবেন; আপনি যদি বেরোবার পথ চান তো ঠিকই শিখবেন; শিখবেন নির্দয়ের মতো। নিজেকে তখন আপনি পাহারা দেবেন হাতে চাবুক নিয়ে; নিজের ভেতর থেকে সামান্যতম বাধা অনুভব করলেই চাবুকে নিজের ছাল তুলে ফেলবেন। আমার শিম্পাঞ্জির স্বভাব এমন দুড়মুড় করে আমার থেকে ছুটে দূরে পালাতে শুরু করল যে, এর ফলে আমার প্রথম শিক্ষক নিজেই শিম্পাঞ্জির মতো হয়ে উঠল, শিগগিরই আমাকে শিক্ষা দেওয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সে; তাকে ভর্তি হতে হলো একটা মানসিক হাসপাতালে। সৌভাগ্যক্রমে, হাসপাতাল থেকে অল্পদিনেই ছাড়া পেল সে।

তবে আমি বেশ কয়েকজন শিক্ষক ব্যবহার করেছি, সত্যি বলতে একই সময়ে কয়েকজনকেও। আমি যখন আমার সামর্থ্যের ব্যাপারে আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম, বাইরের পাবলিক যখন আমার অগ্রগতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল আর আমার ভবিষ্যৎ যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠা শুরু হলো, প্রশিক্ষকদের আমি নিজেই ব্যস্ত রাখলাম নিজের হিসাবমতো, তাদের বসালাম পর পর পাঁচটা ঘরে আর তাদের সবার কাছ থেকে, বিরামহীন এক ঘর থেকে আরেক ঘরে লাফ দিয়ে দিয়ে, শিখতে লাগলাম একই সঙ্গে।

কী যে ধাপে ধাপে অগ্রগতি হলো আমার! জ্ঞানের ওই শিখাগুলো চারদিক থেকে ঢুকতে লাগল আমার জেগে-উঠতে-থাকা মগজে! আমি অস্বীকার করব না: আমার হৃদয় তাতে আনন্দ-আপ্লুত হলো। কিন্তু আমাকে এটাও অবশ্যই বলতে হবে: আমি ব্যাপারটার অতিমূল্যায়ন এমনকি তখনো করিনি, আর আজ তা করার তো কথাই ওঠে না। এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি এমন এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমি পৌঁছে গেলাম একজন গড়পড়তা ইউরোপিয়ান মানুষের সাংস্কৃতিক স্তরে। শুধু সেটুকুর বিচারে

এটা হয়তো কিছুই না, তার পরও, প্রকৃত অর্থে, অবশ্যই এটা একেবারে ফেলনা ব্যাপারও না – এর সাহায্যেই তো আমি বেরোতে পারলাম খাঁচা ছেড়ে, এই ব্যাপারটাই তো আমাকে দিল এই বিশেষ ধরনের, মানুষের ধরনের, বেরোবার পথ। জার্মান ভাষায় একটা চমৎকার বাগ্‌ধারা আছে: বড় গাছের নিচের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে যাওয়া; আমি ঠিক সে কাজটাই করেছি, গাছের নিচের ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে গেছি। আমার যাওয়ার অন্য কোনো পথও ছিল না, সব সময়েই আমি ধরে নিয়েছি যে স্বাধীনতা আমার পথ না।

আমি যদি আমার বিকাশ আর তা আমাকে কতদূর নিয়ে এসেছে তার হিসাব করতে বসি, তাহলে দেখি আমার নালিশ জানানোরও কিছু নেই, পরিতৃপ্ত হওয়ারও কিছু নেই। আমার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, টেবিলে আমার ওয়াইনের বোতল রেখে, আমি আমার দোলনা-চেয়ারে আধা শুয়ে, আধা বসে থাকি, তাকাই জানালা দিয়ে বাইরে। যদি কোনো দর্শনার্থী আসে, তাকে অভ্যর্থনা জানাই বিনয়ের সঙ্গে। আমার ম্যানেজার বসে থাকে লাগানো ঘরটাতে, আমি ঘণ্টা বাজালে সে আসে, শোনে আমি কী বলি। সন্ধ্যাবেলা প্রায় প্রতিদিনই শো থাকে, তাতে আমার যে সফলতা তা কারো পক্ষে ছাড়িয়ে যাওয়া বলতে গেলে অসম্ভব। অনেক রাতে আমি যখন ভূরিভোজন থেকে ঘরে ফিরি, কিংবা কোনো বৈজ্ঞানিক সোসাইটির পার্টি থেকে, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডা থেকে, তখন আমার জন্য অপেক্ষা করে একটা ছোট আধা-প্রশিক্ষণ পাওয়া মেয়ে-শিম্পাঞ্জি, শিম্পাঞ্জিদের মতো করেই তার সঙ্গসুখ ভোগ করি আমি। দিনের আলোতে তাকে দেখার আমার কখনোই ইচ্ছা হয় না; কারণ তার চোখের মধ্যে আছে পোষ-মানানো জন্তুদের সেই উদ্‌ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত দৃষ্টি; আর কারো না, কেবল আমার চোখেই সেটা ধরা পড়ে যায়, আর ব্যাপারটা আমার একেবারেই সহ্য হয় না।

সার্বিক বিচারে, আমি যা অর্জন করতে চেয়েছিলাম অন্তত তা অর্জন করতে পেরেছি। কেউ যেন না বলে যে আমার এত চেষ্টা করার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া, অন্যের মতামতে আমার কোনো আগ্রহও নেই; আমার আগ্রহ শুধু আমাকে আপনারা বুঝুন – এই জ্ঞানটুকুর বিস্তারে; আমি শুধু প্রতিবেদন পেশে আগ্রহী; আপনাদের কাছে, অ্যাকাডেমির সম্মানিত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কাছেও আমি কেবল একটা প্রতিবেদনই পেশ করলাম।

অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন
দুটি খণ্ডাংশ ও একটি চিঠির শুরু

আমরা সবাই রট্‌পিটারকে চিনি, যেমনটা তাকে চেনে অর্ধেক পৃথিবী। কিন্তু সে যখন আমাদের শহরে এল বাছাই-করা কিছু অতিথির জন্য শো দেখাতে, আমি ঠিক করলাম তাকে একটু ব্যক্তিগতভাবে জানব। তার শো-তে ঢুকতে পারা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। বড় শহরগুলোতে হয়তো তারকাশিল্পীদের যত কাছ থেকে পারা যায় দেখার জন্য মানুষেরা, যারা খবর রাখে, মারামারি শুরু করে দেয়, অনেক বড় বড় বাধা হয়তো সেখানে পার হওয়া লাগে; কিন্তু আমাদের এই ছোট শহরে মানুষ ওসব বিস্ময়কর জিনিস দূরে গ্যালারি থেকে একটু অবাক চোখে দেখতে পেলেই খুশি। তাই এখন পর্যন্ত আমিই একমাত্র ব্যক্তি, হোটেলের বেলবয় যেমনটা বলল, যে কিনা রট্‌পিটারের সাক্ষাৎ লাভ করতে এসেছি। হের বুসেনাউ, শো-এর প্রযোজক, আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন বিরাট সৌজন্য দেখিয়ে। তিনি যে এরকম বিনয়ী, আর বরং এমন লাজুক প্রকৃতির লোক হবেন তা আমি আশা করিনি। রট্‌পিটারের ঘরের লাগোয়া ঘরটাতে তিনি বসে আছেন, একটা অমলেট খাচ্ছেন। যদিও তখন সকাল, তবু সন্ধ্যাবেলার শো'র সময়ের পোশাক পরে বসে আছেন তিনি। তার চোখ পড়ল আমার দিকে – আমি, এক অচেনা লোক, এক সামান্য অতিথি, আর তিনি, অনেক বিশিষ্ট মেডেল পাওয়া এক মানুষ, প্রশিক্ষকদের রাজা, নামিদামি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টরেটধারী, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, করমর্দনের জন্য দুই হাত ধরে আমাকে ঝাঁকালেন, বসার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করলেন, টেবিলক্লথে তার চামচ মুছলেন আর সৌহার্দ্যপূর্ণ ভঙ্গিতে চামচটা আমাকে দিলেন যেন আমি তার অমলেটটা শেষ করি। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অসম্মতি জানালাম, তিনি তা মানবেন না, চটপট ব্যস্ত হয়ে গেলেন আমাকে খাইয়ে দেওয়ার জন্য। তাকে শান্ত করতে আর তাকে তার চামচ, প্লেট এসব দূরে সরাতে রাজি করানোর জন্য ভালো ঝাক্কি পোহাতে হলো আমার।

'অনেক দয়া আপনার যে আপনি এসেছেন,' কড়া ভিনদেশি বাচনভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'অনেক দয়া! আর আপনি এসেছেন একদম ঠিক সময়ে, কী বলব – রট্‌পিটার সবসময় দর্শনার্থী সাক্ষাৎ দিতে রাজি না। মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতে তার প্রায়ই দেখা যায় বিরাট অনীহা; তখন কাউকেই, যেই হোক না কেন, কাউকেই ঢুকতে দেওয়া নিষেধ; তখন আমিও, এমনকি আমারও তার সঙ্গে দেখা হয় শুধু কাজের সময়ে, মানে বলছি যে, শো-এর মঞ্চে। আর তখন তার শো শেষ হওয়া মাত্র আমাকে ভাগতে হয়, সে একাই গাড়ি চালিয়ে ঘরে ফেরে, এসেই ঘরে তালা লাগিয়ে দেয়, সাধারণত পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই চলে। তার শোয়ার ঘরে সব সময় একটা বড় ফলের ঝুড়ি থাকে, একা থাকার সময়গুলোতে ওই ফল খেয়েই সে

কাটিয়ে দেয়। তবে আমি, আমার কি আর সাহস আছে তাকে চোখের আড়ালে রাখার, তাই সবসময় করি কী – তার ঘরের উল্টোদিকেরটা ভাড়া নিই, পর্দার আড়াল থেকে তার দিকে লক্ষ্য রাখি।'

আমি যখন তোমার সামনে এভাবে বসে আছি রটপিটার, তোমার কথা শুনছি, তোমার সুস্বাস্থ্য চেয়ে ড্রিংক করছি, তখন আমি সত্যি, বাস্তবিক ভুলে যাচ্ছি – তুমি এটা প্রশংসা হিসেবে নাও কিংবা না নাও, এটাই সত্যি – যে তুমি একটা শিম্পাঞ্জি। তখন খুব ধীরে ধীরেই কেবল – ভাবনাগুলো জোর করে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনার পরেই কেবল – আবার বুঝছি আমি আসলে কার অতিথি।

হ্যাঁ।

হঠাৎ তুমি এত চুপ করে গেলে, আমি ভাবছি যে কেন? মাত্র একটুখানি আগেই তো তুমি আমাদের ছোট শহরটা নিয়ে কীরকম অবাক করা বিজ্ঞ মন্তব্য করছিলে, আর এখন তুমি এমন নীরব?

নীরব?

কোনো সমস্যা হয়েছে? আমি কি তোমার প্রশিক্ষককে ডাকব? তোমার কি দিনের এই সময়ে খাওয়াদাওয়া করার অভ্যাস আছে?

না, না। সব ঠিক আছে। বলছি কী ঘটেছে। কখনো কখনো মানুষের প্রতি আমার এমন অনীহা জাগে যে বলতে গেলে প্রায় বমি চলে আসে। অবশ্য আমার এটা নির্দিষ্ট কোনো মানুষের জন্য হয় না, তোমার সঙ্গে আমার এই সুন্দর সাক্ষাতের জন্য তো হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ব্যাপারটা পুরো মানবজাতি নিয়ে। অবশ্য এটার মধ্যে বিশেষ বা অসাধারণ কিছু নেই। ধরো যে তুমি যদি শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গেও টানা এতগুলো দিন থাকতে, এই একই রকম অনুভূতি তোমার তখনো হতো, নিজের ওপর তোমার যতই নিয়ন্ত্রণ থাকুক না কেন। সত্যিকার অর্থে, আমার এত বিতৃষ্ণা মানুষের গায়ের গন্ধ নিয়ে না; মানুষের গন্ধ আমার মধ্যে চলে এসেছে আর আমার নিজের দেশের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে। নিজেই শুঁকে দেখো! এই যে, আমার বুকে! লোমের মধ্যে, অনেক ভেতরে নাক নিয়ে যাও! অনেক গভীরে বলছি!

দুঃখিত, আমি কোনো বিশেষ গন্ধ তো পাচ্ছি না। স্রেফ পরিপাটি করে রাখা কোনো শরীরের সাধারণ গন্ধ, ওটুকুই। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে শহরে থাকা লোকদের নাকের ব্যাপারে বেশি ভরসাও করা যায় না। কোনো সন্দেহ নেই, তুমি এমন হাজার জিনিসের গন্ধ নাকে পাও, যা আমাদের নাক এড়িয়ে যায়।

সেটা একদিন সত্যি ছিল, জনাব, অনেক আগে একদিন। সেই দিন শেষ।

যেহেতু তুমি নিজে কথাটা তুললে, আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করছি: তুমি সত্যিকারের কত দিন হলো আমাদের সঙ্গে আছো?

পাঁচ বছর। এপ্রিলের পাঁচ তারিখে পাঁচ বছর পুরো হবে।

ভয়ংকর সাফল্য। পাঁচ বছরে শিম্পাঞ্জিত্ব ছুড়ে ফেলে মানুষের পুরো বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে আসা! নিশ্চিত তোমার আগে আর কেউই করতে পারেনি এটা! এই রেসের মাঠে তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

হ্যাঁ, এটা যথেষ্ট বড় ব্যাপার, আমি জানি, মাঝেমাঝে আমার নিজেরই চিন্তায় কুলায় না। তবে যখন শান্ত থাকি, তখন এই উচ্ছ্বাসটা অনেক কমে যায়। তুমি কি জানো, আমাকে কীভাবে ধরা হয়েছিল?

তোমাকে নিয়ে ছাপা হওয়া সবকিছুই আমার পড়া শেষ। তোমাকে গুলি করা হয়, তারপর ধরা হয়।

হ্যাঁ, দুটো গুলি করা হয় আমাকে, একবার এই এখানে গালে – যে দাগ তুমি দেখছ তার চেয়ে ক্ষতটা নিঃসন্দেহে অনেক বড় ছিল – আর দ্বিতীয়বার আমার কোমর ও পাছার নিচের এই দিকটায়। তোমাকে দাগটা দেখানোর জন্য আমি এই যে প্যান্ট খুলছি। এখান দিয়ে ঢুকেছিল গুলি, ওটাই ছিল মারাত্মক, চূড়ান্ত আঘাত। আমি গাছ থেকে পড়ে গেলাম আর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি জাহাজের দুই ডেকের মাঝখানে খাঁচায় বন্দী।

খাঁচায়! দুই ডেকের মাঝখানে! তোমার গল্প কাগজে পড়া এক জিনিস, আর তুমি বলছ, তখন নিজের কানে শুনছি – সেটা পুরো আলাদা ব্যাপার!

আর, জনাব, ওই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়াটা তাহলে কত আলাদা ব্যাপার, বলো। ওই দিন পর্যন্ত আমি কখনোই বুঝিনি বেরোবার পথ না-থাকা বলতে কী বোঝায়। ওটা কোনো চারপাশ-ঘেরা সাধারণ শিক দেওয়া খাঁচা ছিল না, এর ছিল শুধু তিনটে পাশ, একটা বাক্সের সঙ্গে জোড়া লাগানো, বাক্সটাই চার নম্বর পাশ। অদ্ভুত এই পুরো জিনিসটা এত নিচু ছিল যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আর আড়ে এত চাপা ছিল যে আমি এমনকি বসতেও পারতাম না। আমাকে বসতে হতো হাঁটু ভাঁজ করে, উবু হয়ে – তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। রাগে ক্রোধে ফেটে পড়ে আমি ঠিক করলাম কাউকেই দেখা দেব না, তাই বাক্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতাম; দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি ওই মেঝে ছুঁয়ে বসে থাকতাম, হাঁটু কাঁপতে থাকত আমার, আর পিঠের দিকে খাঁচার শিকগুলো মাংস কেটে ঢুকে যেত। বুনো জন্তু আটকে রাখার এই পদ্ধতিকে প্রথম কিছুদিনের জন্য সুবিধাজনক বলে ধরা হয়ে থাকে, আর আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কথাটা সত্যিই বটে। কিন্তু তখন মানুষের কী দৃষ্টিকোণ তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমার সামনে ছিল ওই বাক্স। কাঠের তক্তাগুলো ভেঙে ফ্যালো, কামড়ে কামড়ে ওগুলোতে একটা ফাঁক বানাও, কোনো একটা ফাঁক দিয়ে শরীর মুচড়িয়ে ঢুকিয়ে দাও, বাস্তবে কিনা যে ফাঁকটা বলতে গেলে বাইরে তাকানোর মতোও বড় নয়, আর, সেটা দেখেই কিনা তুমি, প্রথম যখন দেখলে, বোকার মতো না-বুঝেই কী মহা খুশিতে চিৎকার দিয়ে ওটাকে স্বাগত জানালে! কোথায় যেতে চাও তুমি? তক্তাগুলোর ওপারে জঙ্গলের শুরু।

(একটি চিঠির শুরু)

প্রিয় হের রটপিটার:

আমি অনেক আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির কাছে লেখা তোমার প্রতিবেদনটি পড়লাম, সত্যি বলতে, পড়ার সময়ে বুক ধুকপুক করছিল আমার। তাতে অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই, যেহেতু আমিই ছিলাম তোমার প্রথম শিক্ষক; আর আমার স্মৃতি তুমি যে সদয় ভাষায় মনে করেছ, তাতেও অবাক হইনি আমি। তবে আমার মানসিক হাসপাতালে যাওয়ার কথাটা হয়তো তুমি আরেকটু বিবেচনা করে এড়িয়ে যেতে পারতে; আমি অবশ্য বুঝতে পারি, তোমার এই পুরো প্রতিবেদন আর যেরকম অকপটে তুমি এটা লিখেছ, তাতে লেখার সময় এই আনুপুঙ্খিক তথ্যটি বাদ দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি, যদিও এতে করে অল্প হলেও আমার সুনামের ক্ষতি হয়ে গেছে। অবশ্য আমি এখানে ঠিক এ কথা তোলার জন্য কলম ধরিনি, আমার মাথায় অন্য কিছু কথা আছে।

কয়লা-বালতির সওয়ারি

সব কয়লা শেষ; কয়লার বালতি শূন্য; কয়লার বেলচাটার এখন আর কোনো মানে নেই; উনান থেকে বেরোচ্ছে হিম; ঘরটা জমে যাচ্ছে কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায়; জানালার বাইরের গাছগুলো বরফ পড়ে পাথর; ওপরে খোদার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চাইছে তো আকাশ তার জন্য হয়ে আছে ধাতব ঢাল। কয়লা আমাকে পেতেই হবে; ঠান্ডায় জমে আমি মরতে পারি না; আমার পেছনে নির্দয় উনানটা, আমার সামনে একই রকম নির্দয় আকাশ; তাই আমাকে জলদি এ দুয়ের মধ্যে ভেসে পড়তে হবে, আর এদের মধ্যেখানে যে কয়লা-ব্যাপারী, তার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। কিন্তু আমার রোজকার কান্নাকাটিতে তার তো মন গলবে না একটুও; তার কাছে আমাকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে হবে যে আমার কাছে কয়লার আর একটা গুঁড়ো পর্যন্ত নেই, আর সেজন্যই তিনি এখন আমার কাছে আকাশের সূর্যদেবতার সমার্থক। তাঁর দরজায় গিয়ে আমাকে হাজির হতে হবে সেই ভিখারির মতো, যে গলায় মরণের ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে গিয়ে দাঁড়ায় গেরস্তের বাড়ির সামনে, বলে মারা যাচ্ছে এখনই, এতে করে ঐ বিরাট বাড়ির রান্নার মেয়েটা শেষে রাজি হয় তাকে কফিকাপের তলানিটুকু দিয়ে দিতে; আমি চাচ্ছি ঐ একই রকম বিবেচনা থেকে কয়লা-ব্যাপারী, খেপে গেলে যাক, তবু 'নরহত্যা কোরো না' এই ঐশ্বরিক আদেশে উদ্দীপ্ত হয়ে আমার কয়লা-বালতিতে ছুড়ে দেবেন এক বেলচা কয়লা।

আমি কীভাবে গিয়ে হাজির হচ্ছি, তার ওপর নির্ভর করবে সবকিছু; সুতরাং আমি চড়ে বসলাম আমার কয়লা-বালতিতে। কয়লা-বালতির সওয়ারি হয়ে, বালতির হাতলের 'পরে হাত রেখে – এর চেয়ে আর সহজ কোনো লাগাম হয় না – আমি বেশ খানিকটা কষ্ট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম; তবে নিচে নামার পরে আমার বালতি ওঠা শুরু করল ওপরে, চমৎকার, চমৎকারভাবে; মাটিতে আসন গেড়ে বসা উটেরা তাদের চালকের ছড়ির নিচে কাঁপতে কাঁপতেও এর চেয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে পারে না। বরফে ঢাকা রাস্তাগুলো বেয়ে আমরা চলতে লাগলাম এক ছন্দের দুলকি চালে; প্রায়ই আমি উঠে যাচ্ছি বাড়িগুলোর একতলা সমান উঁচুতে; একবারও নামছি না বাড়িগুলোর সামনের দরজার উচ্চতায়। তারপরে একটা অস্বাভাবিক উচ্চতায় আমি ভেসে থাকলাম কয়লা-ব্যাপারীর বাড়ির বেজমেন্টের সামনে, ওখানে অনেক নিচে তিনি তার ছোট টেবিলটাতে পড়ে আছেন গুটিসুটি

মেরে, লিখছেন; ঘরের ভেতরের অতিরিক্ত তাপটা বের করে দিতে খুলে রেখেছেন দরজা।

'কয়লা-ব্যাপারী!' আমি চিৎকার দিলাম, চরম ঠান্ডায় নিঃসাড় হওয়া এক গলায়, আমার শ্বাসের পুঞ্জ মেঘের মধ্যে মুড়ে গিয়ে, 'দয়া করুন গো কয়লা-ব্যাপারী, আমাকে একটুখানি কয়লা দিন। আমার কয়লা-বালতি এতই খালি যে আমি এখন ওটাতে চড়ে বসতেও পারছি। একটু দয়া করুন। যত শিগগির পারি আমি এর দাম মিটিয়ে দেব।'

কয়লা-ব্যাপারী হাত রাখলেন তার কানের ওপরে। 'কেউ কি কিছু বলল?' কাঁধ বাঁকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তার স্ত্রীকে, মহিলা উনানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তার আসনে বসে উল বুনছেন। 'কিছু শুনলাম মনে হচ্ছে? কোনো কাস্টমার নাকি?'

'আমি তো কিছুই শুনিনি,' তার স্ত্রী বললেন, উল বুনতে বুনতে কী প্রসন্ন মনে শ্বাস ফেলে চলেছেন, ওনার পেছন দিকটা কত সুন্দর গরম হয়ে আছে।

'হ্যাঁ, তাই,' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এই যে আমি; আপনার পুরোনো এক কাস্টমার; বিশ্বস্ত ও সৎ; স্রেফ অল্প কদিনের জন্য হাত একদম খালি।'

'বউ,' ব্যাপারী বললেন, 'কেউ এসেছে, অবশ্যই কেউ; পুরোটা আমার কল্পনা হতে পারে না; এত আপন করে ডাকছে, তখন নিশ্চয় আমার কোনো পুরোনো, অনেক পুরোনো কাস্টমার হবে।'

'তোমার সমস্যা কী, বলো তো?' জিজ্ঞেস করলেন তার স্ত্রী, একটুর জন্য থেমে উলের কাজটা বুকের কাছে চেপে ধরে, 'কেউ আসেনি, রাস্তাঘাট ফাঁকা, আমাদের সব কাস্টমারকেই কয়লা দেওয়া হয়ে গেছে; এখন আমরা বেশ কদিনের জন্য দোকান বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে পারি।'

'কিন্তু এই যে, আমি তো এখানে উপরে আমার কয়লা-বালতিতে বসে আছি,' আমি কেঁদে ফেললাম, আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে নির্দয় ঠান্ডায় জমে যাওয়া অশ্রুতে, 'একটু দয়া করে একবার এই ওপরে তাকান; তাহলেই আমাকে দেখতে পাবেন; আমি আপনার কাছে মাত্র এক বেলচা কয়লা ভিক্ষা চাচ্ছি; আর যদি দুই বেলচা দেন তো খুশিতে কী যে হব! অন্য সব কাস্টমাররা তো তাদের কয়লা পেয়ে গেছেন, নাকি? ওহ্, যদি এক্ষুনি আমার বালতিতে কয়লা পড়ার ঠনঠন শব্দটা শুনতে পেতাম!'

'আমি আসছি,' বললেন ব্যাপারী, তার খাটো দুপায়ে বেজমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা শুরু করলেন, কিন্তু তার স্ত্রী ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন, তার হাত ধরে ফেলেছেন আর বলছেন: 'ওখানেই থাকো। এমন যদি গোঁয়ারের মতো করো তো আমি নিজেই যাচ্ছি। কাল রাতের বিশ্রী কাশিটা একবার মনে করে দেখো। তার পরও শুধু একটু ব্যবসার লোভে, যদিও বলছি এটা স্রেফ তোমার কল্পনাই, তুমি কিনা তোমার বউ-বাচ্চার কথা আর নিজের ফুসফুসের কথা ভুলে যাওয়ার জন্য তৈরি! আমিই যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, তাহলে তাকে কিন্তু আমাদের কাছে মজুত সব রকম কয়লার কথাই বোলো; তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি জোরে জোরে দাম বলে যাব।'

'ঠিক আছে,' বললেন তার স্ত্রী, আর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন রাস্তায়। বলার অপেক্ষা রাখে না, তক্ষুনি আমি তার চোখে পড়ে গেলাম।

'ম্যাডাম কয়লা-সওদাগর,' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'আমি আপনার অধম সেবক, শুধু এক বেলচা মাত্র কয়লা; সোজা আমার এই বালতিতে; আমি নিজেই বাড়ি বয়ে নিয়ে যাব; আপনার সবচেয়ে পচা মানের কয়লার একটা বেলচা মাত্র। আপনাকে পুরো দামই দেব, নিশ্চিত থাকুন, তবে ঠিক এখন না, ঠিক এখন না।' কীরকম মৃত্যুঘণ্টার মতো শোনাল আমার 'ঠিক এখন না' কথাটা, আর কীরকম গুলিয়ে-টুলিয়ে ওটা মিশে গেল কাছের কোনো গির্জার চূড়া থেকে আসা সন্ধ্যার সুরেলা ঘণ্টার সঙ্গে!

'তা চাচ্ছেটা কী সে?' ব্যাপারী চিল্লিয়ে উঠলেন।

'কিছু না,' তার স্ত্রী ওনার দিকে চিৎকার করে বললেন, 'এখানে কিছু নেই; আমি কিছুই দেখছি না, কিছুই শুনতে পাচ্ছি না; শুধু ছয়টা বাজার ঘণ্টা পড়ছে, দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। কী ভয়ংকর ঠান্ডা; কাল মনে হয় আমাদের আজকের চাইতেও বেশি কাজ পড়বে।'

তিনি কিছুই দেখলেন না, কিছুই শুনলেন না; কিন্তু তাতে কী? তিনি ঠিকই তার অ্যাপ্রনের ফিতা খুলে নিয়েছেন আর আমাকে অ্যাপ্রনটা দিয়ে তাড়িয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। হায়, তিনিই সফল হলেন। আমার কয়লা-বালতির সব গুণই আছে একটা তেজি ঘোড়ার যা যা থাকে, কিন্তু কোনোকিছু রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এর নেই; বেশি হালকা এটা, কোনো মহিলার অ্যাপ্রনই যথেষ্ট এর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে নিতে।

'ওই বদমাশ বেটি,' চলে যেতে যেতে আমি চিৎকার করে বললাম, তখন তিনি দোকানের দিকে ঘুরে বাতাসে একটা হাত নেড়ে যাচ্ছেন, অর্ধেকটা অবজ্ঞায়, অর্ধেকটা তৃপ্তিতে, 'ওই বদমাশ বেটি। আমি তোর কাছে সবচেয়ে খারাপ কয়লার একটামাত্র বেলচা চাইলাম আর তুই দিলি না!' এ কথা বলে আমি উঠে গেলাম হিমবাহদের দেশে আর হারিয়ে গেলাম চিরতরে।

কাফকার প্রকাশিত গল্পটি এখানে শেষ হয়, কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে গল্পটি কাফকা শেষ করেছিলেন নিচের প্যারাগ্রাফটি যোগ করে। বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট (পৃ.৪৪০) দ্রষ্টব্য:

> এই হিমবাহ ভরা পর্বতের দেশটা নিচের ঐ বরফঢাকা পৃথিবীর চেয়ে কি উষ্ণ না? চারদিকে সবকিছু সাদা হয়ে আছে, শুধু আমার বালতিটাই যা কালো রঙের। এর আগে আমি অনেক উঁচুতে ভেসে থাকলেও এখন আছি অনেক নিচে; আমি ঘাড় লম্বা করে ওপরে তাকালাম পর্বতমালার দিকে। বরফের একটা তুষার-সাদা পাতলা খণ্ড এখানে-ওখানে ফেটে আছে অদৃশ্য স্কেটারদের পায়ের চাপে। আমার এজন্যে এক ইঞ্চিও দাবছে না, এমন পুরু বরফের ওপর আমি চলতে লাগলাম ছোট মেরু অঞ্চলের কুকুরের পায়ের চিহ্ন ধরে। আমার কয়লা-বালতিতে চড়ার এখন আর কোনো অর্থ নেই। তাই আমি নেমে পড়েছি আর বালতিটা বয়ে চলেছি আমার কাঁধের 'পরে।

এক অনশন-শিল্পী

চারটি গল্প

প্রথম দুঃখ

এক ট্র্যাপিজ-শিল্পী – এ শিল্পের (বিখ্যাত বিচিত্রানুষ্ঠান-মঞ্চগুলোর উঁচু গম্বুজের মতো অংশটিতে যার চর্চা হয়) পরিচিতি আছে মানুষের আরাধ্যের মধ্যেকার সবচেয়ে কঠিন কাজের একটি হিসেবে – প্রথম দিকে স্রেফ আরো চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছানোর ইচ্ছে থেকে, কিন্তু পরের দিকে নির্মম হয়ে ওঠা এক অভ্যাসেরও তাড়নায়, তার জীবনকে এমনভাবে সাজাল যে সে কোনো একটা দলের সঙ্গে যত দিন করে থাকত তার পুরোটা সময়ই, রাতদিনের পুরোটাই, কাটাত ট্র্যাপিজের উপরে। তার যা কিছু দরকার, সত্যি বলতে চাহিদা ছিল তার অতি সামান্য, তা নিচে পাহারায় থাকা সারি-বেঁধে-দাঁড়ানো পিয়নের দল তার কাছে পৌঁছে দিত বিশেষভাবে বানানো ঝুড়িতে করে, উপরে ওখানে তার যা যা লাগবে তা ঝুড়িতে ভরে তারা সেটা ওঠাত আর নামাত। তার এই এমনতরো জীবনধারার কারণে সাধারণ পাবলিকের যে বিশেষ কোনো অসুবিধা হতো তা বলা যাবে না; স্রেফ অন্য খেলার সময়ে তার এই উঁচুতে বসে থাকার ব্যাপারটা মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটাত একটু, তাকে তো লুকিয়ে রাখার কোনো উপায় ছিল না; যদিও ওসব সময়ে সে স্থির হয়ে থাকত, তবু দর্শকের চোখ তো মাঝেসাঝে তার দিকে একটু পড়তই। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই বিষয়টুকু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন, কারণ সে ছিল একজন ব্যতিক্রমী আর ভূ-ভারতে মাত্র একজনই আছে এমন এক শিল্পী। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষ ভালোমতোই বুঝতেন যে কোনো বাঁদরামি করার জন্য সে এমনভাবে জীবন কাটাচ্ছে না, তারা বুঝতেন নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য এ ছাড়া তার আসলে কোনো বিকল্পও নেই।

আর উপরে ওখানে থাকাটা স্বাস্থ্যকরও বটে; গরমের দিনে যখন গম্বুজের চারপাশের জানালার ফোঁকরগুলো খুলে দেওয়া হতো, বাইরের তাজা হাওয়ার সঙ্গে যখন ভেতরের আধো-অন্ধকারে বানের মতো রোদ ঢুকত, তখন একই সঙ্গে দেখতে সুন্দরও লাগত বেশ। সত্য যে তার সামাজিক মেলামেশা ছিল সীমিত; স্রেফ কখনো সখনো দেখা যেত

কোনো সহসঙ্গী অ্যাক্রোব্যাট দড়ির মই বেয়ে কষ্ট করে উপরে তার ওখানে উঠেছে, তারপর তারা দুজনে একসঙ্গে বসত ট্র্যাপিজের উপর, ডানে ও বাঁয়ে নিরাপত্তা-দড়ির উপর ঝুঁকে পড়ত আর খোশগল্প করত; কিংবা হয়তো ছাদ সারাতে ওঠা মেরামত শ্রমিকেরা তার সঙ্গে টুকটাক দু-একটা কথা বলত কোনো খোলা জানালার ফোঁকর দিয়ে; কিংবা অগ্নি-নির্বাপন বিভাগের কোনো অফিসার, উপরের ব্যালকনির জরুরি আলোক-ব্যবস্থা পরীক্ষা করতে গিয়ে হয়তো তাকে ডাক দিত শ্রদ্ধাভরে কিছু বলে, কথাটা অবশ্য নিচে থেকে ঠিকমতো বোঝা যেত না। এগুলো ছাড়া তার চারপাশে সব সময়েই সুনসান নীরব; স্রেফ মাঝেসাঝে মঞ্চের কোনো কর্মচারী হয়তো দুপুরবেলার ফাঁকা মঞ্চে খানিক ঘোরাঘুরি করার পর ভাবুক দৃষ্টি নিয়ে উপরে, প্রায় অভেদ্য ওই উচ্চতায় তাকাত একটুখানিক, ওখানে ট্র্যাপিজ-শিল্পী, তার বোঝার কোনো উপায় নেই যে কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে, দেখা যেত অনুশীলন করে যাচ্ছে অথবা বিশ্রাম নিচ্ছে।

স্রেফ যদি দলটার এভাবে এক শহর থেকে আরেক শহরে চলে যাওয়ার ওই অপরিহার্য সফরগুলো করতে না হতো, তাহলে ট্র্যাপিজ-শিল্পী হয়তো তার জীবন নিরুপদ্রব কাটিয়ে যেতে পারত এভাবেই; ওই সফরগুলো তার কাছে লাগত মারাত্মক যন্ত্রণার। কোনো সন্দেহ নেই তার ম্যানেজার এটা নিশ্চিত করতেন যেন ট্র্যাপিজ-শিল্পীকে যত পারা যায় কম ভোগান্তি দেওয়া হয়: যেমন একই শহরের মধ্যে এ-জায়গা থেকে ও-জায়গায় যাওয়ার সময়ে রেসিংয়ের গাড়ি ব্যবহার করা হতো; সেই গাড়ি মূলত রাতে কিংবা খুব ভোরে জনমনুষ্যহীন রাস্তাগুলো ধরে ফেড়ে ফুঁড়ে চলতে ভয়ংকর বিপজ্জনক গতিতে, যদিও অস্থিরতার মধ্যে ডুবে থাকা ট্র্যাপিজ-শিল্পীর তখনো মনে হতো গাড়ি আরো জোরে ছুটছে না কেন; আর যদি যাত্রাটা হতো রেলে চড়ে, তাহলে পুরো একটা কামরা ভাড়া করা হতো, সেখানে ট্র্যাপিজ-শিল্পী পুরোটা সময় উপরে লাগেজ রাখার তাকে বসে কাটিয়ে তার স্বাভাবিক জীবনের একধরনের বিকল্প, হয়তো খুবই শোচনীয় বিকল্প, খুঁজে নিত; তাদের সফরসূচিতে পরের যে শহরটা থাকত, সেখানে থিয়েটারে জায়গামতো ট্র্যাপিজটি ঝুলিয়ে ফেলা হতো ট্র্যাপিজ-শিল্পী পৌঁছাবার অনেক আগে থেকেই, এর সঙ্গে অডিটোরিয়ামের দিকে গেছে এমন সব কটা দরজা হাট করে খুলে রাখা হতো, সব করিডর ফাঁকা করে রাখা হতো – তার পরও ম্যানেজার সাহেবের জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত বোধ হয় সব সময়ে ওটাই হতো যখন ট্র্যাপিজ-শিল্পী শেষমেশ পা রাখত দড়ির-মইয়ে আর চোখের নিমেষে, অবশেষে, দেখা যেত সে উপরে ওখানে আবার ঝুলছে তার ট্র্যাপিজে।

এখন পর্যন্ত এরকম অনেক সফর ম্যানেজার সফলভাবে শেষ করতে পারলেও, প্রতিটা নতুন সফরই তার জন্য মনে হতো কঠিন পরীক্ষা, কারণ তিনি বুঝলেন – অন্য সবকিছু বাদ দিলেও, এই সফরগুলো পরিষ্কার ট্র্যাপিজ-শিল্পীর স্নায়ুতে অনেক চাপ ফেলছে।

তো একদিন কী হলো – তারা দুজনে আবার একসঙ্গে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাচ্ছে, ট্র্যাপিজ-শিল্পী শুয়ে আছে উপরে লাগেজ রাখার তাকে, স্বপ্ন দেখছে, ম্যানেজার

উল্টোদিকে জানালার পাশের একটা সিটে হেলান দিয়ে বসে একটা বই পড়ছেন, হঠাৎ নিচু স্বরে ট্র্যাপিজ-শিল্পী ম্যানেজারকে ডেকে উঠল। ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হলেন তার সেবায়। ট্র্যাপিজ-শিল্পী তার ঠোঁট কামড়িয়ে বলল, এখন থেকে তার শো'র জন্য সব সময়, এত দিনকার স্রেফ ওই একটা ট্র্যাপিজের বদলে, দুটো করে ট্র্যাপিজ লাগবে, দুটো ট্র্যাপিজ – একটা আরেকটার সামনাসামনি। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ তার সম্মতি দিলেন। কিন্তু ট্র্যাপিজ-শিল্পী তার পরও ঘোষণা করল – যেন সে দেখাতে চাচ্ছে যে এ-বিষয়টাতে ম্যানেজারের রাজি হওয়া কিংবা না-হওয়া, দুটোই তার কাছে সমান গুরুত্বহীন – যে এখন থেকে সে আর কখনোই, কোনো দিনও আর কোনো পরিস্থিতিতেই, শুধু এক ট্র্যাপিজে খেলা দেখাবে না। আবার যে কোনো দিন তাকে এক ট্র্যাপিজে খেলা দেখানো লাগতে পারে স্রেফ এটুকু ভাবতেই ভয়ে-বিরাগে তার গা মনে হয় কেঁপে উঠল। ম্যানেজার, দ্বিধাদীর্ণ ও সতর্ক, আরো একবার জোর দিয়ে জানালেন তার হ্যাঁ-সূচক পূর্ণ সম্মতি, একটা ট্র্যাপিজের চেয়ে দুটো কত ভালো, আর তা ছাড়া এই নতুন ব্যবস্থায় বাড়তি লাভ হচ্ছে এটা খেলায় বৈচিত্র্য যোগ করবে। এ সময় ট্র্যাপিজ-শিল্পী হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল। খুব শঙ্কিত হয়ে ম্যানেজার লাফিয়ে উঠলেন, জিগ্যেস করলেন কী হয়েছে, আর কোনো উত্তর না পেয়ে ট্র্যাপিজ-শিল্পীর আসনে উঠে গেলেন, তার গায়ে হাত বোলালেন আর তার গালে গাল রাখলেন যাতে করে ট্র্যাপিজ-শিল্পীর চোখের পানিতে তার নিজের গাল ভেসে যায়। কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসা আর অনেক মন-গলানো কথার পরেই কেবল ট্র্যাপিজ-শিল্পী মুখ খুলল ফোঁপাতে ফোঁপাতে: 'আমার হাতে শুধু এই একটা ট্র্যাপিজের বার – এভাবে কী করে আমি বাঁচব!' এবার তাকে সান্ত্বনা দেওয়া ম্যানেজারের জন্য খানিকটা সহজ হলো; তিনি কথা দিলেন পরের স্টেশনেই তিনি নিচে নেমে তাদের সফরসূচিতে এরপরের যে শহর আছে সেখানে দ্বিতীয় একটা ট্র্যাপিজের কথা বলে টেলিগ্রাম করে দেবেন; তিনি নিজেকে গালমন্দ করলেন এত দিন ধরে ট্র্যাপিজ-শিল্পী কেবল একটা ট্র্যাপিজে খেলা দেখিয়ে এসেছে বলে, আর শেষমেশ এই ভুলটা তার নজরে আনার জন্য তিনি ট্র্যাপিজ-শিল্পীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাদরে তার প্রশংসা করলেন। এভাবেই ম্যানেজার সফল হলেন ট্র্যাপিজ-শিল্পীকে ধীরে ধীরে শান্ত করার কাজে, তারপর তিনি ফিরে গেলেন জানালার পাশে তার নিজের সিটে। কিন্তু তার নিজের মন তখন অনেক অশান্ত, গভীর উদ্বেগ নিয়ে তিনি চোরা চোখে, বইয়ের মাথার উপর দিয়ে, দেখতে লাগলেন ট্র্যাপিজ-শিল্পীকে। একবার যখন এ ধরনের চিন্তা তাকে পীড়া দিতে শুরু করেছে, তখন কি আর কোনো দিন পুরো থামবে তা? বরং এগুলো কি নিয়মিত আরো বাড়তেই থাকবে না? তার রুটিরুজির জন্য এটা কি একটা হুমকি নয়? আর আসলেই ম্যানেজার যখন দেখলেন, সে একসময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আপাতশান্তির এক ঘুমে এলিয়ে পড়েছে, তার মনে হলো ট্র্যাপিজ-শিল্পীর বাচ্চাদের মতো পেলব কপালে যেন প্রথম বলিরেখাগুলোর দাগ কেটে বসা দেখতে পেলেন তিনি।

এক ছোটখাটো মহিলা

আমি এখন যাকে নিয়ে কথা বলছি সে এক ছোট মহিলা; পাতলা গড়ন তবু আঁটসাঁট কাপড় পরে আছে; সব সময় আমি তাকে একই কাপড়ে দেখি, ধূসর-হলদে রঙের ওটা, দেখতে লাগে কাঠের মতো রং, ওটার থেকে ঝোলে একই রঙের সুতো কিংবা বোতামের মতো কিছু জিনিস; তার মাথায় কখনোই হ্যাট দেখি না, তার দীপ্তিহীন ব্লন্ড চুল সে একদম ছেড়ে দিয়ে রাখলেও ওগুলো মসৃণ আর ওদের অগোছালো বলা যাবে না। আঁটসাঁট কাপড় পরা বটে সে, কিন্তু তার চলাফেরার মধ্যে নমনীয়তা আছে; সত্যি বলতে, তার এই সচলতার ভাবটা সে একটু বাড়িয়েই দেখায় – কোমরের পেছনে হাত রেখে, হঠাৎ অবাক করা দ্রুততায় ঝটকা মেরে শরীরের উপরের অংশ পাশের দিকে মোচড় দেওয়া কী যে পছন্দ তার! তার হাত দেখে আমার যে ধারণা হয়েছে তাতে বলতে গেলে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে আমি কখনোই আর ওরকম কোনো হাত দেখিনি, যার প্রতিটা আঙুল একটা থেকে আরেকটা ওরকম স্পষ্ট আলাদা; তা হলেও তার হাতের গঠনে কোনো ত্রুটি কিন্তু নেই, একদম স্বাভাবিক একটা হাত।

এই ছোটখাটো মহিলা আমার ওপর খুব অসন্তুষ্ট, সব সময় আমার কোনো ভুল ধরা পড়বে তার চোখে, সব সময় আমি যেন তার ওপর অবিচার করে যাচ্ছি, প্রতিটা পদক্ষেপে আমি যেন তার বিরক্তি ঘটাচ্ছি; যদি কোনো মানুষের জীবনকে সবচেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে আলাদা করা যেত, আর প্রত্যেক অংশ আলাদা করে বিচার করা যেত, কোনো সন্দেহ নেই সে আমার জীবনের প্রতিটা ক্ষুদ্রতম অংশকেও অশোভন বলত। আমি প্রায়ই ভাবি, আমার সবকিছু তার কাছে এত বিরক্তির কেন; হতে পারে আমার প্রতিটা জিনিসই তার পছন্দের উল্টো – তার নান্দনিক বোধ, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ, তার অভ্যাস, তার রীতিনীতি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা – সবকিছু; দুজনের এরকম বেমিল স্বভাব বাস্তবে অনেক দেখা যায়; কিন্তু ব্যাপারটা তাকে এত পীড়া দেয় কেন? আমাদের মধ্যে মোটেই এমন কোনো সম্পর্ক নেই যে আমার কারণে তার এতখানি কষ্ট পাওয়া উচিত। তার শুধু মনস্থির করা উচিত যে আমাকে সে অপরিচিত কোনো লোক হিসেবেই দেখবে, তার কাছে তো আমি আসলেও তা-ই – সে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নিলে আমার তাতে কোনো আপত্তি থাকবে না, বরং আমি তার সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাব; তার শুধু এটাই ধরে নেওয়া উচিত যে আমি আসলে নেই, আমার থাকাটা আমি তো কখনোই তার ওপরে চাপিয়ে দিইনি কিংবা কোনো দিন চাপিয়ে দেবও না – এটুকু হলেই আমাকে নিয়ে তার সব ভোগান্তি নিশ্চিত শেষ হয়ে যাবে। এখানে আমি আমার নিজের কথা পুরো বাদই দিচ্ছি, এটাও বাদ দিচ্ছি যে তার আচরণে আমিও অনেক বিব্রত হই; আমার এই নিজেরটুকু বাদ দিয়ে দেখার পেছনে কারণ হলো আমি ভালোভাবেই এটা জানি যে আমার এই বিব্রত হওয়াটা আমার জন্য তার ভোগান্তির তুলনায় কিছুই না। একই সঙ্গে আমি এটুকুও জানি যে তার এই ভোগান্তির মধ্যে আমার জন্য তার কোনো স্নেহ-ভালোবাসার

টুকরোটাও নেই; আমাকে ঠিক করা বা শোধরানো নিয়ে সামান্য মাথাব্যথাও নেই তার, তবে এটাও ঠিক যে আমার যেসব জিনিসে তার আপত্তি সেগুলোর কারণে আমার জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে এমনও নয়। কিন্তু আমার সামনে এগিয়ে যাওয়া নিয়েও সে থোড়াই কেয়ার করে, তার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তার নিজের স্বার্থ, সেটা হচ্ছে: আমি তাকে যে যন্ত্রণাটুকু দিই, তার শোধ নেওয়া, আর ভবিষ্যতে আরো যেসব যন্ত্রণা তাকে দিতে পারি বলে তার ভয়, সেগুলো ঠেকানো। আমি একবার তাকে দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে কী করলে সে তার এই বিরামহীন বিরক্তি থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে রেহাই পেতে পারে, কিন্তু তাতে করে সে এমনই রাগে ফেটে পড়েছিল যে আমি কখনোই ওই চেষ্টা দ্বিতীয়বার আর করব না।

আপনি বলতে পারেন, পুরো ব্যাপারটার জন্য আমিও কোনো-না-কোনোভাবে দায়ী, কারণ এই ছোটখাটো মহিলা আমার যতই অপরিচিত হোক – আর যতই এটা সত্যি হোক না কেন যে আমাদের মধ্যে একমাত্র সম্পর্কই হচ্ছে আমার তাকে বিরক্ত করাটুকু, কিংবা আমাকে সে যেটুকু বিরক্তি করতে দেয় সেটুকু – তার ওপরে ওই বিরক্তির স্পষ্ট শারীরিক প্রভাব পড়ছে; সেটা তো আমি পুরো অবজ্ঞা করতে পারি না। থেকে থেকেই আমি অন্যের কাছ থেকে শুনতে পাই, ইদানীং আগে বেশি বেশি করে শুনি, যে সে আবার কীভাবে রাতে ঘুম ভালো না হওয়ার কারণে মলিন চেহারা নিয়ে, মাথা-ফেটে-যাচ্ছে-এমন ব্যথা নিয়ে, আর কাজ করার জন্য প্রায় পুরোপুরি অসমর্থ অবস্থায় কীভাবে সকালে কাজে আসে; তার অবস্থা দেখে তার আত্মীয়স্বজন অনেক উদ্বিগ্ন, তারা এর কারণ খুঁজে বেড়ান, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো উত্তর তারা খুঁজে পাননি। কেবল আমিই জানি কারণটা কী: তার সেই একই পুরোনো আর সব সময় নতুন-করে-শুরু-হওয়া বিরক্তি, আমাকে নিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তার আত্মীয়স্বজনের মতো করে তাকে নিয়ে আমার উদ্বেগ হবে না; সে বেশ সবল ও শক্ত; ওই রকম প্রবল বিরক্ত হওয়ার ক্ষমতা যে রাখে তার তো সেটার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়; আমার এমনকি সন্দেহ হয় যে – অন্তত একটু হলেও – সে কষ্টে থাকার ভান করে যাতে করে মানুষের আমাকে নিয়ে সন্দেহ হয়। তাকে আমি কীভাবে জ্বালাতন করি সেটা সবার সামনে খোলাখুলি বলতে তার অহংকারে লাগে; আমার কারণে তার অন্য লোকের সাহায্য চাইতে হবে – ব্যাপারটা তার কাছে নিজের মর্যাদাহানির সমান; তাকে হরদম তাড়িত করে আমার জন্য এক ঘৃণার বোধ, নিরন্তর ঘৃণার বোধ; এরকম ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষয়টা লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করবে ভাবতেও সে অনেক লজ্জা পায়। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে সে একদম চুপ করে থাকবে তা-ও সে মেনে নিতে পারে না, মেনে না নেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত নিজের মধ্যে চাপ বোধ করে। সুতরাং তার মেয়েমানুষি ধূর্ততা নিয়ে সে বেছে নিয়েছে একটা মধ্যপন্থা: জনতার আদালতে বিষয়টা সে নীরবে, তার গোপন দুঃখের সামান্য একটু বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে, তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বোধ হয় সে এটাও আশা করছে যে লোকজন আমার ব্যাপারে একবার একটু পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেলে, আমাকে নিয়ে

সবার মধ্যে একটা ক্ষোভ জাগবে, সেই ক্ষোভের বিশাল শক্তি আছে আমাকে চিরদিনের জন্য দোষী করার, অন্যদিকে তার ব্যক্তিগত একক ক্ষোভ সে তুলনায় দুর্বল এবং তা কোনো দিনও আমাকে ওরকম শক্তভাবে ও চটজলদি দোষী বানাতে পারবে না; তখন সে স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবসর নেবে পর্দার আড়ালে, আমাকে পিঠ দেখাবে। হুঁ, সে যদি আশা করে যে সত্যিই ও রকম কিছু হবে, তাহলে বলব, বোকার স্বর্গে বাস করছে সে। লোকজনের বয়েই গেছে তার ভূমিকায় মঞ্চে নামতে; লোকজন যদি আমাকে কঠিন কোনো নিক্তিতেও তোলে, তবু আমার মধ্যে কোনো দিন ওই অজস্র ত্রুটি খুঁজে পাবে না। সে যেমন ভাবে, আমি তেমন কোনো মহা ফালতু লোক নই; বড়াই করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, বিশেষ করে এ বিষয় নিয়ে তো নয়ই; কিন্তু তবু বলব, আমি যদি কোনো ব্যতিক্রমী ধরনের সুনাগরিক না-ও হই, তার একদম উল্টোটাও আমি নিশ্চিত নই; শুধু তারই মনে হয় যে আমি সে রকম, শুধু তার ঐ দুচোখ, ওদের ওই প্রায় বিবর্ণ দীপ্তি, শুধু ওদেরই মনে হয় যে আমি সে রকম; অন্য কাউকে সে এ ব্যাপারে কোনো দিনই রাজি করাতে পারবে না। তো, তাহলে আমি কি নিশ্চিন্ত যে খারাপ কিছু ঘটবে না? না, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না; কারণ সত্যিই যদি এটা জানাজানি হয়ে যায় যে আমি আমার আচরণের মাধ্যমে তাকে বাস্তবিকই অসুস্থ বানিয়ে ফেলেছি – আর কিছু গুজব ছড়ানো মানুষ তো থাকেই, একদম হাল-না-ছাড়া কিছু নিরীক্ষক যারা তার কথা প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছে কিংবা অন্তত সে রকমই ভাব দেখাচ্ছে – যদি তারপর সারা দুনিয়া একসঙ্গে হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে: আমার শোধরানোর অযোগ্য খাসলত দিয়ে আমি কেন এরকম একটা নিরীহ ছোট মহিলাকে জ্বালাতন করছি, আমি কি আসলে তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে চাচ্ছি নাকি, আর কবে আমার একটু দয়ামায়া হবে, সামান্য বোধ হবে যে এবার ক্ষান্ত দিই – যদি পৃথিবী আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে, তার উত্তর দেওয়া তো কঠিন হবে। তখন কি আমি এটাই বলব যে আমি ওর ওসব অসুখের ন্যাকামিতে খুব একটা বিশ্বাস করি না, তা বললে কি আমার সম্বন্ধে মানুষের সেই বাজে ধারণাই হবে না যে আমি অন্যকে দোষ দিয়ে আসলে নিজের দোষ এড়াতে চাচ্ছি, আর কাজটা করছি সবচেয়ে অভদ্রলোকের মতো করে? আমি কি, ধরা যাক, সবার সামনে খোলাখুলি বলতে পারি যে, সে যদি সত্যিকারের অসুস্থ হয়েও থাকে, মানলাম, কিন্তু তবু তার জন্য আমার আসলে কোনো মায়া হচ্ছে না, কারণ এই মহিলা আমার একদমই অপরিচিত, আর আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক পুরোপুরি তারই বানানো, কেবল তার দৃষ্টিকোণ থেকেই এর অস্তিত্ব আছে, তা ছাড়া নেই? আমি বলছি না মানুষ আমাকে বিশ্বাস করবে না; এমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে তারা বিশ্বাসও করবে না, অবিশ্বাসও করবে না; তারা ওরকম জায়গায় আসবেই না যেখানে এসব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠতে পারে; তারা স্রেফ আমি একজন দুর্বল, রোগা মহিলাকে নিয়ে কী উত্তর দিলাম সেটা শুনবে, আর তা কোনোভাবেই আমার জন্য ভালো হবে না। কারণ এখানে, এরকম একটা ঘটনায়, আমি যে-উত্তরই দিই না কেন, আমার ওই ঝামেলা থাকছেই যে পৃথিবী সন্দেহ করবে নিশ্চিত

আমাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার আছে, যদিও এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে আমাদের দুজনের মধ্যে ও রকম কোনো ব্যাপার নেই, আর যদি থেকেও থাকত, সেটা খুব সম্ভব তার দিক থেকে যতটা না তার চেয়ে বেশি থাকত আমার দিক থেকেই, যেহেতু সত্যি যে আমি এই ছোটখাটো মহিলার বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও তার নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার অক্লান্ত শ্রমের প্রশংসাই করি, কিন্তু হায়, ঠিক তার এই গুণগুলো কিনা হরহামেশা আমার বিরুদ্ধেই সে ব্যবহার করে চলেছে অস্ত্র হিসেবে। তার মধ্যে আমার প্রতি বন্ধুত্বের সামান্য নিশানাও নেই; সে এ ব্যাপারে একদম সাফ-সাফ এবং আন্তরিক; এখানেই আমার শেষ আশা; আমার বিরুদ্ধে যে প্রচারাভিযান সে চালাচ্ছে, আমাদের মধ্যে প্রেমপ্রীতি-বিষয়ক গুজব উঠলে তাতে তার আরো হয়তো সাহায্য হবে, কিন্তু তবু তার মাথা এত বিগড়ে যায়নি যে ওই গুজবে ইন্ধন দেবে সে। কিন্তু আমজনতা এসব একদমই বুঝবে না, তারা যা ধারণা করেছে তাতেই স্থির থাকবে আর তাদের রায় নিশ্চিত আমার বিপক্ষেই যাবে।

সুতরাং আমার হাতে এখন একটা উপায়ই আছে – সময় থাকতেই নিজেকে বদলানো, বাইরের পৃথিবী নাক গলানোর আগেই অন্তত এটুকু নিজেকে বদলে ফেলা যাতে করে এই ছোট মহিলার আমার প্রতি ঘৃণার পুরোপুরি অবসান না ঘটলেও – সেটা অচিন্তনীয় ব্যাপার – তা মাত্রায় যেন কিছুটা হলেও কমে আসে। আর আসলেই আমি অনেকবার বিভিন্ন সময়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছি – আমার বর্তমান অবস্থা নিয়ে সত্যিই আমি কি এত খুশি যে নিজেকে বদলাবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই, সত্যিই কি আমার অন্তত কিছু কিছু বিষয় বদলানো যায় না (ধরলাম যে সেগুলো বদলাবার প্রয়োজন নিয়ে আমার নিজের ভেতরই কোনো প্রত্যয় নেই) স্রেফ ঐ মহিলাকে শান্ত করবার স্বার্থে? কথা হচ্ছে আমি ঐকান্তিকভাবেই সে চেষ্টা করেছি, যত্ন দিয়ে এবং কষ্ট করে সে চেষ্টা করেছি; আমার ভালোই লেগেছে ব্যাপারটা, এমনকি মজাও পেয়েছি; তাতে করে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন এসেছে ঠিকই, সবাই পরিষ্কার দেখবে এমন কিছু পরিবর্তন, ঐ মহিলাকে আমার কষ্ট করে সেগুলো দেখাতে হয়নি, ও ধরনের যেকোনো কিছু আমার অনেক আগে তার নিজেরই চোখে পড়ে, আমার আচরণে এর কোনো ছায়া পড়লেই সে তা ধরে ফেলতে পারে; কিন্তু বাস্তবে কোনো কাজ হলো না এসব করে। হবেই বা কী করে? আমার প্রতি তার অসন্তুষ্টি একেবারেই মূলগত, সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি এখন; কোনোকিছুই তার অবলুপ্তি ঘটাতে পারবে না, এমনকি আমার নিজের বিলুপ্তি হয়ে গেলেও না; ধরুন, সে শুনল আমি আত্মহত্যা করেছি, তাতে সে যে কী রকম সীমাহীন ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ হয়ে যাবে তা আমি আন্দাজ করতে পারি। আমি ভাবতে পারি না তার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধির কোনো মানুষ ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখতে পারছে না যেভাবে আমি পারছি, মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, তার চেষ্টাগুলো যে কত অর্থহীন তা কি সে দেখে না? সেই সঙ্গে আমার নিজের নিষ্পাপতা, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার চাহিদা মেটাতে আমার অক্ষমতা – এসব কি সে দেখে না? অবশ্যই সে দেখে, কিন্তু তার স্বভাব যেহেতু লড়াই করা, তাই

যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে সে এটা ভুলে যায়, অন্যদিকে আমার নিজের অসুখী স্বভাব – আমার ওটা নিয়ে করার কিছুই নেই, আমি জন্মেছিই ওই স্বভাব নিয়ে – হচ্ছে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ক্রোধের চিৎকার করছে এমন কারো কানে খুব বেশি হলে মৃদু দু-একটা সাবধানের কথা ফিসফিস করে বলা। নিঃসন্দেহে, এভাবে আমাদের দুজনের মধ্যে কখনোই বোঝাপড়া হবে না। আমি আমার বাসা থেকে, ধরুন যে, ভোরবেলার দারুণ আনন্দের মধ্যে বাইরে পা দিতেই থাকব, আর আমার দেখা হতেই থাকবে ঐ অসন্তুষ্ট চেহারার মানুষটার সঙ্গে, আমার কারণেই সে অসন্তুষ্ট, আর সেই গোমড়া মুখের কোঁচকানো ঠোঁট, সেই সন্ধানী দৃষ্টি যা আগে থেকেই জানে যে কী দেখতে পাবে, আমার ওপর দিয়ে সোজা চলে যাবে ঐ দৃষ্টি, যতই ঝটতি দৃষ্টি হোক কিছুই তার চোখ এড়াবে না, সেই বাচ্চা মেয়ের মতো গালে দাগ কেটে বসে যাওয়া ত্যক্তবিরক্ত একটু হাসি, সেই আকাশের দিকে শোকার্তভাবে তাকিয়ে থাকা, সেই কোমরের ওখানে শক্তভাবে হাত রেখে শরীর সোজা করা আর তারপর সেই ফ্যাকাশে মুখে কাঁপতে কাঁপতে রোষে ফেটে পড়া।

কিছুদিন আগে এই প্রথমবারের মতো – আমি আসলে অবাকই হলাম যে এত দিনে এই প্রথমবার – আমি আমাদের ব্যাপারটা আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে একটু ইঙ্গিতে জানালাম, স্রেফ কথার কথা হিসেবে আর কি, স্রেফ হঠাৎ করে দু-একটা কথা বলে ফেললাম এমনভাবে – চেষ্টা করলাম পুরো বিষয়টার গুরুত্ব বাস্তবে যতটুকু তার চেয়ে অল্প একটু কমিয়ে দেখানোর, অবশ্য বাইরের মানুষের হিসেবে দেখলে এটার গুরুত্ব তো এমনিতেও আসলে খুব বেশি না। অদ্ভুত ঘটনা যে, তার পরেও আমার বন্ধু ঠিকই ধরতে পারল; শুধু তা-ই না, আমার চোখে ধরা পড়েনি এমন কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সে সামনে তুলে ধরল, কথা ঘুরিয়ে তার মন আমি অন্যদিকে নিতে ব্যর্থ হলাম, সে এই বিষয় নিয়েই কথা চালিয়ে যাওয়ার জেদ ধরে থাকল। আরো অদ্ভুত যে, ওদিকে পুরো বিষয়টার একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক কিনা সে ছোট করে দেখল, আন্তরিকভাবে আমাকে উপদেশ দিয়ে বসল যে কিছুদিনের জন্য আমি যেন দূরে কোথাও চলে যাই। এত বোকার মতো আর কোনো উপদেশ হতে পারে না; ব্যাপারটা খুব সহজ-সাধারণ, যে-কেউ একটু ভালো করে দেখলেই বুঝবে যে কত সহজ, কিন্তু তাই বলে এত সহজ না যে আমি দূরে চলে যাব আর এর সবকিছুর – কিংবা এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর – সমাধান হয়ে যাবে। বরং উল্টোটাই, দূরে চলে যাওয়াই হবে আমার জন্য সবচেয়ে বড় ভুল; আমাকে যদি কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হয় তা বরং এ রকম: ব্যাপারটা এখনকার সীমাবদ্ধ পরিসরেই রাখতে হবে, এখন যেমন বাইরের পৃথিবী এতে এখনো ঢুকে যায়নি, সেভাবেই রাখতে হবে; অন্য কথায় আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকতে হবে চুপচাপ, দেখতে হবে এটা যেন কোনো বড় মাপের, চোখে-পড়ার-মতো-আকার না নিয়ে নেয়; তার মানে হচ্ছে আমাকে অন্য আরো কিছু বিষয়ের সঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যেন এটা নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলি; এই সবকিছুই দরকারি এজন্য না যে এটা কোনো বিপজ্জনক গোপন বিষয়, বরং এজন্য যে এটা একটা গৌণ, পুরোদস্তুর ব্যক্তিগত

বিষয়, সবকিছুর পরেও এটা হালকা একটা বোঝা, আর এটা তেমনই রাখা সংগত। এদিক দিয়ে দেখলে আমার বন্ধুর উপদেশ আমার জন্য মূল্যহীন নয়; আমি তার উপদেশ থেকে নতুন কিছু হয়তো শিখিনি, কিন্তু ওগুলো আমার মৌলিক ভাবনাচিন্তাকে অন্তত কিছুটা আরো শক্তিশালী রূপ দিয়েছে।

আরো ভালো করে ভাবলে দেখা যায় আসলে পরিস্থিতির এই ইদানীংকালের পরিবর্তনগুলো মোটেই সত্যিকারের কোনো পরিবর্তন নয়, সাধারণ অর্থে এটাই সত্যি; বরং যা ঘটেছে তা হলো এই পরিবর্তনগুলো আমি উপলব্ধি করা শুরু করেছি, ওগুলোর প্রতি আমার আচরণে বিবর্তন ঘটেছে – একদিকে আমি হয়ে উঠেছি আরো শান্ত, আরো পুরুষোচিত, ঘটনার মূল বিন্দুর আরো কাছাকাছি পৌছানো এক মানুষ; অন্য দিকে – আমাকে মানতেই হচ্ছে – আবেগের নিয়মিত ওঠানামার প্রভাবে, যতই তুচ্ছ আবেগ হোক না কেন, আমি কী ধরনের যেন একরকম নার্ভাস বোধ করছি, ওটা থেকে বেরোতে পারছি না।

পুরো বিষয়টা নিয়ে আমি আরো শান্ত হয়ে উঠছি এ-অর্থে যে আমার বিশ্বাস জন্মেছে, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, কখনো-সখনো তা যতই আসন্ন মনে হোক না কেন, আসতে সম্ভবত এখনো অনেক দেরি; সাধারণত বয়স যখন কম থাকে দেখা যায় সবাই ভাবে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো কোনো কঠিন ব্যাপার কি না; যখনই আমার এই ছোটখাটো বিচারক আমাকে দেখে নিস্তেজ হয়ে তার চেয়ারের এক পাশে ঢলে-নুয়ে পড়ত, এক হাতে চেয়ারের পেছন ধরে আর অন্য হাতে অস্থিরভাবে তার কাপড় হাতড়াতে-হাতড়াতে, দেখা যেত তার গাল বেয়ে পড়ছে ক্রোধ ও হতাশার অশ্রু, আমি সব সময় তখন ভাবতাম সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তটা এসে গেছে, শিগগিরই আমাকে জবাবদিহি করতে বলা হবে। কিন্তু দেখা গেল কিছুই না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, জবাবদিহি করার কোনো ডাক এল না – মেয়েরা বহু কিছুতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে প্রায় প্রায়, পৃথিবীর সময় নেই ওদের ওই প্রতিটা ব্যাপারের বিচার করতে বসার। তো, তাহলে, এই এতগুলো বছরে আসলে সত্যিকার অর্থে ঘটলটা কী? এটুকুই যে ওরকম ঘটনা বারবার ঘটল, মাত্রায় হয়তো কোনো বার বেশি, কোনো বার কম, কিন্তু সবটা মিলে মোদ্দা কথা যোগফল এখন আগের চেয়ে বড়। আর এটাও ঘটল যে, লোকজন ইতিউতি দিতে লাগল আশপাশে, পথ পেলেই নাক গলাবে সেই আশায়, কিন্তু কোনো পথ তারা পেল না; এখন পর্যন্ত তারা ভরসা করেছে স্রেফ তাদের নাকের ওপর, যেন গন্ধ শুঁকে বের করবে কী চলছে আমাদের দুজনের মধ্যে, তবে ওসব শোঁকাশুঁকির যাদের স্বভাব তারা হয়তো মহা ব্যস্ত থাকে, তবে তাতে কোনো দিন কোনো কাজের কাজ হয় না। কিন্তু সব সময়ে মূলত এমনটাই হয়ে এসেছে; সব সময়েই এই ফালতু টো-টো কোম্পানির দল আশপাশে ঘুরেছে, বাতাসে গন্ধ শুঁকেছে জোরে জোরে, চালাকের মতো – আত্মীয়তার অজুহাত দিয়ে – জায়েজ করেছে তাদের আশপাশে থাকা; সব সময় সতর্ক পাহারা দিয়ে রেখেছে তারা, সব সময় শুঁকতে শুঁকতে নাক ভরিয়ে রেখেছে কোনো-না-কোনো গন্ধে, কিন্তু কী লাভ? এতকিছু করে তাদের

এটুকুই লাভ যে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে তারা, এখনো। আগের থেকে একমাত্র পার্থক্য, আমি ধীরে ধীরে এদের সবাইকে চিনতে শিখেছি, একজনের থেকে আরেকজনের চেহারা আলাদা করা শিখেছি; একসময় আমি বিশ্বাস করতাম এরা ধাপে ধাপে জড়ো হচ্ছে সব জায়গা থেকে, তার ফলে আমাদের ব্যাপারটা যত দিন যাচ্ছে তাতে আরো বড় আকার নিয়ে নিচ্ছে এবং শুধু এ কারণেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময়টা আসতে আর বোধ হয় বাকি নেই; আজ আমার বিশ্বাস, সবকিছু সেই গোড়া থেকে এরকমই ছিল, সব সময়; এর সঙ্গে সিদ্ধান্তে আসার যোগ অতি সামান্য কিংবা একেবারেই নেই। আর সিদ্ধান্তের বিষয়টা – আমিই বা ওটাকে এরকম ওজনদার নাম দিচ্ছি কেন? সিদ্ধান্ত! যদি অমনটা আসলেই কোনো দিন ঘটে – নিশ্চিত যে কাল ঘটবে না, কিংবা পরশুও না, সম্ভবত কোনো দিনও না – যদি লোকজন আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে সত্যি ব্যস্ত হয়ে পড়ে (তাদের যে এ বিষয়ের বিচার করার কোনো যোগ্যতাই নেই, সে কথা আমি বারবার, বারবার বলব) সেই বিচার-আচারে আমার নিশ্চিত সামান্য কিছু ক্ষতি তো হবেই, কিন্তু তা হলেও কোনো সন্দেহ নেই লোকজন এটাও বিবেচনায় নেবে যে আমি অন্ধকারে ভেসে আসিনি, আমাকে মানুষজন চেনে, সব সময় সবার চোখের সামনেই জীবন কাটিয়েছি আমি, মানুষকে বিশ্বাস করেছি আর মানুষও এর প্রতিদানে আমাকে বিশ্বস্ত হিসেবেই নিয়েছে, অতএব ঐ ছোটখাটো দুঃখী মহিলা, এই সেদিন উদয় হওয়া ঐ মহিলা – যাকে, কথার কথা বলছি, অন্য যেকোনো লোক চিনে ফেলত ক্লান্তিহীন এক গায়ে লতিয়ে পড়া, জড়িয়ে থাকা মেয়ে হিসেবে আর জনতার কানের আড়ালেই জুতোর তলায় পিষে গুঁড়িয়ে মারত বহু আগেই – খুব বেশি হলে কী করতে পারে? খুব বেশি হলে পারে সমাজের সম্মানিত একজন ভদ্রলোক হিসেবে বহু আগে আমি যে সনদপত্র পেয়ে গেছি তাতে শুধু একটু ছোট, কুৎসিত একটা দাগ ফেলতে, স্রেফ ওটুকুই। এখনকার অবস্থা ঠিক এরকম; অন্য কথায়, আমার আসলে চিন্তার খুব বেশি কিছু নেই।

তবে আমি যে গত কয়েক বছর ধরে সামান্য হলেও দুশ্চিন্তা করেছি, তার সঙ্গে ব্যাপারটার সত্যিকারের গুরুত্ব থাকা-না-থাকার কোনো সম্পর্ক নেই; আপনি অন্যের জন্য লাগাতার বিরক্তির কারণ – এটা আপনি কাহাতক সহ্য করবেন? যদি দেখেন যে ওই লোকের বিরক্তির আসলে কোনো কারণই নেই, তবুও তো সহ্যের একটা সীমা থাকবে; একসময় একটু দুশ্চিন্তা তো আপনার হবেই; আপনি বাস করতে শুরু করবেন সব সময় সিদ্ধান্ত আসার এক অপেক্ষার মধ্যে, যদি সেটা স্রেফ শারীরিক অর্থে হয় কিংবা ওসব সিদ্ধান্ত আসার বিষয় নিয়ে খুব বেশি বিশ্বাস আপনার যদি না-ও থাকে তো তবু। অংশত, আমার বিশ্বাস, এ সবকিছুর জন্য দায়ী বয়স বাড়ার ব্যাপারটা; কম বয়স থাকতে সবকিছু মানিয়ে যায় সুন্দরমতো; তারুণ্যের অবিরাম কল্লোলিত শক্তির সামনে যে-কারোরই খারাপ দিকগুলো হারিয়ে যায়; তরুণ বয়সে কারো দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকুন, কেউ আপনার ওপর খেপে যাবে না, কেউ আসলে তা ধরতে গেলে খেয়ালই করবে না, যার কথা বলা হচ্ছে সেই তরুণ নিজেও না; কিন্তু বয়স বাড়লে, বুড়ো হলে কী হয়? পেছনে

ফেলে আসা ঐ সবকিছু তখন ছিটকাপড়ের মতো অবশেষে, এর প্রতিটা টুকরোই দরকারি, কোনোটাই নতুন করে শুরু করা যাবে না, প্রতিটাই সবাই খেয়াল করছে; আর অন্যদিকে বয়স বেড়ে যাওয়া কোনো লোকের তীক্ষ্ণ চোখে তাকানো নিয়ে কোনো এটা-ওটা নেই, তা সোজা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকারই ব্যাপার, সবারই চোখে পড়বে সেটা। তবে এখানেও, আগের মতোই, সত্যি বিরাট যে কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে তা কিন্তু না।

অতএব, যেদিক থেকেই দেখি না কেন, আমার সব সময়েই মনে হয় – আর আমার এ বিশ্বাস থেকে আমি নড়ছি না – আমি যদি শুধু আমার হাত দিয়ে এই ছোট ব্যাপারটা একটু হালকা মতন ঢেকে বা লুকিয়ে রাখি, তাহলে এই মহিলা যতই দুর্বার ক্রোধে ফেটে পড়ুক না কেন, আমি এত দিন যেভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছি সে রকমই আরো অনেক বছর, পৃথিবীর যন্ত্রণা থেকে নির্বিঘ্নে, আমার জীবন কাটিয়ে দিতে পারব।

এক অনশন-শিল্পী

অনশন-শিল্পীদের ওপরে মানুষের আগ্রহ বিগত কয়েক দশকে বেশ কমে গেছে। আগে যেখানে যে-কেউ নিজের উদ্যোগে ওরকম প্রদর্শনীর বড় মাপের আয়োজন করলে অনেক টাকা কামাতে পারত, আজ তা অনেকটাই অসম্ভব। দিনকাল বদলে গেছে। তখনকার দিনে অনশন-শিল্পীকে নিয়ে সারা শহর কীরকম মেতে থাকত; তার না-খেয়ে থাকার দিন যত পার হতো, মানুষের উদ্দীপনা আরো বাড়ত; সবাই রোজ অন্তত একবার করে হলেও চাইত অনশন-শিল্পীকে দেখতে যাবে; তার অনশনের শেষের দিকে শিক-দেওয়া ছোট খাঁচাটার সামনে বিশেষ সংরক্ষিত আসনগুলোয় লোকজন বসে থাকত সারা দিন ধরে; এমনকি রাতের বেলায়ও শো চলত, টর্চের আলো জ্বালিয়ে শো'র চটক বাড়িয়ে তোলা হতো; যেদিন আবহাওয়া ভালো থাকত, খাঁচাটা বাইরে বয়ে আনা হতো, ওভাবে বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য অনশন-শিল্পীকে দেখানোর ব্যবস্থা হতো; বড়দের কাছে যেখানে অনশন-শিল্পী একধরনের তামাশা-মশকরার বিষয়, তারা সেই তামাশায় অংশ নেয় কারণ অমনটাই হাল ফ্যাশনের নিয়ম, সেখানে বাচ্চারা দাঁড়িয়ে থাকত মুখ হাঁ করে, বিপদমুক্ত থাকার জন্য তারা একজন আরেকজনের হাত ধরে থাকত আর তাকে দেখত খাঁচার ভেতরে তার জন্য বিছানো খড়ের উপর বসে আছে, চেয়ারে বসতেও মহা অরুচি তার, কালো সাঁতারের পোশাক পরা একটা [illegible] শরীর, পাঁজরের হাড়গুলো বেরিয়ে আছে কিম্ভূতকিমাকারভাবে, এই মাথা নুইয়েছে বিনয়ের সঙ্গে, এই একটা কষ্টের হাসি দিয়ে জবাব দিচ্ছে কোনো প্রশ্নের, মাঝে মাঝে শিকের ভেতর থেকে একটা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে বাইরে যেন বাচ্চারা ছুঁয়ে দেখতে পারে কী লোলচর্ম হাল তার, কিন্তু তারপরই নিজেকে ফের সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের ভেতরে, কারোর দিকেই কোনো মনোযোগ দিচ্ছে না, এমনকি খাঁচার ভেতরে যে দেয়ালঘড়ি – তার কাছে যেটা অনেক প্রিয় একটা জিনিস আর তার খাঁচার একমাত্র আসবাব – সেটা বেজে উঠলেও তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, সে শুধু আধবোজা চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে আর তার শুকনো ঠোঁট একটু ভেজানোর জন্য একটা ছোট গ্লাস থেকে কখনো-সখনো চুমুক দিচ্ছে একটু।

তাকে দেখতে আসা ও ভেতরে ঢোকা এইসব দর্শকের পাশাপাশি আরো থাকত স্থায়ী পাহারাদারেরা, জনগণই ঠিক করত কারা পাহারাদার হবে – যথেষ্ট অবাক ব্যাপার যে সব সময় দেখা যেত এরা সবাই পেশায় কসাই – এদের কাজ ছিল প্রতি শিফ্‌টে তিনজন করে সারা দিন সারা রাত অনশন-শিল্পীর দিকে নজর রাখা, এটুকু নিশ্চিত করা যে অনশন-শিল্পী কোনো গোপন যন্ত্রের সাহায্যে তার শরীরে পুষ্টি জোগাচ্ছে না। তবে এটা ছিল স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা, জনসাধারণকে অনশন বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়ার ভাবনা থেকেই এর শুরু হয়েছিল, উদ্যোক্তারা ভালোভাবেই জানত যে অনশন-শিল্পী তার অনশনের দিনগুলোতে কখনোই কোনো অবস্থাতেই, এমনকি তাকে জবরদস্তি করা হলেও, এক টুকরো খাবারও মুখে তুলবে না; তার শিল্পের মর্যাদা তাকে অমন কিছু করতে দেবে না। তবে অবশ্য সব

পাহারাদারই যে এই সত্যটা বুঝত এমন না, প্রায়ই এমন পাহারাদারের দল দেখা যেত যারা রাতের শিফটে পাহারা দিতে গিয়ে বিরাট উদাসীন আচরণ করত, ইচ্ছে করে এক কোনায় জড়ো হয়ে মগ্ন থাকত তাস খেলায়, তাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য অনশন-শিল্পী এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নিক, তারা ভাবত গোপন কোনো ভান্ডার থেকে খাদ্য আহরণ করার কোনো একটা উপায় অনশন-শিল্পী জানে। এ ধরনের পাহারাদারেরাই ছিল অনশন-শিল্পীর জন্য সবচেয়ে যন্ত্রণার বিষয়; ওরা তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলত; তার অনশনকে বীভৎস রকমের কঠিন বানিয়ে ছাড়ত; তাদের সন্দেহ যে কত ভুল তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে সে শরীরের যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে তা জড়ো করে তাদের পাহারার সময় গান ধরত, যতক্ষণ শক্তিতে কুলায় – গেয়ে চলত। কিন্তু তাতে খুব কোনো কাজ হতো না; বরং ওরা এতে আরো অবাক হতো যে গান গাইতে গাইতে খাওয়ার ক্ষমতাও এই লোকের আছে। এদের চেয়ে অনেক বেশি সে পছন্দ করত সেই সব পাহারাদারদের যারা শিকের কাছ ঘেঁষে বসে থাকত, অডিটোরিয়ামের ক্ষীণ রাত্রিবেলার আলোতে সন্তুষ্ট হতে পারত না, তাই তার ওপরে ফেলে রাখত তাদেরকে ম্যানেজার সাহেবের দেওয়া বৈদ্যুতিক টর্চের আলো। ঐ চোখ-ধাঁধানো আলোতে তার একটুও অসুবিধা হতো না, ঘুম তো তার এমনিতেই হতো না, আর যতই আলো থাকুক, ঘড়িতে যে কাঁটাই বাজুক, সব সময়েই চট করে একটু তন্দ্রার মধ্যে চলে যাওয়া তার জন্য সম্ভব ছিল যেকোনো সময়, এমনকি যখন অডিটোরিয়াম গিজগিজ করত হই-হট্টগোল করা দর্শকে, তখনো। ঐসব পাহারাদারের সঙ্গে সারা রাত একটুও না-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে খুবই রাজি থাকত সে; ওদের সঙ্গে তামাশা-কৌতুক করতেও রাজি থাকত; চাইত ওদের শোনাবে তার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এই জীবনের গল্প আর ওদের থেকে শুনবে ওদেরটাও, অর্থাৎ যেকোনো কিছুতেই রাজি সে, উদ্দেশ্য স্রেফ ওদের জাগিয়ে রাখা যেন সে বারবার দেখাতে পারে যে তার খাঁচার মধ্যে কোনো খাদ্য নেই আর সে এমনভাবেই অনশন করছে যেটা করার ক্ষমতা ওদের কারো নেই। তবে সে সবচেয়ে খুশি হতো যখন সকালে তার নিজের খরচে ওদের সবার জন্য আসত বিরাট নাশতা; ক্লান্তিকর রাতভর পাহারার পরে কোনো সুস্থ মানুষের যে খিদে লাগে, সেরকম খিদে নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ত নাশতার ওপর। তবে এমন লোকও আছে যারা ভাবত, এভাবে পাহারাদারদের নাশতা খাওয়ানোর পেছনে হীন উদ্দেশ্য আছে, অনশন-শিল্পী ওদের দলে টানতে চাইছে, কিন্তু এরকম সন্দেহকে বাড়াবাড়িই বলতে হবে, তাদের যদি তখন উল্টো জিজ্ঞাসা করা হতো সকালের নাশতা ছাড়া তারা রাতের পাহারা দিতে রাজি কি না, অর্থাৎ পাহারা শুধু পাহারা দেওয়ারই স্বার্থে, সে বেলায় কিন্তু সব দৌড়ে পালাত, তবে সন্দেহ করা কিন্তু তার পরও ছাড়ত না।

অনশন-শিল্প নিয়ে মানুষের অসংখ্য সন্দেহের মাত্র একটা উদাহরণ এটা। কথা হচ্ছে, এমন কেউ নেই, যার পক্ষে সম্ভব অনশন-শিল্পীকে সারা দিন, সারা রাত ধরে দিনের পর দিন লাগাতার পাহারা দিয়ে যাওয়া, তাই কেউই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারবে না তার অনশন সত্যিকারের একটানা ও ত্রুটিহীন অনশন ছিল কি না; সেটা শুধু অনশন-

শিল্পীই জানে; অতএব তার নিজের অনশনের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত দর্শক হওয়া একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সে নিজেও, অন্য এক কারণে, কখনোই নিজের ওপর তৃপ্ত হতো না; তাকে যে দেখতে এরকম কঙ্কালের মতো রোগা লাগত – ওই দৃশ্য সহ্য করতে না-পারার কারণে অনেকেই আফসোসের সঙ্গে তার শো দেখতে যাওয়া পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিত – তা সম্ভবত তার অনশন চালিয়ে যাওয়ার কারণে মোটেও না, সম্ভবত তাকে ওরকম কঙ্কাল বানানোর পেছনে স্রেফ তার নিজের ওপর অতৃপ্তিই দায়ী। কারণ একমাত্র সে-ই জানত, যা কিনা অনশন-শিল্পের বোদ্ধা কেউও জানত না, যে অনশন করা কত সহজ। পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ এটা। এ কথা গোপন করত না সে, কিন্তু মানুষ তার কথা বিশ্বাস করত না, খুব বেশি হলে তারা ভাবত এটা তার বিনয়, বেশিরভাগ লোকই ভাবত এটা তার প্রচারসর্বস্ব মানসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়, কিংবা কেউ কেউ এমনও ভাবত যে সে একটা বাটপার, তার জন্য তো অনশন করা সহজ হবেই, কারণ সে তো জানে কাজটা কী করে সহজ করতে হয়, আর দ্যাখো কী ঔদ্ধত্য তার যে কথাটা সে এভাবে অর্ধেক স্বীকারও করছে। এই সবকিছু সহ্য করে যেতে হতো তাকে। সত্যি বলতে, যত বছর পার হতে লাগল, এগুলো গা-সওয়া হয়ে গেল তার কাছে, যদিও ভেতরে ভেতরে তার এই অসন্তোষ তাকে খুঁচিয়ে মারত, তাই মনে হয় কোনো দিন, একবারের জন্যও কোনো অনশন পর্বের শেষে – এটুকু তাকে কৃতিত্ব দিতেই হবে – সে নিজের থেকে খাঁচা ছেড়ে যেতে চায়নি। তার ম্যানেজার তাকে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন অনশন করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, এর থেকে বেশি দিন অনশন চালানোর অনুমতি তার কখনোই মিলত না, এমনকি বড় নামকরা শহরগুলোতে গেলেও না, এর পেছনে অবশ্য যুক্তিসংগত একটা কারণও ছিল। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যেকোনো শহরেই অনশন-প্রদর্শনীর ওপরে মানুষের আগ্রহ, প্রচার-প্রচারণা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে, মোটামুটি দিন-চল্লিশেক পর্যন্ত জারি রাখা যায়, কিন্তু তারপর দর্শকসংখ্যা কমতে শুরু করে, দর্শক উপস্থিতি দেখা যায় ধুপ করে পড়ে যায়; স্বাভাবিক যে শহর ও অঞ্চলভেদে এই হিসাবের অল্পস্বল্প তারতম্য হতো, কিন্তু মোটের ওপর ওটাই নিয়ম ছিল যে চল্লিশ দিনই সর্বোচ্চ সীমা। অতএব তাই, চল্লিশতম দিনে, খোলা হতো ফুলে ফুলে ভরে থাকা খাঁচার দরজা, উৎসাহী দর্শকের ভিড়ে ভরে যেত প্রদর্শনীর পুরো এলাকা, সামরিক বাদ্যযন্ত্রীদের দল বাজনা বাজাত, দুজন ডাক্তার খাঁচার ভেতরে ঢুকত অনশন-শিল্পীর শরীরের প্রয়োজনীয় মাপজোক নিতে, মেগাফোনের সাহায্যে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে ঘোষণা করা হতো ফলাফল, আর সবশেষে দুই তরুণী সামনে এগিয়ে আসত, ওরা খুশিতে আটখানা যে ওদের ওপর এই দায়িত্ব পড়েছে, ওদের কাজ অনশন-শিল্পীকে খাঁচা থেকে বার করে আনা, তারপর কয়েক কদম হেঁটে তাকে একটা ছোট টেবিলের কাছে নিয়ে যাওয়া – ওটাতে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা থাকত অনেক দিন না-খাওয়া কোনো মানুষের জন্য উপযোগী কিছু খাবার। এই মুহূর্তটা এলেই অনশন-শিল্পী সব সময় বাধা দিয়ে বসত। এই দুই তরুণীর তার গায়ের উপর ব্যাকুল হয়ে ঝুঁকে পড়ে বাড়িয়ে দেওয়া হাতের মধ্যে নিজের হাড় জিরজিরে হাত দুটো সঁপে দিতে অনশন-শিল্পীর

কোনো আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে তার থাকত ঘোর আপত্তি। কেন, চল্লিশ দিন পর কেন সে তার অনশনে ক্ষান্ত দেবে? সে তো আরো অনেক দিন অনশন চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল, সীমাহীন আরো অনেক কাল চালাতে পারত সে এভাবেই; তাহলে কেন হঠাৎ এখনই থামতে হবে তাকে, যখন কিনা সে তার অনশনের সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে, সত্যিকার অর্থে যখন কিনা তার অনশনের সেরা বিন্দুতে পৌঁছানোর এখনো বাকি? কেন তারা তার কাছ থেকে তার অনন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার গৌরব কেড়ে নিতে চায় – শুধু যে সর্বকালের সেরা অনশন-শিল্পী হওয়ার গৌরব তা-ই নয় (সম্ভবত এরই মধ্যে সে ওটা হয়ে গেছে), সেই সঙ্গে তার নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার, চিন্তার অগম্য এক জিনিস অর্জন করার গৌরবটুকুও? তার এরকম ভাবার কারণ সে বিশ্বাস করে তার অনশন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সীমাহীন। কেন ভিড়ের এই জনতা, যারা দাবি করে অনশন-শিল্পীকে এত ভালোবাসার, কেন তারা তার ব্যাপারে এত অধৈর্য হবে; সে যদি নিজে আরো বেশি দিন অনশন মেনে নিতে পারে, তাদের তাতে সমস্যা কিসের? আর তা ছাড়া সে তো ক্লান্ত, ভালোই তো আরাম করে সে বসে ছিল খড়ের উপর, সেই তাকে কিনা এখন উঠে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে আর এগিয়ে যেতে হবে খাবারের কাছে – খাবার, ওটা ভাবলেই তো তার গা গুলিয়ে আসে, এমন গা-গোলানো এক অনুভূতি হয় যা কিনা তাকে অনেক কষ্টে, ঐ মেয়ে দুটোর প্রতি সম্মানবশত, দমিয়ে রাখতে হয়। সে তখন তাকাত ঐ মেয়ে দুটোর চোখের দিকে, ওপরে ওপরে কত বন্ধুত্বের সেই দৃষ্টি, কিন্তু বাস্তবে আসলে কত নিষ্ঠুর; তারপর সে মাথা নেড়ে 'না' জানাত, তার ঐ নিস্তেজ ঘাড়ের উপরে কেমন ভার হয়ে বসে পড়ত তার মাথা। কিন্তু এরপর তা-ই ঘটত যা সব সময়ে ঘটে। ম্যানেজার সাহেব নিজে গিয়ে হাজির হতো ওখানে; নীরবে – যেহেতু ব্যান্ডের বাজনার কারণে কোনো কথা বলা যেত না – সে অনশন-শিল্পীর দেহটার উপরে নিজের দুই হাত তুলে ধরত যেন স্বর্গের দিকে কাউকে ডাকছে এইখানে এই খড়ের উপর বসে থাকা তার সৃষ্টিকর্মটি দেখতে, এই শোচনীয় শহীদ বেচারাকে দেখতে – অনশন-শিল্পী সত্যিকার অর্থে তো তা-ই, স্রেফ ভিন্ন এক অর্থে, এই যা। তারপর ম্যানেজার তাকে তার সরু কোমর বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরত, একটু বাড়াবাড়ি রকম সহৃদয়তা দেখিয়ে কাজটা করত সে যাতে করে দর্শকেরা বুঝতে পারে কত পলকা একটা জিনিস তাকে নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে; এবার সে তাকে তুলে দিত – সবার চোখের আড়ালে দু-একটা ঝাঁকি দিয়ে তবেই, এর ফলে অনশন-শিল্পীর শরীরের উপরের অংশ ও নিচের অংশ অসহায়ের মতো দুলত টলমলিয়ে – মরা মানুষের চেহারার মতো ফ্যাকাশে হয়ে আসা মেয়ে দুটোর হাতে। ততক্ষণে অনশন-শিল্পী নিজেকে পুরো সঁপে দিয়েছে পরিস্থিতির কাছে; তার মাথা ঢলে পড়েছে বুকের উপর; দেখে মনে হচ্ছে গড়িয়ে ওখানে গেছে যেন মাথাটা আর হঠাৎ যেন থমকে গেছে ওখানটায়; তার শরীর দেখতে লাগছে একদম কোনো কোটরের মতো; তার পা দুটো হাঁটুর ওখানে একটার সঙ্গে অন্যটা জড়িয়ে আছে, কোনোভাবে নিজেদের বাঁচাতে চাইছে ওরা, তবে যেভাবে মাটির উপর টলটলিয়ে ঘসটে আছে ওরা, দেখে মনে হচ্ছে ওটা

যেন সত্যিকারের মাটি নয়, সত্যিকারের মাটি কোথায় তা যেন খুঁজছে ওরা; তার পুরো শরীর, নিশ্চিত ওজনে অতি সামান্য, মেয়ে দুটোর একটার উপরে হেলে আছে, মেয়েটা তখন সাহায্যের জন্য তাকাচ্ছে চারপাশে, নিশ্বাস ফেলছে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে – সে ভাবেনি তার এত সম্মানের কাজ আসলে এ জায়গায় এসে ঠেকবে – প্রথমে ঘাড়টা যত দূর পেছনে পারা যায় সরিয়ে নিচ্ছে সে, তার লক্ষ্য কোনোভাবেই যেন অনশন-শিল্পীর গালে তার গাল লেগে না যায়, কিন্তু এরপর সে দেখল যে তা অসম্ভব আর তার ভাগ্যবান সঙ্গীটি তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না – সেই মেয়ে খুশি যে তাকে শুধু তার কাঁপা হাতে অনশন-শিল্পীর একগাদা হাড়গোড়, মানে তার দুই হাত ও হাতের আঙুলগুলো, ধরে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, এবার মেয়েটি ভেঙে পড়ল কান্নায়, দর্শকেরা তখন আমোদের হাসিতে ফেটে পড়েছে – মেয়েটার এই হাল দেখে একজন কর্মচারী এসে তার জায়গা নিল, তাকে বিকল্প হিসেবে আগে থেকেই এ কাজের জন্য পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর এল খাবার, ম্যানেজার চামচ দিয়ে সামান্য একটু তুলে দিল প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলা, প্রায় কোমায় চলে যাওয়া অনশন-শিল্পীর মুখে, ম্যানেজার সেই সময় সমানে উৎসাহসূচক বকবকানি করে চলেছে যেন দর্শকের মনোযোগ অনশন-শিল্পীর এই চরম দুর্দশার অবস্থা থেকে অন্যদিকে ঘুরে যায়; এরপর আমজনতার সুখ-স্বাস্থ্য কামনা করে পানীয়ের প্রস্তাব রাখা হলো, বলা হয় যে অনশন-শিল্পী নিজে ম্যানেজারকে কানে কানে এ প্রস্তাব দিয়েছে; ব্যান্ডদল এবার সবকিছু ঢেকে দিল তাদের বিউগল-ট্রাম্পেটের ফেটে পড়া আওয়াজে, সবাই শুরু করল বিদায় নেওয়া, কারোরই মনে এখন আর এই শো নিয়ে কোনো অসন্তোষ নেই, কারোরই নেই – কেবল অনশন-শিল্পী ছাড়া, সব সময়ই কেবল সে ছাড়া।

এভাবেই অনশন-শিল্পী কাটিয়ে দিল অনেকগুলো বছর, বিশ্রামের জন্য নিয়মিত ছোট কিছুদিনের বিরতি দিয়ে দিয়ে, দৃশ্যত একধরনের গৌরবের মধ্যে, পৃথিবীর কাছ থেকে সম্মানিত হয়ে – কিন্তু এসব কিছুর পরেও মূলত দুঃখের মধ্যে, সেই দুঃখ তার বরং আরো বেড়েই চলল কারণ কেউ তা গুরুত্ব দিয়ে দেখল না। আর আসলেও, মানুষ তাকে সান্ত্বনাই বা দিত কীভাবে? এর বেশি সে চায়ই বা কী? আর যদি কোনো এক দিন কোনো দয়ালু কেউ কাছে এসে তার জন্য দুঃখ প্রকাশও করত, তাকে বোঝাতে চেষ্টা করত যে সম্ভবত অনশন চালিয়ে যাওয়ার পরিণতি হিসেবেই সে এরকম দুঃখী হয়ে পড়ছে, তাহলে মাঝেমধ্যে, বিশেষ করে সে যদি তখন অনশনের শেষ পর্যায়ে থাকত, এমন ঘটত যে অনশন-শিল্পী ফেটে পড়ত রাগে, সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়ে কোনো বুনো পশুর মতো খাঁচার শিক ধরে বাড়ি-টাড়ি মেরে একাকার করত। কিন্তু অনশন-শিল্পীর এই উন্মত্ত আচরণের জন্য ম্যানেজারের কাছে কৈফিয়ত তৈরি থাকত, সে খুব মজা পেত এই কৈফিয়তটা দিয়ে। দর্শকের ভিড়ের উদ্দেশে সে অনশন-শিল্পীর পক্ষ থেকে মাফ চাইত, বলত যে অনশন-শিল্পীর এই আচরণ না-খেয়ে থাকার কারণে মেজাজ খিটমিটে হয়ে যাওয়ার জন্যই ঘটছে, সেটা কীভাবে ঘটে তা পেট-পুরে খাওয়া লোকজনের জন্য আসলেও বোঝা কঠিন; আর এ-প্রসঙ্গে সে অনশন-শিল্পীর দাবির কথাটাও সবাইকে

জানিয়ে রাখছে, ওই দাবিটারও একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন, তার দাবি – চল্লিশ দিনের অনেক অনেক বেশি অনশন করে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব; ম্যানেজার এ পর্যায়ে তার এই বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষার, তার এই প্রশংসনীয় ইচ্ছার তারিফ করত, তার এরকম চাওয়ার মধ্যে নিঃসন্দেহে আত্মবলিদানের যে বিশাল প্রকাশ লুকিয়ে আছে তাকে সাধুবাদ জানাত; কিন্তু এরপরই সে নেমে যেত অনশন-শিল্পীর এই দাবি খণ্ডন করার কাজে – সেজন্য বেশি কিছু লাগত না, দর্শককে সামান্য কিছু ফটো দেখালেই কাজ হয়ে যেত, একই সঙ্গে ফটোগুলো বিক্রির জন্য দেওয়া হতো দর্শকদের কাছে – এই ফটোগুলোতে দেখা যেত অনশন-শিল্পী তার কোনো এক অনশনের চল্লিশতম দিনে বিছানায় পড়ে আছে চরম ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে, তার অবস্থা প্রায় মরো-মরো। সত্যের এই বিকৃতি দেখাটা অনশন-শিল্পীর জন্য নতুন কিছু নয়, তার পরও প্রতিবারই এটা তার শক্তি ফের একবার শুষে নিত, সে সহ্য করতে পারত না এত বড় মিথ্যাচার। সময়ের আগেই তার অনশন শেষ করার পরিণতিকে কিনা এখানে দেখানো হচ্ছে কারণ হিসেবে! এই নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে, বিরাট-বিশাল এই মূর্খামির বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব। এর আগ পর্যন্ত সে সব সময় খাঁচার শিক জড়িয়ে ধরে থাকত, কান খাড়া করে সরল বিশ্বাসে শুনত ম্যানেজার কী বলছে, কিন্তু প্রতিবারই যেই ফটোগুলো দেখানো শুরু হতো, সে দীর্ঘ এক শ্বাস ফেলে শিক ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে পড়ে যেত তার খড়ের বিছানার উপর – এ সময়ে দর্শকেরা দুশ্চিন্তামুক্ত, তারা আবার খাঁচার কাছে এগিয়ে যেত তাকে খুঁটিয়ে দেখতে।

মাত্র দু-এক বছর পরেই, এসব দৃশ্যের যারা সাক্ষী, তারা যখন তাদের এই আচরণের কথা মনে করল, নিজেরাই অবাক হয়ে গেল নিজেদের ওপর। কারণ তত দিনে সেই আগের বলা পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রায় রাতারাতিই ঘটেছে এই পরিবর্তন; হয়তো এর পেছনে আরো গূঢ় কোনো কারণ রয়েছে, কিন্তু কে ভাবতে যাচ্ছে ওসব নিয়ে? যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, একদিন এই এত প্রীতি-প্রশ্রয় পাওয়া অনশন-শিল্পী দেখল বিনোদন-সন্ধানী দর্শকেরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তার বদলে তারা সব দলে দলে গিয়ে হাজির হয়েছে নতুন কোনো প্রদর্শনীতে। তার ম্যানেজার, একবার, শেষবারের মতো তাকে নিয়ে ইউরোপের অর্ধেকটা চষে ফেলল – দেখতে যে পুরোনো আগ্রহের কোনো ছিটেফোঁটার দেখা কোথাও মেলে কি না; না পুরো চেষ্টা ব্যর্থ হলো, যেন গোপন কোনো সন্ধির বলে সব মানুষ অনশন-প্রদর্শনীর ওপর পুরোপুরি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সবখানে। অবশ্য রাতারাতি, এত হঠাৎ করে, এমন তো হওয়া সম্ভব নয়; পেছন দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে পড়ল বেশ কয়েকটা পূর্বাভাস আসলে আগে ঠিকই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কেউ ওগুলো – তখনকার সাফল্যের তোড়ে – ঠিকভাবে খেয়াল করেনি কিংবা ওগুলোর ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, আর এত দিন পরে এসে ব্যবস্থা নেওয়ার সেই সময়ও আর নেই। এটা নিশ্চিত, অনশন-শিল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ আবার একদিন, অন্য অনেক কিছুর মতো, ঠিকই ফিরে আসবে; কিন্তু এখনকার অনশন-শিল্পীদের জন্য সে কথার মধ্যে কোনো সান্ত্বনা আছে কী? অনশন-শিল্পী এখন করবেটা কী? হাজার মানুষের হাততালি পাওয়া

কোনো শিল্পী তো আর গ্রামের কোনো মেলায় গিয়ে ছোট দু'পয়সার শো-তে হাজির হতে পারে না; আর যদি তার অন্য কোনো পেশা বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়, অনশন-শিল্পীর সে হিসেবে অনেক বেশি বয়স হয়ে গেছে, আর আরো বড় কথা হচ্ছে অনশনের শিল্পের প্রতি তার অনুরাগটা খুব বেশি মারাত্মক। অতএব সে বিদায় নিল তার ম্যানেজারের কাছ থেকে, তার এই অদ্বিতীয় কর্মজীবনের নিত্যসঙ্গী ছিল এই লোক; আর তারপরে যোগ দিল বিরাট এক সার্কাসের দলে; নিজেকে খুঁচিয়ে আর আহত না-করার জন্য সে চুক্তিপত্রটা একবার তাকিয়েও দেখল না।

কোনো বড় সার্কাসের দলে যা হয়, এদের পাল পাল মানুষ, জীবজন্তু আর যন্ত্র-সরঞ্জাম নিয়ে সব সময় সুন্দর ব্যবস্থা নেওয়া থাকে বাড়তি কিছু খেলা দেখানোর, তাই ওসব দলে যে কোনো সময়, যে-কারোরই – এমনকি কোনো অনশন-শিল্পীরও – জায়গা পাওয়া কোনো বড় সমস্যা না, ব্যাপার শুধু এটুকুই যে তার চাওয়া-পাওয়া হতে হবে সীমিত; আর তা ছাড়া এই অনশন-শিল্পীকে দলে টানার বেলায় তারা যে স্রেফ কোনো একজন অনশন-শিল্পীকে বেছে নিয়েছে তা তো নয়, তারা নিয়েছে অনেক দিনের বিখ্যাত এক শিল্পীকে; সত্যি বলতে, এই শিল্পে দক্ষতার জন্যে যে বিশেষ ক্ষমতা থাকা লাগে, সময়ের সঙ্গে তার কমে আসার কোনো যোগ্য নেই, তাই এই অনশন-শিল্পীকে কেউ বলতে পারবে না সে কোনো অবসর-নেওয়া বুড়ো শিল্পী যে তার সেরা সময় পার করে এসেছে আর এখন তাই আশ্রয় চাচ্ছে ঝামেলাহীন কোনো সাকার্সের চাকরিতে; বরং উল্টো অনশন-শিল্পী দাবি করতে লাগল – তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ তো নেই – সে আগের মতোই এখনো স্বধর্মে অনশন চালিয়ে যেতে পারে; এমনকি সে বলে বসল যে তাকে যদি তার মতো করে অনশন করতে দেওয়া হয়, তাহলে – কোনো দ্বিধা ছাড়াই সার্কাসের উদ্যোক্তারা রাজি হয়ে গেল তার এই প্রস্তাবে – সে আসলে প্রথমবারের মতো এই পৃথিবীতে বিরাট কোনো তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য সত্যিকারের তৈরি, যদিও তার এই দাবি, বর্তমানের সময়ের মেজাজের বিবেচনায় – যা কিনা অনশন-শিল্পী তার প্রবল উৎসাহের তোড়ে শুধু ভুলে যায় – অভিজ্ঞ লোকজনের মধ্যে সামান্য হাসি ছাড়া আর কোনো জোশ জাগাল না।

তবে বাস্তবে কিন্তু অনশন-শিল্পী চারপাশের সত্যিকারের পরিস্থিতি কী তা ভুলে যায়নি; যেমন, সে একদম স্বাভাবিকভাবে মেনে নিল যে মঞ্চের মাঝখানে তারকা-আকর্ষণ হিসেবে আর তাকে ও তার খাঁচাকে রাখা হবে না, তাকে জায়গা দেওয়া হবে বাইরে, জীবজন্তু থাকার জায়গার কাছে, সহজে যাওয়া যায় এমন এক স্থানে। বড় বড়, রংচঙে ব্যানার টানানো হলো তার খাঁচার চারপাশ ঘিরে, ওতে লেখা ব্যানারের পেছনে কী দর্শনীয় বস্তু রয়েছে। সার্কাসের বিরতির সময়ে মানুষজন যখন দল বেঁধে ভিড় করে জীবজন্তু দেখে, তখন অনশন-শিল্পীর খাঁচা পার হয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না, তারা ওখানে থামে একটুখানিকের জন্য; সম্ভবত তারা আরো বেশিক্ষণ থাকত তার ওখানে, কিন্তু সরু এই গলিপথে তাদের পেছনে ধাক্কা দিতে থাকে আরো অনেক মানুষ, পেছনের ওরা

বুঝে উঠতে পারে না কোন জিনিসটা তাদের এত কাঙ্ক্ষিত জীবজন্তুর খাঁচার কাছে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর ফলে কেউ যে অনশন-শিল্পীকে আর একটু সময় নিয়ে, আরাম করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে সেই উপায় নেই। এটাও একটা কারণ যে কেন অনশন-শিল্পী বিরতির সময়ের কথা ভেবে কাঁপত, যদিও অন্য হিসেবে দেখলে তাকে দেখতে মানুষ আসবে এজন্যই তো সে বেঁচে আছে। প্রথমদিকে সার্কাসের বিরতি হওয়ার জন্য তার আর তর সইত না; সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে দেখত কীভাবে স্রোতের মতো মানুষ এদিকে আসছে, কিন্তু খুব শিগগিরই তার বোধোদয় হয়ে গেল যে – এমনকি সবচেয়ে গোঁয়ার্তুমি করে, সুচিন্তিতভাবে নিজেকে ঠকানোর পরিকল্পনা করার মাধ্যমেও তো এই সত্য ঢাকা যাবে না – পুরো ভিড়টাই, প্রতিবারই, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই, অন্তত তাদের যা মন চাইছে সেই বিচারে, ছুটছে আসলে জীবজন্তুর খাঁচার দিকে। দূর থেকে সে যে তাদের দেখত, সেটাই তার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগত। কারণ যেই-না তারা কাছে আসত, তার কান বধির হয়ে যেত সংখ্যায় ভারী হতে থাকা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের চিৎকার ও গালিগালাজে: একদল চাচ্ছে – অল্পদিনের মধ্যেই অনশন-শিল্পী এই দলটাকেই বেশি অপছন্দ করা শুরু করল – তাকে চুপচাপ একটু দেখতে, কোনো সত্যিকারের আগ্রহ থেকে না, স্রেফ তাদের খেয়ালের কারণে, স্রেফ তাদের বোকার মতো একগুঁয়েমি থেকে; আর অন্যদল চাচ্ছে সোজা, ধাক্কা মেরে, জীবজন্তুর খাঁচার ওখানে পৌঁছাতে। প্রথম ভিড়টা একবার চলে যেতেই এবার আসত বিচ্ছিন্ন, একা-একা ঘুরতে থাকা লোকজন, অনশন-শিল্পীকে থেমে যতক্ষণ খুশি দেখতে বাধা দেওয়ার তাদের কেউ নেই, কিন্তু এরা কিনা ঝটপট চলে যেত লম্বা পা ফেলে, পাশের দিকে বলতে গেলে একবার তাকাতও না; তাদের একটাই পণ – সময়মতো পৌঁছাতে হবে পশুদের খাঁচার কাছে। আর খুবই দুর্লভ সৌভাগ্য বলতে হবে যখন, কখনো-সখনো, দেখা যেত বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কোনো পরিবারের পিতা হাজির হয়েছে, আঙুল দিয়ে বাচ্চাদের দেখাচ্ছে অনশন-শিল্পীকে, বিস্তারিত বলছে অনশন-শিল্প কী জিনিস সে বিষয়ে, তাদের শোনাচ্ছে সেই অতীতকালের গল্প যখন সে নিজে দেখেছে একই রকম কিন্তু এখনকার চেয়ে হাজার গুণ বেশি চমৎকার অনশন-শিল্পের প্রদর্শনী, আর বাচ্চারা তখন, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা কম এবং স্কুলে তাদের ঠিকভাবে শেখানো হয়নি বলে, তখনো বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা কী – তাদের কাছে অনশন মানে কী আসলে? – কিন্তু তার পরও তাদের কৌতূহলী চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠত এক নতুন ও আরেকটু দয়ালু কোনো ভবিষ্যতের ঝলকানি। কখনো কখনো অনশন-শিল্পী মনে মনে বলত, খুব সম্ভব পুরো ব্যাপারটা আরেকটু ভালো হতো যদি তার খাঁচা জীবজন্তুদের খাঁচাগুলোর অত কাছে রাখা না হতো। এর ফলে মানুষজন কী দেখতে হবে তা খুব সহজে বাছাই করে নিতে পারছে – অন্য ব্যাপারগুলো না-হয় বাদই দেওয়া গেল: যেমন পশুর খাঁচার থেকে আসা ঐ বিকট দুর্গন্ধ, রাতের বেলায় পশুগুলোর ঐ ছটফটানি, শিকারি পশুদের জন্য তার খাঁচার সামনে দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া কাঁচা কাঁচা মাংসের পিণ্ড, খাওয়ার সময় হলে ওদের ঐ তর্জন-গর্জন; এ সবকিছুই তার মন অনেক খারাপ করে দিত, সব সময় তার

মন ভার করে রাখত। কিন্তু সার্কাসের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানানোর সাহস হতো না তার; সবকিছুর পরেও ঐ পশুগুলোকে তার তো ধন্যবাদই দেওয়া উচিত, ওদের কারণেই তো এদিকে দর্শকের দল আসে, আর দলের মধ্যে সব সময় কেউ-না-কেউ তো থাকে তার শিল্পকে একটু মন দিয়ে দেখবে; তা ছাড়া সে যে এখানে আছে সেটা মনে করিয়ে দিলে কে জানে তাকে নিয়ে তারা কোথায় লুকিয়ে রেখে দেবে, তখন তো তাদের মনে পড়ে যাবে যে এই অনশন-শিল্পী, নিখুঁত বিচারে বললে, জীবজন্তুর খাঁচার কাছে যাওয়ার পথে বাধা ছাড়া আর কিছুই না।

খুব ছোট একটা বাধা, মানতেই হবে, এমন একটা বাধা যা সময়ের সঙ্গে আরো আরো ছোট হয়ে আসতে লাগল। আজকাল কেউ যদি বলে সে অনশন-শিল্পীকে দেখতে চায়, এমন কথা বলাটাও অদ্ভুত কিছু; কথাটা সে হিসেবেই দেখার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; আর সেই অভ্যাসের সঙ্গেই মোহর পড়ে গেল তার নিয়তিতে। যেমন খুশি সে অনশন করে যেতে পারে, কীভাবে করছে তা শুধু তার নিজের জানলেই চলবে – আর সে করলও তাই, কিন্তু তাতেও তার রক্ষা হলো না কোনো, মানবজন্ম চলে গেল তার খাঁচা পাশ কাটিয়ে। আপনি স্রেফ চেষ্টা করে দেখুন না অনশন-শিল্প কী তা কাউকে একটু ব্যাখ্যা করে বোঝানোর। কেউ যদি ব্যাপারটা ভেতর থেকে অনুভব করতে না পারে, তাহলে কি কোনো দিনই বুঝবে এটা কী জিনিস? সুন্দর ব্যানারগুলো হয়ে পড়ল নোংরা ও পড়ার অযোগ্য, ওদের ছিঁড়ে নামানো হলো, কেউ নতুন ব্যানার টানানোর কথা ভাবল না; ছোট বোর্ডের উপরে যেখানে কত দিন অনশন হয়েছে তার হিসাব লেখা থাকে, যেটা প্রথমদিকে খুব যত্ন করে বদলানো হতো প্রতিদিন, সেই বোর্ড এখন দীর্ঘদিন পড়ে থাকল একই হিসাব নিয়ে, কর্মচারীরা প্রথম কটা দিন যেতে-না-যেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এই সামান্য কাজটুকু করতেও; অতএব অনশন-শিল্পী তাই আসলে অনশন করেই যেতে লাগল, একদিন তো এটারই স্বপ্ন দেখত সে, কিন্তু কেউ হিসাব রাখল না কত দিন হলো; কেউ, এমনকি অনশন-শিল্পী নিজেও, জানল না যে কত বিশাল এক সাফল্য অর্জন করল সে; আর তার বুক ভার হয়ে উঠল একসময়। আর কখনো যদি কোনো দিন কোনো গা-ছাড়া দর্শক একটু এখানে থামল তো বোর্ডের মধ্যে লেখা ওই পুরোনো সংখ্যা দেখে অনশন-শিল্পীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা শুরু করে দিত, বলত বাটপারি হচ্ছে – এর চেয়ে অপমানকর মিথ্যা কথা আর হয় না, মানুষের উদাসীনতা ও স্বভাবগত বিদ্বেষপরায়ণতা থেকে এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর জন্ম নিতে পারে না, কারণ বাটপারি করে অনশন-শিল্পী কাউকে ঠকাচ্ছে না, সে তার শিল্পচর্চা করে যাচ্ছে সততা নিয়েই, বরং পৃথিবীই তাকে ঠকাচ্ছে তার প্রাপ্য পুরস্কার থেকে।

তারপর আবার অনেকদিন চলে গেল, তারপর সেটারও শেষ হলো একদিন। একদিন এক শ্রমিকসর্দারের হঠাৎ নজরে পড়ল খাঁচা, সে তার সঙ্গের শ্রমিকদের কাছে জানতে চাইল যে কেন এই সুন্দর খাঁচা ভেতরে পচা খড় নিয়ে পড়ে আছে বিনা কারণে, কেন ওটার কোনো ব্যবহার করা হচ্ছে না; কেউ উত্তর দিতে পারল না, শেষে একজন, অনশনের

হিসাব রাখার বোর্ডটা দেখে, মনে করতে পারল অনশন-শিল্পীর কথা। তারা খড়ের মধ্যে গুঁতোটুঁতো দিল, অনশন-শিল্পীকে শেষমেশ পেল ওই খড়ের নিচে। 'কি, তুমি কি এখনো না-খেয়ে আছ?' শ্রমিকসর্দার জিগ্যেস করল, 'কবে থামবে তুমি বল তো?' 'আমাকে সবাই ক্ষমা করে দিয়ো,' ফিসফিস করে বলল অনশন-শিল্পী; শুধু শ্রমিক-সর্দারই, তার কান খাচার শিকে লাগানো, বুঝতে পারল সে কী বলছে। 'অবশ্যই দেব,' শ্রমিকসর্দার বলল, সে হাত দিয়ে তার কপাল চাপড়াচ্ছে, বাকি সবাইকে বোঝাতে চাইছে অনশন-শিল্পীর কী করুণ অবস্থা, 'আমরা তোমাকে ক্ষমা করছি।' 'আমি সব সময় চেয়েছি আমার অনশনকে তোমরা সম্মানের চোখে দেখো', বলল অনশন-শিল্পী। 'তাই তো দেখি আমরা', অমায়িক বিনয় নিয়ে বলল শ্রমিকসর্দার। 'কিন্তু তোমাদের উচিত না এটা শ্রদ্ধা-সম্মানের সঙ্গে দেখা,' অনশন-শিল্পী বলল। 'ঠিক আছে, তাহলে দেখি না ওভাবে', বলল শ্রমিকসর্দার, 'কিন্তু কেন আমরা তোমার অনশন শ্রদ্ধা-সম্মান নিয়ে দেখব না, কেন?' 'কারণ আমাকে অনশন করতেই হবে, আমার অন্য কোনো উপায় নেই,' বলল অনশন-শিল্পী। 'উফ্, আর কী বলবে বলো তো,' বলল শ্রমিকসর্দার, 'কেন তোমার অন্য কোনো উপায় নেই?' 'কারণ,' বলল অনশন-শিল্পী, অল্প একটু মাথা তুলে, ঠোঁট দুটো দিয়ে যেন চুমু খেতে চাইছে এমনভাবে কুঁচকে, সোজা শ্রমিকসর্দারের কানের মধ্যে বলল যেন তার একটা শব্দও সর্দারের শোনা বাদ না পড়ে যায়, 'কারণ আমি খেতে পছন্দ করি এমন কোনো খাবার কখনোই খুঁজে পাইনি। যদি খুঁজে পেতাম, বিশ্বাস করো, তাহলে কোনো শোরগোল পাকাতাম না, আমার খাবারটুকু পেটপুরে খেতাম ঠিক তোমার ও অন্য আর সবার মতোই।' এই ছিল তার শেষ কথা, কিন্তু তার ক্ষীণ ও দুর্বল চোখের মধ্যে তখনো দেখা যাচ্ছে গর্বটুকু বাদ দিয়ে শুধু দৃঢ় এক প্রত্যয় যে, সে তখনো অনশনেই আছে।

'এই, তাহলে এবার সব সাফ করো!' বলল শ্রমিকসর্দার, এরপর তারা কবর দিল অনশন-শিল্পী, খড়বিচালি, সবকিছু। খাঁচার মধ্যে তারপর তারা পুরল একটা জোয়ান চিতা। এত দিনের এই শূন্য পড়ে থাকা খাঁচায় বনের এই জন্তু লাফিয়ে চলেছে এটা দেখাও তো কোনো সবচেয়ে ভোঁতা-বুদ্ধির লোকের জন্যও স্পষ্ট স্বস্তির। চিতাটার কোনোকিছুরই অভাব নেই। তাকে যারা পালে, তারা তার পছন্দের খাবার এনে এনে দেয়, কোনো বেশি ভাবাভাবি করার থাকে না এ বিষয়ে; তাকে দেখে মনে হয় স্বাধীনতা হারানোর ব্যাপারটা নিয়েও তার কোনো আফসোস নেই; তার ঐ রাজকীয় শরীর – যেখানে যা যা দরকার সব নিয়ে শরীরটা ফেটে পড়ার উপক্রম – তার ঐ রাজার শরীর যেন একেবারে নিজের মধ্যে স্বাধীনতা সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে; তার চোয়ালের মধ্যে কোথাও যেন লুকানো আছে ঐ স্বাধীনতা; আর তার কণ্ঠের অগ্নিকুণ্ড থেকে জীবনের জয়োল্লাস এমন প্রচণ্ডভাবে জ্বলে বেরোচ্ছে যে দর্শকদের পক্ষে এর ধাক্কা সহ্য করা সহজ নয়। কিন্তু নিজেদের শক্ত করে নিয়েছে তারা, দাঁড়িয়ে গেছে খাঁচাটা ঘিরে, আর একবার দাঁড়িয়েছে তো ওখান থেকে নড়ানোই যাচ্ছে না তাদের।

গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি

আমাদের গায়িকার নাম জোসেফিন। যে তার গান শোনেনি, সে জানে না গানের শক্তি কী জিনিস। আমাদের মধ্যে কেউ নেই যে তার গান শুনে আত্মহারা না হয়; আর আমরা যেহেতু সার্বিক বিচারে কোনো গানপ্রিয় জাতি না, এটা তাই আরো বড় ব্যাপার বলতে হবে। আমাদের জন্য সেরা গান হচ্ছে শান্তি, আর নিরুদ্বেগ থাকা; জীবন আমাদের কঠিন, আর আমরা যদি কোনো দিন ধরুন একবারের জন্যও আমাদের রোজকার উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে পারলাম, তবু গানের মতো আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে এত দূরের এক জিনিস নিয়ে পড়ে থাকার মতো অবস্থা আমাদের নেই। তবে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের বেশি আক্ষেপও নেই; অদ্দুর পর্যন্ত ব্যাপারটা যায়-ই না কখনো; আমরা মনে করি, আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে আমাদের বিশেষ একধরনের বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ধূর্ততা – আমাদের জন্য সত্যি বলতে ওটারই সবচেয়ে বেশি দরকার – আর সেই ধূর্তামির একটু হাসি দিয়েই আমরা একজন আরেকজনকে প্রবোধ দিই সব ব্যাপারেই, এমনকি ধরুন যখন আমাদের মন কেমন করে ওঠে – আসলে এমনটা হয় না – বিশেষ ওই ধরনের সুখের জন্য যা কিনা সম্ভবত সংগীত থেকে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে জোসেফিনই একমাত্র ব্যতিক্রম; সে গান ভালোবাসে, আর জানে গান দিয়ে কীভাবে অন্যের মনে নাড়া দিতে হয়; একমাত্র সে-ই; তার বিদায়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন থেকে – কে জানে কতকালের জন্য – গানও বিদায় নেবে।

গান আসলে কী জিনিস তা নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবি। সবকিছুর পরেও এটা সত্যি যে আমরা অসাংগীতিক এক জাতি; তাহলে কী করে আমরা জোসেফিনের গান বুঝি, কিংবা – যেহেতু জোসেফিন মানতে চায় না যে আমরা গান বুঝি – ভাবি যে আমরা ওর গান বুঝছি, তা আমার মাথায় আসে না। এ প্রশ্নের সবচেয়ে সোজা উত্তর বোধ হয় এ-ই যে, জোসেফিনের গানের মাধুর্যের কারণে কারো পক্ষেই, সবচেয়ে ভোঁতা কানের যে তার পক্ষেও, তার গান উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না; তবে এটা কোনো ভালো উত্তর হলো না। যদি সত্যিই তা-ই হতো, তাহলে তার গান তো যে-কারো মধ্যেই সাধারণের বাইরের কিছু হিসেবে তাৎক্ষণিক ও চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যেত; আমাদের মনে হতো, আমরা এর আগে কোনো দিন শুনিনি আর শোনার ক্ষমতাও আমাদের নেই এমন একটা কিছু বোধ হয় বের হচ্ছে তার গলা থেকে; এমন কিছু যা কেবল এই অদ্বিতীয় জোসেফিনই, আর কেউ নয় শুধু জোসেফিনই, আমাদের পারে শোনার জন্য যোগ্য করে তুলতে। কিন্তু এমনটা ঘটছে বলে আমি অন্তত মনে করি না; এমন কিছু আমি অনুভব করি না, এমন কিছু অন্য কেউ অনুভব করছে বলেও আমি দেখিনি। আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা খোলাখুলিভাবেই বলি যে জোসেফিনের গান, গান হিসেবে, সাধারণের বাইরের কোনো কিছু নয়।

সত্যিই কি একে গান বলা চলে? গানের মর্ম সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা না থাকলেও এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে সামান্য হলেও গানের ঐতিহ্য আমাদের

জাতির আছে; প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গানের প্রচলন ছিল; এসব নিয়ে কিংবদন্তিও আছে, কিছু কিছু গান সংরক্ষণ করাও হয়েছে, যদিও মানছি যে এখন আর কেউ ওগুলো গাইতে পারে না। তার মানে, গান কী, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে কিছু আবছা ধারণা অবশ্যই রয়েছে; আর সত্যি কথা হচ্ছে জোসেফিন যা গায় তাকে কি আদৌ গান বলা চলে? তা কি আসলে স্রেফ শিস বাজানোই নয়? আর কিচমিচ করে শিস বাজানোর সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, ওরকম শিস দেওয়াই আমাদের জাতির সহজাত প্রবণতা, কিংবা আসলে ওটাকে প্রবণতা বলাও হয়তো ঠিক হচ্ছে না – আমাদের জীবনের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নই তো ওটা। আমরা সবাই কিচমিচ করি, কিন্তু খুব স্বাভাবিক যে সেটাকে শিল্প বলার স্বপ্নও কেউ দেখে না, আমরা কিচমিচ করি নিজেদের অজান্তেই; সত্যি বলতে খেয়ালও করি না যে কিচমিচ করছি; আর আমাদের মধ্যে এমনকি অনেকেই আছে, যারা জানেও না যে কিচমিচ করা আমাদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অতএব এ কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে যে জোসেফিন গান গায় না বরং শুধু একটু কিচমিচ করে, আর তা-ও এমনকি আমাদের – অন্তত আমার কাছে সেটাই মনে হয় – সাধারণ কিচমিচের চেয়ে উঁচু কোনো কিচমিচও নয় – সত্যি বলছি, তার শরীরের যা শক্তি তাতে সাধারণ কিচমিচ করাই তো তার সাধ্যে কুলায় না, এমনকি মাটি খোঁড়ার সাধারণ কোনো শ্রমিকও তো সারা দিন কাজ করে যাওয়ার মধ্যেই কত সাবলীলভাবে কিচমিচ চালিয়ে যেতে পারে – এই সব যদি সত্যি হয়, তো জোসেফিনের এই তথাকথিত শিল্পীর পরিচয় আসলেই খারিজ হয়ে যায়, কিন্তু তাহলে আবার আমাদের মধ্যে তার যে বিশাল প্রভাব রয়েছে তা ভাবতে সত্যিই ধাঁধার মতো লাগে।

কথা হচ্ছে, জোসেফিনের গলা থেকে যা বেরোয় তা স্রেফ কিচমিচ করা শিসধ্বনিই নয়। আপনি যদি ওর কাছ থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ান ও শোনেন, কিংবা আরো ভালো যদি এই পরীক্ষাটা করেন, অর্থাৎ, যখন কিনা জোসেফিন অন্য কয়েকজনের সঙ্গে মিলে গাইছে, তখন যদি আপনি ওর কণ্ঠ অন্যদের থেকে আলাদা করতে চেষ্টা করেন, তাহলে সব সময়ই আপনি দেখবেন যে ওটা খুব সাধারণ একটা কিচমিচ শিস ছাড়া আর কিছুই নয়, অন্যগুলোর থেকে যা শুধু এই অর্থেই আলাদা যে তারটা আরো বেশি নাজুক ও নিস্তেজ এক শিস। কিন্তু এবার ধরুন, আপনি দাঁড়ালেন জোসেফিনের সামনে গিয়ে, তখন দেখবেন যে স্রেফ শিস না ওটা; তার শিল্প বোঝার জন্য আপনার শুধু তাকে শুনলেই চলবে না, তাকে দেখতেও হবে। যদি তারটা এমনকি স্রেফ আমাদের নিত্যদিনের কিচমিচ শিস দেওয়াও হয়ে থাকে, তার পরও আমাদের প্রথমে এই অদ্ভুত সত্যের মুখোমুখি হতে হবে যে, আমরা সবাই রোজ রোজ যা করে থাকি সে কাজটা করার জন্যই এখানে আমাদের একজন আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে – স্রেফ এটাই তো বিশেষ একটা ব্যাপার। যতই যেভাবে দেখুন না কেন আপনি তো আর বাদাম ভাঙতে পারাকে শিল্প বলতে পারেন না, আর তাই এমন কি হওয়া সম্ভব যে কেউ সবাইকে কখনো একসঙ্গে জড়ো করবে, তারপর সামনে এগিয়ে এসে সবাইকে বাদাম ভেঙে

বিনোদন দিতে চাইবে? কিন্তু ধরুন, কেউ সেটাই করল; ধরুন সেটা করে তার লক্ষ্যে সফলও হলো, তখন তো আপনি আর ব্যাপারটাকে স্রেফ বাদাম-ভাঙা বলতে পারবেন না। অথবা অন্যভাবে দেখলে, ওটা হয়তো স্রেফ বাদাম-ভাঙাই, কিন্তু দেখা গেল আমরা, আগে অনেক বাদাম ভেঙেছি বলেই হয়তো কখনো খেয়ালই করিনি যে এটা একটা শিল্প, আর এই নতুন বাদাম-ভেদকই কিনা আমাদের প্রথমবারের মতো দেখিয়ে দিল বাদাম-ভাঙার সত্যিকারের অর্থ কী – আর সেই ক্ষেত্রে সে যদি আমাদের অধিকাংশের চেয়ে বাদাম-ভাঙার কাজে একটু কম দক্ষ হয়, তাহলে তো তার বাদাম-ভাঙার সৌন্দর্য বরং আমাদের চোখে আরেকটু বেড়েই যাবে।

সম্ভবত জোসেফিনের গানের বেলায় ব্যাপারটা এমনই; তার ক্ষেত্রে আমরা ঠিক সে জিনিসটারই প্রশস্তি গাই, আমাদের নিজেদের বেলায় যেটার প্রশস্তি গাওয়ার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না; এই পরের কথাটাতে, প্রসঙ্গক্রমে বলছি, জোসেফিন আমাদের সঙ্গে পুরো একমত। একবার আমি উপস্থিত আছি এরকম একটা জটলায় আমাদের মধ্যে কেউ একজন – মাঝেমধ্যেই এমন হয় – কথা তুলল জাতি হিসেবে আমাদের কিচমিচ শব্দ করার অভ্যাস নিয়ে; কথাটা বেশ সাবধানেই বলল সে, কিন্তু জোসেফিন সেটুকুও সহ্য করতে পারল না। কী এক শ্লেষাত্মক, কী এক ঔদ্ধত্যভরা হাসি হাসল সে, যেমনটা আমি আগে আর কখনোই দেখিনি; সে, যাকে দেখতে মনে হয় কমনীয়তার বিরাট বড় উদাহরণ (এ ধরনের নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যে ভরা কোনো জাতির সদস্য হিসেবেও তার কমনীয়তা চোখে পড়ার মতো), সেই তাকেই কিনা সে সময়ে মনে হলো কত রুক্ষ; তবে সঙ্গে সঙ্গেই সে বোধ হয় বুঝতে পারল ব্যাপারটা, তার সংবেদনশীলতা সব সময়েই বলার মতো, তাই সামলে নিল নিজেকে। অতএব, কথা হচ্ছে, জোসেফিন তার শিল্প ও কিচমিচ করার মধ্যে সামান্য সম্পর্কও আছে বলে বিশ্বাস করে না। যারাই এর উল্টো ভাবে, সে তাদের ঘৃণা করে, সম্ভবত লুকানো এক ঘৃণা। এটা অসার দম্ভের কোনো ব্যাপার না, কারণ বিরোধীপক্ষও, আমি নিজে অর্ধেকটা ওই দলেরই একজন, কোনো সন্দেহ নেই তার ততটুকুই প্রশংসা করে যতটা তাকে করে আমাদের জাতির বেশিরভাগ সদস্য; তবে জোসেফিন শুধু ওই প্রশংসাতেই খুশি নয়, সে চায় তাকে প্রশংসা করা হোক একদম তার ঠিক করে দেওয়া নিয়ম মেনে, শুধু প্রশংসার জন্য প্রশংসাতে তার কোনো আগ্রহ নেই। আর তার সামনে বসলেই না আপনি বুঝবেন সে কী জিনিস; তার বিরোধিতা শুধু তার থেকে দূরে বসেই করা সম্ভব; তার সামনে বসলে আপনি জেনে যাবেন যে: তার এই কিচমিচ শিস বাজানো কোনো কিচমিচ শিসই নয়।

কিচমিচ করাটা যেহেতু আমাদের ভেবেচিন্তে করতে হয় না, আমরা স্বভাবগতভাবেই ওটা করি, তাই আপনি ঠিকই ভাববেন যদি ভাবেন যে জোসেফিনের শ্রোতাদের মধ্যেও তো যে-কেউ কিচমিচ করে বসতে পারে; তার শিল্পকর্ম শুনে আমরা ভালো বোধ করি, আর আমরা যখনই ভালো বোধ করি, তখনই কিচমিচ করি। তবে শ্রোতারা কিচমিচ করে না; ইঁদুরদের চেয়ে চুপচাপ আর কোনো শ্রোতা নেই; আমরা

যেন আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত শান্তির সন্ধান পেয়ে গেছি, যে শান্তি থেকে আমাদের নিজস্ব কিচমিচ আমাদের কিছুটা হলেও দূরে সরিয়ে রাখে, তেমনভাবে আমরা চুপ করে থাকি। তার গানই কি আমাদের জাদু করে রাখে নাকি তার ক্ষীণ, সামান্য কণ্ঠ ঘিরে রেখেছে যে ভাবগম্ভীর নীরবতা, তাতে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই? একবার কী হলো, জোসেফিন যখন গান গাইছে, কমবয়সী বোকা একটা কেউ খুব সরলমনেই কিচমিচ করে শিস বাজানো শুরু করল। আর দেখা গেল, তার ও জোসেফিনেরটার মধ্যে সামান্য কোনো পার্থক্যও নেই; আমাদের সামনের দিক থেকে আসছে জোসেফিনের কিচমিচ শিস, তার অত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কেমন লাজুক একটা গলা; আর শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আসছে বাচ্চাদের মতো কণ্ঠের নিজেকে-ভুলে-যাওয়া এক কিচমিচ শিসধ্বনি; এদের কেউই আলাদা করতে পারবে না; তার পরও আমরা তক্ষুনি এই অনাহূতকে শিস দিয়ে ও স্ স্ স্ আওয়াজ তুলে থামিয়ে দিলাম, যদিও সত্যি বলতে ওটা করার দরকার ছিল না, কারণ আমরা অমনটা না করলেও সে নিজের থেকে লজ্জা আর ভয়ে এমনিতেই কুঁকড়ে গিয়ে হামা দিত; ইতোমধ্যে জোসেফিন, খুশিতে আত্মহারা হয়ে, শুরু করে দিয়েছে তার বিজয়ীর কিচমিচ, তার হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে আর তার গলা যত দূর পারা যায় তত দূর উপরের দিকে তুলে ধরে।

কিন্তু সে সব সময় অমনই; যেকোনো তুচ্ছ জিনিস, যেকোনো দৈবাৎ ঘটনা, যেকোনো উৎপাত, মেঝের কাঠের সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ, দাঁতের সামান্য কিচমিচ, আলোতে কোনো সমস্যা – সবকিছুকে সে ভাবে তার গানের জাদু বাড়ানোর মোক্ষম উপায়; তার হিসেবে তার গান তো এমনিতেই কেউ বোঝে না; উৎসাহ আর হাততালির হয়তো কোনো কমতি নেই, কিন্তু অন্যরা তাকে সত্যিকারের বুঝবে, সে যেভাবে চায় সেরকম করে বুঝবে, এই আশা সে ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন আগেই। এ কারণেই যেকোনো উৎপাতকে সে দেখে সুবিধা হিসেবে; বাইরের যেকোনো কিছু যা তার গানের বিশুদ্ধতার সঙ্গে যায় না, আর যাকে হারানো যায় সহজেই, কোনো কষ্ট না করেই হারানো যায়, এমন যেকোনো কিছু শ্রোতাদের জাগিয়ে তুলতে পারে, তাদেরকে কোনো উপলব্ধি দিতে না পারলেও অন্তত তাদের মধ্যে কিছুটা ভয় ও শ্রদ্ধা মেশানো ভাবের জন্ম দিতে পারে।

কিন্তু এসব ছোট বিষয় যদি তার এতটা কাজে আসে, তাহলে ভেবে দেখুন, বড়গুলোতে কী হতে পারে! আমাদের জীবন অনেক উদ্বেগের, প্রতিটা দিন আসে নতুন সব বিস্ময় নিয়ে, সেই সঙ্গে নতুন বিপদসংকেত, আশা, আতঙ্ক; এর ফলে কারো একার পক্ষে এতটা চাপ নেওয়া সম্ভব হয় না – তাকে দিনে-রাতে সব সময়, তার সঙ্গীদের সহযোগিতা নিয়ে চলতে হয়; কিন্তু তার পরও প্রায়ই সবকিছু অনেক কঠিন হয়ে ওঠে; মাঝেমধ্যেই হাজার জনের কাঁধ কাঁপতে থাকে এমন এক বোঝার ভারে, যা আসলে কেবলমাত্র একজনের বোঝা। জোসেফিন কিন্তু অপেক্ষা করে থাকে এই সময়টার জন্যই। ঐ যে সে দাঁড়িয়ে ওখানে, দুর্বল এক চিড়িয়া, বিপজ্জনকভাবে কাঁপছে বিশেষ করে তার বুকের নিচের দিকটায়; দেখে মনে হচ্ছে তার সব শক্তি যেন সে ঢেলে দিয়েছে তার

গানের মধ্যে; যেন যেকোনো কিছু যা তার গানের কোনো কাজে আসছে না, তার শরীরের সামান্য একটু শক্তিও, তার বেঁচে থাকার সামান্য কোনো উপায়ও – সব যেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার থেকে; যেন তাকে উলঙ্গ করে ফেলা হয়েছে, উন্মুক্ত, পুরোপুরি সে টিকে আছে স্রেফ সহৃদয় অতিলৌকিক শক্তিদের দয়ার ওপর; যেন এই এভাবে যখন সে বাস করছে তার গানের মধ্যে, এরকম সবকিছুর সামনে পুরো উন্মুক্ত হয়ে, যেন তখন স্রেফ ঠান্ডা হাওয়ার সামান্য একটা ফুঁয়েই সে শেষ হয়ে যাবে। তবে ঠিক এরকম দৃশ্য দেখেই আমরা – তার তথাকথিত বিরোধীপক্ষ যারা – নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি: 'সে তো সামান্য কিচমিচ করতেও জানে না; দেখো তাকে কী ভয়ংকর কষ্ট করতে হচ্ছে একটুখানি গান গাওয়ার – আরে গানের কথা তো বাদই দাও – একটুখানি আমাদের রোজকার কিচমিচ করার মতো কিছু করতে গিয়েও।' আমাদের এমনটাই মনে হয়; তবে তার পরও, যা আগেই বলেছি, আমাদের এই অবশ্যম্ভাবী অনুভূতি স্রেফ ক্ষণিকের জন্যই, দ্রুতই তা মিলিয়ে যায়। একটু পরেই আমরাও ডুবে যাই ভিড়ের বাকিদের অনুভূতির মধ্যে, ওরা – একজন আরেকজনের গরম শরীরের সঙ্গে ঠাসাঠাসি হয়ে – তার গান শুনে যায় শ্রদ্ধা-মাখানো রুদ্ধনিশ্বাসে।

আর আমাদের জাতির এই এতগুলোকে একসঙ্গে তার চারপাশে জড়ো করার জন্য – মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতির সবাই সব সময়ে আছে চলার মধ্যে, সব সময় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটছে এদিক-ওদিক, কেন তা প্রায়ই স্পষ্ট নয় – সাধারণত জোসেফিনের ওরকম একটা অবস্থান নিলেই কাজ হয়ে যায়: মাথা পেছনে ঝুলিয়ে, মুখ অর্ধেক খুলে, চোখ আকাশের দিকে তুললেই চলে, সবাই বুঝে যায় সে গান গাইতে চাচ্ছে। এই কাজটা সে যেকোনো জায়গায় করলেই হবে, জায়গাটা দূর থেকে দেখা না গেলেও চলবে; ঠিক ঐ মুহূর্তে, কোনোকিছু না-ভেবেই, যেকোনো একটু নিরালা কোনার মধ্যে হলেও অসুবিধা নেই। সে গান গাইতে যাচ্ছে এই খবর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তক্ষুনি মিছিল করে আসতে থাকে সবাই। তবে কখনো-সখনো কাজটা কঠিনও হয়ে পড়ে; জোসেফিনের বেশি পছন্দ ঝামেলার সময়ে গান ধরা, তাই দেখা যায় একগাদা উদ্বেগ ও সমস্যার মধ্যে পড়ে আমাদের আসতে হয় নানা ঘোরানো পথ ধরে; সাদা দুনিয়ার সব সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় জোসেফিন যত তাড়াতাড়ি চায়, তত তাড়াতাড়ি আমরা জড়ো হতে পারি না; দেখা যায়, তাকে তার ওই অনবদ্য ভঙ্গিমায় হয়তো যথেষ্ট দর্শকসমাগম না-হওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে – তারপর স্বাভাবিক সে রাগে ফেটে পড়ে, পা দিয়ে মাটিতে বাড়ি মারতে থাকে, জঘন্য অ-নারীসুলভ ভঙ্গিতে গালিগালাজ করতে থাকে, সত্যি বলতে সে এমনকি কামড় দেওয়াও শুরু করে। কিন্তু দেখা যায় এ ধরনের আচরণেও তার সুনামের কোনো ক্ষতি হয় না; তার এসব বাড়াবাড়ি চাহিদা কিছুটা খর্ব করার পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে, সবাই বরং যদ্দুর সম্ভব চেষ্টা করে সেগুলো মেটাতে; শ্রোতাদের ধরে নিয়ে আসার জন্য পিয়ন পাঠানো হয়; এই কৌশলের কথা তাকে জানানো হয় না; চারদিকের সব রাস্তায়

তখন দেখা যায় প্রহরী বসানো হয়েছে, তারা আসতে থাকা শ্রোতাদের হাত নেড়ে নেড়ে তাড়া দিতে থাকে আরেকটু জোরে ছোটার জন্য; এ রকম চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষমেশ একটা মানানসই শ্রোতার সংখ্যা তৈরি হচ্ছে।

জোসেফিনের জন্য আমাদের জাতির সবাই এ রকম কষ্ট করতে রাজি হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জোসেফিনের গানবিষয়ক প্রশ্নটার মতোই কঠিন, আর আসলে একটার সঙ্গে অন্যটার যোগও আছে। এই প্রশ্নটা আপনি বাতিল করেও দিতে পারেন, এটাকে দ্বিতীয় প্রশ্নের সঙ্গে পুরোপুরি মিশিয়ে দিয়ে; সে ক্ষেত্রে আপনাকে ধরে নিতে হবে যে আমাদের জাতির সবাই জোসেফিনের প্রতি নিঃশর্তভাবে অনুরক্ত তার গানের কারণেই। কিন্তু তা তো সত্যি নয়; নিঃশর্ত অনুরক্তি বলে বাস্তবিক কোনোকিছু আমাদের জানা নেই; আমাদের জাতির যারা আছি তারা সবকিছুর ওপরে ভালোবাসি একধরনের ধূর্তামি, নির্দোষ ধরনের ধূর্তামি, বাচ্চাদের মতো ফিসফিসিয়ে কথা বলা, আর আমরা কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না নিয়েই, মন থেকে নয়, স্রেফ ঠোঁটের থেকে, চর্চা করে যাই গুজব ও গালগল্পের – এরকম এক জাতির পক্ষে শর্তহীন অনুরক্তি অসম্ভব একটা বিষয়; আর সম্ভবত জোসেফিনও তা অনুমান করতে পারে; ঠিক এটার বিরুদ্ধেই সে লড়াই করে যায় তার দুর্বল স্বরযন্ত্রের সব শক্তি দিয়ে।

তবে নিশ্চিত এরকম আলগা রায় দেওয়াও সেটা বেশি দূর নেওয়া ঠিক নয়; জাতি হিসেবে আমরা আসলেই জোসেফিনের প্রতি অনুরক্ত, নিশ্চিত আমরা তার ভক্ত, শুধু শর্তহীনভাবে কথাটা ঠিক না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা জোসেফিনকে নিয়ে কখনোই হাসাহাসি করতে পারি না। সত্য স্বীকার করে নেওয়া ভালো: জোসেফিনের মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা হাসির উদ্রেক করে; আর হাসিতে ফেটে পড়া আমাদের জাতির চিরকালীন বৈশিষ্ট্য; আমাদের বেঁচে থাকার এত এত দুর্গতি সত্ত্বেও একটুখানিকের জন্য চুপচাপ হাসি, সত্যি বলছি, আমাদের খুব পছন্দের বিষয়; কিন্তু জোসেফিনকে নিয়ে আমরা হাসি না। মাঝেমধ্যে আমার মনে হয় আমাদের জাতি জোসেফিনের সঙ্গে তার সম্পর্ককে বরং এভাবে দেখে: এই নাজুক, অরক্ষিত, যেভাবেই হোক বিশিষ্ট আসনে বসা প্রাণীটির – তার হিসাবমতে, তার বিশিষ্টতার কারণ তার গান – ভার আমাদের হাতে সঁপে দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের অবশ্যই তার দেখভাল করে যেতে হবে; এর কারণ কী তা কারো কাছেই পরিষ্কার নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে এটাই প্রতিষ্ঠিত সত্য। আর আপনার হাতে কোনোকিছু বিশ্বাস করে যত্ন নেওয়ার জন্য সঁপে দেওয়া হলে আপনি তো তা নিয়ে হাসেন না; ঐ হাসি তো দায়িত্বভঙ্গের সমতুল্য হয়ে যাবে; আমাদের মধ্যে জোসেফিনের ওপর যাদের বিদ্বেষ সবচেয়ে বেশি, তারাও ওর প্রতি সবচেয়ে বড় বিদ্বেষ ঝাড়ে খুব বেশি হলে, মাঝেমধ্যে, এ কথা বলে: 'জোসেফিনকে যখন দেখি তখন তো হাসি আসে না।'

তার মানে আমাদের জনগণ জোসেফিনের যত্ন নেয় ঠিক যেভাবে কোনো বাবা যত্ন নেয় তার দিকে ছোট ছোট হাত সামনে বাড়িয়ে দেওয়া শিশুসন্তানের – ওই বাড়ানো হাত দেখে বলার উপায় নেই শিশুটি কি কাকুতি-মিনতি করছে, নাকি তার চাহিদার কথা

জানাচ্ছে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে ওরকম পিতৃসুলভ দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের জনগণ উপযুক্ত নয়, কিন্তু সত্যি হচ্ছে আমরা সেটা, অন্তত শুধু এই জোসেফিনের বেলায়, ঠিকই খুব ভালোভাবে পালন করি; এই ক্ষেত্রে কারো একার পক্ষে দায়িত্বটা সেভাবে পালন করা সম্ভব নয়, যা একটা জাতি হিসেবে সবাই মিলে সম্ভব। বলা বাহুল্য, জাতির শক্তি কোনো একজনের শক্তির চেয়ে অনেক অনেক বেশি, এতই বেশি যে জাতিকে স্রেফ তার কাছে রক্ষাপ্রার্থী ওই একজনকে নিজের কোলের উষ্ণতার মধ্যে একটু টেনে নিলেই হয়, তাতেই সবকিছু থেকে তার যথেষ্ট রক্ষা মিলতে বাধ্য। মানছি, কারো অবশ্য সাহস নেই এসব কথা জোসেফিনকে বলার। 'আমাকে রক্ষা করার কথা ভুলেও বলবে না,' সে তখন বলবে, 'না হলে তোমার কিচমিচের শিগগির আমি বারোটা বাজিয়ে দেব।' 'ওহ্ হ্যাঁ, কিচমিচ করা তো তুমি ভালোই জানো,' আমরা ভাবি। তবে যা-ই বলুন, তার ওরকম বিদ্রোহী আচরণ মানে এটা না যে সে আমাদের কথা সত্যিই মানতে চাইছে না। তার এই আচরণ বরং এক শিশুসুলভ বিদ্রোহের, এটার মধ্যে দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শিশুতোষ ভঙ্গিটাই ফুটে ওঠে; এ ক্ষেত্রে কোনো পিতার কাজ হলো এসব খেয়াল না-করা।

তবে ঘটনা এখানেই শেষ নয়, আরো অন্য ব্যাপারও আছে; আমাদের জনগণ ও জোসেফিনের মধ্যেকার সম্পর্কের হিসাবটা ব্যাখ্যা করা এবার কিছুটা কঠিনই বটে। ঘটনা হচ্ছে, জোসেফিনের হিসাব পুরো উল্টো; তার বিশ্বাস, সে-ই বরং আমাদের জনগণকে রক্ষা করছে। যখনই আমরা গভীর কোনো সমস্যায় পড়ি, তা রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতিক, বলা হয়ে থাকে যে তার গান তখন আমাদের রক্ষা করে; ঐ গানের অবদান এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; আর তাতে যদি আমাদের দুর্দশার অবসান নাও হয়, অন্তত সেটার ভার বহনের শক্তি আমরা পাই তার গান থেকেই। এমন না যে সে নিজে থেকে এটা বলে, কিংবা এভাবে না-বললেও অন্যভাবে বলে, বস্তুত সে খুব একটা কিছু বলে না কখনোই; আমাদের এই বকবক করা জনগণের তুলনায় সে অনেক চুপচাপ, কথাটা তার চোখের মধ্যে ঝিলিক মারে; তার বন্ধ করে রাখা ঠোঁটে – আমাদের মধ্যে খুব সামান্য কজনই হয়তো আছে যারা ঠোঁট বন্ধ রাখতে পারে; জোসেফিন তাদেরই একজন – কথাটা স্পষ্ট পড়া যায়। যখনই আমাদের কাছে কোনো খারাপ খবর আসে – অনেক দিনই দেখা যায় খারাপ খবর আসে বানের মতো, মিথ্যা খবর, অর্ধসত্য খবর সব মিলিয়ে অনেক – তখন জোসেফিন তার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে – অন্য সময় হলে এই একই ক্লান্তিতে ঢুলতে থাকে সে – উঠে দাঁড়ায় একটুও দেরি না করেই, দাঁড়িয়ে গলা সারসের মতো বাড়িয়ে সে এদিক-ওদিক তার জাতিভাইদের দেখতে থাকে, যেভাবে ঝড় আসার আগে রাখাল-বালক দেখে নেয় তার মেষগুলো। সত্যি যে বাচ্চারাও এ ধরনের দাবি করে থাকে, তাদের যুক্তিহীন, বিশৃঙ্খল পদ্ধতিতে তারা এসব দাবি জানায়; কিন্তু জোসেফিনের দাবিগুলো বাচ্চাদের মতো অতটা ভিত্তিহীন নয়। এটা কি বলা লাগে যে, জোসেফিন আমাদের কোনো রক্ষাকর্তা নয়, আমরা তার কাছ থেকে কোনো ভার-বহনের শক্তিটক্তিও

পাই না? একটা জাতির রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেকে দাবি করা সোজা, বিশেষ করে সেই জাতি যদি আমাদের মতো হয়: ভোগান্তিতে অভ্যস্ত, নিজেদের ব্যাপারে মুক্তহস্ত, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পারদর্শী, মৃত্যুর সঙ্গে অতিপরিচিত, কেবল বেপরোয়া যে পরিবেশের মধ্যে নিয়ত বাস করছে তাতে মনে হয় একটু উদ্বিগ্ন, আর এরই সঙ্গে বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে যতটা অতিপ্রজ ততটাই স্বভাবে সাহসী – আমি বলতে চাচ্ছি, এরকম এক জাতির রক্ষাকর্তা হিসেবে, যে জাতি সব সময়েই কোনো-না-কোনোভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে, সেজন্য হয়তো তাদের এতটা মূল্য দিতে হয়েছে যা ভেবেই কিনা ইতিহাসবিদেরা – অবশ্য, সাধারণত, ঐতিহাসিক গবেষণায় আমরা কোনো পাত্তা দিই না – আতঙ্কে হিম হয়ে যান; সে রকম জাতির রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেকে জাহির করা খুব সহজ। তা সত্ত্বেও ঠিক এ রকম সময়গুলোতেই, যখন আমরা সবচেয়ে বিপদে থাকি সে রকম সময়েই আমরা জোসেফিনের গান অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে গভীর মনোযোগে শুনি। আমাদের ওপরে ঝুলতে থাকা আসন্ন বিপদের হুমকি আমাদের করে তোলে আরো শান্ত, আরো বিনয়ী, জোসেফিনের একনায়কসুলভ আচরণের প্রতি আরো অনুগ্রহ; আমরা আনন্দের সঙ্গেই সবাই একসঙ্গে হই, আনন্দের সঙ্গেই দল বেঁধে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়াই; আনন্দ কারণ আমাদের এই এখনকার গানের আসর ঐ বিরাট ও নিদারুণ যন্ত্রণার মূল বিষয় থেকে কত দূরের; ব্যাপারটা এমন যেন আমরা সবাই তড়িঘড়ি – ওহ্ হ্যাঁ, তড়িঘড়ি করার প্রয়োজন আছে, জোসেফিন প্রায়ই ভুলে যায় সেই কথা – যুদ্ধের আগে আমাদের শান্তির যৌথ পানপাত্র থেকে একটু পান করে নিচ্ছি। আসরটা যতটুকু না গানের, তার চেয়ে বেশি জনসমাবেশের; আরো বড় কথা, এটা এমন এক জনসমাগম যেখানে, স্রেফ সামনের দিকের দুর্বল গলায় কিচমিচ করতে থাকা ঐ একজন ছাড়া, সবাই একদম চুপ; বকবকানি করার হিসেবে অনেক অনুপযুক্ত ও অনেক গাম্ভীর্যপূর্ণ এক সময় তখন।

অবশ্য এ ধরনের এক সম্পর্ক জোসেফিনকে কখনোই তৃপ্ত করতে পারে না। আমাদের জাতিতে তার অবস্থান কোথায়, তা কখনোই পরিষ্কার নয়, আর সেজন্য জোসেফিনের বুক ভরে থাকে অভিমান ও অসন্তোষে, তার নিজের প্রতি বিশ্বাসে সে আসলে এত অন্ধ যে অনেককিছুই সে দেখতে পায় না, আরো অনেক কিছুতে তার যেন চোখ না পড়ে সে-বিষয়ে তাকে রাজি করানোও কঠিন কোনো ব্যাপার নয়, – এ উদ্দেশ্যেই তাকে সব সময় ঘিরে রাখে চাটুকারের দল, তবে, অন্যদিক থেকে দেখলে, সবার জন্য ভালো কাজই তো করে তারা; – কিন্তু স্রেফ কোনো একটা জায়গায়, জনসমাবেশের কোনো এক কোনার মধ্যে, কেউ ঠিকমতো খেয়ালও করছে না এমন এক অবস্থায়, স্রেফ কোনো আনুষঙ্গিক আকর্ষণ হিসেবে গান গাওয়ার জন্য, যদিও সেটাও একেবারে কম কথা নয়, জোসেফিন নিশ্চিত তার সংগীতশিল্প বিসর্জন দেবে না।

তাকে দিতেই বা কে বলছে? তার শিল্পের দিকে কারো খেয়াল নেই কথাটা তো সত্যি না। যদিও এটা সত্যি যে আমরা তখন মানসিকভাবে একদম অন্য কিছুতে আচ্ছন্ন, সত্যি যে আমাদের তখনকার ঐ নীরবতার কারণ শুধু সে গান গাইছে বলেই না, সত্যি যে

অনেক শ্রোতাই এমনকি উপরের দিকে একটু তাকায়ও না, বরং তার বদলে পাশের জনের লোমের মধ্যে মুখ গুঁজে রাখে, আর তাই জোসেফিনকে দেখতে মনে হয় যে ঐ সামনে ওখানে একদম বিনা কারণে সে নিজেকে ক্লান্ত করে চলেছে, এসব সত্ত্বেও তার ঐ কিচমিচ শিসের মধ্যে – এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই – ঠিকই দুর্নিবার কিছু আছে যা আমাদের মনকে মাতায়। এই জেগে উঠতে থাকা কিচমিচ শিস – যখন অন্য সবাইকে, অন্য সবকিছুকে যেন বলা হয়েছে একদম নীরব থাকতে – প্রত্যেক সদস্যের কানে পৌঁছায় জাতির থেকে আসা কোনো বার্তার মতো; গুরুতর সব সিদ্ধান্তের মাঝখানে জোসেফিনের এই ক্ষীণ কিচমিচ অনেকটা যেন বৈরী পৃথিবীর মাঝখানে আমাদের জনগণের সকরুণ অস্তিত্বের মতোই কিছু। জোসেফিন নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তার এই তুচ্ছ গলা, এই তুচ্ছ অর্জন নিজেদের জাহির করে আর ঠেলে পথ কেটে পৌঁছায় আমাদের মনের জগতে; এ কথা মনে রাখা দরকার। যদি কোনো দিন সংগীতশিল্পের কোনো সত্যিকারের প্রতিনিধি আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে, তাকে কিন্তু আমরা জাতির এরকম একটা সময়ে নিশ্চিত সহ্য করতে পারব না, সবাই আমরা একজোট হয়ে তার গানকে হাস্যকর হিসেবে প্রত্যাখ্যান করব। হায়, জোসেফিন যেন কখনো এটা জানতে না পারে যে আমরা তার গান যে শুনি তার মানেই হচ্ছে, সে সত্যিকারের কোনো গায়িকা নয়। তার মনের মধ্যে এটা নিয়ে সম্ভবত ঠিকই কিছুটা সন্দেহ আছে, নতুবা কেন সে ওরকম জোর দিয়ে বলে যে আমরা তার গান শুনি না? – তার পরও সে নিজের মতো গেয়েই যায়, এসব সন্দেহ পাশ কাটিয়ে কিচমিচ করে যায়।

তবে, এটা ছাড়াও, তার জন্য অন্য আরো সান্ত্বনাও আছে: কিছুটা হলেও এটা সত্যি যে আমরা সত্যিই তার গান শুনি, সব সত্ত্বেও শুনি, যেভাবে কেউ সম্ভবত কোনো সত্যিকারের গায়কের গান শোনে, অনেকটা সেভাবে; আমাদের মন সে এমনভাবে আচ্ছন্ন করতে পারে যা কিনা কোনো সত্যিকারের শিল্পী আমাদের বেলায় পারত না, কোনো সন্দেহ নেই তার গানের ক্ষমতা কম বলেই সে এমনটা পারে। এটার মূল কারণ, নিঃসন্দেহে, আমাদের জীবনযাপনের ধারা।

আমাদের জীবনে তরুণ বয়স বলে কিছু নেই, আর সামান্য একটু শৈশবেরও কোনো অস্তিত্ব নেই। সব সময় আমরা উপদেশ শুনি যে বাচ্চাদের একটু স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত; তাদের যে একটু শাসনের বাইরে যাওয়ার অধিকার আছে – এসব অধিকার মেনে নেওয়া উচিত, এসব অধিকার যেন তারা পায় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা উচিত; এ ধরনের উপদেশ আমাদের দেওয়া হয়, আর বলতে গেলে সবাই তাতে সম্মতিও জানায়, এর চেয়ে বেশি সম্মতি জানানোর মতো আর কিছু আমরা পাই না, কিন্তু একই সঙ্গে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার নিরিখে, মেনে নেওয়ার জন্য এর চেয়ে কঠিন কিছুও নেই; আমরা বাচ্চাদের এসব দাবি মেনে নিই, তারা যেন ওভাবে চলতে পারে তার জন্য কিছু প্রচেষ্টাও নেওয়া হয়, কিন্তু দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই সব আবার যেখানে ছিল সেখানে ফিরে এসেছে। সত্যি কথা হচ্ছে, আমাদের জীবনটাই এমন

যে, যে-ই না একটা বাচ্চা একটু দৌড়াদৌড়ি করা শিখল, তার চারপাশ একটু চেনা শুরু করল, তাকে তখনই ঠিক বড়দের মতো করেই নিজেই নিজের দেখাশোনা করতে হয়; অর্থনৈতিক কারণে আমরা যতখানি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে বাস করতে বাধ্য হই তা আকারে খুব বিশাল, আমাদের শত্রুর সংখ্যাও অগুনতি, আমাদের জন্য সবখানে ওঁত পেতে থাকা বিপদের সংখ্যাও অগণন – বেঁচে থাকার সংগ্রাম থেকে আমাদের বাচ্চাদের আগলে রাখা তাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না; যদি তা আমরা করার চেষ্টা করতাম, তার সোজা মানেই হতো এই বাচ্চাদের অকালমৃত্যু। তবে এরকম মন-খারাপ-করা কারণের পাশাপাশি একটা মন চাঙা করা কারণও আছে: বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের জাতির অতিপ্রজতা। এক প্রজন্মের – প্রতিটা প্রজন্মই সংখ্যায় অগণন – পেছন পেছনেই রয়েছে তার আগেরটা; বাচ্চাদের সময় নেই বাচ্চা থাকার। অন্য জাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা তাদের শিশুদের বিরাট যত্ন নিয়ে লালন-পালন করে, ওদের জন্য তারা হয়তো স্কুল বানায়, আর এসব স্কুল থেকে শিশুরা, জাতির ভবিষ্যৎ তারা, ঢলের মতো বেরিয়ে আসতে থাকে; কিন্তু অন্য এসব জাতির ক্ষেত্রে রোজ রোজ, দীর্ঘকাল ধরে, এই যে শিশুরা এভাবে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে, তারা কিন্তু একই শিশুদের দল। আমাদের কোনো স্কুল নেই, আমাদের অগুনতি বাচ্চাদের ঝাঁক বেরিয়ে আসে আমাদের জাতির ভিড়ের মধ্যে থেকেই, সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে বেরিয়ে আসে তারা – ফুর্তিতে কিচিরমিচির করছে কিংবা চিকচিক শব্দ করছে যত দিন পর্যন্ত না কিচমিচ করে শিস দেওয়া না শিখছে, মাটিতে গড়াচ্ছে কিংবা ভিড়ের হাতে লাথিগুঁতো খাচ্ছে, যত দিন পর্যন্ত না দৌড়াতে শিখছে, তাদের বিশাল এক পাল হয়ে চলার কারণে সামনের সবকিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে, যত দিন না ঠিকভাবে দেখতে শিখছে – আহ্, আমাদের বাচ্চারা! আর তারা, অন্য জাতির স্কুলের বাচ্চাদের মতো, সব সময়ে একই বাচ্চা না; না, সব সময়েই নতুন মুখ, চিরদিন, ফের নতুন নতুন মুখ; এর কোনো শেষ নেই, এর কোনো বিরাম নেই; এই এখন দেখলেন একটা বাচ্চা, তারপরই সে আর বাচ্চা নেই, এর পেছনে আরো অনেক বাচ্চার মুখ ভিড় করে আসতে শুরু করেছে, সংখ্যায় এত বেশি আর গতিতে এত দ্রুত যে এদের একটা থেকে আরেকটা আলাদা করার কোনো উপায় নেই, সবগুলো খুশিতে গোলাপি চেহারা। কিন্তু যতই আনন্দের শোনাক এ কথাগুলো, আর অন্য জাতির ওরা আমাদের এ কারণে যতই ঈর্ষা করুক – ঈর্ষাটা অযৌক্তিক নয় – সত্য এটাই থাকে যে আমরা আমাদের সন্তানদের একটা সঠিক শৈশব উপহার দিতে অসক্ষম। আর এর পরিণতি অবশ্যই আছে। আমাদের জাতির সবার ওপরে সব সময়ের জন্য বিরাজ করছে এক অমোচনীয় শিশুসুলভ ব্যাপার; আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় গুণ, অর্থাৎ আমাদের অব্যর্থ বাস্তব কাণ্ডজ্ঞান, তার একেবারে বিপরীতেই আমরা কিনা প্রায়-প্রায়ই আচরণ করি চরম বোকার মতো, আমাদের এই বোকামি ঠিক বাচ্চারা যেরকম বোকামি করে সে রকম: একটা বাতিকগ্রস্ত, সীমা ছাড়ানো, প্রবল, দায়িত্বজ্ঞানহীন রকমের বোকামি, আর দেখা যায়, প্রায়ই তা স্রেফ একটু মজা করার জন্যই করছি আমরা। আর

ও রকম করে আমরা যে আনন্দ পাই, তাকে অবশ্য বাচ্চাদের আনন্দের মতো মণপ্রাণঢালা আনন্দ বলা যাবে না, তবে কোনো সন্দেহ নেই, তার মধ্যে বাচ্চাদের সেই আনন্দের কিছুটা ছাপ তো থাকেই। আর আমাদের এই শিশুত্ব থেকে সবচেয়ে বেশি যে লাভ তুলে নিয়েছে, একদম শুরু থেকেই নিয়েছে, সে হলো জোসেফিন।

কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা যে শুধু শিশুসুলভ তা-ই না, এক অর্থে আমরা আসলে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া এক জাতিও বটে; শৈশব ও বয়স হওয়ার ব্যাপারটা আমাদের ক্ষেত্রে অন্য জাতির থেকে ভিন্নভাবে ঘটে। আমাদের কোনো তরুণ বয়স বলে কিছু নেই, আমরা ধুম করে হঠাৎ বড় হয়ে যাই, তারপর একটু লম্বা সময় ধরে ওরকম বড়ই হয়ে থাকি; যার ফলে বিশেষ ধরনের এক ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের বোধ কাজ করে আমাদের জাতির স্বভাবের মধ্যে – যদিও মূলে দেখলে আমরা স্বভাবে শক্ত ও আত্মবিশ্বাসী –, আর এর ছাপ রেখে যায়। আর আমরা যে অসাংগীতিক এক জাতি, তার সঙ্গে এ ব্যাপারগুলোরই সম্ভবত যোগ রয়েছে; আমরা সংগীতের জন্য একটু বেশি বুড়ো, সংগীতের উত্তেজনা, এর কল্লোল, এর উচ্ছ্বাস – এসব আমাদের বুড়োটে ভারিত্বের সঙ্গে যায় না, ক্লান্ত-শ্রান্তভাবে আমরা সংগীতকে দূর-দূর করে দিই; তারপর আমরা পিছু হটে আশ্রয় নিই কিচমিচ শিসের মধ্যে, এই এখন বা তখন একটুখানিক কিচমিচ শিস দেওয়া – ওটাই আমাদের জন্য ঠিক জিনিস। তবে আমাদের মধ্যে যে গানের মেধা নিয়ে কেউ আসেনি তা কে বলতে পারে; কিন্তু যদি এসেও থাকে, সেই মেধা বিকশিত হওয়ার আগেই তার সঙ্গীদের স্বভাব তার মেধাকে টিপে মারবে। অন্যদিকে জোসেফিন কিচমিচ করুক, কি গান গাক, কি ওটা তার মনে যা চায় সেই নামে সে ডাকুক, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা তাতে বিরক্ত হই না, আমাদের জন্য তা বরং ঠিকই আছে, আমাদের তা সহ্য করা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই; তার গলা থেকে যা বেরোয় তার মধ্যে গানের কিছু যদি থেকেও থাকে, সেটা একেবারে ন্যূনতম কিছুতে নামিয়ে আনা হয়; আমরা এক বিশেষ ধরনের গানের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখি, তবে সেই ঐতিহ্যকে আমাদের ওপরে সামান্যতম বোঝা হয়ে উঠতে দিই না কখনো।

কিন্তু আমাদের জনগণ, ওপরে বলা তাদের স্বভাবের কারণেই, জোসেফিনের কাছ থেকে এর চেয়েও বেশি কিছু পায়। তার গানের অনুষ্ঠানগুলোতে, বিশেষ করে বাতাসে যখন বিপদের গন্ধ, দেখা যায় যাদের বয়স একদম কম কেবল তাদেরই আগ্রহ আছে গায়িকার প্রতি; কেবল তারাই অবাক চোখে দেখে কীভাবে সে তার ঠোঁট কোঁচকায়, তার সামনের সুন্দর দাঁতগুলোর ফাঁক দিয়ে কীভাবে বাতাস বেরোয়, নিজের গলা থেকে বেরোনো শব্দ শুনে সে নিজেই কীভাবে ঘোরের মধ্যে চলে যায় আর এই ঘোরের ঘাড়ে চড়েই কীভাবে সে পৌঁছে যায় সাফল্যের আরো উঁচু শিখরে, তার নিজের কাছেই বিশ্বাস হতে চায় না এমন উঁচুতে; কিন্তু ততক্ষণে – পরিষ্কার দেখা যায় যে – শ্রোতাদের মূল অংশ সব যার যার মতো আছে। যুদ্ধের মধ্যেকার এসব ছোট বিরতির সময়ে একটা পুরো জাতি স্বপ্ন দেখা শুরু করে; ব্যাপারটা এমন যেন জাতির প্রতিটা একক সদস্যের হাত-পা একটু

জিরিয়ে নিচ্ছে, যেন যার যার ভেতরকার অস্থিরতা সবাই সরিয়ে রাখছে, যেন যে-কেউ শেষমেশ এত দিনে পারছে জাতির মহান উষ্ণ বিছানায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে তার মনের খুশি মিটিয়ে শুতে। আর এসব স্বপ্নের মধ্যে থেকে থেকে ঢুকে পড়ে জোসেফিনের কিচমিচের শব্দ; সে এটাকে বলে মৃদু জলতরঙ্গ, আমরা বলি ধাক্কার শব্দ; কিন্তু যেটাই হোক, এখানে এসেই গান তার আসল ঠিকানা খুঁজে পায় – অন্য কোথাও না, শুধু এখানেই – গানের প্রতীক্ষায় থাকা আসল মুহূর্তকে খুঁজে পায়; এটা তো সত্যি যে গানের মুহূর্ত সব সময় সহজে এমনি এমনি আসে না। এই গানের মধ্যে থাকে আমাদের অল্প দিনের শৈশবের একটু ছোঁয়া, যে আনন্দ আমরা হারিয়ে ফেলেছি আর যা আর কখনো ফিরে আসবে না তার একটু ছোঁয়া, কিন্তু আমাদের বর্তমানের ব্যস্ত জীবনের কিছুটা ছাপও, এই জীবনের দুর্জ্ঞেয় আনন্দ-ফুর্তির – যা অনড়-অটল বয়ে চলে এবং যার কোনো দিন অবসান ঘটে না – একটুখানি মিশ্রণও। আর এই সবকিছু গানের মধ্যে কোনো জোর ও জমকাল গলায় বলা হয় না, বলা হয় নরম, ফিসফিসে সুরে, সংগোপনে, কখনো কখনো একটু হেঁড়ে গলায়। মানছি যে তার এই গান একধরনের কিচমিচ মাত্র। হবেই বা না কেন? কিচমিচই তো আমাদের জাতির ভাষা; ব্যাপার হচ্ছে, কেউ কেউ সারা জীবন না-জেনেই, না-বুঝেই কিচমিচ করে যায়, আর এখানে এই কিচমিচ কিনা রোজকার জীবনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত, আর তা আমাদেরকেও পারে, সামান্য সময়ের জন্য হলেও, ওসব থেকে মুক্ত করতে। ওহ্ না, যেকোনো মূল্যেই হোক, এই গান আমাদের শোনা লাগবেই।

এখান থেকে নিয়ে জোসেফিনের জোর দাবি পর্যন্ত – অর্থাৎ এরকম সময়ে সে আমাদের দেয় নতুন শক্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি – কিন্তু অনেক লম্বা পথ। মানে, সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য; জোসেফিনের তোষামোদকারীদের জন্য নয়। 'অন্যকিছু হবেই বা কীভাবে?'– এমনটাই তারা বলে কেমন নির্লজ্জ ধৃষ্টতার সঙ্গে – 'তার গানের অনুষ্ঠানের জন্য জড়ো হওয়া এই বিশাল ভিড়ের আর অন্য কী ব্যাখ্যা করা যায়, বিশেষ করে এমন আসন্ন বিপদের সময়েও এত জনসমাগম, আর যখন প্রায়ই দেখা যায় জোসেফিনের আসরে সবাই এভাবে জড়ো হয়েছে বলেই সময়মতো বিপদ এড়ানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা পর্যন্ত নেওয়া যাচ্ছে না?' এই শেষ কথাটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, যদিও এর মধ্য দিয়ে জোসেফিনের খ্যাতির ব্যাখ্যা হয় না; বিশেষ করে, এর সঙ্গে আপনি যখন এটাও দেখবেন যে জোসেফিন – মানে যখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে শত্রুরা ঢুকে পড়েছে দর্শকদের মধ্যে, ভেঙে দিয়েছে ঐ জনসমাগম আর এর ফলে আমাদের অনেকেই মারা পড়েছে শত্রুর হাতে – এমন সময় আপনি যখন দেখবেন যে জোসেফিন, যে কিনা দায়ী এ সবকিছুর জন্য আর যার কিচমিচ শিসের কারণেই আসলে শত্রুরা হাজির হয়েছে, নিজে কিন্তু সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটা দখল করে নিল, সব সময়েই সে থাকল নিরাপদে আর পরে সে-ই প্রথম তার নিরাপত্তাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে পালিয়ে গেল খুব নীরবে আর প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবাই এসবই জানে, তবু তারা পরেরবার আবার যখন জোসেফিন ঠিক করে যে সে উঠে দাঁড়াবে ও গান গাইবে, তখন আবার তারা

দৌড়ে আসে, যেখানেই বা যে-সময়েই সে গান গাইতে মনস্থির করুক না কেন। এসব দেখে আপনার এমনটাই মনে হবে যে জোসেফিন যেন আইনের উর্ধ্বে, যেন যা খুশি তা-ই সে করতে সক্ষম, কোনো ব্যাপারই না যদি তাতে করে আমাদের জাতি বিপদের মধ্যেও গিয়ে পড়ে; তার পরও সবকিছুর জন্য সে ঠিকই মাফ পেয়ে যাবে। যদি সত্যি সত্যিই এমন হয়ে থাকে, তাহলে জোসেফিনের দাবিগুলো তো ঠিকই আছে; প্রকৃত অর্থেই, জনগণ তাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছে, এত বেশি স্বাধীনতা যা আর কাউকেই দেওয়া হয়নি আর যা আমাদের জাতির আইনকানুনের সঙ্গে কোনোভাবেই খাপ খায় না, স্বাধীনতার এ রকম লাগামছাড়া গতি দেখে আপনি বুঝে যাবেন যে আসলেই আমাদের জনগণ – ঠিক যেমন জোসেফিন দাবি করে – জোসেফিনকে বোঝে না, বরং তারা স্রেফ অসহায়ের মতো তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, নিজেদের মনে করে তারা তার গানের যোগ্য নয়, আর আশা করে তাদের এই অযোগ্যতায় জোসেফিন যে কষ্টটা পাচ্ছে তা তারা পুষিয়ে দেবে নিজেদের নিশ্চিত মরিয়া আত্মত্যাগের মাধ্যমে – মানে, জোসেফিনের শিল্পীমন যেমনটা তাদের বোধগম্যতার বাইরে, ঠিক তেমন জোসেফিনকে ও তার ইচ্ছেগুলোকে তাদের আইনকানুনের অনেক বাইরে যেতে দিয়ে। যা-ই বলুন, কথাটা একটুও সত্যি না, হতে পারে খুঁটিনাটি বিষয়ে তারা জোসেফিনের কাছে আসলেই সহজে আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ তারা কারো কাছেই করে না, সুতরাং জোসেফিনের কাছেও না।

দীর্ঘদিন হয়ে গেছে, সম্ভবত তার শিল্পীজীবনের সেই শুরু থেকেই, যে জোসেফিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এই বলে – সে যেহেতু গান গায়, তাই সে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না; আমাদের বেঁচে থাকার যাবতীয় সংগ্রাম ও তার প্রতিদিনকার রুটিরুজির যাবতীয় উদ্বেগ থেকে তাকে রেহাই দিতে হবে আর – তার হিসেব মতে – তার ঐসব ঝামেলার ভার ঘাড়ে নিতে হবে আমাদের পুরো জাতিকে। যাদের কিনা অতি উৎসাহী হওয়ার রোগ আছে – এরকম অতি উৎসাহী চিড়িয়া আমাদের মধ্যে আসলেই রয়েছে – এমন যে-কেউ স্রেফ জোসেফিনের এই দাবির অস্বাভাবিকতা দেখে, এমন দাবি করার মতো মানসিক শক্তি কারো আছে এটা দেখে, ধরে নেবে তার দাবির যেন সহজাত ন্যায্যতা রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ এটা ধরলেও, জাতি হিসেবে আমরা কিন্তু তা ধরে নিইনি; আমরা শান্তভাবে জোসেফিনের অনুরোধে 'না' বলে দিয়েছি। আমরা যে এর পেছনের যুক্তিতর্ক খণ্ডানোর জন্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছি তা-ও নয়। জোসেফিন দাবি করে, উদাহরণস্বরূপ বলছি, যে কাজের চাপে তার গলার ক্ষতি হয়, সে আরো বলে কাজের চাপ যদিও গান গাওয়ার চাপের তুলনায় কিছুই না, তবু গান গাওয়ার পরে যে বিশ্রামটুকু তার দরকার হয়, নতুন করে গান গাওয়ার জন্য যে শক্তিটুকু তার দরকার হয়, তাকে গানের পাশাপাশি কাজও করতে হলে সেই বিশ্রাম সে আর পায় না, এর ফলে গান গেয়ে সে নিজেকে ক্লান্তিতে নিঃশেষ করে ফেলে ঠিকই, কিন্তু তবু, যেহেতু পরিস্থিতিটা এমন, গানের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা

তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। জনগণ তার এসব যুক্তি শোনে কিন্তু এসবে কোনো গা করে না। আমাদের এই জনগণ, আহ্ তাদের কত সহজে অভিভূত করা যায়, সেই তারাই আবার মাঝে মাঝে কিনা আদৌ কিছুতেই অভিভূত হয় না। তাদের প্রত্যাখ্যান মাঝেমধ্যে এত রূঢ় প্রত্যাখ্যান হয় যে এমনকি জোসেফিনও অবাক হয়ে যায়, তাকে জনগণের রায় মেনে নিতে হয়, নিজের কাজের ভাগটুকু নিজেকেই করতে হয়, যেটুকু ভালোভাবে সম্ভব গান গাইতে হয় – কিন্তু এ সবই অল্পখানিকের জন্য; কারণ তারপর আবার নতুন উদ্যম নিয়ে – এ কাজে তার উদ্যমের মনে হয় কোনো শেষ নেই – সে ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে তার লড়াইতে।

তবে এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে জোসেফিন যা বলছে, আক্ষরিক অর্থে সে আসলে তা চায় না। তার বুদ্ধি আছে; সে কাজ ভয় পায় না, অবশ্য কাজ ভয় পাওয়া ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে এমনিতেই থাকা অসম্ভব; তাকে কাজ করতে হবে না, তার এই আরজি যদি মানাও হতো, তার জীবন কিন্তু ঐ আগের মতোই থাকত, তার কাজ তার গানের জন্য একটুও কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াত না, তার গানও যে এর ফলে আরো বেশি সুন্দর কিছু হতো, তা-ও না – না, তার সত্যিকারের চাওয়া আসলে তার শিল্পের গণস্বীকৃতি, এমন এক স্বীকৃতি যা কিনা দ্ব্যর্থহীন, কাল বা যুগহীন, আজ পর্যন্ত দেওয়া যেকোনো স্বীকৃতির চেয়ে বড়। কিন্তু অন্য প্রায় সবকিছু তার মুঠোর মধ্যে থাকলেও দেখা যায় তার কাছে শুধু এই স্বীকৃতির ব্যাপারটা কখনো ধরা দেয় না। মনে হয় প্রথম থেকেই তার লড়াইয়ের জন্য ভিন্ন কোনো কৌশল নেওয়া উচিত ছিল, মনে হয় সে এত দিনে তার ভুল বুঝে গেছে, কিন্তু এখন আর তার পেছনে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, যেকোনো ধরনের পিছু হটাই তার জন্য হয়ে যাবে নিজের প্রতি অসৎ হওয়া; এখন তার এই কাজ করতে না চাওয়ার দাবি নিয়েই হয় তাকে লড়তে হবে, নয়তো মরতে হবে।

সে যেমনটা বলে, তার যদি আসলেই ওরকম শত্রু থাকত, তারা তাহলে তার এই লড়াই দেখে মজাই পেত শুধু, কখনো তার বিরুদ্ধে একটা আঙুল তোলারও দরকার পড়ত না তাদের। কিন্তু তার তো কোনো শত্রু আসলে নেই; আর যদি ধরলাম মাঝে মধ্যে তাকে ছোটখাটো বিরোধিতার মুখে পড়তেও হয়, তবু আসলে তার এই লড়াইতে কেউ মজা পায় না কোনো। কীভাবে তারা মজা পাবে, যখন কিনা তারা আসলে এ ব্যাপারে বেছে নিয়েছে এক শীতল, নিরপেক্ষ মনোভঙ্গি – এমন এক ভঙ্গি যা অন্য কোনোকিছুর বেলায় দুর্লভ? আর কেউ একজন যদি নিজে ধরলাম জোসেফিনের দাবি ব্যক্তিগত পর্যায়ে মেনেও নিল, কিন্তু জাতি হিসেবে একদিন এভাবেই এ ধরনের দাবি তার বা অন্যদের ক্ষেত্রেও মানা লাগতে পারে, স্রেফ এই চিন্তা থেকেই তো আনন্দের সঙ্গে জোসেফিনের দাবি মেনে নেওয়া থেকে সে পিছিয়ে যাবে। কারণ এখানে, সত্যিকার অর্থে, জোসেফিনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা বা তার দাবিটা আসলে কী, সেটা কোনো ব্যাপার নয়; ব্যাপার হচ্ছে জাতি হিসেবে আমরা যে আমাদেরই এক কমরেডের

সামনে এরকম পাথুরে, দুর্ভেদ্য এক দেয়াল তুলে দিতে পারলাম – সেটা; আর এ ক্ষেত্রে দেয়ালটা আরো বেশি দুর্ভেদ্য কারণ এ সেই আমাদের একই কমরেড যাকে কিনা অন্য সবকিছুর বেলায় আমরা পিতৃসুলভ – আসলে পিতৃসুলভ বললেও কম বলা হবে – এক বিনয়নম্র যত্নের সঙ্গে দেখেছি।

আসুন, এখানে আমরা জাতির জায়গায় কোনো একক ব্যক্তির কথা চিন্তা করি: আপনি ধরে নিতে পারেন যে এই লোকটি সব সময় জোসেফিনের বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে শুধু তার বুকের ভেতরে এক বিরামহীন, জ্বলন্ত বিশ্বাস থেকে যে এভাবেই একদিন এই সব বশ্যতা স্বীকারের শেষমেশ ইতি ঘটবে; সে অতিমানবিক পরিমাণে জোসেফিনকে ছাড় দিচ্ছে এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই যে অবশেষে এই সমস্ত ছাড়ের একটা বিহিব্যবস্থা হবে একদিন; প্রকৃত অর্থে, দরকারের চেয়েও বেশি ছাড় সে দিয়ে চলেছে স্রেফ যাতে করে সেই দিনটা একটু তাড়াতাড়িই আসে, স্রেফ জোসেফিন যেন আরো আহ্লাদ পায় এবং আরো আরো বেশি চাইতে উদ্বুদ্ধ হয়, আর যেন শেষমেশ একদিন জোসেফিন তার এই শেষ দাবিটা করে বসে, আর তখন যেন সে, আগে থেকেই ভালো রকম তৈরি হয়ে আছে বলেই, সোজা, সংক্ষেপে তার চূড়ান্ত 'না'-টা জোসেফিনকে বলে দিতে পারে। হুঁ, কিন্তু সত্য আসলে এমন নয়, একেবারেই না; আমাদের জনগণের এত কূটকৌশলের দরকার পড়ে না, আর তা ছাড়া জোসেফিনের ওপরে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা যথেষ্ট আন্তরিক এবং প্রমাণিত, আর এমনিতেই জোসেফিনের দাবি এতই বাড়াবাড়ি রকমের যে, কোনো সাধারণ বাচ্চার পক্ষেও তাকে বলা সম্ভব এর পরিণতি কী হবে; তা সত্ত্বেও, জনগণের ওপরে-বলা ধারণাগুলো যে পরিস্থিতি বিষয়ে জোসেফিনের নিজের ধারণাকে কিছুটা প্রভাবিত করে তা বোঝাই যায় – ফলে, শেষমেশ, তার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কষ্টের সঙ্গে আরো যোগ হয় নতুন তিক্ততা।

কিন্তু সে জনগণের এসব ধারণা বা অনুমান ঠিকই বিবেচনায় রাখলেও, এসবকে সে তার লড়াইয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেয় না। ইদানীং তার এই অবস্থান আগের চেয়ে আরো তীব্র হয়েছে; আগে সে যেখানে কিনা কথা দিয়ে লড়াই চালাত, আজকাল সেখানে সে অন্য অস্ত্র ব্যবহার করা শুরু করেছে, এমন সব অস্ত্র যা তার ধারণায় অনেক বেশি কার্যকরী, কিন্তু আমাদের হিসেবে তার জন্য আরো বেশি বিপজ্জনক।

আমাদের মধ্য কেউ কেউ আছে যাদের বিশ্বাস, জোসেফিন যে আজকাল এরকম নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছে তার কারণ, সে বুঝতে পারছে তার বয়স পড়ে আসছে, তার কণ্ঠের জোর কমে আসা শুরু হয়েছে, অতএব স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে শেষ লড়াইটা চালানোর তার এখনই সময়। আমি এটা বিশ্বাস করি না। যদি এটা সত্য হয় তাহলে জোসেফিন আর জোসেফিন থাকে না। তার জন্য বুড়ি হয়ে যাওয়া কিংবা গলার জোর কমে যাওয়া, এসব কথা প্রযোজ্যই না। সে যখন কোনোকিছু চায়, তাতে বাইরের পরিস্থিতির কোনো ভূমিকা থাকে না, তার ভেতরকার যুক্তি থেকেই সে তা চায়। সবচেয়ে উঁচু রাজমুকুটের পেছনে সে এ কারণে ছোটে না যে মুকুটটা এখন একটু নিচে ঝুলে আছে,

বরং এ কারণে যে ওটা সবচেয়ে উঁচুতে; তার যদি ক্ষমতা থাকত, সে মুকুটটা বরং আরো বেশি উপরেই ঝোলাত।

বাহ্যিক বাধাগুলোর প্রতি তার এই ঘৃণা কিন্তু তাকে লড়াইয়ের সবচেয়ে জঘন্য পথগুলো বেছে নেওয়া থেকে নিরস্ত করেনি। তার অধিকারগুলো তার কাছে সব রকম প্রশ্নের উর্ধ্বে, তাই কীভাবে সে সেই অধিকারগুলো আদায় করে নিচ্ছে, তাতে কী যায়-আসে; বিশেষ করে সে যখন বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে ভালো পথগুলো বেছে নিলে ব্যর্থতা অনিবার্য। মনে হয়, আসলে এ কারণেই সে তার গানসংক্রান্ত ন্যায়বিচার পাওয়ার লড়াই থেকে সরে গেল অন্য এক বিষয়ের লড়াইতে, যেটার গুরুত্ব তার কাছে অতি সামান্য। তার অনুসারীরা কথা ছড়িয়ে দিল যে জোসেফিন বলেছে সে এমনভাবে গান গাইতে পুরোপুরি সক্ষম যাতে আমাদের জাতির সব স্তরের সবাই, এমনকি শত্রুপক্ষের শেষ সীমানা পর্যন্ত সবাই, সত্যিকারের আনন্দ পেতে পারে – আরো বড় কথা, এই সত্যিকারের আনন্দ জনগণের মানদণ্ডে সত্যিকারের আনন্দ না, কারণ জনগণ তো বলেই যে তারা সব সময়েই জোসেফিনের গান শুনে আনন্দ পায়, বরং তা জোসেফিনের নিজস্ব মানদণ্ডে সত্যিকারের আনন্দ। কিন্তু – সে আরো যোগ করে – যেহেতু তার পক্ষে যা মহান তা নিয়ে মিথ্যা বলা সম্ভব নয়, আবার যা অশ্লীল তার তোষণও সম্ভব নয়, তাই তার গান বরং যা আছে তা-ই থাকবে। তবে যেই-না বিষয়টা তার কাজকর্ম করা থেকে রেহাই পাওয়ার লড়াইসংক্রান্ত হয়ে দাঁড়ায়, দেখা যায় সেটা আলাদা ব্যাপার; স্বাভাবিক যে এ সময়েও সে আসলে তার গান নিয়েই কথা বলছে, কিন্তু এখানে সে তার গানসংক্রান্ত দামি অস্ত্রের সরাসরি ব্যবহার করছে না, তার মানে লড়াইয়ের যে পন্থাই সে নিক না কেন, সবই তার হিসেবে হালাল পন্থা।

উদাহরণস্বরূপ, গুজব ছড়ানো হলো যে যদি জোসেফিনের অনুরোধ রাখা না হয়, তাহলে সে তার গানের আলংকারিক অংশগুলো ছোট করে ফেলবে। গানের আলংকারিক অংশ কী সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই, আমি তার গানে কোনো আলংকারিক কিছু কখনো দেখিওনি। কিন্তু জোসেফিন নাকি তার আলংকারিক অংশগুলো কমিয়ে আনবে; আপাতত ওগুলো সে পুরো বাদ দেবে না, স্রেফ কমিয়ে আনবে। লোকে বলে সে তার হুমকি বাস্তবে রূপও দিয়েছে, যদিও আমার কথা যদি বলেন, আমি কিন্তু তার আগের গানের থেকে কোনো পার্থক্যই খুঁজে পাইনি। সবাই মিলে যে জনসাধারণ তারা আগের মতোই তার গান শুনছে, আলংকারিক অংশ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি কেউ, তার দাবির বিষয়ে অন্যদের মনোভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঘটনাক্রমে এটাও অস্বীকার করা যাবে না জোসেফিন, যার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিশেষ একধরনের মাধুর্য সত্যিই আছে, কখনো-সখনো সে তার চিন্তার মধ্যেও কিছুটা একই মাধুর্যের পরিচয় দেয়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, সে-ই ওই গানের অনুষ্ঠানের পরে ঘোষণা করল – যেন তার আলংকারিক অংশসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটু বেশি কঠোর বা বেশি আচমকা হয়ে গেছে – যে, আগামীবার সে আরো একবার আলংকারিক অংশগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গাইবে। কিন্তু পরেরবার

সংগীতানুষ্ঠানের পরে সে আবার তার মন বদলে ফেলল, বলল, আলংকারিক অংশের পুরোটা গাওয়ার আর কোনো দিন প্রশ্নই আসে না, আর যদ্দিন না সবাই জোসেফিনের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ওই আলংকারিক অংশগুলো এখন থেকে পুরো বাদ। হায়, তার এইসব ঘোষণা, এইসব সিদ্ধান্ত, এইসব উল্টো-সিদ্ধান্ত জনগণ একদম কানেই তুলল না, ঠিক যেভাবে কোনো বাচ্চার বকবকানি কানে নেয় না বয়স্ক কেউ, যেভাবে সেই বয়স্ক লোকটা বাচ্চার ভালো চায় ঠিকই, তবে স্রেফ দূরের থেকে।

যা-ই হোক, জোসেফিন ক্ষান্ত দেয় না। এই যেমন সেদিন, উদাহরণস্বরূপ, সে দাবি করল কাজ করতে গিয়ে সে তার পায়ে ব্যথা পেয়েছে, তাই এখন গান গাওয়ার সময় দাঁড়ানোটা তার পক্ষে কঠিন; কিন্তু সে যেহেতু কেবল দাঁড়িয়েই গান গাইতে পারে, তাই সত্যিকার অর্থে তার গানগুলো ছোট করে আনা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। যদিও সে এরপরে খুঁড়িয়ে চলা শুরু করল, তার সমর্থকেরা তাকে হাঁটতে সাহায্য করে যাচ্ছে, কেউই বিশ্বাস করল না সে সত্যিকারের আহত। আপনি যদি এমনকি বিশ্বাসও করেন যে জোসেফিনের খুদে শরীরটা সত্যি অস্বাভাবিক রকমের স্পর্শকাতর, তার পরও এটা তো সত্যি যে আমরা পরিশ্রমী জাতি আর জোসেফিন আমাদেরই একজন; সেই আমরা যদি প্রতিবার একটু আঁচড় খেয়েই খোঁড়াতে শুরু করে দিই, তাহলে তো আমাদের সবাই সারা জীবন খোঁড়াতেই থাকবে। তার পরও সে যদি পঙ্গুদের মতো অন্যের সাহায্য নিয়ে চলাফেরার সিদ্ধান্ত নেয়, সে যদি এমনকি বরাবরের চেয়ে বেশি ঘন ঘন আমাদের সামনে হাজির হয় তার এই শোচনীয় হালে, আমাদের জনগণ তবু আগের মতোই কৃতজ্ঞচিত্তে এবং মুগ্ধতা নিয়ে এখনো তার গান শুনে যায়; শুধু তার ওই গান ছোট করে আনা-টানা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো বিরাট হই-হট্টগোল থাকে না।

কিন্তু তার পক্ষে তো আর সারা জীবন খুঁড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, তাই সে আবিষ্কার করল নতুন এক জিনিস – সে ভান করল পরিশ্রান্ত হওয়ার, খুব মনমরা হওয়ার, মূর্ছা যাবে যাবে এমন অবস্থার। অতএব এবার আমরা সংগীতানুষ্ঠানের পাশাপাশি তার নাট্যাভিনয়ও দেখা শুরু করলাম। জোসেফিনের পেছন পেছন আমরা দেখছি তার দলের সমর্থকদের, তাকে কাকুতি-মিনতি জানাচ্ছে গান গাওয়ার জন্য। গাইতে পারলে সে খুশিই হতো, কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, তোশামোদের আদর-সোহাগ জানাচ্ছে, তাকে পারলে প্রায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে গান গাওয়ার সেই বাছাই করা জায়গাটায়। শেষমেশ, ব্যাখ্যার অযোগ্য এক চোখের পানি ফেলে, সে হার মানল; কিন্তু তারপর সে যখন গাওয়ার চেষ্টা করল, স্পষ্ট দেখা গেল তার গান গাওয়ার ক্ষমতার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে সে, একদম দুর্বল, বরাবরের মতো তার হাতগুলো দুপাশে ছড়িয়ে গেল না, বরং তার শরীরের দুদিকে ঝুলতে লাগল লকলক করে, দেখে মনে হলো হাতগুলো যেন আকারে একটু ছোট – এবার যখন সে গাওয়া শুরু করতে মনস্থির করল, না, পারল না, আদৌ পারল না, তার মাথার একটা অনীহাভরা ঝাঁকি

দেখেই আমরা সব বুঝে ফেললাম, আর তারপর আমাদের চোখের সামনেই সে পড়ে গেল ধপ করে। কিন্তু দেখা গেল আবার সে উঠে দাঁড়িয়েছে, গাইতে শুরু করেছে, আমার হিসাবে আগের থেকে সেই গানে তেমন কোনো পার্থক্য নেই; সম্ভবত সূক্ষ্ম পার্থক্য সবচেয়ে ভালোভাবে ধরতে পারে এমন কোনো কান হলে এটা ধরতে পারত যে, তার গানে আবেগ বরং সামান্য কিছুটা বেড়েছে, যার ফলে তার গানের আবেদনও যেন বেড়েছে সামান্য। আর অনুষ্ঠান শেষে দেখা গেল, আগের চেয়ে সে বরং আরো কম ক্লান্ত; একটা দৃঢ় পদক্ষেপে – তার দ্রুত, হন্তদন্ত হয়ে ছোটাকে যদি আদৌ পদক্ষেপ বলা যায় – সে বেরিয়ে চলে গেল, তার কোনো সমর্থকেরই কোনো সাহায্য না নিয়ে, আর শীতল চোখে ভিড়ের সবাইকে মাপতে মাপতে – ভয় ও শ্রদ্ধা মেশানো এক ভঙ্গিতে ভিড়ের সবাই সরে তাকে পথ করে দিল।

অল্প কিছুদিন আগ পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা, কিন্তু সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে: একবার, সবাই যখন অনুষ্ঠানের ওখানে তার গানের অপেক্ষায়, তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু যে তার সমর্থকেরা তাকে খুঁজতে লাগল তা-ই নয়, অন্য অনেকেও খোঁজায় যোগ দিল, কিন্তু সবই বৃথা; জোসেফিন অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে গান গাইতে রাজি নয়, গান গাওয়ার কোনো আমন্ত্রণও সে আর গ্রহণ করবে না, এই দফা সে আমাদের পুরোপুরি ছেড়ে চলে গেছে।

এটা ভাবতেও অদ্ভুত লাগে যে জোসেফিন কীভাবে হিসাবে মহা ভুল করে, চালাক এই চিড়িয়া এতটাই কিনা হিসাবে গোলমাল করে ফেলে যে মনে হয় সে আদৌ কোনো হিসাবই করেনি, আর নিয়তি কেবল তাকে সামনের দিকে ধেয়ে নিয়ে গেছে, আর আমাদের পৃথিবীতে নিয়তি তো কখনোই দুঃখের বাদে অন্য কিছু হয় না। নিজের থেকেই সে গান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, নিজের থেকেই সে ধ্বংস করেছে আমাদের হৃদয়-মন জয় করে নেওয়া তার সেই ক্ষমতা। সে যদি আমাদের মনকে এত কমই চেনে, তাহলে সে আসলে সত্যি ঐ ক্ষমতা অর্জন করেছিল কীভাবে? সে নিজেকে লুকিয়ে রাখল এবং গান গাইতে অসম্মতি জানিয়ে দিল; তবে ইতোমধ্যে আমাদের জাতি কিন্তু শান্তভাবেই, কোনো চোখে পড়ার মতো হতাশা না দেখিয়ে, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কর্তৃত্বপরায়ণ এক জাতি হিসেবে – যারা সত্যি বলতে, দেখতে অন্য রকম লাগলেও, বাস্তবে শুধু কাউকে দিতেই শিখেছে, নিতে শেখেনি, এমনকি জোসেফিনের কাছ থেকেও না – বরাবরের মতো, নিজের পথে, সামনে চলতে লাগল।

তবে জোসেফিনের পথ শুধু নিচের দিকেই নামতে পারে। শিগগিরই ঐ দিন আসবে যেদিন তার শেষ কিচমিচ শোনা যাবে আর তা মিলিয়েও যাবে। আমাদের জাতির অন্তবিহীন ইতিহাসের সে এক ছোট অধ্যায় মাত্র, আর জনগণ তার ক্ষতি কাটিয়েও উঠবে। এমন না যে সেটা আমাদের জন্য সহজ হবে; চূড়ান্ত নীরবতার মধ্যে আমাদের জনসমাগম নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে না। কিন্তু যখন জোসেফিন আমাদের মধ্যে ছিল তখনো কি জনসমাগমগুলো নীরবই ছিল না? তার সত্যিকারের কিচমিচ কি তার কিচমিচের স্মৃতি যা

থাকবে তার চেয়ে বেশি উঁচু লয়ের আর বেশি প্রাণবন্ত কিছু ছিল কখনো? তার জীবদ্দশায়ও কি আসলে তা স্রেফ কোনো স্মৃতির চেয়ে বেশি কিছু ছিল? ব্যাপারটা কি বরং এমন না যে আমাদের জনগণ তাদের প্রজ্ঞা থেকেই, জোসেফিনের গানের অমন উঁচু মূল্যায়ন করেছিল এজন্যই যে তারা জানত স্রেফ তেমনটা করলেই তার গানের কোনো দিন বিলীন হওয়ার ব্যাপার বলে কিছু থাকবে না?

সুতরাং, মনে হয়, সব সত্ত্বেও আমরা তার অভাব খুব বেশি একটা বোধ করব না, অন্যদিকে যখন কিনা জোসেফিন পার্থিব যন্ত্রণাগুলো থেকে – যেগুলো অবশ্য তার হিসেবে শুধু কিছু বাছাই-করা লোকেরই ভাগ্যে জোটে – মুক্ত হয়ে খুশিমনে হারিয়ে যাবে আমাদের জাতির বীরদের অগণন ভিড়ের মধ্যে, আর শিগগিরই, যেহেতু আমরা ইতিহাসে বিশ্বাস করি না, তার ভাগ্যে জুটবে তার সমস্ত ভাই-বেরাদারের সঙ্গে মিলে বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার এক আরো উঁচু কোনো মুক্তি।

পরিশিষ্ট

তিনটি সাহিত্য সমালোচনা

একটি তারুণ্যের উপন্যাস

ফেলিক্স স্টারন্‌হাইম: তরুণ ওজ্‌ভালডের গল্প (Die Geschichte des jungen oswald)
প্রকাশক: হুইপেরিয়নফেরলাগ্‌ হানস্‌ ফন ভেবার, মিউনিখ, ১৯১০

এ উপন্যাসটির নিজের অভিপ্রায় এমনটি ছিল কিনা জানি না, তবে তরুণেরা পড়ে খুশি হবে এমনই এক লেখা এটি।

চিঠি আদান-প্রদানের আঙ্গিকে লেখা এই উপন্যাস যখন কোনো তরুণ পড়া শুরু করবে, পাঠককে একধরনের ছলাকলাহীন অনভিজ্ঞতার ভঙ্গি নিতে হবে, কারণ সে যদি শুরুতেই আবেগের স্থির ও অবিচল স্রোতের মধ্যে অত জলদি মাথা ঢুকিয়ে দেয়, তাহলে এ-উপন্যাসের পাঠক হিসেবে তার প্রাপ্তি বেশি হবে না। আর সম্ভবত পাঠকের তরফ থেকে এই অনভিজ্ঞতার কারণেই, একদম শুরুতেই, সকালের পরিষ্কার আলোতে যেমন, তার সামনে ফুটে উঠবে লেখকের দুর্বলতাগুলো: ভেরথার-এর ছায়ার ওপরে ভর করে আছে এক সীমিত শব্দভান্ডার, বারবার 'সোনামণি' ও বারবার 'চমৎকার' শুনতে কানে যন্ত্রণা লাগে। বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এক তুরীয় আনন্দের, যার পরিপূর্ণতা কখনোই কমানো হচ্ছে না, যা এই বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোর মধ্য দিয়ে চলছে মৃত-অবস্থায়-জন্ম-নেওয়া শিশুর মতো, প্রায়ই দেখা যাচ্ছে কোনোমতে আঁকড়ে আছে শব্দগুলোকে।

কিন্তু পাঠক একবার সুখী ও স্বচ্ছন্দ বোধ করা শুরু করলে পরে, একবার সেই নিরাপদ ছাউনির নিচে পৌঁছে গেলে পরে (যার নিচের মাটি কাঁপছে গল্পের ভিতের প্রতি সাড়া দিয়ে), আর বুঝতে কষ্ট হয় না কেন উপন্যাসটির চিঠি বিনিময়ের আঙ্গিকটি এত জরুরি ছিল – লেখকের জন্য যতটুকু না দরকার ছিল এই আঙ্গিকের, তার চেয়ে আঙ্গিকটিরই লেখককে দরকার ছিল বেশি। চিঠি চালাচালির এই আঙ্গিকের কারণে

দেখা যাচ্ছে কোনো চিরস্থায়ী পরিস্থিতির ভেতরেই কীভাবে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়া সম্ভব – তবে তাতে আকস্মিক পরিবর্তনের আকস্মিকতা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে না: প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানিয়ে চিরস্থায়ী পরিস্থিতিকে সবার সামনে খোলাসা করে দিচ্ছে তা, আর সেই সঙ্গে এর চিরস্থায়িত্বও বিদ্যমান থাকছে। চিঠি বিনিময়ের এই ধাঁচের কারণে ঘটনাপরম্পরা একটু দেরিতে সংঘটিত হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে ক্ষতি হচ্ছে না কোনো; কারণ, যে মানুষটির ন্যায্য আবেগে আমরা মথিত হচ্ছি সে তার চিঠিগুলো লিখছে (সমস্ত ক্ষমতাশালীরা তাকে রক্ষা করুন) যখন পর্দা নামানো হয়ে গেছে – তার পুরো শরীর তখন শান্ত-স্থির, সে-অবস্থায় চিঠি লেখার কাগজের উপর দিয়ে অবিচল, মসৃণভাবে চলছে তার হাত। গভীর রাতে, আধো-ঘুমেও চলছে তার চিঠি লেখা; চোখ যত বড় করে কেউ তাকিয়ে দেখছে সেটা, তত দ্রুতই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চোখ। দুটি ভিন্ন ঠিকানায় দুটি চিঠি লেখা হয়েছে পরপর, দ্বিতীয়টি সেই মন নিয়ে লেখা যা শুধু ভাবছে প্রথমটির কথা। চিঠিগুলো লেখা হয়েছে সন্ধ্যায়, রাতে, আর সকালেও; আপনার সকালের চেহারা সামনে তাকাচ্ছে আপনার রাতের চেহারা পেরিয়ে (রাতের চেহারা দেখে আপনাকে এরই মধ্যে আর চেনার উপায় নেই) আপনার সন্ধ্যার চেহারার দিকে – তখনো দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে উপলব্ধি ও বোধশক্তিতে পরিপূর্ণ। 'প্রিয়তম, প্রিয়তম গ্রেটখেন্!' এই কথাগুলো দুটি দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে লুকানো, দুটি বাক্যকেই হঠাৎ অবাক করে দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে তারা, বাক্য দুটি সরিয়ে দিয়েছে এক পাশে আর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে নিয়েছে।

আমরা ততক্ষণে সবকিছু পরিত্যাগ করেছি – খ্যাতি, কথাসাহিত্যের রচনারীতি, সংগীত, সব; আর আমরা হারিয়ে গেছি ঐ গ্রীষ্মকালীন গ্রামে, যেখানে মাঠ ও তৃণভূমি জুড়ে 'ডাচ-ঢঙে বয়ে যাচ্ছে কালো, সরু, নাব্য খালগুলো', যেখানে সাবালিকা মেয়েদের, ছোট শিশুদের এবং এক চতুর মহিলার সঙ্গে বাস করে ওজভালড্ প্রেমে পড়েছে গ্রেটখেনের, ঘড়ির টিক-টিকের মতো ছোট ছোট বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে চলছে তাদের ভালোবাসা। এই গ্রেটখেন্ দখল করে আছে উপন্যাসের স্থির কেন্দ্রবিন্দুটি; আমরা তার দিকে অবিরাম, সব দিক থেকে, ছুটে যাচ্ছি। খানিক পরপরই আমরা ওজভালড্কে হারিয়ে ফেলছি, কিন্তু গ্রেটখেন্ থাকছে আমাদের দৃষ্টির সীমানাতেই; গ্রেটখেন্কে আমরা দেখছি তার ছোট বন্ধু-আত্মীয় পরিমণ্ডলের সবচেয়ে জোর উচ্চ হাসির মধ্যে, যেন ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছে হাসিটা। তার পরও তাকে ভালোমতো দেখার আগেই, তার সহজ-সুন্দর রূপটি ভালোমতো দেখার আগেই আমরা তার এত কাছে চলে আসি যে তাকে আর দেখতেই পাই না; তাকে কাছাকাছি কোথাও ভালোভাবে অনুভব করার আগেই আমাদের যেন তুলে নেওয়া হলো ওখান থেকে, আর আমরা তাকে তখন দূরে দেখতে পাচ্ছি ছোট কোনো বিন্দুর মতো। 'গ্রেটখেন্ তার ছোট মাথা রাখল বার্চ-কাঠের রেলিংয়ের ওপরে, এতে করে তার মুখের অর্ধেক ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়।'

এই গ্রীষ্মের জন্য পাঠকের হৃদয়ে যে প্রশস্তির বোধ, কে সাহস নিয়ে বলবে (আরো ভালো হয় যদি বলি, কে সাহস নিয়ে দেখাবে) যে এই জায়গা থেকেই বইটি তার নায়ক, প্রেম, বিশ্বস্ততা আর সব সব ভালো জিনিস নিয়ে, এই জায়গা থেকেই বইটি সোজা পতনের পথে নেমে গেছে; শুধু জিতেছে এর নায়কের পত্রসাহিত্যিক কুশলতাটুকু – এটুকু নিয়ে প্রশ্ন তোলার কিছু নেই, তার কারণ শুধু এর নিস্পৃহ-উদাসীন ভঙ্গিমার মধ্যে নিহিত। আর তাই দেখা যায় পাঠক, যতই সে আগায় উপন্যাসটির শেষের দিকে, ততই তার মন কাঁদে সেই গ্রীষ্মকালে ফিরে যাওয়ার জন্য, যেখানে উপন্যাসটি শুরু হয়েছিল; আর সব শেষে, নায়কের আত্মহত্যা করবার খাড়া পাহাড়ের কাছে নায়কের পেছন পেছন না গিয়ে, পাঠক আনন্দের সঙ্গে ফিরে যায় সেই গ্রীষ্মে, সেখানে চিরকাল থাকবে ভেবে পরিতৃপ্ত।

ক্লাইস্ট্-এর ছোট বাস্তব কাহিনিগুলো

কী খুশি লাগে এটা দেখতে যে কীভাবে মহান রচনাগুলো, এমনকি যখন অযৌক্তিকভাবে ওগুলো কেটে ছোট করা হয়েছে, তখনো কীভাবে তারা তাদের ভেতরকার অবিভাজ্য নির্যাসের বাইরে গিয়েও টিকে থাকে – দেখা যায়, তখনো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সম্পূর্ণ অন্য রকম বিশেষ এক ঢঙে তারা ধাঁধিয়ে চলেছে আমাদের ক্লান্ত-শ্রান্ত দৃষ্টি। কোনো লেখকের সমগ্র সাহিত্যকর্মের সামান্য একটু অংশ নিয়ে বের হওয়া কোনো বিশেষ সংস্করণ যখন পাকাপোক্তভাবে আরো একবার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তার সত্যিকারের ভালো দিকের ব্যাখ্যা ওপরের বাক্যটিতেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে যখন ঐ বিশেষ সংস্করণগুলো হয় এরকম, যেমনটি হাইন্‌রিখ ফন ক্লাইস্ট্-এর এই ছোট, বাস্তব কাহিনিগুলোর (anecdotes) সংকলন – এতে তৈরি হয় নতুন এক ঐক্যের, তাই সত্যিকার অর্থে ক্লাইস্টের সৃষ্টিকর্মের ব্যাপ্তিই আরো বেড়ে যায়। এমন যদি হয় যে আমরা এই বইয়ের সমস্ত কাহিনি জানি, তবু এ ব্যাপ্তি ঠিকই বাড়ে – অবশ্য সবগুলো কাহিনিই যে সেই ব্যাপ্তি বাড়াতে সক্ষম তা বলা যাবে না। গবেষকেরাই বলতে পারবেন যে কেন ক্লাইস্ট্-এর সমগ্র সাহিত্যকর্মের নানা সংস্করণেও এখানকার অনেক কাহিনি নেই, এমনকি টেম্‌পেল সংস্করণেও; সাধারণ পাঠকেরা সেসব অবশ্য ধরতে পারবে না, আর সে কারণেই ফেরলাগ্ রোভোল্ট প্রকাশনীর এই সামান্য দুই মার্ক দামের, পরিষ্কার হরফ ও সমীহ-জাগানো আকার-আয়তনের – সামান্য রঙের আভাযুক্ত এর কাগজ আমার বিশেষ ভালো লেগেছে – নতুন বইটি তারা আরো জোরে আঁকড়ে ধরবে।

হুইপেরিয়ন – এক বিগত জার্নাল

অর্ধেক বাধ্য হয়ে আর অর্ধেক স্বেচ্ছায় *হুইপেরিয়ন* ম্যাগাজিন তার যবনিকা টানল; এখন যা থাকল তা স্রেফ তার পাথরখণ্ডের মতো বড় বড় বারোটি সাদা ভলিউম। কেবল ১৯১০ এবং ১৯১১-এর *হুইপেরিয়ন* অ্যালমানাকগুলোই আমাদের সরাসরি মনে করিয়ে দিচ্ছে এর স্মৃতি, মানুষ এখন কাড়াকাড়ি করছে ওগুলো নিয়ে যেন ওরা কোনো বেখাপ্পা মৃতদেহের মনোযোগ-অন্যদিকে-সরানো কোনো পবিত্রস্মৃতিচিহ্ন। এর সত্যিকারের সম্পাদক ছিলেন ফ্রানৎস ব্লাই, এক প্রণম্য মানুষ যিনি তাঁর মেধার অগ্রপশ্চাদ্বিবেচনাহীনতা এবং, আরো বেশি করে বলতে হয়, বিচিত্রতার কারণেই যেন তাড়া খেয়ে ঢুকেছিলেন সাহিত্যের নিবিড় জগতে; কিন্তু সেখানে চালিয়ে যেতে না পেরে কিংবা নিজেকে খুলে দিতে না পেরে তিনি বদলে যাওয়া শক্তি নিয়ে পালিয়ে এলেন সাহিত্যপত্রিকা প্রতিষ্ঠা করবেন, এই আশায়। এর প্রকাশক ছিলেন হানস্ ফন ভেবার, যার প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান (যদিও প্রথমে *হুইপেরিয়ন*-এর ছায়ায় তা পুরো হারিয়ে গিয়েছিল) আজ জার্মানির প্রকাশনা জগতের অল্প কটি প্রতিষ্ঠানের একটি, যারা জানে তারা কোনদিকে চলেছে, আর সেই জানাটা জানে সাহিত্যের কোনো পাশের গলিপথে নেমে না গিয়ে আর একই সঙ্গে কোনো অতিব্যাপক কর্মসূচির বিরাট হৈচৈই বাধিয়ে না দিয়েই।

হুইপেরিয়ন-এর প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য ছিল সাহিত্যপত্রিকা জগতের সেই শূন্যতাটুকু পূরণ করবেন, যা প্রথম চেষ্টা করেছিল *প্যান* (*Pan*), এরপরে *ইন্‌জেল* (*Insel*), এবং তার পর থেকে আবার দৃশ্যত যা ফাঁকাই ছিল। সত্যিকার অর্থে *হুইপেরিয়ন*-এর ভুলগুলোর শুরুও হয়েছিল এখান থেকেই। অবশ্য কোনো সাহিত্যপত্রিকাই মনে হয় কোনো দিন এত মহানভাবে কোনো ভুল করেনি। *প্যান* পত্রিকাটি তার সময়ে জার্মানিকে দিয়েছিল হতাশার সুফল – ওই হতাশা, ওই আতঙ্ক পত্রিকাটির থেকে অসংখ্য শাখা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল হাজার ধারায়, এটি একত্র করেছিল অনেকগুলো শক্তিকে, যারা সবাই সমকালীন কিন্তু তখনো অপরিচিত; তারা যেন একে অপরকে সহায়তা ও সান্ত্বনা দেয়, সে কাজে তাদের সক্ষম করে তুলেছিল এই পত্রিকা। *ইন্‌জেল*-এর সময়ে এগুলো আর এত জরুরি প্রয়োজনীয় ছিল না, পত্রিকাটি আমাদের মন ভোলাতে চেয়েছিল আর একটু, হয়তো মানের দিক থেকে নিচু একটু, ধারায়; *হুইপেরিয়ন*-এর প্রেক্ষাপট এ দুটির থেকেই ছিল ভিন্ন। এ পত্রিকাটি চেয়েছিল যেসব লেখক সাহিত্যজগতের বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের জন্য প্রতিনিধির ভূমিকায় নামতে – বিশাল ও অতীব মূল্যবান এক প্রতিনিধিত্ব; কিন্তু কথা হচ্ছে ওই লেখকদের হয় সেই অধিকার পাওয়ার যোগ্যতা ছিল না, কিংবা মনের গভীরে তারা চাচ্ছিলও না যে কেউ তাদের প্রতিনিধিত্ব করুক।

যেসব লেখকের স্বভাবই হচ্ছে মানুষের ভিড় থেকে একটু দূরে থাকা, তারা যদি কোনো সাহিত্যপত্রিকার পাতায় নিয়মিত হাজির হয়, তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি করে তারা – সেখানে সূচিপত্রের অন্য সবকিছুর পাশে তাদের নিজেদের মনে হয় অতিপ্রখর আলোর

নিচে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ এবং তারা বাস্তবে যতটুকু অচেনা তার চেয়েও অচেনা লাগে নিজেদের। তারা অন্যের কাছ থেকে প্রতিরক্ষাও চায় না, কারণ তাদের না-বুঝতে পারাটাই তাদের বন্ধু, তারা যেহেতু গূঢ় ও রহস্যময়, তাই ভালোবাসা তাদেরকে খুঁজে নেয় যে কোনোখানে। অন্য কারোর উৎসাহেরও কোনো দরকার নেই তাদের, কারণ অকৃত্রিম ও খাঁটি থাকাটাই যেহেতু তাদের বাসনা, সেহেতু নিজেদের যত্ন তাদের নিজেদেরই নিতে হয়, কেউ তাদের কোনো সাহায্য করতে পারে না প্রথমে তাদের ক্ষতি না করে। অন্য সাহিত্যপত্রিকাগুলোর জন্য যে-সম্ভাবনা উন্মুক্ত – প্রতিনিধিত্ব করার, প্রদর্শন করার, রক্ষা করার ও শক্তি জোগানোর সম্ভাবনা – তা *হুইপেরিয়ন*-এর জন্য কখনোই ছিল না, তবে একই সঙ্গে কিছু বেদনাদায়ক বোঝা ছিল এই পত্রিকার ঘাড়ে; *হুইপেরিয়ন*-এ যেভাবে নানা সাহিত্যকর্ম ভিড় করত, ওই ধরনের সংকলনের তাতে করে সব সময়েই অসৎ হওয়ার প্রতি সমূহ আকর্ষণ থেকে যায়, অসততাগুলো থেকে নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে সে হয়ে পড়ে অসহায়, শক্তিহীন; আর, অন্যদিকে, যদিও *হুইপেরিয়ন*-এ দেখা মিলত সাধারণ সাহিত্য ও শিল্পকলার সেরা কাজগুলোর, তবু বলা যাবে না যে সব সময় সূচিপত্রের সবকিছুর মধ্যে কোনো প্রীতিকর ঐকতান খুঁজে পাওয়া যেত, আর – যেভাবেই হোক – পত্রিকাটি থেকে এমন কোনো বিশেষ প্রাপ্তি মিলত না, যা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তার পরও, এতসব সংশয় মিলেও এই দুই বছরে আমাদের *হুইপেরিয়ন*কে উপভোগের আনন্দ একটুও কমাতে পারেনি, কারণ এই উদ্যোগের যে উত্তেজনা (যে কোনো বীরোচিত কিছুই যতটা বর্বরসুলভ, ততটুকু বর্বরসুলভই ছিল এই উত্তেজনা) তা অন্য সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল; তবে *হুইপেরিয়ন*-এর জন্য কিন্তু এসব সংশয় ছিল আসলেই বাঁচা-মরার প্রশ্ন, আর আত্মনিন্দা থেকেই তারা নিশ্চিত এর বিলুপ্তি ঘটালেন, আরো আগেই হয়তো ঘটত এটা যদি সাধারণ মানুষের না-বোঝার ব্যাপারটা – সচেতনভাবে তারা অবশ্য এমনটা চায়নি – *হুইপেরিয়ন*-এর উদ্যোক্তাদের আগাম পথরোধ না করত। তারা *হুইপেরিয়ন*-এর বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন ঠিক কোনো ভূতের মতো, যে-ভূতের জন্য রাত শেষ হয়ে গেছে, আর যে-ভূত আমাদের জীবনের অন্য ভালো ভূতগুলো থেকে কোনোভাবেই কোনো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূত নয়; আমাদের এ-জীবনকেই *হুইপেরিয়ন* নামের ভূত, কোনো রকম কোনো অনুমতি না নিয়েই, চেষ্টা করেছে নতুন এক বিভ্রান্তির মাধ্যমে নতুন এক বিন্যাসে নিয়ে আসতে। তবে এর স্মৃতির বিলুপ্তি ঘটা সম্ভব নয়, অন্য সবকিছু বাদ দিলেও শুধু একারণেই যে, নিশ্চিত আর কাউকে সামনের কোনো প্রজন্মে পাওয়া যাবে না যার থাকবে এরকম ইচ্ছাশক্তি, ক্ষমতা, আত্ম-উৎসর্গ করার সাহস এবং প্রবল উৎসাহী আত্মবিভ্রমের এমন স্বভাব নিয়ে এজাতীয় কোনো উদ্যোগ আবার শুরু করার আগ্রহ; অতএব, সে কারণেই, অবিস্মরণীয় *হুইপেরিয়ন* এরই মধ্যে শুরু করেছে সব ধরনের বৈরিতার উর্ধ্বে চলে যাওয়া, এবং আজ থেকে দশ বা বিশ বছরের মধ্যে এটি কোনো বিবলিওগ্রাফিক্যাল ভান্ডারের [bibliographical; লেখক বা বিষয়ের গ্রন্থ ও রচনার তালিকা সম্বন্ধীয়] থেকে কিছু কম হয়ে উঠবে না।

এই সংকলনের গল্পগুলো

প্রাসঙ্গিক তথ্য, পাঠ-পর্যালোচনা ও টীকা

ফ্রানৎস কাফকার বাংলায় *গল্পসমগ্র*র এই প্রথম খণ্ডে রয়েছে কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত সব কটি লেখা – গল্প, ভ্রমণকাহিনি, সাহিত্য সমালোচনা; সব। এ বইয়ের সূচিটি যে ক্রম মেনে সাজানো হয়েছে – অর্থাৎ পত্রিকায় প্রকাশের বা বই হিসেবে প্রকাশের তারিখ অনুসারে, লেখার তারিখ নয় – সেই একই ক্রম অনুযায়ী নিচে প্রতিটি লেখার বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য, প্রেক্ষাপট এবং পাঠ-পর্যালোচনা দেওয়া হলো। কাফকার লেখা আত্মজৈবনিক উপাদানে পরিপূর্ণ বলে, এই তথ্যগুলো পাঠকের যেমন কাজে লাগবে, তেমনই তাঁর লেখা অনেকাংশে ধাঁধার সমতুল্য বলে পাঠ-পর্যালোচনাগুলোও বাঙালি পাঠকের কাফকা বোঝার ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হবে। পাঠ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব অতিসরলীকরণ বা অনুমাননির্ভর ব্যাখ্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে করে পাঠক নিজের ব্যাখ্যা নিজেই দাঁড় করাতে কোনো বাধায় না পড়েন। কাফকা-পাঠের অন্যতম প্রধান মজাও এই – যার যার কাফকা তার তার মতো। তার পরও গত একশো বছরের কাফকা-গবেষণার এবং বিশিষ্ট কাফকা-বোদ্ধাদের মতামতেরও নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্ব আছে।

লেখাগুলোর ক্ষেত্রে তাদের বাংলা নামের পাশাপাশি প্রতিটির সবচেয়ে চালু ইংরেজি নাম (কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে যা দুয়েরও অধিক) এবং মূল জার্মান নামও দেওয়া হলো। কাফকার অসংখ্য ইংরেজি অনুবাদ হওয়ার কারণে মূল জার্মান নামটি সামনে এগিয়ে যাওয়া পাঠকের জন্য একদিন না একদিন বিভিন্ন প্রবন্ধ বা গবেষণাগ্রন্থে লেখাটি সঠিকভাবে খুঁজে পেতে বা শনাক্ত করতে কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

টীকা দেওয়া হয়েছে শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা তথ্যের।

দুটি কথোপকথন

এই দুটি কথোপকথনই কাফকার ২১ থেকে ২৪ বছর বয়সে লেখা অসমাপ্ত নভেলা *একটি সংগ্রামের বিবরণ* (ইংরেজি *Description of A Struggle*; মূল: *Beschreiburg eines Kampfes*) থেকে নেওয়া। কাফকার তরুণ বয়সে লেখা এই নভেলাটির দুটি আলাদা, মৌলিক অর্থেই ভিন্ন, পাণ্ডুলিপি রয়েছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিটি সম্ভবত ১৯০৭ সালে লেখা (সেটিও আসলে ১৯০৪ সালে লেখা একটি খসড়ার চূড়ান্ত রূপ)। আর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি (পাণ্ডুলিপি 'খ'), যার সঙ্গে প্রথম পাণ্ডুলিপির সম্পর্ক ক্ষীণ, সম্ভবত কাফকা ১৯০৯ থেকে

১৯১০ এর মধ্যে লিখেছিলেন। নভেলাটিকে দীর্ঘদিন ধরে ভাবা হয়েছিল, এটি 'হারিয়ে গেছে'। পরে ১৯৩৫ সালে ম্যাক্স ব্রড তাঁর লাইব্রেরিতে এটি খুঁজে পান। ব্রড এটি সম্পাদনা করে কাফকার রচনা সংকলন *Gesammelte Schriften*-এর পঞ্চম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই নভেলারই দুটি ছোট অংশের নাম (দুটিই পাণ্ডুলিপি 'ক' থেকে নেওয়া): 'প্রার্থনাকারীর সঙ্গে কথোপকথন' (ইংরেজি 'Conversation with the Supplicant'; মূল: 'Gespräch mit dem Beter') এবং 'মাতালের সঙ্গে কথোপকথন' (ইংরেজি: 'Conversation with the Drunk'; মূল: 'Gespräch mit dem Betrunkenen)। দুটি অংশেই নভেলার 'মোটা লোকটি' কথা বলছে দুজন আলাদা মানুষের সঙ্গে: একজন উপাসনাকারী, অন্যজন মাতাল এক ব্যক্তি। এ দুটি অংশই জার্মানির মিউনিখ থেকে প্রকাশিত তখনকার দিনের অন্যতম নামকরা দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্রিকা, ফ্রানৎস ব্লাই সম্পাদিত *হুইপেরিয়ন*-এর ১৯০৯ সালের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ('*হুইপেরিয়ন*-এক বিগত জার্নাল' নামের কাফকার সাহিত্য-সমালোচনামূলক লেখাটি এ সংকলনের 'তিনটি সাহিত্য সমালোচনা'য় অন্তর্ভুক্ত হলো)।

ফ্রানৎস কাফকার *গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে (যেটিতে থাকছে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সব গল্প ইত্যাদি) *একটি সংগ্রামের বিবরণ* নভেলাটি থাকছে; সেখানে মূল নভেলার অংশ হিসেবে এ দুটি কথোপকথনই আবার মুদ্রিত হবে।

স্যার স্যালকম প্যাস্লির মতে, 'একটি সংগ্রামের বিবরণ' কাফকার 'খুব ছোট বয়সের' লেখা এবং 'অস্বীকারের উপায় নেই যে, কাঁচা লেখা'; অতএব এটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।

'মাতালের সঙ্গে কথোপকথনে'এ কাফকার প্রাগের বেশ কিছু জায়গার নাম আছে। এর মধ্যে রিংপ্লাৎস, টাউন হল স্কোয়ার, কুমারী মেরির স্তম্ভ (Virgin's Column) – এগুলো কাফকার জন্মস্থানের পাশেই এবং তিনি জীবনের দীর্ঘ বছর যে বাসাগুলোতে থেকেছেন তাদের পাশেই প্রাগ শহরের মূল কেন্দ্র ওল্ড টাউন হলের আশপাশের নানা জায়গা।

গল্পের শেষের দিকের ওয়েনসেস্লাস্ স্কোয়ার ওল্ড টাউন স্কোয়ার থেকে হাঁটা পথে অল্প দূরের আরেকটি বিখ্যাত স্কোয়ার। ১৯১৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পরে চেক জাতির ইতিহাসের আরও অনেক ঐতিহাসিক ঘোষণা এই স্কোয়ার থেকেই দেওয়া হয়। এর দক্ষিণ মাথায় জাতীয় জাদুঘরের সামনে, সন্ত ওয়েনসেস্লাসের (দশম শতাব্দীর বোহেমিয়ার ডিউক) বিশাল ঘোড়ার পিঠে মূর্তিটি দেখার মতো।

ব্রেস্সায় উড়োজাহাজ

১৯০৯ সালের গ্রীষ্মে (সেপ্টেম্বরে) লেখা। প্রকাশ: প্রাগের সংবাদপত্র *বোহেমিয়া*-য় ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ তারিখে। ইংরেজিতে 'The Aeroplanes At Brescia'; মূল: 'Die Aeroplane in Brescia'।

কাফকা সে বছর তাঁর গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে বন্ধু ম্যাক্স ব্রড ও ব্রডের ভাই ওটো ব্রডের সঙ্গে উত্তর ইতালিতে যান। তারিখ: ৪ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯। লেক গার্দার রিভায় থাকার সময়ে তাঁরা একটি খবরের কাগজে দেখেন যে ইতালিরই ব্রেস্‌সা শহরে উড়োজাহাজ চালানোর এক মহা প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কাফকা খুব চাইছিলেন বলেই এই তিনজন ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রেস্‌সায় গিয়ে এই, তখনকার দিনের হিসেবে, দুর্লভ ও চোখ-ধাঁধানো প্রতিযোগিতাটি দেখার জন্য মনস্থির করেন। উড়োজাহাজের ইতিহাসে সেটি মনে রাখার মতো একটি সময় – ব্রেস্‌সায় প্রতিযোগিতার মাত্র এক বছর আগে, ১৯০৮ সালে, রাইট ভাইয়েরা ইউরোপে তাঁদের উড়োজাহাজ জনসমক্ষে দেখানো শুরু করেছেন; এবং ব্রেস্‌সার মাত্র দু'মাস আগে (২৫ জুলাই, ১৯০৯) ফরাসি বৈমানিক লুই ব্লেরিও ইতিহাসে প্রথমবার বিমান নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার মতো তাক-লাগানো ঘটনা ঘটিয়েছেন।

১৯০৯-এর গ্রীষ্মে কাফকা লেখালেখির মহাসংকটে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁর সৃজনী-ক্ষমতা শূন্য হয়ে গেছে এবং কলম থেকে কিছু বেরোচ্ছে না। তখন ম্যাক্স ব্রড বন্ধুর লেখনী-বন্ধ্যাত্ব ঘোচানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের দুজনের মধ্যে এক লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজনের ঘোষণা দিলেন। তিনি কাফকাকে বললেন, ব্রেস্‌সায় বিমান ওড়ানো দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা দুজনে দুটি আলাদা লেখা লিখবেন। এই হচ্ছে কাফকার 'ব্রেস্‌সায় উড়োজাহাজ' লেখার প্রণোদনার পেছনের গল্প।

এ তিনজন প্রাগে ফিরে আসার অল্পদিন পরে কাফকার লেখাটি, পত্রিকায় স্থান-সংকুলানের খাতিরে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে (বাংলা অনুবাদে যদিও পুরো লেখাটিই দেওয়া হলো), দৈনিক পত্রিকা *বোহেমিয়ার* সাংস্কৃতিক সংবাদ অংশে ছাপা হয় ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে।

একই ঘটনার ওপরে ব্রডের লেখাটি (নাম: 'Flight Week in Brescia') বের হয় ১৯০৯-এর মধ্য অক্টোবরে *মার্স (März)* নামের সাময়িকীতে।

ভ্রমণ কাহিনি ধাঁচের এই লঘু চালের লেখাটিতে ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে কাফকার জীবনে প্রথম উড়োজাহাজ দেখার বিস্ময়বিমুগ্ধতা ফুটে উঠেছে। তবে যেহেতু কাফকার কোনো বিবরণই স্রেফ বিবরণ নয়, আমরা এ লেখার মধ্যে আয়রনি (বক্রাঘাত), উচ্ছ্বাস, চপলতা, বিদেশের মাটিতে বিদেশি হওয়ার অভিজ্ঞতা, এসবের পাশাপাশি হালকা রূপকের ছোঁয়াও (metaphorical overtone) দেখতে পাই। ক্লান্তিকর ব্রেস্‌সা যাওয়ার অভিজ্ঞতার – জীবনের রোজকার সংগ্রামের মতো – বিপরীতে এখানে দেখি আকাশে ওড়ার মাধ্যমে মুক্তির সম্ভাবনাটুকু। বৈমানিকের দৃষ্টিকোণ থেকে কাফকার কাল্পনিক বর্ণনা (যেমন গ্লেন কার্টিস বৈমানিকের আসনে বসে দেখছেন দূরের বন 'এতক্ষণে জেগে উঠছে দৃষ্টির সামনে') মাটির দর্শকদের কার্টিসের চোখেই ঐ বন দেখাচ্ছে। উপন্যাস পড়ার সময়ে আমরা পাঠকেরা কীভাবে কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখা শুরু করি, সে বিষয়টির মেটাফর হিসেবেও একে দেখা যায়। শেষের দিকে আমরা যখন পড়ি, বৈমানিক

'রুঝে তার নিয়ন্ত্রণ-আসনে বসে আছেন লেখার টেবিলে বসা কোনো ভদ্রলোকের মতো', এই 'লেখার টেবিল' লেখক ও বৈমানিককে এক করে দেয়, লেখক বিমানচালনা করার মতোই যে কল্পনার উড়াল দিতে পারেন, সে কথাই বলে যেন। লেখাটির শেষে আকাশ ও মাটির যে বৈপরীত্য আমরা দেখি, তা নিঃসন্দেহে চমৎকার: রুঝে এত উপরে যে তাকে মনে হচ্ছে আকাশের তারা, অন্যদিকে কাফকা ও তাঁর সঙ্গীরা মাটির পৃথিবীতে কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে হোটেলের পথে।

লেখাটিতে বড় কোনো ঘটনা কীভাবে মানুষের সামাজিক ভাগগুলো ভেঙে এক করে দেয়, তারও চমৎকার ছবি আছে। আমরা দেখি, ইতালির রাজরাজড়া থেকে শুরু করে লেখক গ্যাব্রিয়েল দান্নুনৎসিও, সংগীতশিল্পী গিয়াকোমো পুচিনি, সবাই একসঙ্গে প্রযুক্তির এই জাতিভেদ ভুলিয়ে দেওয়া চমকটিকে দেখছেন।

ব্লেরিওর বিমান ওড়াতে যেরকম ঝামেলা হলো, তাঁর মধ্যে কাফকার লেখার বন্ধ্যাত্বের ছোঁয়া দেখেছেন অনেক গবেষক। আর ব্লেরিও ও কার্টিসের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা হয়তো ব্রড ও কাফকার এই লেখাটি নিয়ে প্রতিযোগিতার তুলনা। লেখাটিতে বৈমানিকদের ব্যর্থতা থেকে সফলতার যে ছবি আমরা পাই, তা তাঁদের একই ক্রম মেনে ১৯০৯-এর পরে কাফকার সৃজনীশক্তির স্ফুরণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রসঙ্গত: 'ব্রেস্সায় উড়োজাহাজ' জার্মান সাহিত্যে বিমানচালনাবিষয়ক প্রথম লেখা।

টীকা:

গ্যাব্রিয়েল দান্নুনৎসিও: (Gabriele d'Annunzio, ১৮৬৩-১৯৩৮), ইতালিয়ান কবি ও ঔপন্যাসিক, তাঁর উপন্যাস *The Triump of Death*, ১৮৯৪-এর কারণে যথেষ্ট বিখ্যাত। নিজেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধবিমান চালান। ব্রেস্সায় বিমানপ্রদর্শনীর দিনে তিনি কার্টিসের বিমান নিয়ে এ কবার আকাশে উড়েছিলেন।

রুঝে: অঁরি রুঝে (Henri Rougier, ১৮৭৬-১৯৫৬), ফরাসি রেসিং কার চালক ও বৈমানিক। ব্রেস্সায় কার্টিসকে হারিয়ে তিনি 'সবচেয়ে উঁচুতে ওঠার' পুরস্কারটি পান।

কার্টিস: গ্লেন কার্টিস (Glenn Curtiss, ১৮৭৮-১৯৩০), আমেরিকান বৈমানিক। ১৯০৭ সালে ঘণ্টায় ১৩৬.৩৬ মাইল বেগে মোটরসাইকেল চালিয়ে তিনি পৃথিবীর দ্রুততম মানবের উপাধি লাভ করেন। ব্রেস্সায় বিমানচালনার গ্র্যান্ড প্রাইজটি তিনিই জিতে নেন।

ব্লেরিও: লুই ব্লেরিও (Louis Bleriot , ১৮৭২-১৯৩৬), বিখ্যাত বৈমানিক, তিনি ১৯০৯ সালের ২৫ জুলাই বিমানে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন।

লা-ব্লাঁ: আলফ্রেড লা-ব্লাঁ (Alfred Leblanc, ১৮৬৯-১৯২১), ফরাসি বৈমানিক, ব্লেরিওর সহকারী।

লাথাম: হুবার্ট লাথাম (Hubert Latham, ১৮৮৩-১৯১২), ইঙ্গ-ফরাসি বৈমানিক। ১৯০৯-এর ১৯ জুলাই ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে তিনি পৃথিবীতে প্রথম সাগরে বিমান নামানোর রেকর্ড গড়েন।

প্রথম দীর্ঘ রেলভ্রমণ – *ম্যাক্স ব্রড ও ফ্রানৎস কাফকা*

১৯১১ সালের ১৯ ও ২৬ নভেম্বরের দুটি রোববারে ম্যাক্স ব্রড ও ফ্রানৎস কাফকার যৌথভাবে লেখা। প্রকাশ: ব্রড ও কাফকার বন্ধু ভিল্লি হাস (Willy Haas) সম্পাদিত, প্রাগ থেকে প্রকাশিত *হারডারব্লাটার* (*Herder-Blatter*) সাময়িকীর মে, ১৯১২ সংখ্যায়। ইংরেজি নাম: 'The First Long Train Journey'; মূল: 'Die erste lange Eisenbahnfahrt'।

কাফকা ও তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রড ১৯১১-র শরতে পরিকল্পনা করেন যে তাঁরা যৌথভাবে 'রিচার্ড ও স্যামুয়েল' ('Richard and Samuel'; 'Richard und Samuel') নামের একটি ভ্রমণকাহিনি বা ডায়েরি বা উপন্যাস লিখবেন। ১৯১১-র ২৬ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে এ দুই বন্ধু সুইজারল্যান্ড, উত্তর ইতালি হয়ে শেষে প্যারিসে পৌঁছান। রেলভ্রমণের সময় তাঁরা দুজনেই দুটো আলাদা নোটবুক বা ডায়েরিতে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখেন; পরে ১৯ ও ২৬ নভেম্বরের দুটি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে – রবিবারে – তাঁরা এই ভ্রমণকাহিনির প্রথম অংশটি যৌথভাবে লেখা শেষ করেন। কাফকা দায়িত্ব নেন শেষটুকু লেখার – অর্থাৎ রিচার্ডের দীর্ঘ অংশটুকু – এবং তিনি তা শেষ করেন ডিসেম্বরের শুরুর দিকে। লেখাটি প্রাগের *হারডারব্লাটার* সাময়িকীর মে, ১৯১২ সংখ্যায় তাদের যৌথ প্রজেক্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ এবং এর দুই নায়কের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণসহ প্রকাশিত হয়।

এখানে আমরা গল্পের দুই নায়ক রিচার্ড ও স্যামুয়েলের আলাদা আলাদা চিন্তাগুলো একজনের পরে আরেকজনের বক্তব্য হিসেবে পেলেও, পুরোটাই ব্রড ও কাফকার এক সঙ্গে লেখা – অর্থাৎ এমন না যে স্যামুয়েলের ভাষ্য ব্রড লিখেছেন কিংবা রিচার্ডেরটা কাফকা, কিংবা তার উল্টো। তবে স্যামুয়েলের যে বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব, তাঁর সঙ্গে ব্রডেরটা মিলে যায়; অন্যদিকে রিচার্ড-এর অন্তর্মুখী সংবেদনশীলতা আমাদের তাকে কাফকা বলে ভাবতে উৎসাহ জোগায়।

গল্পের প্রথম অংশে আমরা পাই ডোরা লিপ্‌পার্টকে, এক অচেনা মেয়ে, সংগীত ভালোবাসে সে। স্যামুয়েল চাইছে ডোরাকে পটাতে, আর রিচার্ড ডোরার প্রতি সহানুভূতিশীল, কিছুটা স্নেহার্দ্র। মিউনিখে রাতের বেলায়, তা-ও আবার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, তারা একসঙ্গে আধা ঘণ্টা ট্যাক্সিতে ঘুরল, এরপর স্টেশনে ফিরে ডোরা চলে গেল ইনস্ব্রুকের ট্রেনে, আর আমাদের দুই নায়ক সুইজারল্যান্ডের পথে।

গল্পের শেষ অংশে আমরা দেখি স্যামুয়েল ট্রেনের কামরায় সারা রাত জেগে আছে, অন্য যাত্রীদের নিয়ে তার ভাবনাগুলো আমাদের জানাচ্ছে; আর এর পরেই রিচার্ডের দীর্ঘ অংশ (এটি কাফকার একার লেখা) পড়ে আমরা সত্যি বুঝতে পারি সে রেলভ্রমণে বেরিয়ে এত শান্তিতে কেন ঘুমাতে পারে। গল্পের একেবারে শেষে, যখন রিচার্ড ভাবছে ডোরা লিপ্‌পার্টের কথা, আর কেন একজন পুরুষ কোনো দিনও অন্য পুরুষের নারীসঙ্গের আকুতি

মেটাতে পারবে না (আমাদের মনে রাখতে হবে এ অংশটি কাফকার একার লেখা), এই ঈষৎ কৌতুকময় কিন্তু প্রগাঢ় অনুভূতিতে ভরা অংশটিতে খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে কাফকা কখনোই সমকামী ছিলেন না। এ অংশটির বিখ্যাত লাইন '...আমার পাশে থাকবে কাপড়চোপড়ে পুরো গা ঢাকা কোনো পুরুষ, যার শরীর আমি দেখব শুধু গোসলের সময়েই, যদিও তা দেখার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই' – কাফকা-গবেষকদের জন্য এ বিষয়ে কাফকার পক্ষ থেকে শেষ কথার মতো।

বিরাট শোরগোল

এই ছোট্ট বিবরণ বা স্কেচটি কাফকা লেখেন ১৯১১-র ৫ নভেম্বর তাঁর ডায়েরিতে। প্রকাশ: কাফকার বন্ধু ভিল্লি হাস (Willy Haas) সম্পাদিত, প্রাগ থেকে প্রকাশিত *হারডারব্লাটার* (*Herder-Blatter*) সাময়িকীর অক্টোবর, ১৯১২ সংখ্যায়। ইংরেজি নাম: 'Great Noise'; বা 'Grand-Scale Noise'; মূল নাম: 'Grosser Lärm'।

এ লেখাটি পরিবারের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টের জীবন নিয়ে ফ্রানৎস কাফকার লেখা সবচেয়ে বদরাগী অভিযোগপত্র; এখানে তিনি তাদের বাসস্থানকে অপমানসূচকভাবে বলছেন 'হইচইয়ের হেডকোয়ার্টার'। ক্ষতের মধ্যে লবণ দেওয়ার মতোই কাফকা এই লেখাটি প্রকাশও করেন, যেখানে বোনের নাম ভাল্লিই রাখেন, বাবার কথাও সরাসরি উল্লেখ করেন – পাঠক বুঝে যান, এটি আত্মজৈবনিক লেখা। কাফকা যে প্রগাঢ় বিরক্তি নিয়ে এ লেখাটি লিখেছেন এবং তা অন্যের পড়ার জন্য ছাপিয়েছেন, তাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় বাড়ির অবস্থা নিয়ে কতটুকু হতাশা ছিল এই উঠতি লেখকের মধ্যে। এ লেখার বাড়িটি ৩৬ নম্বর নিকলাস্স্ট্রাসের বাড়ি, একদম ওল্ড টাউন স্কোয়ারের ওপরে; সেখানে অ্যাপার্টমেন্টের মাঝবরাবর ছিল কাফকার কামরা, সেটির চারপাশে অন্যদেরগুলো ও সবার বসার কামরা, অতএব কাফকার নিজের একান্ত একটু জায়গা সে বাড়িতে ছিল না। বাবা দরজা খুলে কাফকার কামরা হয়ে ড্রেসিং গাউন পরে যাচ্ছেন অন্য কামরায় – বাড়ির ভূগোলটি এ কথার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ম্যাক্স ব্রডকে লেখা ১৯০৯-এর ২৩ মার্চের এক চিঠিতে কাফকা নালিশ জানিয়েছেন যে তাদের বাসার সবাই তাঁর কামরাতেই যেভাবে দখল নেয়, তাতে মনে হয় এটি কোনো 'জিপসি ওয়াগন'। এ বাড়ির কামরাগুলোর অবস্থানই আমরা পরে মূর্ত হতে দেখি তাঁর অমর গল্প 'রূপান্তর'-এ, যেখানে গ্রেগর সামসার ঘরটি তার বাবা-মায়ের শোবার ঘর, তার বোনের ঘর ও তাদের সবার বসার ঘরের একদম মাঝখানে – নিকলাস্স্ট্রাসের বাড়িতে কাফকার ঘরের নিখুঁত প্রতিবিম্ব। লেখাটির শেষে পরিবারের হই-হট্টগোলে তাঁর শান্তি ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ – কাফকার ডায়েরিতে অসংখ্যবার আছে তিনি হই-হট্টগোল কত বেশি অপছন্দ করেন

– গিয়ে পড়ে তাঁর নিজের ওপরও, তিনি 'সাপের' মতো – আমাদের মনে আসে গ্রেগর সামসার 'পোকা' হয়ে যাওয়ার কথা – বুকে ভর দিয়ে অন্যদের কামরার কাছে গিয়ে মিনতি জানাতে চান আওয়াজ না করার জন্য।

ধেয়ান

কাফকার প্রথম প্রকাশিত বই। এতে আছে মোট আঠারোটি গদ্য রচনা বা স্কেচ। এগুলো লেখা ১৯০৪ থেকে ১৯১২-র মধ্যে। বই আকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৯১২-র ডিসেম্বরে (বইয়ের মধ্যে প্রকাশ-সন হিসেবে লেখা ১৯১৩)। প্রকাশক লাইপজিগের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা আরন্স্ট্ রোভোল্ট (Ernst Rowohlt)। দ্বিতীয় সংস্করণটি বেরোয় ১৯১৫ সালে, জার্মানির আরেক বিখ্যাত প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান কুর্ট ভোলফ্ (Kurt Wolff) থেকে। বইটির ইংরেজি নাম: *Meditation*; বা *Contemplation;* বা *Looking to See*। ইংরেজিতে *Meditation* নামটিই সবচেয়ে প্রচলিত। বইয়ের মূল জার্মান নাম: *Betrachtung*। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে ম্যাক্স ব্রডকে।

এই আঠারোটি গদ্যরচনার আটটি, Betrachtung শিরোনামেই, ১৯০৮-এ ফ্রানৎস ব্লাই ও কার্ল স্টার্নহাইম সম্পাদিত, জার্মানির মিউনিখ থেকে প্রকাশিত, পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়ে ওঠা দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা *হুইপেরিয়ন* (*Hyperion*)-এর প্রথম সংখ্যায় (মে, ১৯০৮) ছাপা হয়। এটিই ছাপার অক্ষরে কাফকার প্রথম আত্মপ্রকাশ (সে হিসেবে এই আটটি লেখা দিয়েই, যেহেতু বইটি কাফকার লেখার প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজানো, এই বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থটি শুরু হওয়ার কথা; এবং এ বইয়ের প্রথম গল্প 'দুটি কথোপকথন' এই আটটি লেখার পরে আসার কথা; কিন্তু যেহেতু এই আটটি লেখা *ধেয়ান* নামের কাফকার প্রথম বইয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই এদের *ধেয়ান* থেকে আলাদা না করাটা আমার কাছে জরুরি বলে মনে হলো)। *হুইপেরিয়ন*-এ প্রকাশিত আটটি লেখা হলো: ১. ব্যবসায়ী; ২. জানালা থেকে আনমনা বাইরে তাকিয়ে; ৩. বাড়ির পথে; ৪. পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়া মানুষ; ৫. পোশাক; ৬. যাত্রী; ৭. রূঢ় প্রত্যাখ্যান; ৮. গাছ। এই আটটি গদ্য স্কেচ কাফকা লেখেন ১৯০৬ থেকে ১৯০৭-এর শেষদিকের মধ্যকার সময়ে।

হুইপেরিয়ন-এ বের হওয়া ওপরের আটটির পরে 'Betrachtungen' (বহুবচনে Meditations) শিরোনামে পাঁচটি গদ্য স্কেচ ছাপা হয় ১৯১০-এর ২৭ মার্চ *বোহেমিয়া* নামের দৈনিক পত্রিকার প্রভাতী সংস্করণে। এ পাঁচটি হলো: ১. জানালা থেকে আনমনা বাইরে তাকিয়ে; ২. পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়া মানুষ; ৩. পোশাক; ৪. যাত্রী; ৫. শৌখিন ঘোড়সওয়ারদের বিবেচনার জন্য। পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে, এ পাঁচটি লেখার প্রথম চারটিই ১৯০৮ সালে *হুইপেরিয়ন*-এ বেরিয়েছিল। শেষের লেখাটি কাফকা লেখেন ১৯০৯ সালের শেষভাগে বা ১৯১০-এর শুরুতে। *বোহেমিয়া* পত্রিকার সম্পাদকের

দেওয়া বহুবচনে '*Betrachtungen*' নামটি কাফকার পছন্দ হয়নি; তিনি তাঁর প্রথম বইয়ের নাম একবচনে '*Betrachtung*'-ই রাখেন।

হুইপেরিয়ন এবং *বোহেমিয়ায়* প্রকাশের তালিকাটি দেখলে স্পষ্ট হয়, *ধেয়ান* বইয়ের আঠারোটি গদ্যরচনার মোট নয়টি কাফকা বই বের হওয়ার আগেই প্রকাশ করেছিলেন। বাকি নয়টির প্রথম প্রকাশ বইয়ের ভেতরেই (যদিও বইয়ের প্রথম লেখাটি – 'গাঁয়ের রাস্তায় বাচ্চারা' – বইটি প্রকাশের একই সময়ে, ১৯১২-র ডিসেম্বরে, *বোহেমিয়া* সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল)।

আগেই বলেছি, *ধেয়ান*-এর আঠারটি লেখা কাফকার জীবনের একেবারে প্রথম দিককার সৃষ্টি। শৈলীর দিক থেকে এগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার জনপ্রিয় ইমপ্রেশনিস্টিক ধারার – এখানে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার এক শক্তিশালী আত্মনিষ্ঠ (subjective) ছবি পাই আমরা, কথকের বা পর্যবেক্ষকের আবেগ ও মেজাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে দেখি তার পারিপার্শ্বিকতাকে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে। দুটি লেখায় আমরা পড়ি 'জানালা'র কথা ('জানালা থেকে আনমনা বাইরে তাকিয়ে' এবং 'রাস্তার ধারের জানালা')। জানালা এখানে রূপক হয়ে দাঁড়ায় লেখকের গল্পবর্ণনার ভঙ্গিবিষয়ক সিদ্ধান্তের। বাহ্যিক পৃথিবী থেকে তার মনকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করে রাখে এই জানালা, আর শেষে এভাবেই জন্ম হয় এক বিষণ্ন ও ব্যক্তিক, ধ্যানী কণ্ঠের।

ধেয়ান বইটিকে কাফকা পরের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন না। ১৯২২-এর নভেম্বরে তিনি ম্যাক্স ব্রডকে একটি নোটে লেখেন (পাঠাননি): '*ধেয়ান*-এর অল্প কিছু বিক্রি না হওয়া কপি আর ধ্বংস করার দরকার নেই, ওদের মণ্ড বানানোর কষ্টও আমি কাউকে দেব না, তবে *ধেয়ান*-এর একটি লেখাও যেন আর পুনর্মুদ্রণ না হয়।' বাস্তবে, *ধেয়ান* বইটির ভাগ্যে অনেক প্রশংসা জুটেছিল। অন্যদের মধ্যে খ্যাতিমান জার্মান ঔপন্যাসিক রবার্ট মুসিল ও কুর্ট টুকোলস্কি বইটি খুব পছন্দ করেন।

কাফকার ডায়েরি এন্ট্রি, তারিখ ১৫ আগস্ট, ১৯১২: 'আবার আমি পুরোনো ডায়েরি থেকে দূরে থাকার বদলে ওগুলো পড়লাম। আদতে যতটা সম্ভব ততটা অযৌক্তিক রকমেরই জীবন কাটাচ্ছি আমি। আর এই একত্রিশ পাতার বইটির প্রকাশই দায়ী এ সবকিছুর জন্য। তবে আমারও দুর্বলতারও, অবশ্যই, দোষ দেব, যেটার কারণে এ-জাতীয় ভাবনা আমাকে প্রভাবিত করতে পারছে।'

ডায়েরি এন্ট্রি, তারিখ ১১ আগস্ট, ১৯১২: 'সত্যের মধ্যে স্রেফ আঙুলের ডগা ছুঁইয়েই যদি আমি তৃপ্ত না হতে চাই, তাহলে আমাকে এখন – এই বইটির প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরে – পত্রপত্রিকা ও সাহিত্য-সমালোচনা থেকে এমনকি আগের চেয়েও বেশি দূরে থাকতে হবে।'

গাঁয়ের রাস্তায় বাচ্চারা

ধেয়ান বইয়ের প্রথম এই গল্পটি ১৯০৯ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যেকার কোনো এক সময়ে কাফকা লিখেছিলেন তাঁর নভেলা *একটি সংগ্রামের বিবরণ*-এর পুনর্লিখিত পাণ্ডুলিপির এক

অধ্যায় হিসেবে। ইংরেজি নাম: 'Children on a Country Road'; মূল জার্মান: 'Kinder auf der Landstrasse'। বইয়ের পাশাপাশি এটি, একই সময়ে, *বোহেমিয়া* সংবাদপত্রের ক্রিসমাস ক্রোড়পত্রে ছাপা হয় ডিসেম্বর, ১৯১২ সালে।

এই গল্পে কথকের স্বপ্ন বা কল্পনা তাকে নিয়ে যায় তার শৈশবে। শিশুটির চোখ দিয়ে প্রথম পুরুষে বলা এই গল্পে কথক তার বাগানের বেড়ার ওপাশের পৃথিবীকে দেখে নিবিড়ভাবে। অনেককিছুই ঘটে এখানে – বাচ্চাগুলো গাঁয়ের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কথক মিশে যায় দলের সঙ্গে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, দ্বন্দ্বের বিবরণ আমরা পাই সংলাপের মধ্যে দিয়ে; শেষে কথক দলের বাকি বাচ্চাদের ছেড়ে বেরিয়ে আসে, রওনা দেয় দক্ষিণের এক মিথিক্যাল শহরের পথে, যেখানে মানুষেরা কখনো ঘুমায় না। *একটি সংগ্রামের বিবরণ* নামের নভেলাটির মতোই (যেটি থাকছে কাফকা *গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে) এখানে ব্যক্তি ও দলের মধ্যেকার যোগাযোগের সমস্যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, দেখি যে 'আমি'-কথক কথক দলের সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ। পুরো গল্পে ছড়িয়ে আছে বিষণ্নতা ও একাকিত্বের গাঢ় ছাপ, এতটাই যে কথক যখন বাচ্চাদের দলের সঙ্গে মিশে গেছে তখনো সে একা। থিমের দিক থেকে আমরা এখানে দেখি কাফকার অন্যতম থিম – ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিশাপ – ভাষা দিচ্ছে তাঁর প্রিয় দার্শনিক আর্থার শোপেনহাউয়ারের নৈরাশ্যবাদী দর্শনের, যা তিনি আসলে পেয়েছেন শোপেনহাউয়ারের দর্শনকে জনপ্রিয় করে তোলা ফ্রেডরিখ নিটশের কাছ থেকে।

সাধু-সাজা এক ফেরেববাজের মুখোশ উন্মোচন

ধেয়ান নামের গল্পসংকলনের এই দ্বিতীয় গল্পটি ১৯১২ সালে বইয়ে প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি কাফকার জীবনের শেষ দিকে, ১৯২১-এর সেপ্টেম্বরে, প্রাগের প্রধান দৈনিক পত্রিকা *Prager Presse*তে পুনর্মুদ্রিত হয়। যেহেতু এটির মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, তাই বলা কঠিন, ঠিক কবে কাফকা এটি লিখেছিলেন। তবে কাফকার নভেলা *একটি সংগ্রামের বিবরণ*-এর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এর থিম ও পরিস্থিতিগত সাযুজ্যের কারণে গবেষকদের অনুমান, কাফকা এটি ১৯১০-এর অক্টোবরের আগে নয়, বরং ১৯১১-এর আগস্টে *একটি সংগ্রামের বিবরণ* শেষ করার সময়ে লিখেছিলেন। জানা যায়, কাফকা এটি ঘষেমেজে ঠিক করেন ১৯১২ সালের ৮ আগস্টে, ডায়েরিতে তিনি লেখেন যে গল্পটি শেষমেশ যে চেহারা নিয়েছে তাতে তিনি তৃপ্ত। ইংরেজি নাম: 'Unmasking of a Confidence Trickster'; মূল জার্মান: 'Entlarvung eines Bauernfängers'।

গল্পে কাফকার প্রথম দিককার লেখার রীতি মেনে আমরা দেখি নামহীন, ভবঘুরে ধরনের এক কথক শহরের রাস্তায় রাতে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর তার পাশে আরেক নামহীন লোক যাকে কথক ভয় পাচ্ছে ঠগ বা বাটপার হিসেবে। প্রথম পুরুষের এই কথক যেভাবে এই বাটপারের কাছ থেকে ছাড়া পেতে চাইছে, তার মধ্যে কাফকার চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক

বিশ্লেষণী ক্ষমতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। কথক যে এই শহরে মোটামুটি নতুন তা আমরা ধরতে পারি, আর বাটপারটির পেশা যে গ্রাম থেকে বড় শহরে আসা নতুন লোকদের ঠকানো, তাও বোঝা যায়। বড় শহরে মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের সুরটি এখানে প্রকট। তবে, কথকের দাবি ছাড়া গল্পের কোথাও প্রমাণ নেই যে সঙ্গের লোকটি সত্যিই ঠগ প্রকৃতির; হতে পারে তার এই স্বভাব হয়তো স্রেফ কথকেরই নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে তৈরি হওয়া কল্পনা। গল্পের শেষ হয় কথকের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার মধ্যে দিয়ে; সে তার পরিচিত লোকজনের সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়, সেখানকার চাকরবাকরেরা তার জুতোর ধুলো ঝাড়ে। একটু আগের সামাজিক সিঁড়িতে নিচের দিকে থাকা কথক – বাটপারটি তার এই শহর সম্বন্ধে জ্ঞানের কারণেই কথকের উপরে – এখন সিঁড়ির উপরের দিকে, চাকরেরা তার কোট খুলছে, জুতো সাফ করে দিচ্ছে। সামাজিক সম্পর্কগুলোর অস্বস্তিকর মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাই এ গল্পের মূল থিম বলে অনুমান হয়।

হঠাৎ হাঁটতে বেরোনো

ধেয়ান সংকলনের তৃতীয় এই ছোট স্কেচটি কাফকা প্রথম ডায়েরিতে লেখেন ১৯১২ সালের ৫ জানুয়ারি। ইংরেজি নাম: 'The Sudden Walk'; মূল: 'Der plötzliche Spaziergang'।

এটি যতটুকু না গল্পবর্ণনা, তার চেয়ে বেশি আত্মমগ্ন ভাবনা, যেমনটি মানুষ সাধারণত ডায়েরিতে লিখে থাকে। আর এর মধ্যে কাফকার আত্মজীবনীরও উপাদান পাওয়া যায় – তৃতীয় পুরুষের লোকটির পরিবারের সবার সঙ্গে বসবাসের মধ্যে কাফকার নিজের বাড়িতে বসবাসের বন্দিত্বের ইঙ্গিত পাই আমরা। এই স্কেচে কাফকা আমাদের বলছেন, যদি আমরা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময়, বিছানায় না গিয়ে বরং শহরের রাস্তায় একটু হাঁটতে বের হই তাহলে কী কী হতে পারে, ইত্যাদি। কাফকার এই 'যদি' এবং 'তাহলে' ঘরানার লেখা আছে বেশ কয়েকটি, যার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখি *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ের 'উপরে, গ্যালারিতে' গদ্যরচনায়। তবে, এখানে প্রথমদিকের 'যদি' পাঠকের মনে স্কেচটি পড়তে পড়তে যে প্রত্যাশা জাগায়, সেই প্রত্যাশা শেষ অংশের 'তখন' বা 'তাহলে' দিয়ে পূরণ হয় না; আমরা দেখি কাফকা আমাদেরকে শহরে হাঁটা বাদ দিয়ে বরং বলছেন, আরো ভালো হয় রাতের ওরকম সময়ে আমরা যদি কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। চমৎকার শেষ হয় এই স্কেচটির। তার মানে, বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত পরিবারে বাস করার যাতনাই শুধু নেই এ স্কেচে, আরো আছে – পারিবারিক সম্পর্কের শীতলতাগুলোর বিকল্প হিসেবে – ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংস্পর্শে আসার উষ্ণতার কথা।

সংকল্পগুলো

ধেয়ান সংকলনের চতুর্থ এই স্কেচটি কাফকা তাঁর ডায়েরিতে লেখেন ১৯১২ সালের ৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। ইংরেজি নাম: 'Resolutions'; মূল: 'Entschlüsse'। দুটি

নামই বহুবচনে; বাংলায় শুনতে খটকা লাগলেও 'সংকল্প'-এর শেষে বহুবচনের 'গুলো' বসানো বসানো হলো; এর কারণটি আমরা একটু পরেই বলব।

কাফকার অন্য অনেক প্রবচনের (aphorism) মতো এটির একটি কঠিন যৌক্তিক কাঠামো আছে। কাফকার কাঠামোটি সাধারণত এমন: প্রথম অনুচ্ছেদে একটা থিসিসের কথা বলা হবে; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সেটার সঙ্গে যায় না, এমন কিছু বলা হবে; তৃতীয় অনুচ্ছেদে প্রথম অনুচ্ছেদের থিসিস-এর অ্যান্টিথিসিস তুলে ধরা হবে; আর উপসংহার অনুচ্ছেদে এই মামলার কোনো নিষ্পত্তি না করে স্রেফ শারীরিক একটা ভঙ্গিমার উল্লেখ পাব আমরা (যেমন এই স্কেচে, কড়ে আঙুল দিয়ে ভ্রু ডলতে থাকা), যে ভঙ্গিমা আগের মানসিক অবস্থার বিবরণের শারীরিক প্রকাশ হয়ে দাঁড়াবে। মনের ভেতরে চলতে থাকা মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাস্রোত, ঝড় বা সুস্থ-সংহত ভাবনাচিন্তাকে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করা কাফকার সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। বহু বার বহু জায়গায় তিনি এটি করেছেন এবং এর ফলে এই ধারণাও জোরালো করেছেন যে, তিনি বস্তু ও বাস্তব পৃথিবীর কমিক্যাল ও কার্টুনসদৃশ দিকটাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

এই স্কেচে দেখা যায়, দুর্দশার মুখোমুখি হয়ে আপনার দুটো করণীয় আছে: আপনি দৃঢ় চিত্তে, সাহসীর মতো সেটির মোকাবিলা করতে পারেন; অথবা নিজের ভেতরে আরো সেঁদিয়ে গিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে উপেক্ষার বুড়ো আঙুল দেখাতে পারেন। এই যে দুটি সংকল্প (এ কারণেই বহুবচনে 'সংকল্পগুলো') থেকে একটি বেছে নেওয়ার ব্যাপার, তাতে শেষ বাক্যের শারীরিক ভঙ্গিমা থেকে বোঝা যায়, দ্বিতীয় বিকল্পটির দিকেই কাফকার পক্ষপাত বেশি।

পাহাড়ে দল বেঁধে বেড়ানো

ধেয়ান গল্পসংকলনের পঞ্চম লেখা এটি। ইংরেজি নাম: 'Excursion into the Mountains'; মূল: 'Der Ausflug ins Gebirge'। এটি লেখার সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অনুমান করা হয়, এটি কাফকার নভেলা *একটি সংগ্রামের বিবরণ*-এর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির অংশ হিসেবে লেখা হয়েছিল এবং এখান থেকে তুলে নিয়েই কাফকা এটি *ধেয়ান* বইয়ে ঢুকিয়ে দেন। সে হিসেবে, গবেষকদের দাবি, লেখাটির জন্ম সম্ভবত ১৯১০-এর মার্চের শুরুর দিকে।

প্রথম পুরুষে লেখা স্বগতোক্তি এটি। উর্ধ্বকমার মধ্যে লিখে কাফকা এটিকে নাটকীয় সংলাপের মতো রূপ দিয়েছেন। নামহীন কথক এখানে নির্জনতা-ও সামাজিক যোগাযোগের মধ্যেকার বিপরীতমুখী চাপের বিষয়টি, যেটি কাফকার প্রথমদিককার লেখাগুলোর অন্যতম লক্ষণ, ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চাপ বা দ্বন্দ্বের এখানে একটি সমাধান দিয়েছেন কথক: তিনি একদল কেউ-না (nobody) কে জড়ো করেছেন, তারপর তাদের নিয়ে পাহাড়ে হেঁটে বেড়াতে যাচ্ছেন। এই পাহাড় সম্ভবত প্রাগ শহরের ভ্লতাভা (আগের নামে মলদাউ) নদীর অন্য পাশে, এ পাশে ওল্ড টাউন বা কাফকার বাড়ি, প্রাগ দুর্গের সঙ্গে লাগোয়া

পেত্রিন পাহাড় (জার্মান নামে তখন ছিল লরেন্জিবুর্গ পাহাড়), যেখানে বন্ধুদের নিয়ে কাফকা প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। পাহাড়ের পরিবেশে ধ্যানী মৌনতার সন্ধানে থাকা নিট্শের ভবঘুরের মোটিফটিকে কাফকা এখানে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমন 'কেউ-না'-র দলের কাল্পনিক আর্মি এসে সেই মৌনতা চূর্ণ করে দিচ্ছে, এমনটিও কাফকার বিপরীতমুখী শঙ্কা। একই বিষয়কে ঘিরে এই পরস্পর বিপরীত দুই সত্যের অবস্থান ও সংঘর্ষ পুরো কাফকা-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

ব্যাচেলরের নিয়তি

ধেয়ান গল্পসংকলনের ষষ্ঠ এই ছোট স্কেচটি কাফকা তাঁর ডায়েরিতে লেখেন ১৯১১ সালের ১৪ নভেম্বর। *ধেয়ান* বইতে প্রকাশের পরে আবার ১৯১৩-র ৩১ মার্চ তারিখে আরো অন্য দুটি লেখার সঙ্গে *ধেয়ান* নামের অন্তর্ভুক্ত হয়েই এটি *ডয়েচ মুনটাগস্-সাইটুঙ* পত্রিকায় বের হয়। ইংরেজি নাম: 'Bachelor's Ill luck'; বা 'The Fate of the Bachelor'; মূল জার্মান: 'Das Unglück des Junggesellen'।

বিয়ে না করে সারা জীবন কুমার থেকে যাওয়ার ওপরে লেখা এই দুঃখভারাক্রান্ত রচনাটি থেকে কাফকার বিয়ে থা করে সংসার গড়ার স্বপ্ন (যা এই বইয়ের ভূমিকা অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) যে কত বড় ছিল, তারই উল্টোদিক থেকে দেখা ছবিটি পাই। ব্যাচেলর থাকার বিষয়টি কাফকা-সাহিত্যের অন্যতম বড় বিষয়বস্তু। তাঁর উপন্যাস ও প্রধান গল্পগুলোর সব মুখ্য চরিত্রই – কার্ল রসমান, গেয়র্গ বেন্ডেমান, গ্রেগর সামসা, জোসেফ কে., কে. – ব্যাচেলর, যেমনটি ছিলেন কাফকা নিজেও।

কাফকা সব সময়ে দুটি বিপরীতধর্মী বাসনার মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছেন – একদিকে ব্যাচেলর থেকে নিঃসঙ্গ জীবনটি সাহিত্যের জন্য উৎসর্গ করার বাসনা, আর অন্যদিকে বিয়ে করে সাধারণ মানুষের কাতারে ভেড়ার বাসনা। বিয়ে ও পরিবার গড়ে তোলা, কাফকা তাঁর প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারকে বলেছিলেন, মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সামাজিক কাজ।

কাঠামোর দিক থেকে এটি *ধেয়ান* বইয়ের অন্য স্কেচ 'হঠাৎ হাঁটতে বেরোনোর' মতোই – দুটি লেখাতেই আছে স্রেফ দুটি বাক্য, প্রথমটি অনেক দীর্ঘ আর দ্বিতীয়টি ছোট। আর *ধেয়ান* বইয়ের 'সংকল্পগুলো'র মতো, দ্বিতীয় বাক্যের শেষে এখানেও আমরা পাই আরেকটি শারীরিক ভঙ্গি – হাতের তালু দিয়ে কপাল চাপড়ানো। এই ভঙ্গির অর্থ পরিষ্কার: কুমারের নিঃসঙ্গ ও অসুখী জীবনের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে প্রতিবাদ ও অনীহ সম্মতি প্রকাশ করা।

ব্যবসায়ী

এটি *ধেয়ান* রচনাসংকলনের সপ্তম স্কেচ বা ছোট গদ্যরচনা। যেহেতু লেখাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, তাই লেখার তারিখ অনুমাননির্ভর মাত্র। লেখাটি প্রথমে *হুইপেরিয়ন*

পত্রিকায় ১৯০৮ সালের মার্চে বের হয়, আর এ লেখায় বর্ণিত বাড়িটির সঙ্গে ওল্ড টাউন স্কোয়ারের পাশের ৩৬ নম্বর নিকলাস্‌স্ট্রাসে কাফকাদের বাড়ির মিল দেখে (কাফকারা এ বাড়িতে ওঠেন ১৯০৭-এর জুনে) অনুমান হয় যে এটি ১৯০৭-এর শেষ দিকে কোনো এক সময়ে লেখা। ইংরেজি নাম: 'The Tradesman'; বা 'The Businessman' মূল জার্মান: 'Der Kaufmann'।

কাফকার বিখ্যাত দুই গল্প 'রায়' ও 'রূপান্তর'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবেও আমরা তরুণ ব্যবসায়ীর দেখা পাই। গ্রেগর সামসা ভ্রাম্যমাণ সেলস্‌ম্যানের চাকরি করে বটে, কিন্তু তার চাকরির ধরনটা ব্যবসায়ীদের মতো। যা-ই হোক, এ লেখার ব্যবসায়ী কথকটি আমাদের কাফকার বাবা হারমান কাফকার কথা মনে করিয়ে দেন। প্রাগের ওল্ড টাউন স্কোয়ারে তার কাপড় ও ফ্যান্সি দ্রব্যসামগ্রীর মোটামুটি বড় দোকান, আর সারা দিন তিনি ব্যবসাতে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলেও, কখনোই পুরো ব্যাপারটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারছেন না। তিনি ভাবতেন, তিনি তাঁর অপদার্থ সব কর্মচারীর হাতে বন্দী; বাজারের অনিশ্চয়তা ও ঘটনা-দুর্ঘটনার হাতে বাঁধা তাঁর নিয়তি। কাফকার গল্পের ব্যবসায়ী তেমনই সারা দিন শেষে বাড়ি ফেরেন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে, আর ব্যবসাসংক্রান্ত উদ্বেগে মানসিকভাবে পীড়িত অবস্থায়। কেবল লিফটে ঢোকার পরই কাজ থেকে মুক্তি মেলে তার; আমরা গল্পের রূঢ় বাস্তবতা থেকে প্রবেশ করি রূপকথার মতো মায়াবী এক কল্পনার জগতে। ফ্রানৎস কাফকার নিজের যেমন ছিল দুই জীবন – অফিসের কাজে পিষ্ট, তিক্ত কাফকা এবং সৃজনী ফ্যান্টাসিতে ডানা মেলে দেওয়া উৎফুল্ল লেখক কাফকা – তেমনি এ গল্পের ব্যবসায়ীরও দুই ভিন্ন জীবন: লিফটের বাইরে ও লিফটের ভেতরে। লিফটে ঢোকার পরে জাদুর মতো তিনি উড়ে যান স্বপ্নের প্যারিসে, আরো অদ্ভুত নানা দূর দেশে, সুন্দরী মহিলা ও উল্লাসরত নাবিকদের সান্নিধ্যে; এবং একসময় নিজেকে এক বিপজ্জনক লুটেরার ভূমিকায় দেখেন তিনি, আর যাকে লুট করা হলো সে কেমন মন খারাপ করে হেঁটে যাচ্ছে – এত চমৎকার ইমপ্রেশনিস্টিক বর্ণনা সাহিত্যে এর চেয়ে ভালো বোধ হয় আর হয় না। এর পরই দেখি স্কোয়ারের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি। কিন্তু এই কল্পনার লাগামহীন দৌড় মাত্র ক্ষণিকেরই জন্য। লিফট্ এসে থামে, কাজের মেয়েটা দরজা খুলে দেয়; আবার সেই রূঢ় বাস্তবতার ও কোলাহলের পৃথিবী। 'লিফট' এখানে সম্ভবত কাল্পনিক সৃজনীশক্তি দিয়ে উপর দিকে ওঠার রূপক।

টীকা:

'আমার দাঁতকে কথাগুলো বলি আমি' (পৃ. ১৩০): লিফটের আয়নায় নিজের দাঁতের দিকে তাকানোর কথা বলা হচ্ছে। আয়নায় দাঁতের দিকে তাকিয়ে এর আগের যে-বাক্যটি বলা হলো তা মূল জার্মানে বললে – দাঁতগুলো আসলেই একবার মুখের মধ্যে হারিয়ে যায়, আবার ভেসে ওঠে। শারীরিক ভঙ্গিমা বর্ণনার প্রতি কাফকার পক্ষপাত, যে কথা আগেই বলেছি, এবং এই বাক্যের জার্মান ছন্দে সেটির প্রকাশ বাংলায় কখনোই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

জানালা থেকে আনমনা বাইরে তাকিয়ে

ছোট, ভাবুকের গাঢ় ভাবনা ধরনের এই লেখাটি *ধেয়ান* সংকলনের অষ্টম স্কেচ। লেখার কাল সম্ভবত ১৯০৭-এর বসন্ত। এটির প্রথম প্রকাশ ১৯০৮-এর মার্চের *হুইপেরিয়ন* সাময়িকীতে, নামহীন; অন্য সাতটি লেখার সঙ্গে। এর পরে 'জানালায়' ('At the Window'; 'Am Fenster') নামে, অন্য চারটি লেখার সঙ্গে এর প্রকাশ প্রাগের সংবাদপত্র *বোহেমিয়ায়*, মার্চ ১৯১০-এ। শেষে *ধেয়ান* বইতে ছাপা হয় এটি; এই প্রথম এর নাম দেওয়া হয় 'জানালা থেকে আনমনা বাইরে তাকিয়ে'; ইংরেজিতে: 'Absent-minded Window Gazing' বা 'A Stray Glance from the Window'; মূল জার্মান: 'Zerstreutes Hinausschaun' । কাফকার জীবনের একদম শেষ দিকে, এপ্রিল ১৯২৪-এ, লেখাটি প্রাগের নামকরা দৈনিক *Prager Presse*-তে ছাপা হয়।

এখানে একজন লোক জানালা থেকে বাইরে তাকিয়ে আছে উদাস নয়নে, সব খুঁটিয়ে দেখছে আর ভাবছে – এটি কাফকার সবচেয়ে ইমপ্রেশনিস্টিক লেখাগুলোর একটি। 'জানালা' এখানে আবারও বাইরের পৃথিবীতে তাকানো কিন্তু অংশগ্রহণে অক্ষম বা অনিচ্ছুক লেখকটির বিচ্ছিন্ন অবস্থানের রূপক। খুব সাধারণ এক দৃশ্যই দেখছে সে – ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়েছে রাস্তায় হেঁটে যাওয়া এক মেয়ের গালে। কিন্তু এই দৃশ্য হঠাৎ বিপজ্জনক বা অশুভের সংকেতের মতো হয়ে ওঠে, যখন পেছন থেকে আসা এক লোকের ছায়া সূর্যের সেই আলো ঢেকে দেয়। তবে লোকটা চলে যেতেই আবার আলো ফিরে আসে। পুরো কাঠামোটিতে আছে অনেকগুলো 'পরস্পরবিরোধিতার' ব্যঞ্জনা: আলো-আঁধার, বাচ্চা মেয়ে-বড় মানুষ, নারী-পুরুষ, আর সবশেষে আলো-বাচ্চামেয়ে-নারী – তিনজনই পেলো আশাবাদের 'ঝলমলে' ছোঁয়া।

বাড়ির পথে

ধেয়ান বইয়ের নবম এই স্কেচটি কাফকা সম্ভবত লেখেন ১৯০৭ সালের শেষ ভাগে। প্রথম পুরুষে বলা এই ভাবনামূলক ছোট লেখাটি কোনো শিরোনাম ছাড়া প্রথম ছাপা হয় ১৯০৮- এর মার্চে মিউনিখের *হুইপেরিয়ন* সাময়িকীতে। পরে *ধেয়ান* বইতে এটি নেওয়ার সময় কাফকা এর নাম দেন 'বাড়ির পথে' । ইংরেজিতে: 'The Way Home'; মূল জার্মান: 'Der Nachhauseweg' ।

কাফকার সাহিত্যজীবনের প্রথম দিককার অসংখ্য ধ্যানী ও চিন্তাশীল রচনাগুলোর মধ্যে এটিই সম্ভবত সবচেয়ে 'আশাবাদী' রচনা – কথকের মনোজগৎ ও বাইরের বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের সুরটি এখানে ইতিবাচক; বাইরের পৃথিবী ও কথকের মনোজগৎ এখানে এতখানিই ইতিবাচকতা নিয়ে এক হয়ে গেছে যে, আমরা কথককে দেখি তার পরিপার্শ্ব থেকে সে তার মানসিক পুষ্টি আহরণ করে নিচ্ছে। পৃথিবী ও

মানবাত্মার এই হ্যাঁ-বোধক সম্পর্ক কাফকার অন্য সব লেখাতেই বিরল; সেগুলোতে এই সম্পর্কটি অনেক বেশি সমস্যায় আকীর্ণ। সেই সমস্যার সামান্য ছোঁয়া এই লেখাটিতেও পাওয়া যায়, যখন কথক 'ভাগ্যবিধাতার অন্যায়'কে দায়ী করেন তাঁর প্রতি শুভ পক্ষপাত দেখানোর জন্য। এই আত্মসমালোচনাই শেষে গিয়ে, কথক বাড়ি ফিরলে, তার সৌভাগ্য ও প্রসন্ন মেজাজের ওপর বিষণ্ন ছায়া ফেলা শুরু করে।

এ বইয়েরই 'যাত্রী' নামের স্কেচে আমরা পাই আত্মপ্রত্যয়হীনতা ও সন্দেহ-সংশয়ের গাঢ় এক ছবি, যা এই স্কেচটির স্বর ও সুরের ঠিক বিপরীত কিছু।

পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়া মানুষ

ধেয়ান বইয়ের দশম এই ছোট, চমৎকার স্কেচটি কাফকা কবে লিখেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হয়নি, তবে ১৯০৮-এর মার্চে *হুইপেরিয়ন* সাময়িকীতে সাতটি নামহীন লেখার সঙ্গে প্রকাশিত এই লেখাটি প্রথম প্রকাশের তারিখের আগে লেখা তো বটেই। পরে কাফকা এটিকে 'রাতে' ('At Night'; 'In der Nacht') নাম দিয়ে ১৯১০-এর মার্চে *বোহেমিয়া* দৈনিক পত্রিকার ইস্টার ক্রোড়পত্রে পাঁচটি লেখার দ্বিতীয়টি হিসেবে প্রকাশ করেন। শেষে *ধেয়ান* বইতে এর নাম হয় 'পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়া মানুষ'; ইংরেজিতে: 'The Men Running Past' বা 'Passers-by'; মূল জার্মানে: 'Die Vorüberlaufenden'।

এ লেখার গল্পের অংশটুকু কাফকার প্রথম দিককার ধ্যানী গদ্য রচনাগুলোতে অনেকবার ব্যবহৃত একই আবহের: এক পায়ে-হাঁটা লোক রাতের বেলা শহরের রাস্তা দিয়ে চলেছে আর ভাবছে তার পাশ দিয়ে ছুটে চলা এক লোকের ব্যাপারে সে কী করবে। লেখাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে অনেকগুলো 'হতে পারে', অর্থাৎ অনেকগুলো সম্ভাবনা; সম্ভাবনাগুলো পাশের এই লোকটিকে কল্পনার অন্য আরো লোকের সাপেক্ষে বিচার করছে, আমরা তাকে দেখছি একবার খুনের শিকার হিসেবে, একবার অন্য কারো অনিষ্ট করতে চাওয়া কেউ হিসেবে, শেষে নিরপরাধ ঘুমে-হাঁটা মানুষ হিসেবে। কাফকার শুরুর দিকের অন্য ধ্যানমগ্ন গদ্য রচনাগুলোর মতোই এখানে কল্পনার অনিঃশেষ বিস্তার লক্ষ্য করি আমরা, বাইরের পৃথিবী থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা দিয়ে শিল্পী এখানে অনন্ত কল্পনার বা সৃজনী-ক্ষমতার আগল খুলে দেন। ফ্যান্টাসি এখানে রোজকার বাস্তব পৃথিবী থেকে পালানোর ও তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার বাহন হয়ে দাঁড়ায়।

যাত্রী

ধেয়ান গদ্যরচনা সংকলনের এই এগারোতম স্কেচটি কাফকা লেখেন ১৯০৭ সালের শেষ ভাগে; প্রথমে এটি বেরোয় মিউনিখ থেকে প্রকাশিত *হুইপেরিয়ন* পত্রিকার মার্চ, ১৯০৮ সংখ্যায়, নামহীনভাবে অন্য আরো সাতটি লেখার সঙ্গে সাধারণ শিরোনাম *ধেয়ান*-এর

অন্তর্ভুক্ত হয়ে। পরে 'যাত্রী' নামে কাফকা এটি পুনর্মুদ্রণ করেন *বোহেমিয়া* পত্রিকার মার্চ ১৯১০-এর ইস্টার ক্রোড়পত্রে, মোট পাঁচটি স্কেচের চতুর্থটি হিসেবে। শেষে *ধেয়ান* বইতে এটি যোগ হয় 'যাত্রী' নামেই। ইংরেজি নাম: 'The Passenger' বা 'On the Tram'; মূল জার্মান: 'Der Fahrgast'।

প্রথম-পুরুষে বলা এই ছোট লেখাটির প্রথম লাইনের শেষের অংশটি কাফকা গবেষণায় বিশিষ্ট মর্যাদা নিয়ে আছে, যেখানে বলা হচ্ছে: '...পুরোপুরি অনিশ্চিত লাগছে এই পৃথিবীতে, এই শহরে এবং আমার পরিবারে আমার অবস্থানের বিষয়ে।' নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা, বিচ্ছিন্নতা, অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের অপর নাম যে কাফকা, এই যে অতিপরিচিত কাফকার ছবি (যেটিকে আজকাল অর্ধসত্য বা মিথ বলেন অনেকে), তাতে বিরাট মাত্রা দিয়েছিল কাফকার কম বয়সে লেখা এই বাক্যটি।

এটির সাধারণ আবহ কাফকার এ সময়কার অন্য লেখাগুলোর মতোই, শুধু এখানে কথক পায়ে হাঁটার বদলে প্রাগ শহরের জনপ্রিয় যানবাহন, আজও তেমন, ট্রামে ঘুরছে। তার চারপাশে অন্য যাত্রীদের ভিড়, পৃথিবীতে নিজের জায়গাটুকু সে ঠিকমতো ঠাহর করে উঠতে পারছে না। প্রথম অনুচ্ছেদের এই 'কাফকায়েস্ক' ভঙ্গি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এসে পুরো হাওয়া। কথক ট্রামে সহযাত্রী এক মেয়েকে দেখে বেশ উজ্জীবিত, মেয়েটি পরের স্টপেজে নেমে যাওয়ার জন্য তৈরি। তারপর মেয়েটির পোশাক-আশাক ইত্যাদির, মানে বাইরের পৃথিবীর, ঘন বুনোটে ঠাসা খুঁটিনাটি বর্ণনা। আমরা বুঝতে পারি, কথক পৃথিবীতে তার জায়গাটুকু খুঁজে পেয়েছেন। তৃতীয় ও শেষ অনুচ্ছেদে এসে কথকেরই বিস্ময়বিমূঢ়তা এ নিয়ে যে, কী করে মেয়েটি নিজেকে নিয়ে অবাক হচ্ছে না। তবে, আমরা বুঝি, নিজেকে নিয়ে অত ভাবাভাবির স্বভাব এ মেয়ের নেই, সে অন্য সবার মতো স্বাভাবিক-সাধারণ ও মানবসমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়া একজন, কথক যেমনটি নয়। ব্যাপারটি কাফকার প্রথম দিককার লেখায় অনেকবারই এসেছে: ব্যক্তি হচ্ছে বহিরাগত কেউ, আর সামাজিক মানুষটি হচ্ছে আরো বৃহত্তর মানবসমাজের একজন সদস্য, নিঃসঙ্গ ব্যক্তি এখন সামাজিক মানুষটিকে নিয়ে ভাবছে, হয়তো তার নিজের একাকিত্ব ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার অক্ষমতার বা অনিচ্ছার কথা চিন্তা করে নিজেকে নিয়ে আফসোসই করছে।

ধেয়ান-এর নবম স্কেচ, গাঢ় আশাবাদী স্কেচ, 'বাড়ির পথে'-এর ঠিক উল্টো দিকে আছে 'যাত্রী'। 'বাড়ির পথে'-এর আত্মপ্রত্যয়ী, সংশয়হীন কথক যেন নিজের বিরাটত্ব নিয়ে ঘোরের মধ্যে আছে; অন্যদিকে ট্রামের এই 'যাত্রী' বিষণ্ন, সন্দেহদীর্ণ, আর আত্মপ্রত্যয়হীন ও সংশয়ী – যেমনটি কাফকার মূল লেখাগুলোর মুখ্য চরিত্রেরা বাস্তবে ছিলেন ব্যক্তি-কাফকা নিজেও।

পোশাক

ধেয়ান বইয়ের এই বারো নম্বর স্কেচটি কাফকা নিয়েছিলেন তাঁর নভেলা *একটি সংগ্রামের বিবরণ*-এর প্রথম পাণ্ডুলিপি থেকে; সে হিসেবে ধরা যায় এটি লেখা হয় ১৯০৭ সালের

সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে। 'পোশাক' প্রথম বের হয় মিউনিখের *হুইপেরিয়ন* পত্রিকার ১৯০৮ সালের মার্চ সংখ্যায়, মোট আটটি নামহীন রচনার (পুরোটির নাম কাফকা রাখেন 'ধেয়ান') পঞ্চমটি হিসেবে। 'পোশাক' নামে (ইংরেজিতে: 'Clothes'; মূল: 'Kleider') এটি বের হয় *বোহেমিয়া* সংবাদপত্রের ২৯ মার্চ ১৯১০ সংখ্যায়, অন্য আরো চারটি ধ্যানী লেখার সঙ্গে। পরে কাফকার প্রথম বই *ধেয়ান*-এ এটিকে স্থান দেন লেখক।

এই ছোট লেখাটিতে নতুন শতাব্দীর শুরুর দিকে মেয়েদের ফ্যাশন নিয়ে, পোশাক-আশাকসংক্রান্ত বিষয়ের অসারতা নিয়ে, কাফকা ব্যঙ্গ করেছেন বলে মনে হয়। প্রথম পুরুষে বলা কথক প্রাগের ফ্যাশনেবল মেয়েদের ভড়ং ও অতি জাঁকালো কাপড়ের দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকাচ্ছেন এখানে। আর তারা যে একই পোশাক রোজ রোজ পরে, এতেই তাদের ফ্যাশনসচেতনতার ভানটুকু খুলে যায়, এই অতি-বাস্তব কথাটি কাফকা মোটামুটি স্পষ্ট করেই বলেছেন এ-লেখায়। কথক বোধ হয় তার ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার চূড়ান্তে পৌঁছান যখন তিনি মেয়েদের পেশি, হাড়, ত্বক, চুল নিয়েও কথা বলেন – তা কী প্রশংসার সুরে, নাকি প্রশংসার আড়ালে খোঁচা দিয়ে, গল্পের বাকিটুকুর সাপেক্ষে বিচার করলে তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাফকার শুরুর দিকের অনেক ধ্যানমগ্ন লেখার মধ্যে আমরা দেখি তিনি নারীদের বিষয়ে সন্দিহান, কিন্তু এই স্কেচে তাঁর নারীবিষয়ক অবস্থান খুব স্পষ্ট – সমালোচনামূলক। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের অন্য অনেক লেখকের মতোই তরুণ কাফকা নারীদের 'অন্তসারশূন্যতা' বা ভড়ং' বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'ভ্যানিটি', সেগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তায় বা মনঃকষ্টে ছিলেন বলা যায়।

রূঢ় প্রত্যাখ্যান

ধেয়ান গদ্য রচনা সংকলনের এই তেরো নম্বর ছোট সংলাপমূলক লেখাটি কাফকা প্রথম তাঁর নারীবন্ধু, ভিয়েনার মেয়ে হেড্‌ভিগ ভেইলারকে (১৮৮৭-১৯৫৩) লেখা একটি চিঠির সঙ্গে সংযোজন হিসেবে পাঠান 'হঠাৎ সাক্ষাৎ' (ইংরেজিতে: 'Encounter', মূল জার্মান: 'Begegnung' নামে। তারিখহীন চিঠিটি ১৯০৭-এর অক্টোবর বা নভেম্বরের দিকে লেখা। এ চিঠিতে কাফকা বলেছেন, 'হঠাৎ সাক্ষাৎ' তিনি লিখেছিলেন প্রায় এক বছর আগে; সে হিসেবে ১৯০৬-এর শেষ ভাগেই লেখা এটি। এটি প্রথম ছাপা হয় ১৯০৮-এর মার্চে *হুইপেরিয়ন* পত্রিকায়, মোট আটটি গদ্যরচনার সপ্তমটি হিসেবে; তখন, অন্যগুলোর মতোই, এটির কোনো আলাদা নাম ছিল না। পরে কাফকার প্রথম বই *ধেয়ান*-এ এটি বের হয় 'রূঢ় প্রত্যাখ্যান' (ইংরেজি: 'Rejection'; মূল: 'Die Abweisung') নামে।

বেশ মজার একটি লেখা এটি, কাফকার রসবোধ এখানে খুবই স্পষ্ট; পাঠক না হেসে পারবেন না। পুরুষ কথক এখানে একটা মেয়েকে প্রেমের বা সম্পর্ক গড়ার প্রস্তাব দিচ্ছে, সুন্দরী মেয়েটি তা প্রত্যাখ্যান করেছে; এবার কথক বলছে মেয়েটি কেন তাকে প্রত্যাখ্যান

করল, কী ভাবনা সে সময় চলছিল মেয়েটির মাথায়। এর পরই কথকের মধ্যে হাস্যকর এক প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠতে দেখি আমরা, সে প্রমাণ করে ছাড়ে যে মেয়েটি শারীরিক ও সামাজিক – দুই দিক থেকেই খুঁতে ভরা, আর আরো ভয়ংকর কথা, মেয়েটি হালফ্যাশন বোঝে না। শেষে মেয়েটি বলে, যদি এমনটাই হয়, তাহলে দুজনেরই উচিত যার যার পথে বিদায় হওয়া। অর্থাৎ সম্পর্কটি আর গড়ে ওঠে না। মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কাফকার দ্বিধা, ভয়, দুশ্চিন্তার ভালো ছোঁয়া আছে এই রচনায়। কাফকা হেড্‌ভিগের প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাকে চিঠি লিখতেন (চিঠিগুলো আছে তাঁর *Letters to Family, Friends and Editors* বইয়ে), তাকে প্রাগে চাকরি দিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু হেড্‌ভিগ ভিয়েনাতেই থেকে গিয়েছিলেন। এই উনিশ বছরের তরুণী হেড্‌ভিগ ভেইলারকে যে কাফকা লেখাটির মূল পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন, সেটি থেকেও কিছু জিনিস আঁচ করা যায় – হেড্‌ভিগের সঙ্গে কাফকা সক্রিয় এবং সূক্ষ্মভাবে চেষ্টা করে গেছেন তাদের সম্পর্কের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার ও সেটিকে নাড়িয়ে দেওয়ার। এই একই কাজ কাফকা অসংখ্য চিঠিতে করেছেন তাঁর প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গেও – নিজের কাছেই জানতে চাইছেন তাদের দুজনের যে সম্পর্ক তাতে পুরুষ-চরিত্রে তাঁকে মানাচ্ছে কি না। কাফকার এ অদ্ভুত আত্মদহন ও পীড়ন যেমন কমিক্যাল, তেমনই মনকে বিষণ্ন করে তোলে।

শৌখিন ঘোড়সওয়ারদের বিবেচনার জন্য

ধেয়ান বইয়ের চৌদ্দ নম্বর এই রচনাটি প্রথম কবে লেখা হয়েছিল তা জানা যায়নি। এটি প্রথম ছাপা হয় ২৭ মার্চ ১৯১০-এর *বোহেমিয়া* সংবাদপত্রে, অন্য চারটি লেখার সঙ্গে সবগুলোর একক নাম 'ধেয়ান' নিয়ে, পঞ্চম বা শেষতম লেখা হিসেবে। এই তারিখটি বিবেচনায় নিলে এবং এটুকু মনে রাখলে যে কাফকা ১৯০৯ সালে প্রাগের রেসের মাঠে যেতেন ও ১৯০৯ থেকে ১৯১০-এর শীতকালে ঘোড়ায় চড়া শিখছিলেন, অনুমান হয়, এটি ১৯০৯-এর শেষ ভাগে লেখা। *বোহেমিয়ার* পরে লেখাটি শুধু কাফকার *ধেয়ান* বইতেই বেরোয়নি, ১৯১৩-এর ৩১ মার্চ তারিখে অন্য আরো দুটি লেখার সঙ্গে 'ধেয়ান' শিরোনাম নিয়েই *ডয়েচ মনটাগস্‌-সাইটুং* পত্রিকায় ছাপা হয়, এবং পরে ১৯১৪-তে কুর্ট ভোলফ্ প্রকাশনা সংস্থা থেকে বের হওয়া গল্প সংকলন *Das bunte Buch*-এও এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। কাফকা লেখাটি অনেক ভালোবাসতেন বলেই এর এই এতবার প্রকাশ, এমনটিই ধারণা গবেষকদের। এটির ইংরেজি নাম: 'For the Consideration of Amateur Jockeys' বা 'Reflections for Gentlemen Jockeys'; মূল জার্মান: 'Zum Nachdenken für Herrenreiter'।

ঘোড়া বা ঘোড়দৌড় কাফকার একটি প্রিয় মোটিফ: *আমেরিকা* উপন্যাসের নায়ক কার্ল রসমানের নামের আক্ষরিক অর্থ 'ঘোড়া মানুষ'; একই উপন্যাসে আমরা দেখি রেসের মাঠের 'নেচার থিয়েটার অব ওকলাহামা'; কিংবা এ বইয়েরই *এক গ্রাম্য ডাক্তার*

গল্পসংকলনের 'উপরে, গ্যালারিতে' লেখাটি। কাফকার ডায়েরি ও চিঠিগুলোতে বহুবার এসেছে ঘোড়া ও ঘোড়দৌড়ের কথা।

ঘোড়দৌড়ের মোটিফটি আধুনিক যুগের বেশ প্রচলিত একটি অস্তিত্ববাদী রূপক – সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রতিযোগিতার, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সফল বা ব্যর্থ হওয়ার রূপক। ফ্রয়েডিয়ান সাইকো-অ্যানালিসিসে ঘোড়াকে বশে আনার মধ্যে আছে আমাদের পশুপ্রবৃত্তির উত্থান ও দমনের চিহ্ন। কাফকার লেখাটিতে ঘোড়দৌড়ে জেতার, অদ্ভুত কারণে, কোনো প্রশংসা নেই; আছে বিজয়ীর জন্য তৈরি থাকা অসুবিধাগুলোর তালিকা। দুঃখজনকভাবে এ তালিকায় আমরা দেখি কাফকা যোগ করেছেন বিজয়ীর বন্ধুরা কীভাবে রেসে জেতার টাকা বুঝে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাবে, বন্ধুকে ভুলে যাবে; সেই সঙ্গে কীভাবে মহিলারা পরাজিতের প্রতিই বেশি দরদি হয়ে ওঠে ইত্যাদি। শেষমেশ এমনকি বৃষ্টিও পড়া শুরু হয়।

আমরা এসবের মধ্য দিয়ে দেখি এক চরম নিরাশাবাদী, বিষণ্ন কাফকাকে। কোনো কিছুতে বিজয়ীর অবস্থা যে কখনো এমন হতে পারে, তা এ লেখাটি না পড়লে সম্ভবত আমরা কখনো জানতেই পারতাম না। সৌভাগ্য আসলে দুর্ভাগ্য – ভয়ংকর উপসংহার কাফকার মনোজগতের। তবে যেসব পাঠক এটি কয়েকবার পড়বেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা এর অতিশয়োক্তিগুলো, এর নিয়তিবাদী আগ্রহের অনুষঙ্গগুলোর আড়ালে এখানে খুঁজে পাবেন কাফকার বীভৎস-রস বা ইংরেজিতে যাকে বলে slapstick humour, যেমনটি করতেন চার্লি চ্যাপলিন, কাফকার প্রিয় এক অভিনেতা। এ লেখার অন্তত পাঁচটি জায়গায় কাফকার সেই হিংস্র-রসের কী নির্মম-ঠাট্টার দেখা মেলে। পাঠকের খুঁজে নেওয়ার আনন্দ নষ্ট না করার স্বার্থেই এখানে তা উল্লেখ করা হলো না।

রাস্তার ধারের জানালা

ধেয়ান গল্পসংকলনের এই পনেরো নম্বর স্কেচটি প্রথম ছাপা হয় ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে কাফকার এ প্রথম বইতেই। কাফকার একটি নোটবুকে দেখা যায় তিনি এই লেখাটি (এবং 'সাধু-সাজা এক ফেরেববাজের মুখোশ উন্মোচন' নামের লেখাটি) সম্ভবত লেখেন ১৯১০ সালের অক্টোবর ও ১৯১২ সালের আগস্ট মাসের মাঝখানের কোনো এক সময়ে। থিমের দিক থেকে এটির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে *ধেয়ান* বইয়েরই অন্য একটি স্কেচ 'জানালা থেকে আনমনা বাইরে তাকিয়ে'-এর। এটির ইংরেজি নাম: 'The Window on the Street' বা 'The Street Window'; মূল জার্মান: 'Das Gassenfenster'।

এ স্কেচটিতে কাফকার প্রথম দিককার প্রিয় থিম – ব্যক্তির একাকিত্ব এবং তার বিপরীতে সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়ার স্বস্তি – পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। এ লেখায় কাফকা খুব গাঢ়ভাবে 'জানালা' নামের ইমেজটি ফুটিয়ে তুলেছেন একজন মানুষের (এ ক্ষেত্রে কাফকার

নিজের) পরম নিঃসঙ্গতার জন্য কামনা ও একই সঙ্গে মানব সমাজের অংশ হওয়ার স্বপ্নের রূপক হিসেবে। 'জানালা' দাঁড়িয়ে আছে এই পরস্পরবিরোধী দুই কামনার মাঝখানে সীমানা হয়ে। এই দুই কামনার যন্ত্রণায় পীড়িত মানুষটির জন্য কত ভালো হয় তার ঘরে একটি রাস্তার দিকের জানালা থাকলে – সে কথা স্কেচটির প্রথম ভাগে কাফকা স্পষ্ট করেছেন। কাফকা বলতে চাইছেন যে সে রকম কেউ জানালার ধারে বসে একই সময়ে ঘরের নির্জনতাও ভোগ করতে পারবে, আবার কল্পনায় জানালার বাইরের ব্যস্ত পৃথিবীতেও অংশ নিয়ে সামাজিক মানুষ হতে পারবে। আর জানালায় বসে সে যখন দেখবে রাস্তার ঘোড়াগুলো, তারা নিশ্চয়ই তখন তাকে (তার মনকে) টেনে নিয়ে যাবে বাইরের আনন্দময় মানুষের বাস্তব-পৃথিবীতে। তবে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এই যে একাত্ম হয়ে যাওয়া, তা শুধু কল্পনাতেই: শুধু মনটাই যাবে সেখানে, শরীর থেকে যাবে ঘরের চার দেয়ালের মাঝখানে বন্দীই। মানুষের মনের আত্মা ও শরীরের আত্মার এই বিভাজন, আগেই বলেছি, জীবনের প্রথম দিককার লেখাগুলোতে কাফকা বারবার তুলে ধরেছেন। এখানে কাফকার অসম্পূর্ণ উপন্যাস (আকারে যা বরং একটি বড় গল্প; বাংলায় থাকছে কাফকার *গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে) 'গ্রামে বিয়ের তৈয়ারি' ('Wedding Preparations in the Country')-র নায়ক এডুয়ার্ড রাবানের কথা না বলে পারছি না। রাবান চাইছে, তার মনটি থাকবে ঘরে, বিছানায় শুয়ে, আর সে সময় সে তার কাপড়চোপড় পরা শরীর ছুড়ে দেবে বাইরের পৃথিবীর দিকে, যেন তার ওই শরীর সামাজিক কাজকর্মগুলো চালিয়ে যেতে পারে।

রেড ইন্ডিয়ান হওয়ার বাসনা

এটি *ধেয়ান* বইয়ের ষোলো নম্বর স্কেচ; ১৯১২ সালে বইটিতেই এর প্রথম প্রকাশ। লেখার সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ইংরেজি নাম: 'Longing to be a Red Indian' কিংবা 'Wish to Become a Red Indian'; জার্মান মূল: 'Wunsch, Indianer zu werden'।

পুরো স্কেচটি একটিমাত্র দীর্ঘ বাক্য যার শুরুতেই কেউ একজন রেড ইন্ডিয়ান হয়ে বিরান ভূমিতে ঘোড়া ছোটানোর স্বপ্ন দেখছে। লেখাটি যতই আগায়, ততই প্রথমের এই মূল স্বপ্নের উল্টোদিকেই যেতে থাকে সবকিছু, কাল্পনিক ঘোড়সওয়ার এক এক করে হারাতে থাকে সব – জুতোর নাল, ঘোড়ার লাগাম, ঘোড়া চালানোর প্রান্তর, এমনকি ঘোড়াও। এই যে আগের বলা চিন্তা বা ভাবনা পরে গিয়ে উল্টো দিকে হাঁটে, এই অদ্ভুত লজিক কাফকা-সাহিত্যে বেশ কয়েকবারই ঘটতে দেখা গেছে। এই স্কেচে লজিকটি রূপ নিয়েছে এ রকম অদ্ভুতুড়ে অবস্থার: হয় প্রথমে ব্যক্ত ইচ্ছাটিই এখানে পিছু হটে গেছে, রেড ইন্ডিয়ান হয়ে প্রান্তরে ঘোড়া চালানোর আর কোনো ইচ্ছা লেখকের নেই, না হয় অন্য সবকিছু মুছে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সেই ইচ্ছাটি স্রেফ একটি ইচ্ছা হয়েই – বাস্তবের সব সংযোগবঞ্চিত অবস্থায় – ব্যক্ত থাকছে। শেষে যখন কিছুই আর টিকে নেই, সম্ভবত শুধু ইচ্ছাটুকুই রয়ে যাচ্ছে।

গাছ

ধেয়ান গল্পসংকলনের সতেরো নম্বর স্কেচ এটি, সংক্ষিপ্ততমও। কাফকা-গবেষকদের কাছে দামি এই স্কেচটি নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এটির মোটামুটি বিস্তারিত উল্লেখ এ বইয়ের 'ভূমিকা' অংশেও রয়েছে। এই রূপকাশ্রয়ী (মেটাফরিক) লেখাটি কাফকা প্রথম লেখেন সম্ভবত ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের কোনো এক সময়ে। আমরা এটি প্রথম দেখি *একটি সংগ্রামের বিবরণ* নামের নভেলার প্রথম পাণ্ডুলিপিতে। কাফকা ওখান থেকে তুলে নিয়ে এটি ছাপান মিউনিখের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা *হুইপেরিয়ন*-এর প্রথম সংখ্যায়, ১৯০৮ এর মার্চে, মোট আটটি গদ্য রচনার শেষটি হিসেবে। তখন এটির, অন্যগুলোর মতোই, কোনো নাম ছিল না; সবগুলো বেরিয়েছিল 'ধেয়ান' নামের আওতায়। কাফকা ১৯১২ সালে তাঁর প্রথম বইতে স্থান দেওয়ার সময় এটির নাম দেন 'গাছ' (ইংরেজি নামঃ 'The Trees'; মূলঃ 'Die Bäume')।

খুব ছোট এই ভাবনাটি চরিত্রের দিক থেকে একটি মেটাফর (সোজা বাংলায় 'রূপক'), যার সঙ্গে কাফকার পরের দিককার প্যারাবলগুলোর (রূপকাশ্রয়ী নীতিকথা; যেগুলো বাংলায় *গল্পসমগ্র*-র দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে) অনেক মিল রয়েছে, বিশেষ করে কাঠামোগত দিক থেকে। একটি সাধারণ উপমা দিয়ে এর শুরু – নামহীন এক '"আমরা" হচ্ছি তুষার শুয়ে থাকা গাছের গুঁড়ির' মতো। তারপর যতই লেখা আগায় আর আমরা উপমাটির ব্যাখ্যা পেতে থাকি, পুরোটা নিতে থাকে কূটাভাস (paradox) বা সোজা ভাষায় পরস্পরবিরোধিতার বা অসংগতির চেহারা। তার ফলে গাছের উপমাটি শেষে গিয়ে পুরো নাই হয়ে যায়।

লক্ষ করার বিষয়, লেখাটির মোটামুটি শুরুতে এবং শেষে – দুই জায়গাতেই আমরা পাই 'আপাতদৃষ্টিতে' কথাটুকু। সবই এখানে আপাতদৃষ্টিতে – সব মিল, উপমা, সাযুজ্যই আপাতচোখে; মানে, মনে হয় সত্যি, তবে সত্যি নাও হতে পারে। 'মনে হয়' শব্দবন্ধটিই বড় কথা; বাস্তবে কী, বা বাস্তব বলে আদৌ কিছু আছে কি না, নাকি যাকে আমরা ভাবি বাস্তব সেটিও আসলে আপাতদৃষ্টিতেই – আমরা নিশ্চিত করে জানি না। বস্তু পৃথিবীর বাইরের কোনো অর্থ, কোনো চেতনা, কোনো গূঢ় দর্শনকে কাফকা এখানে ধরতে চেয়েছেন রূপক ও উপমার মধ্য দিয়ে ('ভূমিকা'য় এ লেখাটি বিষয়ে অংশটুকু দেখুন), আর যে ভঙ্গিতে তিনি এখানে তা করতে চেয়েছেন তাতে আলংকারিক ভাষার গাঠনিক বিষয়টুকুই প্রথমে উঁচুতে উঠে গিয়ে পরে শূন্য হয়ে গেছে। এর ফলে লেখাটি পড়া শেষে আমরা এক রকম হতবাক হয়ে যাই। একসময়, কয়েকবার পড়া হলে, যতখানি মনে হয় এটি একটি ধাঁধার মতো, এখানের মূল সংকট মানবজীবনের চিরায়ত সংকট (অর্থাৎ সত্য কী, যা দেখি তা কতটুকু অলীক ভাবনা, কতটুকু সত্য; জীবনের স্থায়িত্ব কতটুকু, মৃত্যুর সাপেক্ষে জীবনের দৃঢ়তার ধারণা কতটুকু মায়া?), ততখানিই এমনও মনে হয় যে এর মূল সংকট ভাষার সংকট – আলংকারিক ভাষায় যোগাযোগের বা কোনোকিছু বোঝানোর ও তার

সত্যমূল্য নিরূপণের সংকট। কয়েকবার পড়ার পরে, কোনোভাবেই লেখাটিকে আর হেঁয়ালি বলে মনে হয় না, বরং এর মধ্যে পরম সত্যের হালকা আভাস পেয়ে আমাদের কেমন দম বন্ধ লাগে।

বিমর্ষতা

কাফকার প্রথম প্রকাশিত বই *ধেয়ান*-এর শেষ গল্প এটি, এ বইয়ের দীর্ঘতম লেখা। এটি কাফকা প্রথম তাঁর ডায়েরির দ্বিতীয় নোটবুকে লেখেন; মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ১৯০৯-এর নভেম্বর ও ১৯১১-এর মার্চের মধ্যে কোনো এক সময়ে লেখা এটি। মার্চ, ১৯১১-তে কাফকা গল্পটি ম্যাক্স ব্রডকে পড়ে শোনান। কাফকার বেশিরভাগ লেখার ক্ষেত্রেই যেটি সত্য – থেমে থেমে দীর্ঘদিন ধরে লেখা, কখনোই এক বসায় বা একটানা কয়েক দিনের মধ্যে না – সেটির ব্যতিক্রম 'বিমর্ষতা'-র বেলায়ও হয়নি। ইংরেজি নাম: 'Unhappiness'; মূল জার্মান: 'Unglücklichsein'।

ধেয়ান-এর অন্য কয়েকটি স্কেচের ক্ষেত্রে যে কথা বলা হয়েছে, 'বিমর্ষতা'য় সেই একই রকম – একদিকে ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা আর অন্যদিকে বাইরের পৃথিবীতে মানুষের সামাজিক জগৎ। ছবিটি আমাদের ইতোমধ্যেই বেশ পরিচিত: নভেম্বরের সন্ধ্যায় এক লোক তার ঘরে একা, নিঃসঙ্গতার বেদনায় পুড়ছে। তার ঘরের বাইরে রাস্তা, আর ভেতরে দেয়ালে ঝুলছে আয়না – দুটোই রূপক; বাইরে রাস্তায় তাকিয়ে সে চাইছে ওই পৃথিবীতে গিয়ে মিশে যেতে, কিন্তু আয়না তাকে ভেতরের দিকে টেনে ধরছে, শারীরিক অর্থে এবং মনের দিক থেকেও। তাই আমরা অবাক হই না, যখন দেখি আয়নায় তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে পালিয়ে যায় এই বাস্তবতা থেকে – একটি বাচ্চা ভূত এসে হাজির হয় তার ঘরে। গল্পটিতে একটু আগালেই আমরা বুঝতে পারি এই ভূত তারই মনের প্রতিবিম্ব, তারই আত্মস্বরূপ (alter ego) যাকে সে সৃষ্টি করেছে তার নিঃসঙ্গ ঘরটা ভরিয়ে তুলতে। কিন্তু এই কাল্পনিক সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ়তর করার বদলে কথক শেষে মনস্থির করল ঘর থেকে বাইরে হাঁটতে যাওয়ার। তখন সিঁড়িতে দেখা এক প্রতিবেশীর সঙ্গে – ভূতটির সঙ্গে যেমন, এ লোকের সঙ্গেও কথকের তেমনই ছাড়া ছাড়া কথাবার্তা; সম্পর্ক তৈরি হলো না এবারও। কাফকা-সাহিত্যের সংলাপ যেমন হয়, দুবারই সংলাপগুলো তেমনই: মিল ও ঐক্যতানের বদলে বেমিল ও দ্বন্দ্বই বেশি; কথা বলা দুই চরিত্রের মধ্যে সেই কথাগুলো যতটা না সেতু বানায়, তার চেয়ে বেশি করে দূরত্ব বাড়ানোর কাজ। এরই প্রতিক্রিয়ায়, বিমর্ষ হয়ে বাইরে হাঁটতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে কথক নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসে; মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা ও পরিত্যক্ত হওয়ার বোধ তাকে এতটাই ঘিরে ধরে যে সে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অভিশাপের যে কথা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আর্থার শোপেনহাউয়ার ও নিট্‌শে বলেছিলেন, এ গল্পে সেই অভিশাপ থেকে পালানোর উপায়

থাকে না, আমরা গল্পের নায়ককে দেখি সামাজিক কোনো বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে উদ্বিগ্ন, উৎপীড়িত।

প্রতিবেশী লোকটি যেভাবে বলে যে মেয়ে ভূতদের খাবার খাওয়ানো সম্ভব, তখন তার কথায় আমরা যেমন না হেসে পারি না, তেমনই অতো স্মার্ট একটি কথার সামনে কথকের (কাফকার) অসহায়ত্ব অনুভব করেও আমাদের মায়া হয়।

রায়

ফ্রানৎস কাফকার সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পগুলোর একটি, একই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মোড় ঘোরানো প্রধান কয়েকটি গল্পেরও অন্যতম। লেখার তারিখ: ১৯১২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা থেকে পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বরের সকাল ৬টা পর্যন্ত, টানা আট ঘণ্টা, এক বসায়। ইংরেজি নাম: 'The Judgement' বা 'The Verdict'; মূল জার্মান: 'Das Urteil'। প্রথম প্রকাশ কাফকার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ম্যাক্স ব্রড সম্পাদিত, নামকরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান লাইপ্‌জিগের কুর্ট ভোলফ্ প্রকাশিত বার্ষিক সাহিত্য সংকলন *আর্কাডিয়ায় (Arkadia)* ১৯১৩ সালে। এখানে কাফকা 'রায়' নামের শেষে 'একটি গল্প' কথাটিও জুড়ে দিয়েছিলেন, যেন তিনি নিশ্চিত করে জানতেন না এই লেখাটিকে সাহিত্যের কোন্ খোপে ফেলবেন। প্রকাশকের সঙ্গে চিঠিতে কাফকা কয়েকবার লেখাটিকে ছোট উপন্যাস বা নভেলা বলে দাবি করেছেন এবং তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যে 'রায়' তাঁর অন্য দুটি নভেলা *রূপান্তর* ও *দি স্টোকার*-এর সঙ্গে একত্রে, একই বইতে বের হবে, আর সে বইয়ের নাম হবে *পুত্রেরা (The Sons; Die Söhne)*। বাস্তবে সেটি তাঁর জীবদ্দশায় কখনো হয়নি। পরে ১৯১৬-তে এই গল্পটি এককভাবেই একটি বই আকারে বের হয় কুর্ট ভোলফ্ থেকেই, তাদের *নতুন দিন (The New Day)* নামের বইয়ের সিরিজের ৩৪ নম্বর খণ্ড হিসেবে। কাফকা তাতে খুশি হননি, তিনি চাইছিলেন একেবারেই আলাদাভাবে এই বই বের হোক; তিনি মনে করতেন গল্পটি 'যতটা না গল্প, তার চেয়ে বেশি কবিতা', তাই ছাপার অক্ষরে, কবিতার মতোই, দুই পাশে অনেক ফাঁকা জায়গা রাখা আবশ্যক। ১৯১৯ সালে সে চেহারা নিয়েই আবার বইটি বের হয় কুর্ট ভোলফ্ থেকে এবং এখানের লেখাটিকেই 'রায়' গল্পের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে ধরা হয়।

'রায়' লেখার মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে কাফকার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারের পরিচয় হয়। আর এটি লেখার আঠারো মাস পরে কাফকার সঙ্গে ফেলিসের প্রথম বাগ্‌দান হয়। এ গল্পটির কথা এই বইয়ের 'ভূমিকা' অংশেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। গল্পটি কাফকা উৎসর্গ করেন 'মিজ ফেলিস বি.'কে।

'রায়' গল্প লিখেই কাফকা বুঝতে পারেন যে তাঁর সত্যিকারের সৃজনী-ক্ষমতা রয়েছে এবং তাঁর পক্ষে ভালো লেখা ও বড় মাপের সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব। সে হিসেবে 'রায়'

কে বলা হয় কাফকার ব্রেক থ্রু (প্রথম প্রধান সাফল্য) রচনা, যেটি লেখার মাধ্যমে কাফকা কাফকা হয়ে ওঠেন।

১৯১২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, রায় লেখা শেষ হওয়ার পরে, কাফকা তাঁর ডায়েরিতে লেখেন: 'এই গল্পটি, নাম "রায়", আমি এক বসায় লিখলাম ২২ ও ২৩ তারিখের রাতে, রাত দশটা থেকে নিয়ে ভোর ছয়টা পর্যন্ত। বসে থাকতে থাকতে পা এমন শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে টেবিলের নিচ থেকে আমি ওদের প্রায় টেনে তুলতেই পারছিলাম না। ভয়ানক টান টান অবস্থা আর আনন্দ, কীভাবে গল্পটা আকার নিল আমার চোখের সামনে, মনে হয় যেন আমি পানির ওপর দিয়ে আগাচ্ছিলাম। ...কীভাবে সম্ভব যা চাই তা বলা, কীভাবে সবকিছুর জন্যই, এমনকি সবচেয়ে অদ্ভুত ভাবনার জন্যেও, অপেক্ষা করে থাকে এক বিশাল আগুন, যেটার মধ্যে ভাবনাগুলো পোড়ে আর আবার জেগে ওঠে। ... কেবল এরকমভাবেই সম্ভব লেখালেখি, শুধু এরকম প্রাঞ্জলতা (coherence) নিয়েই, শরীর ও আত্মা এরকম সম্পূর্ণ খুলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই।'

১৯১৩-র ১১ ফেব্রুয়ারি কাফকা ডায়েরিতে আবার লেখেন: 'আমি যখন "রায়"-এর প্রুফ দেখছি... আমার ভেতর থেকে গল্পটা বেরিয়ে এসেছিল কোনো সত্যিকারের শিশুর জন্মের মতো, কদর্য ও পিচ্ছিল নোংরায় ঢাকা, আর শুধু আমারই ছিল ওই শরীরটার কাছে পৌঁছানোর মতো হাত, আর কাজটা করার মতো ইচ্ছাশক্তির-জোর।'

ফ্রানৎস কাফকা নামের ম্যাক্স ব্রডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে লেখা জীবনীতে ব্রড লিখছেন: 'অস্কার বাউমের ওখানে কাফকা আমাদের "রায়" গল্পটি পড়ে শোনাল, তাঁর চোখে তখন পানি। কাফকা বললেন: "এই গল্পের নিঃসংশয়তা (indubitability) এখন চূড়ান্ত।" আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিশালী কথা ছিল এটি, যেমনটি কাফকার ক্ষেত্রে বিরল।'

ম্যাক্স ব্রডকে লেখা আরেকটি নোটে কাফকা বলেন: 'আমার সব লেখার মধ্যে যে কয়টি বই টিকে থাকবে তারা হলো: *রায়*, *দি স্টোকার*, *রূপান্তর*, *দণ্ড উপনিবেশে*, *এক গ্রাম্য ডাক্তার* আর ছোট গল্প: এক অনশন-শিল্পী।'

নিজের লেখার প্রতি কাফকার যে অসন্তুষ্টি, সংশয় ও সন্দেহ এবং অতৃপ্তির বোধ, (মূলত যে সমস্ত কারণে কাফকা তাঁর লেখাগুলো ম্যাক্স ব্রডকে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন), তার আলোকে 'রায়' গল্পটি নিয়ে যেরকম অ-কাফকাসুলভ আত্মবিশ্বাস, প্রশংসা ও নিঃসংশয়তা আমরা তাঁর ওপরের কথাগুলোতে দেখতে পাই, তাতে স্পষ্ট হয় যে 'রায়' কাফকার নিজের সাহিত্যিক ক্ষমতা নিয়ে আশাবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল।

কী আছে কাফকার এই বিখ্যাত গল্পটিতে? ১৯১৩-এর ১১ ফেব্রুয়ারি কাফকা ডায়েরিতে লিখেছেন গল্পের নায়ক গেয়র্গ বেন্‌ডেমান ও নায়িকা ফ্রিডা ব্রান্ডেন্‌ফেল্ড – নাম দুটি কীভাবে ফ্রানৎস কাফকা ও ফেলিস বাউয়ার নামের সঙ্গে মিলে যায়: Bende লিখতে ঠিক সে কটা অক্ষরই লাগে যেটা লাগে Kafka লিখতে, আর Bende-র স্বরবর্ণ দুটো ঠিক সেখানেই যেখানে Kafka-র স্বরবর্ণ দুটো। নামেও ততগুলোই অক্ষর যতগুলো F.-এ

[অর্থাৎ Felice-এ], আর দুটি নামেরই প্রথম অক্ষর F; Brandenfeld নামেরও প্রথম অক্ষর B [অর্থাৎ Bauer নামের যেমন]।' কেন এই চারটি নামের মধ্যেকার মিল প্রতিষ্ঠার এই চেষ্টা? এটি কি তাহলে কাফকার নিজের জীবনেরই গল্প?

গল্পটিও বেশ সরল, সোজা। গেয়র্গ বেন্‌ডেমান নামের এক তরুণ ব্যবসায়ী রাশিয়ায় বসবাসরত বন্ধুকে চিঠি লিখে জানাচ্ছে যে তার বাগ্‌দান হয়ে গেছে ফ্রিডা ব্রান্ডেন্‌ফেল্ড নামের অবস্থাপন্ন ঘরের এক মেয়ের সঙ্গে। চিঠিটি ডাকে দেওয়ার আগে সে তার বাবাকে জানাল এই চিঠির কথা। বাবা তার ওপর ক্ষিপ্ত হলেন ছেলে ইদানীং তার কাছে তাদের পারিবারিক ব্যবসার অনেক কিছু লুকাচ্ছে বলে। একসময় বাবা গেয়র্গকে খোঁটা দিলেন যে তার এই রাশিয়ার বন্ধুটি তার স্রেফ মনগড়া, তার ওরকম কোনো বন্ধুই নেই। গল্পের দ্বিতীয় অংশটি মনে হয় পরাবাস্তব, যেখানে বাস্তবের কোনো লজিকই আর কাজ করছে না; বাবা স্বীকার করলেন গেয়র্গের ওই বন্ধুকে তিনি চেনেন, ছেলেকে তিনি দোষী করলেন কোথাকার এই এক মেয়ের শরীরের লোভে তাকে বিয়ে করতে মনস্থির করার জন্য, এই মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়ে তার মায়ের স্মৃতিকে অপমান করার জন্য এবং নিজের বাবাকে কম্বলে মুড়ে দিয়ে কবর দিতে চাইবার জন্য। একসময় ছেলেকে 'শয়তানের মতো এক মানব সন্তান' বলে তিনি তাকে পানিতে ডুবে মরার মৃত্যুদণ্ড দিলেন। ছেলে এই দণ্ড মেনে নিয়ে দৌড়ে বাসার সামনের এক ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

মানে কী এই অদ্ভুতুড়ে কাহিনির? অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসে এই ভয়ংকর ও নৃশংস গল্পটি পড়া শেষ হলে। ডব্লিউ এইচ অডেন যেমন বলেছেন: '"রায়" গল্প পড়া হলে "আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়।"' আমরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভাবি (বা নিজেদের প্রশ্ন করি): রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকা গেয়র্গের এই বন্ধুর তাৎপর্য কী? সে কি আসলেই আলাদা কেউ নাকি সে গেয়র্গের alter-ego (আত্মসত্তা)? ছেলে বিয়ে করে সংসার গড়তে চাইছে বলে কেন তার বাবার মৃত্যুদণ্ডের মতো এত কঠিন শাস্তি দেওয়া? কেন গেয়র্গ সেই শাস্তি মেনেও নিল, নিজেই তা কার্যকরও করল? কিসের পাপবোধে ভুগছে সে? কোনো প্রতিবাদ নেই কেন তার? সে কি নিরপরাধ কিন্তু অন্যায় এক রায়ের বা অবিচারের শিকার? বাবা কি বিচারকের আসনে বসে আছেন, নাকি যে তিনি সত্যিকারের কোনো আদালতের মতো মৃত্যুদণ্ডের রায় পড়লেন? গেয়র্গের অপরাধের ভিত্তি কী – ব্যবসায়ে বাবার স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বে ভাগ বসানো? বুড়ো বাপকে একা ফেলে নতুন বউ নিয়ে অন্য বাড়িতে ওঠার স্বপ্ন দেখা? নাকি বিয়ে করে সত্যিকারের পুরুষ হতে চাওয়া, যখন কিনা তার এককালের শক্তসমর্থ বাবা অথর্ব, ভঙ্গুর ও বুড়ো হয়ে গেছেন? এই ধাঁধাভরা প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলেই 'রায়' গল্পের পাঠ-পর্যালোচনার আর দরকার হতো না। কাফকা নিজেও সে উত্তর খুঁজে পাননি: প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারকে তিনি জানিয়েছিলেন যে এই গল্পের 'ব্যাখ্যা করা অসম্ভব'।

কাফকার নিজের অনেকগুলো সংকট এই গল্পে দৃশ্যমান। এর পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব বাবার সঙ্গে কাফকার সম্পর্কেরই প্রতিচ্ছবি। এ গল্পে ইহুদিধর্মে কাফকার সংশয়যুক্ত বিশ্বাসের

ছবিও দেখা যায়। এটি লেখার অল্প কদিন আগে ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তাঁর মানসিক অবস্থা তখন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। কাফকা ডায়েরিতে লেখেন যে, গল্পটি লেখার সময় 'ফ্রয়েড নিয়ে ভাবনা, স্বাভাবিকভাবেই' তাঁর মাথায় এসেছিল। বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থায়, আবেগের দ্বৈত রূপ এখানে স্পষ্ট: গেয়র্গ সফল এক ব্যবসায়ী; তার রাশিয়ার বন্ধুর প্রতি সে কর্তৃত্বসুলভ মায়া ও বিরক্তি বোধ করে। বন্ধুকে সে তার বাগ্‌দানের কথা বলতে চায় না কারণ তার ভেতরে এই বোধ কাজ করে যে বাগ্‌দান করে ফেলার মাধ্যমে সে তার অবিবাহিত, নিঃসঙ্গ বন্ধুর প্রতি প্রতারণা করেছে। তার বাগ্‌দত্তা যখন তাকে বলে 'তোমার যদি ওরকম বন্ধু থাকে গেয়র্গ, তোমার তো তাহলে বিয়ের জন্য বাগ্‌দান করাই ঠিক হয়নি' তার মানে ওরকম বন্ধু আর বিয়ে একসঙ্গে যায় না, যেমন কাফকা ভাবতেন যে বিয়ে ও লেখালেখি একসঙ্গে যায় না। এবার আসি বাবার বিষয়ে। গল্পটিতে আপাতচোখে মনে হয়, গেয়র্গ বাবার প্রতি দায়িত্বশীল এক ছেলে। কিন্তু আমরা দেখি, সন্ধ্যাগুলো আসলে বাবার সঙ্গে না কাটিয়ে সে কাটায় বন্ধুদের বা তার বান্ধবীর সঙ্গে; দুপুরের খাবার তারা একই সময়ে খায়, কিন্তু একসঙ্গে না; বাবাকে সে হঠাৎ করে বলে বসে, 'এক হাজারটা বন্ধু মিলেও আমার বাবার সমান হতে পারবে না,' যেন তার বাবা তার পিতৃস্নেহ নিয়ে তাকে সন্দেহ করছেন; তারপরে আমরা দেখি, বিয়ের পরে বাবাকে কে দেখভাল করবে, তা গেয়র্গ আসলেই ভাবেনি; সে বাবাকে ঢেকে দিতে চায় কম্বলে – এর মানে বাবাকে রক্ষা করা বা কবর দেওয়া, দুই-ই হতে পারে।

কিন্তু তার বাবা ঢাকা পড়তে অসম্মতি জানান। গেয়র্গ ফ্রিডার সঙ্গে ঘর করতে চায় এই কারণে তাকে বাবার কাছ থেকে শুনতে হয় যে সে তার মায়ের স্মৃতির প্রতি অসম্মান করেছে, বন্ধুর প্রতি প্রতারণা করেছে, বাবাকেও ঠকিয়েছে। কীভাবে মায়ের স্মৃতিকে অসম্মান করল সে? এর কোনো উত্তর নেই। শেষে বাবা বলে বসলেন এমন এক কথা যা আক্ষরিক অর্থে অর্থহীন এক প্রলাপ বাক্য, কিন্তু যা আসলে পুরো গল্পেরই মূল বাক্য: 'নিরপরাধ একটা শিশু তুমি, সত্যিই, কিন্তু আরো বড় সত্যি হচ্ছে তুমি একটা শয়তানতুল্য মানুষ!' এই যে 'সত্যিই...আরো বড় সত্যি' – ভাষাগত দিক থেকে কথাটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অর্থের দিক থেকেও দ্বিগুণ ধাঁধালো। এর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে গেয়র্গ (বাকি সবার মতোই) দুই চেহারা নিয়ে বাস করে। একদিকে সে স্বাভাবিক, আত্মকেন্দ্রিক, প্রাণশক্তিতে ভরা এক যুবক। তার নৈতিকতা অত জোরালো নয়, তাই সে 'শিশু'র মতো। ওরকম অনৈতিক পৃথিবীতেই সম্ভব বাবাকে সরিয়ে দেওয়ার, বন্ধুর ওপরে জেতার ও ফ্রিডাকে ভোগ করার ইচ্ছা পোষণ করা – সবই ক্ষমতাশালী হওয়ার ইচ্ছা। কাফকা নিট্‌শে পড়েছেন এবং এই অনৈতিক (আর অনৈতিক বলেই শিশুসুলভ) ইচ্ছেটি নিট্‌শেয়ান ইচ্ছে। এর বিপরীতে, অন্য দিকে, আছে নৈতিক পরম সত্যগুলো, যেগুলো কাফকা ধার করেছেন কান্ট থেকে। কান্টের কঠোর নীতি-নৈতিকতার মানদণ্ডে গেয়র্গ শয়তানরূপী এক মানুষ। এই দুই চেহারার দুই গেয়র্গের কখনো এক গেয়র্গ হওয়া সম্ভব নয়। বাবার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে নিট্‌শেয়ান ক্ষমতালিপ্সু গেয়র্গ হেরে যায়

ক্ষমাহীন, কঠোর নৈতিক কান্টিয়ান বিচারের কাছে, নিজেকে তখন ধ্বংস করে দেওয়া ছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না।

কিন্তু এ কথার মধ্যে ফাঁক আছে। গেয়র্গের বাবা যদি হন নৈতিকতার প্রতিমূর্তি, তাহলে তিনি এত বছর চুপ থেকে যেভাবে শেষে ছেলের ওপর নিজের ক্ষমতা জাহির করলেন, সেটিও ক্ষমতালিপ্সাই, যার ফলে শেষমেশ বাবা বরং সন্তানের চেয়ে বেশি নিট্‌শেয়ান ও কৌশলের দিক থেকে বেশি সফল। গল্পের এই যে দুই মূল্যবোধ – এক যুবকের কামনা যা স্বাভাবিক ও নিষ্পাপ, তা একই সঙ্গে শয়তানসুলভ ও দুষ্ট – এই দুইকে ফুটিয়ে তুলতে কাফকার এরকম অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে ভরা ভাষাই দরকার ছিল যা তিনি 'রায়' গল্পে সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন।

রায় গল্পে এতকিছুর পরোক্ষ-উল্লেখ (allusion) আছে যে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে যাই। খ্রিষ্টধর্মের পরোক্ষ-উল্লেখ এখানে এসেছে বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে: যিশুর সঙ্গে পিটার বিশ্বাসভঙ্গ করেছিলেন, তেমনটাই বুঝি গেয়র্গ করল তার সেন্ট পিটার্সবার্গের বন্ধুর সঙ্গে। সফল ছেলে যেভাবে বুড়ো বাবাকে অবহেলা করছে তাতে খ্রিষ্টধর্ম ও এই ধর্মের সঙ্গে তার পিতৃতুল্য ইহুদিধর্মের সম্পর্কের কথা মনে আসে। খ্রিষ্ট ধর্মবিশ্বাস কাফকার পৃথিবীতে এসে আরো প্রাচীন ইহুদিধর্মকে ছাড়িয়ে গেছে, যেভাবে ছেলে এখানে ছাড়িয়ে গেছে বাবাকে। কিন্তু এই দুই ধর্মের মধ্যেকার নিষ্ঠুর ইতিহাস, যেখানে বেশিরভাগ সময়েই ইহুদিরা মার খেয়েছে, যেন আমাদের পিতৃতুল্য ধর্মটি নিয়ে খ্রিষ্টানদের অস্বস্তির কথাই জানান দেয়; সেই পিতৃতুল্য ধর্ম রাজি হয় না কম্বলে মুড়ে থাকতে। বাবা যেভাবে হুংকার দিয়ে এখানে পৃথিবীতে ফেরত আসেন, বিজয়ী হন, তা কাফকার সময়ের সব জায়োনিস্টেরই স্বপ্নের সমান্তরালি – এই স্বপ্ন যে, ইহুদিধর্ম একদিন খ্রিষ্টধর্মের শাসনকে সরিয়ে আবারও পৃথিবীতে জায়গা করে নেবে।

গল্পের প্রথম ভাগ খুব বাস্তববাদী ঢঙে বলা। গেয়র্গের ব্যবসা যে পাঁচ গুণ বেড়েছে, এ রকম খুঁটিনাটি বাস্তব তথ্যও আমরা জানতে পারি সেখানে; বাগ্‌দত্তা মেয়েটির প্রতি তার সুপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষাও আমরা বুঝি। তবে গেয়র্গ বাবার অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই সব বদলে যায়। আধো অন্ধকারে অশুভ কিছুর ইঙ্গিত পাই আমরা; শেষে বাবা এমনভাবে ছেলেকে শেষ করে দেন যা বাস্তবিক অর্থে অসম্ভব ও অবাস্তব এক দৃশ্য। এভাবেই গল্পের দ্বৈত মূল্যবোধ, গল্প বর্ণনার দুই আলাদা ভুবনের মধ্যেও ছায়া ফেলে। বাস্তববাদী কথনভঙ্গি হয়ে যায় পরাবাস্তবতাবাদী বা, কমের পক্ষে, এক্সপ্রেশনিস্ট ভঙ্গি বা অ্যাবসার্ড ভঙ্গি। এটা করে কাফকা পাঠকের সঙ্গে লেখকের চুক্তিটিও ভেঙে ফেলেন। আমরা পাঠক হিসেবে সব সময়েই চাই যে, যে ভঙ্গিতে বা শৈলীতে একটি গল্প শুরু হয়েছে, একইভাবে তার শেষ হবে। কিন্তু এখানে তা হয় না – আমরা শুরুতে যা আশা করি যে হবে, তার সবই শেষে এসে দখলে চলে যায় যুক্তিহীনতার ও আবেগের নিষ্ঠুর চোরাগলির। কোন্‌টি বাস্তব পৃথিবীর ইমেজ? গল্পটি যেভাবে বোধগম্যতার মধ্যে দিয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দরের প্রত্যাশা জাগিয়ে শুরু হয়েছিল সেটি? নাকি যেরকম অনিশ্চয়তা ও খামখেয়ালের মধ্যে

দিয়ে শেষ হয়েছে সেটি? 'রায়' আমাদের সামনে দুটিকেই তুলে ধরে, কিন্তু আমরা কোন্‌টা বেছে নেব, সে কথা বলে দেয় না।

টীকা:

সেন্ট পিটার্সবুর্গ (পৃ. ১৪৫): পিটারের শহর (রোম); এ গল্পের খ্রিষ্টীয় পরোক্ষ-উল্লেখের এই-ই শুরু।

রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত (পৃ. ১৪৬): ১৯০৫-এর ব্যর্থ বিপ্লবের পরের অনিশ্চয়তার কথা বলা হচ্ছে।

কিন্তু সেটার দায় তো আমাদের দুজনেরই (পৃ. ১৪৮): কাফকা এটি খোলাসা করেননি যে এখানে দুজন বলতে কোন দুজনকে বোঝানো হচ্ছে: গেয়র্গ ও ফ্রিডা, নাকি গেয়র্গ ও তার রাশিয়ার বন্ধু।

আমাদের প্রিয় মা মারা যাওয়ার পর থেকে (পৃ. ১৫০): এই অদ্ভুত বাক্যটিতে বোঝা যাচ্ছে গেয়র্গের বাবা তার মৃত স্ত্রীকে গেয়র্গের মা হিসেবে দেখতেন, সেই সঙ্গে তার নিজের মা হিসেবেও।

রাশিয়ার বিপ্লব নিয়ে কীসব অবিশ্বাস্য গল্প (পৃ. ১৫১): ১৯০৫-এর বিপ্লব, যেখানে যাজক ফাদার গ্যাপন বিরাট এক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখানে যাজককে আমরা দেখি নিজেকে আহত ও রক্তাক্ত করে জনতাকে খেপিয়ে তুলছে। গল্পের অন্যতম প্রধান অংশ কিয়েভের এই যাজকের দৃশ্যটুকু।

সে আমার এমন একটা ছেলে হতো, যে কিনা আমারই ছায়া (পৃ. ১৫৩): ইংরেজিতে 'He would have been a son after my own heart'। এই বাক্যে বাইবেলের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে: 'প্রভু তাঁর মধ্যে চাইলেন এমন এক মানুষ যে তাঁরই ছায়া' (স্যামুয়েল ১৩:১৪)।

ফাঁকা, লুট হয়ে যাওয়া দোকানের (পৃ. ১৫৩): সম্ভবত কাফকা ইহুদি-বিদ্বেষী দাঙ্গার কথা বলছেন।

সত্যিই, কিন্তু তারচেয়েও বড় সত্যি (পৃ. ১৫৫): আক্ষরিকভাবে দেখলে, অর্থহীন, অ্যাবসার্ড একটি কথা বা বাচনভঙ্গি।

পানিতে ডুবে মরার মৃত্যুদণ্ড (পৃ. ১৫৫): হজরত মুসার সঙ্গে পালানো ইজরায়েলিদের ধাওয়া করা মিসরীয় ফেরাউনদের পরোক্ষ-উল্লেখ। খোদার শাস্তি হিসেবে তারা সমুদ্রের পানিতে ডুবে মরেছিল (বাইবেল, এক্সোডাস ১৪ : ২৮)।

মুঠিতে তখনো রেলিংটা ধরে (পৃ. ১৫৬): গেয়র্গের সেতুর রেলিং ধরে এভাবে ঝুলে থাকার মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পরোক্ষ-উল্লেখ আছে। একটু আগে ঠিকা-ঝিও 'যিশু' বলেই চিৎকার দিয়েছিল।

দি স্টোকার – *একটি খণ্ডাংশ*

ফ্রানৎস কাফকার প্রথম উপন্যাস *Der Verschollene,* ম্যাক্স ব্রড যার ইংরেজি নাম দেন *Amerika* এবং যা অবশেষে মূলের সঙ্গে সংগতি রেখে এখন বাজারে এসেছে *The Man Who Disappeared* বা *The Lost One* নামে (বাংলায় বলা যায় *নিখোঁজ মানুষ*); সেটির প্রথম অধ্যায়ের নাম 'দি স্টোকার' (ইংরেজিতে The Stoker; মূল: 'Der Heizer')। 'স্টোকার' শব্দটির কোনো জুতসই বাংলা প্রতি শব্দ নেই। জাহাজের ইন্‌জিনের চুলায় কয়লা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত শ্রমিককে বলা হয় Stoker। সোজা অর্থে, জাহাজের বয়লার রুমে

(যেখানে পানি গরম করে বাষ্প করা হয়) কাজ করা কয়লা শ্রমিকই হচ্ছে স্টোকার।

কাফকা *আমেরিকা* বা *নিখোঁজ মানুষ* উপন্যাসের এই প্রথম অধ্যায়টি একটি আলাদা বই হিসেবে প্রকাশ করেন জার্মানির প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা কুর্ট ভোলফ্ থেকে ১৯১৩ সালের মে মাসে, নাম দেন 'Der Heizer: Ein Fragment' ('The Stoker: A Fragrment'; বাংলায় 'দি স্টোকার: একটি খণ্ডাংশ')। কাফকা এটি লেখেন ১৯১২-র সেপ্টেম্বরে, অর্থাৎ 'রায়' গল্পটি লেখার সেই উত্তুঙ্গ আনন্দ ও তৃপ্তির পরপরই। এটি লিখতে তাঁর প্রায় এক সপ্তাহ লেগে যায়; অক্টোবরের ২ তারিখ নাগাদ শেষ হয় লেখা। কাফকা এর পরে উপন্যাসের অন্য অধ্যায়গুলোও লিখতে থাকেন ১৯১৩-এর জানুয়ারি পর্যন্ত, মাঝখানে শুধু থামেন 'রূপান্তর' গল্পটি লিখতে (১৯১২-এর মধ্য নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত)।

১৯১৩-এর ১০ মার্চ কাফকা তাঁর প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারকে চিঠিতে লেখেন যে *নিখোঁজ মানুষ* উপন্যাসের এই প্রথম অধ্যায়টিই (দি স্টোকার) উপন্যাসের একমাত্র অংশ, যা তাঁর 'ভেতরকার সত্য'র প্রতিনিধিত্ব করছে, এর পরের অধ্যায়গুলোতে অনুভূতির সেই জোরালো ধার নেই যা এই অধ্যায়ে আছে। এর কাছাকাছি কোনো একটা সময়েই কাফকা 'দি স্টোকার'কে আলাদা একটি লেখা বা বই হিসেবে প্রকাশের ব্যাপারে মনস্থির করেন। কুর্ট ভোলফ্ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের 'নতুন দিন' ('The New Day') সিরিজের বইগুলোর ৩ নম্বর খণ্ড বা বই হিসেবে এর প্রকাশ হয়, আগেই বলেছি, ১৯১৩-র মে মাসে। ১৯১৬-তে বের হয় দ্বিতীয় সংস্করণ, আর ১৯১৮-র বসন্তে তৃতীয়। দ্বিতীয় সংস্করণে কাফকা প্রথমটি থেকে সামান্য কিছু পরিবর্তন করেন এবং এটিকেই এখন ধরা হয় 'দি স্টোকার'-এর প্রামাণ্য সংস্করণ (Definitive Edition বা Critical Edition)।

১৯১৩-র এপ্রিলে প্রকাশকের কাছে লেখা একটি চিঠিতে কাফকা বলেন যে, তাঁর তিনটি খুদে উপন্যাস বা নভেলা: *দি স্টোকার*, *রায়* (এটিকে তিনি গল্প না বলে নভেলা বলতেন) এবং *রূপান্তর* দুই মলাটের মধ্যে একসঙ্গে তিনি একটি বই হিসেবে প্রকাশের স্বপ্ন দেখেন এবং সে বইয়ের নাম হবে *পুত্রেরা* (*The Sons; Die Söhne*)। এই স্বপ্ন কখনো বাস্তবে রূপ নেয়নি।

'দি স্টোকার' (সেই অর্থে পুরো *আমেরিকা* বা *নিখোঁজ মানুষ* উপন্যাসটিই) কাফকার অন্য সব লেখা থেকে আলাদা। এর গল্প, বলার শৈলী, গল্প এগিয়ে যাওয়ার ভঙ্গি – সবই বাস্তববাদী (realistic) ঘরানার। এই প্রথম কাফকার কোনো লেখায় পুরো প্রেক্ষাপট – নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট স্থান ইত্যাদি – বাস্তবের চেহারা নিয়েই উপস্থিত। খুবই প্রথাগত ভঙ্গিতে তিনি পুরোটা গল্পটা বলে গেছেন বেশ কৌতুকী এক কায়দায়। উপন্যাসের (এই গল্পের বা উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায়ের নয়) শেষ অধ্যায়টি বাদ দিলে লেখাটিকে মনে হবে ডিকেন্সের লেখায় অনুপ্রাণিত – ডিকেন্সের সেই বাস্তবানুগ শৈলী, সরল গদ্য, সামাজিক স্তরভেদের বিশ্লেষণ, সামাজিক অন্যায় অবিচারের ছবি আঁকার প্রবণতা – সবকিছু। কাফকা বাস্তবেও এ সময়ে খুব চার্লস ডিকেন্স পড়তেন এবং তিনি ডায়েরিতে এ উপন্যাস প্রসঙ্গে

লিখেছিলেন: 'এখন দেখতে পাচ্ছি, আমার ইচ্ছা ছিল ডিকেন্সিয়ান একটা উপন্যাস লেখার, যা আমাদের আধুনিক সময়ের কাছ থেকে নেওয়া ধারালো আলোতে সমৃদ্ধ, আর আমার ভেতরকার মলিন আলোতেও যা ভরপুর।'

'রায়' বা 'রূপান্তর' গল্পের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা এখানে দেখি এক বাস্তবানুগ কথক ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বিষয়ে জানার দিক থেকে এর সীমিত জ্ঞানের নায়ককে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই কথক যেভাবে নায়কের ও অন্যান্য চরিত্রের চিন্তাভাবনা বিষয়ে নানা তথ্য আমাদের সামনে হাজির করছে, সে রকম কোনো সর্বত্রব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী কথকের উপস্থিতি কাফকার অন্য আর কোনো লেখার শৈলীতেই অনুপস্থিত বা অতি দুর্লভ। 'দি স্টোকার' কাফকার সবচেয়ে বেশি সামাজিক খুঁটিনাটি ও পরিপার্শ্বিক আবহ ফুটিয়ে তোলা লেখা, যেখানে নানা ভাষা ও নানা জাতির বিশাল আমেরিকায় জাতিগত ভেদ, এ-সম্পর্কিত চাপ ও উত্তেজনা এবং কুসংস্কারগুলো দৃশ্যমান – কাফকা তাঁর নানা জাতির অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের এই চাপ ও উত্তেজনার ছবিটিই হয়তো আমেরিকার প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আমরা এখানে দেখি কার্ল জাহাজে তার সহযাত্রী স্লোভাকদের ব্যাপারে নানা মানসিক কু-ধারণায় ভুগছে, যেভাবে জার্মান স্টোকার তার রুমানিয়ান বস শুবালকে নিয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণার আগুনে পোড়ে। তেমনি আমরা আরো দেখি কার্ল নিজেকে বলছে যে অভিবাসী আইরিশ আমেরিকানদের থেকে সাবধান থাকতে হবে, যাদের নাকি কুখ্যাতি আছে নবাগত অভিবাসীদের ঠকানোর ও ব্যবহার করার। এ গল্পের আমেরিকান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংগতি রেখেই এর থিমও স্বাধীনতার সমস্যা, ব্যক্তির স্বশাসন ও স্বতন্ত্রতা, বিচারের নামে প্রহসন এবং সম্পদ বা পুঁজির ও তা থেকে উদ্ভূত সামাজিক ক্ষমতাবিন্যাসের চেহারাকে তুলে ধরা।

এ গল্পে হাস্যরসের কোনো কমতি নেই। কার্লকে আমেরিকাগামী জাহাজে তুলে দেওয়া হয়েছে এক কাজের মেয়ের গর্ভে তার ঔরসে সন্তান আসার দায়ে; মাত্র ষোলো বছরের কিশোর ছেলে সে, কাজের মেয়ে ইয়োহান্না ব্রামার তাকে যৌন অর্থে যেভাবে ব্যবহার করেছে তা – এত বাস্তববাদী একটি গল্পেও – ভয়ানক কাফকায়েস্ক। গল্পের শেষে আমরা দেখি জাহাজের খুব ক্ষমতাশালী অতিথিটিকে – সিনেটর এডওয়ার্ড জ্যাকব, কার্লের মামা, যাকে সেই ইয়োহান্না ব্রামারই চিঠি লিখে জানিয়েছে তার সঙ্গে কার্লের সম্পর্কের কথা এবং কার্ল যে এই জাহাজে আমেরিকা যাচ্ছে, সে কথা। এই মামার সঙ্গেই জাহাজ ত্যাগ করে কার্ল, আমরা বুঝতে পারি স্টোকারে কপালে শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি আছে; তার মামার হিসেবে স্টোকারের সঙ্গে তার বস্ শুবালের ঝগড়াঝাঁটির পুরো ব্যাপারটি ন্যায় বা অন্যায়ের নয়, বরং শৃঙ্খলার বিষয়। কার্ল একদম শেষে স্টোকারের সঙ্গে যে রকম মানসিক একাত্মতা বোধ করে ও তার জন্য চোখের পানি ফেলে, তাতে আমরা অবাক হয়ে যাই কাফকাও যে এমন মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতার দলিল লিখতে পারেন, তা দেখে! ক্ষমতাবান মামার হাত ধরেই আমেরিকায় নামে কার্ল, আমাদের মনে আশা জাগে এই বাচ্চা ছেলেটি মামার ছায়ায় ও প্রভাবের বলয়ের মধ্যে থেকে এই সব-সম্ভবের-দেশ আমেরিকায় বোধ হয় ভালো করবে।

এ গল্পটি নিয়ে আর যে কথাটি শুধু বলার থাকে তা হলো, মনোযোগী পাঠক ঠিকই এ গল্পের ডিকেন্‌সিয়ান বাস্তবতার আড়ালে কাফকার চিরাচরিত মোটিফটি লক্ষ করবেন: দম আটকানো, অন্যায় ও বিমূর্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার মধ্যে নানা অদ্ভুতুড়ে ঘটনাকে তাড়িয়ে বেড়ানো একাকী নায়ক কার্ল যেভাবে তার নিজের ও স্টোকারের নিষ্পাপতা ও সরলতাকে জাহাজের একদল ক্ষমতাশালী লোকের সামনে – যেন দূরের কোনো রহস্যময় কর্তৃপক্ষের সামনে – ব্যর্থভাবে তুলে ধরতে চাইছে, তা যেমন হাস্যকর, তেমনই যথেষ্ট কাফকায়েস্ক ভীতি ও চাপা উত্তেজনায় ভরা। এর বাদে এটুকুই বলা যায় যে, পাঠক এ গল্প পড়তে পড়তে একটু পরপরই মুচকি হাসবেন এবং কাফকার চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনা বর্ণনার বিশাল ক্ষমতা দেখে অবাক হবেন।

'দি স্টোকার'ই কাফকাকে এনে দিয়েছিল লেখক হিসেবে তাঁর করতলগত একমাত্র সাহিত্য পুরস্কার – ১৯১৫ সালের থিওডর ফন্‌তান্‌ প্রাইজ। খ্যাতনামা জার্মান নাট্যকার ও ছোটগল্প লেখক কার্ল স্টার্নহাইম (১৮৭৮-১৯৪২), যিনি ব্যক্তিজীবনে ছিলেন বিরাট ধনী একজন মানুষ, পুরস্কারটি পেলেও 'দি স্টোকার' লেখায় মুগ্ধ হয়ে ফ্রানৎস কাফকাকে তিনি এটি দান করে দেন। সে অন্য এক বিরাট কাহিনি।

রূপান্তর

ফ্রানৎস কাফকার সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প এটি এবং এর প্রথম লাইন: 'এক সকালে গ্রেগর সামসা অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখল সে তার বিছানায় এক দৈত্যাকার পোকায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে আছে' – বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যের সব গল্পের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও সবচেয়ে পরিচিত প্রথম লাইন। এই গল্পটি নিয়ে এত শত, আরো নিখুঁত করে বললে, এত হাজার বই বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে যে, এই সামান্য কটি পাতায় এর প্রেক্ষাপট ও পাঠ-পর্যালোচনা লেখার চিন্তাটিই একটি ভীতিকর ব্যাপার।

এই গল্পটি, যাকে খুদে উপন্যাস বা নভেলাও বলা হয়, কাফকা লেখেন তাঁর 'ব্রেক থ্রু' গল্প 'রায়' লেখার মাত্র দু মাসের মাথায় – ১৯১২-এর ১৭ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে। কাফকা এই 'ছোট গল্পটি' লেখার চিন্তার কথা প্রথম বলেন ১৭ নভেম্বর তারিখে তাঁর প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারকে। তিনি বলেন, এই গল্পের ধারণাটি তাঁর মাথায় আসে ইদানীং একদিন অলসভাবে বিছানায় শুয়ে থাকার সময়ে। ১৯১২-এর ১৫ ডিসেম্বরে কাফকা তাঁর বন্ধুমহলে গল্পটি পড়েও শোনান; এরপর তাঁর বন্ধু, লেখক ফ্রানৎস ভেরফেল, কাফকার প্রকাশক কুর্ট ভোলফ্‌কে জানান এ গল্পের কথা। ১৯১৩-এর ২৪ মার্চ কাফকা একটি পোস্টকার্ডে ভোলফ্‌কে লেখেন: 'প্রিয় জনাব ভোলফ্‌, ভেরফেল্‌কে বিশ্বাস করবেন না! সে আমার গল্পের একটা শব্দও আসলে জানে না। যেইমাত্র গল্পটা ঠিকঠাকভাবে কাগজে তোলা শেষ হবে, আমি নিশ্চিত খুশি মনেই আপনার কাছে তা পাঠিয়ে দেব।'

'রূপান্তর' ছাপার অক্ষরে প্রথম বের হয় *হুইপেরিয়ন* পত্রিকার সেই ফ্রানৎস ব্লাই

সম্পাদিত (পরে, গল্পটি বের হবার সময়, রেনে শিক্‌কেলে ছিলেন এর সম্পাদক) আরেকটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা *The White Pages* (*Die Weissen Blätter*)-এর অক্টোবর, ১৯১৫ সংখ্যায়। এই সাময়িকী কাফকার প্রকাশক কুর্ট ভোলফ্ প্রকাশনী সংস্থার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। লেখাটি শেষ হওয়ার তারিখ (৬ ডিসেম্বর, ১৯১২) ও প্রকাশনার তারিখের (অক্টোবর, ১৯১৫) মধ্যে দীর্ঘ প্রায় তিন বছরের ব্যবধানের কারণ ছিল: ১. *The White Pages* সাময়িকীর সম্পাদকমণ্ডলী বদল হওয়া; ২. প্রকাশনা সংস্থা ফিশার ফেরলাগের সাহিত্য সাময়িকী *Die neue Rundschau (The New Review)*-তে এটি ছাপানোর পরিকল্পনা চলছিল। শেষে *রূপান্তর* আলাদা বই হিসেবে বের হয় কুর্ট ভোলফ্ সংস্থার 'The New Day' অথবা 'Judgement Day' ('Der jüngste Tag') বই সিরিজের ২২/২৩ নম্বর বই হিসেবে ১৯১৫-সালের নভেম্বরে, *The White Pages* সাময়িকীতে লেখাটি বের হওয়ার অল্প দিন পরেই। ১৯১৫-তে বের হওয়া এই বইটির প্রুফ কাফকা নিজে দেখেছিলেন বলেই, এটিকেই ধরা হয় এই গল্পের চূড়ান্ত (definitive) রূপ বা সংস্করণ হিসেবে। এ বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী ওটোমার স্টার্কে; ছবিতে দেখা যায় বাথরোব পরা বাবা পোকা হয়ে যাওয়া ছেলে গ্রেগর সামসার ঘরের খোলা দরজার সামনে ভয়ে ঘৃণায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন। কাফকা জানতে পারেন যে, প্রকাশক বইয়ের প্রচ্ছদে একটা পোকার ছবি দিতে মনস্থির করেছেন। ত্বরিত কাফকা চিঠি লিখে জানান, কোনোভাবেই এ পোকাটি ছবি এঁকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে না; ১৯১৫-র ২৫ অক্টোবর কাফকা কুর্ট ভোলফ্‌কে লেখেন: 'না, দয়া করে ওই কাজ করবেন না! ...এই পোকা আঁকা অসম্ভব। এটাকে দূর থেকে দেখানোও যাবে না।' 'রূপান্তর' গল্পের ইংরেজি নাম 'The Metamorphosis' বা 'The Transformation'; মূল জার্মান নাম: 'Die Verwandlung' (উচ্চারণ: ডি ফারভানড্‌লুঙ)।

'রূপান্তর' গল্পটি বেশ সরল একটি গল্প; কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই (যে কথা কাফকার সব লেখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) টান টান এই গল্পটি এক বসাতেই পড়ে শেষ করা সম্ভব। গ্রেগর সামসা নামের ভ্রাম্যমাণ সেলস্‌ম্যান এক যুবক এখানে এক ভোরে তার বিছানায় উদ্বেগাকুল স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, দেখে সে একটা বিশাল গুবরে পোকা (beetle) বা তেলাপোকা (cockroach) হয়ে গেছে। তার এই মানুষ থেকে পোকায় রূপান্তরের আগে সে ছিল পুরো পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি – পরিবারে আছে তার বাবা-মা ও তার ছোট বোন গ্রেটে সামসা। গ্রেগর শুরুতেই তার অফিসের কাজের দুর্বিষহ কষ্ট নিয়ে কথা বলতে থাকে। তার রূপান্তর একদিক থেকে দেখলে তার জন্য আশীর্বাদও বটে – ভ্রাম্যমাণ সেলস্‌ম্যানের চাকরির পীড়ন ও জ্বালা থেকে মুক্তি মেলে তার। এ অর্থেই তার রূপান্তর অনেকটা সিগমুন্ড ফ্রয়েড কথিত 'ইচ্ছাপূরণ কল্পনা'র (wish-fulfillment fantasy) মতো। তবে ফ্রয়েডের সূত্র ধরেই, গ্রেগরের মনের গোপন ইচ্ছা (অর্থাৎ এই কষ্টকর চাকরির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির ইচ্ছা) এতে পূরণ হয় ঠিকই, কিন্তু তার বিবেকের পীড়া তাকে মুক্তি দেয় না: পরিবারকে পথে বসানোর

পীড়া এবং অলস, কাজ-ফাঁকি দেওয়া মানুষ/পোকা হয়ে যাওয়ার পীড়া। এ কারণেই তার এই রূপান্তর কোনো ইতিবাচক রূপান্তর নয়, এটি একটি নেতিবাচক পরিস্থিতি – একজন সুস্থ-সমর্থ উপার্জনক্ষম মানুষের পরগাছা হয়ে যাওয়ার কাহিনি। গ্রেগর আসলেও পরিবারের জন্য বোঝা ও পরগাছাই হয়ে ওঠে; পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ বেঁচে থাকার স্বার্থে চাকরি বা কাজ করা বেছে নেয় – আগে যেখানে গ্রেগর কাজ করত আর তারা তিনজন তার আয়ের ওপরে ভর করে কর্মজীবনের পীড়নমুক্ত হয়ে বাসায় বসে থাকত, এখন সেখানে তারা সবাই পেটের দায়ে কাজ করে আর গ্রেগরের/পোকাটির তাদের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকতে হয়। অতএব এই রূপান্তর, গল্পের চরিত্রগুলোর ভূমিকার ও কাজেরও রূপান্তর – গ্রেগরের সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিনজনেরও রূপান্তর ঘটে এবং সে অর্থে পুরো পরিবারটিরই রূপান্তর ঘটে, যে পরিবারের গ্রেগর সত্যিকার অর্থে আর কোনো অংশ থাকে না।

গ্রেগরের বাবা হের সামসার রূপান্তরটি লক্ষণীয়: দুর্বল, ক্লান্ত, অবসরে যাওয়া এই বুড়ো মানুষটি এক শক্ত, প্রাণময় মানুষ হয়ে ওঠেন, তার গায়ে আমরা দেখি ব্যাংকের পিয়নের চাকরির জাঁকালো এক ইউনিফর্ম। গ্রেটেও তাই – ছোট এই মেয়েটি গল্পের শেষে গিয়ে এক 'সুন্দর ও সুগঠন' তরুণী হয়ে ওঠে, যে রকমটি হলে বিয়ের জন্য ভালো বর পাওয়া যায়। গ্রেটের রূপান্তর পরিষ্কার ইতিবাচক এক রূপান্তর, ওর মধ্যে দিয়েই জেগে থাকে কাফকার সামান্য আশাবাদ। যে যত বড় বিপদ-দুর্বিপাকই আসুক না কেন, জীবন চলেই যায়, চলতেই থাকে। তা ছাড়া পরিবারের সবাই তাদের ঘাড়ে চড়ে বসা হঠাৎ এই দুর্দশার মুখে – অর্থাৎ ঘরের বড় ছেলেটি একটি পোকা হয়ে গেছে এবং সামাজিকভাবে বিষয়টি বড় লজ্জার ও গ্লানির – যেভাবে সবাই একজোট হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ায়, তার মধ্যেও মানবসমাজের জন্য আশাবাদ দেখেছেন অনেক গবেষক।

গল্পটির গঠন, এক কথায়, নিখুঁত। এর মোট তিনটি অংশ, প্রতিটিই মোটামুটি সমান দৈর্ঘ্যের। প্রথম আর দ্বিতীয় অংশের মধ্যে ব্যবধান এক দিনের; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির মধ্যে ব্যবধান আরো দীর্ঘ ও অনিশ্চিত এক কালের। প্রতিটি অংশই শেষ হয় একটি করে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে, এর ফলে পুরো গল্পেই টান টান উত্তেজনা বজায় থাকে। প্রথম অংশে গ্রেগরের অফিসের প্রধান কেরানি তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে যেতে আসে, আর এটির শেষে তার বাবা লাঠি ও খবরের কাগজ দিয়ে গ্রেগরকে তাড়াতে তাড়াতে তার ঘরে ঢুকিয়ে দেন; দ্বিতীয় অংশে ঘরের আসবাবপত্র সরানো হয় আর শেষে তার বাবার সেই প্রাণঘাতী আক্রমণ – তিনি গ্রেগরের গায়ে একটি আপেল ছুড়ে মারেন, যা তার গায়ে বিঁধে গিয়ে পরে একসময় তার মৃত্যু ডেকে আনে; তৃতীয় অংশে আমরা দেখি তার বোন ভায়োলিন বাজায় (গল্পের অন্যতম প্রধান দিক বা মেটাফর এই সংগীতের সুর, যা নিয়ে পরে কথা বলব), আর শেষে গ্রেগরের মৃত্যু। প্রথম বিপর্যয় থেকে আসে 'ভারী, মূর্ছার মতো' এক ঘুম; দ্বিতীয়টি থেকে আসে মূর্ছা যাওয়া এবং এক বিপজ্জনক ক্ষত; তৃতীয়টি থেকে মৃত্যু।

পুরো গল্পটি বলা হয় গ্রেগরের সীমিত চোখ দিয়ে। কাফকার গল্প বলার টেকনিক যার নাম 'monopolized narration' (একচেটে বর্ণনাকৌশল), এ গল্প তার এক ধ্রুপদি উদাহরণ। গ্রেগর তার ছোট ঘরের মধ্যে বসে, মূলত কানে শুনে যে পৃথিবীকে দেখে, তা-ই গল্পে দেখতে হয় আমাদের; সে-ই কথক, সে-ই গল্পের নায়ক, আর সে ঘরে বন্দী। ফলে গল্পের হদিস খুঁজে পাওয়ার উপায় আমাদের, পাঠকদের, হাতে সীমিত; আর এর ফলেই এ গল্প নিয়ে এত অনিশ্চিত সব ব্যাখ্যা – সব ব্যাখ্যাতেই কিছু না কিছু ইঙ্গিত-ইশারা মেলে, কিন্তু কোনোটিই চূড়ান্ত নয়। এই যে অনিশ্চয়তা, কাফকা গল্পে তা ধরে রাখেন বারবার 'যেন বা', 'মনে হয়', 'বোধ হয়' – এজাতীয় শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু করে। আর গ্রেগরের চোখ বা মানস দিয়েই আমরা যেহেতু গল্পের পৃথিবীটি দেখি, তাই তার জটিল ও দ্বন্দ্বপীড়িত মনস্তত্ত্বের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েই আমাদের গল্পটি পাঠ করতে হয়। একদিকে আমাদের তার জন্য মায়া হয় এটা ভেবে যে বেচারা কীভাবে পাঁচ-পাঁচটি বছর কত কষ্ট করে এই পরিবারের ঘানি টেনেছে, অন্যদিকে আমরা তার ওপর ক্ষুব্ধ হই পরিবারটিকে এভাবে পথে বসানোর জোগাড় করার জন্য। অর্থাৎ একদিকে গ্রেগরের আত্মপক্ষ সমর্থনে বলা দৃষ্টিকোণ, অন্যদিকে তার কর্কশ আত্মসমালোচনা ও অপরাধবোধ। এই দুই মেরুর মধ্যখানেই দোলে পুরো গল্পটির বর্ণনার পেন্ডুলাম। দুটিরই যে বস্তুনিষ্ঠতা (objectivity), তা আবার নায়কের নিজের মনোগত (subjective) ব্যাখ্যা দিয়েই ঘেরা।

গল্পের তিনটি অংশের কাঠামোতে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো প্রতিটিই শুরু হয় গ্রেগরের ঘুম বা মূর্ছার মতো কিছু থেকে জেগে ওঠা দিয়ে, এর পরে পরিবারের সঙ্গে তার একাত্ম হওয়ার চেষ্টা, আর শেষে পরিবারের কাছে তাড়া খেয়ে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই বৃত্তাকার গঠনের মধ্যে আছে কাফকা-সাহিত্যের কেন্দ্রীয় একটি থিম, যা ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর বহু বহু লেখায়: বৃহত্তর সমাজ বা পরিবারের সঙ্গে, নিজের বিচ্ছিন্নতা ঘোচানোর লক্ষ্যে, একাত্ম হতে চাওয়ার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা। গ্রেগরের পোকায় রূপান্তর সেই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস, সেলস্‌ম্যানের চাকরির জঘন্য বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে পরিবারের উষ্ণ পরিমন্ডলে ঠাঁই নেওয়ার রূপক, আবার একই সঙ্গে সেই বিচ্ছিন্নতাবোধের টিকে থাকা বা জয় হওয়ারই বিরাট উদাহরণ – বাকি সবাই যেখানে মানুষই রয়ে গেছে, সেখানে সে হয়ে গেছে নোংরা একটি কীট, অর্থাৎ প্রজাতিগতভাবেই মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই যে দুই বাঁধনের টানাপোড়েনে আটকে পড়া গ্রেগর, তার মানবসমাজে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে তা যেকোনো সচেতন পাঠকের কাছেই, প্রথম থেকেই, পরিষ্কার। গল্পের তৃতীয় অংশে গিয়ে গল্পটি বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসে – আর গ্রেগরকে তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাতে হয় না, কারণ তার বোন গ্রেটে বাবা-মাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে এই পোকা কোনোভাবেই তার ভাই বা তাদের ছেলে গ্রেগর নয়, এ পোকা স্রেফ একটি পোকাই; তারাই বোকা যে তারা এতদিন ধরে ওকে গ্রেগর বলে ভাবছে। এই সেই মুহূর্ত যখন গ্রেগর, অবশেষে, নিজেকে অবাঞ্ছিত বলে মেনে নেয়, পরগাছা বলে স্বীকার করে নেয়, স্বেচ্ছায় নিজের ঘরের বিচ্ছিন্নতার হাতেই নিজেকে

সঁপে দেয় – তার সমস্ত যুদ্ধ তখন শেষ, সমাজে-পরিবারে জায়গা খুঁজে নেওয়ার সব চেষ্টা তখন তিরোহিত, কোটি কোটি আধুনিক মানুষের মতো সে তখন শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত যে মৃত্যুই বোধ হয় এর চেয়ে ভালো।

গ্রেগরের ঘরের ভূগোলের মধ্যেও সমাজে ব্যক্তির মিশে যাওয়া ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার এই থিম স্পষ্ট। সতর্ক পাঠক দেখবেন, ঘরের দরজাগুলো যেমন বাইরে যাওয়ার দরজা, তেমনই এরা এমন সব বাধা যাতে করে ভেতরে আটকে থাকতে হয় – মূলত সেগুলো যতটা না বাইরে, পরিবারে মিশে যাওয়ার পথ, তার চেয়ে বেশি বাধা, বাধার দেয়াল।

'রূপান্তর' গল্পে পাঠকের চমৎকৃত হওয়ার সবচেয়ে বড় দিকটি হলো কীভাবে এখানে ফ্যান্টাসি ও বাস্তবতা একাকার হয়ে গেছে। আধুনিক পৃথিবীর অগনন আধুনিক মানুষ যারা জীবনযাপনের দুর্বিষহ ভারে, সমাজের অন্যায়-অবিচার ও খামখেয়ালিপনার চক্করে বেঁচে থাকার ঘানি টানতে টানতে নিজেদের অহরহ পোকার মতো কিছু বলেই ভাবে, তাদেরই একজন এখানে সত্যিকারের, একদম বাস্তবের একটি পোকাতেই রূপান্তরিত হয়ে যায়। গল্পের প্রথম লাইনটি তাই, কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বসাহিত্যে জাদু-বাস্তবতার (magic realism) প্রথম বড় শুরু। এ লাইনটি পড়েই সাহিত্যে জাদু-বাস্তবতার প্রধান নাম গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের অসংখ্য জাদু-বাস্তবতাময় লেখনীর শুরু; আর তারও আগে হোরহে লুইস বোরহেসের বিখ্যাত 'The Congress' গল্পের চোখ-ধাঁধানো জাদুবাস্তব কাহিনির সূচনা।

গ্রেগর তার পোকা হয়ে যাওয়াতে একটুও বিস্মিত নয়; মনের দিক থেকে আগের থেকেই নিজেকে পোকা বলে ভাবা গ্রেগর কী সহজে নিজের এই নতুন রূপ মেনে নেয়, যেন কত স্বাভাবিক তার এই রূপান্তর, তার এই নতুন মোটা পেট আর অসংখ্য পা-ওয়ালা শরীর। পরিবারের অন্যরাও কখনোই অবিশ্বাস করে না তার এই রূপান্তরকে, বিনা প্রশ্নে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীতে ঘটে যাওয়া এই ফ্যান্টাস্টিক বা অলৌকিক ঘটনাটি তারা দৃশ্যমান বাস্তব বলেই মেনে নেয়। গল্পের প্রথম দুটি অংশে তারা এই পোকাকে রীতিমতো পরিবারের একজন সদস্য বলেই ভাবে। কেবল তৃতীয় অংশে গিয়েই তারা গ্রেগরের সঙ্গে তাদের পারিবারিক বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয়, তার পরও তারা একবারের জন্যও সন্দেহ করে না গ্রেগরের এই 'অবিশ্বাস্য' পোকায় রূপান্তরের ঘটনাটি (গল্পের একদম এই শেষে এসেই গল্পটি আর আমরা গল্পের কথক বা নায়ক গ্রেগরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি না; শেষ পাঁচ ছয় পাতায় এসে কথক এটি বর্ণনা শুরু করেন অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে)। নিখুঁত চোখে দেখলে, পরিবারের অন্যরা গ্রেগরের পোকা হওয়াকে যেভাবে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন, ঠিক সেটির কারণেই আসলে তারা গ্রেগর/পোকা থেকে তাদের মুক্তির পথ খোঁজেন। তার পোকায় রূপান্তরে তাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকত, তাহলে তারা এই গ্রেগর/পোকা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অমন স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও বিধ্বংসী হয়ে উঠতেন না। কাফকার 'বাস্তবতা'র একটি মৌলিক

বিষয় এই অভ্যন্তরীণ ধারাবাহিকতা: তার চরিত্রেরা সব সময়েই কাল্পনিক এক পৃথিবীর দাবার ঘুঁটি, কখনোই তাদের নেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া যার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও বেড়ের সম্বন্ধে কোনো সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি, কোনো উতরে যাওয়ার মতো প্রশ্ন ও তার সমাধানের সংকেত পেতে পারে। চিরাচরিত রিয়ালিস্ট কথাসাহিত্যের শৃঙ্খল ও কানুন মেনেই এ গল্পে কাফকা তার অদ্ভুত রিয়ালিজমের 'অদ্ভুত' অংশটিকে বিরাট সফলতার সঙ্গে সরিয়ে রাখেন। বাস্তবের অনেক খুঁটিনাটি বর্ণনা কাফকা এখানে যেভাবে সাংবাদিকের মতো লিখে যান, তাতে অবাক হতে হয় এটা ভেবে যে এই একই গল্প আসলে একজন মানুষের পোকা হয়ে যাওয়ার কাহিনি; অর্থাৎ রিয়ালিস্ট থেকেও কাফকা এখানে তুমুল ফ্যান্টাস্টিক (অবাস্তব কল্পনাপ্রবণতা অর্থে) এবং বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবতা থেকে অনেক দূরের। অবাস্তব কল্পনার ঘটনারাজি আর তাদের বাস্তবানুগ চিত্রণ – এই দুয়ের যে বিরোধ আর আবার যে সম্মিলন, এর ফলেই 'রূপান্তর' গল্পটি পড়তে গিয়ে মনে হয় এটা অদ্ভুত এক স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, যদিও কাফকা ডায়েরিতে লেখেন যে এই গল্পটি কোনো স্বপ্ন নয়, এটি কোনো স্বপ্নবর্ণনাও নয় (যেমন স্বপ্নবর্ণনা তার অন্য বিখ্যাত গল্প 'এক গ্রাম্য ডাক্তার')।

পরিশেষে আর সামান্য কয়েকটি কথা, পাঠকের জানা জরুরি বলেই বলছি, যদিও অতি সংক্ষেপে:

১. সাহিত্যের নানা ধারার সঙ্গে যারা সামান্য পরিচিত, তারা এটিকে বাস্তববাদী (realist) সাহিত্য, যেমনটি কাফকার 'দি স্টোকার', না বলে বলবেন এক্সপ্রেশনিস্ট ধারার লেখা। এটি রিয়ালিস্ট আবহের মধ্যে ছুড়ে মারা একটি এক্সপ্রেশনিস্টিক বোমা। 'স্বপ্ন' হিসেবে এর ব্যাখ্যা করা ভুল; আগেও বলেছি, কাফকা নিজেও সে ব্যাপারে সচেতন ও সজ্ঞান ছিলেন।

২. কাফকার রিয়ালিজমের মধ্যে এখানে ক্যারিকেচারের ও বাড়িয়ে বলার কমতি নেই। পোকাটির কথাই ধরুন। তার পিঠ কঠিন এক খোলার মতো, বাস্তবের কোনো পোকায় তা থাকে না, থাকে বাদামের গায়ে; আর তার পেট যদি গম্বুজের আকারেরই হবে, তাহলে তার অসংখ্য পা (পোকার পা থাকে ছয়টি) কী করে মাটি ছোঁয়? বিশ্বসাহিত্যের আরেক মহান লেখক ভ্লাদিমির নবোকভ, যিনি ছিলেন নামকরা পতঙ্গবিশারদ, বলেন যে গ্রেগর তেলাপোকা নয়, কারণ তেলাপোকার শরীর সমতল, তাদের বিরাট পা থাকে, যেখানে গ্রেগরের পিঠ ও পেট উত্তল (convex); তার শক্ত পিঠ দেখে মনে হয় সে গুবরে পোকা বা বিটল্, কিন্তু তার কোনো ডানা নেই। নবোকভের উপসংহার, এই পোকা কাফকারই নিজের সৃষ্ট এক অদ্ভুত প্রজাতি। কাফকা এটিকে মূল জার্মানে বলছেন: 'Ungeziefer', যার মানে 'কীট' বা 'কীড়া' কিংবা 'পরজীবী কীট যেমন উঁকুন'। পোকায় রূপান্তরিত হওয়া হচ্ছে নিজেকে ঘৃণার শেষ বিন্দু, এর বেশি আত্মঘৃণা আর কী হতে পারে? কাফকার পড়া উপন্যাস দস্তইয়েফ্স্কির *The Brothers Karamazov*-এ দিমিত্রি

কারামাজভ নিজেকে বলে 'পোকা' ও 'ছারপোকা', আর তার ভাই আলইওশাকে বলে 'আমাকে তেলাপোকার মতো পিষে ফেলো'। কাফকা এই তেলাপোকার মেটাফরকে (রূপক) আক্ষরিক বাস্তবতা বানিয়ে ছেড়েছেন।

৩. প্রধান কেরানি যেভাবে, ভয় পেয়ে, ধাপে ধাপে গ্রেগরদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, তাতে স্পষ্ট মনে আসে নীরব সিনেমার (silent cinema) কথা; কাফকা silent cinema-র ভক্ত দর্শক ছিলেন।

৪. কাফকা ডিকেন্স ভালোবাসতেন – তিনি *আমেরিকা/নিখোঁজ মানুষ* উপন্যাসটিকে বলেছিলেন চার্লস ডিকেন্সের *ডেভিড কপারফিল্ড* উপন্যাসের অনুকরণ – আর 'রূপান্তর' গল্পে ডিকেন্সিয়ান ক্যারিকেচার স্পষ্ট। দরজা ধড়াম করে বন্ধ করা ঠিকে ঝি, এ বাসায় ভাড়া থাকা তিন ভাড়াটে, কিংবা ডেস্কের ওপরে শরীর ছড়িয়ে বসা গ্রেগরের বস্ – এসব জায়গায় আমাদের ডিকেন্সকে মনে পড়ে।

৫. গ্রেগরের বাবা আপেল ছুড়ে যেভাবে সন্তানহত্যা করেন, তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'রায়' গল্পের বাবা যেভাবে ছেলেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

৬. এ গল্পে পরিষ্কার যে কাফকার নিজের দুঃসহ পারিবারিক জীবন – তাঁর গর্বিত ও দাম্ভিক বাবা যার কথা বইয়ের 'ভূমিকা' অংশে আমরা বিস্তারিত জেনেছি, তাঁর নীরব ও সাহায্যের হাত না বাড়ানো মা যার কথাও এসেছে বইয়ের 'ভূমিকা' অংশে, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বোন ও আজীবনের প্রিয়তম বন্ধু, স্বাধীনচেতা ওট্‌লা – তিনজনই এ গল্পে হাজির। এ কারণেই এ গল্পের আত্মজৈবনিক ব্যাখ্যার এমন জোয়ার। তবে এটুকু ভুলে গেলে পাঠকের ঠিকই মনে হবে 'এটি যেকোনো পরিবারেরই গল্প'।

৭. 'প্রতিষ্ঠান' হিসেবে পরিবারকে কাফকা ঘৃণা করতেন। ১৯১২-র ২১ নভেম্বর তিনি ফেলিস বাউয়ারকে লেখেন 'সব সময় আমি আমার বাবা-মাকে দেখেছি আমাকে হয়রানি করছে...তারা এটা করছে ভালোবাসা থেকেই, আর ঠিক এ কারণে ব্যাপারটা আরো ভয়ংকর।' 'রূপান্তর' গল্পে প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার যতটা না ভালোবাসার জায়গা, তার চেয়ে বেশি ভালোবাসার নামে অন্যকে শুষে নেওয়া ও ভায়োলেন্সের মুক্তমঞ্চ।

৮. এ গল্পে বাবাই পরিবারের একমাত্র সক্রিয় যৌনশক্তির ধারক। গল্পের দ্বিতীয় অংশের শেষে গ্রেগর তার মাকে প্রায় নগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলে। তিনি গ্রেগরকে বাঁচাতে তার স্বামীর দিকে ছুটছেন, 'পেছনে মেঝেতে একটার পর একটা ছেড়ে আসছেন তার ঢিলে করে দেওয়া পেটিকোটগুলো...নিজেকে ছুড়ে দিলেন তার বাবার গায়ের ওপর, জড়িয়ে ধরলেন তাকে, পুরোপুরি এক হয়ে গেছেন তার সঙ্গে।' ভয়ংকর দৃশ্য এটি। গ্রেগর যা দেখল – তখন তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে অর্থ এ দৃশ্য তার দেখা মানা – তা ফ্রয়েডের হিসাবে আদিম বা প্রধান (primal) এক দৃশ্য; বাবা মায়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে, যা থেকে সন্তানের জন্ম,

সৃষ্টির গোপন সত্য প্রত্যক্ষ করলো গ্রেগর; কিন্তু তা স্রেফ খানিকের জন্যই। এর পরই এ দৃশ্যের নিষিদ্ধতা (taboo) আবার প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রেগরের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসার মধ্য দিয়ে। আর তার মা যৌনতাকে ব্যবহার করলেন গ্রেগরের জীবন বাঁচানোর কাজে। 'পরিবার' নামের প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্রে কাফকা নিয়ে এলেন যৌনতা, ক্ষমতা ও ভায়োলেন্সের ত্রিধারা।

৯. বাবার যৌনক্ষমতা প্রদর্শনের বিপরীতে গ্রেগরের যৌনবঞ্চনা যেন পাঠকের চোখ এড়িয়ে না যায়। গ্রেগরের মনে পড়ে 'মফস্বলের এক হোটেলের এক পরিচারিকা'র কথা, 'এক মধুর ও ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি'; 'একটা হ্যাটের দোকানের এক ক্যাশিয়ার মেয়ে যার প্রণয়প্রার্থনা সে করছিল মন দিয়েই' – তবে তার রূপান্তরের আগে তার যৌনজীবন বোধ হয় তার ঘরে টানানো ফারের টুপি ও ফারের গাউন পরা মহিলার ছবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গবেষকেরা এখানে মনে করেন লিওপোল্ড ফন সাখার-মাসোখের কুখ্যাত উপন্যাস *ভেনাস ইন ফারস্* (*Venus in Furs;* ১৮৭০)-এর কথা। পশুর লোম বা ফার দিয়ে তৈরি গাউন পরা এই মহিলা গ্রেগরের জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে যখন তার মা ও বোন তার ঘরের ফার্নিচার সরাচ্ছে, তখন সে ছবিটি বাঁচাতে ওটা নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে রাখে। তার অবদমিত যৌনতা বোনের সঙ্গে কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করার মধ্যে দিয়েও ফুটে ওঠে – গ্রেগর একপর্যায়ে তার বোনের গলায় চুমু খেতে চায় (যেভাবে জোসেফ কে. *বিচার* উপন্যাসে চুমু খায় ফ্রয়লাইন বার্স্টনারকে)। বোনের সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠতা আমাদের মনকে আরো বেশি করে পীড়া দেয় এটা ভাবলে যে নিজের বোনই কীভাবে শেষে তার মৃত্যুর প্রধান দূত হয়ে ওঠে, সে-ই বাবা মাকে এক পর্যায়ে বলে যে এই পোকাকে যেতেই হবে।

১০. গ্রেগর এ গল্পে শুধু পরিবারের নিষ্ঠুরতার শিকার, তা-ই নয়; সে আসলে পরিবারের জন্য নিজেকে আত্মত্যাগ করেছে। কাফকা আমাদের বেশ কয়েকবার মনে করিয়ে দেন এ পরিবারটির খ্রিষ্ট ধর্মানুরাগের কথা। গ্রেগরের/পোকাটির মৃত্যুর পরে তারা বলেন, 'এখন আমরা খোদাকে শুকরিয়া জানাতে পারি', আর তারপর তিনজনই বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন। তবে তাদের মধ্যে আমরা য়ে রকম নিট্‌শেয়ান ক্ষমতার কামনা দেখি, তাতে তাদের এই ধর্মানুরাগ কপট বলে মনে হয়। বেঁচে থাকা সামসারা খুশি, চনমনে, বসন্তের আলোয় ট্রেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে; 'স্বাস্থ্যবান পশু' তারা, যেমনটি বলেন নিট্‌শে, আর এ ধরনের বিজয়ী মানুষেরা যেভাবে, নিট্‌শের ভাষায়, তাদের অতীত ভুলে যায়, সামসারাও এখানে তেমনই; কেবল সামনে তাকায় তারা, পৃথিবীতে লড়াই করে ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য প্রস্তুত, মেয়ের বিয়ে দিয়ে বংশ টিকিয়ে রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর।

এ গল্পের নিট্‌শেয়ান বিশ্ববীক্ষা (world-view) আমরা আগেই 'রায়' গল্পে দেখেছি।

১১. তবে 'রায়' গল্পের মতো নিট্‌শেয়ান ক্ষমতালিপ্সু বিশ্ববীক্ষার বিপরীতে এখানে কোনো কান্টের নৈতিক কাঠিন্য আমরা খেলা করতে দেখি না; বরং দেখি আরো রহস্যময়, এমনকি অতীন্দ্রিয় বা মরমি কিছু। গ্রেগর পোকা হয়ে গিয়ে যে নোংরা নরকে নেমে যায় তা এক অভিজ্ঞতা বটে, আর কাফকা এই অভিজ্ঞতাকে মায়া বা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মুড়ে দেন সংগীত দিয়ে। আগে গ্রেগর সংগীতের অনুরাগী ছিল না, আর এখন একমাত্র সে-ই বোনের ভায়োলিন বাজানো বুঝতে পারে। একই সময়ে আমরা দেখি গ্রেগর পার্থিব খাবারের প্রতি সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে; সংগীতই তখন তার পুষ্টির উৎস (পাঠককে এ গল্প পড়া শেষে এ বইয়ের 'এক অনশন-শিল্পী' গল্পটি পড়তে বলব, যেখানে পুষ্টির অন্য আরেক উৎসের ইঙ্গিত দিয়েছেন কাফকা)। বোনের ভায়োলিন বাজানো শুনে গ্রেগর ভাবে: 'সংগীত যদি তার মনকে এইভাবে নাড়া দেয়, তাহলে কী করে হয় যে সে একটা পশু? তার মনে হলো সেই অজানা খাদ্য, যা সে এত দিন ধরে খুঁজে আসছিল, সেটার কাছে খাওয়ার পথ বুঝি আজ খুলে গেছে।' এই ধাঁধা-কুহকে ভরা বাক্যটি 'রূপান্তর' গল্প বুঝবার এক বিরাট চাবিকাঠি। পার্থিব জীবনের বাইরের আরো বৃহত্তর, মরমি জীবনের প্রতি কাফকার আকাঙ্ক্ষা ও তার নান্দনিকতার বিশ্ববীক্ষা এখানে পরিষ্কার।

১২. সামসা (Samsa) নামের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ দর্শনের 'সংসার' বা 'Samsara' শব্দের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বৌদ্ধ বিশ্বাসে বলা হচ্ছে: 'এই হচ্ছে সংসার (Samsara) – কাম, বাসনা দিয়ে শুরু আর তাই জন্ম, রোগশোক, বার্ধক্য ও মৃত্যুতে ভরা পৃথিবী। এমন এক পৃথিবী যার এরকম হওয়াটা উচিত ছিল না। সংসারের যারা তাদের দিয়েই ভরা এই পৃথিবী। অতএব এর চেয়ে ভালো আর কী আপনি আশা করতে পারেন এর থেকে?' বিশ্বসংসার (Samsara), যেখানে ভোগান্তি ও কষ্টের মধ্যে থাকার জন্য আমরা দণ্ডিত, থেকেই সম্ভবত এসেছে গ্রেগর সামসা (Samsa) নামটি। (দ্রষ্টব্য: Michael Ryan, 'Samsa and Samsara: Suffering, Death and Rebirth in "The Metamorphosis"', ১৯৯৯, German Quarterly, 72।

১৩. 'রায়' গল্পের মতো এখানেও আমরা দেখি দুই বিপরীতধর্মী মূল্যবোধের প্রকাশ। একদিকে শোপেনহাউয়ারের জীবনের মায়া ত্যাগ করা বৈরাগ্য, যা ধারণ করে গ্রেগর টিকে থাকে তার জীবনের শেষ কটা দিন; আর অন্যদিকে নিট্‌শের জীবনবাদী প্রাণপ্রাচুর্য, যাতে বিশ্বাস করে পরিবারটি নিজেদের বাঁচায়, সন্দেহ নেই যথেষ্ট ভদ্র ও কপট এক পথেই। কাফকা নিজে শাকাহারী (vegetarian)

ছিলেন বলেই হয়তো তিনি এই দুই মূল্যবোধের ছবিটি তুলে ধরেন খাদ্যের ইমেজ দিয়ে। গ্রেগর খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়, যে কারণে তার মৃত্যুর পরে আমরা দেখি তার শরীর কত পাতলা ও সমান। ঠিক তখনই, ভাড়াটেরা যখন সিঁড়ি দিয়ে তাড়া খেয়ে নেমে যাচ্ছে, তারা এক কসাই বালককে পার হয়, এই বালক তার মাথায় ট্রেতে করে নিয়ে আসছে মাংস। গ্রেগরের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মাংসখেকো নিষ্ঠুর জীবনীশক্তির জয় হয়। যারা কাফকাকে চেনেন, তারা জানেন, গল্পে এসব কোনোকিছুই কাকতালীয় নয় – কসাইবালকের মাংসের ট্রে মাথায় করে সামসা-ফ্ল্যাটের দিকে উঠে আসার কথা কাফকা খুব ভালোভাবে জেনে ও বুঝেই লিখেছিলেন। কাফকার কাব্যিক কল্পনাশক্তি যেমন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনই গোছানো। কাব্যিক শক্তি দিয়ে তিনি দাবা খেলতে জানতেন।

'রূপান্তর' গল্পের এই পাঠ-পর্যালোচনা আমরা শেষ করছি নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক এলিয়াস কানেত্তির একটি বাক্য দিয়ে: '"রূপান্তর" গল্পটি বিংশ শতাব্দীতে কাব্যিক কল্পনা দিয়ে লেখা অল্প কয়টি মহান ও নিখুঁত সৃষ্টির একটি।'

টীকা

ফারের গাউন পরা এক মহিলা (পৃ. ১৮৫): এই পিন-আপ ছবিটি সাখার-মাসোখের কুপ্রসিদ্ধ *Venus in Furs* উপন্যাস থেকেই নিয়েছেন কাফকা। পাঠ-পর্যালোচনায় বলা হয়েছে সে কথা। ১৯১২ সালের দিকে পশুর লোমে বা [illegible]রে বানানো পোশাক পরা ছিল বিরাট ফ্যাশন।

অসংখ্য ছোট সাদা, সাদা ফোঁটা (পৃ. ১৮৬): সম্ভবত রাতে ঘুমে অর্থাৎ স্বপ্নে বীর্যপাত হওয়ার ইঙ্গিত।

মেরুদণ্ডহীন একটা গবেট (পৃ. ১৮৭): ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা করা যায় যে মেরুদণ্ডহীন পোকা গ্রেগর অন্যকে মেরুদণ্ডহীন কেন বলল, যদিও সে তখনো স্পষ্ট করে জানে না যে তার নিজেরই মেরুদণ্ড নেই।

সেইন্টদের নাম জপা (পৃ. ২০৪): পরিবারটি যে খ্রিষ্টান তার বেশ কিছু ইঙ্গিতের প্রথমটি।

সে চাইছিল এই ক্রিসমাসেই (পৃ. ২০৬): গল্পটি শুরু হয় শরতে বা শীতের শুরুতে, বাজে আবহাওয়ায়; আর শেষ হয় বসন্তে।

আঁটসাঁট এক ইউনিফর্ম (পৃ. ২১৫): বাবা এখানে পুরুষত্বের ধারক হয়ে উঠেছেন – তার পরনে সৈনিকের মতো ইউনিফর্ম। আমাদের মনে আসে গ্রেগরও একসময় সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছে; সেও অমন ঋজু ও চাকচিক্যময় ছিল একদিন।

যেন পেরেকে গাঁথা সে (পৃ. ২১৬): সম্ভবত যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত।

দণ্ড উপনিবেশে

এই ছোট গল্পটি, যাকে নভেলা বা ছোট উপন্যাসও বলা হয়, কাফকা লেখেন ১৯১৪ সালের অক্টোবরে। এর প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯১৯। লেখা ও প্রকাশনার মধ্যে পাঁচ বছরের এই দীর্ঘ ব্যবধান মূলত এ কারণে যে কাফকা এ গল্পের শেষটা নিয়ে খুশি ছিলেন

না। ১৯১৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর প্রকাশক কুর্ট ভোলফ্‌কে লেখেন যে গল্পের শেষ তিন পাতা 'জোড়া-তালির কাজ হয়েছে'। কাফকার অসন্তুষ্টির চিহ্ন বহনকারী শেষটুকু নিয়ে এই গল্প যা ছিল, সেই পাণ্ডুলিপিটি এখন আর নেই। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে কাফকা সেই ক্রটিযুক্ত শেষাংশটুকু ঠিক করেন, আর কেবল তার পরই লাইপ্‌জিগের প্রকাশক কুর্ট ভোলফ্‌কে দেন বই বের করার জন্য। ১৯১৯ সালের অক্টোবরে আলাদা বই হয়ে এটি বের হয়। গল্পটির ইংরেজি নাম: 'In the Penal Colony' বা 'In the Penal Settlement'; মূল জার্মানে 'In der Strafkolonie'।

গল্পের শেষাংশ নিয়ে কাফকার অতৃপ্তি থাকলেও এটা বলা যাবে না যে কাফকা পুরো গল্পটি নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। বরং তার উল্টো – তিনি ১৯১৪ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বন্ধুদের গল্পটি পড়ে শোনান আর ১৯১৬ সালের নভেম্বরে মিউনিখের গোলৎস্‌ গ্যালারিতে পাবলিক রিডিংয়ে – যেমনটা কাফকার ক্ষেত্রে ছিল অতি দুর্লভ – এটি জনসমক্ষে পড়েন। কবি রাইনার মারিয়া রিল্‌কে ছিলেন এ গল্পের একেবারে প্রথম দিককার পাঠক, যদিও রিল্‌কে এটিকে 'দি স্টোকার'-এর মতো পছন্দ করেননি। এপ্রিল ১৯১৫-র মধ্যে কাফকা টাইপে তুলে ফেলেন পুরো গল্পটি, পরে ১৯১৬-র গ্রীষ্মে মূল পাণ্ডুলিপি পাঠান কুর্ট ভোলফ্‌কে। ভোলফ্‌ গল্পটি খুবই পছন্দ করেন, কিন্তু তখনো, ১৯১৮-র শরৎ পর্যন্ত, কাফকা এর ছাপার বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকেন। এরই মধ্যে ১৯১৭ সালে *মারসিয়াস (Marsyas)* নামের বিখ্যাত দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকায় ঘোষণা ছাপা হয় যে পরের যেকোনো সংখ্যায় আসছে ফ্রানৎস্‌ কাফকার 'দণ্ড উপনিবেশে', যদিও বাস্তবে তা ঘটার আগেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, গল্পটির প্রকাশনা বিষয়ে কাফকার দ্বিধা শুধু গল্পের শেষটা নিয়ে ছিল তা নয় – ১৯১৮ সালের শরতে বই হিসেবে এর প্রকাশে কাফকা কুর্ট ভোলফ্‌কে সম্মতি দেওয়ার আগেই *মারসিয়াস* পত্রিকায় এটি ছাপাতে তিনি ঠিকই রাজি হয়েছিলেন।

১৯১৫ সালের অক্টোবরে কাফকা তাঁর প্রকাশককে লেখেন যে 'দণ্ড উপনিবেশে' গল্পটি তার অন্য দুটি গল্প 'রায়' ও 'রূপান্তর'-এর সঙ্গে দুই মলাটের ভেতরে একটি বই হিসেবে বের হওয়া উচিত, যে বইয়ের নাম হবে: 'শাস্তি' ('Punishments'; 'Strafen')। কাফকা-গবেষকদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে কাফকা এ তিন গল্পের সঙ্গে শাস্তির অমন যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। এ গল্পটি আসলেই এক আসামির শাস্তি পাওয়া বিষয়ক, কিন্তু 'রায়' গল্পে কিসের শাস্তি পেল গেয়র্গ, আর 'রূপান্তর' গল্পে গ্রেগর? থিমের দিক থেকে এ তিনটি গল্পের মধ্যে দৃশ্যত সম্পর্ক থাকলেও, 'রায়' ও 'রূপান্তর'-এ যেখানে নায়ক দুজন মনে হয় নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দিল, সেখানে এ গল্পে এক পর্যটক বা এক অভিযাত্রী, যিনি বিদেশি এক মানুষ, বড় কোনো দেশের এক উপনিবেশে বেড়াতে এসে, গল্পের কোনো অংশ না হয়ে দূর থেকে বাস্তবনিষ্ঠ চোখে দেখলেন কীভাবে শাসকেরা শাস্তি দিচ্ছে তাদের প্রজাদের। এই পর্যটক স্রেফ একজন দর্শক, তিনি পরিষ্কার ঘৃণা করছেন শাস্তি প্রদানের এই মধ্যযুগীয় ও অমানবিক বর্বরতাকে, কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে

বিচার-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার তার ঐকান্তিক কোনো ইচ্ছা নেই। গল্পের শেষে তিনি স্রেফ দ্বীপটি ছেড়ে পালান, পেছনে ফেলে রেখে যান সৈনিক ও দণ্ডিত মানুষটিকে, তাদের ভাগ্যে কী ঘটে তা আর আমরা জানতে পারি না।

গল্পে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এক দ্বীপে, যা কোনো বড় দেশের উপনিবেশ, এক পর্যটক বেড়াতে বা সেই দ্বীপের বিচার-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে আসেন। দ্বীপের এক অফিসার তাকে একটি যন্ত্র বা অ্যাপারেটাস (মেশিনারি অর্থে এবং প্রশাসনের অ্যাপারেটাস অর্থেও এর ব্যাখ্যা হয়) দেখান। এটি আসামিদের শাস্তি দেওয়ার যন্ত্র যার ভেতরে আসামিকে ঢুকিয়ে সুই দিয়ে তার শরীরে তার অপরাধের কথা লিখে দেওয়া হয়; ১২ ঘণ্টার এই দীর্ঘ শাস্তি-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মৃত্যু ঘটে আসামির। আসামিকে অন্য কোনোভাবে তার বিরুদ্ধে আনা রায়ের বিষয়ে বলা হয় না, এই রায় আসামিদের 'মাংসে' বা 'শরীরে'র ওপরে লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়! অফিসারের বর্ণনা থেকেই আমরা জানি দুই কমান্ড্যান্টের কথা – দ্বীপের এই প্রশাসক দুজনের মধ্যে অনেক ফারাক। পুরোনো কমান্ড্যান্ট এই শাস্তি-প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক ও মহা সমর্থক ছিলেন, আর নতুন কমান্ড্যান্ট এই প্রথা ও বিচার-প্রক্রিয়ার উচ্ছেদ চাচ্ছেন। অফিসার ভদ্রলোক এখানে নতুন কমান্ড্যান্টের ওপর মহা ক্ষিপ্ত। কারণ তিনি এই নির্যাতন-মেশিনটি উপেক্ষা করছেন এবং জনগণের আগ্রহ এর থেকে সরিয়ে সরকার চালানোর আমলাতন্ত্রের দিকে নিয়ে গেছেন। একসময় অফিসার ভাবেন যে যেহেতু পর্যটক তার এই মেশিনের মাহাত্ম্য বুঝেছেন, অতএব তিনি এই মেশিন ও এর বিচার ও শাস্তিপ্রদান-প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানাবেন, তার হয়ে নতুন কমান্ড্যান্টকে এর পক্ষে বলবেন। কিন্তু পর্যটক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি কোন্ পক্ষে। হতাশ অফিসার তখন দণ্ডিত আসামিকে ছেড়ে দেন এবং নিজেই উঠে যান মেশিনে। আমরা অফিসারের নির্মম মৃত্যু প্রত্যক্ষ করি; সেই সঙ্গে কাফকার চূড়ান্ত 'আয়রনি'রও দেখা পাই: যে অফিসার এতক্ষণ বকবক করেছেন যে কীভাবে আসামিরা তাদের ১২ ঘণ্টার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার ষষ্ঠতম ঘণ্টায় 'আলোকপ্রাপ্ত' হয়, সেই তিনি তেমন কোনো আলোকেরই দেখা পেলেন না। সবই যে আদতে বর্বরতা, তা বেশ কৌতুকী ব্যঙ্গে কাফকা বুঝিয়ে দেন এখানে। অফিসারের এই মৃত্যুর পরই পর্যটক দ্বীপ ছেড়ে পালান, এর আগে তিনি অবশ্য দ্বীপটির চা-খানায় বা চায়ের ক্যান্টিনে একটা টেবিলের নিচে পুরোনো কমান্ড্যান্টের কবর দেখেন। কবরের ফলকে যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে একদিন পুরোনো কমান্ড্যান্ট আবার জেগে উঠবেন আর তার বর্বর অনুসারীরা আবার এ উপনিবেশের দখল নেবে, তাতে পাঠকের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের বলা হয়: 'বিশ্বাস রাখুন এবং দেখতে থাকুন!' পুরো কাফকা-সাহিত্যে অন্য কোথাও আর এভাবে স্পষ্ট বিপদের সংকেত বা অশুভের ঘোষণা দেওয়া হয়নি, আর কাফকা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ-বাইশ বছর আগেই তাঁর দিব্য দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের জার্মান নাৎসি বর্বরতাকে দেখতে পেয়েছিলেন, যে বর্বরতায় প্রাণ হারায় তার তিন বোনই এবং কোটি কোটি মানুষ, এই যে কাফকা-মিথ, এতে 'দণ্ড উপনিবেশে' গল্পের নির্যাতন-মেশিন ও কবর ফলকের গায়ে লেখা এই ঘোষণা

– 'বিশ্বাস রাখুন এবং দেখতে থাকুন!' – বিরাট ভূমিকা রাখে। যা হোক, পুরোনো কমান্ড্যান্টের কবর দেখার পরে, গল্পের শেষে, তার সঙ্গে দ্বীপ ছাড়তে প্রত্যাশী দণ্ডিত মানুষ ও সৈনিকটিকে সঙ্গে না-নিয়েই পর্যটক নৌকায় উঠে একরকম পালিয়ে যান।

ফ্রানৎস কাফকার উর্বর ও অদ্বিতীয় কল্পনাশক্তির খুব বড় উদাহরণ এই নির্যাতন-মেশিনের ধারণা ও ধাপে ধাপে, বাক্যের পরে বাক্যে, এর নিখুঁত নির্মাণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একে তুলনা করা হয়েছে হিটলারের নাৎসি বাহিনী উদ্ভাবিত 'গ্যাস চেম্বার'-এর সঙ্গে। সম্ভবত সরকারি বিমা কোম্পানিতে চাকরির অভিজ্ঞতা থেকেই কাফকা এই মেশিনের ধারণাটি পেয়েছিলেন। তিনি শ্রমিক দুর্ঘটনার বিমা দাবির ফাইলগুলোতে প্রায়ই দেখতেন কীভাবে শিল্প-কারখানার মেশিনে শ্রমিকেরা হাত, হাতের আঙুল, পা ইত্যাদি হারায়। আর একই সঙ্গে এটাও বেশ একটা কাফকায়েস্ক মোচড় যে মানুষ মারার এই মেশিনটি কিনা আসলে একটি লেখার মেশিন – এর অসংখ্য সুই দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের শরীরে তাদের অপরাধের কথা লিখে দেওয়া হয়। মেশিনটির বিরাট সমর্থক অফিসারটির গায়ে যখন লেখা হয় 'ন্যায়পরায়ণ হও!', তখন পুরো মেশিন ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিচার-প্রক্রিয়াটি যে ন্যায়পরায়ণ ও সঠিক ছিল না, সেটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাফকার এই বক্রোক্তি এখানেই থেমে থাকে না, এটি রীতিমতো বরং এক উপহাস হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি যে অফিসারটির গায়ে এই শব্দটি লিখতে গিয়ে পুরো মেশিনটিই ভেঙে পড়ল। তার মানে কতখানি ন্যায়নীতিহীন ছিল এই মেশিন নিজেও!

কাফকা-গবেষকেরা এই মানুষ হত্যার বা লেখার মেশিনটিকে 'মেটাফর' বা রূপক হিসেবে দেখেছেন; এটি কাফকার নিজের লেখালেখির রূপক, যেখানে 'নিপীড়নের' পরে আসে 'আলোকপ্রাপ্তি', যেমনটা কাফকা বিশ্বাস করতেন তাঁর নিজের লেখালেখির ক্ষেত্রে। কাফকা মনে করতেন, নিজের সৃজনীশক্তির ওপরে 'নির্যাতন' চালিয়েই সম্ভব লেখালেখির উত্তুঙ্গ মহিমা স্পর্শ করা।

দার্শনিক শোপেনহাউয়ার ভাবতেন এই পৃথিবীটাই একটি 'দণ্ড বা শাস্তি উপনিবেশ', তিনি বলতেন এ পৃথিবী 'Strafanstalt' বা 'প্রায়শ্চিত্তের জায়গা'; এই শব্দটির সঙ্গে আমরা মিল পাই গল্পের নামের 'Stafkolonie'-এর। গল্পটি পড়তে অ্যালিগরির ('allegory' অর্থাৎ রূপকাশ্রয়ী কাহিনি) মতো লাগলেও তখনকার ইউরোপের বাইরের উপনিবেশগুলোতে দৃশ্যমান বর্বরতার বাস্তব উপাখ্যান থেকে এর দূরত্ব একেবারেই বেশি নয়। কাফকা যদিও কখনো ইউরোপের বাইরে যাননি, তিনি ইউরোপের নানা বৃহৎ শক্তিশাসিত কলোনিগুলোতে কী চলছে তা ভালোভাবেই জানতেন। তাঁর এক মামা ইওসেফ লাওভি ১৮৯১ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার কঙ্গোতে বাধ্যতামূলক শ্রমে বানানো এক রেলওয়ের প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছিলেন; তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই কাফকা সম্ভবত নির্মাণ করেন 'দণ্ড উপনিবেশ'-এর ভূগোল, তিনি জানতেন ফরাসি উপনিবেশ ডেভিলস্ আইল্যান্ডে (শয়তানের দ্বীপ) কীভাবে ক্যাপ্টেন ড্রেইফাস্‌কে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এখনকার নামিবিয়াতে (তখনকার সাউথ-ওয়েস্ট

আফ্রিকা) জার্মান ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ কীভাবে হেরেরো বিদ্রোহে গণহত্যার ইতিহাস চাপা দিয়েছিল, তা-ও কাকফা জানতেন। গল্পের অন্যতম প্রধান বাক্য, 'তারা অপরাধকে অনুভব করবে তাদের নিজেদের গায়ের মাংসে' – তখনকার দিনের হেরেরো বিদ্রোহীদের নিয়ে জার্মান চায়ের টেবিলে বাস্তবেই এ বাক্যটি উচ্চারিত হতো। ১৮৯৪ সালে জার্মান সোশালিস্ট নেতা অগাস্ট বেবেল শাসকদের চমকে দিয়েছিলেন উপনিবেশগুলোতে শাস্তির জন্য ব্যবহার করা হিপোপটেমাসের চামড়ার তৈরি চাবুক জনসমক্ষে দেখিয়ে, যদিও জার্মান সরকার এর সত্যতা অস্বীকার করেছিল।

এর আগের গল্পগুলোর মতো এখানেও দুই বিপরীতধর্মী বিশ্ববীক্ষার সন্তান মেলে। একদিকে বর্বর অফিসারের দিক থেকে নির্যাতন-মেশিনটির প্রতি প্রগাঢ়, অনেকটা ধর্মভক্তির মতো ভালোবাসা; অন্যদিকে পর্যটকের লিবারাল-মানবিক জীবনদর্শন। কিন্তু আগের গল্পগুলোতে যে রকম দুটি বিশ্ববীক্ষাই সমান সমাদৃত, কোনো একটির প্রতি সমর্থন আর অন্যটির প্রতি বিরাগ দেখানো হয়নি – এখানে তা নয়; গল্পের কথকের সহানুভূতি এখানে স্পষ্ট পর্যটকের লিবারাল দর্শনের প্রতিই।

নির্যাতন-মেশিনটি কীভাবে কাজ করে, তার যে ছক-বাঁধানো বর্ণনা কাফকা দিয়েছেন, তার মধ্যে 'নির্যাতন' নিয়ে কাফকার রুগ্‌ণ ঝোঁকেরও প্রকাশ মেলে। তাঁর ডায়েরির পাতায় আমরা অনেকবার দেখি তাঁর বীভৎস সব ফ্যান্টাসি: কীভাবে তিনি জানালা থেকে লাফ দেবেন, কীভাবে জানালার কাচ তাকে কেটে ফেলবে, কীভাবে মাংস কাটার মেশিন তাঁর শরীরের পাশটা কেটে নেবে, কসাইয়ের ছুরি তাকে কী করে কুচি কুচি করবে, তারপর টুকরোগুলো কী করে কুকুরকে খাওয়ানো হবে, ইত্যাদি। তাঁর এই 'নির্যাতন' ফ্যান্টাসি তুমুল আকার ধারণ করে অক্টোবর ১৯১৪-এর দিকে, যখন তিনি *বিচার* উপন্যাস লেখায় ক্ষান্তি দিয়ে এই গল্পটি লেখা শুরু করেন। মোটামুটি কাছাকাছি সময়েই তিনি লেখেন *বিচার* উপন্যাসের 'চাবুকধারী' ('The Thrasher') অধ্যায়টি, যেখানে জোসেফ কে.-কে গ্রেপ্তার করা একজন রক্ষীকে সামান্য ভুলের জন্য ন্যাংটো করে চাবকানো হয়। এরই মাত্র কয়েক মাস আগে ফেলিস বাউয়ার কাফকার সঙ্গে বাগ্‌দান ভেঙে দিয়েছেন, কাফকাকে দোষ দেওয়া হয়েছে ফেলিসের বান্ধবী গ্রেটে ব্লখের সঙ্গে গোপনে সমান্তরাল প্রেম চালানোর জন্য, কাফকার তখন অপরাধবোধে চূড়ান্ত জর্জর অবস্থা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নির্যাতন (torture)-সম্পর্কিত কাফকার পড়াশোনা – শুধু সাখার-মাসোখের *Venus in Furs*-ই নয়, তিনি পড়লেন ফরাসি অবক্ষয়বাদী লেখক অক্টাভে মিরবো'র কুখ্যাত উপন্যাস *The Torture Garden* (১৮৯৯)। এ-উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, ইউরোপিয়ান দর্শনার্থীরা এক চায়নিজ বন্দিশিবির দেখতে গেছেন, ওটার বাগানে বন্দীদের ওপরে চলছে যত রকমের বিচিত্র, 'সৃজনশীল' নির্যাতন-উৎপীড়ন। 'দণ্ড উপনিবেশে' গল্পের প্রাচ্যদেশীয় পটভূমি (যদিও তা স্পষ্ট করে কোথাও বলা হয়নি) সম্ভবত এই চায়নিজ বাগান থেকেই নেওয়া।

গল্পের দু-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক:

১. পুরোনো কমান্ড্যান্ট, যিনি বর্বর দণ্ডবিধি ও শাস্তি-প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক, তাকে বলা

হচ্ছে 'একই সঙ্গে অনেক কিছু – সৈনিক, বিচারক, প্রকৌশলী, কেমিস্ট এবং নকশাবিদ'। বিখ্যাত কাফকা-গবেষক স্যার ম্যালকম প্যাস্‌লি জানাচ্ছেন যে এই কমাড্যান্ট যখন একসঙ্গে এত কিছু, তার মানে সে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে, ঈশ্বর-সমতুল্য কিছু। ম্যালকম প্যাস্‌লির কথা বলেই এটিকে উড়িয়ে দেওয়া কষ্টকর।

২. পুরোনো কমান্ড্যান্টের হিসাবে, ন্যায়বিচারের ধারণার গোড়ায় আছে এই অনুমান যে অপরাধবোধ একটি নিশ্চিত, বিনা-প্রশ্নের বিষয় – কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মধ্য দিয়েই অপরাধ অটোমেটিক্যালি প্রমাণ হয়ে যায়। অতএব ন্যায়বিচার আর শাস্তি – সমার্থক দুটি শব্দ; আর শাস্তি মানেই গুরু শাস্তি, মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি, তা ছাড়া আবার শাস্তি হয়? কারণ একমাত্র মৃত্যুদণ্ডের সময় নির্যাতনের মধ্য দিয়েই অপরাধীকে বোঝানো সম্ভব তার অপরাধের গুরুত্ব আর অপরাধীর পক্ষেও শরীরের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থার মধ্য দিয়েই শেষমেশ পাওয়া সম্ভব 'অন্তর্দৃষ্টি'। পুরোনো কমান্ড্যান্ট ও আজকের অফিসারটি এই 'রুগ্ণ' ধারণারই বিশ্বাসী মানুষ।

৩. এ গল্পে অনেক গবেষক ধর্মের সূক্ষ্ম কিন্তু বিধ্বংসী সমালোচনা আছে বলে মনে করেছেন। খ্রিষ্টধর্ম ও আরো অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলোতে ত্যাগ, তিতিক্ষা, পীড়িত হওয়ার প্রতি খোদার যে সমর্থন ও পক্ষপাতের কথা বলা হয়েছে, এ গল্প যেন তারই সমালোচনা। ধর্মের বাণীর মধ্যে কাফকা হয়তো সুসংগঠিত নিষ্ঠুরতার ছবি দেখেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে বলা হচ্ছে 'আলোকের প্রাপ্তি' বা 'ঈশ্বরের সন্ধান' লাভ করা সম্ভব, আর আরো বলা হচ্ছে যারা সেই দৃশ্যের সাক্ষী হবে তারা যেন পরম (absolute) ন্যায়বিচার প্রত্যক্ষ করবে। নিট্‌শে তাঁর বিখ্যাত *On the Genealogy of Morals* গ্রন্থে এর বর্ণনা দিতে গিয়ে একসময় স্পষ্ট ভাষায় বলছেন: 'খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা পীড়ন বা যন্ত্রণার মধ্যে রূপদান করেছেন মুক্তির এক গোপন মহাযজ্ঞকে।' আধুনিক হয়ে উঠতে থাকা পৃথিবীতে ধর্মের এসব কঠোর অনুশাসন যেমন কিছুটা অতীতের বিষয়, তেমনই পুরোনো কম্যান্ড্যান্টকেও আমরা দেখি কবর দেওয়া হয়েছে পুরোনো এক দালানে, যার মধ্যে ফুটে আছে 'অতীতকালের স্বাক্ষর'।

এ গল্পটি প্রথমবার পড়লে আপনার হয়তো মনে হবে এটি 'রায়' বা 'রূপান্তর'-এর মতো উৎকৃষ্ট কোনো গল্প নয়। সত্যিই এতে দুই বিরোধী বিশ্বাসের যুদ্ধ আছে বটে, কিন্তু আগের গল্প দুটির মতো টান টান ব্যাপারটি এখানে নেই। আবার যেভাবে পুরো গল্পটি বলা হয়েছে, তাতে কাফকার রহস্যময়তা হারিয়ে এটি খানিকটা 'অ্যালিগরি'তে (প্রতীকাশ্রয়ী কাহিনি) পরিণত হয়েছে বলেও মনে হবে। শাস্তির বর্ণনার মধ্যে বেশ বাড়াবাড়ি আছে বলেও আপনার ধারণা জন্মাবে। এসব মিলে আপনার মনে হতে পারে 'দণ্ড উপনিবেশে' খুব যন্ত্রণাদায়ক, নির্যাতনময়, একটি অসুস্থ কাহিনি; কিন্তু এটি নিশ্চিত যে এই গল্পটি শেষ করার রেশ আপনার স্মৃতি ও বিবেকে থেকে যাবে দীর্ঘদিন। আর এ কারণেই আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান রচনা বলে মানা হয় এটিকে, বিশেষ করে উপনিবেশ-উত্তর এই পৃথিবীতে যেখানে অতীতের বড় উপনিবেশগুলোতে পৃথিবীকে 'সভ্য' করার নামে আসলে কী ঘটেছিল তা নিয়ে এখন বিস্তর গবেষণা চলছে। যতই

যন্ত্রণাদায়ক হোক, এটি জরুরি একটি গল্প, নিঃসন্দেহে। আর এ গল্পের 'যন্ত্রণাদায়ক' ব্যাপারটি নিয়ে কাফকা তাঁর প্রকাশককে ১৯১৬ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে লিখেছিলেন: 'আমার এই গল্পটির ব্যাখ্যায় আমি স্রেফ এটুকুই যোগ করব যে, শুধু এ গল্পটিই যন্ত্রণাদায়ক এমন নয় বরং এই যে আমরা সবাই, বিশেষ করে আমি, যে সময়টিতে বাস করছি সেটিই তো যন্ত্রণাদায়ক।'

এক গ্রাম্য ডাক্তার – *কিছু ছোট কাহিনি*

১৪টি গল্পের এই সংকলন, কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত ষষ্ঠ বই, প্রথম বের হয় ১৯১৯ সালের শেষ দিকে মিউনিখ ও লাইপ্‌জিগ থেকে; প্রকাশক কুর্ট ভোলফ্। সেই বইতে গল্পগুলো যে ক্রমানুসারে ছাপা হয়েছিল, এখানে বাংলায় একই ক্রম অনুসরণ করা হলো। এ বইয়ের ১৪টি গল্পের পরে যে গল্পটি আছে – অর্থাৎ 'কয়লা-বালতির সওয়ারি' – সেটিও কাফকা শুরুতে এ বইয়ে স্থান দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু প্রথম প্রুফ দেখার সময় তিনি সেটি এখান থেকে বাদ দিয়ে দেন। এই গল্পগুলো কাফকা লেখেন ১৯১৬ সালের নভেম্বরের শেষ থেকে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের প্রথমার্ধের মধ্যে; শুধু ব্যতিক্রম দুটি গল্প 'আইনের দরজায়' এবং 'একটি স্বপ্ন' – ১৯১৪-১৫ সালে কাফকা যখন তাঁর উপন্যাস *বিচার* লিখছেন, তখন লেখা হয় এ দুটি। দুটিই *বিচার* উপন্যাসের অংশ। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাফকা প্রথম এই ১৪টি গল্পের সংকলন বের করার পরিকল্পনা করেন। ১৯১৭ সালের এপ্রিলে তিনি মার্টিন বুবারের কাছে ছাপার জন্য ১২টি গল্প পাঠান, বুবারকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এই ১২টি থেকে বেছে নিয়ে যেটা খুশি তাঁর জায়োনিস্ট আন্দোলনের সাময়িকী *Der Jude (The Jew)*-এ প্রকাশ করার। এ সময়ে কাফকা এই সংকলটির নাম ঠিক করেন 'দায়িত্ব' ('Responsibility'; 'Verantwortung')। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে কাফকা এখানকার ১৩টি গল্প পাঠান তাঁর প্রকাশক কুর্ট ভোলফের কাছে; প্রকাশক উত্তরে জানান, তিনি এগুলো একত্রে করে একটি বই বের করতে চাচ্ছেন। ১৯১৭-র আগস্টে কাফকা প্রকাশকের এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান, প্রকাশককে গল্পগুলোর ক্রম লিখে পাঠান, সেই সঙ্গে বইয়ের নামটিও: '*এক গ্রাম্য ডাক্তার - কিছু ছোট কাহিনি*'। তিনি আরো জানান যে বইটি তাঁর বাবাকে উৎসর্গ করা হবে। যুদ্ধকালীন ছাপাখানার সমস্যার কারণে বইটি বেরোনোর জন্য তৈরি থাকলেও, বেরোতে বেরোতে ১৯২০ সালের বসন্তকাল এসে যায়, কিন্তু কপিরাইটে প্রকাশের কাল হিসেবে লেখা থাকে ১৯১৯। এ বইয়ের ইংরেজি নাম: *A Country Doctor. Little Tales;* মূল জার্মানে: *Ein Landarzt: Kleine Erzählungen*।

এবার একটু ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। ১৯১৫ সালের শুরুর দিকে কাফকা তাঁর *বিচার* উপন্যাসের কাজ মাঝপথে থামিয়ে দেন। এ সময় থেকে তিনি লেখালেখি

বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাঁর এই বন্ধ্যা সময়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য লেখা, ছোট গল্প 'ব্লুমফেল্ড, এক প্রবীণ ব্যাচেলর'। এটি ব্লুমফেল্ড নামের অবিবাহিত এক মানুষের গল্প যাকে মনে হয় *বিচার* উপন্যাসের জোসেফ কে.রই আর একটু বয়স্ক ও আরো রুক্ষ-কর্কশ রূপ। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কাফকার অনেক সহকর্মী ও বন্ধু যুদ্ধে চলে গেছে, তিনি নিজেও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় নাম জমা দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি ওই বিমা কোম্পানি তাঁকে কোম্পানির জন্য 'অতি আবশ্যক এক কর্মকর্তা' হিসেবে যুদ্ধে যেতে দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে। অফিসে লোক কম, তাই কাজের চাপ বেড়ে গেল প্রচুর, অন্যদিকে যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, চারদিকে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাল, সেইসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বন্ধুরা ও তার বোনের স্বামীরা পাঠাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতা ও শোচনীয় অবস্থার নানা বিবরণ। এসব কিছু মিলে কাফকার সৃজনীশক্তির ওপর এল বেশ বড় আঘাত, আর তার ওপরে বাসার কোলাহল, হইচই তো আছেই। এ সময়, ১৯১৬ সালের নভেম্বরে, তাঁর সব থেকে প্রিয় ছোট বোন ওট্‌লা কাফকাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে, মলদাউ নদীর (চেক নাম ভ্লতাভা) ওপারে, প্রাগ দুর্গের সীমানাপ্রাচীরের মধ্যে আলকেমিস্ট লেনে ছোট, ২২ নম্বর ঘরটি ভাড়া নিলেন। কাফকা এই ঘরটিই, যেটি এখন প্রাগ ভ্রমণের সময় ট্যুরিস্টরা অবশ্যই দেখতে যান, বেছে নিলেন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত লেখালেখির জন্য নিরিবিলি ও প্রিয় এক জায়গা হিসেবে। তিনি রাতে কোনো দিন এই বাসায় থাকেননি, প্রতিদিন হেঁটে চার্লস ব্রিজ পেরিয়ে পুরোনো প্রাগে বাড়িতে এসে ঘুমিয়েছেন। এ বাসাতেই লেখা হয় কাফকার বিখ্যাত বই *এক গ্রাম্য ডাক্তার*-এর সব কটি গল্প।

কাফকার খুব প্রিয় ছিল এ বইয়ের গল্পগুলো। তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে যে সামান্য কটি লেখা টিকে থাকবে বলে ম্যাক্স ব্রডকে জানিয়েছিলেন, *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ের ১৪টি গল্প সে তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এই গল্পগুলো, ফ্রানৎস কাফকার অধিকাংশ লেখার মতোই, নানাভাবে, নানা রকম দৃষ্টিকোণ থেকে পড়া যায়। আমরা যখন কাফকার কোনো গল্প পড়ি, তখন সাধারণত উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসা করি না, 'এই গল্পের মানে কী?' কারণ আমরা, কাফকা পাঠকেরা, ধরেই নিই কাফকা তাঁর গল্পের 'মানে' বা 'অর্থ' কোনো গোপন বাণী হিসেবে গল্পের বাক্যগুলোর মধ্যে কোনোখানে, নানা ছদ্মাবরণে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই গল্পের বাইরে গিয়ে 'মানে' খোঁজার বদলে, আলব্যের কামুর কাফকা-পাঠ বিষয়ক তত্ত্ব মেনে আমরা গল্পটিই বারবার পড়ি, যেহেতু ওই 'মানে', যেমনটি আগেই বলেছি, আমরা বিশ্বাস করি লুকিয়ে আছে কোনো-না-কোনো বাক্যের আড়ালে। কাফকা-পাঠবিষয়ক এই প্রতিষ্ঠিত সত্য *এক গ্রাম্য ডাক্তার*-এর গল্পগুলোর জন্য খুবই প্রযোজ্য। এ গল্পগুলোর বর্ণনার মধ্য দিয়েই, পড়তে গেলে আপনি দেখবেন, অটোমেটিক বেরিয়ে আসছে এর রূপক (symbol ও metaphor দুই অর্থেই) বা মেটাফিজিক্যাল (সত্তার প্রকৃতি ও জ্ঞানসংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র, যাকে বাংলায় বলা হয় অধিবিদ্যামূলক দর্শন; আরো সোজা ভাষায় বিমূর্ত বা দূরকল্পী আলোচনা) চারিত্র্য। পদার্থবিজ্ঞানের বা বাস্তব পৃথিবীর যেসব

নিয়মকানুন ও সূত্র আমরা সত্য বলে জানি, সেগুলো মন থেকে সরিয়ে রেখেই আমাদের এই বইটি হাতে নিতে হয়, কারণ এখানকার অধিকাংশ লেখায় কাফকা ওসব সূত্রের বা প্রাকৃতিক আইনের ধার ধারেননি। আলেকজান্ডারের যুদ্ধের বিখ্যাত ঘোড়া বুসেফেলাস্ এখানে ডক্টর বুসেফেলাস্, পেশায় উকিল; এক গরিলা এখানে (তার ভাষ্যমতে) নিজেকে মানুষে পরিণত করেছে; বিরাট শরীরের দুই ঘোড়া এখানে অলৌকিকভাবে এক শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধ এক গ্রাম্য ডাক্তারকে অনেক দূরের রোগীর গ্রামে নিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে; আইনের দরজা নামের বিশাল এক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রাম থেকে আসা এক লোক, ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইতে চাইতে, মৃত্যুর কাছে এসে পৌঁছেছে; সম্রাটের কাছ থেকে আমাদের জন্য একটা বাণী নিয়ে বার্তাবাহক অবিশ্বাস্য ও নির্মম এক গোলকধাঁধার মধ্যে দৌড়েই বেড়াচ্ছে; এক বাবা তাঁর ১১টি পুত্রসন্তান নিয়ে অদ্ভুত ও ক্ষমাহীন এবং একই সঙ্গে অর্থহীন এক বিশ্লেষণের খাতা খুলে বসেছেন; ওড্রাডেক নামের অদ্ভুত এক প্রাণী, তার সমতল গঠন, তারা আকৃতির সুতোর নাটাইয়ের মতো প্যাঁচানো দেখতে, সেই তারার মাঝখান দিয়ে আড়াআড়ি বেরিয়ে আছে ছোট কাঠের এক ক্রসবার, সে মানুষের সঙ্গে কথা বলে আর এমনভাবে হাসে যে হাসি হাসা সম্ভব কেবল ফুসফুস না থাকলেই; শেয়ালেরা যুক্তি-তর্ক দিয়ে কী সুন্দর কথা বলে এক রক্ত হিম করা, আরব-ইজরায়েলি সমস্যা নিয়ে লেখা রাজনৈতিক উপাখ্যানে; সম্রাটের প্রাসাদের সামনে দখল নেওয়া উত্তরের যাযাবরেরা জ্যান্ত একটি ষাড়ের মাংস শরীর থেকে খুবলে খুবলে খায় সবার চোখের সামনে।

'রূপান্তর' গল্পে গ্রেগর সামসার পোকা হয়ে যাওয়ার মতোই, এসব ঘটনারও কোনো ব্যাখ্যা চলে না, পাঠককে স্রেফ মেনে নিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকতে হয়, আর কাফকা যে ধাঁধার জগৎ তৈরি করেন, কল্পনার যে পৃথিবী গড়ে তোলেন এর বাক্যে বাক্যে, তার ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় ঘর্মাক্ত হতে হয়। খুবই আনন্দের সে চেষ্টা, খুবই মজার ও বিস্ময়ের সে সফর। এ কারণেই *এক গ্রাম্য ডাক্তার*-এর লেখাগুলো, আজও, নানা ভাষায়, সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক জনপ্রিয়, আজও এই ১৪টি গল্প প্রতিষ্ঠিত ও উঠতি গদ্য-লিখিয়ে ও গল্পকারদের প্রেরণা জোগায় বাস্তব পৃথিবীতে রূপকাহিনি টেনে আনার কৌশল দেখিয়ে, কল্পনার সব শৃঙ্খল খুলে দিয়ে কোনো-না-কোনো গূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটন ও উপস্থাপনের শৈলী শিখিয়ে।

এক গ্রাম্য ডাক্তার বইয়ের প্রধান থিম কী? এত কথা বলা হয়েছে এ বইয়ের থিম নিয়ে, এত কালি আজ পর্যন্ত খরচ হয়েছে যে, পাঠ-পর্যালোচনার এই সীমিত পরিসরে তা তুলে ধরার চেষ্টা করতেও ভয় হয়। তবু খানিকটা প্রয়াস নেওয়া যাক। প্রতিটি গল্প নিয়ে অবশ্য আলাদা পাঠ-পর্যালোচনাও থাকছে এর পরেই। থিমগুলো অতি সংক্ষেপে বললে এ রকম:

১. কাফকা এখানে সাংস্কৃতিক নিরাশাবাদের কথা বলছেন। আপনি যদি এ বইয়ের নামগল্প 'এক গ্রাম্য ডাক্তার', এবং প্রথম গল্প 'নতুন উকিল' ও শেষ গল্প

'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন'-এর দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন কাফকা বোধহয় মূলত বলতে চাইছেন যে আগে পৃথিবী কত ভালো ছিল আর আধুনিক সভ্যতার খপ্পরে পড়ে তা কত বিপর্যয়কর ও যন্ত্রণার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঠকের মনে পড়বে জাঁ-জাক রুশোর কথা; ১৭৫০ সালে রুশো বলেছিলেন যে আদিম সমাজের সহজ-সততার ক্ষয় হয়েছে, সভ্যতা যত পাপ, ভান ও শঠতার পথে এগিয়েছে। 'অ্যাকাডেমির জন্য প্রতিবেদন' গল্পে শিম্পাঞ্জিটি মানুষের মতো যেভাবে থুতু ফেলতে, সিগারেট খেতে ও ব্রান্ডি পান করতে শেখে, তাতে মনে হয় কাফকা সভ্যতার চাকার এসব কৃত্রিম পথে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন। 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পটি শেষ হয় 'সবচেয়ে দুর্ভাগা এই কালের' কথা বলে।

২. আধুনিক সমাজের আধ্যাত্মিক রুগ্ণতাও এই বইয়ের একটি থিম হিসেবে গণ্য হয়েছে। প্রতিটি গল্পের আলাদা ব্যাখ্যা যেহেতু থাকছেই, এখানে এই থিমের সপক্ষে শুধু 'নতুন উকিল' গল্পটির কথাই বলা হলো। এই গল্পে আমরা দেখি আলেকজান্ডার তাঁর বাহিনিকে যে ভারতের (India) দিকে চালিত করেছিলেন তা যতটা না ভূগোলের ভারত, তার চেয়ে বেশি এক আধ্যাত্মিক লক্ষ্য, যার দিকে আমাদের চালিত করার মতো আর কেউ এখন নেই। আলেকজান্ডার যেখানে তার তরবারি সামনে তুলেই মানুষকে পথ দেখাতে পারতেন, সেখানে এই গণতন্ত্র ও কর্তৃত্বের বহুধা বিভক্তির যুগে এখন অনেক মানুষ তাদের তরবারিগুলো কেবল শূন্যে ঘোরানোর ক্ষেত্রেই পারঙ্গম, এর বেশি কিছু নয়। আত্মার ডাক বলে কিছু আর পৃথিবীতে নেই; মানুষের আত্মা এখন আর মানুষকে ডাকে না, ডাকে লোভ-ঘৃণা-হিংস্রতা ও স্বেচ্ছাচারিতা।

৩. এ বইয়ের আরেকটি থিম হচ্ছে মানুষ হওয়া বলতে কী বোঝায়, আর মানুষ ও পশুর মধ্যে ব্যবধান-রেখাটি কোথায়, তার অনুসন্ধান। 'রূপান্তর' গল্পেও মানুষ ও পোকার ভেদরেখা মুছে দিয়ে কাফকা এই থিম নিয়ে আগে কাজ করেছেন। পোকা গ্রেগর সেখানে পোকা হয়ে গিয়েই সংগীত ভালোবাসে, মানুষ থাকতে নয়। এ বইয়ের 'নতুন উকিল' গল্পের আলেকজান্ডারের ঘোড়া বুসেফেলাস্ মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, সে এখন আধুনিক যুগের একজন উকিল। 'রূপান্তর' গল্পে ও 'নতুন উকিল' গল্পে মানুষ থেকে পশু এবং পশু থেকে মানুষে এই রূপান্তরের কাহিনি দুটি পাঠকের সঙ্গে কাফকার ক্ষমাহীন ও নির্দয় এক খেলা। গ্রেগর নামের পোকাটির চেহারা অনুমান করতে গিয়ে আমরা বারবার যে রকম ধাঁধায় পড়ি, তেমনই ধাঁধা তৈরি হয় ঘোড়া বুসেফেলাসের এখনকার চেহারাটি কী তা ভেবে।

মানুষ ও পশুর ব্যবধানরেখা মুছে দিয়ে কাফকা যে সূক্ষ্ম রস করেছেন তা-ই শুধু নয়, ডারউইনের উত্থানের ওই যুগে তিনি জরুরি এক দার্শনিক প্রশ্নও হাজির করেছেন। ডারউইনের বিখ্যাত বই *Origin of Species* (১৮৫৯) মানুষকে তার বিশেষ 'স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব' নামের সিংহাসন থেকে নামিয়ে পশুদের জগতের একজন বানিয়ে দিয়েছিল। এর সঙ্গে যোগ হলেন নিট্শে, শেষ দিককার লেখায় বারবার নিট্শে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন

'মানুষ আসলে কী ধরনের পশু?' এবং বললেন, মানুষ এই অর্থেই অন্য পশুদের থেকে আলাদা যে 'মানুষ হচ্ছে অসুস্থ পশু' (the sick animal)। অন্য পশুরা যেখানে তাদের পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর খাপ খাইয়ে নিতে পারে, মানুষ সেখানে অস্বস্তিতে ভোগে কিংবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খাপ-খাওয়ানোর এই ব্যর্থতা থেকেই, নিট্শের মতে, মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় অব্যাখ্যাত, অদ্ভুত ও ভয়ংকর সব তাড়না, কারণ আমরা 'সবচেয়ে অসফল পশু, সবচেয়ে অসুস্থ, আমাদের সহজাত প্রবণতা থেকে সবচেয়ে বিপজ্জনকভাবে পথ হারানো আর নিশ্চিত এসব কিছু মিলে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং!'

এ বইয়ের ১৪টির মধ্যে ছয়টি গল্পে, নানা রং ও সুরে, কাফকার মানুষ বনাম পশু থিমটি দৃশ্যমান। এগুলো হচ্ছে: 'নতুন উকিল', 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' (লক্ষ করুন ঘোড়াগুলো কীভাবে রোগী বালককে জানালা দিয়ে দেখছে), 'পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা' (যাযাবরেরা এখানে আচরণের দিক থেকে নির্ঘাত পশুর সমতুল্য); 'শেয়াল ও আরব', 'পরিবারের প্রধানের জন্য একটি সমস্যা', এবং 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন'। এই শেষ গল্পটির নায়ক রট্পিটার নামের এক শিম্পাঞ্জি। তার মানুষ হয়ে ওঠাকে রুশোর ধরনে আমরা আদিম সুখী কোনো জীবের সভ্যতার কলুষের মধ্যে নেমে যাওয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি, এবং একই সঙ্গে ডারউইনিয়ান বিবর্তনের হাস্যকর এক আখ্যান হিসেবে একে দেখা যায় যেখানে রট্পিটার বিবর্তনবাদী তত্ত্বের খুব দ্রুত ঘটে যাওয়া এক প্রকাশ – এক জীবনের মধ্যেই শিম্পাঞ্জি থেকে সোজা মানুষ। সে খাঁচার মধ্যে বন্দী থাকতে চায় না বলেই জরুরি ভিত্তিতে মানুষ হয়ে গেল – যেমনটি কিনা ডারউইন বলেছেন যে বিবর্তনবাদ ঘটেছে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জরুরি চাহিদা হিসেবে। রট্পিটারের মানুষে বিবর্তনের পেছনে আছে তার শক্তিশালী ইচ্ছা। নিট্শে ডারউইনের সমালোচনায় বলেছেন যে ডারউইন বিবর্তনবাদের কারণ হিসেবে পরিবেশের প্রভাবকে খুব বড় করে দেখিয়েছেন, কিন্তু আসলে – নিট্শে বলছেন – এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল প্রাণীজগতের ভেতরকার বিকাশের তাড়না যা, তাঁর ভাষায়, তাঁর বিখ্যাত 'ক্ষমতাশালী হওয়ার ইচ্ছা'র তাড়না, আর ক্ষমতা-অর্জনের এই তাড়না ইতিহাসে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে। নিটশে বলছেন: 'মানুষ যখন তার নিজের জন্য স্মৃতি নির্মাণের কথা ভাবল, তার পর থেকে কোনোকিছুই আর আগায়নি রক্ত, নির্যাতন ও শিকার ছাড়া।' রট্পিটারের নিজেকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে মানুষ বানানো কিংবা আরবদের বিরুদ্ধে শেয়ালদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ডাক দেওয়া কিংবা উত্তরের যাযাবরেরা যেভাবে রক্তের হোলি খেলায় মেতে ওঠে – এসব কিছুর মধ্যেই নিট্শের 'ক্ষমতার লোভ' ও 'নিষ্ঠুরতা' তত্ত্বের প্রগাঢ় ছাপ মেলে।

৪. সভ্যতার সমালোচনা যেমন এ বইয়ের থিম, তেমনই অনেক গবেষক মনে করেন এর আরেকটি থিম হচ্ছে সভ্য হওয়ার প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান – সভ্য হওয়ার জন্য কীভাবে নিজেকে শারীরিকভাবে বিক্ষত করতে হয়; বিশেষ করে, কীভাবে নিজের যৌনতার শক্তিকে পঙ্গু করতে হয়। রট্পিটারকে যখন জঙ্গল থেকে ধরা হয়, তখন গুলি তার

জননেন্দ্রিয়র কাছে লাগে – 'পাছার নিচে'; 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের বালকটির ক্ষতও তার কোমর ও পাছার অঞ্চলে; আমাদের মনে পড়ে 'রায়' গল্পে বাবার শরীরে, উরুর কাছে, যুদ্ধের ক্ষতের কথা। গেরহার্ড নিউমান, কাফকা-ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে খুব বিচক্ষণ একজন বলে যার খ্যাতি, তিনি রট্‌পিটারের অভিজ্ঞতাকে বলেন, 'সংস্কৃতি বিষয়টি উদ্ভাবনের এক আদিম বা মৌলিক দৃশ্য', 'নগ্ন শরীর থেকে সামাজিক আইনের দিকে' তার যাত্রার গোঁড়াতে রয়েছে ব্যথা বা যন্ত্রণা।

গ্রাম্য ডাক্তার নিজেও, আহত নয় বটে, কিন্তু যৌন প্রাণপ্রাচুর্যের দিক থেকে মরা এক লোক। এভাবে দেখলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় অব্যবহৃত শুয়োরের খোঁয়াড় এবং তার ভেতর থেকে বের হয়ে আসা প্রাণীদের রূপকের ব্যাপারটি। দুটি প্রকাণ্ড ঘোড়া, শক্তিশালী তাদের পাঁজর আর জানোয়ারসদৃশ এক সহিস যে তাদের ডাকছে 'ভাই' ও বোন' নামে, এর মধ্যে আমরা পাই তরতাজা শারীরিক শক্তির চিহ্ন; এর পরই দেখি সহিস তার শিকার মেয়েটিকে মেয়েটির নাম ধরেই ডাকছে, অন্যদিকে তখন পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে মেয়েটির পরিচয় 'আমার কাজের মেয়ে' বা 'বোকা মেয়েটি' হিসেবে। সহিসের অন্তত মেয়েটির সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, অন্যদিকে ডাক্তারের সম্পর্কের রূপটি কোনো নপুংশক বা খোজা লোকের মতো। যৌনতার শক্তি বা সে-সংক্রান্ত প্রাণপ্রাচুর্যের অভাব আমরা ভালো করে তাকালে খুঁজে পাই 'উপরে, গ্যালারিতে', 'পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা', 'পরিবারের প্রধানের জন্য একটি সমস্যা', 'এগারো পুত্র', 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন' এবং এ বইয়ের নামগল্পে।

৫. এ বইয়ের আরেকটি বড় থিম 'দায়িত্ব'। আমরা আগেই বলেছি কাফকা বইটির নাম প্রথমে *দায়িত্ব* (*Responsibility*; *Verantwortung*) রাখবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন। কেন? 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পে আমরা দেখি ডাক্তার তার রোগীকে বাঁচানোর দায়িত্ব পালনে কীভাবে ব্যর্থ হলেন, আর বোধ করি সে ব্যর্থতা ঢাকার স্বার্থেই তিনি গ্রামবাসীর ধর্মবিশ্বাসহীনতার কথা বলছেন। গ্রামের লোকজন, তার ভাষায়, তাদের যাজককে ভুলে গিয়ে ডাক্তারের বিজ্ঞানের ওপর ভরসা রাখছে। এক দূরের বরফঢাকা গ্রামে এই যদি হয় গ্রামবাসীর প্রবণতা, তাহলে বলতেই হবে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ডাক্তার তার গ্রামবাসীর জন্য ধর্মনিরপেক্ষ কোনো উদ্ধার বা সহায় হওয়ার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ।

অন্য গল্পের নায়কেরাও, যেমন বুসেফেলাস্ ও রট্‌পিটার, তাদের সমাজে মিশতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব সম্ভবত বোধই করে না। ঘোড়া থেকে উকিল হওয়া বুসেফেলাস্ আইনশাস্ত্রের বড় বড় বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকতে অভিলাষী, আর শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ হওয়া রট্‌পিটার স্বাধীনতার সব আশা ত্যাগ করে এটুকুতেই তৃপ্ত যে সে বেরোবার পথ খুঁজে পেয়েছে শিম্পাঞ্জি-কিন্তু-মানুষ নামের এক অদ্ভুত পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে।

দায়িত্ববোধের থিমটি এ বইয়ের অনেক গল্পেই দৃশ্যমান। 'পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা' গল্পে চীনের উত্তর থেকে আসা যাযাবরেরা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার (যার আরেক অর্থ

করা যায় বর্বরতা) চূড়ান্ত উদাহরণ। তারা কাঁচা মাংস খায়, আর মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব, প্রকৃতি ও সংস্কৃতি – ওই সবের মধ্যে কোনো ফারাক করার তোয়াক্কা করে না। সম্রাট চুপ করে বসে থাকেন তাঁর প্রাসাদের দূর অন্দরমহলে, তাঁর যেন কোনো দায়িত্বই নেই প্রজাদের এই যাযাবর গোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করার। শহরের প্রধান স্কোয়ারের দোকানদারদের কাঁধে এখন এই যাযাবরদের তাড়িয়ে দেশ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত। কী হাস্যকর এক পরিস্থিতি!

'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা'র পটভূমিও চীন। কোনো অব্যাখ্যাত এক বাধার কারণে (যে বাধা মনে হয় যেন বাস্তবতার অঙ্গাঙ্গি অংশ) মৃত্যুশয্যায় শায়িত সম্রাটের গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে তার বার্তাবাহকের আর কখনো গন্তব্যে পৌঁছানোই হয়ে ওঠে না। না সে পারে তার ওপর অর্পণ করা দায়িত্ব পালন করতে, না সম্রাট পারেন প্রজাদের কাছে একটি সামান্য (বা অসামান্য) বার্তা পৌঁছানোর মতো সহজ কাজটির সমাধান করতে।

'পাশের গ্রাম' স্কেচে স্থান ও কালকে আমরা দেখি খুব বিপজ্জনক এক বায়বীয় অবস্থায়। আর 'উপরে, গ্যালারিতে' নামের ছোট রচনাটিতে একই অবস্থার দুই চিত্র আমাদের 'দায়িত্ব' শব্দটি নিয়েই নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। এর প্রথম অংশে আমরা জানতে পারি সার্কাসের শিল্পী মেয়েটির দুর্দশা দেখে আমাদের নায়ক-দর্শক গ্যালারি থেকে নিচে নেমে আসবে, 'থামো' বলে সার্কাস থামিয়ে দিয়ে তার দায়িত্ব পালন করবে। আর এর দ্বিতীয় অংশ আমরা দেখি, অমনটা আসলে বাস্তবে ঘটে না, বাস্তবে সার্কাসের মেয়ে সুন্দরভাবে তার খেলা দেখায়, দর্শকেরা তাতে খুশি হয়, হাততালিতে ফেটে পড়ে, আর আমাদের নায়ক তখন কাঁদে। আসলেই বাস্তবে কোন্‌টা ঘটে? নায়কের প্রতিবাদী কাজটি, নাকি তার কান্নার ব্যাপারটি? পৃথিবী যদি ও-রকম দ্ব্যর্থবোধকই হয়, তাহলে আদৌ কি দায়িত্বপূর্ণ কাজটুকু কখনো সমাধা করা সম্ভব?

একইভাবে 'ভাইয়ের হত্যা' গল্পেও আমরা দায়িত্বের প্রশ্নটির মুখোমুখি হই। প্যাল্লাস নামের গোয়েন্দা ভদ্রলোক নির্বিকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন শ্মার কীভাবে ভেজেকে খুন করল, কীভাবে এই খুন ঠেকানোর কোনো চেষ্টাই প্যাল্লাস করল না। মনে হয় যেন 'আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক নাকি?' – বাইবেলের এই প্রশ্নের সামনে সে দ্বিধান্বিত, মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে।

৬. এ বইয়ের আরেকটি থিম বলে ধরা হয় বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব ঘটনাগুলোর বিষয়ে কাফকার ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। উত্তরের যাযাবরদের বর্বরতার গল্পটি কাফকা লেখেন ১৯১৭ সালের মার্চে। আড়াই বছরের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দেশরক্ষা বিষয়ে এ গল্পে তোলা কাফকার প্রশ্নটি – ওই সময়ের আলোকে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এ বইয়েরই অংশ ছিল যে গল্পটি 'কয়লা-বালতির সওয়ারি' – যেটি পরে কাফকা বই থেকে বাদ দিয়ে দেন, সেখানে বর্ণিত যুদ্ধকালীন তীব্র কয়লা-সংকটে শীতে জমে মানুষের মৃত্যু বাস্তবে অহরহই ঘটছিল। এর প্রধান চরিত্র 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের ডাক্তারের মতো একইভাবে ঘুরে মরে বরফের বিস্তীর্ণ মৃত্যুপুরীতে। কাফকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাস্তবেই যুদ্ধফেরত

সৈনিকদের মানসিক বিকার ও যন্ত্রণার লাঘব করতে একটি বড় ক্লিনিক খাড়া করার আরজি জানিয়েছিলেন সরকারের কাছে, যদিও এটির অরগানাইজিং কমিটিতে তিনি থাকতে চাননি।

৭. এ বইয়ের আরেকটি বড় থিম জায়োনিস্ট আন্দোলন (ইহুদিদের আলাদা স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখার রাজনৈতিক আন্দোলন)। 'শেয়াল ও আরব' নামের গল্পটিকে, যার স্থান সম্ভবত প্যালেস্টাইন, চরমপন্থী জায়োনিস্টদের দিবাস্বপ্ন দেখা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনাও বলা যায়। এ গল্পটি মার্টিন বুবারের ইহুদি সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইস্যুভিত্তিক মাসিক পত্রিকা *Der Jude* (*The Jew; ইহুদি*)-এ বেরিয়েছিল 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন' গল্পের সঙ্গে, 'দুটি জীবজন্তুর গল্প' নাম নিয়ে। 'শেয়াল ও আরব' গল্পের ইহুদি বিষয়-সংশ্লিষ্টতা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজনই পড়ে না, এতই স্পষ্ট এর জায়োনিস্ট থিম। কিন্তু 'অ্যাকাডেমির জন্য' গল্পের মধ্যে মার্টিন বুবার জায়োনিজমের কী খুঁজে পেয়েছিলেন এ প্রশ্ন তোলা যায়। ম্যাক্স ব্রড এ প্রসঙ্গে বলেন, ইহুদিদের ইউরোপের মূল সমাজে আত্তীকরণ (assimilation) বিষয়ে লেখা সর্বকালের সবচেয়ে উজ্জ্বল স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গাত্মক রচনা এই রট্পিটার নামের শিম্পাঞ্জির গল্পটি যেখানে রট্পিটারের মানবসমাজে হাস্যকরভাবে মিশে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান পরিমণ্ডলে ইহুদিদের মিশে যাওয়ার, একই সঙ্গে 'রাজি' ও 'গররাজি', আকাঙ্ক্ষাটির। কাফকা-গবেষকেরা এ বইয়ের আরো দুটি গল্পের মধ্যেও জায়োনিস্ট কণ্ঠ খুঁজে পেয়েছেন: 'পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা' ও 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা'। পশ্চিম ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদি জনগণ এবং রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের ধর্মভীরু ইহুদিদের মধ্যকার ফারাক উতরিয়ে কীভাবে বৃহত্তর ইহুদি প্রশ্নে সব ইহুদিরা জাতীয়তাবাদী চেতনায় এক হবে, আর তাদের এক হওয়ার মধ্যে দিয়ে কীভাবে তারা সম্রাটের দপ্তরটিকে অকার্যকর ও অর্থহীন করে তুলবে – এই প্রশ্নের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ গল্প দুটি পড়া যায়। ইহুদি জাতীয়তাবাদের ভালো-মন্দ বা বাস্তবতা-অবাস্তবতা বিষয়ে অবশ্য কাফকার সেরা গল্পটি হচ্ছে 'চীনের মহাপ্রাচীর' ('The Great Wall of China'), যা *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে। প্রসঙ্গত হোরহে লুইস বোরহেস ইঙ্গিত দিয়েছেন যে 'চীনের মহাপ্রাচীর' কাফকার সবচেয়ে সেরা রচনা। এখন *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইটির আপাতদীর্ঘ এই পাঠ-পর্যালোচনার পরে এর ১৪টি গল্পের ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যাখ্যা বিষয়ে সংক্ষেপে আলাদা আলাদা আলোচনা করা যাক।

নতুন উকিল

ছোট, রূপককাহিনির (*Parable*) ধাঁচে লেখা, এই কাহিনিটি কাফকা তাঁর অক্টাভো নোটবইতে ১৯১৭ সালের মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারির কোনো এক সময়ে লেখেন। প্রথম প্রকাশিত হয় দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *মারসিয়াস* (*Marsyas*)-এর জুলাই-আগস্ট ১৯১৭ সংখ্যায়, 'পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা' ও 'ভাইয়ের হত্যা' গল্প

দুটির সঙ্গে। এরপর *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ে কাফকা এটিকে বিশেষ মর্যাদা দেন বইয়ের প্রথম গল্প হিসেবে, এমনকি বইয়ের নামগল্প 'এক গ্রাম্য ডাক্তার'-এর আগেও স্থান দিয়ে। গল্পটির ইংরেজি নাম: 'The New Advocate'; মূল জার্মান: 'Der neue Advokat'।

কাফকার অন্য অনেক প্যারাবলের মতোই এ গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক দূর ইতিহাসের আখ্যান – আলেকজান্ডার দি গ্রেটের কিংবদন্তি। লক্ষণীয় যে এ লেখার নায়ক মেসিডোনিয়ার এই বিখ্যাত সম্রাট নন, এর নায়ক তারই যুদ্ধের ঘোড়া বুসেফেলাস্। 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন' গল্পের নায়ক শিম্পাঞ্জি রট্‌পিটারের মতোই বুসেফেলাস্ এখানে তার জন্তুজীবন বিসর্জন দিয়ে সমাজের উঁচুতলার এক মানুষের জীবন বেছে নিয়েছে। রটপিটারের মতোই বুসেফেলাস্‌ও পণ্ডিত ও জ্ঞানী – সে আমাদের 'নতুন উকিল', যেমনটি গল্পের শিরোনাম, আদালত ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে কিংবা পুরোনো বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে।

এই গল্পটি, যেখানে কাফকা কিংবদন্তির এক অতীতকে জাদু বলে আমাদের এখনকার কিংবদন্তিহীন বাস্তব পৃথিবীতে বসিয়ে দেন, তিনি লেখেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক রক্তপাতের একসময়ে, আর কীভাবে আলেকজান্ডারের সময়ের রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ধারা আজও বয়ে চলেছে সে বিষয়ে তিনি বিরাট জোর দেন। সভ্য মানুষ, কাফকা যেন বলেন, তার অতীতের বর্বর ও পশুসুলভ উত্তরাধিকারের বাইরে যেতে পারেনি। অদ্ভুত যে, এখানে কোনো মানুষ নয় বরং একটি পশু (যে আবার বিখ্যাত এক সম্রাটের হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী তার প্রিয় যুদ্ধের ঘোড়া) পৃথিবীর ইতিহাসের হট্টগোলের বাইরে শান্তির একটু জায়গা খুঁজেছে, যে-জায়গা সে পেয়েও যায় আইনের বইয়ের রহস্যময়তার মধ্যে। কাফকা নিজেও ছিলেন আইনের ছাত্র এবং পুরোদস্তুর ডক্টরেট, সে কথাটিও মনে রাখতে হবে।

যেভাবে বুসেফেলাস্ যুদ্ধের এজেন্ট থেকে আইনবিষয়ক আমলার নির্বিরোধ পেশায় চলে এল, তার মধ্যে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের সঙ্গে কাফকার সময়ের মুমূর্ষু অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যেরও তুলনা টানা চলে। কাফকা যখন এ গল্পটি লেখেন, তখনো তিনি এই সাম্রাজ্যের নাগরিক, যা ১৯১৮ সালের অক্টোবরে এসে অনেকগুলো আলাদা দেশ হয়ে যায়, যার একটি কাফকার চেকোস্লোভাকিয়া। বুসেফেলাসের মহা-রূপান্তরের মতোই অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যও বিরাট রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায় – আমলাতান্ত্রিক অনমনীয়তা ও সরকারি অদক্ষতা একসময়ের বহুজাতিক চেহারা নেওয়া এই সাম্রাজ্যকে সোজা প্রবিষ্ট করিয়ে দেয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরির আলেকজান্ডার, সম্রাট ফ্রানৎস জোসেফ মারা যান ১৯১৬ সালের নভেম্বরে, কাফকা এই গল্পটি লেখার মাত্র কয়েক মাস আগে। কোনো সন্দেহ নেই, খুব ঘনিষ্ঠ পাঠে আপনার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই গল্পে কাফকা বুসেফেলাসের ওপরে ভর করে আমাদের সামনে তীব্র বিদ্রূপাত্মক এক সাংস্কৃতিক সমালোচনা হাজির করেছেন। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলোই যে এখনকার দিনের আধুনিক ইউরোপে ঔপনিবেশিকতাবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার

মধ্য দিয়ে পুনরাভিনীত হচ্ছে, যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার গর্ভেই জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের, তার কথা কাফকা এখানে গূঢ় এক ঢঙে বেশ পরিষ্কার করেই বলেছেন। আর বুসেফেলাস্ যে যুদ্ধ-রক্তপাত থেকে বাঁচতে আইনি পেশার আড়ালে লুকালো, তাকে তো অন্যভাবেও দেখা যায়: আধুনিক পৃথিবীতে যুদ্ধ ও জাতিগত দ্বন্দ্ব এমনভাবে সমাজের রন্ধ্রে মিশে গেছে যে আইনি পেশা বা উচ্চতর পড়াশোনা এখন এক আড়াল বা ভান মাত্র, বাস্তবে এর থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। অন্যদিকে এ গল্পে আমরা দেখি, কাফকা কীভাবে আলেকজান্ডারের দ্বিধাহীনতা ও স্পষ্টতার বিপরীতে আমাদের এখনকার সময়ের দিকভ্রান্ত ও দ্বিধাহীন অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। এই দিকভ্রান্ত অবস্থারই রূপক হিসেবে এখানে এসেছে কাফকার প্রিয় এক রূপক – প্রাচীন গ্রন্থ; বুসেফেলাস সেগুলো পড়ছে গল্পের শেষে এসে। কাফকার ক্ষেত্রে সব সময়ই বই কোনো পথ দেখায় না, কোনো চূড়ান্ত উত্তর দেয় না, বরং অনিশ্চয়তা আরো বাড়ায়, ব্যাখ্যার জঙ্গলের জন্ম দিয়ে আরো বিভ্রান্ত করে।

টীকা:

বুসেফেলাস (পৃ. ২৬১) : আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর যুদ্ধের ঘোড়া যা আলেকজান্ডারের হাতে বশীভূত হওয়ার আগে ছিল জেদি, বদ ও দুর্ধর্ষ, আধুনিককালে তার শান্ত-সমাহিত উকিলের চেহারার ঠিক উল্টোটি। আলেকজান্ডার ছিলেন মেসিডোনিয়ার সম্রাট ফিলিপের পুত্র।

ভারতের দরজা (Gate of India, পৃ. ২৬১): কাফকার পড়া বেশ কিছু মধ্যযুগীয় উপকথা এখানে মনে পড়বে। কাফকা ইহুদি লোককাহিনি খুব পছন্দ করতেন, আর তাতে থাকত এসব উপকথা, যেমন: ভারত অভিমুখে আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযাত্রা তাকে কীভাবে স্বর্গের দরজার কাছে এনেছিল, যদিও তিনি সেই দরজা দিয়ে ঢুকতে পারেননি; কিংবা কীভাবে গগ ও ম্যাগগকে, ইজরায়েলের হারিয়ে যাওয়া উপজাতিকে, আটকে রাখা হয়েছে মধ্য এশিয়াতে, আলেকজান্ডারের তোরণের পেছনে।

এক গ্রাম্য ডাক্তার

ফ্রানৎস কাফকার বিখ্যাত এই ছোট গল্পটি ১৯১৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৯১৭ সালের মধ্য জানুয়ারির কোনো এক সময়ে লেখা। গল্পের পাণ্ডুলিপিটি, যা কাফকা সম্ভবত তাঁর অক্টাভো নোটবুকগুলোর একটিতে লেখেন, হারিয়ে গেছে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কুর্ট ভোলফের অ্যালমানাক 'Die neue Dichtung' (The New Literature)-এ, ১৯১৮ সালে। পরে ১৯১৯ সালে প্রকাশিত ছোট গল্পের বই *এক গ্রাম্য ডাক্তার* ('Ein Landarzt')-এ, এটি হয়ে দাঁড়ায় বইয়ের নামগল্প। ইংরেজি নাম: 'A Country Doctor'; মূল জার্মান: 'Ein Landarzt'।

গল্পটি প্রথম পুরুষে বলা। এর নায়ক গ্রামের এক ডাক্তার, কাফকা তাকে গড়ে তোলেন তাঁর মামা সিগফ্রিড লাউভির আদলে। সিগফ্রিড ছিলেন কাফকার সবচেয়ে প্রিয়

মামা; তিনি মোরাভিয়ার ট্রিয়েশ নামের এক গ্রামে ডাক্তারি চর্চা করতেন। এই গল্পটি কাফকার সবচেয়ে স্পষ্ট যৌন অনুষঙ্গে পূর্ণ রচনা, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের উদ্‌গতি তত্ত্ব (theory of sublimation; প্রবৃত্তিজাত আবেগকে নিজের অজ্ঞাতে উচ্চতর খাতে প্রবাহিত করা বা ঊর্ধ্বগামী করা) এখানে স্পষ্টই হাজির। গ্রাম্য ডাক্তারটি এখানে তার যুবতী, সুন্দরী চাকর মেয়ে রোজ-এর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকছেন দীর্ঘদিন যাবৎ, কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষের ডাক্তার হিসেবে তাঁর পেশার কাজের চাপে তিনি বলতে গেলে রোজকে কখনো খেয়ালই করেননি। ডাক্তারের নিস্তরঙ্গ দৈনন্দিন জীবনে এই অবদমিত যৌন উদ্‌গতিই একসময় ফেটে বেরিয়ে আসে গল্পের লাইনে লাইনে।

এক বরফঢাকা শীতের সন্ধ্যায় ডাক্তারের কাছে ডাক আসে দশ মাইল দূরের গাঁয়ে এক গুরুতর অসুস্থ রোগী দেখতে যাওয়ার; ডাক্তার প্রথমে রওনা দিতে ব্যর্থ হন, কারণ বরফমোড়া (frizid) বা শীতল আবহাওয়ায় তাঁর নিজের ঘোড়াটা মারা গেছে – এই 'শীতলতা' তার পশুপ্রবৃত্তি দমিয়ে রাখার এক পরোক্ষ-উল্লেখ। কিন্তু ডাক্তার যখন আনমনে তার বহু দিনের অব্যবহৃত শুয়োরের খোঁয়াড়ের দরজায় লাথি মারলেন, তিনি ঘোড়ার স্পষ্ট গন্ধে অবাক হয়ে গেলেন। দরজা দিয়ে বাইরে এল দুটি বলশালী ঘোড়া আর তাদের সহিস, সে নিজেও পশুর মতো, চার হাত পায়ে হামা দিয়ে বাইরে এল। সহিস যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাক্তারের পরিচারিকা রোজ-এর ওপরে, তখন মনে হয়, সহিস ডাক্তারের অবদমিত যৌন বাসনার ফেটে পড়ারই রূপক। সহিসকে ঠেকাতে পারলেন না ডাক্তার, রহস্যময় দুই ঘোড়া তাকে চোখের নিমেষে ১০ মাইল দূরের গ্রামে নিয়ে হাজির করল। ডাক্তার তখন দেখছেন কীভাবে সহিস তার বাড়ির এ-ঘর থেকে ও-ঘরে রোজকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ধর্ষণ করবে বলে। এর পর থেকে গল্পটি আরো বেশি ফ্যান্টাসির চেহারা নিয়ে নিল – স্বপ্নের মতোই কাল ও স্থানের সব নিয়ম ও চিহ্ন এখানে তিরোহিত, পুরোটাই মনে হয় দুঃস্বপ্নে দেখা।

রোগীর বাসায় শয্যাশায়ী ছেলেটিকে দেখে ডাক্তার প্রথমে ভাবলেন, তার কোনো অসুখই নেই। কেবল যখন রোগীর বোন একটা রক্তমাখা রুমাল – সম্ভবত ঋতুস্রাব বা কুমারীত্ব হারানোর রূপক – দেখাল, তখনই ডাক্তার খেয়াল করলেন ছেলেটির শরীরের পাশের দিকে একটা বড়, হাতের তালুর আকারের বিশ্রী (বা রূপসী!) ক্ষত, সেটি কিলবিল করছে কড়ে আঙুলের মতো মোটা আর লম্বা অসংখ্য পোকায়। কাফকা-গবেষকদের অনেকেই বলেছেন যে এটা একটা 'মেটাফিজিক্যাল' ক্ষত; এ প্রসঙ্গে তাঁরা উল্লেখ করেছেন পরে ছেলেটির ডাক্তারকে বলা ভয়ংকর কথাটির, যেখানে সে বলছে তার জন্মের সময় সে পৃথিবীতে এসেছে কেবল ওই 'সুন্দর' ক্ষতটি নিয়েই। এখানে আবার আমাদের মাথায় আসে নিট্‌শে – ছেলেটি প্রতিনিধিত্ব করছে মানবজাতির, যা আসলে পশুর জাতি এবং মূলেই অসুস্থ। তা ছাড়া ক্ষতটির সঙ্গে মিলে আছে আবেগজাত প্রগাঢ় ও ধাঁধালো অনেককিছুর। একদিকে এটি দেখতে ভয়ংকর ও ঘেন্না-জাগানো, অন্যদিকে একে কাফকা তুলনা করেছেন ফুলের সঙ্গে, মানে দেখতে সুন্দরও বটে। আমরা আমাদের শরীরের ভেতরটা দেখতে পেলে যেমন ঘেন্না ও ভয় জাগত তেমনই একটা অনুভূতি হয় ক্ষতের

বিবরণটি পড়লে; মনে হয় নারী-যৌনাঙ্গ নিয়ে পুরুষের যে আতঙ্ক ও কৌতূহল, তারই যেন বিবরণ আছে এতে। একই সঙ্গে কাফকা এটিকে বলছেন 'মাটিতে পোঁতা বোমা'। সবকিছুর ওপরে এই ক্ষতের সঙ্গে ডাক্তারের কাজের মেয়ে রোজের স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষতটির বর্ণনা শুরু হয়েছে 'গোলাপের মতো লাল' কথাটি দিয়ে; ইংরেজিতে Rose-red (মূল জার্মানে 'Rosa' অর্থাৎ গোলাপি, বড় হাতের R স্পষ্ট এখানে কাজের মেয়ে Rosa-র সঙ্গে যোগসূত্র ঘটাচ্ছে)। এরপর ডাক্তার রোজের কথাই মনে করলেন, আফসোস করলেন যে তিনি মেয়েটিকে সহিসের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না। এ রকম সময়ে গাঁয়ের প্রবীণেরা ডাক্তারকে উলঙ্গ করে শুইয়ে দিলেন ছেলেটির পাশে, বিছানায়। সমকামিতার আভাস পাওয়া যায় এ দৃশ্যে।

ছেলেটিকে সারিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে একসময় পালালেন ডাক্তার। কিন্তু যে ঘোড়া দুটি তাঁকে চোখের পলকে নিয়ে এসেছে ১০টি মাইল, দেখা গেল এ দফায় তারা চলছে প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, বোঝাই যাচ্ছে তারা আর ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছাবে না কোনো দিন। গল্পের শেষে ডাক্তারের আক্ষেপ যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন, জরুরি ডাকে তাঁর সাড়া দেওয়াই ঠিক হয়নি – ইঙ্গিতটি এখানে খানিকটা স্পষ্ট যে এই জরুরি ডাক তার নিজের অবদমিত যৌন ইচ্ছার হঠাৎ বিস্ফোরিত হওয়ার ডাক এবং সেই ডাকে সাড়া দেওয়ারই এখন শাস্তি ভোগ করছেন এই বৃদ্ধ ডাক্তার।

বিখ্যাত কাফকা-গবেষক রিচি রবার্টসন গল্পের শুরুর দিকে (শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে ঘোড়া ও সহিস বেরিয়ে আসার পরে) কাজের মেয়ে রোজের ডাক্তারের উদ্দেশে মন্তব্য: 'নিজের ঘরের মধ্যে কী লুকানো আছে তা নিজেরই জানার উপায় নেই কখনো,' এর সঙ্গে ফ্রয়েডের সমকালীন বাক্য 'the ego... is not even master in its own house'-এর তুলনা টেনেছেন। বহু বছর ধরে ডাক্তারের দমিয়ে রাখা মনোবাসনা বা যৌনবাসনাকে তার শিকার রোজ নিজেই যেন ব্যঙ্গ করল এখানে।

এ গল্পের শৈলী ও কাঠামো পুরো কাফকা-সৃষ্টিকর্মের মধ্যে অন্যতম বা বিশিষ্ট হয়ে আছে। স্বপ্নচারী বর্ণনার জন্য জুতসই প্রথম পুরুষের কথকের ভঙ্গিটি কাফকা এখানে ভালোভাবে রপ্ত করেছেন; কাফকার প্রথম দিককার রচনায় আমরা এর বিপরীতে দেখি তৃতীয় পুরুষে বলা স্বগতোক্তি। আবার এ গল্পে আলাদা আলাদা ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সফলভাবে কাফকা 'জোড়' নির্মাণ করেছেন। যেমন: শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে আসা ঘোড়া দুটোকে বলা হচ্ছে 'ভাই' ও 'বোন'; পরে আমরা এই ভাইকে দেখি রোগী হিসেবে আর বোনকে দেখি রক্তমাখা রুমাল বের করে ডাক্তারকে সত্য জানাচ্ছে। আবার আগেই বলেছি, কীভাবে রোগীর এই rose-red ক্ষতের মধ্যে লুকিয়ে আছে চাকরানি রোজ, আর কীভাবে ধর্ষণোদ্যত সহিস বেরিয়ে এল ডাক্তারের 'নিজেরই বাড়ি' থেকে, অর্থাৎ ডাক্তারের নিজেরই অবদমিত যৌন চেতনা থেকে। এসব পারস্পরিক সংযুক্ত বিষয়-আশয় থেকেই এ গল্পের অর্থ বা 'মানে' সম্পর্কিত একটা ধারণা মেলে। সে হিসেবে গল্পের বুনোটটি ফ্রয়েড কথিত 'স্বপ্ন' বা 'স্বপ্ন মনস্তত্ত্ব'-এরই মতো। তবে স্বপ্নের খাপছাড়া

চেহারাটি আবার ভেঙেও যায় গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি জায়গায়, যেখানে স্বপ্নের দৌড়কে ছাড়িয়ে যায় যুক্তি, যেমন ডাক্তার যখন ভাবেন যে কীভাবে গায়ের লোকজন ধর্ম-টর্ম ভুলে বিজ্ঞানের কাছ থেকে আশা করছে অলৌকিক ফলাফলের, কীভাবে গ্রামের মানুষের জন্য যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজটি প্রেসক্রিপশন লেখার চেয়ে কঠিন, আর কীভাবে 'এই সবচেয়ে অসুখী সময়ের' কাছে 'উন্মুক্ত' হওয়ার কারণে তার আসলে ভোগান্তি ছাড়া আর অন্য কোনো গতি নেই। এই মন্তব্য বা ভাবনাগুলোই আমাদের, অন্যদিকে, বাধ্য করে গল্পটিকে অবদমিত যৌন বাসনার প্রকাশের চেয়েও অন্য বা বড় কিছু হিসেবে দেখতে; আমরা এর মেটাফিজিক্যাল তাৎপর্য ধরতে পেরেছি ভেবে তখন দ্বিগুণ খুশি হই। আর গল্পের শেষ বাক্যটি যে মহান, বেদবাক্যময় ঢঙে বলা হয় – 'রাতের ঘণ্টার ভুল সংকেতে একবার সাড়া দিয়েছ কি, সেই ভুলের মাশুল দেওয়া শেষ হবে না কোনো দিন' – তাতে বোঝা যায়, কাফকা গল্পটির খুব ফর্মাল ও আড়ম্বরপূর্ণ সমাপ্তি টানলেও এক হাজার ব্যাখ্যার দুয়ার উন্মুক্ত রাখলেন। কী রাতের ঘণ্টা আর কী ভুল সংকেত কিংবা মাশুলই বা কী? কাফকা হঠাৎ করে গল্প শেষ করার এই টেকনিকে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

টীকা:

এত সুন্দর দুটো ঘোড়ার গাড়িতে (পৃ. ২৬৪): ডাক্তারের এই একজোড়া ঘোড়া প্রসঙ্গে মনে আসে হোমারের কবিতায় ঘোড়ার জোড়ার কথা, কিংবা আরো বেশি করে গ্যেয়টের বর্ণনামূলক কবিতা Hermann and Dorothea (১৭৯৭)-এর সর্গ ৫, লাইন ১৩২-৫০, যেখানে হারমান তার সাহসী এক জোড়া স্ট্যালিয়নকে গাড়িতে জুড়ছে। কাফকা গ্যেয়টের কবিতাটি পড়েন ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

উচ্চতর কর্তৃপক্ষ (পৃ. ২৬৬): কাফকা এখানে আমলাতন্ত্রের ভাষা ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। 'By Higher Authority'- কাফকার কালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের নানা সরকারি কাজে বহুল ব্যবহৃত একটি কথা ছিল।

বিছানায় (পৃ. ২৬৭): গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের, যিনি ছিলেন কাফকার অন্যতম প্রিয় লেখক, গল্প 'Legend of St. Julian the Hospitalier' (১৮৭৭)-এর শেষের সঙ্গে তুলনা টানা যায় গল্পের এ অংশের। সেই গল্পের সাধু এক কুষ্ঠরোগীর বিছানায় গিয়ে ওঠেন, তাকে জড়িয়ে ধরেন। পরে দেখা যায় সেই কুষ্ঠরোগীটি স্বয়ং যিশু, যিনি সাধুকে নিয়ে স্বর্গে চলে যান। কাফকার গল্পে ডাক্তার রোগীর বিছানায় রোগীর পাশে শুয়ে পড়েন ঠিকই, কিন্তু আর কোনো অলৌকিক কিছু ঘটে না।

উপরে, গ্যালারিতে

এই ছোট রূপককাহিনি বা প্যারাবলটি কাফকা লেখেন ১৯১৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির কোনো এক সময়ে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ে। লেখাটি পরে আবার ছাপা হয় *Prager Presse* পত্রিকায় ১৯২১ সালের

৩ এপ্রিলের সকালের সংস্করণে। এই পুনর্মুদ্রণটি করা হয় কাফকার অজ্ঞাতেই, তবে তাঁর প্রকাশকের অনুমতি নিয়ে, কিছুদিন আগে প্রকাশিত *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ের (যেখানে এটি তৃতীয় গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে) বিজ্ঞাপনের স্বার্থে। এটির ইংরেজি নাম: 'Up in the Gallery' 'বা' 'In the Gallery'; মূল জার্মানে: 'Auf der Galerie'।

এই প্যারাবলে কাফকার ভাষার ওপর দক্ষতা তাঁর অন্য যেকোনো লেখার চেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এতে মোট দুটি প্যারাগ্রাফ, দুটিই একটি করে দীর্ঘ বাক্য, আর কাহিনির গোড়ায় আছে সার্কাসের এক ঘোড়সওয়ারি মেয়ের দুটি পরস্পরবিরোধী ও ভিন্ন অবস্থার চিত্র এবং সার্কাসের গ্যালারিতে বসা এক দর্শকের সেই দুই অবস্থা দেখে দুটি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া।

প্রথম অংশে আমরা দেখি এক নিষ্ঠুর কড়া রিংমাস্টারের হাতে এই মেয়েটি কীভাবে নাজেহাল হচ্ছে, কীভাবে তার যাতনা চাপা পড়ে যাচ্ছে দর্শকদের হাততালির মধ্যে; আর মেয়েটির প্রতি এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাতে কীভাবে সেই দর্শক গ্যালারি থেকে নেমে সার্কাসের রিংয়ের ভেতরে ঢুকে সার্কাস থামাতে বলছে। কিন্তু গল্পের এই প্রথম অংশটি আসলে সত্য নয়। এটা শুরুই হয়েছে 'যদি-ক্লজ' নামের এক অনুমান দিয়ে, যা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে মিথ্যা; কাফকা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ শুরু করেছেন এই প্রথম প্যারাগ্রাফের সত্যতা নাকচ করে দিয়ে: 'কিন্তু যেহেতু এমনটা ঘটে না...'।

দ্বিতীয় অবস্থাটি এমন: বলাই হচ্ছে, এটাই সত্যিকারের চিত্র, যেখানে সার্কাসের ঘোড়সওয়ারি মেয়েটি আসলে সুন্দর এক মহিলা, আর সেই নিষ্ঠুর পরিচালক বা রিংমাস্টার আসলে মেয়েটিকে তোয়াজ করতেই ব্যস্ত; মেয়েটি যেহেতু ভালো খেলা দেখায়, তাই তিনি তাকে নিজের নাতনির মতোই আদর করেন। কিন্তু মেয়েটির প্রতি এই সুবিচার ও যত্ন দেখে আমাদের নায়ক দর্শক পাঠকের প্রত্যাশা মোতাবেক আচরণ করে না: ঘোড়সওয়ারি মহিলার দারুণ খেলা দেখে, দর্শকদের ও পরিচালকের তার প্রতি সমর্থন ও ভালোবাসা দেখে সে তা উদ্‌যাপন করার বদলে বরং রেলিংয়ে গাল ঠেকিয়ে, গভীর কোনো স্বপ্নে ডুবে গিয়ে, নিজের অজ্ঞাতসারে চোখের পানি ফেলে।

দর্শকটির ব্যাখ্যার-অযোগ্য এই আচরণে পাঠক বিমূঢ় হয়ে যেতে বাধ্য; আর পুরো কাহিনিটিই শেষে এসে কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। বিস্ময়কর এই শেষের আগে পর্যন্ত কাহিনির সব সমান্তরাল উপস্থাপন ও বিপরীতার্থক তুলনাগুলো বেশ গোছানো নিয়ম মেনেই চলছিল, যেমন দুটি প্যারাগ্রাফের বাক্যের গাঁথুনি ও গঠনের মধ্যে অসম্ভব মিল, দুটিই দীর্ঘ একটি করে বাক্য, দুটিরই বাক্যাংশগুলো এমনভাবে সাজানো যে দুটি অবস্থার বিপরীত চিত্র জলের মতো স্বচ্ছই শুধু নয়, যথেষ্ট কৌশলে বিন্যস্তও বটে। দুটি প্যারাগ্রাফেরই মূল বিষয় ঘোড়সওয়ারি সার্কাসের মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচালক ও এক দর্শকের সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রদান। শুরু থেকে এই দুই বিপরীত অবস্থার পথচলা এতটাই সমান্তরালভাবে ঘটেছে যে পাঠকের প্রত্যাশা জাগে, কাহিনির শেষে গিয়েও সেই সমান্তরাল মনোভঙ্গি বজায় থাকবে। কিন্তু না, গ্যালারির দর্শকটির শেষ প্রতিক্রিয়া কাহিনির পুরো

বিন্যাসের সঙ্গে প্রতারণা করে বসে, পুরো কাহিনিটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

কাফকা তাঁর প্যারাবলগুলোর মোটামুটি সব সময় যে রকম বিস্ময়কর উপসংহার টানেন, তার সঙ্গে এর মিল থাকলেও দর্শকটির এই অদ্ভুত চোখের পানি ফেলা এটিকে প্যারাডক্স বা কূটাভাস বানিয়ে ছাড়ে; আর সব প্যারাডক্সেই যেমন, যখন পাঠক সুন্দর সমাধান বা সমাপ্তি প্রত্যাশা করছে, তখনই আসে সবচেয়ে বড় মোচড়টি, পাঠকের কাছে সবকিছুই গুলিয়ে যায়। এর ফলে এই কাহিনির শেষে যদিও বেশ একটা ফরমাল সমাপ্তির স্বাদ আমরা পাই, তবুও – ঘনিষ্ঠ পাঠের মধ্য দিয়ে – আমরা দেখি যে এই তথাকথিত সমাপ্তি হঠাৎ এ কাহিনির অর্থের নানামুখী বিরাট সব দরজা খুলে দিয়েছে। সবশেষে থাকে শুধু বিভ্রান্তিটুকুই, শুধু মনের মধ্যে কোনো একটা ছাপ, যা ধরে ওঠা দুরূহ।

পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা

কাফকার যথেষ্ট পাঠকপ্রিয় এই ক্ষুদ্র গল্পটি তাঁর বই *এক গ্রাম্য ডাক্তার*-এর চতুর্থ গল্প। ১৯১৭ সালের মার্চের শেষ ভাগে কাফকা প্রথম এটি লেখেন তাঁর আটটি নীল অক্টাভো নোটবইয়ের 'C' বইয়ে। লেখাটির মূল নাম কাফকা পাণ্ডুলিপিতে পরে যোগ করেন 'চীনের এক পুরোনো পাণ্ডুলিপি' ('An Old Manuscript from China') হিসেবে। এর ফলে কাফকার চীনবিষয়ক অন্য লেখাগুলোর সঙ্গে এটির একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়: একই নোট বইয়ে এ গল্পটির ঠিক আগেই আছে কাফকার বিখ্যাত গল্প 'চীনের মহাপ্রাচীর' এবং 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা' নামের লেখা দুটি। 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা' শিরোনামের লেখাটি কাফকা বড় গল্প 'চীনের মহাপ্রাচীর' (যা বাংলা *গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে) থেকে তুলে নিয়ে এখানে আলোচ্য গল্পটির সঙ্গে প্রকাশ করেন তাঁর ছোটগল্পের বই *এক গ্রাম্য ডাক্তার*-এ ১৯১৯ সালে। এ বইতে স্থান পাওয়ার আগে এই গল্পটি ছাপা হয়েছিল *Marsyas* নামের দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকার জুলাই-আগস্ট ১৯১৭ সংখ্যায় – 'নতুন উকিল' ও 'ভাইয়ের হত্যা' নামের এ বইয়েরই অন্য দুটি গল্পের সঙ্গে। গল্পটি পরে কাফকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফেলিক্স ভেলট্শ্ সম্পাদিত সাপ্তাহিক জায়োনিস্ট সংবাদপত্র *Selbstwehr*-এ পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, আপাতচোখে কাফকার পূর্বানুমতি না নিয়েই। এটির ইংরেজি নাম: 'A Leaf from an Old Manuscript' বা 'An Old Manuscript' বা 'An Ancient Manuscript'; মূল জার্মানে: 'Ein Altes Blatt'।

গল্পটি আমরা শুনি এক মুচির জবানে, যার দোকানটি চীনের পিকিং শহরের প্রধান স্কোয়ারে, যেখানে রয়েছে সম্রাটের প্রাসাদও। এই রাজধানী শহরে এবার ঢুকে পড়েছে উত্তরের যাযাবরেরা, সংখ্যায় তারা বাড়ছেই, পুরো দখল করে নিয়েছে প্রধান স্কোয়ার; এবং আমরা জানতে পারি যে সম্রাটের প্রাসাদই লোভ দেখিয়ে এদের এখানে টেনে এনেছে। পুরো গল্পে আমরা এই যাযাবরদের অসংখ্য নৃশংসতার ও কাঁচা মাংস খাওয়ার (এদের

ঘোড়াগুলোও মাংসখেকো) কথা শুনি; বর্বরতার চূড়ান্ত করে ছাড়ে এরা যখন কসাইয়ের তাজা ষাঁড়টিকে সবাই মিলে জ্যান্ত খুবলে খুবলে খায়। ঠিক এমন সময় প্রাসাদের এক জানালায় জনগণ দেখতে পায় সম্রাটকে, তিনি মাথা নিচু করে দেখে যান কীভাবে বহিঃশত্রুরা তার দেশ ও শহরকে তছনছ করছে। গল্পটি শেষ হয় এই মুচির সব জনগণের পক্ষ থেকে আফসোস প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সে জানায়, দেশরক্ষার ভার এখন পড়েছে তার মতো কারিগর আর ব্যাপারীদের হাতে, যাদের কোনো যোগ্যতা নেই অমন কাজের; আর এই যে ভুল লোকদের হাতে দেশরক্ষার মতো বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অপর্ণ – এই ভুল-বোঝাবুঝির কারণেই একদিন চীনের ধ্বংস নেমে আসবে।

এ গল্পটি পড়তে গেলে আমাদের কাফকার অন্যতম প্রধান গল্প 'চীনের মহাপ্রাচীর' ('The Great Wall of China')-এর কথা মনে পড়বেই। সেখানে আমরা দেখি, উত্তরের এই যাযাবরদের হাত থেকে বাঁচতেই বানানো হয়েছিল বিশাল প্রাচীরটি, কিন্তু যাযাবরদের কখনোই দেখি না, প্রাচীন সব গ্রন্থে তাদের উল্লেখ দেখি মাত্র; আর এ গল্পে সেই যাযাবরেরা সরাসরি চীনের রাজধানীতে উপস্থিত – আর সেটা আমরা জানছি প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপির পাতা থেকে। দুটি গল্পের প্লট তাই দ্বান্দ্বিক, ভিন্নধর্মী, কিন্তু একই সঙ্গে একটি আরেকটির পরিপূরক। কাফকা এ গল্পে পুরোনো এক পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করে (স্রেফ শিরোনামেই এসেছে এই উল্লেখ, গল্পের শুরুতে বা শেষে যেমনটি থাকে তেমনটি নেই) তাঁর স্কলার বলেছেন। এভাবে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বরাত দিয়ে গল্প লেখা একটি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক কৌশল, যাতে করে লেখকের লেখা পেয়ে যায় ঐতিহাসিক সত্যতার দলিল। অক্টাভো নোটবইগুলোর 'C' বইটিতে যেখানে কাফকা এই গল্পটি লেখেন, তার ঠিক পরেই আছে ছোট একটি খসড়া প্যারাগ্রাফ, যা কাফকা শেষমেশ বাতিল করে দেন, সেই প্যারাগ্রাফে কাফকা লেখেন যে এই গল্পটি আসলে প্রাচীন এক চীনা পাণ্ডুলিপির অংশ। পুরোটাই কাল্পনিক – এ আসলে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বরাতে লেখার প্রথাগত কৌশল, যা আমরা চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছাতে দেখি হোরহে লুইস বোরহেসের অসংখ্য গল্পে। সম্ভবত কাল্পনিক প্রাচীন পাণ্ডুলিপির নাম উল্লেখ করে লেখার বিষয়টি বোরহেস কাফকার অক্টাভো নোটবইয়ের বাতিল এই প্যারাগ্রাফটি থেকেই পেয়েছিলেন।

মজার বিষয়, এ গল্পে যাযাবরদের কোনো ভাষা নেই, তারা কথা বলে দাঁড়কাকদের মতো করে। কাফকা নামটি এসেছে চেক শব্দ Kavka থেকে, যার অর্থ দাঁড়কাক (jackdaw); কাফকার বাবা হারমান কাফকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লোগোতেও ছিল এই দাঁড়কাকেরই ছবি। আর যাযাবরদের কাঁচা মাংসপ্রীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'রূপান্তর' গল্পের তিন ভাড়াটিয়ার কথা কিংবা 'এক অনশন-শিল্পী' গল্পের চিতা বাঘের কথা। কাফকার প্রতিনায়কেরা এ রকম কাঁচা মাংস পছন্দ করে, অন্যদিকে তার নায়কেরা দেখা যায় ক্ষুধার্ত থাকতেই বেশি ভালোবাসে, যেমন 'রুপান্তর' গল্পের গ্রেগর সামসা, কিংবা 'এক অনশন-শিল্পী'

গল্পের অনশন-শিল্পী, যে তার পুষ্টি আহরণ করে তার এই দুর্বোধ্য শিল্প থেকেই। কাফকা-জীবনীগুলো থেকে আমরা জানি, গপগপ করে মাংস চিবিয়ে খাওয়ার ব্যাপারটির কথা কাফকা তাঁর 'চিরশত্রু' বাবা হারমান কাফকার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন; তাঁর বাবা এ গল্পের বর্বর যাযাবরদের মতোই খাবার টেবিলে খুবই পুরুষালি ঢঙে মাংস ও হাড় চিবিয়ে খেতেন। কাফকা-গবেষকেরা এ গল্পের দাঁড়কাক ও হারমান কাফকার ব্যবসায়িক লোগোর দাঁড়কাক এবং যাযাবরদের মাংস-খাওয়া ও হারমান কাফকার মাংসভোজনের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়ে এমনটাই বলেছেন যে, এ গল্পের চীনা সম্রাট যিনি তাঁর নাগরিকদের ও যাযাবরদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় আসতে পারেন (যেমনটি বাবা হারমান কাফকা ও ছেলে ফ্রানৎস কাফকার মধ্যেও কারো আসা সম্ভব ছিল), তিনি আসলে ঈশ্বরের প্রতীক। কিন্তু কাফকার সাহিত্যভুবনের অন্য সব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতোই এই সম্রাট দূরের কেউ, খুবই দূরের, তিনি মানুষের কোনো কাজেই আসেন না, তার প্রাসাদের ভেতর মহলের কোথায়ও অনেকটা লুকিয়েই থাকেন।

এ গল্পের এই আত্মজৈবনিক ও মনস্তাত্ত্বিক 'অপিনিগরি'সুলভ ব্যাখ্যার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও আছে, যেখানে চীনের সমস্যাকে চীনেরই সমস্যা হিসেবে দেখা হয়েছে। কাফকা জুলিয়াস ডিট্মারের ভ্রমণকাহিনি *নতুন চীনে* (*In The New China*; *Im neuen China*; ১৯১২) পড়েছিলেন; ডিট্মার সে বইতে চীনের সামাজিক সংকটের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে কীভাবে চীনের জনগণ ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের আগ্রাসনকে উপকথার 'উত্তরের যাযাবরদের কাল্পনিক আক্রমণ' হিসেবে দেখছে। এই আলোকে গল্পটি পড়লে মনে হবে কাফকা এখানে পুব বনাম পশ্চিমের, এশিয়া বনাম ইউরোপের, শোষিত উপনিবেশ বনাম শোষক ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যকার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। ডিট্মারের বইয়ে উল্লেখ আছে কীভাবে চিং (Ch'ing) রাজত্বের শেষভাগে সম্রাট তাঁর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন; কাফকার গল্পের শেষ ভাগে সম্রাট ও প্রজাদের মধ্যকার একই বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। পাঠককে মনে রাখতে হবে যে এই গল্পটি কাফকা যখন লেখেন তখন ইউরোপের বিশাল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের সূর্যও অস্ত যাচ্ছে। কাফকা ছিলেন এই সাম্রাজ্যেরই বোহেমিয়া প্রদেশের রাজধানী প্রাগের বাসিন্দা। বিশাল এই সাম্রাজ্য তখন যেমন ভেতর থেকে নানামুখী জাতীয়তাবাদী ও জাতিগত শক্তির চাপে দুর্বল, তেমনই বাইরে থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশাল আঘাতে আহত (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পেছনেও এই সাম্রাজ্যের ভূমিকা ছিল সব থেকে বেশি)। চেক পাসপোর্টধারী, জার্মান ইহুদি কাফকা বিষণ্ন ছিলেন অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের আসন্ন পতন নিয়ে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, বিরাট সাম্রাজ্যের অংশ থেকে হঠাৎ ছোট চেকোস্লোভাকিয়ার নাগরিক হয়ে গেলে তাঁর জন্য যেমন আছে অর্থনৈতিক ঝুঁকি, তেমনই ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনিশ্চয়তা। সেই অনিশ্চয়তার জন্যই হয়তো গল্পের শেষ ভাগে তিনি দোষারোপ করছেন অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান

সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রানৎস জোসেফকে, দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনে তাঁর অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে।

আইনের দরজায়

ফ্রানৎস কাফকার এই প্রচণ্ড শক্তিশালী প্যারাবলটি কাফকা-সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম প্রধান রচনা। অনেক গবেষকই দেখা গেছে কাফকা-সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা শুরু করেন এই লেখাটি দিয়ে, যার মধ্যে 'কাফকায়েস্ক' কথাটির সারবত্তা স্পষ্ট বিদ্যমান।

১৯১৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর কাফকার ডায়েরি এন্ট্রি থেকে জানা যায়, কাফকা এটি লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাস *বিচার* (*The Trial*; *Der Prozess*)-এর অংশ হিসেবে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে, ১৯২৫ সালে। ডায়েরিতে কাফকা লেখেন যে 'দারোয়ানের লোককাহিনি' ('Legend of the Door Keeper'; '*Legende von dem Türhüter*') লেখাটি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট; এমনই নাম দেন তিনি লেখাটির। সম্ভবত এটিই মূল কারণ যে কেন কাফকার জীবদ্দশায় লেখাটি দুই বার প্রকাশিত হয়। কুর্ট ভোলফ্ প্রকাশনা সংস্থা ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে এটি প্রথম প্রকাশ করে সমকালীন লেখকদের লেখার উদাহরণ হিসেবে তাদের অ্যালমানাকে। ম্যাক্স ব্রড পরে এটিকে 'আইনের দরজায়' নাম দিয়ে ১৯১৫ সালে আবার প্রকাশ করেন। *বিচার* উপন্যাসে এটি আছে কারাগারের যাজকের বয়ানে নায়ক জোসেফ কে-কে বলা একটি গল্প হিসেবে, নাম 'আইনের রূপককাহিনি' ('Parable of the Law')। ইংরেজিতে এটির নাম: 'Before the Law'; মূল জার্মান: 'Vor dem Gesetz'।

এই প্যারাবলটি *বিচার* উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও এর তাৎপর্য উপন্যাসটিকে ছাড়িয়ে গেছে, মানবজীবনের অবস্থা বিষয়ে কাফকার দর্শনের অন্যতম মূল কথা হয়ে উঠেছে এটি। এর মূল থিম তিনটি: ১. জীবনের অর্থের অনুসন্ধানে থাকা ব্যক্তির হতাশা; ২. অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যক্তির যে তাড়না সে বিষয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা স্বর্গ ও মর্ত্যের উদাসীনতা; ৩. ব্যক্তিকে খোঁড়া করে দেওয়া এই নিয়ত লড়াইয়ে ব্যক্তির জেতার অক্ষমতা বা সেই দুঃসহ পরিস্থিতিকে অতিক্রম করার প্রয়াসের নিষ্ফলতা। এখানে নায়ক ব্যক্তিটি আটকা পড়ে গেছে কূটাভাসের (paradox) জালে, সে বুঝতে চাইছে দুর্বোধ্য, অতীন্দ্রিয়, ভয় ও বিস্ময় উদ্রেককর 'আইন'কে, অর্থাৎ আমাদের মানবজীবনের পরম কর্তাকে (তিনি যে-ই হোন), কিন্তু সেই কর্তা বা কর্তৃপক্ষ (যে বা যারা পৃথিবীকে চালাচ্ছে) তাকে সেই জ্ঞান নিতে দেবে না, আর পরিশেষে নায়কের মৃত্যু, যে আলোর সন্ধানে সে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে তার দেখা না পেয়েই তার জীবনাবসান। শেষে গিয়ে এটাই মনে হয় যে তার ব্যর্থতার জন্য সে নিজেই দায়ী।

এর নায়ক গ্রাম থেকে আসা এক লোক (a man from the country; Mann vom Lande); এই পরিচয়ের মধ্যেই আছে হিব্রু amha'aretes শব্দের পরোক্ষ-উল্লেখ, যার অর্থ

'গেঁয়ো বোকাসোকা লোক', সেই সঙ্গে আছে ইদ্দিশ amorets শব্দের পরোক্ষ-উল্লেখও, যার অর্থ 'অজ্ঞ' (ignoramus)।

এক লোক জীবনভর চেষ্টা করল আইনের দরজা দিয়ে একটু ভেতরে ঢুকতে, কিন্তু তার সামনে মূর্তিমান বাধা এক দারোয়ান, যে তাকে ভেতরে ঢুকতে না করছে না, কিন্তু বলে দিচ্ছে ভেতরে আছে আরো আরো দারোয়ান, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান বা শক্তিশালী, তারই বরং সব দারোয়ানের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষমতা। এই হুমকি শুনে, আর দারোয়ানটির চেহারা ও তাতারদের মতো দাড়ি দেখে, গেঁয়ো লোকটি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে ওই দরজার সামনে, তার আশা একদিন ভেতরে ঢোকার অনুমতি মিলবে। দারোয়ানকে কত রকমের ঘুষ দেয় সে, কত রকমের প্রশ্ন করে। একবার সে এমনকি দেখে যে 'আইনের দরজাপথ থেকে ভেসে আসছে অনির্বাণ এক দীপ্তি'। কিন্তু ওটুকুই; ওই দীপ্তি তার পর্যন্ত পৌঁছায় না, দারোয়ানের কোনো দিনও একটু দয়া বা মায়া হয় না। শেষে, লোকটির মৃত্যুর মুহূর্তে, দারোয়ান তাকে জানায় যে এই দরজাটা স্রেফ তার জন্য তৈরি করা হয়েছে বলেই আজ পর্যন্ত অন্য কেউ এ দরজার সামনে ভেতরে ঢোকার মিনতি জানাতে আসেনি, আর এখন সে যেহেতু মারা যাচ্ছে, এই দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কাফকার অন্য অনেক গল্পের মতোই (যেমন এই খণ্ডের 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা', কিংবা দ্বিতীয় খণ্ডের 'একটি সাধারণ বিভ্রান্তি', বা 'বিবাহিত যুগল' গল্পগুলোর; কিংবা তাঁর উপন্যাস *দণ্ড ও বিচার*) এখানে দেখা যায় নায়ক তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে না। এখানে দারোয়ানের উচ্চারিত প্রথম বাক্যটিই হরণ করে নেয় গেঁয়ো মানুষটির স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা বা সাহস। তার সঙ্গে আছে লোকটির নিজেরও সংশয় ও সন্দেহ। অন্য কোনো দারোয়ানের দিকে না তাকিয়ে, শুধু এই এক দারোয়ানকে নিয়ে জীবন পার করে দেওয়ার মাধ্যমে সে জীবনের বৃহত্তর চেহারাটি দেখা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে, বৃহত্তর লক্ষ্য বোঝা থেকে নিজেকে ঠকায়। কাফকার লেখার অন্যতম একটি টেকনিক হচ্ছে: একটি মেটাফর নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মেটাফরটিকে আক্ষরিক অর্থে প্রকাশ করা। যেমন – মানুষের জীবন পোকার মতো; এই অতি সাধারণ মেটাফরটিকে কাফকা বাস্তব বানিয়ে ফেলেন গ্রেগর সামসাকে জীবন্ত, পুরোদস্তুর এক তেলাপোকায় রূপান্তর করে দিয়ে। ঠিক তেমনি, এখানে গ্রাম্য লোকটির জীবনের মূল লক্ষ্য দেখা থেকে বিচ্যুতির কথা যখন কাফকা বলেন, তখন আমরা দেখি যে লোকটির দৃষ্টিশক্তি বাস্তবেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আর তার চারপাশের পৃথিবী আঁধার হয়ে আসছে। কাফকা এমন সময় তাঁর স্বভাবসুলভ নিষ্ঠুর কৌতুক করতেও ভোলেন না: আমরা দেখি, লোকটি দারোয়ানের পোশাকের কলারের মাছিগুলোকেও মিনতি জানাচ্ছে ব্যাটার মন একটু গলানোর জন্য।

কাফকা-সাহিত্যে 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ' বা 'কর্তৃপক্ষ' নামের যত ক্ষমতাশালী লোকজন আছে, এই দারোয়ান তাদেরই অন্যতম। 'রায়' ও 'রূপান্তর' গল্পের বাবার মতো, কিংবা

দ্বিতীয় খণ্ডের 'একটি ভাষ্য' গল্পের পুলিশটির মতো, কিংবা তাঁর বিখ্যাত 'বাবাকে লেখা চিঠি'র বাবার মতোই এ গল্পের দারোয়ান প্রার্থনাকারীর বা পুত্রের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে এক বাধার দেয়াল। এর কাছে অনুমতি চেয়ে বা এর সাহায্য চেয়েই প্রার্থনাকারী নিজেকে ব্যর্থতার গহ্বরে ছুড়ে দিচ্ছে, হয় জেনে, না হয় না জেনে। গ্রাম্য লোকটি যদি আইনের দরজা দিয়ে ঢুকতে পারত, সে হয়তো বুঝতে পারত, তার জন্য কী ঠিক। কারণ, আর যা-ই হোক, এই দরজাটা ছিল তো শুধু তার জন্য, শুধুই তার, আর যেমন অনেক কাফকা-গবেষক বলেছেন, তাকে তো ভেতরে ঢুকতে সত্যিকার অর্থে কখনো মানা করা হয়নি, কেবল তার ভেতরে ঢোকাকে দেরি করিয়ে দেওয়া হয়েছে, মৌখিকভাবে তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে মাত্র, বলা হয়েছে, তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব, তবে 'এখন নয়'; বলা হয়েছে 'চেষ্টা করে দেখো না ভেতরে ঢোকার। ভেতরে কিন্তু...অন্য দারোয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে।' কিন্তু আমাদের নায়ক হয় বিভ্রান্ত হয়ে গেল, না হয় ভয় পেয়ে গেল; সে ভেতরে ঢুকল না, অন্য দারোয়ানগুলোর মুখোমুখি হলো না বা মোকাবিলা করল না। এই যে তার ভীতি বা সিদ্ধান্তহীনতা, এরই দায় তাকে দিতে হলো জীবন দিয়ে, জীবনের লক্ষ্যে না পৌঁছানোর ব্যর্থতার দায় নিয়ে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রার্থনাকারীর এই দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব বা কাফকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আত্মজৈবনিক অর্থে বলতে গেলে, পিতার সঙ্গে পুত্রের দ্বন্দ্ব) শুধু এই লোককাহিনিরই মূল সুর না, কাফকা-সাহিত্যেরও অন্যতম প্রধান কথা।

বিচার উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, সেখানে যাজকের কাছ থেকে এই গল্পটি শোনার পরে নায়ক জোসেফ কে. ও যাজক এটির (প্যারাবলটির) অর্থ কী এবং এর ফলাফল হিসেবে কী হতে পারে সে বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করে। সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে কাফকা পাঠকদের জন্য এই প্যারাবলটির একটি ব্যাখ্যাও দাঁড় করান। কিন্তু, কী অদ্ভুত ব্যাপার যে এসব ব্যাখ্যা শুনে জোসেফ কে. তার নিজের বন্দী হয়ে যাওয়া পরিস্থিতি বিষয়ে নতুন কোনো আলো বা সত্যের সন্ধান পাওয়ার বদলে বরং তার বিরুদ্ধে চলা বিচারকাজ নিয়ে আরো বিভ্রান্ত, আরো চরম হতচকিত হয়ে পড়ে।

এই প্যারাবলটি কথাসাহিত্যিক হিসেবে কাফকার অতি অল্প কথার মধ্যে অতি বিরাট জীবনসত্য বা জীবনদর্শন প্রকাশের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একই সঙ্গে দরজার পরে দরজা ও দারোয়ানের পরে দারোয়ানের যে চিত্র কাফকা এখানে এঁকেছেন তাকে আধুনিক পৃথিবীর 'কাফকায়েস্ক' আমলাতন্ত্রের নিখুঁত চিত্র হিসেবেও দেখা হয়। অনেক গবেষক এটিকে 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের মতোই একটি 'দুঃস্বপ্নের' চিত্রণও বলেছেন।

শেয়াল ও আরব

এক গ্রাম্য ডাক্তার গল্পসংকলনের ষষ্ঠ রচনা। এটি একটি ছোট গল্প, এর পাণ্ডুলিপিটি আছে কাফকার আটটি অক্টাভো নোটবইয়ের 'B' নোটবইটিতে। ডিসেম্বর ১৯১৬ থেকে

এপ্রিল ১৯১৭ সালের মধ্যকার কাফকার জীবনের অন্যতম সাহিত্যিকভাবে ফলপ্রসূ পর্বের (যে পর্বে কাফকা প্রায় ১৭টি বিখ্যাত গল্প বা রচনা লেখেন, যার মধ্যে 'চীনের মহাপ্রাচীর' ও 'শিকারি গ্রাখুস'-এর মতো প্রসিদ্ধ গল্পও অন্তর্ভুক্ত, যে দুটি গল্পই থাকছে বাংলা *গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে) কোনো এক সময়ে এটি লেখা। এর প্রথম প্রকাশ হয় মার্টিন বুবারের সাময়িকী *Der Jude* (*The Jew*)-এ, আরেকটি গল্প 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন'-এর সঙ্গে একত্রে 'Two Animal Stories' শিরোনামে। এ পর্বে লেখা অধিকাংশ গল্পের মতো এ দুটি গল্পও পরে কাফকা তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত *এক গ্রাম্য ডাক্তার* গল্পসংকলনের মধ্যে দিয়ে দেন। মার্টিন বুবারের জায়োনিস্ট পত্রিকায় প্রকাশের পরে আবার এটির, কাফকার অনুমতি ছাড়াই, প্রকাশ হয় ডিসেম্বর, ১৯১৭ সালে *Österreichische Morgenzeitung* নামের দৈনিক পত্রিকায়; এবং পরে আবার ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে বার্লিনের একটি প্রকাশনী সংস্থার জুলিয়াস স্যান্ডমেইয়ার সম্পাদিত '*সমকালীন জার্মান লেখক*' (*Neue deutsche Erzähler*) নামের এক সংকলনে। এর প্রথম প্রকাশের সময় কাফকা মার্টিন বুবারকে লেখেন যেন 'শেয়াল ও আরব' এবং 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন' – এ দুটি লেখার কোনোটিকেই প্যারাবল হিসেবে গণ্য না করা হয়, যেন এদের 'জীবজন্তু নিয়ে লেখা *গল্প*' হিসেবে দেখা হয়, ঠিক যে কারণে মার্টিন বুবার এ দুটি গল্প ছাপেন 'Two Animal Stories' শিরোনামে। এ দুটিকে প্যারাবল না বলতে চাওয়ার অর্থ কাফকা চাননি এ দুটি লেখার মধ্য থেকে কোনো মরাল বা নীতিকথা খুঁজে বের করা হোক; কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে, অধিকাংশ গবেষকই 'শেয়াল ও আরব'-কে যতটা না ছোটগল্প হিসেবে দেখেছেন তার চেয়ে বেশি দেখেছেন প্যারাবল হিসেবে। এর ইংরেজি নাম 'Jackals and Arabs'; মূল জার্মান: 'Schakale und Araber'।

'শেয়াল ও আরব' গল্পের কথক কাফকার অন্য গল্প 'দণ্ড উপনিবেশে'র মতোই একজন উত্তর ইউরোপীয় পর্যটক; যিনি অনামা এক দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; তিনি এমন এক সভ্যতার মুখোমুখি হয়েছেন, যেটিকে তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। আর সেখানকার প্রতিনিধিত্বকারীরা তাকে, অন্য গল্পটির মতো, শুধু তাদের বিচারকের ভূমিকায় দেখতে চাইছে তা-ই নয়, চাইছে, তিনি ন্যায়বিচারের প্রয়োগকর্তার ভূমিকাও পালন করুন। মরুভূমির এক মরূদ্যানে তিনি এক রাতে তাঁবু গেড়েছেন। তখন একদল শেয়াল তাকে ফিরে ধরল। এই শেয়ালদের মধ্যে যে প্রধান সে তাকে জানাল, তারা সবাই যুগ যুগ ধরে তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে, আর তিনি যে তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে একদিন আসবেন সে কথা তাদের পূর্বপুরুষেরা বলে গেছে। এই শেয়ালদের আশা, 'উত্তরের থেকে আসা এই লোক' আরবদের গলা কেটে দেবেন এবং শেয়ালদের জন্য পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আসবেন। এরা পর্যটককে একটা মরচে পড়া কাঁচি দিল, তখন ক্যারাভ্যানটির আরব নেতা চাবুক মেরে শেয়ালগুলোকে তাড়িয়ে দিল এবং বলল যে এই শেয়ালেরা উত্তরের থেকে আসা সব পর্যটককেই এই একই গল্প বলে, এই একই

মিনতি জানায়। এরপর এই জন্তুগুলোর আসল স্বভাব দেখানোর জন্য আরব নেতা লোকটি শেয়ালদের দিকে ছুড়ে দিল একটা উটের মৃত শরীর, শেয়ালেরা তখন মহা আনন্দে সেটি খাওয়ার কাজে মত্ত হয়ে গেল। তখন আর শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য তাদের আগের আশা বা আকাঙ্ক্ষার কোনো খবর নেই।

গল্পটি যেহেতু প্রথম মার্টিন বুবারের জায়োনিস্ট সাময়িকী *ইহুদি*তে প্রকাশিত হয়, সমালোচকেরা অতি সহজে এই উপসংহারে চলে আসেন যে, এ গল্পের শেয়ালেরা হলো ইহুদি, যারা ধর্মের বিধান মেনেই মানবজাতির শেষ ত্রাণকর্তা বা মিসাইআ (Messiah)-র অপেক্ষা করছে; আর গল্পের আরবরা হচ্ছে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের আরব, যারা ইহুদিদের স্বপ্নের ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দিচ্ছে (কাফকার এ গল্পটি, মনে রাখতে হবে, আজকের ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার বহু আগে লেখা)। এ গল্পের প্যারাডক্সটি এই যে এখানে শেয়ালেরা পরিচ্ছন্নতার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের আচরণ একদমই নোংরা ও লোভী। রক্তের জন্য তাদের লোভ তাদের নিজেদের লালসার দাস বানিয়ে রেখেছে। সেই অর্থে তাদের আসল শত্রু আরবরা নয়, বরং তারা নিজেই – তাদের রক্তপিপাসু লোভী স্বভাব। ইহুদিদের এমন বাজেভাবে চিত্রণের মধ্যে কাফকার, তখনকার রীতিমাফিক, ইউরোপে প্রচলিত ইহুদি আত্মধিক্কার বা আত্মঘৃণার প্রতি সমর্থন এবং তিনি নিজেও যে ইহুদি হিসেবে নিজেকে ছোট ভাবতেন, ঘৃণা করতেন, সেই বোধ ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আমি এ বইয়ের 'ভূমিকা' অংশে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

খনি পরিদর্শন

এক গ্রাম্য ডাক্তার গল্পসংকলনের সপ্তম এই গল্পটি একটি নীতিগর্ভ রূপককাহিনি বা প্যারাবলিক লেখা। কাফকা এটি লেখেন ১৯১৭ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে। এর মূল পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে গল্পের এই শিরোনামের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৯১৭ সালের ২০ আগস্টে কাফকা যখন তাঁর প্রকাশক কুর্ট ভোলফ্‌কে *এক গ্রাম্য ডাক্তার* গল্পসংকলনের প্রাথমিক সূচি পাঠান, তার মধ্যে। পরে ১৯১৯ সালে বইতে এ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরেজি নাম: 'A Visit to a Mine' বা 'A Visit to the Mine'; মূল জার্মান: 'Ein Besuch im Bergwerk'।

মাটির নিচের এক খনিতে কাজ করা নিম্নপদস্থ এক কর্মচারীর বয়ানে বলা হয়েছে এ গল্পটি। তাদের খনি পরিদর্শনে এসেছেন দশ জন ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী, খনির পরিচালকেরা তাদের পাঠিয়েছেন খনিটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবসম্মত, তা খতিয়ে দেখতে। কথক ও তার সহকর্মী খনি কর্মচারী বা শ্রমিকেরা এই দশ জন প্রকৌশলীর থেকে পদের বিচারে এবং শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির বিচারে সামাজিক সিঁড়িতে অনেক নিচু স্তরের; তারা এই প্রকৌশলীদের দেখছে বিস্ময় নিয়ে, এত বড় বস্‌দের বয়স যে এত কম তা দেখে অবাক হচ্ছে, আর ভাবছে এদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব কত বেশি। গল্পের বড় একটি

অংশই ব্যয় হয়েছে এ দশ প্রকৌশলীর প্রত্যেককে এক-এক করে বর্ণনা করার কাজে। প্রকৌশলীদের এই দলটির সঙ্গে আছে নিম্নপদস্থ এক কেরানি, কিন্তু যেহেতু সে ক্ষমতাশালীদের কাছের একজন, তাই তার দাপট অনেক বেশি। গল্পের এ অংশটুকু যথেষ্ট কাফকাসুলভ রসবোধে পূর্ণ। এই কেরানির গিল্টি করা বোতামের ইউনিফর্ম পরিহিত কেতা দেখে আমাদের মনে পড়ে যায় 'রূপান্তর' গল্পের শেষ ভাগের জনাব সামসার কথা; সামান্য এক ব্যাংক পিয়ন তখন তিনি, কিন্তু তাতেই তার মধ্যে কী বাড়াবাড়ি রকমের (বা কী হাস্যকর) কর্তৃত্বের বোধ।

কাফকা-গবেষকদের মতে, এ গল্পের মূল কথা মানুষের সামাজিক স্তরবিন্যাস, ওপর-নিচের ভেদাভেদ এবং নিচের মানুষেরা ওপরের মানুষদের কত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভয়ের চোখে দেখে তার চিত্রণ। গল্পে খনি কর্মচারীদের সঙ্গে পরিদর্শক দলের সবার যে ফারাক এবং পরে ওই দশ জনের মধ্যেও ওপর-নিচের যে ভেদাভেদ, বলা হয় কাফকা এর সবটুকু পেয়েছিলেন 'The Eight Immortals' নামের এক চীনা রূপকথা থেকে, এটি জার্মান অনুবাদে বেরিয়েছিল ১৯১৪ সালে, কাফকা এটি পড়েছিলেন এবং বইটি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতেও পাওয়া গেছে।

বিখ্যাত কাফকাবোদ্ধা স্যার ম্যালকম প্যাসলির মতে, কাফকার গল্পের এ প্রকৌশলীরা আসলে কাফকার সময়ের নানা লেখকের রূপক – যাদের মধ্যে আছেন হাইনরিখ মান, হুগো ফন হফমানস্থাল এবং কাফকার প্রিয়তম বন্ধু ঔপন্যাসিক ম্যাক্স ব্রড; এবং নিচু পদের এই খনিশ্রমিক-কথক আর অন্য কেউ নন, স্বয়ং কাফকা নিজে, যিনি এসব লেখকদের দিকে তাকিয়ে আছেন শ্রদ্ধা ও বিমুগ্ধতার দৃষ্টিতে। কাফকার ডায়েরিতে এবং নানা চিঠিতে লেখকের জন্য প্রয়োজনীয় বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের কথা বলতে গিয়ে যতবার গুহাবাসী মানুষ কিংবা গর্তজীবী কোনো প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ম্যালকম প্যাস্লির এই অনুমানকে অযৌক্তিক মনে হয় না। তবে এই ব্যাখ্যার ত্রুটি হচ্ছে এটি কাফকার লেখাকে খুব সীমিত এক আত্মজৈবনিক পরিমণ্ডলের প্রতিনিধি হিসেবে দেখায়, যেখানে বাস্তবে কাফকা তাঁর সাহিত্যে সব সময়েই চেয়েছেন ব্যক্তি-ভূগোল ও সময়কে ছাড়িয়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য খাটে, এমন এক বিশ্বজনীন উপাখ্যান তৈরি করতে। কাফকা তাঁর নিজের লেখার কাছ থেকে শৈলী, তাৎপর্য ও গভীরতা বিষয়ে যে বিশাল সব দাবি করতেন, যে কঠিন দাড়িপাল্লায় তিনি এগুলো মাপতেন (বিশেষ করে যে লেখা প্রকাশ করবেন বলে মনস্থির করেছেন, সে লেখার ক্ষেত্রে তো আরো বেশি), তাতে করে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে 'খনি পরিদর্শন' গল্পের একমাত্র তাৎপর্য যদি হতো ব্যক্তিগত তাৎপর্য, তাহলে তিনি এটিকে *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ে স্থান দিতেন। অন্যদিকে, এ গল্পে সামাজিক স্তরবিন্যাসের থিমের বাইরে কাফকা গবেষকেরা আর অন্য কোনো আরো বড় থিম বা কাঠামো খুঁজে পাননি, আর সে কারণেই এটি হয়ে আছে কাফকার সবচেয়ে কম পঠিত ও কম আলোচিত অল্প কিছু লেখার একটি।

টীকা:

প্রধান প্রকৌশলীরা (পৃ. ২৮০): স্যার ম্যালকম প্যাস্‌লি বলছেন যে এই দশ প্রধান প্রকৌশলী হচ্ছেন কাফকার সমকালীন দশ লেখক, যাঁরা *The New Novel* (*Der neue Roman*) নামের সংকলনে লিখেছিলেন; কাফকা সম্ভবত ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংকলনটি হাতে পান। প্যাসলি এঁদের চিহ্নিত করেছেন গল্পে বলা প্রকৌশলীদের একই ক্রম মেনে এভাবে: ১. কাফকার বন্ধু ও লেখক ম্যাক্স ব্রড (১৮৮৪-১৯৬৮); ২. বামপন্থী কবি রুডলফ লেওনার্ড (১৮৮৯-১৯৫৩) যিনি সংকলনটিতে হাইনরিখ মানকে নিয়ে একটি লেখা লেখেন; ৩. ফরাসি ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রঁস (১৮৪৪-১৯২৪); ৪. ড্যানিশ সমালোচক গেয়র্স ব্রান্ডেস (১৮৪২-১৯২৭), যিনি সংকলনটিতে আনাতোল ফ্রঁসকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন, আর তাই দেখা যায় এখানে তিনি তৃতীয় প্রকৌশলীকে অযাচিতভাবে কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন; ৫. হাইনরিখ মান (১৮৭১-১৯৫০); ৬. ইদ্দিশ নাট্যকার ওসিপ দাইমভ (১৮৭৮-১৯৫৯; আসল নাম ইওসেফ পার্লমান); ৭. *গোলেম* উপন্যাসের লেখক গুস্তাভ মেয়রিন্‌ক (১৮৬৮-১৯৩২); ৮. এক্সপ্রেশনিস্ট নাট্যকার ও কথাশিল্পী কার্ল স্টারন্‌হাইম (১৮৭৮-১৯৪২); ৯. ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬); ১০. হুগো ফন হফমান্সথাল (১৮৭৪-১৯২৯)।

পাশের গ্রাম

খুব ছোট এই গদ্য রচনাটি, যা নিয়ে এ বইয়ের 'ভূমিকা' অংশে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে, ফ্রানৎস কাফকার মানসের প্রতিনিধিত্বকারী লেখাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে এক দাদার জবানিতে তাঁর জীবন-সম্পর্কিত অভিজ্ঞানের কথা বলছে তাঁর এক নাতি, যে এ গল্পের প্রথম-পুরুষের কথক। লেখাটির মূল পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে গবেষকদের মতে, সম্ভবত এটি ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির কোনো এক সময়ে লেখা। কাফকা তাঁর অক্টাভো নোটবইতে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে দুটি রচনার নাম লেখেন: 'এক অশ্বারোহী' ('A Rider; Ein Reiter'); এবং 'সামান্য সময়' ('Short time; Die Kurze Zeit') – সম্ভবত এ দুটি কাফকার 'পাশের গ্রাম' রচনাটিরই আদি নাম। বর্তমান নাম 'পাশের গ্রাম' ('The Next Village'; 'Das nächste Dorf') কাফকা প্রথম উল্লেখ করেন তাঁর প্রকাশক কুর্ট ভোলফ্‌কে লেখা ১৯১৭ সালের ২০ আগস্টের এক চিঠিতে, যেখানে তিনি *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ে কী কী লেখা যাবে তার তালিকা দিচ্ছিলেন। পরে *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইটি ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হলে দেখা যায়, এ লেখাটি বইয়ের অষ্টম লেখা হিসেবে ছাপা হয়েছে।

লেখাটি আমাদের পরিচিত প্রবচন – 'শিল্প অনেক বড়, জীবন ছোট' (Art is long, life is short), বা 'শিল্প অনন্ত, জীবন ছোট'-কে মনে করিয়ে দেয়। এখানে দাদা বলছেন জীবন এতই ছোট যে তিনি চিন্তা করতে পারেন না, কী করে কেউ পাশের গ্রামে ঘোড়ায় করে যাওয়ার কথা ভাবে; কারণ, জীবনের পরিধি এতই ক্ষুদ্র যে ওরকম একটা কাছের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যও তা যথেষ্ট নয়। এভাবে লেখাটি কাফকা-সাহিত্যের সুপরিচিত একটি থিমেরই ছবি তুলে ধরে: বাস্তব পৃথিবীর জ্যামিতি যে স্থান ও কালের সূত্র মেনে চলে,

সেই স্থান ও কালের মধ্যে আসলে সংযোগ নেই। কাফকার অন্য দুটি প্যারাবলে ('একটি সাধারণ বিভ্রান্তি', যেটি *গল্পসমগ্রর* দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে; এবং 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা', যেটি এ বইতে আছে) যেমন আমরা দেখি স্থান ও কালের সূত্র গুলিয়ে গেছে, মানুষের পার্থিব অস্তিত্বের নিয়মের বাইরে চলে গেছে তারা, জ্যামিতি ভেঙে গেছে (সম্রাটের বার্তাবাহক লোকটি আমাদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে 'হাজার বছর ধরে', আর তার দৌড়ের জায়গাগুলোও অদ্ভুত ও অনন্ত, যেমনটি প্রায়ই দেখা যায় বোরহেসের গল্পে), ঠিক একই জিনিস ঘটতে দেখি এ লেখাটিতেও। তবে ওই গল্প দুটিতে যেভাবে স্থান ও কালের বিভ্রান্তি গল্প দুটির চরিত্রেরা উপলব্ধি করে, গল্প পাঠরত পাঠকের কল্পনার জগৎ ওলট-পালট হয়ে যায় বস্তুনিষ্ঠ (objective) ধরনে, এ লেখাটিতে তেমনটি ঘটে না – এখানে দাদার নিজের ব্যক্তিগত (subjective) অনুভূতি বা জীবনবোধের কথাই বলা হয় মাত্র; অন্য দুটিতে পাঠককে লেখক যা বলছেন তা মানতেই হয়, যেন স্থান ও কাল ওরকম গুলিয়ে যাওয়াই নিয়ম, আর এটিতে দাদার কথা বা বোধ আপনি মানতে পারেন, আবার না-ও পারেন। একজন পিতামহ স্থানীয় মানুষ, যিনি তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত, তাঁর কাছে পাশের গ্রামে যাওয়ার পথটুকু অসম্ভব রকমের দীর্ঘ বলে মনে হতেও পারে, তবে আপনার কাছে তা ঠিক বলে মনে না-ও হতে পারে।

মনোযোগী পাঠকের ক্ষেত্রে এটুকু বোঝার জন্য কাফকা বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা না জানলেও চলে যে, এই লেখার মূল কথা হচ্ছে জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য মানুষের যে তাড়না, যে উচ্চাশা, তা আসলে অর্জন করা অসম্ভব; লক্ষ্য অর্জন করা আসলে এক অবাস্তব স্বপ্ন, আর মানুষের মধ্যে সেই লক্ষ্য অর্জনের যে চির অতৃপ্তিবোধ, তা তাকে হতাশ করতে বাধ্য; কোটি কোটি বছরের পৃথিবীতে মানুষ যে ৬০-৭০ বছরের আয়ু নিয়ে আসে, সে বিচারটিই সবচেয়ে বড় বিচার এবং সে বিচারে মানুষের এই চির অতৃপ্তির বোধ তাকে শেষমেশ শুধু ব্যর্থ ও হতাশই করতে পারে।

সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা

ফ্রানৎস কাফকার বহুল পঠিত, বহুল আলোচিত অন্যতম প্রধান রচনা। এটি একটি রূপককাহিনি (parable); এর প্রথম প্রকাশ ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে *Selbstwehr* নামের জার্নালে; পরে কাছাকাছি সময়ে *এক গ্রাম্য ডাক্তার* নামের গল্পসংকলনের নবম গল্প হিসেবে। শুরুতে এটি ছিল কাফকার বিখ্যাত বড় গল্প 'চীনের মহাপ্রাচীর'-এর অংশ। কাফকা গল্পটি প্রথম লেখেন তাঁর আটটি অক্টাভো নোটবই-এর 'C' বইতে। লেখার তারিখ মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যায় ১৯১৭ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের শেষের কোনো এক সময়ে। কাফকা লেখাটিকে 'চীনের মহাপ্রাচীর'-এর এই বৃহত্তর পরিমণ্ডল থেকে তুলে নিয়ে *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ে দিয়ে দেন; একই রকম ব্যাপার ঘটে *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়েরই 'আইনের দরজায়' গল্পের ক্ষেত্রেও, যেটি কাফকা তুলে আনেন তাঁর *বিচার* উপন্যাস থেকে

এবং আলাদা গল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এটির ইংরেজি নাম: '*An Imperial Message*' বা '*A Message from the Emperor*'; মূল জার্মান: '*Eine kaiserliche Botschaft*'।

মূল গল্প 'চীনের মহাপ্রাচীর' যারা পড়েছেন (বাংলা *গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে), তারা জানেন যে এই ছোট অংশটুকুর ভূমিকা প্যারাবল বা নীতিগর্ভ রূপককাহিনির: সম্রাট অর্থাৎ চীনা সম্রাট থেকে তাঁর প্রজাকুলের দূরত্ব কতখানি তা বোঝাতেই এই প্যারাবলের আবির্ভাব; এটি বলা হচ্ছে 'আপনি' অর্থাৎ পাঠকদের, যারা অপেক্ষা করে আছে মৃত্যুশয্যায় শায়িত সম্রাটের কাছ থেকে আসা এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তার। বার্তার গুরুত্ব যতই বিশাল হোক, আর বার্তাবাহকের শক্তি-সামর্থ্য ও সদিচ্ছা যতই বড় হোক, বার্তাটি আমাদের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব। টিপিক্যাল কাফকান ঢঙে এখানে আমরা দেখি, সময় ও স্থানের নিয়মগুলো সব গুলিয়ে গেছে, বার্তাবাহক বেঁচে আছে হাজার বছর ধরে, আর হাজার বছর ধরেই ছুটছে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে, আমাদের কাছে, পৌঁছানোর তাড়নায়। কিন্তু সবই বৃথা। বার্তাটি না পেয়ে আপনি আপনার জানালায় বসে আছেন, স্বপ্ন দেখছেন 'মৃত' সম্রাটের ওই বার্তার – এই-ই আপনার সান্ত্বনা। আর যেভাবে কাফকা পাঠকের উদ্দেশে 'আপনি' বা 'তুমি'র ব্যবহার করেছেন, তাতে প্যারাবলটি রূপ নিয়েছে অ্যালিগরিতে। কিসের অ্যালিগরি (সোজা অর্থে, রূপক) এটা? কাফকার লেখার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য, সর্বসম্মত অর্থ যে থাকে না, সেই অর্থ প্রদানে করতে যে কাফকার অসম্মতি – তারই অ্যালিগরি। ঠিক যেভাবে আমরা অর্থাৎ সম্রাটের প্রজাকুল বৃথা অপেক্ষা করে থাকি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটির জন্য, তেমনই কাফকা-সাহিত্যের বিশ্লেষকেরাও যেন বৃথাই অপেক্ষা করে আছে কাফকার লেখার মূল ও আসল অর্থ উদ্ধারে।

এ বইয়ের 'ভূমিকা' অংশেও এই আশ্চর্য সুন্দর লেখাটির ব্যাখ্যা নিয়ে, বিশেষত ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিয়ে, বেশ কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবারের প্রধানের জন্য একটি সমস্যা

এক গ্রাম্য ডাক্তার বইয়ের দশম গল্প এটি। খুবই অদ্ভুত, যথেষ্ট 'কাফকায়েস্ক' এই ছোট রচনাটি বলা হয়েছে প্রথম-পুরুষে, এই 'আমি'ই হচ্ছে গল্পের শিরোনামের 'পরিবারের প্রধান', সে বলছে ওড্রাডেক নামের অদ্ভুত ও ধাঁধায় ভরা এক বস্তু (নাকি প্রাণী?) বিষয়ে, যেটি মাঝেমধ্যে তার বাড়িতে এসে হাজির হয়। ২২ এপ্রিল, ১৯১৭ সালে কাফকা মার্টিন বুবারের জন্য সাম্প্রতিক লেখা যে-গল্পগুলোর তালিকা তৈরি করেছিলেন, সেটিতে এই গল্পের কথা নেই, তবে সে বছরেরই ২০ আগস্ট তারিখে কাফকা তাঁর প্রকাশক কুর্ট ভোলফের কাছে যে গল্প-তালিকা পাঠান তাতে এটি রয়েছে – এ কারণে, স্বভাবতই, কাফকা-গবেষকদের বিশ্বাস যে গল্পটি এ দুটি তারিখের মাঝখানের কোনো এক সময়ে লেখা। গল্পটির কোনো মূল পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটির প্রথম প্রকাশ জায়োনিস্ট সাপ্তাহিক খবরের কাগজ *Selbstwehr*-এ (*Self-Defence*; *আত্মরক্ষা*),

১৯১৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে, সে বছরেই প্রকাশিত *এক গ্রাম্য ডাক্তার* গল্পসংকলনের দশ নম্বর গল্প হিসেবে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আর্বিভাবের অল্প কিছু দিন আগে। ইংরেজি নাম মূলত তিনটি: ‘A Problem for the Father of the Family’; ‘The Cares of a Family Man’; এবং ‘Odradek, or Cares of a Householder’; মূল জার্মানে: ‘Die Sorge des Hausvaters’।

ফ্রানৎস কাফকার সবচেয়ে বেশি বার এবং বারবার বিশ্লেষণ হওয়া বা ব্যাখ্যা হওয়া লেখাগুলোর মধ্যে একদম প্রথম কাতারে রয়েছে এই লেখাটি। দুর্জ্ঞেয় নাম ওড্রাডেক নিয়ে এই যে বস্তুটি, যা আবার কথাও বলে এবং ‘এমন এক ধরনের হাসি’ হাসে, ‘যা কেবল ফুসফুস না থাকলেই হাসা যায়’, একে নিয়ে কথকের যে ব্যাখ্যা বা অনুমান তা নিজেই কাফকা-ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যার সমস্যা একটুও দূর না করে বরং আরো ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়। যেভাবে পরিবারের প্রধান লোকটি এখানে ওড্রাডেক বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন, তাতে গল্পটিকে কাফকার শেষ দিককার (১৯১৬-১৭ থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত) তদন্তানুসন্ধানমূলক গল্পগুলোর মডেল বা আদর্শ হিসেবে ধরা যায়, যেমন: ‘চীনের মহাপ্রাচীর’ (*গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য) ‘একটি কুকুরের তদন্তমালা’ (*গল্পসমগ্র*র দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য); কিংবা ‘গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি’ (এই খণ্ডেই রয়েছে)।

গল্পের মূল অংশ ব্যয় হয়েছে ওড্রাডেক কে, বা কী এবং সে কী করে, তার ব্যাখ্যা ও বর্ণনায়; কিন্তু আমরা সেসব বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাচ্ছি কথকের মুখ থেকে, তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হিসেবে – শেষমেশ তদন্তাধীন বস্তু ওড্রাডেক নিয়ে আমরা যেটুকু জানছি, মোটামুটি ততটাই জানছি তদন্তকারী লোকটি নিয়েও। এ কারণেই, অসংখ্য কাফকা গল্পে ‘monopolized narration’-এর যে টেকনিক, যেখানে বর্ণনার লক্ষ্যবস্তু ও বর্ণনাকারী অদ্ভুতভাবে একাকার হয়ে গেছে, তা এখানেও দৃশ্যমান। কাফকার বর্ণনাকারী কথক যদি মূলত অব্যাখ্যেয় এক বিষয়ের জট খোলার কাজে গলদঘর্ম হচ্ছেন, তো আমরা পাঠকেরাও তার ব্যাখ্যার (*hermenutics*) এই সমস্যার হাতে পর্যুদস্ত হচ্ছি। পাঠককে পর্যুদস্ত করার কাজে কাফকা যথেষ্ট দড় ছিলেন।

এক দিক থেকে দেখলে মনে হয়, কাফকা এখানে সাহিত্যব্যাখ্যা বা ভাষার সমস্যা ব্যাখ্যা নিয়ে প্যারোডি করছেন। ওড্রাডেক শব্দটি জার্মান, না স্লাভোনিক – তা নিশ্চিত নয়, কিন্তু, তিনি গল্পের শুরুতে বলছেন, বুৎপত্তি যেখানেই হোক, শব্দটির একটি গ্রহণযোগ্য অর্থ দাঁড় করাতে কোনো ভাষাই পারেনি। কাফকা-গবেষকেরা এই ক্লু ধরেই অনেক চেষ্টা করেছেন এর সত্যিকারের বুৎপত্তি সন্ধানের। চেক ভাষায় বুৎপত্তি খোঁজা গবেষকেরা শেষে বলেছেন, ওড্রাডেক শব্দটিকে কোনো খোপে ফেলা যায় না, কোনো অর্থ দেওয়া যায় না; তারা এ-ও বলেছেন, ওড্রাডেক মানে নিয়ম বা ভাষা-সংগঠন নিয়মের বাইরের কিছু। অন্যদিকে জার্মান ভাষাবিদেরা এটিকে ভেঙেছেন এভাবে – ‘rad’ অর্থ ‘round’ বা গোলাকার; ek অর্থ ‘corner’ বা কোনা। শেষমেশ কিছুই দাঁড়ায়নি; সুতো দিয়ে প্যাঁচানো কিছুর মতো, এই ‘অমর’ বস্তুটি দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য ও রহস্যময়ই থেকে গেছে; সেই সঙ্গে

স্ববিরোধীও। তবে শুরুর দিকে যা ছিল স্রেফ একটি শব্দ, পরে একটি প্রাণহীন জড়পদার্থ, তা-ই গল্পের শেষ দিকে রূপ নিয়েছে একটি প্রাণীতে; একদম শেষে ওড্রাডেক একটি 'বাচ্চা', যাকে নিয়েই পরিবারের প্রধানের 'সমস্যা' বা 'যত্ন' বা 'উদ্বেগ'।

আর ওড্রাডেক হাজিরও হয় অদ্ভুত সব জায়গায়, সব সময় কোনা-ঘুপচিতে থাকে সে: মূল বাসায় ঢোকে না, তার বাস বেজ্‌মেন্টে, হলঘরের বারান্দায়, কিংবা সিঁড়িতে, আর সে সব সময়ই চলছে। শেষ দিকে কথক যখন তার সঙ্গে কথা বলে, সেসব কথাও আপাত-অর্থহীনই থাকে; তাকে আমরা ধরে উঠতে পারি না, শুধু বুঝি তার ফুসফুসবিহীন হাসির মধ্য দিয়ে কাফকা নিজের ভয়ংকর অদ্ভুত রসবোধ বা নির্মম তামাশার বোধকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এর পরই কথকের মেটাফিজিক্যাল অনুমানের মুখোমুখি হই আমরা – ওড্রাডেকের জীবনের উদ্দেশ্য, তার কাজ, এমনকি তার মরণশীলতা বা অমরত্ব নিয়ে আমরা চিন্তায় পড়ে যাই। গল্পের একেবারে শেষে এসে আমরা জানতে পারি কথক বা পরিবারের প্রধান লোকটির মূল উদ্বেগের কথা: ওড্রাডেক যদি তার পরও বেঁচে থাকে, তার সন্তানদের পরেও কিংবা তার সন্তানদের সন্তানদের পরেও, তাহলে ওড্রাডেককে তো অমরই বলা যায়। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে এই মরণশীল 'আমার' তো মন খারাপ হবেই।

তবে মনোযোগী পাঠক খেয়াল করবেন, কাফকা তাঁর স্বভাবসুলভ কাফকান ভঙ্গিতে ওড্রাডেকের এই অমরত্বের মধ্যেও একটি আঁচড় রেখেছেন: ওড্রাডেক অমর হয়তো হতে পারে, কিন্তু তার জীবনের বা অস্তিত্বের কোনো মানে নেই, লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। এ গল্পেরই বিখ্যাত কাফকা-উক্তি: 'পুরো জিনিসটিকেই নিশ্চিত মনে হয় অর্থহীন, তার পরও এর নিজের মতো করে সম্পূর্ণ।' এই লাইনটি সম্ভবত সব মানুষকে নিয়েই কাফকার ভাবনা, সব শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তাঁর দর্শন, কিংবা অন্তত নিজের লেখা নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ, সম্ভবত যে কারণে তিনি ম্যাক্স ব্রডকে বলেছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্ম পুড়িয়ে ফেলতে।

ওড্রাডেকের যে স্বয়ংনির্ভরতা, দুর্বোধ্যতা, খণ্ডিত অস্তিত্ব আর অস্থায়ী চরিত্র, আর একই সঙ্গে তার যে কালের পর কালে (কিন্তু কোনো উদ্দেশ্য পূরণ না করে) টিকে থাকা – এর সবই, গবেষকদের মতে, শিল্পকর্ম বা নন্দনতত্ত্ব ও নান্দনিকতা বিষয়ে কাফকা যে ধারার পক্ষপাতী ও বিশ্বাসী ছিলেন, তারই প্রতিনিধিত্বকারী।

এগারো ছেলে

ফ্রানৎস কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্পসংকলন *এক গ্রাম্য ডাক্তার*-এর এগারো নম্বর গল্প এটি। এই ছোট গল্পটির মূল পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া না গেলেও কাফকা গবেষকেরা মোটামুটি নিশ্চিত যে এটি কাফকা লিখেছিলেন ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের শেষ দুই সপ্তাহের কোনো এক সময়ে। ডিসেম্বর ১৯১৯-এ কাফকার বইটিতেই এটির প্রথম প্রকাশ। ইংরেজি নাম: 'Eleven Sons'; মূল জার্মানে: 'Elf Söhne'।

এক সর্বজ্ঞ পিতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই গল্পটি লেখা, যিনি তাঁর এগারো পুত্রের প্রত্যেকের স্বভাবের ভালো ও খারাপ দিকের এখানে মূল্যায়ন করছেন। কাফকা এই একই রকম নিখুঁত ক্রম মেনে দশ জন প্রকৌশলী নিয়ে লিখেছেন তাঁর আরেকটি গল্প 'খনি পরিদর্শন', যা *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়েরই সপ্তম গল্প। গল্পটি মোট এগারোটি প্যারাগ্রাফে বিভক্ত, প্রত্যেকটিতে এক-এক করে এই পিতার এগারোটি পুত্রের বিশ্লেষণ; এগারোটি প্যারাগ্রাফের আগে আছে একটি লাইন: 'আমার এগারো ছেলে'; আর শেষে আরেকটি: 'এই আমার এগারো ছেলে' – এটি দিয়েই গল্পের শেষ।

কাফকা ম্যাক্স ব্রডকে বলেছিলেন যে তাঁর গল্পের এই এগারো পুত্র আসলে তাঁরই লেখা এগারোটি গল্পের প্রতিচ্ছায়া। কাফকার কথার এই সূত্র ধরেই অনেক গবেষণা হয়েছে সেই এগারোটি গল্পকে আলাদা আলাদাভাবে এ গল্পের ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়ে চিহ্নিত করার, এগারো ছেলের মাধ্যমে কাফকা তাঁর নিজের কোন্ লেখাটির কী আত্মবিশ্লেষণ করলেন তা বের করার। তবে গবেষকেরা তাঁদের আবিষ্কার নিয়ে কখনোই একমত হতে পারেননি। যেমন *A Franz Kafka Encyclopedia* (২০০৫)-এর মতো মহামূল্যবান বইটিতে যে এগারোটি গল্প চিহ্নিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে স্যার ম্যালকম প্যাস্‌লির তালিকার রয়েছে বিরাট বৈসাদৃশ্য। স্যার ম্যালকম প্যাস্‌লিকে কাফকা বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিশ্লেষক ও গবেষক বলে ধরা হয় বলেই, এখানে অন্য গবেষকদের অন্য তালিকগুলো বাদ দিয়ে তাঁরটিই তুলে ধরা হলো:

১. প্রথম ছেলে: গল্প 'একটি স্বপ্ন' যা সমালোচিত হয়েছে 'খুব সাদামাটা' হিসেবে; ২. দ্বিতীয় ছেলে: গল্প 'আইনের দরজায়', এই ছেলেটির 'তরবারি খেলায়' দক্ষতার সঙ্গে তুলনা টানা হয়েছে *বিচার* উপন্যাসে জোসেফ কে. এবং ধর্মযাজকের মধ্যকার দ্বন্দ্বের, তারা দুজন একমত হতে পারছেন না 'আইনের দরজায়' নামের প্যারাবলটির অর্থ বিষয়ে; ৩. তৃতীয় ছেলে: গল্প 'সম্রাটের কাছ থেকে একটি বার্তা', গল্পের এই প্যারাগ্রাফটির লিরিক্যাল ভঙ্গি থেকে ম্যালকম প্যাস্‌লির মনে হয়েছে এটা; ৪. চতুর্থ ছেলে: গল্প 'পাশের গ্রাম', যার সমালোচনা হয়েছে 'হালকা লেখা' হিসেবে; ৫. পঞ্চম ছেলে: গল্প 'পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা', চত্বরের দোকানদারদের ছলাকলাহীনতার কারণে এই তুলনা; ৬. ষষ্ঠ ছেলে: গল্প 'শেয়াল ও আরব', ছয় নম্বর এই ছেলেটি শেয়ালদের মতোই মাথা ঝুঁকিয়ে রাখে বলে; ৭. সপ্তম ছেলে: গল্প 'উপরে, গ্যালারিতে', এই ছেলেটির আচরণে 'প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রথাকে পীড়ন করা' দুইয়েরই ছাপ, যেমনটি 'উপরে, গ্যালারিতে' গল্পের দর্শক নামের লোকটির; ৮. অষ্টম ছেলে: গল্প 'কয়লা-বালতির সওয়ারি', যেটি প্রথমে *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ের অংশ হিসেবে রাখা হয় কিন্তু পরে কাফকা বই থেকে বাদ দিয়ে দেন, অতএব, যেমনটি লেখক এই ছেলেকে নিয়ে বলেন: 'সে এত দূরে চলে গেছে'; ৯. নবম ছেলে: গল্প 'এক গ্রাম্য ডাক্তার', এই ছেলের ঐ গল্পের মতোই স্বপ্নচারী বা স্বপ্নসুলভ স্বভাব; ১০. দশম ছেলে: গল্প 'নতুন উকিল', ছেলেটির অন্যদের 'প্রশ্ন থামিয়ে দিচ্ছে কেমন চতুর সূক্ষ্মতায়', এ কথার মধ্যে উকিলের পেশার মিল পেয়েছেন ম্যালকম

প্যাস্লি; ১১. একাদশ ছেলে: গল্প 'ভাইয়ের হত্যা', যা শেষ হয় এই ছেলেটির পরিবারে ভাঙন ধরাতে পারার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে।

নিজের এগারোটি গল্পের সঙ্গে কাফকার এ গল্পের এগারো পুত্রের প্রতিতুলনা, যা কাফকা নিজেই বলে গিয়েছেন (কিন্তু গল্পগুলো চিহ্নিত করে যাননি), এর মধ্য দিয়ে গবেষকেরা দেখেছেন তাঁর পিতা হারমান কাফকার হাত থেকে কাফকার সৃজনশীলতার মাধ্যমে মুক্তির প্রয়াস। এ বইয়ের 'ভূমিকা' অংশে আমরা বিস্তারিত বলেছি যে কাফকা কীভাবে তাঁর পিতা ও তাঁর পরিবারের 'লেখকবিরোধী' পরিবেশের সমালোচনা করতেন। এ গল্পে কাফকা নিজেই নিলেন সেই পিতার ভূমিকা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করলেন তাঁর এগারোটি সন্তানের (অর্থাৎ এগারোটি লেখার) ভালোমন্দ ইত্যাদির। সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে মানুষের বংশ বৃদ্ধির এই প্রতিতুলনা আধুনিক সাহিত্যে নতুন নয় – তবে এর মাধ্যমে কাফকা তাঁর মহা অপছন্দের পিতার সমান উচ্চতায় উঠে, পিতার 'কর্তৃত্বের' সে জায়গাটি নিতে পেরে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কাফকা যে ভঙ্গিমায় – যে শীতল ও প্রায়শই বেশিজ্ঞানী, ও অন্যকে হেয় জ্ঞান করা ভঙ্গিমায় – এখানে এগারো সন্তানের পিতার মুখ দিয়ে তার সন্তানদের কথা বলিয়েছেন, তা যেন বাস্তব জীবনে ছেলের প্রতি হারমান কাফকার বিচারকসুলভ, কঠিন, আবেগশূন্য আচরণেরই প্যারোডি। তা ছাড়া গল্পের পিতা যেভাবে তার ছেলেদের নিয়ে, বিশেষ করে ছেলেদের চরিত্রের খারাপ দিকগুলো নিয়ে, সমালোচনামুখর, তার সঙ্গে মিলে যায় কাফকার নিজের লেখালেখি নিয়ে অতি কঠোর, অতি নির্দয় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। হারমান কাফকা যেমন তাঁর ছেলে ফ্রানৎস কাফকাকে নিয়ে অসংখ্য সমালোচনা করতেন, তারই স্রোত আমরা এখানে বহমান দেখি কাফকার হাতে তাঁর নিজের এগারোটি লেখার শীতল ও ভাবলেশহীন সমালোচনার মধ্যে। এই তুলনার মধ্য দিয়ে আরো বড় একটি সত্যও বেরিয়ে আসে: ফ্রানৎস কাফকা তাঁর 'স্বৈরাচারী' পিতার হাতে যেভাবে নিগৃহীত হতেন বলে ভাবতেন (যদিও বাস্তবে সে রকম হতেন না বলে কাফকা জীবনীকারেরা এখন একমত), সেই একই 'স্বৈরাচারী' আচরণ কাফকা করেছেন নিজের সাহিত্যকর্মগুলোর প্রতি, এবং তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল বন্ধুকে তাঁর সব লেখা পুড়িয়ে ফেলার অনুরোধ জানানোর মধ্য দিয়ে।

তবে এগারো ছেলের সঙ্গে এগারোটি গল্পের এই মিলিয়ে মিলিয়ে পাঠেরও সমালোচনা আছে। অনেক গবেষকই মনে করেন, এতে করে লেখাটির বৃহত্তর অর্থকে খর্ব করা হয়েছে, সংকীর্ণ এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে লেখাটির গুণের দিকটি উপেক্ষা করা হয়েছে। এ গল্পের পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যকার যে বিচ্ছিন্নতাবোধ, তা কাফকার নিজের জীবনের পিতা-পুত্রের দূরত্বের ঐ সত্য বা অর্ধসত্য কাহিনির চেয়ে অনেক বেশি সর্বজনীন।

পিতা-পুত্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক শুধু কাফকার *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়েরই অন্যতম থিম নয়, তা পুরো কাফকা-সাহিত্যেরই একটি বড় থিম, আর কাফকা *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইটি নিজের পিতাকে উৎসর্গ করে সেটিতে যোগ করেছেন ট্র্যাজিকমিক এক অন্য মাত্রা।

কোনো কোনো গবেষক এই এগারো পুত্রের একেবারে ভিন্ন ব্যাখ্যাও করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এর মধ্যে আছে বাইবেলের পরোক্ষ উল্লেখ; জ্যাকবের শেষ পুত্র বেনজামিনের জন্মের আগে তাঁর এগারো পুত্রের কথা (জেনেসিস ৩২:২২) মনে করেছেন এই গবেষকেরা। এ হিসেবে, কাফকা এখানে নিজেই আছেন জ্যাকবের ভূমিকায়, যে জ্যাকব ইজরায়েলের ভবিষ্যৎ জাতিগোষ্ঠীর 'পিতা'।

ভাইয়ের হত্যা

কাফকার *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ের এই বারো নম্বর গল্পটি তাঁর জনপ্রিয় লেখাগুলোর অন্যতম। পড়ার স্বাদের বিচারে এর সঙ্গে তুলনীয় গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের বিখ্যাত উপন্যাস *Chronicle of A Death Foretold* যেখানে আর একটু বড় আয়তনে রয়েছে একটি খুনের একই রকম নৃশংস ও হৃদয়ছোঁয়া বর্ণনা। গল্পটির মূল পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাফকা এটি লিখেছিলেন সম্ভবত ১৯১৬ সালের মধ্য ডিসেম্বর থেকে ১৯১৭ সালের মধ্য জানুয়ারির কোনো এক সময়ে। বইয়ে গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই কাফকা যে এটিকে বেশ কবার অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করেন তা থেকে অনুমান করা যায় লেখাটি তাঁরও বিশেষ পছন্দের ছিল। এটির প্রথম প্রকাশ ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে, দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা *Marsyas*-এ, আরো দুটি গল্প 'নতুন উকিল' ও 'পুরোনো পাণ্ডুলিপির একটি পাতা'র সঙ্গে। একই গল্প একটু পুরোনো চেহারা নিয়ে (কাফকা যা পরে ঠিক করে বর্তমান রূপ দেন) 'একটি খুন' ('A Murder'; 'Ein Mord') নামে কুর্ট ভোলফ্ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অ্যালমানাক 'Die neue Dichtung'-এ ১৯১৮-তে। এরপর এটি জায়গা পায় *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ে, ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে। এরও পরে কাফকা ১৯২১ সালে গল্পটি ম্যাক্স ক্রেল সম্পাদিত গল্প সংকলন *The Unfolding: Novellas of Our Time* বইয়ে প্রকাশের অনুমতি দেন। ইংরেজি নাম: 'A Fratricide' বা 'A Brother's Murder'; মূল জার্মান: Ein Brudermord।

'ভাইয়ের হত্যা' কাফকার বাস্তবানুগ বিবরণ এবং সহিংসতার চিত্রণের দিক থেকে খুবই অ-কাফকাসুলভ একটি লেখা। এই সংবাপত্রের রিপোর্টিংয়ের ধাঁচে লেখা গল্পটি এমনভাবে, আইনি বর্ণনার ঢঙে, শুরু হয়েছে যে ঘটনার সত্যতা নিয়ে পাঠকের কোনো সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না। এই বাস্তবানুগ ও সর্বজ্ঞ কথকের বিবরণে গল্প বলার কায়দাটি মোটামুটি কাছাকাছি সময়ের অন্য লেখা যেমন 'দণ্ড উপনিবেশে', 'উপরে, গ্যালারিতে', কিংবা 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন'-এর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। এর সবগুলোতেই কথক কাহিনির কেন্দ্র থেকে একটু দূরে বসে নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক ঢঙে আমাদের গল্প শোনায়। শৈলী বা রীতিকুশলের দিক থেকে দেখলে গল্পটি একটি মাস্টারপিস – এখানে খুনি শ্মার যেভাবে ভেজেকে খুন করে, যে নিখুঁত পূর্বপরিকল্পনা, আবেগ ও ঘোরের মধ্যে সে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটায়, সেই একই বিশদ বিবরণ ও তেজ নিয়েই গল্পটি বলেন কাফকা।

শ্মার ভেজেকে কেন খুন করলো তা কখনোই স্পষ্ট করা হয় না; তবে আমাদের মনে হয়, এই খুনের পেছনে ভেজের স্ত্রী জুলিয়া একটি কারণ – এটি প্রেমঘটিত একটি হত্যাকাণ্ড। লেখার কোথায়ও বলা নেই যে শ্মার ও ভেজে দুই ভাই, কিন্তু গল্পের নাম যেহেতু 'ভাইয়ের হত্যা', আমাদের মনে হয় তারা দুজন রক্তসম্পর্কের। কিংবা মনে হয় বাইবেলের কেইনের হাতে ভাই আবেলের খুনের কাহিনিটি। গল্পের এক রহস্যময় চরিত্র প্যাল্লাস, এক শৌখিন গোয়েন্দা সে, পুরো খুনটি দেখে তার দোতলার জানালা দিয়ে, কিন্তু একবারও খুনটি সংঘটনে কোনো রকম বাধা দেয় না। সমালোচকেরা বলেন যে, এই একই জিনিস গার্সিয়া মার্কেস তাঁর উপন্যাসে কাফকার কাছ থেকেই ধার করেছিলেন, যেখানে সান্তিয়াগো নাসারের খুন হওয়াটাও ওই শহরের সবাই আগে থেকে জানা সত্ত্বেও ঠেকায় না। প্যাল্লাসের এই দূর থেকে খুনে অংশগ্রহণের প্যারাডক্সটি (যা প্রতীকায়িত হয়ে আছে প্যাল্লাসের জানালার ওপাশে আসন গ্রহণের মধ্যে) কাফকা খুবই প্রশংসনীয়ভাবে গল্পের ঘটনার সঙ্গে পাঠকের অংশগ্রহণের মধ্যেও জারিত করে দিয়েছেন।

গল্পের থিমটি, ধরা হয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব এবং পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রতীকী চিত্রায়ণ, যেমনটি আছে কেইন ও আবেলের ধর্মীয় মিথে। তবে গল্পটির অন্য ব্যাখ্যাও হয়েছে। এর সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাখ্যাটিতে বলা হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ইউরোপের, বিশেষ করে প্রাগের কথা। কাফকা এটি লেখেন ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে, যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাগ কাঁপছে, হাবসবুর্গ রাজত্বের সূর্য যখন ডুবু ডুবু। ঐ অস্থির ও শঙ্কাক্ত সময়ে প্রাগের বহুজাতিক 'ভ্রাতৃত্ববোধ' তখন বিরাট প্রশ্নের মুখে, নানা জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষকে একসঙ্গে ধরে রাখা সম্রাট তখন তাঁর শেষ সময়ে উপনীত; কাফকা হয়তো এই অদ্ভুত ও ভঙ্গুর সময়টির – যখন ভাই আর ভাই থাকছে না, যখন সবাই সবাইকে যতটা না বিশ্বাস করছে, সন্দেহ করছে তার চেয়ে বেশি – প্রতীকী বর্ণনা রেখেছেন এই গল্পে; খানিকটা ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তির ছলে।

গল্পটির ফ্রয়েডিয়ান ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে এর তিনটি চরিত্র মানবমনের তিনটি চেহারার প্রতিনিধিত্বকারী: শ্মার এখানে অচেতন অবস্থার নিয়ন্ত্রণহীন বাসনা; ভেজে এখানে অহংবোধের (ego) সামাজিক চেহারা; আর প্যাল্লাস সুপার-ইগোর (অধ্যহং বা মনের যে অংশ বিবেক ও নীতিবোধের আহ্বানে সাড়া দেয়) মনোযোগী দৃষ্টি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, গবেষকদের মতে, গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক আত্মসংহারের উদাহরণ। একই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক টেকনিক কাফকা সম্ভবত আরো সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন তাঁর বইয়ের নামগল্প 'এক গ্রাম্য ডাক্তার'-এ।

পরিশেষে, শ্মার ও ভেজের মধ্যকার শত্রুতাকে এভাবেও দেখা যায় যে এরা দুজন কাফকার বিভাজিত ব্যক্তিত্বের দুই চেহারা, যেখানে ভেজের মধ্যে আমরা দেখি সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়া, বিবাহিত, মধ্যবিত্ত এক আমলা কাফকাকে, যার স্ত্রী স্বামীর অফিস থেকে বাড়ি আসার জন্য অপেক্ষা করে আছে; আর শ্মার হচ্ছে নৈরাজ্যবাদী, সমাজচ্যুত

বা বহিরাগত এক চরিত্র যে তার সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়া আত্মস্বরূপকে (alter-ego) 'পুরো হাওয়া করে দিয়েছে' বা খতম করে দিয়েছে।

টীকা:

সব ফুল-ধরা (পৃ. ২৯৩): গোয়েটের কবিতা 'প্রমিথিউস' (১৭৭৪)-এর সামঞ্জস্যহীন কিন্তু সন্দেহাতীত উল্লেখ: 'কারণ আমার সব স্বপ্ন পরিপক্বতায় ফুল ধরেনি', বলেছিলেন গোয়েটে।

একটি স্বপ্ন

ছোট এই গল্পটির নায়ক এবং কাফকার *বিচার* উপন্যাসের নায়কের নাম একই – জোসেফ কে.। এই গল্পে জোসেফ কে. তার নিজের মৃত্যু নিয়ে স্বপ্ন দেখছে। যেহেতু গল্পটির মূল পাণ্ডুলিপির খোঁজ মেলেনি, এর লেখার তারিখটি তাই নিশ্চিত করে বলা যায় না, এবং তারিখটি নিয়ে কাফকা-গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্কও রয়েছে। যাঁরা গল্পটিকে *বিচার* উপন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেন, তাঁদের বিশ্বাস, এটি ১৯১৪ সালের শেষ মাসগুলোর কোনো এক সময়ে লেখা, যখন কাফকা তাঁর উপন্যাসটি নিয়ে সবচেয়ে নিবিড় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই স্বপ্নটি উপন্যাসে নেই, উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপির কোথাও নেই, এবং উপন্যাসের বৃহত্তর পরিধিগুলের কোনো স্থান বা কোনো পরিচ্ছেদের সঙ্গেই এটি খাপ খায় না। সর্বোপরি, গল্পটি বলা হচ্ছে তৃতীয়-পুরুষে সর্বজ্ঞ এক কথকের জবানিতে, যেখানে *বিচার* উপন্যাসে কাফকা তাঁর monopolized narration টেকনিক প্রয়োগ করেছেন, যাতে বর্ণনাকারীর দৃষ্টিকোণ এবং বর্ণনাকারীর বর্ণিত নায়কের দৃষ্টিকোণ একই। এ দুটি কারণে, অন্যদল গবেষকের বিশ্বাস, গল্পটি কাফকা *বিচার* উপন্যাস লেখা শেষ করার (তিনি অসমাপ্ত অবস্থায় উপন্যাসটি লেখা ছেড়ে দেন) বেশ কিছুকাল পরে, সম্ভবত ১৯১৬ সালের বসন্তে, লেখেন। গল্পটির কথা কাফকা প্রথম উল্লেখও করেন ১৯১৬ সালের জুন মাসে। একই রকম সর্বজ্ঞ-কথকের তৃতীয়-পুরুষের বর্ণনাভঙ্গিতে কাফকা ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালে অন্য আরো কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন বলেই – যার অধিকাংশই আছে তাঁর *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ে – গবেষকদের এই বিশ্বাস (যে গল্পটি *বিচার* উপন্যাস লেখা শেষ হওয়ার পরে লেখা) আরো দৃঢ় হয়েছে। ইংরেজি নাম: 'A Dream'; মূল জার্মান: 'Ein Traum'।

কাফকা সামান্য কয় বছরের ব্যবধানে গল্পটি মোট চারবার প্রকাশ করেন। নিজের লেখা নিয়ে তাঁর কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া অসন্তোষ বা সংশয়ের বিচারে এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয় যে লেখাটিকে তিনি নান্দনিক দিক থেকে সফল বলে মনে করতেন। এটির প্রথম প্রকাশ ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে, জায়োনিস্ট সাপ্তাহিকী *Selbstwehr* (*Self-Defence*)-এর সম্পাদনাগোষ্ঠীর প্রকাশিত গল্পসংকলন *Das jüdische Prag* (*Jewish Prague*)-এ। এর কয়েক সপ্তাহ পরই, ১৯১৭ সালের ৬ জানুয়ারি এটি প্রাগের দৈনিক পত্রিকা *Das*

Prager Tagblatt-এর সকালের সংস্করণে বের হয়। এরপর এটি আবার ছাপা হয় ১৯১৭ সালেই, *Neue Jugend* জার্নালের অ্যালমানাকে, যেটির সম্পাদক ছিলেন হেইনজ্ বারগার। সবশেষে, কাফকা ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত তাঁর চৌদ্দটি গল্পের সংকলন *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ের তেরো নম্বর গল্প হিসেবে এটি বইয়ে স্থান দেন।

গল্পে যেভাবে স্থান ও কালের সূত্র দুমড়ে-মুচড়ে ফেলা হয়েছে তা শুধু মানুষের স্বপ্নের মধ্যেই যে ঘটে এমন নয়, কাফকার অসংখ্য স্বপ্ন-নয় এমন গল্পেও আমরা তা ঘটতে দেখি। এটি কাফকা কথাসাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান কাঠামোগত কৌশল। গল্পে জোসেফ কে. স্বপ্ন দেখে যে একটি কবরের সামনে এক শিল্পী কবরফলকে তার (জোসেফ কে.-এর) নামটি লিখছে; শিল্পীর বিব্রত অবস্থা (সে বিব্রত, কারণ যে মানুষটি এই কবরে শোবে, অর্থাৎ জোসেফ কে. নিজে, সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে) দেখে জোসেফ কে. নিজেই নিজের কবরে শুয়ে পড়ে, ওখানে নিচে শুয়ে দেখতে থাকে শিল্পী কীভাবে কবরফলকে তার নামটি লেখা শেষ করে আনছে। ঠিক এ সময় এই স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে কে.; নিজের দাফন হয়ে যাওয়ার দৃশ্য-স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও, ভয় পাওয়ার বদলে আমরা দেখি সে, টিপিক্যাল কাফকান ঢঙে, বিস্ময়-বিমুগ্ধ, যেন দাফন হওয়াটা কোনো আনন্দের ঘটনা। মৃত্যুতে খুশি হওয়ার এই যে লক্ষণ, তার সঙ্গে কাফকা-পাঠকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে ফ্রানৎস কাফকার ডায়েরির মাধ্যমে, সেখানে অসংখ্যবার এজাতীয় কথা লিখেছেন তিনি। এ কারণেই, মনে হয়, এই জোসেফ কে. যত না *বিচার* উপন্যাসের জোসেফ কে., তার চেয়ে বেশি ফ্রানৎস কাফকা স্বয়ং। *বিচার* উপন্যাসের জোসেফ কে. উপন্যাসের শেষে খুন হয় যথেষ্ট লজ্জা ও মনঃপীড়া নিয়ে, সে-উপন্যাসে এ গল্পের নায়কের 'বিমুগ্ধ বিহ্বলতার' লেশমাত্র নেই।

অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন (দুটি খণ্ডাংশসহ)

কাফকার প্রথম এবং সম্ভবত সবচেয়ে কৌতুকপ্রদ জীবজন্তু-বিষয়ক গল্প, যার প্রথম পুরুষের কথক জন্তুটি (এ ক্ষেত্রে একটি শিম্পাঞ্জি) নিজেই। সংগতকারণেই গল্পটি প্রাণীটির দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা। লেখার কাল: এপ্রিল, ১৯১৭। কাফকা এটি সম্ভবত ১৯১৭ সালের ১ এপ্রিল দৈনিক *Prager Tagblatt* পত্রিকায় প্রকাশিত, প্রাগে অনুষ্ঠিত এক সার্কাস দলের এক শিম্পাঞ্জি-বিষয়ক রিপোর্ট পড়ে লিখতে অনুপ্রাণিত হন। কাফকা সে বছরের এপ্রিলের শেষে মার্টিন বুবারের কাছে তাঁর নতুন জার্নাল *The Jew* (*Der Jude*)-এ প্রকাশের জন্য মোট বারোটি লেখা পাঠান; বুবার তার মধ্য থেকে বেছে নিয়ে দুটি গল্প ছাপান 'Two Animal Strories' শিরোনামে – একটি 'শেয়াল ও আরব', এবং অন্যটি 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন'। ছাপার তারিখ: নভেম্বর, ১৯১৭। এটি কাফকার অনুমতি না নিয়েই আবার ছাপা হয় ১৯১৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর *Osterreichische Morgenzeitung* পত্রিকার ক্রিসমাস ক্রোড়পত্রে। সবশেষে কাফকা এটি তাঁর *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ের শেষ

গল্প হিসেবে প্রকাশ করেন। ইংরেজি নাম: 'A Report to an Academy' মূল জার্মানে: 'Ein Bericht fur eine Akademie'।

গল্পের প্রেক্ষাপটটি যেমন বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ, তেমনই হাস্যকর: রট্পিটার নামের এক শিম্পাঞ্জি, সার্কাসের খেলা দেখানো শিল্পী সে, সফলভাবে মানুষের আচরণ অনুকরণ করে যাচ্ছে, যাতে করে সে হয়ে উঠতে পারে 'গড়পড়তা শিক্ষিত একজন ইউরোপিয়ান'; আর এবার সে অ্যাকাডেমির কাছে তার আগের শিম্পাঞ্জি-জীবন নিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখতে বসেছে। কিন্তু, কী হাস্যকর, রট্পিটার বলছে যে তার পক্ষে এই প্রতিবেদন লেখা সম্ভব নয়; কারণ, সে মানুষের সভ্যতার সঙ্গে এমনভাবে আত্মীকৃত হয়ে পড়েছে যে আসলে সে মানুষই হয়ে গেছে, এবং শিম্পাঞ্জি অতীতের কোনো স্মৃতিই তার আর এখন মনে নেই। তার প্রতিবেদনে তাই আছে আফ্রিকার জঙ্গলে তার ধরা পড়ার পরের কাহিনি, শিম্পাঞ্জি থেকে 'মানুষ' হয়ে ওঠার ইতিহাস। কাফকার 'আয়রনি'ও (বক্রাঘাত) সবচেয়ে ঝিলিক মারে এখানেই: এই শিম্পাঞ্জিটির প্রথম প্রশিক্ষকেরা হচ্ছেন তাকে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা জাহাজেরই নাবিক, আর তার প্রথম মানবসুলভ কাজগুলো হচ্ছে থুতু ফেলা, পাইপ টানা আর অ্যালকোহল পান। আর রট্পিটার যেভাবে অ্যালকোহলের গন্ধ ও ঝাঁঝালো স্বাদ কাটিয়ে উঠে পরে তা পান করতে শেখে, তা 'সভ্য হওয়ার পুরো প্রক্রিয়ারই 'মেটাফর'।

মানুষ হওয়ার শিক্ষা নিতে গিয়ে রট্পিটারের মাথায়, আমরা দেখি, একটা জিনিসই কাজ করে – তার দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে 'বেরোনোর পথ'। তবে, লক্ষণীয়, এই বেরোনোর পথ ('Ausweg') স্বাধীনতার সমার্থক নয়। 'স্বাধীনতা' কথাটি মেলে তার ধরা পড়ার আগের জীবনের সঙ্গে, আর অন্যদিকে মানুষের জীবনে, রট্পিটারের মতে, 'স্বাধীনতা' একটি ধোঁকা মাত্র। তার 'বেরোনোর পথ' মানে পালিয়ে যাওয়াও নয়, কিংবা আত্মহত্যা করাও নয়; রট্পিটার ও-ধরনের বেপরোয়া স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে, বদলে গ্রহণ করে যথেষ্ট যুক্তিশীল, হিসাবী এক কৌশল। তার 'বেরোনোর পথ' হচ্ছে নিখুঁতভাবে মানুষের নকল করা, নিখুঁতভাবে মানবসভ্যতার অংশ হয়ে যাওয়া, মিশে যাওয়া। রট্পিটার বলে যে তার এই মানুষের সঙ্গে আত্তীকরণ সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝানো যায় একটা জার্মান প্রবাদের মাধ্যমে: 'sich in die Busche schlagen'; যার অর্থ 'ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হওয়া', শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে যার আক্ষরিক অর্থ বিপজ্জনক প্রাণীর হাত থেকে (মানুষের হাত থেকে) বাঁচতে আরো ঘন জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া। কাফকা এই প্রবাদবাক্যে রট্পিটারের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এক মহা কৌতুকই শুধু করেননি, লেখক হিসেবে তাঁর উৎকর্ষও দেখিয়েছেন – রট্পিটার বলছে সে তার শিম্পাঞ্জি-জীবন পার হয়ে এসেছে, ওটা এখন তার জন্য শুধুই অতীত, ওদিকে সে মানুষ নিয়ে ভাবতে গিয়ে ভাবছে শিম্পাঞ্জিরই মতো করে। (এর অন্য অর্থও হয় যে, এই 'ঘন জঙ্গল' আসলে তথাকথিত সভ্য মানুষেরই 'জঙ্গল', অর্থাৎ সভ্য মানুষও জঙ্গলের পশুই, শুধু প্রেক্ষাপট বা বাসের স্থানটাই যা ভিন্ন)। যা হোক, মানুষের নকল করাই হচ্ছে যেহেতু রট্পিটারের 'বেরোনোর পথ', তার মানে, চারপাশের মানবসমাজের মধ্যে মিশে যাওয়াতেই রট্পিটারের মুক্তি, ঠিক যেভাবে বহুরূপী গিরগিটি নিজেকে খাপ

খাওয়ায় তার পরিবেশের সঙ্গে গায়ের রং বদলিয়ে। এ অর্থে কাফকা এখানে ডারউইনিয়ান থিম নিয়েই চাতুরীর সঙ্গে খেলেছেন: ডারউইনের 'শ্রেষ্ঠই টিকে থাকবে' মতবাদ মানে, কাফকার কাছে, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে খাপ খাওয়ানোরাই টিকে যাবে।

কাফকার শিম্পাঞ্জির মধ্যে তাঁর সমকালীন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মানবসভ্যতার সংঘটনবিষয়ক তত্ত্বের স্পষ্ট ছোঁয়া দেখা যায়: প্রথমত, সভ্য হওয়া মানে বিশাল পরিমাণে আত্মশৃঙ্খলা (যার অন্য অর্থ নিজেকে শাস্তি দেওয়া, নিজের সত্তাকে অস্বীকার করা) দেখানো এবং তার ভেতরে নিজেকে সঁপে দেওয়া; দ্বিতীয়ত, সভ্যতা মানুষের মুক্তির বা স্বাধীনতার পথে যাত্রা নয়, বরং উল্টোটাই, অর্থাৎ মানুষ যত সভ্য হয়, ততই বন্দিত্বের জোয়াল তার কাঁধে চাপে; রট্‌পিটার মানুষ হচ্ছে মানে সে আরো বন্দী হচ্ছে। ফ্রয়েডের চিন্তার ধাঁচেই কাফকা এ গল্পে সভ্যতার পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। আর শুধু যৌন সংসর্গের সময়ই যে আমরা রট্‌পিটারকে দেখি তার আধা-জান্তব আদিরূপে নেমে যেতে, সেটিও কাফকার ফ্রয়েড থেকে নেওয়া।

এ গল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হচ্ছে, কাফকা যেভাবে অনুকরণ ও আত্মীকরণের বিষয়টি গল্পের ভাষা ও কাঠামোর মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। রট্‌পিটার শিক্ষিত এক অ্যাকাডেমির কাছে চিঠি লিখছে এমন এক ভাষায়, যে ভাষা সে নিজেই অ্যাকাডেমির বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করছে। এখানেই আমরা বুঝতে পারি, কেন সে তার বিবরণটিকে বস্তুনিষ্ঠ 'রিপোর্ট' বা 'প্রতিবেদন' বলতে চায়; আরো বুঝতে পারি, রট্‌পিটারের ভাষার অতিসচেতন চেহারার প্রয়োজনীয়তাটুকুও। আমাদের অবাক হতে হয় তার সঠিক জায়গায় সঠিক মেটাফরের ব্যবহারের ক্ষমতা দেখে, আর যে চুলচেরা নির্ভুলতার সঙ্গে সে ভাষার অর্থঘটিত কাছাকাছি শব্দ 'বেরোনোর পথ', 'স্বাধীনতা', কিংবা 'পলায়ন'-এর মধ্যে পার্থক্য করে, তা দেখে বিস্ময় জাগে। কাফকা এ গল্পের বিষয়বস্তু ও গদ্যশৈলীর মধ্যে চাতুরীর সঙ্গে যে স্বপ্রকাশিত সংগতি ফুটিয়ে তুলছেন, তা কেবল খুব বড় মাপের লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

মূল গল্পটি (অর্থাৎ *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ে প্রকাশিত গল্পটি) যেখানে শেষ হয়েছে, বাংলা অনুবাদে এর পরে 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন – দুটি খণ্ডাংশ' নামের একটি লেখা জুড়ে দেওয়া হলো। দুটিই এ গল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথমটিতে রটপিটারের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন গল্পের কথক, তারপর দুজনের মধ্যে চমৎকার কিছু কথোপকথন। বোঝাই যায় কাফকা এ অংশটি মূল গল্পের খসড়া হিসেবে লিখেছিলেন। কিন্তু লেখার চমৎকারিত্বের গুণে এটি নিজেই একটি গল্প হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়টি 'একটি চিঠির শুরু', চিঠিটি রটপিটারকে লিখেছে তার প্রথম প্রশিক্ষক – বেশ মজার চিঠি, যার শেষ হয়েছে কেমন যেন এক ধাঁধার মধ্য দিয়ে।

প্রথম খণ্ডাংশটি নেওয়া হয়েছে ইংরেজিতে *The Complete Stories of Franz Kafka* (১৯৭১; শোকেন্ বুকস) বইটি থেকে; অনুবাদ তানিয়া ও জেমস স্টার্নের। এখানেও,

এই ইংরেজি বইটির মতোই, খণ্ডাংশটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত মূল গল্পটির পরে, আলাদা করে।

দ্বিতীয় খণ্ডাংশটি নেওয়া হয়েছে ফ্রানৎস কাফকার *Description of A Struggle and Other Stories* (১৯৭৯; পেঙ্গুইন মডার্ন ক্ল্যাসিকস্) বইটি থেকে; তানিয়া ও জেমস্ স্টার্নের অনুবাদে একই প্রথম খণ্ডাংশের পরে এই চিঠিটি সেখানে ছাপা হয়েছে একটু বিরতি দিয়ে।

দুটি খণ্ডাংশই প্রথম প্রকাশিত হয় প্রাগে, ১৯৩৭ সালে, মূল জার্মানে।

টীকা:

গোল্ড কোস্ট (পৃ. ২৯৭): পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপসাগরের পাশের ব্রিটিশ কলোনি, যা পরে ১৯৫৭ সালে ঘানা নামের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই ঘানার জঙ্গল থেকে ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপের অনেক চিড়িয়াখানার জন্য জীবজন্তু (বিশেষ করে শিম্পাঞ্জি, গরিলা) ধরে আনা হতো।

হাগেন্‌বেক (পৃ. ২৯৭): ১৯০৭ সালে হামবুর্গ চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল হাগেন্‌বেক (১৮৪৪-১৯১৩); কাফকা সম্ভবত হাগেন্‌বেকের আত্মজীবনী পড়েছিলেন এবং জোর নয় বরং মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় বন্য পশুকে পোষ মানানোর হাগেন্‌বেক তত্ত্বের কথা জানতেন।

রেড পিটার বা রট্‌পিটার (পৃ. ২৯৭): রট্‌পিটার অর্থ 'রেড পিটার' (Red Peter); এই নাম ইঙ্গিত করছে গুলিতে আহত হয়ে তৈরি ক্ষতের দাগের দিকে। ১৯০৪ সালে কাফকার প্রাগে সার্কাসে খেলা দেখিয়েছিল কনসাল পিটার নামের এক শিম্পাঞ্জি; জ্যাকেট পরে সে ডিনার করত, বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে মদ খেত, তারপর চেয়ারে পেছনে হেলান দিয়ে সিগারেট টানত। কাফকা এর পিটার নামের সঙ্গে গুলির ক্ষতের লাল দাগ যোগ করে নায়ক শিম্পাঞ্জিটিকে নাম দিয়েছেন: রট্‌পিটার।

কয়লা-বালতির সওয়ারি

ছোটগল্প, কাফকা এটি প্রথমে লেখেন তাঁর আটটি অক্টাভো নোটবই-এর 'B' বইটিতে; সুতরাং গবেষকদের বিশ্বাস ১৯১৭ সালের মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারির কোনো এক সময়ে এটি লেখা। গল্পটিতে প্রথম পুরুষের এক কথক কয়লা আনতে এক কয়লা ব্যাপারীর কাছে যায়, তার বাহন কয়লার একটি বালতি (Coal-Scuttle), কিন্তু তার হাত পুরো খালি, অতএব ব্যাপারী তার প্রতি কোনো দয়া দেখায় না। ১৯১৬-১৭ সালে ভয়ংকর শীতের সময়ে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর কয়লাসংকটের দিনে, কাফকা এটি লেখেন প্রাগ দুর্গের পাশে বোন ওট্‌লার ভাড়া করা ২২ নম্বর আলকেমিস্ট লেনের (বা গোল্ডেন লেন) এক কামরার ছোট ঘরটিতে বসে, যেখানে শরীর গরম রাখার জন্য ছিল একটা স্টোভ, তাতে শীত মানত না পুরোপুরি। কাফকা প্রথমে এটি *এক গ্রাম্য ডাক্তার* গল্পসংকলনে দেওয়ার কথা ভাবেন, কিন্তু প্রুফ দেখার সময় অজ্ঞাত কারণে এই সুন্দর

গল্পটি বই থেকে বাদ দিয়ে দেন। প্রুফ দেখার কাগজগুলো আজও টিকে আছে; সেখানে দেখা যায় কাফকা গল্পটি বই থেকে বাদ দেওয়ার আগে নতুন করে লেখার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। গল্পটি লেখার তারিখ থেকে প্রকাশনার তারিখের মধ্যে দীর্ঘ চার বছরের ব্যবধান; এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালের ২৫ ডিসেম্বর *Prager Presse* দৈনিক পত্রিকার ক্রিসমাস ক্রোড়পত্রে। ইংরেজি নাম: 'The Coal-Scuttle Rider' কিংবা 'The Bucket Rider'; মূল জার্মানে: 'Der Kübelreiter'।

গল্পের কাঠামোতে আছে শীতে মরো-মরো অবস্থার কথক আর অন্যদিকে গরমে সেদ্ধ কয়লা-ব্যবসায়ী ও তার বউয়ের মধ্যকার পরিস্থিতির তুলনা। একজনের কাছে কোনো কয়লা নেই, আর অন্যজন যেন পৃথিবীর সব কয়লা নিয়ে বসে আছে। কিন্তু এবার আর বাকিতে কয়লা দেবে না ব্যাপারী; তবে ব্যাপারীর মন যদি একটু গলল তো তার বউ কঠিন-নিষ্ঠুর। গল্পের শেষে কয়লা-ব্যাপারীর বউকে অভিশাপ দিয়ে কথক বেচারা হারিয়ে যায় শীতের পাহাড়ের দেশে, ঠিক যেভাবে 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের ডাক্তারকে আমরা দেখি তুষারের দেশে অনন্তকাল ঘুরে বেড়ায় রোগীকে বাঁচাতে না-পারার ব্যর্থতায় আর তার ঘোড়া দুটির বিশ্বাসঘাতকতায়।

আক্ষরিক অর্থে দেখলে গল্পটিকে মনে হয় সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাফকার সৃষ্টিশীল অবস্থান – একদিকে যার আছে তার কথা, আর অন্যদিকে যার নেই তার দুর্দশার কাহিনি। ভিখিরিদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু টাকাপয়সা, কিন্তু এখানে তা কয়লা, যা না পেলে প্রাগের ওই বরফঢাকা শীতে বেঁচে থাকা নিঃসন্দেহে একদম অসম্ভব। আর কয়লা-ব্যাপারীর স্ত্রী যেভাবে নির্দয়তা দেখালেন, তা শহরের জীবনে আধুনিক মানুষের নিত্যকালীন আচরণের ছবি – নিজের স্বার্থ অনেক বড় বিষয় অন্যের জন্য দয়ামায়ার চেয়ে।

এ তো গেল আক্ষরিক অর্থের কথা। আলংকারিক অর্থে দেখলে এ গল্পের মূল সৌন্দর্য কাফকার কলমে প্রচণ্ড শীতের বর্ণনা। কাফকা-সাহিত্যে বরফ বা শীতের কথা বারবারই এসেছে, প্রতিবারই সমাজ থেকে সৃজনশীল লেখকের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও তার নিঃসঙ্গতার রূপক হয়ে। কাফকাসাহিত্যের দুই বিখ্যাত চরিত্র – 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের ডাক্তার এবং 'রায়' গল্পের নায়ক গেয়র্গের রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে বাস করা বন্ধুটি – আক্ষরিক ও মেটাফরিক্যাল, দুই অর্থেই, শীতার্ত আবহাওয়ার হাতে পীড়িত নিঃসঙ্গ, দুই ব্যাচেলর। এই শীত শুধু আবহাওয়ার শীতই নয়, তাদের নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন পারিপার্শ্বিকতার সামাজিক 'শীতলতা'ও বটে। ফ্রেডরিখ নিট্‌শে, কাফকার ওপরে যাঁর প্রভাব অনেক, বলেছেন সৃজনশীল ব্যক্তিমানুষ মাত্রই তুষারঢাকা পাহাড় চুড়ার মধ্যে বাস করা নিঃসঙ্গ ভবঘুরে। এ গল্পের কয়লা-ব্যাপারীর স্ত্রীকে আমরা উল বুনতে দেখি; হাতের আঙুল গরম থাকলেই কেবল উল বোনার কাজ করা যায়। এ দৃশ্য দেখে আমাদের মাথায় আসে, ২২ নম্বর আলকেমিস্ট লেনের বরফজমা বাসায় বসে, নিঃসঙ্গ ফ্রানৎস কাফকার জমে যাওয়া আঙুলে সাদা পৃষ্ঠার উপরে কলম দিয়ে লেখার অক্ষর বোনার কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি পড়লে মনে হয়, এটি লেখার সময়

লেখকের দুর্দশাগ্রস্ত বাস্তব অবস্থা এবং উষ্ণ কোনো ঘরে বসে কোনো অবস্থাপন্ন মহিলা যে উল বুনছে তা নিয়ে লেখকের ঈর্ষা – এ দুয়ে মিলেই সম্ভবত সৃষ্টি হয়েছে কয়লা-বালতির সওয়ারির অমানবিক আখ্যান।

মূল গল্পটি *Prager Presse* সংবাদপত্রে যেভাবে ছাপা হয়েছে, তার শেষে এখানে যোগ করা হলো মূল পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া আরো একটি প্যারাগ্রাফ। কাফকা পাণ্ডুলিপিতে এ অংশটুকু কেটে বাদ দিয়েছিলেন। উইল্‌হেম এমরিখের যথেষ্ট খ্যাতিমান, কাফকা-সাহিত্যের 'দার্শনিক' ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ *Franz Kafka – A Critical Study of His Writings* (জুন ১৯৮১; উঙ্গার পাবলিশিং কোম্পানি) গ্রন্থ থেকে এই অংশটুকু নেওয়া হয়েছে, যা, উইল্‌হেম এমরিখের মতে, গল্পটির পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এই বাদ পড়া অংশটুকুর সঙ্গে 'এক গ্রাম্য ডাক্তার' গল্পের শেষটুকু পাশাপাশি পড়লে দুটি গল্পের উপসংহারের তুলনা আরো জোরালো হয়।

এক অনশন-শিল্পী – *চারটি গল্প*

চারটি গল্পের এই সংকলন। নাম *এক অনশন-শিল্পী – চারটি গল্প*, কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত সপ্তম ও শেষ বই। কাফকা মারা যান ১৯২৪ সালের ৩ জুন; মৃত্যুশয্যায় তিনি বইটির প্রুফ দেখছিলেন; আর বইটি আলোর মুখ দেখে তার মাত্র চার মাস পরে, ১৯২৪-এর অক্টোবরে। প্রকাশক বার্লিনের নামী প্রকাশনা সংস্থা ডি স্মিড্যে (Die Schmiede)। নামগল্পটি ছাড়াও এতে আছে আরো তিনটি গল্প: 'প্রথম দুঃখ', 'এক ছোটখাটো মহিলা' এবং 'গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি'। এ চারটি গল্পই কাফকার মৃত্যুর আগে হয় সংবাদপত্রের সাহিত্য পাতায়, না হয় সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও বন্ধু ম্যাক্স ব্রডই সব সময় কাফকার হয়ে প্রকাশকদের সঙ্গে তাঁর বইগুলোর চুক্তি ইত্যাদি সম্পন্ন করতেন এবং তিনিই কাফকাকে ডি স্মিড্যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের খোঁজ দেন, তবু কাফকা নিজেই প্রকাশকের সঙ্গে এ বই নিয়ে বাণিজ্যিক চুক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের দফারফা করেন ১৯২৩ সালে। প্রকাশকের কাছ থেকে কাফকা সামান্য কিছু অগ্রিম টাকাও পেয়েছিলেন, সেটা তাঁর চিকিৎসার জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল। মৃত্যুর পর বইয়ের রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্য সব অর্থ তাঁর জীবনের শেষ সময়ের প্রেমিকা ডোরা ডিয়ামান্টকে দেওয়ার তিনি বন্দোবস্ত করে যান। বইয়ের প্রুফ যখন তাঁর কাছে পৌঁছায় তখন তিনি ভিয়েনার কাছের কিয়েরলিংয়ের স্যানাটোরিয়ামে শয্যাশায়ী; জীবনের শেষ কয়েকটি সপ্তাহে, যখন তাঁর কথা বলার আর সামর্থ্য নেই এবং তিনি কিছু খেতেও পারছেন না, তিনি তাঁর সহসঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেন কাগজের টুকরোতে (conversation slips) লিখে লিখে। এরই একটিতে তিনি রীতিমতো বিলাপ করেন যে, প্রকাশকেরা তাঁর কাছে প্রুফ কপি পাঠাতে খুবই দেরি করে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও শরীরের শেষ শক্তিটুকু

দিয়ে, কাফকা বইয়ের গ্যালি-প্রুফ দেখা সম্পন্ন করে যান একদম তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে কাজ করে। এ বইয়ের তিনটি গল্পই সরাসরি কোনো শিল্পীকে (performing artist) নিয়ে; শুধু ব্যতিক্রম 'এক ছোটখাটো মহিলা', তবে নিবিড়ভাবে দেখলে তাকেও একধরনের শিল্পী বলে মনে হয়। পুরো বইটিতেই আছে মৃত্যুপথযাত্রী এক লেখকের জীবনের শেষবেলার বিদায়ের সুর। এর দুটি গল্প – 'এক অনশন-শিল্পী' (যেটি কাফকা নিজেই বলে গিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে টিকে থাকবে) এবং 'গায়িকা জোসেফিন' – কাফকা-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রচনার মর্যাদা পেয়েছে। বইটির থিম বিষয়ে আমরা নিচে গল্পগুলোর আলাদা আলাদা পাঠ-পর্যালোচনায় কথা বলব। বইটির ইংরেজি নাম: *A Hunger Artist: Four Stories* কিংবা *A Fasting-Artist: Four Stories* কিংবা *A Fasting Showman: Four Stories;* মূল জার্মান নাম: *Ein Hüngerkunstler: Vier Geschichten*।

প্রথম দুঃখ

এক অনশন-শিল্পী বইয়ের এ প্রথম গল্পটি কাফকা লেখেন ১৯২১ সালের শরৎকাল থেকে ১৯২২-এর বসন্তের মধ্যকার কোনো এক সময়ে, যখন তাঁর শারীরিক অবস্থা দিন দিন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। মূল পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে ছেঁড়া কয়েকটি পাতায়, যা কাফকা সম্ভবত তাঁর ডায়েরি বা নোট বই থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিলেন। গল্পটি প্রথমে ছাপা হয় কাফকার প্রথম প্রকাশক কুর্ট ভোলফের জার্নাল *Genius*-এ ১৯২১ সালে (ভলুম ৩, নম্বর ২, ১৯২১); পরে ১৯২২ সালে *Prager Presse* নামের দৈনিক পত্রিকার ডিসেম্বর মাসের ক্রিসমাস ক্রোড়পত্রে। ১৯২২ সালের ২৬ জুন ম্যাক্স ব্রডকে লেখা এক চিঠিতে কাফকা বন্ধুকে লেখেন যে এটি 'বিরক্তিকর, ছোট একটি গল্প'।

বইয়ের মোট চারটি গল্পের তিনটি যেমন, এটিতেও তেমনই কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন শিল্পী, এ ক্ষেত্রে ট্র্যাপিজ শিল্পী বা সার্কাসের ট্র্যাপিজে খেলা দেখানো এক অ্যাক্রোব্যাট, যে কিনা যখন দর্শক থাকে না, অর্থাৎ শো চলাকালীন সময় বাদেও সারা দিনই সার্কাসের তাঁবুর উপর দিকে তার ট্র্যাপিজে বসে থাকে, কখনোই নিচে নামে না। যেহেতু সে খুব ভালো একজন ট্র্যাপিজ শিল্পী, তাই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তার খেয়ালকে সহ্য করে যায়; তাদের স্বার্থ এটুকুই যে তারা জানে, এর মাধ্যমে শিল্পীকে তার শিল্পের চূড়ান্ত উৎকর্ষ ধরে রাখতে সাহায্য করা হচ্ছে; তাদেরও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে। একমাত্র ঝঞ্ঝাট বাধে, যখন এই শিল্পীকে শহর বদল করতে হয়। ম্যানেজার চেষ্টা করেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে নতুন শহরে, নতুন সার্কাসের তাঁবুতে গিয়ে, উপরে ট্র্যাপিজে বসিয়ে দেওয়ার, কিন্তু পথের যন্ত্রণা (অর্থাৎ ট্র্যাপিজ থেকে নেমে গাড়িতে বা ট্রেনে বসে থাকা) তাকে ভীষণ মনঃপীড়া দেয়। ট্রেনে সে বসে থাকে উপরে লাগেজ রাখার তাকে; এই অংশে আমরা কাফকার রীতিমাফিক নিষ্ঠুর কৌতুক বা রসবোধ প্রত্যক্ষ করি। একদিন সে জানায়, এখন

থেকে সে আর শুধু এক ট্র্যাপিজে খেলা দেখাবে না, তার দুটি করে ট্র্যাপিজ লাগবে। যদিও ম্যানেজার কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ বিবেচনা করে তৎক্ষণাৎ এই অসম্ভব প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়, তবু শিল্পীর কান্না থামে না, সে পুরো গল্পে তার একমাত্র সংলাপটি আওড়ায়: 'আমার হাতে শুধু এই একটা মাত্র [ট্র্যাপিজের] বার – কী করে আমি বাঁচব এভাবে!' ম্যানেজার তাকে কথা দেয়, নতুন শহরে পৌঁছানোর আগেই তার দুই ট্র্যাপিজের কথা জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠানো হচ্ছে, আর নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে এত বড় 'ভুল' কী করে তার নিজের চোখ এড়িয়ে গেছে এত দিন। শেষে ট্র্যাপিজ শিল্পীর কপালে বলিরেখা দেখে, সে যে বুড়িয়ে যাচ্ছে তা লক্ষ করে, ম্যানেজার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এ গল্পটির অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়েছে। সমালোচকেরা এর মধ্যে বইয়ের মূল গল্প 'এক অনশন-শিল্পী' লেখার প্রস্তুতিপর্ব দেখতে পেয়েছেন। দুটি গল্পেই দুই ভিন্ন ধরনের শিল্পী, আর তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের বাণিজ্যিক কর্তা, ম্যানেজার মহোদয়। ট্র্যাপিজ শিল্পী দুটি ট্র্যাপিজ চাওয়ার মধ্যে দিয়ে তার শিল্পের আরো উন্নত, আরো অসম্ভব শিখরে পৌঁছানোর তাড়নার কথাই ব্যক্ত করছে। এক ট্র্যাপিজ নিয়ে শিল্পী তার কাজ চালিয়েছে সম্পূর্ণ সমাজবিচ্ছিন্ন এক অবস্থায় – কাফকা নিজে যেভাবে নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতার মধ্যে লেখালেখি চালিয়ে যেতে চাইতেন, তেমন। দুই ট্র্যাপিজে নিশ্চয়ই শিল্পমান আরো সমুন্নত হবে, এ-ই শিল্পীর ধারণা। কিন্তু ম্যানেজারের ভীতি, এরপর শিল্পী আরো আরো ট্র্যাপিজ চাইবে, কারণ শিল্পের চূড়ান্ত মান বলে আর কিছু নেই, ভালো শিল্পীরা প্রতিবারই চায় আগের সেরাটুকু ছাড়িয়ে যেতে; আর তাই যদি হয়, শিল্পমান নিয়ে মহা খুঁতখুঁতে এই শিল্পী তো একদিন কোনো দুর্ঘটনাই ঘটিয়ে বসবে, তখন তার নিজের জীবনটাও যাবে, আর ম্যানেজারের ব্যবসাটাও যাবে।

এ গল্পের অন্য একটি ব্যাখ্যা হলো এ রকম: এখানে শিল্পীর 'প্রথম দুঃখ' এ নিয়েই যে সে তার শিল্পের নিষ্পাপ, নির্দোষ, নির্ঝঞ্ঝাট পর্বটি পার করে এসেছে; তার এখনকার উপলব্ধি চারিত্রের দিক থেকে কাফকার অন্যতম প্রিয় লেখক হাইনরিখ ফন ক্লাইস্টের 'On the Puppet Theater' লেখাটির প্রধান চরিত্রের উপলব্ধির মতো – অর্থাৎ শিল্পীর জন্য ঐ নির্ঝঞ্ঝাট পর্ব শেষের বোধ থেকেই আসে এর পরের খ্যাপামি বা পাগলামি পর্বে প্রবেশের অন্তর্তাগিদ; উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছানোর তার সহজ সুন্দর স্বপ্ন তখন ঢুকে যায় বিপজ্জনক খ্যাপামির জগতে।

তবে মোটামুটি সব কাফকাবোদ্ধাই একমত যে 'প্রথম দুঃখ' গল্পে কাফকা তাঁর নিজের জীবনের কথাই বলেছেন; এটি মেটাফরের মাধ্যমে জীবনের শেষ ভাগে এসে নিজের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে, শিল্পমান নিয়ে মহা খুঁতখুঁতে ও সংশয়পূর্ণ কাফকার অন্তর্জগতের ছবিই তুলে ধরেছে; তিনি তখন বুঝতে শুরু করেছেন যে শিল্পের উৎকর্ষে পৌঁছানোর তাঁর নিয়ত স্বপ্ন ও লেখালেখির মাধ্যমে জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত একমাত্র উচ্চাশাটুকু পূরণের তাঁর স্বপ্ন বুঝি অধরাই থেকে যাবে। গল্পে কাফকার মনোজগতের তখনকার এই হতাশা ও বেদনার সুরটি স্পষ্ট। যথেষ্ট মন খারাপ করা এক গল্প যে এই 'প্রথম দুঃখ', তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এক ছোটখাটো মহিলা

বইয়ের এই দ্বিতীয় গল্পটি কাফকা সম্ভবত লিখেছিলেন ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে, বার্লিনে ডোরা ডিয়ামান্টের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে একত্রে থাকার দিনগুলোতে। পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে একগাদা কাগজপত্রের মধ্যে; কাফকার *ক্রিটিকাল এডিশন*-এর সম্পাদকেরা যে বান্ডিলটির নামই দিয়ে রেখেছেন 'এক ছোটখাটো মহিলা'।
গল্পের ছোট মহিলাটি সম্ভবত তাদের বার্লিন অ্যাপার্টমেন্টের বাড়িওয়ালি মহিলা, যিনি কাফকার নামে অভিযোগ এনেছিলেন বেশি বেশি বিদ্যুৎ খরচ করার। গল্পে এই ঝগড়াটে মহিলাকে দেখানো হয়েছে হালকা-পাতলা গড়নের বিবর্ণ, সোজা চুলের এক ব্লন্ড হিসেবে, যার প্রাণশক্তির অভাব নেই, আর কখনো কোনো বিরাম-বিশ্রাম নেই। গল্পের কথকের অত্যাচারে সব সময় বিরক্ত হয়ে এই মহিলা আসলে কথকের চিন্তা ও কাজের নেতিবাচক দিকটুকুর প্রতিধ্বনির সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। পারস্পরিক রাগই মনে হয় এ দুজনের মধ্যকার একাত্মবোধের একমাত্র প্রকাশ। কাফকা তাঁর মৃত্যুর আগে এই গল্পটির পুরো প্রুফ সংশোধন করে গেলেও, বইয়ে ছাপা হওয়া অবস্থায় এটি দেখে যেতে পারেননি। এটির প্রথম প্রকাশ ১৯২৪ সালের ২০ আগস্ট *Prager Presse* পত্রিকার ইস্টার ক্রোড়পত্রে। ইংরেজি নাম: 'A Little Woman'; মূল জার্মানে: 'Eine Kleine Frau'।

গল্পের ছোট মহিলার কেন কথকের প্রতি রাগ বা বিরক্তি, তা কোথায়ও স্পষ্ট করা হয়নি। কথক তাকে জ্বালাতন করে, এটুকুই মহিলার সঙ্গে কথকের সত্যিকারের একমাত্র সম্পর্ক। কথক একপর্যায়ে চেষ্টা করে সম্পর্কটি ঢেলে সাজানোর, মহিলাকে শান্ত করার। তবে, শেষে তার দাবি, সে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। কথককে আমরা দেখি পুরো বিষয়টি তার এক পুরোনো বন্ধুকে বলতে, যে বন্ধু বুদ্ধি দেয় কিছুদিনের জন্য কথক যেন দৃশ্যপট থেকে সরে যায়, দূরে কোথায়ও চলে যায়। কথক এই উপদেশকে আমলে নেয় না, কারণ এটি পুরোনো উপদেশ যা সে অন্যদের থেকেও পেয়েছে। উল্টো এই উপদেশের কারণে সে আরো বেশি করে মনস্থির করে এখান থেকে না-নড়ার। তার বিশ্বাস, খারাপ কিছুই ঘটবে না; বাইরের মানুষের মতামত তার বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, আর তার সামাজিক অবস্থান মোটামুটি এতটাই শক্ত যে, ছোট মহিলা তার বিরুদ্ধে বড় কোনো পদক্ষেপ নিলেও তার খুব বেশি কোনো ক্ষতি হবে না। সে বলে যে তার সত্যিকারের অস্বস্তি কারো ঘৃণার বিরামহীন লক্ষ্যবস্তু হওয়া নিয়ে, আর কিছু নয়। পরিশেষে কথক – 'রায়' গল্পের গেয়র্গ বা *বিচার* উপন্যাসের জোসেফ কে.-এর উল্টো গিয়ে, অর্থাৎ তাদের দুজনের মতো সমাজের অন্যের মতামতে বিরাটভাবে প্রভাবিত না হয়ে – মনস্থির করে এসব ঝুটঝামেলার দিকে বুড়ো আঙুল দেখাবে, আর নিজের জীবন কাটিয়ে যাবে এই মহিলার ক্রোধ বা দুর্ব্যবহারের তোয়াক্কা না করেই, পৃথিবীর সব যন্ত্রণার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, নির্বিঘ্নে।

প্রথম পাঠে গল্পটি *এক অনশন-শিল্পী* বইয়ের অন্য তিনটি গল্প থেকে যথেষ্ট ভিন্ন রকমের বলে মনে হয়। বাকি তিনটিতেই কোনো না কোনো শিল্পীর কথা বলা হয়েছে – একজন ট্র্যাপিজ শিল্পী, একজন ক্ষুধা-শিল্পী, আরেকজন গায়িকা; কিন্তু এ গল্পের ছোট মহিলা আপাতচোখে কোনো শিল্পী নয়। তবে গবেষকেরা এই মহিলার স্বভাবের মধ্যে শিল্পীর চেতনার প্রকাশ দেখেছেন এভাবে যে তার সুপার ইগো (অধ্যহং; অর্থাৎ মনের যে অংশ বিবেক ও নীতিবোধের আহ্বানে সাড়া দেয়) নিয়ত পর্যবেক্ষণ করছে ও সমালোচনা করছে শিল্পী-লেখক ফ্রানৎস কাফকার অহংবোধের (ইগো)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গল্পটি কাফকার জীবনের শেষ ভাগের শিল্পবিষয়ক চিন্তাভাবনারই প্রতিচ্ছবি; এ পর্বে কাফকার সৃষ্টিকর্মের মূল বিষয় শিল্পের স্বভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলা – যা এ বইয়েরও অন্যতম প্রধান থিম।

অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, 'এক ছোটখাটো মহিলা' আর কিছুই নয়, ব্যক্তির 'আমি'র নানা রূপের একটি মাত্র, গল্পটি এক মানুষের দুই 'আমি'র মধ্যকার দ্বন্দ্বের ছবি। কাফকা-সাহিত্যে এই প্যাটার্নটি তাঁর 'রায়' গল্পে লক্ষণীয়, বলছেন কাফকা-গবেষক টিলম্যান মোসার।

যা হোক, এটি জানা ভালো যে সমগ্র কাফকা-সাহিত্যকর্মের মধ্যে কেবল 'এক ছোটখাটো মহিলা' ও 'গায়িকা জোসেফিন' গল্প দুটিই নারী-চরিত্র নিয়ে, যদিও 'এক ছোটখাটো মহিলা'র নারী চরিত্রটির চেয়ে যে পুরুষকণ্ঠ নারীটির সমালোচনা বা বিশ্লেষণ করছে, সেই কণ্ঠটি অনেকাংশে বড় হয়ে উঠেছে। কাফকার শেষ দিককার লেখালেখির সঙ্গে এ গল্পের ফারাক মূলত দুটি বিচারে: ১. এর টোন অনেক হালকা বা লঘু; ২. গল্পের শেষটি ইতিবাচক; 'রায়'; 'রূপান্তর', 'এক অনশন-শিল্পী', 'কয়লা-বালতির সওয়ারি' বা 'এক গ্রাম্য ডাক্তার'-এর মতো নেতিবাচক কিংবা ট্র্যাজিক নয়।

এক অনশন-শিল্পী

ফ্রানৎস কাফকার প্রধানতম সাহিত্যকর্মের একটি এই অদ্ভুত ও হৃদয়বিদারক গল্প 'এক অনশন-শিল্পী', যা কাফকার জীবনে প্রকাশিত শেষ বইটির নামগল্পও বটে। গল্পটিকে কাফকা তাঁর ব্রেক-থ্রু ছোটগল্প 'রায়'-এর মতো কখনো প্রশংসা করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর যে ছয়টি মাত্র লেখা তিনি ম্যাক্স ব্রডকে ধ্বংস করে ফেলতে স্পষ্ট করে বলেননি, তার মধ্যে 'এক অনশন-শিল্পী' অন্যতম। কাফকা বলেছিলেন: 'আমার সবগুলো লেখার মধ্যে যেগুলো টিকে থাকবে বলে মনে হচ্ছে, তারা পাঁচটি বই: *রায়*, *দি স্টোকার*, *রূপান্তর*, *দণ্ড উপনিবেশে*, *এক গ্রাম্য ডাক্তার* এবং ছোট গল্প: "এক অনশন-শিল্পী"...আমি যখন এই পাঁচটি বই ও একটি ছোটগল্প সময়ের পরীক্ষায় উতরে যাবে বলি, এর মানে এটা বোঝায় না যে এদের পুনর্মুদ্রণ করা হোক...বরং উল্টোটাই, এরা

যদি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলেই আমি সবচেয়ে খুশি হব। তবে, যেহেতু এদের প্রকাশ হয়েই গেছে, যাদের হাতে এগুলো আছে তারা যদি এদের রাখতে চায় তো আমি বাধা দিতে চাই না।'

কাফকার কাছে 'এক অনশন-শিল্পী' গল্পের মর্যাদা কোথায় ছিল তা উপরের উক্তিতেই স্পষ্ট। তিনি *এক অনশন-শিল্পী* বইটির কথা বলেননি, বলেছেন এ বইয়ের কেবল এ গল্পটির কথা। জনপ্রিয়তার বিচারেও বলা হয় যে এটি কাফকার তৃতীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখা (প্রথম দুটি 'রূপান্তর', ও 'রায়'; এবং চতুর্থটি 'এক গ্রাম্য ডাক্তার')। গল্পটির প্রথম প্রকাশ ১৯২২ সালের অক্টোবর, এস. ফিশার ফেরলাগ প্রকাশনা সংস্থার সংকলন, রুডল্‌ফ কাইজার সম্পাদিত *Die Neue Rundschau*-তে। কাফকা গল্পটি লেখেন ১৯২২ সালের বসন্তে। লেখার সময় কাফকা ভালোভাবেই তাঁর স্বরযন্ত্রের টিবি বা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত, শুকিয়ে কাঠ-কাঠ অবস্থা, কারণ গলায় ক্ষয়রোগের কারণে তিনি কিছু খেতেও পারেন না আর তখন কৃত্রিমভাবে রোগীকে খাওয়ানোর পদ্ধতিও আবিষ্কার হয়নি। গল্পের নায়ক যে বুভুক্ষা বা ক্ষুধা বা অনশন-শিল্পী, অনেকে এর মধ্যে কাফকার তখনকার শারীরিক অবস্থার ছবি দেখেছেন। ইংরেজি নাম: 'A Hunger Artist', বা 'A Fasting Showman', বা 'A Fasting-Artist'; মূল জার্মানে: 'Ein Hungerkünstler'।

গল্পটিতে সার্কাসের এক শিল্পীর কথা বলা হচ্ছে, যার কাজ হলো দিনের পর দিন না খেয়ে থেকে মানুষকে মজা দেখিয়ে, বিস্মিত ও মুগ্ধ করা। কাফকার সময়ে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত, আসলেই ইউরোপ-আমেরিকায় অনশন-শিল্পীদের পেশাটি টিকে ছিল। ১৮৮০ সালে নিউ ইয়র্কের ক্লারেনডন্ হলে মানুষ বিশ সেন্ট দিয়ে টিকিট কেটে ঢুকেছিল চল্লিশ দিনের ক্ষুধা-শিল্পী হেনরি ট্যানারকে দেখতে, এটা ঐতিহাসিক সত্য। এর কিছু কাল পরে আরেক ক্ষুধা-শিল্পী বা অনশন-শিল্পী জোভান্নি সুক্কি তার জীর্ণ-শীর্ণ ক্ষুধার্ত শরীর দেখিয়ে বেড়িয়েছিল ইউরোপের বড় বড় শহরে। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে টিকিট কেটে আর ক্ষুধার্ত মানুষ দেখা লাগল না, কারণ ঘরে ঘরে এ রকম ক্ষুধার্ত মানুষ এমনিতেই ছিল প্রচুর, তখন আস্তে আস্তে এই খেলা বা শিল্পটির মৃত্যু হওয়া শুরু হলো, এটির জায়গা হলো সার্কাসের তাঁবুতে (যেমনটি 'প্রথম দুঃখ' গল্পের ট্র্যাপিজ-শিল্পীর বেলায়)। আমাদের এ গল্পের নায়ক সে রকম সার্কাসের তাঁবুতেই দিনের পর দিন, সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন, না খেয়ে থেকে তার খেলা দেখায় (খেলা বলতে ওই না খেয়ে থাকাটুকুই), টাকা কামায়। সে খাঁচায় বন্দী, দর্শকেরা তাকে টিকিট কেটে দেখে। এই অনশন শিল্পীর কাছে না খেয়ে থাকা একটি শিল্প; এটি জীবন ও শিল্প – দুই-ই। সে বেঁচেই আছে শুধু না-খেয়ে থাকতে, না খেয়ে থাকাটাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তার কাছে এটা ভয়াবহ লাগে যে দর্শকেরা তার এই 'শিল্প'কে বোঝে না, তারা মনে করে সে এবং সার্কাসে খেলা দেখানো অন্যদের মধ্যে কোনো তফাত নেই, আর মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গেলেই সে বুঝি লুকিয়ে খাওয়াদাওয়া করে। এই অনশন-শিল্পীর কাছে তার শিল্পের চর্চা

একদমই কঠিন কোনো কাজ নয়, কিন্তু জনগণ তাকে বিশ্বাস করে না, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয় না।

গল্পে আমরা দেখি, এই শিল্পীর দেখভাল করে এক ম্যানেজার, সে তাকে চল্লিশ দিনের উপরে অনশন করতে না দেওয়ার কারণ এটি না যে শিল্পী তাতে মারা যেতে পারে; সে এটা নিষিদ্ধ করেছে বরং এ কারণে যে চল্লিশ দিন পরে খেলাটির আর বাণিজ্যিক আকর্ষণ থাকে না। প্রতিবারই এই চল্লিশতম দিনের শেষে শিল্পীর খাঁচা খোলা হয়, তাকে ভড়ংসর্বস্ব কিছু সম্মান জানানো হয়। গল্পের এ অংশে কাফকার রসবোধের চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়। অনশন-শিল্পী, যা-হোক, এতে ক্ষেপে যায়, কারণ চল্লিশ দিনের এই সীমা বেঁধে দেওয়ার কারণে তার আর পৃথিবীর সর্বকালের দীর্ঘতম সময়ের ক্ষুধা-শিল্পী হয়ে ওঠা হয় না।

এর পরই গল্পটির ট্র্যাজিক পরিণতি দেখি আমরা: দর্শকেরা তার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, তারা তার খাঁচার সামনে শুধু এ কারণেই একটু থামে যে তাদের এই খাঁচা পেরিয়েই পশুদের খাঁচার দিকে যেতে হয়। অনশন দেখার চেয়ে পশু দেখতে মানুষের অনেক বেশি আগ্রহ। এই পরিবর্তনের ফলে অনশন-শিল্পীর জীবনে নেমে আসে চরম উপেক্ষা – সার্কাসের এক কোনায় পড়ে থাকে সে, কেউ খোঁজও নেয় না কত দিন ধরে সে না খেয়ে আছে, এমনকি শিল্পী নিজেও জানে না দিনের সঠিক সংখ্যাটি। কাফকার আয়রনি এখানেই যে, অনশন-শিল্পী শেষমেশ যখন তার সর্বকালের দীর্ঘতম অনশনের বিশ্বরেকর্ডটি করল, কেউ খেয়ালও করল না। এরপর আমরা দেখি, মৃত্যুর সময়ও সে অনশন চালিয়ে যাচ্ছে। শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় সে বলে যায় ভয়ংকর এক কথা: তার এই না-খেয়ে-থাকার ব্যাপারটা এমন নয় যে সে স্বেচ্ছায় না খেয়ে আছে, সে না খেয়ে আছে তার কারণ অনেক সোজাসাপটা: কারণ এ পৃথিবীতে তার খাওয়ার যোগ্য কোনো খাদ্যই নেই।

তার মৃত্যুর পরে এবার তার খাঁচাতে পোরা হলো এক জোয়ান চিতাবাঘ; খাঁচার মধ্যে রাজকীয় শরীর নিয়ে বাঘটি হেঁটে বেড়ায়, সে তার খাবার খায় পরম আনন্দে; আর দর্শকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিতাটির জীবনের এই রাজসিক 'জয়োল্লাস' দেখার জন্য।

এই গল্পে কাফকা, বইয়ের অন্য গল্প 'গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি'র মতোই, বিরাট চাতুর্যের সঙ্গে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেন শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বভাব বিষয়ে, জীবনের সঙ্গে শিল্পের মিথোজীবিতা বা সিমবায়োসিস নিয়ে। না-খেয়ে থাকাই যখন শিল্প আর সেই না-খেয়ে থাকার কারণ যখন খাওয়ার মতো কোনো খাদ্য নেই বলেই, তখন পাঠক হিসেবে আমরা ভাবতে বাধ্য হই শিল্পের (বা কাজের) সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্কের মূল প্রতিপাদ্য কী তা নিয়ে। অন্য কিছু প্রশ্নও আমাদের মনে নাড়া দেয়, যেমন দর্শকের কাছে শিল্প কীভাবে আগ্রহের বিষয় হয়, শিল্প ও শিল্প উপভোগকারী শ্রোতা বা দর্শকের মধ্যকার সম্পর্কটি আসলে কিসের সম্পর্ক, আর শিল্পের টিকে থাকা তার বাজারমূল্য দিয়েই নির্ধারিত হবে কি না। দুটি বিষয়, এ গল্পে বিবৃত কাফকার দুটি আয়রনি (বক্রাঘাত),

আমাদের পায়ের তলা থেকে একরকম মাটি সরিয়ে দেয়: ১. অনশন করে থাকাটা এই অনশন-শিল্পীর জন্য বেঁচে থাকার সমতুল্য, কিন্তু ওদিকে এই শিল্পের চরম উৎকর্ষ মানে শিল্পীর জন্য শেষে গিয়ে মৃত্যুকেই বরণ করে নেওয়া; ২. অনশন-শিল্পীর শিল্পের নিখুঁতত্ব বা অর্জনযোগ্য চূড়ান্ত বিন্দু তখনই আসে, যখন আর তার শিল্পকর্ম কেউ দেখছে না, যখন মানুষ তাকে ভুলে গেছে এবং এমনকি সে নিজেও যখন সময়জ্ঞান খুইয়ে বসেছে; অতএব আমরা তখন এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে যাই যে দর্শকের বা শ্রোতার মনোরঞ্জন ছাড়া কোনো শিল্প আদৌ আর শিল্প থাকে কি না।

সার্কাসের প্রতি কাফকার ব্যক্তিগত বিশেষ আগ্রহ এবং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শিল্প বনাম জনগণ বিষয়ে কাফকার আগ্রহের কথাও বলেছেন গবেষকেরা এই গল্পটির (পূর্ণাঙ্গ অর্থে *এক অনশন-শিল্পী* বইটিরই) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। বাণিজ্যিক বিষয়গুলোতে সৎ শিল্পীরা বিরক্ত হয়; শিল্পের জন্য জীবন উৎসর্গ করাটাই সৎ শিল্পীর কাছে বড় কথা, বাণিজ্য কতটুকু হলো, অর্থ উপার্জন বাড়ছে না কমছে তা নয়। এ গল্পে অনশন-শিল্পীর উৎকর্ষতা অর্জনের প্রতি ঝোঁকের কথাই কেবল বলা হয়নি, তার সততার কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে। পাহারাদারেরা যেন বুঝতে পারে যে সে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো খাবার খাচ্ছে না, তাই সে রাতভর গান গায়, কিন্তু তার পরও এই পৃথিবী তার পূর্ণ সততায় বিশ্বাস রাখতে পারে না। তবে একসময় সে নিজেই তার সততা নিয়ে সন্দেহ করা শুরু করে, সে তার নিঃস্পৃহ, নিরুৎসুক ম্যানেজারকে জোর দিয়ে জানায় যে তার অনশন আসলে জনগণের ভক্তি-শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। কারণ সে তো না খেয়ে আছে তার খাওয়ার মতো কোনো খাবার নেই বলেই।

প্রখ্যাত কাফকা-গবেষক রিচি রবার্টসন অনশন-শিল্পীর ভয়ংকর এই উক্তিটিকে দেখেছেন এ রকম বাঁকা দৃষ্টিকোণ থেকেই। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, এটা কি অনশন-শিল্পীর স্রেফ বিনয়, নাকি তার খ্যাপাটে বা মনোবিকলনজনিত আত্মসমালোচনা? রিচি রবার্টসন বলতে চাচ্ছেন, এ কথার মধ্য দিয়ে অনশন-শিল্পী শিল্পীদের বিশেষ প্রতিভাসংক্রান্ত রোমান্টিক ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে, সেই বিশেষ প্রতিভা এখানে হয়ে দাঁড়িয়েছে সুন্দর একটি 'স্বাভাবিক' জীবন কাটানোর পথে শিল্পীর জন্য বড় ধরনের ঘাটতি। কাফকার অন্যতম প্রিয় গল্প ছিল টোমাস মানের 'টোনিও ক্রোগার' (Tonio Kroger'), যেখানে নায়ক ঘোষণা দিচ্ছে: 'সাহিত্য মোটেই কোনো পেশা নয়, আপনারা আমার কথা শুনুন – সাহিত্য একটি অভিশাপ।' শেষমেশ মহান শিল্পী ফ্রানৎস কাফকাও জীবন দিলেন না খেতে পেরেই, অনশন করতে করতেই; আর তার চেয়েও বেশি যেমনটা কাফকার মৃত্যুর পরে প্রাগের এক দৈনিক পত্রিকায় তাঁর জন্য লেখা শোকবার্তায় বলতে চেয়েছেন তাঁর চেক ভাষায় অনুবাদক ও প্রাক্তন প্রেমিকা মিলেনা য়েসেন্সকা, সাহিত্যের 'অভিশাপ' মাথার মধ্যে আর নিতে না পেরেই মারা গেলেন শিল্পী ফ্রানৎস কাফকা (এ বইয়ের 'ভূমিকা' অংশ দেখুন)।

১৯১৩ সালের ২১ জুন ডায়েরিতে কাফকা যা লিখেছিলেন তার এখানে পড়া যায় পৃথিবীর সঙ্গে, মানুষের রীতিনীতির সঙ্গে ও পরিবর্তনশীল বাণিজ্যিক পৃথিবীর চরিত্রের সঙ্গে কখনোই

বনিবনা করতে রাজি না-হওয়া অনশন-শিল্পীর ট্র্যাজিক পরিণতির কথা মাথায় রেখে; কাফকা লিখেছিলেন: 'কী ভয়ংকর পৃথিবী আমি বয়ে চলেছি আমার মাথায়। কিন্তু কীভাবে এর থেকে নিজেকে মুক্ত করব, মাথা টুকরো টুকরো করে না ফেলে কীভাবে একে ছাড়িয়ে আনব। আর হাজারবার বরং (মাথা) টুকরো করে ফেলাই ভালো তা নিজের মধ্যে ধারণ করা বা তার কবর দেওয়ার চেয়ে। প্রকৃতপক্ষে এটাই কারণ যে আমি এখানে আছি, সে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার।' কাফকার এই উক্তিতে আছে শিল্পের জন্য মনোবিকলনের শিকার হয়ে শহীদ হতে রাজি হয়ে যাওয়ার কথা, আমাদের এ গল্পের অনশন-শিল্পীও তো তা-ই।

গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি

ফ্রানৎস কাফকার ৪১ বছর জীবনের শেষতম লেখা 'গায়িকা জোসেফিন'। যথেষ্ট গবেষণা ও বিশ্লেষিত হওয়া কাফকার এই অন্যতম প্রধান গল্পটি তাঁর 'এক অনশন-শিল্পী' গল্পসংকলনের চতুর্থ ও শেষ গল্প। এর প্রথম প্রকাশ অবশ্য তাঁর জীবদ্দশায় *Prager Presse* পত্রিকায় ইস্টার সানডে সংখ্যায়। কাফকা তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে বলেছিলেন 'জোসেফিন'কে প্রথমে প্রকাশক ওটো পিকের কাছে পাঠাতে, এবং পরে পাঠাতে প্রকাশনা সংস্থা ডি স্মিড্যেতে, যেহেতু তিনি আশা করেছিলেন যে এটির প্রকাশনা বাবদ ডি স্মিড্যে যে সামান্য অগ্রিম টাকা দেবে তাতে এই কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাঁর চিকিৎসার কিছুটা হলেও ব্যয় বহন হবে। গল্পটি কাফকা লেখেন ১৯২৪ সালের বসন্তে। তখন তাঁর টাকার প্রচণ্ড প্রয়োজন, স্যানাটোরিয়ামের বিল মেটানোর জন্য। স্যানাটোরিয়াম থেকেই ১৯২৪ সালের ৯ এপ্রিল তিনি ম্যাক্স ব্রডকে লেখেন, 'জোসেফিনের অবশ্যই উচিত কিছুটা হলেও সাহায্য করা, আমার আর অন্য কোনো পথ নেই।' এ চিঠির ১১ দিন পরই গল্পটি *Prager Presse*-এ ছাপা হয়, সামান্য কিছুটা আর্থিক সুবিধা হয় কাফকার। এটি লেখার সময় কাফকার শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে তিনি প্রায়শই তার কণ্ঠ খুইয়ে বসছেন, কথা বলতে পারছেন না, প্রায়ই কেবল শোঁ শোঁ শব্দ বেরোচ্ছে তাঁর গলা দিয়ে। গল্পের নায়িকা জোসেফিনও (সে একটি ইঁদুর), আমরা দেখি, গান গায় না, কেবল চিঁ চিঁ শব্দ করে, আর এই শব্দকে কিচমিচ ধরনের শিসে রূপ দিয়ে সে ভাবে যে সে গান গায়, সত্যি তা আসলে কোনো গান নয়, আবার একধরনের গানও; সোজা কথা জোসেফিন ব্যাপারটা পারে তার নিজের প্রতি চরম বিশ্বাস থেকে, তার নিজের শিল্পের প্রতি পরম আস্থা থেকে। 'এক ছোটখাটো মহিলা'র পাশাপাশি এটি কাফকার দ্বিতীয় গল্প যেখানে প্রধান চরিত্র একটি নারী (এ ক্ষেত্রে নারী ইঁদুর); এ উদাহরণ শুধু কাফকার এ দুটি গল্পেই বিদ্যমান। গল্পের নাম: ইংরেজিতে 'Josefine, the Songstress or: The Mouse People' কিংবা ভিন্ন অনুবাদে 'Josephine the Singer, or the Mouse Folk', কিংবা 'Josefine, the Singer or the Mouse-People'; মূল জার্মানে: 'Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse'।

এই গল্পের গায়িকা জোসেফিন আসলে স্রেফ 'কিচমিচ' বা শিসধ্বনি (piping) করে। কথক আমাদের তার গানের শক্তি এবং তার গানের প্রতি ভালোবাসা ইঁদুর-জাতির মধ্যে

ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতার কথা জানান, জোসেফিন তার জাতির 'আইডল' হয়ে ওঠে; কিন্তু গল্প সামান্য এগোতেই দেখা যায় কথক (সে নিজেও একটি ইঁদুর) জোসেফিনের সব গুণের পর্দা খুলে দিচ্ছে, আর পর্দার পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য বিপরীত চিত্র। এর ফলে শেষে গিয়ে জোসেফিন আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় একই সঙ্গে অসাধারণ এবং সাধারণ; পেলব-কোমল এবং অশ্লীল ও কুৎসিত; দূর-গম্ভীর এবং সহজ-সাধারণ, সবার সঙ্গে মেশে এমন; ভঙ্গুর এবং শক্তিশালী; শিশু এবং মা; শান্তশিষ্ট এবং হইচই-প্রবণ; গায়িকা এবং কোনো গায়িকাই নয়; সীমিত শক্তির এবং অসীম সাংগীতিক শক্তির; বুড়িয়ে যাওয়া এবং বয়সহীন; দুষ্ট এবং মনোরম; রূপ বদলানো এবং অনড়; আর সবশেষে, আবেগপূর্ণ ও হিসেবী। অসম্ভব সব বৈপরীত্য। কাফকার শেষ দিকের সাহিত্যকর্মের অনেক শিল্পী চরিত্রের একটি জোসেফিন; প্রায়ই গবেষকেরা জোসেফিনের মধ্যে খুঁজে পান জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজের শিল্পকর্ম যে প্রান্তিক কিছু কাজ মাত্র, এর বেশি কিছু নয়, এমন বিধ্বংসী এক সংশয়বোধে কাফকার নিজের ভোগার ইতিহাসটি। এ গল্পের মূল চরিত্রকে কাফকা যেভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাসে একবার আকাশে তুলে, আরেকবার মাটিতে নামিয়ে, কোর্টের উকিলদের মতো তুলোধুনো করেছেন, সমগ্র কাফকা-সাহিত্যে তার আর কোনো জুড়ি নেই। এখানে আমরা শীতল, কঠিন, আইন বিষয়ে ডক্টরেট এক 'উকিল' কাফকাকেই দেখি যেন।

এবার গল্পের কয়েকটা মূল ঘটনা, বাঁক বা মোড়ের দিকে চোখ দেওয়া যায়; এটি গল্পের বেসিক আউটলাইনও বটে:

১. গল্পে জোসেফিনের মুখে কোনো সংলাপ নেই; সব কথা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এখানে করে যাচ্ছে এক নামহীন কথক, যে নিজেও ইঁদুর-জাতির সদস্য।
২. অতএব পুরো গল্পটিই ওই সমালোচক-কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা; লেখক জোসেফিনকে কখনই আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার সুযোগ দেননি।
৩. কথক বলছে জোসেফিন অন্য ইঁদুরদের থেকে আলাদা, কারণ সে গান পছন্দ করে, গান গাইতেও পারে। গল্পের শেষে আমরা ইঙ্গিত পাই যে জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর-জাতির গানও শেষ হয়ে যাবে।
৪. কথক ভাবে, জোসেফিনের গানের আসলে অর্থ কী, এবং কী করে সম্ভব যে এই কিচমিচ করা গান দিয়ে জোসেফিন তার জাতিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে?
৫. তবে জোসেফিন শুধু কিচমিচই করে না; দর্শকদের বিচারে তার গান আসলে দেখারও বিষয়।
৬. জোসেফিন প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে সব সময়ই দাবি করে তার গান মহৎ কিছু, শৈল্পিক কিছু, কোনোভাবেই মামুলি কিছু নয়; আর যারা তেমনটি ভাবে তাদের ঘৃণা করে সে; সেই সঙ্গে একমাত্র বিশেষ একধরনের শ্রদ্ধা-ভক্তিতেই সে খুশি হতে পারে, যেনতেন শ্রদ্ধা-ভক্তি নয়।
৭. জাতির সবচেয়ে দুর্যোগময় মুহূর্তেই জোসেফিন তার জাতিকে বাঁচার বা শক্তি

দেওয়ার জন্য গান গাওয়ার চরম প্রয়োজন বোধ করে, এ অর্থে সে নিজেকে 'পয়গম্বর'-জাতীয় কিছু বলে ভাবে।

৮. ইঁদুর-জাতির সবাই বিপদের সময়ে জোসেফিনের গান শুনতে এসে নিজেদের জীবন বিপদাপন্ন করতে রাজি, কিন্তু জোসেফিন তাদের জন্য তার গানকে কোরবানি দিতে রাজি নয়।

৯. জোসেফিনের বিশ্বাস তার এই জাতিকে-বাঁচানো গান গাওয়ার ক্ষমতার কারণেই ইঁদুরদের জীবনের সাধারণ, বেঁচে থাকার লড়াই-সংক্রান্ত কাজগুলো করার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি তার প্রাপ্য।

১০. পুরো ইঁদুর-জাতি তাকে এই বিশেষ ছাড় দিক, এটাই সে চায়।

১১. কিন্তু তার জাতির ইঁদুরেরা তার এসব দাবি শুনতে রাজি নয়, আর এর শোধ নিতেই এক সংকটময় মুহূর্তে জোসেফিন অদৃশ্য হয়ে যায়। কথক তখন জানায়, এইবার জোসেফিন চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছে। আর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জোসেফিন হয়তো দৈনন্দিন কাজকর্ম করার কষ্ট থেকে বাঁচল, কিন্তু তার জাতির জন্য শিল্পের স্বাদ পাওয়ার রাস্তাটুকু বন্ধ হয়ে গেল; পরে তাদের মন থেকেও মুছে গেল সে একসময়।

১২. জোসেফিন ইঁদুর জাতির দীর্ঘ, রক্তাক্ত ইতিহাসের সামান্য নগণ্য ও সংক্ষিপ্ত একটি অধ্যায়, আর কথকের ভাষ্যমতে জাতি জোসেফিনের ক্ষতি পুষিয়ে উঠবে।

এতগুলো বাঁক বা মোচড়ের এই গল্পের ব্যাখ্যাও হয়েছে অসংখ্য। যেহেতু এটি কাফকার জীবনের শেষতম লেখা, গবেষকেরা একে দেখতে চেয়েছেন নিজের শিল্প (সাহিত্যকর্ম) সম্পর্কে তার শেষবেলার উপলব্ধি বা মূল্যায়ন হিসেবে। জোসেফিনের শিল্প তার জাতির অন্য ইঁদুরেরা পছন্দ করে, কিন্তু আমরা এমনটি দেখি না যে তারা নিজেরা কখনো গায়ক বা গায়িকা হতে চায়। অন্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য-রেখাই তার এই শিল্প (সংগীত)। 'এক অনশন-শিল্পী' গল্পের মতো এখানেও কাফকা জীবন ও শিল্প নিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলেন: কোনো সংবেদনশীল দর্শকের সান্নিধ্য লাভ করা কোনো শিল্পীর জন্য কতখানি কঠিন? আর শিল্পটি যদি উৎকৃষ্ট মানের না হয়, তাহলে তা কি শিল্পীর মৃত্যুর পরও টিকে থাকতে পারে? গল্পের শেষটুকু পড়লে মনে হয়, শিল্প থাকুক কি না থাকুক, ইঁদুর-জাতির জীবনে তা কোনো পার্থক্য আনবে না। কিন্তু এ গল্পের শেষে গিয়েই বিরাট এক প্যারাডক্সের সামনে পড়ি আমরা (গল্পটিতে প্যারাডক্সের কমতি নেই, নেই আদালতের উকিলসুলভ পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণেরও): বলা হচ্ছে জোসেফিন বেঁচে থাকবে ইঁদুর-জাতির স্মৃতিতে; আবার বলা হচ্ছে সে ইঁদুর-জাতির বীরদের মতোই বিস্মৃত হয়ে যাবে। গল্পের সবশেষের পরস্পরবিরোধিতা, যা যুক্তির দিক থেকে যথেষ্ট কাফকায়েস্ক, এটাই।

যেহেতু জোসেফিন একজন নারী, গবেষকেরা তার মধ্যে দেখেছেন কাফকার কাব্যলক্ষ্মীকে (muse)। সে অর্থে গল্পটি একটি ফ্রয়েডিয়ান অ্যালিগরি যেখানে

জোসেফিনের গান প্রতিনিধিত্ব করছে মনের কোনো বাসনার, আর কথকের গদ্য প্রতিনিধিত্ব করছে যুক্তি ও শাসনের।

অন্য গবেষকেরা একে ব্যাখ্যা করেছেন 'ইহুদি' থিমের দিক থেকে; তারা বলছেন জার্মানে Volk der Mause (ইঁদুর-জাতি) কথার মধ্য দিয়ে কাফকা 'The People of Moses' (মুসা নবীর লোকজন) কথাটিরই শব্দ নিয়ে খেলেছেন। আর জোসেফিন নামের মধ্যেও তারা ছায়া পেয়েছেন বাইবেলের জোসেফ (Joseph) নবীর, তার শিস দিয়ে কিচিরমিচির করার শিল্পের মধ্যে তারা দেখেছেন নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী করার শিল্পকে, যা আবার ইহুদিদের জন্য প্রায় মৃত এক শিল্প। আমরা এ গল্পের 'ইহুদি' ব্যাখ্যায় একটু পরে আবার ফেরত আসছি।

আজ পর্যন্ত এ গল্পটির সবচেয়ে যুক্তপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন রিচি রবার্টসন, অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ডস ক্ল্যাসিকস্ সিরিজের প্রতিটি কাফকা বই আলো করে আছে যার ভূমিকা ও টীকা এবং স্যার ম্যালকম প্যাস্লির পাশাপাশি যাকে ধরা হয় জার্মান ভূখণ্ডের বাইরের সবচেয়ে ভালো কাফকাবোদ্ধা হিসেবে। রিচি রবার্টসন বলছেন যে এই গল্পের মূল কথা হচ্ছে: জোসেফিনের গান প্রতিদিনকার ইঁদুরদের কিচিরমিচিরের অতিরিক্ত কিছুই নয়, স্রেফ তফাত হলো অন্য ইঁদুরেরা কিচিরমিচির বা শিসধ্বনি দেয় তাদের চলার পথে, আর জোসেফিন একই কাজটা করে মঞ্চে। অতএব, তার শিল্পের মূল্যে সে কী করছে তা দিয়ে নির্ধারিত হবে না, হবে অন্য কিছু দিয়ে। কী সেই অন্য কিছু? তার শিল্প সব ইঁদুরকে এক কাতারে, একসঙ্গে আনছে, তাদের মধ্যে জাতীয়তার চেতনা জাগাচ্ছে, জাতীয় সংহতি ও একাত্মবোধের অনুভূতি জাগাচ্ছে। জোসেফিনের শিল্পের শিল্পমূল্য এটাই। গল্পটি যতই আগায় ততই স্পষ্ট হয় 'জাতীয় ঐক্য'ই এ গল্পের মূল থিম। কাফকা ইঁদুর-জাতিকে বোঝাতে শুধু যে আবেগপূর্ণ জার্মান শব্দ 'Volk'-এর প্রয়োগ করেছেন তা-ই নয়, তিনি এ জাতির লোকজনকে বোঝাতে গিয়ে লিখছেন 'Volksgenossen' (অর্থাৎ 'আমাদের লোকজন' বা 'আমাদের জনগণ'; আর একবাচ্যে 'নিজেদের লোক')। এই 'Volk' ও 'Volksgenossen' শব্দ দুটি কাফকার মৃত্যুর পরে প্রচুর ব্যবহৃত হয় হিটলারের নাৎসি বাহিনীর মুখে ও লেখায়; জার্মান জাতীয়তাবাদী চেতনার (যা পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনে) অন্যতম ভিত্তিমূল ছিল দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধে টইটুম্বুর এই শব্দ দুটি। গল্পটি কাফকা লেখেন এমন এক সময়ে, যখন ভার্সাই চুক্তির একপেশে ধারাগুলোর কারণে কেন্দ্রীয় ইউরোপিয়ান জাতীয়তাবাদ টগবগ করে ফুটছে; অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অনেক রাজ্যই আলাদা জাতিরাষ্ট্র হওয়ার পাঁয়তারা করছে; কাফকা নিজেই তখন সে রকম নতুন এক দেশের নাগরিক – প্রথম চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্র, যার ভিতে আছে চেক জাতীয়তাবাদ (কাফকা চেকও নন, ঠিক জার্মানও নন; বলা হয়, তিনি 'চেক পাসপোর্টধারী জার্মান ইহুদি', যেটা ঠাট্টার বাইরেও কাফকার সত্যিকারের পরিচয়)। তা ছাড়া এ গল্পের সৃষ্টির সময়ে কাফকা (রাজনৈতিক 'জায়োনিজমে' অতটা বিশ্বাস না রাখলেও), যুদ্ধ-উত্তর বিদ্বেষ অসহিষ্ণুতায় ভরা ইউরোপ

থেকে পালিয়ে প্যালেস্টাইনে বাকি জীবন কাটানোর কথা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করছেন। গল্পের ইঁদুর-জাতি আসলে ইহুদি জাতি কি না তা আজও বিশ্বাসযোগ্যভাবে নির্ণীত হয়নি, একটু আগে আমরা এ গল্পের 'ইহুদি' ব্যাখ্যা নিয়ে অল্প কথা বলেছি। কথা হচ্ছে, কোনোভাবেই নিশ্চিত করে প্রমাণ করা যায় না যে কাফকা এ গল্পে ইহুদিদের অস্তিত্বের সংকট, সমস্যা ও চেতনার কথা বলছেন। ইঁদুরেরা যেভাবে বিপদের মধ্যে বেঁচে আছে, তাতে ইহুদি ডায়াস্‌পোরার (ইজরায়েলের, কাফকার সময়ে প্যালেস্টাইনের, বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সংখ্যালঘু ইহুদিদের বসতি স্থাপন) কথা নিশ্চিত মাথায় আসে বটে, কিন্তু ধর্মীয় একাত্মবোধের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট মনে হয় যে কাফকা এখানে জাতিভিত্তিক একাত্মতার ও জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা বলছেন।

জাতীয়তাবোধের এই প্রশ্ন কাফকা এর আগেই খুব ভালোভাবে সামলেছেন তাঁর অন্যতম সেরা গল্প 'চীনের মহাপ্রাচীর'-এ (বোরহেসের ভাষ্যমতে যা কাফকার সবচেয়ে সেরা সাহিত্যকীর্তি)। সে গল্পে এবং জোসেফিনে – দুটোতেই আমরা শুনি খুব সাবধানি, সংশয়বাদী একটি সুর। আগের গল্পটিতে (১৯১৭ সালের শুরুতে লেখা) আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারি যে ওভাবে খণ্ডে খণ্ডে চীনের মহাপ্রাচীরটি বানানো একটি অর্থহীন ও অবাস্তব প্রকল্প, এমনকি বিপজ্জনকও, কিন্তু আমরা এটা বুঝি যে সম্রাটের জন্য এই প্রকল্প হাতে নেওয়া দরকারি ছিল, তিনি এর মধ্য দিয়ে চীনাদের মধ্যে জাতীয় সংহতির বোধ তৈরি করতে চাইছিলেন। এখানেও জোসেফিনের গানের কোনো শিল্পমূল্য আসলে নেই, তা স্রেফ কিচকিচ শব্দই মাত্র, এমনকি তার গানের অনুষ্ঠানগুলো তাদের জাতির জন্য বিপজ্জনকও বটে, কারণ তারা তখন সবাই যেভাবে একসঙ্গে জড়ো হয়, তাতে হিংস্র শত্রুর আক্রমণে (অর্থাৎ বিড়ালদের আক্রমণে) সব ইঁদুর একসঙ্গে মারা পড়ে তাদের জাতিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে – কিন্তু তবু এই বেসুরো গানের বিরাট একটা উদ্দেশ্য আছে: জোসেফিন আধুনিক জাতীয়তাবাদের এক কেন্দ্রীয় চরিত্র, জাতীয় আত্মার ধ্বনি তার গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, আর সে তা করছে তার জাতীয় ভাষার (এ ক্ষেত্রে কিচমিচ) ব্যবহার করেই। কিন্তু কাফকার সঙ্গে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ভাবুকদের বিরাট পার্থক্যও আছে: কাফকা এখানে একটি কেন্দ্রীয় দেশপ্রেমিক চরিত্রকে ঘিরে কোনো জাতিপ্রেম বা দেশপ্রেমের গল্প ফেঁদে বসেননি, বা কোনো বাণীও দেননি; বরং তার এই জাতীয়তার বোধ জাগানো গায়িকাকে আমরা দেখি বিভ্রান্ত, আর তার গান যে জাতিগঠনে কাজে লাগানো যায়, সে ব্যাপারে তার জাতির ইঁদুরেরা দেখি বেখবর। এখানেই কাফকা আলাদা প্রথাগত লেখকদের থেকে – সবকিছু নিয়েই কাফকার সংশয় ও সন্দেহ, কোনো কিছুর ব্যাপারেই তিনি নিশ্চিত নন।

গল্পটির যথেষ্ট নারীবাদী (feminist) ব্যাখ্যাও হয়েছে, যার প্রথম কারণ এর প্রধান চরিত্র একজন স্ত্রীলিঙ্গের প্রাণী, যাকে নিয়ে কথা বলছে পুরুষলিঙ্গের এক কথক – অর্থাৎ এই কথকের ভাষ্য ও মতামত নিয়ে সন্দেহ করার কারণ গোঁড়াতেই রয়ে যায়। একজন পুরুষ কি আদৌ একজন নারীর ভেতরটা বুঝতে পারে? সম্ভবত না। তাহলে এই কথকও তো পারেনি জোসেফিনকে বুঝতে, আর সে জন্যই তো সে এত অবিশ্বাস করে

জোসেফিনকে, এত খোঁটা-খোঁচা-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দেখায় তার প্রতি। গল্পটির নারীবাদী পাঠ খুব সামনে তুলে ধরেছে পুরুষ-লেখক কাফকার স্ববিরোধিতা ও প্যারাডক্সকে। কথক যে জোসেফিনকে বর্ণনা করছে, সে এক বিচিত্র জোসেফিন, তার সব গুণই আছে, এবং সব গুণের উল্টোটাও তার মধ্যে আছে (যে কথা আরো ভালোভাবে বলা হয়েছে এই পাঠ-পর্যালোচনার দ্বিতীয় প্যারায়)। দেখা যায়, এর ফলে জোসেফিনের কোনো বিশিষ্ট চরিত্রই দাঁড়ায়নি, সে এই তো সে ঐ ও – অনেকটা কাফকা-সাহিত্যেরও মতো, সেখানে অনেক ধরনের বক্তব্য বা বাক্য সব মিলে শেষমেশ উল্টো কিছুই বলে বসে। জোসেফিনের নারী পরিচয়ের চেয়ে কথকের চশমা দিয়ে দেখা জোসেফিনের বৈপরীত্য বা তার অবস্থানের সাধারণ 'ডিসকোর্স' গল্পটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

সবশেষে বলতে হয়, এ গল্পটি কাফকার শেষ লেখা হিসেবে বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে; এবং সব ছাপিয়ে এটি কাফকা-ভক্তদের জন্য নিয়ে আসে দুঃখ ও বেদনার বোধ। ১৯১৭ সালে যক্ষ্মা ধরা পড়ার পর থেকে কাফকা নানা গ্রামাঞ্চল ও স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যুকে বারবারই একটু একটু দেরি করিয়ে দিয়েছেন। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি ডোরা ডিয়ামান্টকে নিয়ে বার্লিনে থাকলেন, তখন সর্বত্রব্যাপী মহা-মুদ্রাস্ফীতির কারণে তাদের অবস্থা যথেষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত, প্রাগ থেকে বাবা-মায়ের পাঠানো খাবার (food parcel)-এর ওপর ভর করেই তিনি মূলত টিকে আছেন। তাঁর অসুখটাও গলার দিকে, স্বরযন্ত্রের (larynx) ক্ষয়রোগ, যার ফলে তিনি না পারছেন খেতে, না কথা বলতে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে লাগল। একদম শেষদিকে এসে, আগেই যেমনটা বলেছি, তিনি ছোট ছোট স্লিপে লিখে কথাবার্তা চালাতেন; এরই একটি স্লিপে তিনি লিখলেন: 'আমাকে যদি মেরে না ফেলো, তো তুমি খুনি'; যথার্থ কাফকায়েস্ক এক প্যারাডক্সিকাল কথা। এই প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে জোসেফিনের 'ভঙ্গুর গলা'র দোমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থা তাঁর স্রষ্টার কথা বলতে পারার অক্ষমতারই প্রতীকী চিত্র। আর জোসেফিন যে শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা-ও কদিন পরই পৃথিবী থেকে কাফকার অদর্শ হয়ে যাওয়াই। আর কথক যে বলছে, জোসেফিন মিলিয়ে যাওয়ার পরও ইঁদুর-জাতির জীবন একইভাবে চলবে, তার অনুপস্থিতিতে আসলে কিছুই বদলাবে না, এটা হয়তো কাফকারই কাফকাসুলভ বিনয় আর শিল্পী ও লেখকদের অহংবোধ, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর শেষ সমালোচনা।

তিনটি সাহিত্য সমালোচনা

ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র-এর 'পরিশিষ্ট' অংশে যোগ করা হলো কাফকার লেখা তিনটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনা, যা তিনি জীবদ্দশায় প্রকাশ করেছিলেন। যেহেতু *গল্পসমগ্র*র এই প্রথম খণ্ডে কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত সব লেখা (এমনকি ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা শুরু করা উপন্যাসের প্রথম খণ্ডও) একত্রে করা হয়েছে, তাই এটা

অযৌক্তিক না যে, তাঁর এই তিনটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এই বই থেকে বাদ পড়া উচিত নয়।

১৯৪৮ সালে শোকেন্ বুকস, নিউ ইয়র্ক যখন কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্প বা রচনাসংকলন *The Penal Colony – Stories to Short Pieces* নাম দিয়ে বাজারজাত করে, সেখানে তারা এই তিনটি প্রবন্ধকে পরিশিষ্ট অংশে জায়গা দেয়। এরপর প্রকাশিত, বর্তমানে বাজারে সহজলভ্য, কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্পসংকলনের কোনোটিতেই – যেমন পেঙ্গুইন বুকস থেকে প্রকাশিত *The Transformation and Other Stories* (১৯৯২); অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ডস ক্ল্যাসিকস্ থেকে প্রকাশিত দুটি বই *A Hunger Artist and Other Stories* (২০১২) এবং *The Metamorphosis and Other Stories* (২০০৯); জে. এ. আন্ডাউডের অনুবাদে স্ফিয়ার বুকস্ থেকে প্রকাশিত *Franz Kafka: Stories 1904-1924* (১৯৯০); মাইকেল হফম্যানের অনুবাদে পেঙ্গুইন ইউ.কে থেকে প্রকাশিত *Metamorphosis & Other Stories* (২০০৭); সেকার অ্যান্ড ভারবুর্গ থেকে প্রকাশিত *In the Penal Settlement - Tales & Short Prose Works* (১৯৪৯); পেঙ্গুইন প্রকাশিত *Wedding Preparations in the Country & Other Stories* (১৯৭৮) এবং *Description of A Struggle & Other Stories* (১৯৭৯); কিংবা শোকেন্ বুকস থেকে প্রকাশিত কাফকার গল্পসমগ্র *The Complete Stories* (১৯৭১) বা আরো আরো যত বাজারে প্রাপ্য কাফকার গল্পসংকলন আছে, তার কোথাও এ লেখা তিনটিকে রাখা হয়নি। আগেই যেমন বলেছি, কেবল ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত শোকেন্ বুকসের *The Penal Colony - Stories & Short Pieces* বইতে এ লেখা তিনটি রয়েছে। অতি দুর্লভ এই বইটিই, বাধ্য হয়ে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করা হয় এই তিনটি লেখা পড়া ও তাদের বাংলা অনুবাদের জন্য।

শোকেন্ বুকসের এ বইটিতে স্পষ্ট বলা আছে যে এটি কাফকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত সব লেখার সংকলন (যদিও বিস্ময় জাগে তারা কীভাবে বইটি থেকে 'দুটি কথোপকথন'-এর দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ 'মাতালের সঙ্গে কথোপকথন' এবং আলাদা লেখা 'বিরাট শোরগোল' বাদ দিয়েছিলেন তা দেখে), সে হিসেবে আমারও অনুমান ছিল যে গবেষকেরা প্রমাণ পেয়েছেন, কাফকার এই তিনটি প্রবন্ধই তাঁর জীবদ্দশায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কাফকা এদের মধ্য থেকে কেবল প্রথমটিই ('একটি তারুণ্যের উপন্যাস') নিশ্চিতভাবে জীবদ্দশায় ছাপেন। অন্য দুটি লেখা ম্যাক্স ব্রড খুঁজে পান কাফকার অসংখ্য কাগজপত্রের মধ্যে; দেখেন যে কাফকা লেখাগুলোর প্রুফ দেখে গিয়েছিলেন। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 'ক্লাইসট্-এর ছোট ও বাস্তব কাহিনিগুলো' লেখাটির প্রুফ কাফকার নিজ হাতে দেখা আর শেষ প্রবন্ধ 'হুইপেরিয়ন' তাঁর ছোট বোন ওট্লার কলমে লেখা, কিন্তু প্রুফ কাফকার দেখা। শোকেন্ বুকসের বইটির অনুকরণে, যা হোক, এ তিনটি লেখাই এখানে ছাপানো হলো। এদের মধ্যে দিয়ে পাঠকেরা প্রাবন্ধিক ও শিল্প-সাহিত্য আলোচক কাফকার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

একটি তারুণ্যের উপন্যাস

এই নামে কাফকা ১৯১০ সালের ১৬ জানুয়ারি *বোহেমিয়া* সংবাদপত্রে ফেলিক্স স্টারন্‌হাইমের উপন্যাস *The Story of Young Oswald: An Epistolary Novel* (*তরুণ ওজভাল্ডের গল্প: একটি চিঠি বিনিময়মূলক উপন্যাস; Die Geschichte des jungen Oswald: Ein Roman in Briefen*)-এর সমালোচনাটি ছাপান। স্টারন্‌হাইমের বইটি বের হয় ১৯১০ সালেই, কাফকারই প্রথম লেখা ছাপা হওয়া *হুইপেরিয়ন* পত্রিকার মালিক হানস্ ফন ভেবারের প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান থেকে। ফেলিক্স স্টারন্‌হাইম বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার ও লেখক কার্ল স্টারন্‌হাইমের ভাই। কাফকার প্রবন্ধটির ইংরেজি নাম: ‘A Novel About Youth’, মূল জার্মানে: ‘Ein Roman der Jugend’।

কাফকা কেন ও কী ভেবে এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তা জানা যায়নি। তবে স্টারন্‌হাইমের উপন্যাসটির শৈলী ও আত্মজীবনীমূলক ভঙ্গি নিঃসন্দেহে কাফকাকে নাড়া দিয়েছিল। বইটি গ্যেয়টের বিখ্যাত উপন্যাস *তরুণ ভেরথারের দুঃখকষ্ট* (*The Sorrows of Young Werther*)-এর মতোই প্রথম-পুরুষে চিঠি বিনিময়ের আদলে লেখা। কাফকা তাঁর প্রবন্ধে গ্যেয়টের ভেরথারের কথা নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। গ্যেয়েটের উপন্যাসটি, যেখানে নায়ক ভেরথার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে, অন্য আর সব জার্মানের মতোই কাফকারও পড়া ছিল এবং তিনি গ্যেয়টের উপন্যাসটির সঙ্গে স্টারন্‌হাইমেরটির সহজেই তুলনা টানতে পারছিলেন। স্টারন্‌হাইমের উপন্যাসটিতে দেখা যায় ওজভাল্ড এক তরুণ নাট্যকার, সমাজের ভিড় থেকে দূরে বসে লিখছে মহান এক ট্র্যাজেডির নাটক। ওজভাল্ড প্রেমে পড়েছে এক তরুণীর, কিন্তু তাকে বিয়ে করতে গেলে ওজভাল্ডের অনেক অর্থকড়ি লাগবে, আর অর্থকড়ি পেতে হলে তার নাটকটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে হবে। যত দিনে ওজভাল্ড এই ট্র্যাজেডি লেখা শেষ করল এবং এক নাট্যদলের পরিচালক এর মঞ্চায়নে রাজি হলেন, দেখা গেল সেই তরুণীর অন্য একজনের সঙ্গে বাগ্‌দান হয়ে গেছে। উপন্যাসের শেষে ব্যথিত, পরিত্যক্ত ওজভাল্ড ভাবছে আত্মহত্যা করার কথা।

কাফকার সমালোচনাটি সব সময়ই যে প্রশংসামূলক তা নয়। তিনি স্টারন্‌হাইমকে দোষী করছেন সেন্টিমেন্টাল ভাষা ও চিঠিতে গড়া উপন্যাসের ‘ফর্ম’-এর জন্য। অন্যদিকে, কাফকা তার প্রশংসাও করছেন যে উপন্যাসটি কীভাবে পাঠকদের কতো সুন্দর একাত্ম করেছে নায়ক ওজভাল্ডের পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে। ওজভাল্ডের সংকটগুলো সে সময়ে কাফকারও সংকট: সৃজনশীল মানুষের সমাজের প্রতি তিক্ততার বোধ; শিল্পীর উচ্চাশা ও রুটি-রুজির সংস্থান হওয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব; তরুণ লেখকের লেখক হয়ে ওঠার পথে বাবা-মায়ের বাধা; লেখার মতো ‘পবিত্র’ বিষয়কে অর্থ-উপার্জনের মতো ‘নোংরা’ বিষয়ের কাছে হার মানতে না দেওয়া। এ ছাড়া, ওজভাল্ডের মতোই কাফকা নিজেও এ সময়ে আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করছিলেন, যে কথা আমরা এই বাংলা অনুবাদের ‘ভূমিকা’য় পড়েছি।

প্রবন্ধটির এক জায়গায় কাফকা ওজভাল্ডের ব্যাপারে বলছেন যে তার চিঠি লেখার অভ্যাস তাকে চারপাশের পৃথিবীর যাতনা থেকে বাঁচিয়ে শান্তির একটু জায়গা করে দিচ্ছে। কাফকা এখানে লেখালেখির মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব এমন এক স্বস্তির কথা বলছেন, যা তিনি নিজের জীবনেও প্রথমবার পেয়েছিলেন সারা রাত জেগে টানা আট ঘণ্টা এক বসায় 'রায়' গল্পটি লেখার মাধ্যমে। ওজভাল্ডকেও আমরা দেখি চিঠি লিখছে রাতে একা বসে, রাতভর। স্টারন্‌হাইমের উপন্যাসটির সঙ্গে একাত্মতা খুঁজে পাওয়ার মতো, অতএব, কাফকার অনেক কারণ ছিল।

ক্লাইস্টের ছোট, বাস্তব কাহিনিগুলো

প্রুশিয়ান লেখক হাইনরিখ ফন ক্লাইস্টের (১৭৭৭-১৮১১) ছোট আকারের, বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্পগুলো (anecdotes) নিয়ে কাফকার এই ছোট আলোচনাটি তিনি সম্ভবত লেখেন ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে। কাফকার লেখাটি, ধারণা করা হয়, প্রাগের দৈনিক পত্রিকা *Die Prager Presse*-এর জন্য লেখা হয়েছিল, কিন্তু আজও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে এটি সেই পত্রিকায় বা অন্য কোথাও কখনো তাঁর জীবদ্দশায় ছাপা হয়। লেখাটি তাঁর মৃত্যুর পরে ম্যাক্স ব্রড সম্পাদিত কাফকা রচনাসংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। ক্লাইস্টের যে বইটি নিয়ে কাফকা এ লেখাটি লেখেন তা জুলিয়াস বাব-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ সালে, রোভোল্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে। বইটি কাফকার চোখে পড়ে এমন একটি সময়ে যখন তিনি নিবিড়ভাবে ক্লাইস্ট পাঠে ব্যস্ত। সত্যিকার অর্থে ক্লাইস্ট কাফকার পছন্দের অল্প কজন লেখকের অন্যতম যার প্রভাব তাঁর নিজের লেখার শৈলী ও থিমের ওপর ভালোভাবেই লক্ষ করা যায়। কাফকা তাঁর প্রেমিকা ফেলিক্স বাউয়ারকে একটি চিঠিতে লেখেন যে ক্লাইস্ট, দস্তইয়েফ্‌স্কি, ফ্লবেয়ার ও গ্রিলপারসার – এই চারজন লেখক সাহিত্য বিষয়ে তাঁর 'রক্তের ভাই' সম্পর্কীয়। লেখাটিতে কাফকা প্রকাশকের প্রশংসা করেন যে ক্লাইস্টের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অ্যানেক্‌ডোটগুলো তারা একত্রে, এভাবে দুই মলাটের ভেতর প্রথম ছাপিয়েছেন। এই বইটি ক্লাইস্টের স্বল্পায়তন সাহিত্যকর্মে এক বিশেষ সংযোজন, যার মধ্য দিয়ে ক্লাইস্ট তাঁর সৃষ্টিকর্মে অ্যানেকডোটকে এক গুরুত্বের আসন দিয়ে গেছেন। তবে, কাফকার লেখাটির আগ্রহোদ্দীপক বিষয় এটিই যে তিনি ক্লাইস্টের বইটির বাহ্যিক দিকগুলোতে অনেক মুগ্ধ হয়েছিলেন, যেমন বইটির ছাপার অক্ষরের সৌন্দর্য (টাইপফেস্), কাগজের মান, জ্যাকেট, ইত্যাদি। এ বইটি কাফকার মাথায় এতটাই গেঁথে গিয়েছিল যে পরে যখন তিনি একই প্রকাশক আরনস্ট্ রোভোল্ট থেকে তাঁর প্রথম বই *ধেয়ান* বের করছেন, তখন প্রকাশককে তিনি বিশেষভাবে ক্লাইস্টের 'অ্যানেকডোট' বইটির অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা, নিজের বইয়ের স্ট্যান্ডার্ড বা মান হিসেবে, মাথায় রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ১৯১২ সালের

৭ সেপ্টেম্বর কাফকা তাঁর প্রকাশককে একটি চিঠিতে লেখেন যে তাঁর *ধেয়ান* বইটিও 'ক্লাইস্টের অ্যানেকডোটগুলোর মতোই হালকা রঙের আভায় রঞ্জিত কাগজে' ছাপা হোক। তিনি ক্লাইস্টের বইটির মতোই বড় বড় হরফ বা টাইপফেস্ চেয়েছিলেন নিজের বইতেও।

ফেলিক্স বাউয়ারকে লেখা কাফকার বিখ্যাত 'রক্তের ভাই' চিঠিতে কাফকা আরো লেখেন (ঐ চারজন তাঁর 'রক্তের ভাই' হলেও) ক্লাইস্ট হচ্ছেন একমাত্র লেখক/মানুষ 'সম্ভবত...তিনিই একজন যিনি সঠিক সমাধানটি খুঁজে পেয়েছেন।' অর্থাৎ কাফকার ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সমস্যাগুলোর সমাধান। এখানে 'সমাধান' বলতে কাফকা ক্লাইস্টের আত্মহত্যার কথা বুঝিয়েছেন। ক্লাইস্ট তাঁর বন্ধু, মৃত্যুশয্যায় শায়িত হেনরিয়েটে ফোগেলের সঙ্গে, আত্মহত্যার মৌখিক চুক্তি করে নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে মারা যান ১৮১১ সালের নভেম্বরে।

ক্লাইস্টের প্রতি কাফকার এই বিশাল পছন্দের বিষয়টি, গবেষণার মাধ্যমে, দেখা গেছে একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনো বা রহস্যময় কোনো পছন্দ ছিল, কারণ আজ পর্যন্ত স্পষ্ট ও নিশ্চিত করে কাফকার কোনো লেখাকে চিহ্নিত করা যায়নি, যেখানে কাফকা ক্লাইস্ট থেকে চোখে পড়ার মতো কোনো শৈলী, গদ্যের চরিত্র বা থিম ধার নিয়েছেন। ক্লাইস্ট ছিলেন একই সঙ্গে অনেক কিছু – মূলত একজন নাট্যকার, কবি ও গল্পলেখক।

কাফকার প্রবন্ধটির ইংরেজি নাম: 'On Kleist's "Anecdotes"'; মূল জার্মানে: 'Über Kleists Anekdoten'।

হুইপেরিয়ন – এক বিগত জার্নাল

দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা *হুইপেরিয়ন* বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কাফকা এই শিরোনামে লেখাটি ছাপেন এপিটাফ বা সমাধিলিপির ঢঙে। তাঁর শোকবার্তায় কাফকা *হুইপেরিয়ন* জার্নালটির প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানান এ কারণেও যে এই ঢাউস সাইজের জার্নালটিতেই তাঁর জীবনের প্রথম লেখা ছাপা হয় ১৯০৮ সালে, সেটি ছিল জার্নালটিরও প্রথম সংখ্যা। সেই লেখাগুলো ছিল পরবর্তীকালে তাঁর প্রথম বই *ধেয়ান*-এর অন্তর্ভুক্ত আটটি গদ্য স্কেচ। কাফকা তাঁর এ লেখায় ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে *হুইপেরিয়ন*-এর মোট বারোটি সংখ্যা ভবিষ্যতে একদিন প্রামাণিক সাহিত্য পঠন-পাঠনের একটি bibliophilic ভান্ডার হিসেবে চিহ্নিত হবে বা স্বীকৃতি পাবে। কাফকার প্রবন্ধটির ইংরেজি নাম: 'Hyperion – A Departed Journal'; মূল জার্মানে: 'Hyperion – Eine entschlafene zeitschrift'।

যে যে কারণে কাফকা *হুইপেরিয়ন* দ্বিমাসিকটির মৃত্যু হলো বলে মনে করছেন, সেগুলো উল্লেখযোগ্য: কাফকার মতে এই জার্নালটি তার আগের দুটি বিখ্যাত সাহিত্যিক জার্নালের ছায়া হয়ে এসেছিল; একটি সাহিত্য ম্যাগাজিন *Pan* (প্রকাশনা

১৮৯৫ থেকে ১৯০০), এবং অন্যটি Insel (প্রকাশনা ১৮৯৯ থেকে ১৯০২), কিন্তু এই আগের দুটির মতো *হুইপেরিয়ন* কোনো বিশিষ্ট চরিত্র ধারণ করতে এবং নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। যা হোক, আমরা এর পরেই দেখি কাফকা *হুইপেরিয়ন*-এর এই দোষের দিকটিকে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে, গুণে প্রমাণ করে ছেড়েছেন: যদি *Pan* হয়ে থাকে আভাঁ-গাদ (avant-garde) বা নতুন সব পরীক্ষামূলক সাহিত্য আন্দোলনের তরুণ-তুর্কীদের জায়গা, আর *Insel* যদি হয় জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যের বাহন, তো *হুইপেরিয়ন*-এর সাফল্য হচ্ছে সে এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝখানের ছোট জায়গাটিতে নিজের স্বাধীন সত্তাকে প্রকাশ করতে পেরেছিল। কাফকার মতে, এভাবেই *হুইপেরিয়ন* জায়গা দিয়েছিল সেই সময়ের নতুন সাহিত্যের বার্তাবাহী প্রান্তিক লেখকদের, যেমন তাকে। কাফকা যখন লেখেন যে জার্নালটির মাধ্যমে তাঁর সময়ের প্রান্তে পড়ে থাকা লেখকেরা বিরাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে, চোখ ধাঁধানো প্রকাশনার সাহায্যে, বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পেরেছিল, তিনি নিশ্চিত তাঁর নিজের কথাও ভাবছিলেন।

এই এপিটাফের মাধ্যমে কাফকা *হুইপেরিয়ন*-এর সম্পাদক ফ্রানৎস ব্লাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভোলেননি। তিনি এখানে জার্নালটির প্রকাশক সংস্থা হানস্ ফন ভেবার-এরও প্রশংসা করে বলেছেন যে এটি জার্মান ভাষার একটি প্রধান পুস্তক প্রকাশনা সংস্থায় রূপ নিয়েছে। এ অর্থে লেখাটি বিচার করলে বলতেই হয় যে কাফকা এই এপিটাফটি লিখে সাহিত্যজগতে তাঁর ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় বড় বড় ও প্রভাবশালী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ হাতছাড়া করেননি। লেখাটি কাফকা সম্ভবত লেখেন ১৯১০ সালের শেষ ভাগে।

হুইপেরিয়ন জার্নাল বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য হলো, প্রথম বছরে এর সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক কার্ল স্টারন্‌হাইম্, এবং পরে ফ্রানৎস ব্লাই। এর মোট বারোটি ইস্যু বের হয় ১৯০৮ থেকে ১৯১০ সালের ভেতরে, প্রতি দুই মাস পর পর। ১৯১০ সালের ১২তম সংখ্যা বের হওয়ার পরে জার্নালটি বন্ধ হয়ে যায়। এটিতে সাহিত্যিক (যেমন গল্প) ও প্রাবন্ধিক, দুই ধরনের লেখাই ছাপা হতো, সেই সঙ্গে গ্রাফিক আর্টও থাকত। জার্নালটির কোনো বিশেষ রাজনৈতিক, জাতিভিত্তিক বা ধর্মীয় পরিচয় ছিল না; এটি ছিল তখনকার সময়ের জার্মান সাহিত্যের চালু নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদের বাহন। *হুইপেরিয়ন* জার্নালটি দেখলেই বোঝা যেত, এর বড় আকারের, ঢাউস সাইজের সংখ্যাগুলো যথেষ্ট দামি, এবং খুব উঁচু মানের কাগজে ছাপা, আর এতে থাকত নামকরা সব শিল্পী যেমন – ভ্যান গঘ, পল গগ্যাঁ ও গুস্তাফ ক্লিম্‌ট্-এর ছাপার কাজ।

কাফকার প্রথম প্রকাশিত লেখা *ধেয়ান*-এর আটটি স্কেচই শুধু নয়, তাঁর আরো কিছু লেখা, যেমন এই বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত কথোপকথন দুটি (যা তাঁর অসমাপ্ত নভেলা *একটি সংগ্রামের বিবরণ*-এর অংশ) এই জার্নালে ছাপা হয়। এ অর্থে এই জার্নালটির হাত ধরেই – সেই সঙ্গে বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের অক্লান্ত তাড়ার কারণে– ফ্রানৎস

কাফকা জার্মান সাহিত্যজগতে একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রবেশ করেন। লেখক হিসেবে তাঁর মর্যাদা নিশ্চয়ই অনেক বেড়ে গিয়েছিল যখন তাঁর প্রথম লেখা দিয়েই তিনি *হুইপেরিয়ন*-এর প্রথম সংখ্যায় সে সময়ের (এবং আজ পর্যন্তও) সবচেয়ে কিছু নামীদামি লেখকের পাশে তাঁর সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ঘটান, যেমন হুগো ফন হফমানস্থাল, হাইনরিখ মান এবং কাফকার একই শহর প্রাগের বাসিন্দা রাইনার মারিয়া রিল্‌কে। এসব কারণেই কাফকা জার্নালটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অমন প্রশংসাসূচক এপিটাফটি লেখেন, যদিও লেখাটির নিবিড় পাঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কাফকা জার্নালটির কঠোর সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। বাংলা অনুবাদে (ইংরেজিতেও যেমন) প্রবন্ধটির দ্বিতীয় প্যারার শেষে এবং তৃতীয় প্যারার প্রথম তিনটি লাইনে কাফকার এই ছাইচাপা কিন্তু ক্রূর সমালোচনা চোখে পড়ার মতো এবং প্রাগের উঠতি একজন লেখক হিসেবে ওই বয়সে এমন স্পষ্ট সমালোচনা করার সাহস প্রশংসনীয় অবশ্যই।

ঋণস্বীকার

এই দীর্ঘ পাঠ-পর্যালোচনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো লিখতে আমি উদারভাবে সাহায্য নিয়েছি মূলত তিনটি বইয়ের:

১. *A Franz Kafka Encyclopedia*, লেখা ও সম্পাদনা Richad T. Gray, Ruth V. Gross, Rolf J. Goebl এবং Clayton Koelb, প্রকাশক Greenwood Press, ২০০৫। ঢাউস আকারের, দামি ও অমূল্য সব তথ্যবহুল এ বইতে জার্মান বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী কাফকা-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ, সুন্দরভাবে সাজানো আছে। তবে ১৩ হাজারের বেশি কাফকা-গবেষণা পুস্তকে এ বইয়ে উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলোর বাইরেও অসংখ্য ব্যাখ্যা রয়ে গেছে অবশ্যই। তার পরও, সহজে-সংক্ষেপে ফ্রানৎস কাফকার পৃথিবীতে প্রবেশ ও সে পৃথিবীকে বোঝার জন্য এর সমতুল্য বই আর কোনোটিই নেই। সম্ভবত বইটি আধুনিক কালের কোনো লেখককে নিয়ে লেখা একমাত্র এনসাইক্লোপেডিয়া।

২. *Franz Kafka: A Hunger Artist & Other Stories*; অনুবাদ Joyce Crick, প্রকাশক Oxford University Press, ২০১২। *অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ডস্ ক্লাসিকস্* সিরিজের অন্তর্গত এ বইটির অমূল্য সম্পদ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান কাফকা গবেষক রিচি রবার্টসনের লেখা 'ভূমিকা' ও 'টীকা'।

৩. *Franz Kafka: The Metamorphosis & Other Stories*; অনুবাদ Joyce Crick, প্রকাশক Oxford University Press, ২০০৯। এটিও একই *অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ডস্ ক্লাসিকস্* সিরিজের একটি বই; আগেরটির মতোই নতুন অনুবাদে সমৃদ্ধ এবং এরও অমূল্য সম্পদ রিচি রবার্টসনের মতো বিশাল মাপের কাফকা-গবেষকের 'ভূমিকা' ও 'টীকা'।

এ তিনটি বই ছাড়াও সাহায্য নেওয়া হয়েছে নিচের বইগুলোর:

৪. *Franz Kafka – The Transformation & Other Stories*, অনুবাদ *স্যার ম্যালকম প্যাস্‌লি*, প্রকাশক Penguin Books, ১৯৯২ বইটির। ম্যালকম প্যাসলির খুব ছোট আকারের কিছু টীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য আছে বইটির শুরুতে।

৫. *Franz Kafka – The Complete Stories*, সম্পাদনা Nahum N. Glatzer, প্রকাশক শোকেন্

বুকস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১। ইংরেজি ভাষার একমাত্র *গল্পসমগ্র* এই বইতে (যদিও বেশ কিছু লেখা এতে বাদ পড়েছে) শেষের দিকে 'On the Materials Included in this Volume' অংশে চমৎকার কিছু ঐতিহাসিক ও প্রাসঙ্গিক তথ্য রয়েছে।

৬. *Franz Kafka,* লেখক Ronald Gray; প্রকাশক *ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস*, ১৯৭৩। কাফকার গল্প ও উপন্যাসগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-বিষয়ক চমৎকার একটি অ্যাকাডেমিক পাঠ্যপুস্তক; জনপ্রিয় এই বইটি সাধারণ পাঠকের জন্য কাফকা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক ভান্ডার, যেখানে কাফকার অধিকাংশ গল্প নিয়েই বিস্তারিত অ্যাকাডেমিক আলোচনা আছে, এবং তা-ও সহজ ভাষায়। এ বইটির একমাত্র দোষ বলা যায়, এই নতুন সময়ের কাফকা-বিশ্লেষণের বিপরীতে এর বিশ্লেষণগুলো 'প্রথাগত' বা 'মিথ' ঘরানার কাফকা-উন্মোচন।

৭. *Kafka – A Collection of Critical Essays*; সম্পাদনা Ronald Gray, প্রকাশক Prentice Hall, Inc., ১৯৬২। ১৯৯২ সালে হাতে আসা এটিই আমার পড়া প্রথম কাফকা-বিশ্লেষণমূলক বই যেটিতে চমৎকার একটি 'ভূমিকা' এবং পরে ১৫টি প্রবন্ধ আছে মোট ১৫ জন খ্যাতনামা মনীষীর, যাদের মধ্যে আলবেয়ার কাম্যু, এরিখ হেলার, মার্টিন বুবার, এডমান্ড উইলসন ও এডুইন মুইরের মতো কাফকাবোদ্ধারাও রয়েছেন।

পাঠ-পর্যালোচনা, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা লিখতে প্রভূত সাহায্য করা উপরের এই সাতটি বইয়ের (আগেই বলেছি যে, মূলত প্রথম তিনটির) লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে আমি অকুণ্ঠচিত্তে আমার ঋণস্বীকার করছি।

ফ্রানৎস কাফকা – কালপঞ্জি

১৮৮৩	ফ্রানৎস কাফকার জন্ম অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির দ্বৈত রাজতন্ত্রে, বোহেমিয়া রাজ্যের রাজধানী প্রাগে, ৩ জুলাই। বাবা হারমান কাফকা (১৮৫২-১৯৩১) আর মা ইয়ুলি কাফকা (১৮৫৬-১৯৩৪), যার পিতার দিকের পদবি ছিল লাউভি। বাবা-মা হাবস্‌বুর্গ সম্রাট ফ্রানৎস জোসেফ-এর অনুকরণে ছেলের প্রথম নাম রাখলেন ফ্রানৎস, বাকিটা পিতার দিকের বংশ-পদবি কাফকা (চেক ভাষায় Kavka, মানে 'দাঁড়কাক')।
১৮৮৫	ফ্রানৎস কাফকার ভাই গেয়র্গের জন্ম; ১৫ মাস বয়সে হামে মৃত্যু।
১৮৮৭	ফ্রানৎস কাফকার ভাই হাইনরিকের জন্ম; সাত মাস বয়সে মেনিন্‌জাইটিসে মৃত্যু।
১৮৮৯	বোন গ্যাব্রিয়েল, (এল্লি)-এর জন্ম; মৃত্যু ১৯৪১-এ। পানামা অ্যাফেয়ার। পানামা খাল প্রোজেক্ট ব্যর্থ হওয়ার জন্য ইহুদি অর্থলগ্নিকারীদের দোষ দেওয়া হতে লাগল। হাজার হাজার ফরাসি বিনিয়োগকারী তাদের পুঁজি হারালেন। কাফকার মামা আলফ্রেড ও জোসেফ লাউভি পানামা খাল কোম্পানিতে চাকরি করতেন; তাঁরা টের পেলেন ইহুদি-বিদ্বেষের চেহারা।
১৮৮৯-৯০	ড্রেইফিউস অ্যাফেয়ার। ফরাসি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন, ইহুদি আলফ্রেড ড্রেইফিউস ধরা পড়লেন জার্মানদের কাছে সামরিক গোপন তথ্য সরবরাহের দায়ে; ফ্রান্স জুড়ে শুরু হলো ইহুদি-বিদ্বেষ, ফরাসি ইহুদিদের দেশের প্রতি প্রেম প্রশ্নবিদ্ধ হলো। ড্রেইফিউস অ্যাফেয়ারের ঝড় ইউরোপ জুড়েই চলল হিটলার ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত।
১৮৯০	বোন ভ্যালেরির (ভাল্লি) জন্ম; মৃত্যু ১৯৪২-এ।
১৮৯২	সবচেয়ে প্রিয় বোন, কাফকার জীবনের ঘনিষ্ঠতম মানুষ ওট্‌লির (ওটলা) জন্ম; মৃত্যু ১৯৪৩-এ।
১৮৯৩-১৯০১	কাফকা প্রাগের জার্মান গ্রামার স্কুলে ভর্তি হলেন। বন্ধুত্ব হলো অস্কার পোলাকের সঙ্গে।
১৮৯৬	কাফকার বার-মিৎজ্‌ভাহ (ইহুদি ছেলেদের সাবালক হওয়ার অনুষ্ঠান) হলো জুনের ১৩ তারিখে।
১৮৯৭	প্রাগে তিন দিনের ইহুদিবিরোধী দাঙ্গা ('ডিসেম্বর স্টর্ম' নামে কুখ্যাত) হলো; কাফকার বাবা হারমান কাফকার দোকানটি বেঁচে গেল তারা জার্মানভাষী কিন্তু চেক বলে।

১৮৯৮-১৯০৩	প্রথম কিছু লেখালেখি (নষ্ট হয়ে যায়)।
১৯৯৯-১৯০০	পড়লেন স্পিনোজা, ডারউইন, নিট্‌শে। হুগো বার্গমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব।
১৯০০	সিগমুন্ড ফ্রয়েডের *The Interpretation of Dreams*-এর প্রকাশ; ফ্রেডেরিখ নিট্‌শের মৃত্যু।
১৯০১	দেশের বাইরে কাফকার প্রথম ছুটি কাটানো, মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস হলে গেলেন নর্থ সি-তে জার্মান দ্বীপ নরডার্‌নি ও হেলগোলান্ড-এ। ওটো ভাইনিঙগার-এর *Sex and Character* বইটির প্রকাশ।
১৯০১-০৬	প্রাগে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মানভাষী অংশে ভর্তি হলেন। প্রথমে দুই সপ্তাহ রসায়ন, তারপর শিল্পকলার ইতিহাস এবং জার্মান সাহিত্য পড়ে শুরু করলেন আইন বিষয়ে পড়া। পড়াশোনা কিছুটা মিউনিখেও করেছিলেন। আলফ্রেড ভেবারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটিবিষয়ক বিশ্লেষণে প্রভাবিত হলেন।
১৯০২	শেলেসেন ও ট্রিয়েশে মামা আলফ্রেড লাউভির সঙ্গে ছুটিতে (মামা পেশায় 'গ্রাম্য ডাক্তার')। মিউনিখে ভ্রমণ; সেখানে জার্মান স্টাডিজে পড়াশোনা করার পরিকল্পনা। পরে প্রাগে প্রত্যাবর্তন। অক্টোবর: ম্যাক্স ব্রডের (১৮৮৪-১৯৬৮) সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। স্কুলজীবনের বন্ধু পল কিশ ও অস্কার পোলাকের সঙ্গে চিঠি বিনিময়।
১৯০৩	প্রথম উপন্যাস 'The Child and the City' লেখা শুরু (লেখাটি হারিয়ে গেছে)।
১৯০৪-০৫	রাশিয়ায় ব্যর্থ বিপ্লব; গ্রীষ্মের কিছুটা কাটালেন অস্ট্রিয়ান সিলেসিয়ার (বর্তমানে পোল্যান্ড) জুকমান্টালের এক স্বাস্থ্যনিবাসে (স্যানাটোরিয়াম)। সেখানে প্রথম প্রেম; মেয়েটির নাম অজানা। ১৯০৪-এ শুরু করলেন *একটি সংগ্রামের বিবরণ* নামের নভেলা লেখা। পড়লেন বায়রন, গ্রিল্‌ পারসার, গ্যেয়টে এবং একারমানের ডায়েরি, স্মৃতিকথা, চিঠি। অস্কার বাউম, ম্যাক্স ব্রড ও ফেলিক্স ভেলট্‌শের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডার শুরু।
১৯০৫-০৬	প্রাগে রিচার্ড লাউভির আইনি প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেন করণিক হিসেবে। জুন, ১৯০৬ সালে, পাঁচ বছর আইন পড়া শেষে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে (জুরিসপ্রুডেন্স) ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ। অক্টোবর থেকে প্রাগের ফৌজদারি আদালতে, সরকারি চাকরির যোগ্যতা অর্জনের জন্য, এক বছর বিনা বেতনে পেশাদারি অভিজ্ঞতার (ইন্টার্নশিপ) শুরু।
১৯০৭	অক্টোবর: ইতালির ট্রিয়েস্টের বিমা প্রতিষ্ঠান Assicurazioni Generali-র প্রাগ শাখায় জীবনের প্রথম সত্যিকারের চাকরি। পদটি

ছিল অস্থায়ী ধরনের। পরিবার বাসা বদলালো সেলেৎনা স্ট্রিট থেকে নিক্লাস্ স্ট্রিটে। একটি উপন্যাসের খণ্ডাংশ *গাঁয়ে বিয়ের প্রস্তুতি* (*Wedding Preparations in the Country*) লেখার শুরু।

১৯০৮ — অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি দখল করে নিল বসনিয়া-হার্জেগোভিনা অঞ্চল। ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের শুরু।

মার্চ: মিউনিখের *হুইপেরিয়ন* পত্রিকায় কাফকার প্রথম লেখা (পরবর্তীকালের *ধেয়ান* বইয়ের আটটি লেখা) প্রকাশ।

৩০ জুলাই: ইতালির বিমা প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে বোহেমিয়া রাজ্যের আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান Workers' Accident Insurance Company-তে চাকরির শুরু (এখান থেকেই অবসর ১৯২২-এর জুলাইয়ে)। প্রথম পাঁচ বছর দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

কফি হাউস ও ক্যাবারেগুলোয় সময় কাটানো শুরু।

লিখলেন পেশাদারি লেখা 'On Mandatory Insurance in the Construction Industry'।

১৯০৯ — ডায়েরি লিখে সংরক্ষণ করা শুরু।

এপ্রিল: অফিসে কাফকার ডিপার্টমেন্ট প্রধান তাঁর প্রশংসা করলেন 'ব্যতিক্রমী চিন্তাশক্তির' জন্য।

সেপ্টেম্বর: ম্যাক্স ও ওটো ব্রডের সঙ্গে উত্তর ইতালির ব্রেস্সায় প্রথম উড়োজাহাজ দেখলেন। লিখলেন 'ব্রেস্সায় উড়োজাহাজ', যা পরে ছাপা হলো *বোহেমিয়া* নামের দৈনিক কাগজে। ব্রেস্সার আগে গেলেন সমুদ্রতীরবর্তী শহর রিভায়। বিমা কোম্পানির কাজের অংশ হিসেবে প্রায়ই যেতে হলো প্রদেশগুলোর নানা কারখানা পরিদর্শনে।

১৯১০ — প্রাগে মিসেস বার্টা ফান্টার বুদ্ধিজীবী সংঘে যোগ দিলেন।

মার্চ: *বোহেমিয়া* পত্রিকায় ছাপা হলো পাঁচটি গদ্য রচনা।

মে: বাজারে সহজলভ্য ফ্রানৎস কাফকার *ডায়েরির* প্রথম এন্ট্রি লেখা হলো (শেষ এন্ট্রি ১৯২৩-এর ১২ জুন)। পূর্ব ইউরোপ থেকে প্রাগে আসা ইদ্দিশ্ নাট্যদলের নাটক দেখলেন।

অক্টোবর: ব্রড ভাইদের সঙ্গে প্যারিস ভ্রমণ।

ডিসেম্বর: প্রথমবারের মতো বার্লিন গমন।

১৯১১ — জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি: ফ্রিড্ল্যান্ড ও রাইখেন্বার্গে ব্যবসায়িক কাজে।

মে: আলবার্ট আইনস্টাইনের লেকচার শুনলেন।

গ্রীষ্ম: ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে জুরিখ, লুগানো, মিলান ও প্যারিসে, ছুটিতে। ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে যৌথভাবে *রিচার্ড ও স্যামুয়েল* নামের উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা।

জুরিখের কাছে এক স্যানাটোরিয়ামে (জায়গাটির নাম এরলেন্‌বাখ) একা থাকলেন। ট্রাভেল ডায়েরি লিখলেন।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর: ইদ্দিশ্ নাট্যদলের অনেকগুলো প্রযোজনা দেখলেন প্রাগের 'ক্যাফে স্যাভয়'তে। দলটির অভিনেতা ইসাক লাউভির (Isaak Löwy বা Jitskhok Löwy) সঙ্গে বন্ধুত্ব। কাফকার ইহুদি ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা শুরু।

শরৎ: অ্যাজবেস্‌টস্ কারখানার পারিবারিক ব্যবসায় সময় দিতে হলো। লিখলেন, 'Measures to Prevent Accident [in Factories and Farms] এবং 'Workers Accident Insurance and Management'।

১৯১১-১৩ ২০ বছর আগে ফ্রান্সের ড্রেইফিউস অ্যাফেয়ারের মতো রাশিয়াতে বেইলিস্ অ্যাফেয়ার ইহুদি-বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢালল। পাশের হাবস্‌বুর্গ সাম্রাজ্যেও লাগল সেই আগুনের আঁচ। কিয়েভে এক স্কুলছাত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ইহুদিদের বিরুদ্ধে 'রক্তজাত কুৎসা' আবার মাথাচাড়া দিল। মেন্‌ডেল বেইলিস নামের এক ইহুদি লোক স্কুলছাত্রটিকে খুন করেছিল ধর্মাচারগত কারণে, তার রক্তের প্রয়োজন ছিল বলে। বেইলিস্‌কে শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯১১-১৪ *আমেরিকা* (ম্যাক্স ব্রডের দেওয়া নাম; কাফকা নাম রাখেন: *নিখোঁজ মানুষ*) উপন্যাসের কাজ করলেন (মূল অংশ লেখা ১৯১১-১২ তে)।

১৯১২ ইহুদি ধর্ম (Judaism) বিষয়ে পড়াশোনা।

১৮ ফেব্রুয়ারি: ইদ্দিশ্ ভাষা বিষয়ে, ইদ্দিশ্ নাট্যদলের নাটক মঞ্চায়ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রাগের ওল্ড-নিউ সিনাগগে (ইহুদি প্রার্থনাগৃহ)।

জুন: চেক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ফ্রান্‌টিসেক সুকুপের আমেরিকা-বিষয়ক বক্তৃতা শোনেন এবং তাঁর ভবিষ্যতের দুই প্রকাশক আরনস্ট রোভোল্ট ও কুর্ট ভোলফের সঙ্গে দেখা করেন।

জুলাই: ম্যাক্স ব্রডের সঙ্গে গ্যেয়টের শহর ভাইমারে যান। এরপর তিন সপ্তাহ কাটান হার্স পর্বতের 'ইয়ুংবর্ন' নামের ন্যুডিস্ট স্যানাটোরিয়ামে।

আগস্ট: তাঁর প্রথম বই *ধেয়ান*-এর লেখাগুলো একসঙ্গে করেন।

১৩ আগস্ট: বার্লিনের মেয়ে ফেলিস বাউয়ারের (১৮৮৭-১৯৬০) সঙ্গে প্রাগে ম্যাক্স ব্রডের বাবার বাসায় প্রথম সাক্ষাৎ।

১৪ আগস্ট: প্রথম বই *ধেয়ান*-এর পাণ্ডুলিপি পাঠান প্রকাশকের কাছে।

২০ সেপ্টেম্বর: ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ বছরের চিঠি লেখালেখির শুরু।

২২-২৩ সেপ্টেম্বর: প্রথম ব্রেক-থ্রু গল্প (প্রথম প্রধান সফল সাহিত্যকর্ম) 'রায়' লিখলেন।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর: লিখলেন 'দি স্টোকার' (*আমেরিকা* উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়)।

১২ অক্টোবর - ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩: ডায়েরি লেখায় ছেদ।

নভেম্বর: লিখলেন বড় গল্প 'রূপান্তর'।

পরিবারের অ্যাজবেস্‌টস্‌ ফ্যাক্টরির দায়িত্ব নেওয়া বিষয়ে হতাশ ও বিষণ্ন। আত্মহত্যার পরিকল্পনা।

ডিসেম্বর: প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে নিজের লেখা পড়া ('রায়')।

১৯১৩

জানুয়ারি: জায়োনিস্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী মার্টিন বুবারের সঙ্গে পরিচয়; প্রথম বই *ধেয়ান*-এর প্রকাশ।

ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই, ১৯১৪ পর্যন্ত সৃষ্টিশীল লেখালেখিতে বন্ধ্যাত্ব।

ইস্টার: বার্লিনে ফেলিস বাউয়ারের কাছে প্রথমবারের মতো যাওয়া।

এ বছরই মোট তিনবার যান বার্লিনে।

মে: *দি স্টোকার* আলাদা বই হিসেবে প্রকাশিত হলো।

জুলাই: তাঁর ত্রিশতম জন্মদিনে ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে বাগ্‌দানের ঘোষণা দিলেন।

সেপ্টেম্বর: ভিয়েনা, ভেনিস ও রিভায় গেলেন। রিভায় বন্ধুত্ব হলো এক 'সুইস গার্ল'-এর সঙ্গে। ভিয়েনায় বিমা কোম্পানির দুর্ঘটনা প্রতিরোধবিষয়ক কনফারেন্স শেষে 'একাদশ জায়োনিস্ট কংগ্রেস' এ-ও যোগ দিলেন সেটা ওখানে একই সময় হচ্ছিল বলেই।

নভেম্বর: ফেলিস বাউয়ারের বান্ধবী গ্রেটে ব্লখের সঙ্গে পরিচয়; গ্রেটের সঙ্গে, ফেলিসকে না জানিয়ে, চিঠি বিনিময় শুরু।

এ বছরই পদোন্নতি পেলেন কোম্পানির ভাইস সেক্রেটারি পদে।

বাগান করা শুরু; বাগানে গাছ লাগানো, পরিচর্যা – এসব তাঁর বড় শখে পরিণত হলো।

১৯১৪

হাবস্‌বুর্গ রাজত্বের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রানৎস ফার্দিনান্দের গুপ্তহত্যার ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু (তাকে হত্যা করা হয় বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানী সারায়েভোতে, ২৮ জুন); অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান বাহিনী পুবে রাশিয়া ও দক্ষিণে সার্বিয়ার দিকে আগ্রাসন চালায় এবং দুই ফ্রন্টেই বিশাল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এ বছরেরই ২ আগস্ট কাফকার বিখ্যাত ডায়েরি এন্ট্রি: 'জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে - বিকালে সাঁতার।'

১ জুন: বার্লিনে ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বাগ্‌দান হলো।

১২ জুলাই: বাগ্‌দান ভেঙে গেল; অন্যতম কারণ বান্ধবী গ্রেটে ব্লখের সঙ্গে গোপন প্রেমের কথা ফেলিসের জেনে যাওয়া।
গ্রীষ্ম: আরনস্ট ভেইজের সঙ্গে ছুটিতে বাল্টিকের সাগরবর্তী হেলেরূড়ি, লুবেক ও ম্যারিয়েনলিস্টে। লিখলেন 'কালদা রেলপথের স্মৃতি'।
আগস্ট-ডিসেম্বর: লিখলেন *বিচার* উপন্যাসের বড় অংশ; বড় গল্প 'দণ্ড উপনিবেশে'; *বিচার* উপন্যাসের অংশ হিসেবে 'আইনের দরজায়'।

১৯১৫ জানুয়ারি: বাগ্‌দান ভেঙে যাওয়ার পর ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ; *বিচার* উপন্যাস লেখা চলছে; নাট্যকার কার্ল স্টারন্‌হাইম তাঁর নিজের পাওয়া ফন্‌টান পুরস্কারটি দান করলেন ফ্রানৎস কাফকাকে– *দি স্টোকার* পড়ে মুগ্ধ হয়ে।
ফেব্রুয়ারি: কাফকা বাবা-মায়ের বাসা থেকে আলাদা হয়ে নিজে ভাড়া করা বাসায় (বা ঘরে) উঠলেন – এটাই প্রথম তাঁর একা বাসায় থাকা; ঠিকানা: বিলেক্‌গাসে, প্রাগ।
এপ্রিল: বোন এল্লির সঙ্গে হাঙ্গেরির যুদ্ধ ফ্রন্টে গেলেন বোনের স্বামীকে খুঁজতে।
নভেম্বর: *রূপান্তর* বের হলো আলাদা বই হিসেবে।
ডিসেম্বর (এবং জানুয়ারি, ১৯১৬): লিখলেন বড় গল্প 'গ্রাম্য স্কুলশিক্ষক'।

১৯১৬ জুলাই: ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে ১০টি দিন একসঙ্গে থাকলেন বোহেমিয়ার অবকাশ শহর মারিয়েনবাদে।
আগস্ট: বিয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির তালিকা তৈরি করলেন।
নভেম্বর: বোন ওটলার ভাড়া করা, প্রাগ দুর্গের সীমানাপ্রাচীরের মধ্যে, ২২ নম্বর আলকেমিস্ট লেনের এক কামরার বাসায় সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলল *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বইয়ের গল্পগুলো লেখা। কুর্ট ভোলফ্ প্রকাশনী থেকে বেরোলো *রায়*, আলাদা বই হয়ে।

১৯১৭ বছরের প্রথম ভাগ: লিখলেন 'শিকারি গ্রাখুস'; হিব্রু শিখছেন; লিখলেন 'অ্যাকাডেমির জন্য একটি প্রতিবেদন'; রাশিয়ায় লেনিনের বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হলো।
আলাদা ইহুদি রাষ্ট্রের পক্ষে বালফুর ঘোষণা।
জুলাই: কাফকা ও ফেলিস একসঙ্গে ফেলিসের বোনের বাসায়, বুদাপেস্টে; ফেলিসের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতো বাগ্‌দান সম্পন্ন।
আগস্টে যক্ষ্মারোগের (যাতে তিনি সাত বছর পরেই মারা যাবেন) প্রথম লক্ষণ দেখা গেল; কফের সঙ্গে রক্ত পড়া শুরু।
৪ সেপ্টেম্বর: শরীর সুস্থ করতে বোহেমিয়ার গ্রামাঞ্চলে বোন ওট্‌লার কাছে জুরাউ-তে (অন্য নাম সিরেম)।

	ডিসেম্বর: ফেলিস বাউয়ার কাফকার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; দ্বিতীয় বাগদানও ভেঙে গেল।
১৯১৮	জানুয়ারি-জুন: জুরাউতে বসে লিখলেন অসংখ্য প্রবচন, বা কাফকার ভাষায় 'শেষ জিনিসগুলো' (ম্যাক্স ব্রড পরে এগুলো প্রকাশ করেন: *Reflections on Sin, Suffering, Hope and The True Way* নামে)। পড়ছেন কিয়েরকেগার্ড।
	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পরাজয়ের পর কেন্দ্রীয় ইউরোপের অনেক রাজ্যেই স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের জন্য বিপ্লব শুরু হলো; প্রাগ হলো নতুন রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী।
	নভেম্বর-ডিসেম্বর: কাফকা বোহেমিয়ার শেলেসেন্ গেলেন শারীরিক সুস্থতার আশায়; অফিস থেকে নিলেন লম্বা স্বাস্থ্যগত ছুটি; শেলেসেনে থাকলেন ১৯১৯-এর মার্চ পর্যন্ত; সিনাগগের এক তত্ত্বাবধায়কের মেয়ে ইউলি ওরিৎসেকের (১৮৯১-১৯৪৪) সঙ্গে প্রণয়ের শুরু নভেম্বরে।
১৯১৯	প্রাগে অফিস আর শেলেসেনে স্বাস্থ্যগত বিশ্রামের মধ্যে সময় কাটাতে লাগলেন।
	১০ জানুয়ারি: আবার ডায়েরি লেখা শুরু।
	বসন্তে ফেলিস বাউয়ারের বিয়ে হলো বার্লিনে, মরিৎস মারাসে (১৮৭৩-১৯৫০) নামের এক ব্যবসায়ীর (একটি প্রাইভেট ব্যাংকের অংশীদারি মালিক) সঙ্গে; প্রাগে কাফকার সঙ্গে বাগ্দান হলো ইয়ুলি ওরিৎসেকের; কাফকার বাবা ক্ষুব্ধ।
	মে: *দণ্ড উপনিবেশে* বের হলো আলাদা বই হিসেবে।
	শরৎ: *এক গ্রাম্য ডাক্তার* বের হলো কাফকার ষষ্ঠ বই হিসেবে।
	নভেম্বর: লিখলেন বিখ্যাত *বাবাকে লেখা চিঠি*; ইয়ুলির সঙ্গে বাগ্দান ভেঙে গেল।
	ডিসেম্বর: প্রবচনগুচ্ছ *সে (He)* লিখলেন। ব্রডের সঙ্গে শেলেসেনে।
১৯২০	জানুয়ারি থেকে ১৯২১-এর অক্টোবর: ডায়েরি লেখায় ছেদ।
	স্বাস্থ্যগত ছুটি নিলেন তাঁর কোম্পানি থেকে, পদোন্নতি পেয়ে কোম্পানির সেক্রেটারি হলেন।
	মার্চের শেষে: গুস্তাভ ইয়ানুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ (কাফকার সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে তাঁর বাজারে সহজলভ্য একটি বিখ্যাত বই আছে)।
	এপ্রিল: স্বাস্থ্যের উন্নয়নের আশায় ইতালির মেরানোতে।
	চেক অনুবাদক মিলেনা য়েসেন্স্কার (১৮৯৬-১৯৪৪) সঙ্গে প্রেমের শুরু। মিলেনাকে চিঠি লেখা শুরু।

জুলাই: ইউলি ওরিৎসেকের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হলো।

নভেম্বর: প্রাগে শুরু হলো ইহুদি-বিদ্বেষী দাঙ্গা; কাফকা মিলেনাকে লিখলেন 'যেখানে কেউ ঘৃণার সম্মুখীন হয়, সেখান থেকে চলে যাওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

ডিসেম্বর: আবার স্বাস্থ্যগত ছুটি পেলেন; স্লোভাকিয়ার টাট্রা পর্বতের মাত্লিয়ারিতে এক স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হলেন; এখানেই থাকলেন ১৯২১-এর আগস্ট পর্যন্ত; এখানেই সাক্ষাৎ হলো তাঁর শেষ সময়ের বন্ধু, বয়সে অনেক ছোট, ডাক্তারির ছাত্র রবার্ট ক্লপ্স্টকের সঙ্গে।

১৯২১ আগস্ট: প্রাগে প্রত্যাবর্তন।

সেপ্টেম্বর: কাজে যোগ দিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্য এত খারাপ হতে লাগল যে আবার অক্টোবর থেকে ছুটি নিতে হলো তিন মাসের জন্য।

১৫ অক্টোবর: সমস্ত ডায়েরি হস্তান্তর করলেন মিলেনা য়েসেন্স্কাকে। রবার্ট ক্লপস্টকের সঙ্গে চিঠি লেখালেখির শুরু।

১৯২২ উগ্র ডানপন্থী ইহুদি-বিদ্বেষীদের হাতে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভালটার রাথানাউয়ের গুপ্তহত্যা।

১৬ জানুয়ারি ডায়েরি: কাফকা স্নায়বিক বিপর্যয়ের কথা লিখলেন।

২৭ জানুয়ারি: স্পিন্ডেলারমুহ্লেতে (পোল্যান্ড সীমান্তের অবকাশ কেন্দ্র) গমন, সেখানে *দুর্গ* উপন্যাস লেখা শুরু (বড় অংশই লিখে ফেললেন আগস্টের ভেতরে)।

মার্চ: উপন্যাসের শুরুর অংশটুকু ম্যাক্স ব্রডকে পড়ে শোনান।

বসন্ত: লিখলেন বড় গল্প 'এক অনশন-শিল্পী'।

মে: মিলেনা য়েসেন্স্কার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

গ্রীষ্মে: লিখলেন বড়গল্প 'একটি কুকুরের তদন্তমালা'।

জুনের শেষ থেকে সেপ্টেম্বর: বোন ওটলার সঙ্গে লুশনিৎজ নদীর তীরবর্তী প্লানা-য়। পরে প্রাগে ফিরে আসেন।

১ জুলাই: ওয়ার্কার্স অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে দীর্ঘ ১৫ বছরের চাকরি শেষে স্বাস্থ্যগত কারণে ইস্তফা দিলেন, তবে পূর্ণ পেনশন সুবিধা লাভ করলেন বিশেষ বিবেচনায়।

নভেম্বর: আরেকটি স্নায়ু বিপর্যয় ঘটার পর ম্যাক্স ব্রডকে জানালেন যে তিনি *দুর্গ* উপন্যাসের 'সুতো আর ধরতে পারছেন না'।

১৯২৩ বছরের শুরুতে প্রাগে। হিব্রু পড়াশোনা আবার শুরু। হুগো বার্গমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ; হুগো তাঁকে প্যালেস্টাইনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।

জুলাই: বাল্টিক উপকূলের মুরিৎজে বোন এল্লির সঙ্গে; সেখানে একটি ভ্যাকেশন ক্যাম্পে ১৯ বছর বয়সী ডোরা ডিয়ামান্টের

(১৮৯৮-১৯৫২) সঙ্গে পরিচয় এবং কাফকার শেষতম প্রণয়ের গুরু। তারা দুজনে পরিকল্পনা করেন প্যালেস্টাইনে চলে যাবেন, তেল আবিবে একটি রেস্তোরাঁ খুলবেন, কাফকা হবেন যার ওয়েটার আর ডোরা রাঁধুনি।

সেপ্টেম্বর: মুদ্রাস্ফীতিতে বিপর্যস্ত বার্লিনে ডোরার সঙ্গে বসবাস ১৯২৪-এর মার্চ পর্যন্ত। এ সময়ই লেখা 'এক ছোটখাটো মহিলা'। বার্লিন একাডেমিতে ইহুদি স্টাডিজের লেকচার শোনেন।

শীত: লিখলেন বড় গল্প 'সুড়ঙ্গ' ('The Burrow')।

'এক অনশন-শিল্পী' পাঠানো হলো প্রকাশকের কাছে।

১৯২৪ স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি হলো। প্রাগে সে কারণেই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

১০ এপ্রিল: ভিয়েনাতে প্রফেসর হাজেকের ক্লিনিকে, ভাইয়েনার ভান্ড স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হন; পরে ভিয়েনার কাছে কিয়েরলিংয়ে স্যানাটোরিয়ামে, সঙ্গে ডোরা দিয়ামান্ট ও রবার্ট ক্লপস্টক।

মার্চ-এপ্রিল: লিখলেন ও প্রকাশ করলেন শেষ গল্প 'গায়িকা জোসেফিন অথবা ইঁদুর-জাতি'।

৩ জুন: কিয়েরলিংয়ের ওই স্যানাটোরিয়ামে ৪১ বছর বয়সে মৃত্যু।

১১ জুন: সমাধিস্থ হলেন প্রাগের ইহুদি কবরস্থানে।

আগস্ট: প্রকাশক ডি শ্মিড্যে বের করল কাফকার সপ্তম ও শেষ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *এক অনশন-শিল্পী: চারটি গল্প*।

১৯২৫ ম্যাক্স ব্রডের সম্পাদনায় ডি শ্মিড্যে থেকে প্রকাশিত হলো কাফকার উপন্যাস *দুর্গ*।

১৯২৬ ম্যাক্স ব্রডের সম্পাদনায় কুর্ট ভোলফ্ বের করল উপন্যাস *বিচার।*

১৯২৭ ম্যাক্স ব্রডের সম্পাদনায় বেরোলো উপন্যাস *আমেরিকা* (ম্যাক্স ব্রডেরই দেওয়া নাম; কাফকার নাম *The Man Who Disappeared* বা *নিখোঁজ মানুষ*; প্রকাশক কুর্ট ভোলফ্)।

১৯৩০ লন্ডনের প্রকাশনা সংস্থা মার্টিন সেকার থেকে বেরোল উইলা ও এডুইন মুইর অনূদিত কাফকার উপন্যাস *The Castle* (*দুর্গ*); এটিই কাফকার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ।

১৯৩১ কাফকার বাবা হারমান কাফকার মৃত্যু।

১৯৩৪ কাফকার মা ইয়ুলি কাফকার মৃত্যু।

১৯৩৯ ম্যাক্স ব্রড প্রাগ ছাড়লেন জার্মান আক্রমণে সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার শেষতম মুহূর্তে, সঙ্গে সুটকেস ভর্তি কাফকার পাণ্ডুলিপি; পৌঁছালেন প্যালেস্টাইন।

১৯৪৩ আউস্‌ভিৎসের জার্মান বন্দিশিবিরে কাফকার বোন ওট্‌লার মৃত্যু। অন্য দুই বোনও বন্দিশিবিরেই মারা গেলেন ১৯৪১ ও ১৯৪২-এ।

১৯৪৪ জার্মান এক সৈনিকের হাতে ফেলিস বাউয়ারের বন্ধু ও কাফকার প্রেমিকা গ্রেটে ব্লখের মৃত্যু। এক জার্মান বন্দিশিবিরে মিলেনা য়েসেন্স্‌কার মৃত্যু।

১৯৫২ আগস্ট: লন্ডনে কাফকার শেষ প্রেমিকা ডোরা ডিয়ামান্টের মৃত্যু।

১৯৫৬ ম্যাক্স ব্রড কাফকার সব পাণ্ডুলিপি (*বিচার* উপন্যাস বাদে) সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলেন ভালোভাবে সংরক্ষণের জন্য।

১৯৬০ আমেরিকায় ফেলিস বাউয়ারের মৃত্যু।

১৯৬১ কাফকার উত্তরাধিকারীদের অনুমতি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও পণ্ডিত ম্যালকম প্যাস্‌লি কাফকার পাণ্ডুলিপি সুইজারল্যান্ডে ব্যাংকের ভল্ট থেকে সরিয়ে জমা করলেন অক্সফোর্ডের বোদলেইয়ান লাইব্রেরিতে; পরে অনুমতি দেওয়া হলো পাণ্ডুলিপিগুলো গবেষণার ও সেখান থেকে সরাসরি অনুবাদের।

১৯৬৮ ৮৪ বছর বয়সে ইজরায়েলের তেল আবিবে ম্যাক্স ব্রডের মৃত্যু। ব্রডের সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে ৬ খণ্ডে ফ্রানৎস কাফকা *রচনাসমগ্র* প্রকাশিত হলেও তাঁর প্রচুর লেখা আজও আলোর মুখ দেখেনি। মৃত্যুর সময় ব্রড তাঁর সেক্রেটারি (মতান্তরে গোপন প্রেমিকা) এস্থার হফের কাছে সেগুলো হস্তান্তর করেন। ২০০৭ সালে মিসেস হফের মৃত্যু পর্যন্ত সেগুলো তাঁর জিম্মাতেই ছিল। তবে এরই মধ্যে ১৯৮৮ সালে কাফকার *বিচার* উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তিনি নিলামে ২ মিলিয়ন ডলার দামে বিক্রি করে দেন জার্মানির মার্‌বাখের 'জার্মান লিটারারি আর্কাইভ'-এ, যা আধুনিক জার্মান সাহিত্য নিয়ে গবেষণার এক সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র; এর আগে ১৯৭৪ সালেও মিসেস হফে কাফকার আনুমানিক ২২টি চিঠি ও কাফকার ব্রডকে পাঠানো ১০টি পোস্টকার্ড বিক্রি করেন অজানা এক দামে। এর পরের বছর তেল আবিব এয়ারপোর্টে হফে গ্রেপ্তার হন গোপনে কাফকার কিছু পাণ্ডুলিপি নিয়ে, আইন অনুযায়ী ইজরায়েলের ন্যাশনাল আর্কাইভের কাছে ফটোকপি জমা না রেখেই, প্লেনে ওঠার সময়।

ব্রডের শেষ ইচ্ছার মধ্যে অস্পষ্টতা থাকায় কাফকার বাক্সবন্দী পাণ্ডুলিপি নিয়ে আজও চলছে আইনি লড়াই – একদিকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ইজরায়েল যাদের দাবি ম্যাক্স ব্রড এগুলো হফের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন লাইব্রেরির হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই; অন্যদিকে আছে মিসেস হফের দুই মেয়ে এভা ও রুথ, যাদের দাবি ম্যাক্স ব্রড

এগুলো চিরদিনের জন্য তাদের মাকে দিয়ে গেছেন শর্তহীন উত্তরাধিকারী করে। এই দুই বোন তাদের ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন যে তারা পাণ্ডুলিপির এই বাক্সগুলো ইজরায়েলে রাখবে না (যুদ্ধ হুমকি, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের প্রযুক্তি ও সে বিষয়ক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে), দিয়ে দেবে জার্মানির মার্‌বাখের মিউজিয়ামে বা আর্কাইভে। এভা আজও ইজরায়েলের আদালতে পাণ্ডুলিপিগুলোর অধিকার নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ইজরায়েলের বিরুদ্ধে।

১৯৮০-র দশকে বার্নহার্ড এখ্‌টে নামের এক ভাষাতাত্ত্বিক মিসেস এস্‌থার হফের সঙ্গে মিলে বাক্সবন্দি পাণ্ডুলিপিগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করেন, যার কপি অতি দুষ্প্রাপ্য; ধারণা করা হয়, এটিও সম্পূর্ণ তালিকা নয়, কারণ কাফকার অনেক লেখাই ব্রড পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইজরায়েলের বাইরে – সুইস ব্যাংকের ডিপোজিট বক্সে।

মজার ব্যাপার এটিই যে বিশ্বসাহিত্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বোধ্যতার মূল রূপকার ফ্রানৎস কাফকার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের আদালতে আজও – গত প্রায় কমবেশি ৪০ বছর ধরে, যা তুঙ্গে উঠেছে গত পাঁচ বছরে – চলছে এক দীর্ঘ, দুর্বোধ্য, জটিল বিচার। কাফকারই পাণ্ডুলিপির এই কাফকায়েস্ক বিচার বিশ্বসাহিত্যের এক মহা আয়রনি।

যারা এ বিষয়ে আরো ভালোভাবে জানতে চান, তাঁরা ইন্টারনেটে *নিউ ইয়র্ক টাইমস্* পত্রিকায় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে প্রকাশিত কাফকা গবেষক এলিফ বাটুমান (Elif Batuman)-এর লেখা বিশাল প্রবন্ধ 'Kafka's Last Trial' এবং ইন্টারনেটে সহজলভ্য বেশ কিছু অন্য রিপোর্ট পড়ে দেখতে পারেন।

কাফকার শৈশবে প্রাগের ওল্ড টাউন স্কোয়ার। বাঁয়ের বিল্ডিংটি কিন্‌স্কি প্যালেস; এটার ওপরের তলায় ছিল কাফকার স্কুল (১৮৯৩ থেকে ১৯০১), আর নিচতলায়, ডান দিকে, হারমান কাফকার ব্যবসায়ের দোকানটি। ছবির পেছনে, কেন্দ্রে, রয়েছে টাইন চার্চ; এর ঠিক সামনে দেখা যাচ্ছে কুমারী মেরির স্তম্ভ, কাফকা ও ম্যাক্স ব্রডের রোজকার দেখা করার জায়গা। একদম ডানে দেখা যাচ্ছে সেলেৎনা স্ট্রিটের মাথা; কাফকাদের বাড়ি ছিল এ-রাস্তায় ঢুকতেই হাতের বাঁয়ে দ্বিতীয়টি (১৮৯৭-১৯০৭)। আজকের ওল্ড টাউন স্কোয়ারটি একই রকম আছে, শুধু নেই কুমারী মেরির স্তম্ভ ও স্কোয়ারের ওপরে ছাপরাঘরের দোকানগুলো।

কাফকার বাবা হারমান কাফকা
(১৮৫২-১৯৩১)

কাফকার মা ইউলি কাফকা (বংশনাম লাউভি)
(১৮৫৬-১৯৩৪)

ওল্ড টাউন স্কোয়ারের কোনায় কাফকার জন্মস্থানের বাড়িটি। এর সামনের ঢোকার দরজাটি বাদ দিয়ে পুরো বাড়িটিকেই পরে মোটামুটি নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়। নিচতলায়, বাঁয়ের কোনার রুমটি, এখন একটি ছোট ফ্রানৎস কাফকা স্যুভেনির শপ। এর সামনের রাস্তার নামও এখন 'ফ্রানৎস কাফকা স্ট্রিট'।

কাফকার দুই বছর বয়সের ছবি। এটি তিনি তিরিশ বছর পরে পাঠান ফেলিস বাউয়ারকে, সঙ্গে লেখেন: 'ছবিতে আমার রাগী মুখ মনে হয় স্রেফ মজা করার জন্যই, কিন্তু এখন আমার কাছে ব্যাপারটিকে মনে হয় কোনো গোপন সত্য...। আমার আশপাশে এখন বাচ্চা দেখলে আমি চোখ বন্ধ করে রাখাই পছন্দ করি'।

ফ্রানৎস কাফকা, আনুমানিক পাঁচ বছর বয়সে। ছবিটির ব্যাপারে কাফকার মন্তব্য: 'সবকিছু নিয়ে আমার নিরাপত্তাহীনতা এতটাই ছিল যে আমি শুধু, সত্যিকার অর্থে, নিশ্চিত ছিলাম আমার হাতে ধরে রাখা জিনিসটার ব্যাপারেই...'

কাফকার তিন বোন (বাঁ থেকে) ওট্‌লা, এল্লি ও ভাল্লি

কাফকার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ম্যাক্স ব্রড

কাফকার বিখ্যাত ছবি, ১৯০৬-০৮ সালের কোনো এক সময়ে তোলা, যেখানে তিনি চার্লি চ্যাপলিন হ্যাট পরে আছেন।

১. ফ্রানৎস কাফকা, ২৭ বছর বয়সে ২. বোন এল্লি, ২১ বছর বয়সে
৩. বোন ভাল্লি, ২০ বছর বয়সে ৪. প্রিয়তম বোন ওট্‌লা, ১৮ বছর বয়সে

১. প্রিয় বোন ওট্‌লার সঙ্গে কাফকা, ১৯১৪ সালে।
প্রাগের ওল্ড টাউন স্কোয়ারে ওপেলট্‌ হাউজে তাঁদের বাড়ির তোরণদ্বারের থামে দাঁড়িয়ে
২. প্রেমিকা ফেলিস বাউয়ারের সঙ্গে কাফকা; বুদাপেস্ট, জুলাই ১৯১৭
৩. কাফকার প্রেমিকা মিলেনা য়েসেন্‌স্কা ৪. কাফকার শেষ প্রেমিকা ডোরা ডিয়ামান্ট, ১৯২৩
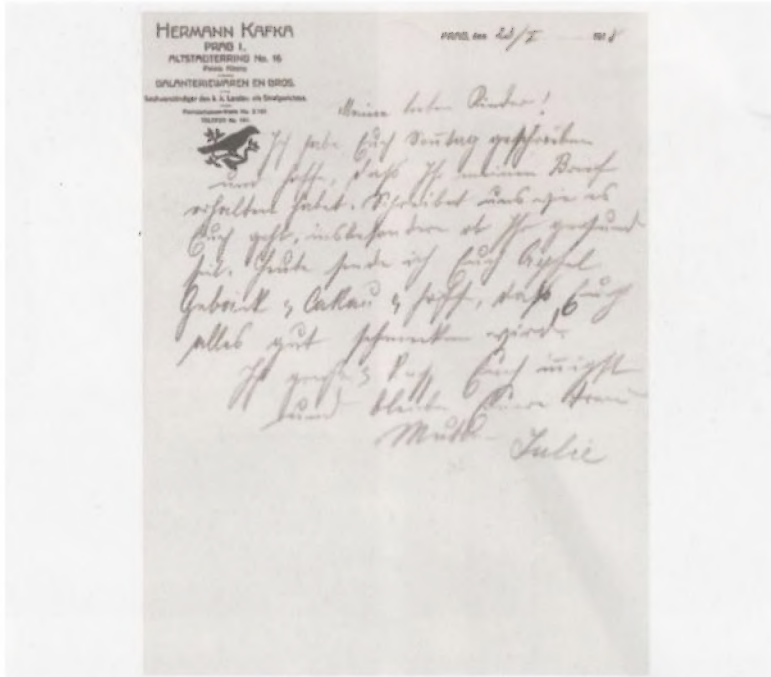
কাফকা ও তাঁর বোন ওট্‌লাকে তাঁদের মায়ের লেখা চিঠি, ২৩ জানুয়ারি ১৯১৮। চিঠির পাতাটিতে কাফকাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লোগো Kavka বা দাঁড়কাক

প্রাগের নতুন ইহুদি কবরস্থানে ফ্রানৎস কাফকার কবর। একই কবরে শুয়ে আছেন তাঁর বাবা ও মা।